

থাকি জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাঠানরাজ ! প্রায় এক বৎসর আপনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, দিল্লীখবরের কোন্ সেনাপতি যুদ্ধে অধিকতম সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি অবজ্ঞাই বলিতে পারেন ?” পাঠানরাজ উত্তর করিলেন, “প্রথম ক্ষত্রিয়-কুলচূড়ামণি রাজা চৌদরমল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমিদার রাজা সমরসিংহ ।” এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে সমগ্র দরবার জয়ধ্বনি ও কোলাহলে প্রাবলিত হইল ; সেই জয়ধ্বনি বায়ুমার্গে আরোহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল ; চতুর্দিকস্থিত ভূগর্ভে—যথায় আমি একাকিনী উপবেশন করিয়া যুদ্ধে স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করিতেছিলাম—প্রবেশ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত করিল। অতঃ কি না সেই সমরসিংহের বিদ্রোহ অপবাদে শিরচ্ছেদন হইল। দেব-দেব মহেশ্বর ! ইহার কি ইহকালে প্রতি-হিংসা নাই, পরকালে বিচার নাই ?

ছিন্ন-ভাঙ্গা বীণার মত সহসা মহাশব্দের গম্ভীর স্বর খামিয়া গেল। শিথিলবাহন বলিলেন, “ভগিনি ! পূর্বকথা স্মরণে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যক কি ? বিশেষ, রাজা সমরসিংহের যশো-বার্তা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছে ? সে কথা বিবৃত করিয়া সমরসিংহের পত্নীর হৃদয়ের ব্যথা পাইবার আবশ্যক কি ?”

মহাশব্দে । সমরসিংহের পত্নী নহি, এককালে সমরসিংহের রাজমহিষী ছিলাম, এক্ষণে নিরাশ্রয়া বিধবা !—আমার আর অধিক বলিবার নাই, শ্রবণ করুন।

সতীশচন্দ্র নানে পাঠানদিগের একজন চতুর কণ্ঠস্বরী ছিল ; পাঠান-গৌরব অন্ত-প্রায় দেখিয়া সে পাঠানপক্ষ ত্যাগ করিয়া

রাজা চৌদরমল্লের আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমার স্বামীই সেই বিনীত ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিয়া রাজা চৌদরমল্লের নিকট লইয়া যান এবং অনেক সহায়তা করেন।

ব্রাহ্মণ চতুর ও কার্যদক্ষ ; সৈন্যদিগের রসদ আহরণে, শত্রুদিগের অভিসন্ধি অনুভব-করণে এবং কুটিল চক্রান্ত দ্বারা শত্রুদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ-সাধনে বিশেষ তৎপর ছিল। রাজা চৌদরমল্ল সতীশচন্দ্রের উপর তুষ্ট হইলেন, রাজপ্রসাদে সতীশচন্দ্র ক্রমে খ্যাতি, ধন ও বিস্তীর্ণ সম্পত্তি লাভ করিল।

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্রের ভীষণ উচ্চাভিলাষ হইল, বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান হইবার আশা হইল, আমার স্বামীর প্রতি বিজাতীয় হিংসা হইল। যোগ-নারা বলেন, লোকের উপকার করিলে লোকে রুতজ হয় ; আমার স্বামী দিল্লী সতীশচন্দ্রের উপকার করিয়া দিল্লীতে পুথিলেন !

রাজা চৌদরমল্ল বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করাতে সতীশচন্দ্র স্ববোগ পাইল ; জাল কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিল যে, রাজা সমরসিংহ উড়িষ্যার পাঠানরাজ দায়দ খাঁর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়াছেন। বঙ্গের মুসলমান স্ববাদের এই অপূর্ণ কথা বিশ্বাস করিলেন ; রাজা সমরসিংহ বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহার জ্ঞানদণ্ড হইল, পামর সতীশচন্দ্র আমাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী পুর-স্বারস্বরূপ অপলাপ করিয়া আজি বঙ্গদেশের দেওয়ান হইয়াছেন !

লাভঃ ! আমার কথা শেষ হইয়াছে। এই শোকে আমি পাগলিনী হইয়াছি ; এই নরহত্যার প্রতিহিংসার জন্য আমি ত্রুতধারণ করিয়াছি !

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রাহিলেন।

শিখগুণবাহন দেখিলেন, মহাশ্বেতার ব্রত-
ভঙ্গের চেষ্টা করা বুঝা, অগ্নিরাশিতে জল-
বিন্দু নিক্ষেপমাত্র ;—বলিলেন, “তবে আমি
পিতাকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিব ?”

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, “হাঁ, বলিবেন
যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্নিকট, নরঘাতকের
দণ্ড সন্নিকট । রাজা টোডরমল্ল তৃতীয়বার
বঙ্গদেশে আসিয়াছেন ; তাঁহার যুদ্ধকাণ্ড
শেষ হইলে সমরসিংহের বিধবা তাঁহার
নিকট সমরসিংহের বধের জন্ত বিচার
প্রার্থনা করিবে । পিতাকে বলিবেন যে,
পক্ষিধাবক ব্যাধ কড়ক আহত হইলে আপ-
নার যাতনায় ক্রন্দন করিয়া প্রাণত্যাগ করে ;
কিন্তু মানিনী ফণিনী পদাহত হইলে আঘাত-
কারীকে দংশন করিয়া হধে, হেলায় প্রাণ-
ত্যাগ করে !

বলিতে বলিতে মহাশ্বেতা আসন ত্যাগ
করিয়া সম্মুখ দাঁড়াইয়া উঠিলেন । মহা-
শ্বেতার সমস্ত শরীর কম্পিত ও কণ্টকিত !
তিনি গহের দ্বার উন্মোচিত করিলেন ;
প্রভাতের আলোকছটা তাঁহার কঙ্কিত
ললাটে পতিত হওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠি-
লেন, দেখিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগ তরুণ
অকণকিরণে স্তব্ধবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ডালে
ডালে নানা পক্ষী নানা রঙ্গে নানা গান
করিতেছে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সরলা ও অমলা ।

Wei Hernia, like two artificial goods,
Have with our needles created both one
flower
Both on one sample, sitting on one

Both, warbling of one song

As if our hands, our sides,

Had been incorporate, so we

Like to a double cherry, seen

And yet a union in partition

Two lovely berries moulded

বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষিগণ
অনেক পূর্বেই সরলা গাে
গৃহকাণ্ডে নিযুক্ত হইল ; ঘর,
সকল পরিষ্কার করিল ।
করিবেন, রাজকুমারীণ কি এ
সাজে ? সরলা যে রাজকুমারী
জানিত না । পিতার মৃত্যুর
বয়স্ক বালিকা ছিল, তখনক
একেবারে বিস্মৃত হইয়া
মাতাপিতা কথা তাহাকে কহ
তাহার বালিকা-হৃদয়ে অজ
মানের লেশমাত্র ছিল না
বাস করিয়া মাতাকে
পত্নীদিগের সহিত অলাপ
ইহা অপেক্ষা উচ্চাভিলাষ ত
করণে তখন স্থান পাইত না

গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া

লইয়া নদীতে স্নান করিতে
দিনই স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে তা
পন হইত । পথিমধ্যে এ
দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,
উত্তর দিল না । পুনরায়
অমলা । ” “যাইলো ! ” এই
ভিতর হইতে কে উত্তর দিল ।
এক পঞ্চদশবর্ষীয়া, প্রখরনয়না

এক রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী, কক্ষে কলস, হাতে শাখা, পায়ে মল । আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া চিম্টা কাটিয়া বলিল, “তোমার যেমন আকৌল ! আমার ঘরে বুদ্ধ স্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয় ? তোমার কি বল, যা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনাঘ নিদ্রা হয় না, প্রভাত হইতে না হইতে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচিস্ ।” এই বলিয়া আবার সরলাকে চিম্টা কাটিল ও হাসিতে হাসিতে গালটিপিয়া দিল।

সরলা বলিল, “সই, তুমি আমাকে আসিতে বল, তাই আমি ডাকিতে আসি ?”

অমলা । তা না হইলে আসিতে না ?

সরলা । আসিতাম ।

অমলা । কেন আসিতে ?

সরলা । তা আমি জানি না । সকালে উঠিয়াই তোমার মুখখানি মনে পড়ে । যদি একদিন তোমায় না দেখি, তা হ'লে আমার সমস্ত দিন কাজক্ষে মন থাকে না ।

অমলা প্রেমপূর্ণলোচনে সরলার মুখখানি নিরীক্ষণ করিল, বালিকার মুখখানিও প্রেম-রাশিতে উলমল করিতেছে । ক্ষণেক পরে অমলা বলিতে লাগিল, “সই, আর শুনেছ— জমীদারের কাছারীর নতুন খবর শুনেছ ?”

সরলা । না, কি খবর ?

অমলা । আমাদের জমীদার নাকি এক বড় বরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, মেয়ে নাকি বড় রূপসী, রূপ যেন বিদ্যাতের মত, আর চক্ষু দুটি যেন—

—যেন—দুটি কালো কালো ভ্রমরার মত ।

সরলা । তার পর ?

অমলা । তার পর সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাদের জমীদারের ছেলে নাকি বলিলেন, “আমি ও মেয়েকে বিবাহ করিব না ।”

সরলা । কেন ?

অমলা । কেন, তা জানি না, শুনিয়াছি, কোন পল্লীগামে কোন এক গরীব মেয়েকে দেখিয়া মন হারাইয়াছেন । তা সেই মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্ত নাকি গৃহত্যাগী হইয়াছেন । আমার সইকেই বা দেখিয়া থাকিবেন ।

সরলা । তামাসা কর কেন সই ? আচ্ছা, বাপ বলিতেছেন একজনকে বিবাহ করিতে, ছেলে আর একজনকে বিবাহ করিবেন ?

অমলা । তা বার থাকে মনে ধরে, বাপ যাহাকে বিবাহ করিতে বলেন, তাহাকে যদি মনে না ধরে ?

সরলা । কেন ধরবে না ?

অমলা । “তুই যেমন হাবা, তোকে আর কত শিখাব । বলি, মাঝে বল বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব শিখবি ।” এই বলিয়া আবার সরলার গাল টিপিয়া দিল ।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল । নদীর তীরে ঘাইয়া এক অশ্রুপূর্ণ দর্শন দৃষ্ট হইল । তথায় নিবিড় কুম্ভবর্ণী, দীর্ঘায়তা, ছিন্নবসনা এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছেন । তাহার গলদেশে অক্ষমালা, হস্তে দণ্ড, শরীরে ভস্ম, চক্ষু রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান । দেখিয়া দুই জনই বিস্মিত হইল । অমলা জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা ?”

সে উত্তর করিল, “আমার নাম বিবে-ধরী পাগলিনী ।” অমলা বলিল, “হাঁ হাঁ, আমি বিপু পাগলীর নাম শুনিয়াছি । তুমি আগে এ গ্রামে একবার আসিয়াছিলে না ?”

বিবেধরী । আসিয়াছিলাম ।

অমলা । তুমি না হাত দেখিতে জান ?

বিবেধরী । জানি ।

অমলা । আচ্ছা, আমার হাত দেখ দেখি ? পাগলিনী হাত দেখিয়া ক্ষণেক পরে বলিল, “তুমি দেওয়ানের ঘৃহিণী হইবে ।”

অমলা। দূর পাগলী! আমার স্বামী বর্জ-
মান; বলে কি না দেওয়ানের দ্বী হবে।
আমার দেওয়ান উজীরে কাজ নাই, আমার
বৃদ্ধ স্বামী বাঁচিয়া থাকুক। এখন বল দেখি,
আমার সহায়ের কবে বিবাহ হবে? বিবাহের
ভাণনা সহায়ের রাত্রিতে ঘুম হয় না।

পাগলিনী অনেকক্ষণ সরলার হস্তধারণ-
পূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে
তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল,
আবার হস্ত দেখিতে লাগিল। অনেক-
ক্ষণের পর বলিল, “তোমার ভবিষ্যৎ
আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন; কৃষ্ণার্ণ মেঘরাশি
ও ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে
পাই না। সম্প্রতি তুমুল প্রলয় উপস্থিত।
তাহার পর কি আছে, বলিতে পারি না।
তিন দিনমধ্যে বড় আসিবে, অগ্নি এ গ্রাম
হইতে পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন
কর।”

সরলা ভীত হইল। অমলা প্রিয়সখীর
এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পাগলিনীকে উপলক্ষ্য
করিয়া বলিল, “ধান ভানিতে শিবের গীত!
আমি কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সহায়ের
বিবাহ হইবে কবে, উনি আকাশ, মেঘ,
প্রলয়ের কথা আনিলেন। দাঁড়া তো আমি
পাগলীকে জন্ম করি।”

এই বলিয়া অমলা পাগলিনীর গায়ে
জল দিতে লাগিল, পাগলিনী ধীরে ধীরে
চলিয়া গেল; দূরে যাইয়া পুনরায় সরলার
প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, “পলায়ন কর,
পলায়ন কর, পলায়ন কর!”

এ দিকে অস্বস্তি ক্রমকপত্নীগণ আসিয়া
ঘাটে উপস্থিত হইল। রামী, বামী, শ্রামী,
নৃত্যের বৌ, হরির মা ইত্যাদি অনেক গ্রাম্য
স্বন্দরী আসিয়া ঘাট আগো করিয়া বসিল;
নাশপ্রকার কর্তব্যবর্তা ও রঙ্গরসে ঘাট

জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত
সৌন্দর্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে ফীত
হইয়া কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতে
লাগিল; গ্রাম্য স্বন্দরীরাও আনন্দে কল-
কল শব্দে গল্প আরম্ভ করিল। গল্পের মধ্যে
অল্পবয়স্কারা স্বামীর কথা ও প্রাচীনরা পর-
নন্দার কথা আনিল। সরলা ও অমলা
কলসে জল লইয়া নিজ গৃহে আসিল।

অমলার স্বামী সহিত পাঠক অগ্রেই
পরিচিত হইয়াছেন। নবীন দাস জাতিতে
কৈবর্ত, সে গ্রামে একজন মহাজন ছিল
ও অনেক প্রকার ব্যবসাও করিত। তাহার
স্বভাব অতি সন্তুষ্ট ও সরল। তাহার
কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্গতিও ছিল। প্রায়
একশত বিঘা জমী, ২০২৫ টা গরু, ১৫
খানা লাঙ্গল ও বাটীর মধ্যে আট দশটা
গোলা ছিল। আর লোকের মুখে এমনও
শুনা যাইত যে, নগদ কিছু টাকা মাটিতে
পুতিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আপন
পত্নীকে অনেক গহনাও দিয়াছিল। প্রথম
পক্ষের ঐর মৃত্যুর পর প্রায় ৩৫ বৎসর
বয়সের সময় দশমবর্ষিয়া অমলাকে বিবাহ
করে। এখনও বৃদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অমলা
উপহাস করিয়া তাহাকে “বৃদ্ধ স্বামী” বলিয়া
ডাকিত। অমলা স্নেহবতী ভাব্যা, কিন্তু
অত্যন্ত রসিকা। “বৃদ্ধ স্বামীর” সেবাশুক্র
করিত, কিন্তু দিবারাত্রি উপহাস করিতেও
ক্লান্ত থাকিত না। এ প্রকার পত্নী পাইয়া
“বৃদ্ধ স্বামীর” স্নেহের ও স্নেহের সীমা ছিল
না।

সরলার কদম্বপুরে আগমন অবধি অমলা
তাহাকে আপন সোদরা অপেক্ষা অধিক
স্নেহ করিত, প্রাণের অপেক্ষা অধিক
বাসিত, দুঃখের সময়ে সরলার
বালিকা-মুখখান দেখিয়া সকল

বারে ভুলিয়া যাইত, সূত্থের সময়ে সরলার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুইটি দেখিতে পাইলে সূত্থ দ্বিগুণ হইত। ছয় বৎসরকাল একত্র থাকিয়া তাঁহাদের স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ভালবাসার শেষ ছিল না। সরলা সময় পাইলেই অমলার নিকট যাইত, অমলা অবকাশ পাইলেই সরলার নিকট আসিত। কত দিন তাহারা দুইজনে মধ্যাহ্নে একটি বৃক্ষছায়ায় বসিয়া কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিত, কত দিন রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত দুই জনে নিভৃত স্থানে বসিয়া গল্প করিত। দুই জনের বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছা নাই, স্মরণ্য সে গল্পেরও শেষ নাই। ফলতঃ, তাহাদিগের শরীর বিভিন্ন হইলেও একই মন, একই প্রাণ, একই হৃদয় ছিল।

সরলা বাটী আসিয়া দেখিল, মাতা ও ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হইলেন। সরলা বলিল, “মা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাও নাই?”

মহাশ্বেতা। না মা, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলাম, কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তোমার আজ ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে।

সরলা। হাঁ মা, আজ ঘাটে বিশু পাগলী নামে এক স্ত্রীলোক আসিয়াছিল।

এই বলিয়া সরলা সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বিশেষরূপে পাগলিনীর জন্ত অনেক অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখা গেল না।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহাশ্বেতা দৈনিক রীতামুসারে স্নানার্থ গমন করিলেন। ফুটরে সরলা একাকিনী কাজ করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিবশতই হউক বা অনেকক্ষণ একাকিনী বলিয়াই

হউক, সরলার মূখমণ্ডল যেন কিছু য়ান বোধ হইতেছে, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরলার হৃদয়ে ছায়া ঘনীভূত হইতেছে। চিন্তা কিছুই নাই, দুঃখ কিছুই নাই, তথাপি হৃদয় আকাশ যেন অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই, স্মৃতিতে কোন পরিতাপ নাই, অথচ হৃদয় আপনা হইতেই ভারগ্রস্ত। সম্মুখে চরকা ঘুরিতেছে, ললাটে ঈষৎ ঘর্ষবিন্দু দেখা যাইতেছে, সরলা একাকিনী বসিয়া কার্য্য করিতেছে ও অতি মুহূর্ত্তেরে এক একবার গান করিতেছে। অতি মুহূর্ত্ত গুণ গুণ শব্দে একটি খেদের গান একবার, দুইবার, তিনবার শব্দ হইল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, “সরলা!”

যিনি ডাকিলেন, তিনি একজন যুবা-পুরুষ, বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। মূখমণ্ডল অতি সূত্রী, ঔদার্য্যবাহক, কিন্তু ঈষৎ গম্ভীর ও য়ান। কেশবিজ্ঞাসে কিছুই য়জ নাই, স্মরণ্য নিবিড় কৃষ্ণকেশ অধুনা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া মূখমণ্ডল কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। চক্ষুঃস্র জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্য অথবা দুঃখ অথবা চিন্তায় চতুর্পার্শ্বে কালিমা পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, বকঃস্থল আয়ত, বাহুযুগল দীর্ঘ, শরীর গম্ভীর ও শান্ত, অথচ তেজোবানক। আকৃতি দেখিলে সহসা বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ গীত হইতেছিল, আগ-স্কন্ধ নিম্পন্দশরীরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন ও অনিমেঘলোচনে সরলার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বোধ হয়, যেন সরলার শোকাবহ গানে আগস্কন্ধের হৃদয়ে কোন শোকচিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যুবক সরলার নাম উচ্চারণ করিলেন,—“সরলা!”

সরলা হঠাৎ পশ্চাতে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিল, “ইন্দ্রনাথ?”

ইন্দ্রনাথ। সরলা! তোমার সংসারে কি এতই বৈরাগ্য হইয়াছে যে, এরূপ শোকাবহ গান গাহিতেছ?

সরলা। “না, আমি মনে কিছুই ভাবি নাই, আমার মনে কোন ভাবনাই নাই, তবে আমি ঐ একটি ভিন্ন আর গান জানি না। সেই জন্ম আমি ঐটি বার বার গাহিতে-ছিলাম। সেই আমাকে অনেক গান শিখাইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার কেবল ঐটি মনে লাগে। যখন একলা থাকি, তখন বসিয়া বসিয়া গাই। আমি কি জানি যে, তুমি লুকাইয়া শুনিতেছ?” এই বলিয়া সরলা মুখ নত করিল, —ক্ষণেক পর আবার বলিল, “মা পূজা করিতে গিয়াছেন, আমাদের দাসী হাটে গিয়াছে, সেই জন্ম আমি একলা বাড়ীতে আছি।” কুমি বস, দাসী এখনই আসিবে।”

এতক্ষণ একাকিনী থাকিয়া সরলা স্নেহপূর্ণ মন হইয়াছিল, চিরপরিচিত বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া সেইরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিল। সরলার কি কথা? সরলচিত্ত বালিকার যে কথা, সরলা সেই কথাই কহিতেছিল। কখন মাতার কথা কহিতেছিল, কখন আপন কার্যের কথা কহিতেছিল, কখন ক্ষুদ্র উচ্চানে লইয়া গিয়া আপনি যে পুষ্পচারা রোপণ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছিল। ইন্দ্রনাথ আগ্রহপূরক তাহাই শুনিতে ও দেখিতে-ছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিবিড় বৃক্ষাবলীর ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে আকাশে স্বর্ণ-বর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের আলোক দেখা যাইতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র উড়ে আরোহণ করিয়া নীল

আকাশে স্বর্ণ-আলোক বিস্তার করিল। সে আলোক সরলার সুগোল শরীর প্রাণিত করিল, সুন্দর বদনমণ্ডলের কিশোরভাব বর্ধন করিল, সুহাসপরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আরও মধুরিমাময় করিল, শান্তজ্যোতিঃ নয়নদ্বয় স্নেহরসে আধৃত করিল। ইন্দ্রনাথেরও মুখে কথা নাই; স্নেহনয়নে সেই সুবর্ণ-পুষ্প-লীর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল, সেই সুবন্ধিম অঙ্গুল, সেই প্রেম-প্রাণিত নয়ন, সেই শ্রুতমধুর ওষ্ঠাধর, সেই মোহন মুগমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “সরলা!”

ইন্দ্রনাথের গভীরস্বরে সরলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, তাঁহার মনমুগ্ধ আরও মন হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, “সরলা! বোধ হয়, তোমার সহিত আমার এই শেষ দেখা।” সরলার প্রফুল্লনয়নে এক বিস্ময় জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, তুমি কি আর রত্নপুরে থাকিবে না?”

ইন্দ্রনাথ। না। আমি আর রত্নপুরে থাকিব না; কারণ বোধ হয় তুমি পরে জানিতে পারিবে।

সরলা। কেন, তোমার এ গ্রামে থাকিতে কোন ক্লেশ হইতেছে? তুমি কেন আমাদের বাড়ী থাক না? আমি যাকে বলিলে সম্মত হইবেন। আমাদের যাহা সামান্য আর আছে, তাহাতে তোমার এখানে কোন কষ্ট হইবে না, স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

ইন্দ্রনাথ। সরলা, তোমার দয়ার শরীর, তোমার স্নেহ অসীম। কিন্তু আমার থাইবার কষ্ট কিছুই নাই, আমি নবীন দাসের বাড়ীতে অতিথি হইয়া আছি, তোমার সেই আমাকে বিশেষ যত্ন করেন, তাহা ত তুমি জান। এখানে স্থান না হইলেও আমার

ধাকিবার অস্ত্র স্থান আছে। আমি অস্ত্র কারণে গ্রাম ত্যাগ করিতেছি।

সরলা। নিতান্তই কি গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে ?

ইন্দ্রনাথ। সরলা, আমি চলিয়া গেলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে ?

সরলা। কষ্ট হইবে না ? আমাদের আর কে আছে বল ?

ইন্দ্রনাথ। সরলা ! তোমার মনের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু আমি কোনও প্রকারে আর এ গ্রামে থাকিতে পারি না। সরলা, বিদায় দাও ; যদি বাচিয়া থাকি, যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনরায় দেখা করিব ; না হয়, এই শেষ।

ইন্দ্রনাথের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। সরলার প্রশান্ত নীলোৎপলসদৃশ চক্ষুতে অশ্রু টল টল করিতে লাগিল। সরলা ইন্দ্রনাথকে ত্রাতার মত ভালবাসিত, তাহা ভিন্ন অস্ত্র কোন প্রকার ভালবাসা আপন হৃদয়কোরকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিত না ; বিদায় দিতে এমন যাতনা হইবে, তাহা জানিত না।

দেই পৌর্ণমাসী রজনীতে, দেই নিভৃত উঠানে, উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া উভয়ের হস্তধারণ করিয়া, পরস্পরের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; পরস্পর-দর্শন-স্বধা সতৃষ্ণনয়নে পান করিতে লাগিলেন ; পরস্পরের বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয়ের যাতনা কিছু কিছু প্রশমিত করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ স্নেহভরে সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “সরলা, আমি ধর্ম্মের গৌরবের জন্ত, পাপের দণ্ডের জন্ত যাইতেছি। ভগবান্ আমাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। যদি

তিনি সাহায্য করেন, তবে কাহাকে ভয় ? অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া আবার তোমারই নিকট আসিব।”

সরলা কিঞ্চিৎ শাস্ত হইয়া বলিল, “যদি এস, কবে আসিবে ?”

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “ভয় মাসের মধ্যে আসিব। আজ পূর্ণিমা, আজ হইতে সপ্তম পূর্ণিমা-তিথিতে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে, ইন্দ্রনাথ আর এ জগতে নাই।”

এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারদেশে শব্দ হইল। সরলা ব্যুল, দাসী আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দ্বিতে গেল। ইন্দ্রনাথ অনিমেষ-লোচনে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও মনে মনে বলিলেন, “ভগবান্, সহায় হও, যেন এই রমণীর লাবণ্য ক্রটিতে পারি। যদি না পারি, এ হৃদয় শুষ্ক হইবে, এ জীবন মরুভূমি হইবে।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুর-পরিত্যাগ।

And there sudden partings, such as press
The life from one young hearts,
and choking sighs
That ne'er might be repeated.
who could guess,
if e'er again should meet those mutual eyes
since upon a night so sweet such awful
morn could rise.
Byron,

রাজা সমরসিংহ রায় বঙ্গদেশীয় সমস্ত হিন্দু জীবদাবদিগের সম্পদকালে পরম বদ্ধ ও বিপৎকালে অবলম্বন এবং আশ্রয় ছিলেন। তিনি নিজ সাহস ও বাহুবলে যে খ্যাতি ও ক্রমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বারা স্বদেশ-

লক্ষী জমীদারদিগের গৌরব বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ বিপৎকালে তাঁহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হন নাই, এ প্রকার জমীদার প্রায় বঙ্গদেশেই ছিল না। ইচ্ছা-পূরের প্রজারঞ্জক জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজা সমরসিংহের বিশেষ অমুগ্রহভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথও রাজা সমরসিংহকে ছোদনাত্মক আক্রমণ করিতেন ও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্যই করিতেন না।

রাজা সমরসিংহের মৃত্যুর পর বিধবা রাজ্ঞী ও বাঙাল্যমণীর জ্ঞান নগেন্দ্রনাথ অনেক অমুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ছদ্মবেশে চতুর্দেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করাতে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইল না। বিশেষতঃ রাজা সমরসিংহের অপত্যের নিমিত্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলে দেওয়ান সতীশচন্দ্রের কোপভাজন হইতে হইবে, এই বিবেচনায় ত্রাস্তরিক স্নেহও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবৃত রাখিতে হইয়াছিল। মানব-জন্মের স্নেহরসজ্বল অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থপরতা যৎপরোনাস্তি প্রবল। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে নগেন্দ্রনাথ আপনার উন্নতির পথে ধাবিত হইতে লাগিলেন, যাহাতে ধন, মান, ক্ষমতা-বর্দ্ধন হয়, যাহাতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ান মহাশয়ের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাঁহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে অভাগা বিধবা ও অনাথা কস্তার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন, বৎসর-মধ্যেই সে দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। রাজা সমরসিংহের যে বিধবা স্ত্রী ও অনাথা কস্তা আছে, তাহা নগেন্দ্রনাথের স্বরণপথ হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

পাঠক মহাশয়, নগেন্দ্রনাথকে রুত্নর বলিয়া মনে করিবেন না। এই অখিল ভূমণ্ড-

লের প্রতি দৃষ্টি করুন। ইহার মধ্যে কয়জন উপকারের প্রতাপকার করিবার জন্ত আপন পথে কাঁটা দেন? কয় জন পূর্বকৃত উপকার-স্বরণে আপন স্বার্থসাধনে বিরত হন? স্নেহ, দয়া, মায়া, এ সকল স্বর্গীয় পদার্থ। কিন্তু স্বার্থপরতা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে স্নেহ কত দিন থাকে? মায়ার পাত্র নয়নের বহির্গত হইলে মায়া কত দিন থাকিতে পারে? আমরা যদি নগেন্দ্রনাথের প্রতি রাগ করিয়া থাকি, তবে নগেন্দ্রনাথকৃত অপরাধ হইতে আপনাদের নিরস্ত থাকিতে যেন চেষ্টা করি। বোধ করি, অনেক দরিদ্র আত্মীয়-কুটুম্ব আত্ম-দিগের মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদিগকে যেন আশ্রয় দান করি; বোধ করি, অনেক অনাথা বিধবা যাতনায় ও কষ্টে কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছে, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহায়তা-দানে যেন ধাবমান হই। এ দুঃখপূর্ণ সংসারে চারিদিকে যে দুঃখরাশি দেখিতে পাই, তাহা সমস্ত নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য, কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতে পারি, একজন ভূক্ষার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তৃপ্ত করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে এ কার্যক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্মধারণ করি নাই।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্মধারণ করেন নাই। ধনবান্ জমীদার-পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না; উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষক-দিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন, কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন, সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন! কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষক-দিগের গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে

কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জলিত, যে সময়ে গো-শালায় গাভীসকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতায় দোষ-শূন্যতা, দুঃখ ও ক্রেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আলোচনা করিতেন ; দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগ-যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথা-বার্তা শুনিতেন— অমুক গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন হইতেছে ; অমুক গ্রামে ধাতু দুর্গম্ভূয়া হইতেছে, এ স্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক, ও স্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচারী— সুরেন্দ্রনাথ এই সকল কথাই আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধনমর্যাদা বিস্মৃত হইতেন ; আপন কুলগৌরব বিস্মৃত হইতেন ; সেই ধাতুক্ষেত্র-বেষ্টিত, আশ্রকাননশোভিত কুটীরবাসীদিগকে আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন।

যখন মহাশ্বেতা বালিকা কন্যা লইয়া চতুর্দিকে দূর হইতে পলায়ন করেন, সুরেন্দ্রনাথ আপন পিত্রাণ্ডয় তাগ করিয়া অনেক দিন অধেষণের পর তাহার সন্ধান পাইলেন। তৎকালে মহাশ্বেতা ইচ্ছামতী-তীরে মোহান্ত চন্দ্রশেখরের নিকট মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে আশ্রয়দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু অভিমানিনী মহাশ্বেতা দরিদ্রাবস্থায় ও গর্ভিতা ছিলেন, সহায়তা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বার বার উপরোধ করিলেন, কিন্তু মহাশ্বেতা বার বার অসম্মত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

“রাজা সময়সিংহের বংশ এই দরিদ্রাবস্থায় মাননীয়, পরের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিবে না।” এ কথায় সুরেন্দ্রনাথ অগত্যা উপরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন ; অবশেষে বলিলেন, “আপনার স্বামীর নিকট আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত আছি, এই অসময়ে যদি কোন প্রত্যাশকার না করিতে পারিলাম, তবে চিরকাল আমরা জন্ম বিফল মনে করিব। অতএব যদি আমাদের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ না করেন, বলুন, আর কি প্রকারে আপনার উপকার করিতে পারি ?” মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, “তবে তোমার জমিদারীর মধ্যে আমাকে থাকিবার স্থান দান কর, আমি বৎসরে বৎসরে তাহার খাজানা দিব, আর কোন নদীতীরে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দাও, তথায় প্রতি-রাত্রে পূজা করিব, ইহা ভিন্ন আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই।” সুরেন্দ্রনাথ রুদ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিলেন এবং সেই অবধি মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা তথায় থাকিতেন।

যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ছদ্মবেশ, তখনই তিনি ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশেই তিনি দেশে দেশে অহুসন্ধান করিয়া মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ছদ্মবেশেই তাঁহার সহিত সেই নিমন্ত্রণ আশ্রমে সরলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইচ্ছামতীতীরে তিনি কতবার বালিকাকে খেলা দিয়াছেন, কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন, কতবার তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এইরূপে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর-সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অল্প কোম

প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অজ্ঞকার এই পূর্ণিমা-রজনীর পূর্বে কেহই জানিতে পারে নাই ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মহাশ্বেতা পূজা সমাধা করিয়া গৃহে আসিলেন । ইন্দ্রনাথ তাহার নিকট বিদায় লইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন । ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “আপনি যে দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সতীশচন্দ্রের নিধনসাধন না করিলে বোধ হয়, আপনার কন্ডার পাণিগ্রহণ করিতে পাইব না ?”

মহাশ্বেতা । পাইবে না ।

ইন্দ্রনাথ । আলীকাদ করুন, আমি

অগ্নই সেই অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেছি ।

আলীকাদ করুন, অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে ।

মহাশ্বেতা । আলীকাদ করিতেছি, দেব-দেব মহেশ্বর তোমার যত্ন সফল করুন । কিন্তু তুমি বালক, সেই চতুর বুদ্ধিকুশল দেওয়ানকে কিরূপে পরাস্ত করিবে, আমার বুদ্ধির অগোচর ।

ইন্দ্রনাথ । অধুনা আমারও বুদ্ধির অগোচর, দেখা যাউক কি হয় ।

মহাশ্বেতা । অবশ্যই তোমার জয় হইবে ।

ধর্মের যদি জয় না হয়, তবে এ সংসার ছারখার হইবে, কেহ আর ভগবানের আরাধনা করিবে না ।

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ধর্মের যদি সর্বদা জয় হইত, তবে আপনার স্বামী নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, সতীশচন্দ্রও বঙ্গদেশের দেওয়ান হইতেন না, মানবজাতি কখন ধর্মপথ পরিত্যাগ করিত না । যখন চারিদিকে পাণের গোরব দেখিতেছি, যখন অত্যাচারী ও কপটাচারিগণ ধন, মান, ঐশ্বর্য লাভ করিতেছে, যখন পরমধার্মিক,

পবিত্রচেতা, পরোপকারিগণ নিপীড়িত ও পদদলিত হইতেছে, তখন আর সংসার ছারখার হইবার বাকি কি ? যদি সদাই ধর্মের জয় থাকিত, তাহা হইলে পাতক ও কপটাচারণ এ সংসার হইতে একেবারে দূরীভূত হইত । তথাপি কেন যে অধর্মের জয় হয়, কে বলিবে? ভগবানের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে ?”

পরে মহাশ্বেতা বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর কথা ইন্দ্রনাথকে বলিলেন । ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এই পাগলিনী মাহুঘী, কি যোগিনী, কি প্রেতকন্ডা, বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার কথা কখন মিথ্যা হয় নাই ।”

মহাশ্বেতা । মিথ্যা কখনও হয় নাই ।

আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছিল । আমি স্বামীকে সবিশেষ অবগত করাইয়া সপরিবারে পলাইবার উপদেশ দিলাম । সেই বীরপুরুষ যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে অজ্ঞাপি জাগরিত রহিয়াছে । বলিলেন, “যে সংগ্রামস্থলে হিন্দু কি মুসলমান, মোগল কি পাঠান, কেহ কখন সমরসিংহ পলায়ন করিতে দেখে নাই ; আচ্ছা পায়ের সতীশচন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিব ? মরিতে হয় মরিব, যোদ্ধার তাহাতে ভয় কি ?”

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “সেইবার ভিন্ন আরও দুই তিনবার ঐ পাগলিনী যে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সত্য হইয়াছে । আমার পরামর্শে আপনাদিগের এই গ্রাম হইতে পলায়ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ।”

মহাশ্বেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন । উক্ত পাগলিনী দুই তিনবার এই প্রকার সহসা দেখা দিয়া যে যে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিল, কখনও মিথ্যা হয় নাই । তিনি অন্তরে নিশ্চয় জানিলেন যে, সেই পায়ের

সতীশচন্দ্র আবার সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবার অনিষ্টচেষ্টা করিতেছে, পাগলিনী মামুষী হউক বা প্রেত-কত্তা হউক, জানিতে পারিয়া সতর্ক করিবার জন্ত আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“অতাই পলায়ন করা শ্রেয়ঃ, উপায়ান্তর নাই।”

ইচ্ছনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাইবেন? আমার আলয়ে কি আপনাকে আশ্রয় করিতে পারি?”

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, “মহেশ্বর-মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখরের নিকট পুনর্বাস যাইব।” ইচ্ছনাথ কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরি-তাগ করিবার উদ্যোগে গমন করিলেন।

মহাশ্বেতা সরলাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া সবিশেষ বলিলেন। সরলার বালিকামুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রুদ্রপুর গ্রামে ছয় বৎসর কাল থাকিয়া সকল দ্রব্যে মায়া হইয়াছিল। সেই পরিপাটি কুটীর, সেই উদ্যান, সেই স্বহস্ত-রোপিত পুষ্পচারা, সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া আর রুদ্রপুরের পক্ষীদিগের সুললিত গান শুনিতে পাইবে না, দুই প্রহরে সেই আশ্রয়ক্ষের নিশ্চর, শিথিল ছায়াতে উপবেশন করিয়া আর কার্য করা হইবে না, সন্ধ্যায় অমলার সেই স্নমধুর হাস্যবিকসিত মুখ আর দেখিতে পাইবে না। অমলার কথা শ্রবণ হওয়াতে চক্ষুতে জল আসিল;—বলিল, “মা, আমি সইয়ের নিকট বিদায় হইয়া আসি।” মহাশ্বেতা বলিলেন, “যাও মা, কিন্তু শীঘ্র আসিও।”

সরলা বিদায় লইতে চলিল। অমলার গৃহের নিকট যাইয়া ডাকিল, “সই!” প্রফুল্ল-বদন অমলা গৃহের বাহিরে আসিল। কি ভাষা করা হবে বলিয়া তাহার

অধরোষ্ঠে হাসি দেখা দিতেছে; কিন্তু সর-লার মুখপানে চাহিয়া অমলার প্রফুল্লমুখ গম্ভীর হইল; অধরে হাসি শুকাইয়া গেল, দেখিল, সরলার নয়নযুগল জলে ছল্-ছল্ করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষঃস্থলে জল পড়িতেছে। অমলা নিকটে আসিয়া স্নেহ-ভরে হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি সই, কি হইয়াছে?”

সরলা উত্তর করিল, “মা বলিয়াছেন, আমরা এই গ্রাম হইতে অতাই চলিয়া যাইব, তোমার সঙ্গে বোধ হয়, এই শেষ দেখা।” এই বলিয়া সরলা অমলার বক্ষঃস্থলে আপন মূখ লুকাইয়া দরবিগলিত-ধারায় রোদন করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সহসা এই কথা শুনিয়া অমলার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হইল! প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু সরলার অবস্থা দেখিয়া সন্দেহেরও স্থল থাকিল না। তখন অমলা অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিল না, চক্ষুজলে সরলার কেশ সিক্ত করিল।

অনেকক্ষণ পর কষ্টে চিন্তা-সংযম করিয়া অমলা বলিতে লাগিল, “সে কি সই? আমার সঙ্গে আবার শেষ দেখা? তুমি যেখানে থাকিবে, আমি সেইখানে যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিব, এক্ষণে এ গ্রাম হইতে তোমরা কেন যাইবে, বল দেখি?”

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, “তাহা আমি জানি না; মা তাহা বলেন নাই; কিন্তু আমরা ইচ্ছামতী-তীরে মহেশ্বর-মন্দিরে যাইতেছি।”

অমলা বলিল, “তা মহেশ্বর-মন্দির আর রুদ্রপুর ত এপাড়া ওপাড়া, প্রত্যহ যাইয়া তোমার দেখিয়া আসিব। তার জন্ত আবার ভাবনা কিসের?”

কণেক পরে অমলা বলিল, “দাঁড়াও সই,

যে পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশদ্বর্ষ হইবে না ; কিন্তু আকার দেখিলে সহসা ষাট বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয় । মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুক্ল ; ললাট চিন্তারোগে অক্ষিত ; শরীরের চর্ম শিথিল, সর্স অঙ্গ ক্ষীণ, তথাপি চক্ষুঃ জ্যোতির্ময় ও মুখমণ্ডলে চিন্তাদেবী সততই অধিষ্ঠান করিতেছেন । ধীর আচরণ, ধীর গমনাগমন, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসঞ্চালন । নানারূপ বহুদূরদর্শিনী বহুদূরব্যাপিনী কল্পনাতে তাঁহার জীবন ও অন্তঃকরণ চিরকালই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে । কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে চিন্তাময় দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে ঈষৎ হাস্য সহকারে ডাকিলেন, “বিমলা !”

বিমলাও পিতাকে দেখিয়া আপন গভীর ভাবনা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইলেন । বদনমণ্ডলে গভীরভাব ক্রমে অপনীত হইয়া পবিত্র পিতৃস্নেহের আবির্ভাব হইল । পিতা কক্ষে আসিয়াছেন, অনবধানতা বশতঃ এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, মনে করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন । সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিমলা, এত কি ভ্রংশ হইয়াছে যে, মৌনভাবে বসিয়া রহিয়াছ ?”

বিমলা উত্তর করিলেন, “আপনি কল্যাণ ভ্রংশ ত্যাগ করিবেন, কত দিন আপনাকে দেখিতে পাইব না, কত দিন এই প্রকাণ্ড ভ্রংশ শূন্য থাকিবে, এই চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছে, আমি আপন মন শান্ত করিতে পারিতেছি না ।”

পিতা উত্তর করিলেন, “সে কি বিমলা, কেন মিথ্যা ভাবনা করিতেছ ? আমি লীজাই ফিরিয়া আসিব, আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারি ?”

বিমলা । পিতা, আপনি যে আমাকে

অতিশয় স্নেহ করেন, তাহা জানি । পিতা কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারেন না ।

সতীশ । তবে চিন্তা করিতেছ কেন ? আমি ত প্রতি বৎসর একবার রাজধানী যাইয়া থাকি, এবার তোমার বিশেষ চিন্তা কেন ?

বিমলা । প্রতি বৎসর আমার এ প্রকার ভাবনা হয় না ; এবার সহসা হৃদয়ে ভয় হইয়াছে কেন, জানি না । পিতা, আপনি গৃহে থাকুন, কোথাও যাইবেন না ।

শেষ কথাগুলি অতি অর্দ্ধফুট মুহূর্ত্তের উচ্চারিত হইল, শুনিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয়ে যেন আহত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইল । ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, “বিমলা ! কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ ? আমাকে যাইতেই হইবে ; যাইবার সময় রোদন করিও না ।”

বিমলা উত্তর করিলেন, “পিতা, মিথ্যা ভয় নহে, কল্যাণ রঞ্জনীযোগে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বোধ হইল যেন স্বর্গীয় মাতা দেখা দিলেন, প্রলোচনে যেন অতি মুহূর্ত্তের বলিলেন, ‘মা, সাবধান ! ঘোর বিপদ সমাগত ।’ এখনও বোধ হইতেছে, তাঁহার শুক্ল মুখখানি—তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচন দুইটি দেখিতে পাইতেছি । কি পাণ করিয়াছি, বলিতে পারি না, কি পাপে স্নেহময়ী মাতাকে হারাইলাম, জানি না ; আবার কি ঘোর বিপদ সমাগত, ভগবান্‌ই জানেন । পিতা, ক্ষমা করুন । আমার ভাবনা হইতেছে, আপনি প্রস্থান করিলে আর এ আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন না ।”

এই বলিয়া বিমলা বাম্পাকুলিতলোচনে পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন

বদনমণ্ডল লুকাইলেন। বিমলার যদি স্থির-
ভাবে থাকিত, দেখিতে পাইতেন যে, পিতা-
রও মুখমণ্ডল সহসা বিকৃতভাবে ধারণ করিয়া-
ছিল। স্বপ্নকথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র শিহ-
রিয়া উঠিলেন, যেন ভয়াবহ কোন পূর্ব-
কথা হৃদয়ে সহসা জাগরিত হইল, যেন কোন
গুট পাপের প্রারম্ভিত সেইক্ষেণেই আরম্ভ
হইল। যখন বিমলা পিতার হৃদয়ে মুখ
রাখিয়া বোধন করিতেছিলেন, পিতার
সাহসনা করিবার আর ক্ষমতা রহিল না।
কিঞ্চিৎ পরেই সতীশচন্দ্র আপন চিত্ত-সংযম
করিয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন,
“বিমলা, এ সকল তোমার মিথ্যা ভয়।
দিশাযোগে তুমি কেবল মিথ্যা চিন্তা কর,
তাঁহাতেই রজনীযোগে সেই প্রকার ভয়ের
স্বপ্ন দেখ। আমি দেখিয়াছি, গত কয়েক
দিন অবধি তুমি কেবলই চিন্তামগ্ন রহিয়াছ,
আমাকে যথার্থ করিয়া বল, সে মহাচিন্তার
কারণ কি?”

বিমলা ধীরভাবে উত্তর করিলেন,
“পিতা, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,
আমি অবশ্যই তাহার উত্তর করিব; আপ-
নার নিকট লুকাইবার আমার কোন কথাই
নাই। আপনিই সে মহাচিন্তার কারণ।
সন্ধ্যায় একমাস হইতে আপনাকে কোন
গভীর চুঃখে বা চিন্তায় মগ্ন দেখিতেছি, দিন
দিন সেই চিন্তা গাঢ়তর হইতেছে। আপ-
নার আহারের সময় খাণ্ডস্রব্যে মন থাকে
না, রজনীকালে আপনার নিদ্রা হয় না,
যদি নিদ্রা হয়, সে ক্লেশপূর্ণ-পরিপূর্ণ। আমি
কতবার দিব্যাযোগে লুকাইয়া আপনার
কক্ষে গিয়াছি; যতবার যাই, দেখি, আপনি
সেই চিন্তায় মগ্ন। নিশিযোগে আমি কত-
বার আপনার শয়নগৃহে গিয়াছি, যখনই
গাই, দেখি, কোন ক্লেশে আপনার ললাট

কুঞ্চিত ও বদন বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। কি
বোর চিন্তা! আপনাকে এ প্রকার যাতনা
দিতেছে? সামান্য জমীদার, সামান্য কৃষকও
দৈনিক পরিশ্রমের পর রজনীতে বিশ্রামলাভ
করে, বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহা-
শয়ের কি সে বিশ্রামে অধিকার নাই?”

বিমলা কণেক নিস্তব্ধ হইলেন, দেখি-
লেন, পিতা স্থিরভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ
করিতেছেন। পুনরায় বলিতে লাগিলেন,
“গত একমাস অবধি আপনার নিকট এত
চর আসিতেছে কেন? চর এত গুপ্তভাবে
আসিয়া গুপ্তভাবে চলিয়া যায় কেন? দিবা-
রাত্রি আপনিই বা কোন গুপ্ত পরামর্শে ব্যস্ত
আছেন? বঙ্গদেশের দেওয়ানের কার্যের
ভার অতি গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের
স্বশাসন ও প্রজার মঙ্গল যে কার্যের উদ্দেশ্য,
সে কার্য ও সে পরামর্শ কি রজনী দ্বিপ্ৰ-
হরের সময় গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া কতক-
গুলি নিতৃত চরের সহিত সিদ্ধ হয়? বালি-
কার এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে।
যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, পিতা,
মার্জনা করুন। কিন্তু আপনি বন্ধিমান ও
বিচক্ষণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, খলস্রাব
সর্পেরই গতি বক্র; উদারচিত্ত মনুষ্যের গতি
সরল। যাহার চরিত্র সরল, যাহার উদ্দেশ্য
সরল, তাহার গতি বক্র হইবে কেন? পিতা,
বালিকার কথায় অবধান করুন। কপট
লোকের পরামর্শ ভাণ্ড করুন, ধর্মের পথ—
সরল পথ—অবলম্বন করুন, তাহা হইলে
কাহাকেও ভয় থাকিবে না, কোন চিন্তা
থাকিবে না। পাপপথে সর্বদাই ভয়, ধর্ম-
পথ নিরাপদ ও নিষ্কটক।”

বলিতে বলিতে বিমলার উদার ললাট ও
বদনমণ্ডল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল,
তাঁহার উজ্জ্বল নয়নমণ্ডল হইতে উজ্জ্বলতর

করিব, যদি ক্ষমা না পাই, আমার অকিঞ্চিৎ-
কর শোণিত দিয়া সমরসিংহের রক্তপ্রবাহ
বর্ধন করিব।”

পরক্ষণেই শকুনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করি-
লেন,—বলিলেন, “এ কি? অন্ধকারে
একাকী বসিয়া আছেন কেন?”

সতীশচন্দ্র অতিশয় গভীরস্বরে উত্তর
করিলেন, “আলোক সহ্য করিতে পারি না,
হৃদয়ে হৃভেদা অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে।
আমার জীবনালোকও শীঘ্র অনন্ত অন্ধকারে
লীন হইবে, আমার লীলাখেলা সাদ্যপ্রায়।”

শকুনি এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন
না, ভৃত্যকে আলোক আনিতে ইঙ্গিত করি-
লেন। ভৃত্য শীঘ্র আলোক আনিয়া পুনরায়
কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন,
“শকুনি! তোমার পরামর্শে আমি এতদূর
কাঁচা করিয়াছি, তাহাতে কি ফল হইল?
আমার পক্ষকাল অনেক দিনই গিয়াছে,
এক্ষণে ইহকালেই সর্বনাশ উপস্থিত!
এই পাপরাশিতে, এই বিপদরাশিতে তুমি
আমাকে নিগ্ধ করিয়াছ, এক্ষণে আর কি
করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অজ
কোন উন্নতিশালী লোকের সর্বনাশ কল্পনা
কর, আমিও ঘোর পাপের যদি কোন
প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাতে প্রবৃত্ত হই।”

শকুনি প্রভুর গভীরস্বরে শুনিয়া চমকিত
লেন, বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে সামান্য
য ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় নাই; দুই
কতব অশ্রুবিম্ব দেখাইয়া শকুনি উত্তর
করিলেন, “প্রভুর গৌরবকালে তাঁহারই স্নেহ-
ময়া ভিন্ন আমার অভিলাষ ছিল না,
ই সর্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রভুর
পক্ষ হওয়া ভিন্ন আমার দ্বিতীয়
।”

সতীশ। শকুনি! তোমার কথা অতি
মিষ্ট, বিধাতা কেন এমন বিবপাত্ত ক্ষীরদ্বারা
আবৃত করিয়াছেন?

শকুনি। আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা না
হইলে প্রভুভক্তির এত ফল ফলিবে কেন?

এই বলিয়া শকুনি আর দুই চারিটি
অশ্রুবিম্ব বাহির করিলেন। সতীশচন্দ্র
দেখিয়া কিছু মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি
আমার উন্নতিচেষ্টা কর, তাহা আমি
জানি, কিন্তু পাপপথে সর্বদাই বিপদ।
শকুনি! সে পথ ভিন্ন কি আর উন্নতির পথ
ছিল না?”

শকুনি দেখিলেন, তাহার অশ্রুবিম্ব
নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, কাতরস্বরে বলিতে
লাগিলেন, “প্রভুভক্তি যদি পাপ হয়, তবে
আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা ভিন্ন পাপ কি,
আমি জানি না।”

সতীশ। জান না? বঙ্গচড়ামণি রাজা সমর-
সিংহকে বিনাশ করিবার পরামর্শ কে দেয়?

শকুনি। রাজাজ্ঞার তাহার দণ্ড হইয়াছে।

সতীশ। ভাল, তাঁহার জমিদারী এক্ষণে
কে পাইয়াছে?

শকুনি। স্ববাদের স্বেচ্ছায়: যাহাকে যে
দ্রব্য দান করেন, তাহা সর্বদাই শিরোধার্য।

সতীশ। শকুনি! আর আমাকে তুলাই-
বার চেষ্টা করিও না। অজ আমার জ্ঞানচক্ষু
উন্মীলিত হইয়াছে ও তদ্বারা স্বীয় হৃদয়ে এত
অন্ধকার, এত পাপ দেখিতেছি যে, সে দৃশ্য
আর সহ্য করিতে পারি না। অজ বালিকার
নিকট উপদেশ গ্রাপ্ত হইয়াছি।

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র বিমলার সহিত
কথোপকথন সমাপ্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন। শকুনি
উত্তর করিলেন, “বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ
দেওয়ানের কি বালিকার কথার ভাত হওয়া
যুক্তিসিদ্ধ?”

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, “বালিকা যদি সত্যকথা কহে, তবে সে কথা বালিকা-মুখনিঃসৃত বলিয়া পরিহার্য্য নহে। পাপপথে সৰ্কদাই বিপদ, তাহা আমি এত দিনে জানিলাম।”

শকুনি। যদি আজ্ঞা করেন, তবে বলি, আপনার বিপদ আমি দেখিতে পাইতেছি না।

সতীশ। আজি ছয় বৎসর হইল, তখন রাজা টোডরমল্ল প্রথমবার বঙ্গ ও বিহারদেশ জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন, তাহার অনতিবিলম্বে পুণ্যাত্মা সমরসিংহ আমা কর্তৃক নিহত হন। সে কার্য্যে তুমিই পরামর্শ দিয়াছিলে।

শকুনি। দিল্লীধরের অধীনস্থ বঙ্গ ও বিহারদেশের সেনাপতি সনাইম খাঁর আজ্ঞায় সমরসিংহের দণ্ড হয়।

সতীশ। সত্য, কিন্তু সে আমাদেরই পাপ যজ্ঞবদে। তাহার ছয় বৎসর পরে রাজা টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন সমরসিংহের মৃত্যুর বিষয়ে কি মিথ্যা কহিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, বোধ হয়, বিস্মৃত হও নাই।

শকুনি। তাহার পর?

সতীশ। তাহার পর টোডরমল্ল পুনরায় সেনাপতি ও সুবাদার হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছেন, আর নিস্তার নাই।

শকুনি। যে কৌশলে এত দিন কথা গুপ্ত ছিল, সে কৌশল এক্ষণে বার্ষ হইবে কেন?

সতীশ। দূরদর্শী টোডরমল্ল আমাদের কৌশলে পরাস্ত হইবেন না। তুমি রাজা টোডরমল্লকে জান না।

শকুনি। কিন্তু এই দূরদর্শী রাজাই একবার এই কৌশলে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

সতীশ। সত্য, কিন্তু সেবার ছয় এক মাসের

জন্ত আসিয়াছিলেন, এবার সুবাদার হইয়া আসিয়াছেন, অনেক দিন বাস করিবেন। শকুনি! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তান একবার আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষম করিলেও করিতে পারেন। তাহার পর আমি পাপ সংসারে থাকিব না, বোগী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব।

শকুনি। তাহা হইলে আপনাকে ইচ্ছা পূরক সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রিয়স্বহৃদ সমরসিংহের হত্যাকারক-সম্বন্ধে রাজা টোডরমল্ল কি আদেশ দিবেন, আপনি তাহা বুঝিতে পারেন না?

এই বান্দবাক্যে সতীশচন্দ্র মনোমগ্নক বেদনা পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শকুনির কথাই সত্য। গুপ্তকথা অপ্ৰকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রকাশ হইলে প্রাণরক্ষার কিছুই অসম্ভব নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “শকুনি! তুমি আমা অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি মৃত্যুমান্ পাপ হও, তথাপি তোমার পরামর্শ অবলম্বন ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়।”

শকুনি। আপনার সহিত তর্ক করা আমার সম্ভবে না; কিন্তু কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, বঙ্গদেশের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে? প্রভো! আমার কথা অবধান করুন, যে কথা ছয় বৎসর গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হইবে না। আমি আপনার নিকট পূণ করিতেছি, যদি এ কথা গুপ্ত না রাখিতে পারি, তবে আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

আশার প্রভাব অতি চমৎকার! যে আশা মনুষ্যকে কত সুখ ও সাধনা প্রদান

করে, সেই আশাই আবার কত দুঃখের কারণ হয়। মানবহৃদয়ও অতি চমৎকার! আশার কুহকে কতই খেলা করে। বিপদের সময়, পীড়ার সময়, দুঃখের সময়, হৃদয়ে ধর্মভয় প্রবল হয়; বিপদের শাস্তি হইলে, পীড়ার আরোগ্য হইলে, দুঃখের অবসান হইলে, ধর্মভয় ক্রমে দূর হয়। ইতিপূর্বে সতীশচন্দ্র বিপদাশঙ্কা করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্মভয় মনে জাগরিত হইয়াছিল, ক্রমে কুহকিনী আশা কানে কানে বলিতে লাগিল, “ভয় কি? বিপদ কোথায়? মিথ্যা ভাবনা কেন?” সতীশচন্দ্রও সেই কুহকে যুগ্ম হইলেন, ভারিলেন, “বিপদ না আসিলেও না আসিতে পারে।” ভাবিতে ভাবিতে বিপদীয় অস্তিত্ব হইল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভয়ও চলিয়া গেল। মানবহৃদয়ে বিপদভয় যত প্রবল, ধর্মভয় যদি সেইরূপ প্রবল হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এতাদৃশ দুঃখ থাকিত?

অনেক চিন্তা করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, “শকুনি! তোমার উপরই আমি নিভর করিব। আশু বিপদের কি কোন সম্ভাবনা আছে?”

শকুনি সময় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, “আশু কি বিলম্বেও শুণ্ডকথা-প্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই। আর যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তদাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষে কি বিপদের সময় কাতরতা যুক্তিসিদ্ধ? বঙ্গদেশে আপনার যশ কে না প্রশংসা করে? ব্রাহ্মণকুলে আপনার মত পবিত্র কুল কাহার? আপনার ক্ষমতার মত ক্ষমতা কাহার? আপনার গৌরবের মত গৌরব কাহার? আপনার অধিকারের মত অধিকার কাহার? বালিকার বাক্য অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত সহসা ত্যাগ করা

কি বঙ্গদেশের রাজাবিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের পক্ষে উচিত কর্ম? আপনাকে পরামর্শ দিব, আমার কি সাধ্য, আপনিই বিবেচনা করুন, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, একরূপ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।”

সতীশচন্দ্র ও কথার কোন উত্তর করিলেন না; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “যথার্থই কি আমি ব্যতুল হইয়াছিলাম, বালিকার কথায় ভীত হইয়াছিলাম!” শকুনি তাহার মুখ দেখিয়া আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, “কদ্রপুরে যে চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শুনিয়াছেন কি?”

সতীশ। না, সেই এক বিষয়ে এখনও ভাবনা আছে। শুনিয়াছি, সমরসিংহের বিধবা ভগ্নানক স্ত্রীলোক, টোডরমল্ল দেশে আসিলে হয়ত সেই একটা কাণ্ড কবিতা বসিবে।

শকুনি। সে ভয় করিবেন না। টোডরমল্ল আদিবার অগ্রেই সমরসিংহের বংশের সকলেরই মূখ বন্ধ হইবে।

সতীশ। তবে কি আমরা যে চর কদ্রপুরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিয় আনিতে পারিয়াছে?

শকুনি। না, এখনও পারে নাই, কিন্তু সে কাণ্ড শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।

সতীশ। পারে নাই কেন?

শকুনি। শুনিলাম, তাহারা দুই এক দিন পূর্বেই সমাচার পাঠাইয়াছিল। সেই পাগলিনী সমাচার দিয়াছিল।

সতীশ। পিশাচী আমার সকল কর্মেই বাধা দেয়। তাহাকে ধরিয় আনাইতে পার না?

শকুনি। চেষ্টার ক্রটি নাই, কিন্তু তাহার

কিছুমাত্র সন্ধান পাই নাই। বোধ হয়, তাহার যথার্থই পৈশাচিক বল আছে, তাহা না হইলে আমাদের সকল গুপ্ত অনুসন্ধান জানিতে পারে কিরূপে? না হইলে একশত চরেও তাহার অনুসন্ধান পাঠিতেছে না কেন?

সতীশ। তবে এক্ষণে উপায় কি?

শকুনি। চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই সকলের মুখ বন্ধ হইবে। আর অধিক ব্যস্তি নাই, আপনি বিশ্রাম করুন। শকুনি শরীর মরণ হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

এই বলিয়া শকুনি আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। রাইবার সময় দুই একবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাতিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, তোমারও নিস্তার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

—*—

ধূর্তে ধূর্তে ।

CURSE on his perjured arts !

dissembling smooth ?

Are honor, pity, conscience, all exiled ?

Is there on pity, no relenting truth ?

Burns.

পরদিন প্রাতে দেওয়ানজী মহাসমারোহে মুন্সের যাত্রা করিলেন। কল্লার নিকট বিদায় লইবার সময় বিমলা বলিলেন, “পিতঃ! আপনি চলিলেন, অশ্রুমতি করুন, আমি প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দিরে গাইয়া আপন-নার মঙ্গলার্থ পূজা দিব। তথায় আমাকে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে।” পিতা সম্মত হইলেন ও অনেক স্নেহগর্ভ বচনে কল্লার নিকট বিদায় লইলেন। কল্লার চক্ষু-জলে বসন্ত সিক্ত হইল, পিতা চলিয়া যাইবার

সময়, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিমলা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “এই বিপুল সংসারে আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর কেহই নাই, আপনি না থাকিলে সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। ভগবান! আপনাকে নিরাপদে রাখুন, ধর্মপথে আপন-নার যতি হউক। আপনার নৈসর্গিক চরিত্র উদার ও অকপট, কক্ষণে শকুনির সহিত মিলন হইরাছিল।”

শকুনির সহিত বিদায় লইবার সময় শকুনি বলিলেন, “আপনি অগস্ত্য হউন, আমিও সমরসিংহের বিধবাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া ও অজ্ঞাত কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার নিকট যাইতেছি।”

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, “যাহা উচিত হয় কর, আমি তোমারই তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর নির্ভর করি।” সতীশচন্দ্র যখন বহির্গত হইলেন, শকুনি মনে মনে বলিতে লাগিল, “বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কি না, হাতে হাতেই টের পাইবে, বড় বিলম্ব নাই।”

শকুনির সহিত সতীশচন্দ্রের আজ আট বৎসর পরিচয়। যখন প্রথমে পরিচয় হইয়াছিল, তখন শকুনির বয়স্ক্রম বিংশতি বৎসর, সতীশচন্দ্রের বয়স্ক্রম চারিংশৎ বৎসর। শকুনি দেখিতে সুশী ছিল ও অল্পবয়সে অনাথ ব্রাহ্মণপুত্র বাল্যে সতীশচন্দ্রের দ্বারে শরণাপন্ন হইয়াছিল। সতীশচন্দ্রও শকুনির নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন—সেই দিন অবধি হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিয়া ছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শকুনি শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের হৃদয় বুঝিল; সতীশচন্দ্রের হৃদয়মনীর উজ্জাভিলাষ লক্ষ্য করিল; সেই ভীষণ অগ্নিতে দিন দিন আভিতি দিতে লাগিল; আভিতি পাইয়া অপ্রাণিতা দিনে দিনে গগনস্পর্শী হইতে

চলিল। এই ঘোর ঝগড়া হইয়া সতীশ-
চন্দ্র দিবিদিকজ্ঞান লাগাইলেন, ধর্ম্মার্থ-
জ্ঞান হারাইলেন, একেবারে অন্ধপ্রায়
হইলেন।

শকুনি সুযোগ পাইল। অন্ধকে কুটিল
পথে লইয়া যাওয়া চুরুর নহে, সংপরামর্শ
হইতে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল,
প্রভুকে সংপথ হইতে কুপথে লইয়া চলিল।
অবশেষে এমন ঘোর পক্ষে নিমগ্ন করিল যে,
তথা হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্তন করা
মহাবীর সাধ্য নহে। তখন সতীশচন্দ্রের
চক্ষু উন্নীলিত হইল, ক্রমে ক্রমে ভ্রম
দেখিতে পাইলেন : কিন্তু তখন পশ্চাত্তাপ
ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শকুনির মনকামনা
সিদ্ধ হইল, প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত
করিল।

শকুনিকে আশ্রয় দিবার অনতিবিলম্বেই
সতীশচন্দ্র • তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া-
ছিলেন। শকুনির বিনীতভাবে সম্বোধন হইয়া-
ছিলেন, তাহার পরামর্শে চমকিত ও প্রীত
হইয়াছিলেন। দিন দিন তাহাকে অধিকতর
স্নেহ করিতেন, আপনাদি পুত্রের মত
ভালবাসিতেন। কখন তাহাকে পোষা-
পুত্র করিবার কামনা করিতেন, কখন
বা তাহাকে আপন দুহিতার সহিত
বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু
নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত কস্তার
বিবাহ দিলে মানহানি হইবে, এই
ভয়ে শকুনিকে গৃহ-জামাতা করিতে
পারেন নাই। ক্রমে কস্তার বয়ঃক্রম অধিক
হইতে লাগিল, কিন্তু কুলীন-কস্তার বয়ঃক্রম
অধিক হইলে কতি কি ? বিশেষ সতীশচন্দ্রের
স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার কস্তার প্রতি স্নেহ বিগুণ
হইয়াছিল, কস্তার বিবাহ দিলে গৃহ শূন্য
হইবে, এই ভয় বিবাহের বিলম্ব হইতে

লাগিল, এই ভয় শকুনিকে জামাতা করিয়া
গৃহে রাখিবার সঙ্কল্প হইতে লাগিল।

পরে যখন পানপান পতিত হইয়া
সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্নীলিত হইল, তখন এই
সঙ্কল্প আবার দূর হইল। পাপ একরূপ স্থগার
পদার্থ যে, একজন পাপী অন্য জনকে ভাল-
বাসিতে পারে না। সতীশচন্দ্র শকুনিকে
আর ভালবাসিতে পারিলেন না। উন্নত-
চরিত্রা ধর্ম্মপরায়ণা দুহিতাকে কুটিলমতাব
কপটচরিত্রী শকুনির হস্তে অর্পণ করিবেন,
এ ভাবনা সতীশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন
না, মনে মনে ভাবিলেন, “আমি পাপিষ্ঠ
বটে, কিন্তু পাপেরও সীমা আছে। ধর্ম্মপরা-
য়ণ সময়সিংহকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু
আমার স্নেহের পুত্রলি বিমলাকে নরকে
ফেলিতে পারিব না। আমার যাহা হইবার,
হইয়াছে, বিমলা ধর্ম্মপথে থাকুক। সতীশচন্দ্র
এইরূপ চিন্তা করিতেন, কিন্তু শকুনিকে কিছু
বলিতে পারিতেন না। শকুনি সুবাদারের
নিকট একটি কথা জানাইলে সতীশচন্দ্রের
শিরশ্চেদন হইবে, তাহা তিনি জানিতেন,
সুতরাং তিনি শকুনির একরূপ হস্তগত
হইলেন।

শকুনি যে ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহা বলা
বাচ্য। সতীশচন্দ্রও পাপিষ্ঠ, কিন্তু তাহার
পাপের সীমা ছিল, তাহার চরিত্রে দুই একটি
সদগুণও ছিল, তাহার হৃদয়ে দুই একটি
মহাত্ম্যও লক্ষিত হইত। পাপের প্রায়শ্চিত্ত-
স্বরূপ মধ্যে মধ্যে তাহার আত্মজানি উপস্থিত
হইত। শকুনির এ সমস্ত কিছুই ছিল না,
কেবল ঘোর স্বার্থপরতা ও ভূর্ভেদ্য কুটিলতা।

সতীশচন্দ্রের মত তাহার হৃদমনীয়া বেগ-
বতী মনোবৃত্তি একটিও ছিল না ; তাহার
হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিই শাস্ত ; সকল প্রব-
ৃত্তিই ঘোর স্বার্থপরতার অঙ্গচারণী। উর্বশাভ

যে রূপ বৃক্ষপত্রগুলি দেখিয়া বীরে বীরে জাল পাতিত করে, শকুনি সেইরূপ অস্ত্র লোকের মনোবৃত্তির বেগ বুঝিয়া অতি বীরে বীরে আপন স্বস্বজাল বিস্তার করিত । সে মন্ত্রণাজাল এমন সুন্দর, এমন দুর্লভ ও এমন দুর্ভেদ্য যে, কাহার সাধ্য তাহা ভেদ করে ? শকুমার মনোবৃত্তি দ্বারা জগৎ বন্ধ ও মানব-জাতি একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শকুনি সে সকল হস্তে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল । যশে অভি-রুচি ও উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি যে সকল দুর্দম মনোবৃত্তি অনেককে বিচালিত করে, তাহা হইতেও শকুনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল । সুতরাং আপন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণার দ্বারা আপন স্বার্থসাধনে কখনও নিফল হইত না ।

শকুনি সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিল যে, চরেরা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে—সেটি মিথ্যা কথা । শকুনির বেক্রপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মহাশেতাকে ধরা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য কার্য্য নহে ; সে কেবল সতীশ-চন্দ্রের সহিত শকুনিকে যুদ্ধের না যাইতে হয়—এই জন্ত । শকুনির বিত্তীয় মন্ত্রণাজাল ভেদ করি, আমাদের কি সাধ্য ? পাঠক মহাশয় ! চলুন, শকুনি যথায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে, তথায় যাইয়া দেখা যাউক, যদি কিছু জানা যায় ।

চতুর্বেষ্টিত দুর্গের প্রশস্ত কক্ষে শকুনি একাকী পাদচারণ করিতেছে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অবলোকন করিতেছে, দুর্গ-পদসঞ্চারিণী কল্লোলিনী যমুনার কল কল শব্দ শ্রবণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত দুর্গের শুদ্ধান্তঃপুরদিকে অবলোকন করি-তেছে । তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ, স্বার্থসাধন হইলে স্বার্থপর লোকের যেক্রপ আনন্দ ও উল্লাস হয়, সেইরূপ আনন্দের

লক্ষণ । মনে মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইতেছে,—

“এই সুবিত্তীর্ণ জমিদারী, এই প্রশস্ত দুর্গ, এই অন্তঃপুরবাসিনী সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী শীত্ৰই নব স্বামী গ্রহণ করিবে ; সমরসিংহের প্রজাগণ, সতীশচন্দ্রের প্রজাগণ শীত্ৰই শকুনির নাম উচ্চারণ করিবে ; কল্লোলিনী যমুনা শীত্ৰই শকুনির গৌরব-গীত গান করিবে । আর তুমি বিমলে ! তুমি আমাকে ঘৃণা কর-জানি, কিন্তু ঘৃণার দিন শেষ হইল ; তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতেই হইবে ; তথাপি যদি ঘৃণা কর, এই পতনের মত তোমাকে পদে দলিত করিব ; এই দলিত যুত পতনের দ্বার দূরে নিক্ষেপ করিব । প্রেমের জন্ত বিবাহ করিতেছি না, প্রেম বালক-বালিকার স্বপ্নমাত্র । তোমার রূপ-লাবণ্যের জন্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না ; আমার নিকট রূপলাবণ্যের আদর নাই ; যদি থাকিত, লক্ষপতির রূপলাবণ্যের অভাব কি ? তবে তোমার দলিত না করিব কেন ? সতীশচন্দ্র, সাবধান, আজি তোমাকে বম-মন্দিরে প্রেরণ করিলাম ; বেক্রপ চর নিযুক্ত করিয়াছি, গুপ্তকথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে । অধিকন্তু শকুনির দোষও তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে । তাহার পর ? তাহার পর নিঃসন্তান সতীশচন্দ্র গত হইলে তাহার জামাতা ভিন্ন আর কে উত্তরাধিকারী হইবে ? তীক্ষ্ণবুদ্ধির চিরকালই জয় হইয়া থাকে ।”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি দেখিল, অন্তঃপুরে গবাক্ষপার্শ্বে বিমলা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । পিতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পিতার গমনপথ-দিক্ অনিমেঘলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন । ক্রন্দন করাতে সেই উন্নত প্রশস্ত ললাটের

পর্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর বাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধন-গৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্নতাই স্থান পাইত না। রাজ-কুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্যন্ত বাইতেন, ভ্রম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্রে পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্মের সম্মুখে উচ্চ কে ? নীচ কে ? ধনীই বা কি ? দরিদ্রই বা কি ?

যদিচ চারিদিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তারিত, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে, সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত, তথায় যে কেবল উপাসকগণ আসিত, এমত নহে, নানা প্রকার লোকে নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত। বালক-বালিকার জন্ত নানা প্রকার ক্রীড়া-দ্রব্য, যুবক-যুবতাদিগের জন্ত নানা প্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্তই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রয় হইত। ক্রেতাগণ তথায় দিবানিশি বাস্তব রহিয়াছে।

যখন বিমলা আপন সঙ্গিনীদিগের সহিত মহেশ্বর-মন্দিরে পৌছিলেন, তখন রজনী আগত হইয়াছে। বিশ্রাম করিয়া আহালাদি করিতে করিতে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। বিমলার সঙ্গিগণ তাঁহাকে সে রাজ্যিতে পূজা করিতে নিবেদন করিল ; কিন্তু বিমলার হৃদয় চিন্তা-পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন, “আমাকে ক্ষমা করুন, আমি উপাসনা না করিয়া অশ্রয়ন করিব না, যদি করি, নিদ্রা হইবে না।” এই বলিয়া বিমলা একাকিনী ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া

গভীর নীল আকাশপটে ঘন চিত্রের স্তায় স্তম্ভ রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল খেত সৌধ-মালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের স্তায় শোভা পাইতেছে। সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, যে স্থানে সমস্ত দিন কলরব হইত—ছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ থতোপতোমালা নয়ন-রঞ্জন করিতেছে। শীতল শ্রুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে স্তম্ভুর গভীর রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অস্ত রব নাই ; কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে ; কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গভীর হাহারব শুনা যাইতেছে ; কেবল দূরস্থ গ্রামবাসিনীগের গীত গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণকূহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সে স্থানে এই গীত শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

এই নিস্তব্ধ শান্তপথে বাইতে বাইতে বিমলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল ; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইতে লাগিল, প্রকৃতির নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও শান্ত-ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবারতনে প্রাতঃকালে দুই একটি করিয়া লোক সমবেত হয় ; মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না, সায়াংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। রজনীতে সমস্ত নির্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত। বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমাদের জীবনেও এই-রূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, যৌবনে সেই প্রবৃত্তিসমূহের দুর্দান্ত প্রভাপ—যেন জগৎসংসারকে গ্রাস

করিবে; বার্ষিকোক্রমে নিম্নোক্ত হইয়া আইসে; দ্বিতীয় শত, ত্রিতম, অনন্ত সাগরে গীন হইয়া যায়—চারিবিদ্যুৎ রত অনন্ত সাগরে গীন হইয়া যায়। তবে এত ধুমধাম কেন?—এত গর্জ, এত গর্জ, এত কোশল, এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন? কে বলিবে কেন? বিধির নির্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ যুদ্ধভূমধ্যে ভয়সাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশ-দিকে ধাবমান হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু যুদ্ধভূমধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃ-কালের রবিকিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতি-বিস্তার কেন? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিমলা সহসা রক্তনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব শুনিতে পাইলেন। সেই ঘণ্টারব চতুর্দিকস্থ সৌধমালার প্রতিভাত হইয়া দশগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চার করিতে লাগিল; নিম্নোক্ত নৈশ গগনে আরোহণ করিয়া সঞ্চার করিতে লাগিল। ঘণ্টারব শেষ না হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্ত-স্বরে মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গীত হইতে লাগিল। কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ধোষবৎ সেই গীত কখন মন্দীভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল; উপাসক-দিগের মন জবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা সপ্তস্বরে সেই গানের সহিত যোগ দিলেন, তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্রাবিত হইতে লাগিল।

বিমলা যখন মন্দিরের ভিতর আসিয়া পৌছিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিল না, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বিমলা পূজার রত হইলেন।

প্রায় এক প্রহরকাল মুদিতমননে নিম্পন্দ-

ধীরে বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন; হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা উদয় হইতেছিল, বিমলার বদনমণ্ডলে তদনুরূপ পরিভ্রমিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু কেহ নাই, পিতাই একমাত্র ভক্তির আধার, পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহশ্রোত, অপরিদৌম ভক্তিশ্রোত সেই একমাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা, বিমলা পিতার জীবনেই জীবনধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হইল; হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্যন্ত ভক্তিরসে প্রাবিত হইল, অর্দ্ধপ্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

তখন বিমলা একেবারে মন্দির হইতে বহির্গত না হইয়া ঔৎসুক্যাকুললোচনে মন্দিরের চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন এ মন্দিরে আইসেন নাই, মন্দিরের সকল দ্রব্যই নূন্য বোধ হইতে লাগিল। বিমলা একরূপ সুনিশ্চিত, প্রশস্ত, চমৎকার অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। কখন কখন সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পালঙ্কৃত স্তম্ভসমূহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন কখন ভিত্তির উপর সুন্দর ভাস্কর্য্যাবলোচন করিতে লাগিলেন; কখন ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কখন দুহ এক জন দেবদাসকে মন্দির-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপাসক আর কেহই নাই, সুতরাং বিমলার এইরূপ ঔৎসুক্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

একপাৰ্বে একমাত্র উপাসক নিদ্রিত
রহিয়াছেন, সহসা বিমলার নয়ন সেই দিকে
পতিত হইল। তাঁহার অলৌকিক তেজঃ-
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হই-
লেন, নয়ন আর সে দিক্ হইতে অস্ত্র দিকে
কিরাইতে পারিলেন না। যুবকের ললাট
উদার ও প্রশস্ত, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কোন
গাঢ় চিন্তার কুঞ্চিত রহিয়াছে। নয়ন মুদিত,
বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও বীরদৰ্শ-প্রকাশক।
উপাসকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া
বিমলার বোধ হইল, যেন কোন বীরপুরুষ
বীরত্বে ব্রতী হইয়া দূরদেশ-যাত্রা করিতে-
ছেন, পথিমধ্যে এই দেবমন্দিরে উপাসনা
করিতে আসিয়াছেন; শ্রান্তিবশতঃ বা অস্ত্র
হান না থাকাতে উপাসনান্তে এই স্থানেই
নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিমলার অবলা-হৃদয়েও
বীরভাবের অভাব ছিল না; সুতরাং উপা-
সকের এই অলৌকিক বীর আকৃতি দেখিয়া
তাঁহার হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল; অনিমেষ-
লোচনে সেই বীরপুরুষের দিকে নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন।

উপাসকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি
গাত্ৰোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; চক্ষু
উন্মীলন করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে উজ্জ্বল-
নয়না তরুঙ্গী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চারি
চক্ষুর মিলন হইণামাত্র বিমলার সংজ্ঞা হইল,
অপরিচিত পুরুষের দিকে দেখিতেছিলেন,
জ্ঞান হইল, লজ্জার মুখ অবনত করিয়া ধীরে
ধীরে মন্দির হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

নিশা প্রভাতপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃ-
কালের প্রথম রশ্মি বিমলার নয়নোপরি
নিপতিত হইল। চারিদিকে দুই এক জন
করিয়া লোক বাহির হইতেছে। লোকের
সম্মুখে পদব্রজে বাওয়া বিমলার অভ্যাস
নাই, বিমলা কুণ্ঠিত হইয়া ক্ষতবেগে বাস-

স্থানাভিমুখে চলিলেন। প্রাণীকরণ কখন
লিঙ্গাসা করিবেন, বিমলা এতক্ষণ কি
করিতেছিলেন, তখন তিনি কি বলিবেন ?
এতক্ষণ কি তিনি উপাসনা করিতেছিলেন ?

বিমলার অন্তর্য্যাক্ত দ্বিষ্টা হইতে লাগিল।
এ বীরপুরুষ কে ? কি ব্রতে ব্রতী হইয়া
সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিতেছিলেন ? এমন
ভাগ্যবান বীরপুরুষের প্রার্থনীয় কি আছে ?
এইরূপ নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া বিমলা
শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

পরিচয় ।

AMID the jagged shadows
Of mossy leafless boughs.
Kneeling in the moonlight
To make her gentle vows

Her slender palms together preat,
And heaving sometimes on her breast ;
Her face resigned to bliss her bale,—
Her face O ! call it fair not pale.—
And both her eyes more blight than clear.
And each about to have a tear.

Coleridge.

সমস্ত রাত্রি-জাগরণের পর কিঞ্চিৎ
আরামলাভ কবিবার জন্ত বিমলা আপন
শয়নভবনে গমন করিলেন। দিনের বেলা
বড় অধিক নিদ্রা হইল না, বাহা হইল, তাহা
স্বপ্নে পরিপূর্ণ। সেই দেব-প্রাক্ষণ, সেই
চন্দ্রালোকে মহেশ্বরগীত, সেই দেবমন্দিরে
মহেশ্বরমূর্তি, তৎপার্শ্বে সেই উপাসক, বিমলা
এই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে বিমলা দেখিলেন, গৃহে স্থায়রশ্মি
পতিত হইয়াছে, প্রাক্ষণে লোকের লম্বাগম

হইয়াছে; কলরব শুনা যাইতেছে। নিশি-
জাগরণে বিমলার চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে;
তাহার স্বাভাবিক গৌর-বদন রক্তশূন্য হইয়া
আবিকতর গৌর হইয়াছে; কপোলে, গণ্ডে,
বক্ষঃস্থলে ঈষৎ দর্শ হইয়াছে। বিমলা আনু-
লায়িত কোশ কথঞ্চিং বন্ধ করিয়া গাত্রোখান
করিলেন।

সমস্ত দিন বিমলা অস্ত্রমনস্কার স্তার হইয়া
রহিলেন। পূৰ্ণ-রাত্রির কথা তাহার বার
বার মনে পড়িতে লাগিল। অনেক চিন্তা
করিয়া কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

সেদিন রজনী এক প্রহরের সময় বিমলা

উপাসনার্থ গমন করিলেন। সমস্ত দিন যদিও
তিনি অস্ত্রমনস্কা হইয়া ছিলেন, উপাসনার
সময় তাহার চিত্ত স্থিরভাব ধারণ করিল।
তিনি প্রণিপাত করিয়া উপাসনা শেষ
করিলেন।

উঠিবারাত্র তিনি পুনরায় সেই অপরি-
চিত উপাসককে দেখিতে পাইলেন। তিনিও
পূজা স্মাধা করিয়া গাত্রোখান করিয়াছেন।
বিমলার চিত্তসংঘর্ষের ক্ষমতা ছিল, তিনি
চিত্ত-সংঘর্ষ করিলেন। কর্ণকমাত্র সেই
উপাসকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিমলা
অবনতমুখে মন্দির হইতে বাহির হইবার
উদ্ভব করিলেন।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। দুই
দিনই সেই পরম স্নানরী রমণীকে দেখিতে
পাইলেন, দুই দিনই স্নানরী একদৃষ্টে তাহার
দিকে ক্ষণেকমাত্র চাহিয়াছিলেন। তাহার
রূদয়ে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, এই রমণীর
কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে; কিন্তু লজ্জায়
অপরিচিত পুরুষের সমন্বিত কথা কহিতে
পারিতেছেন না। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার
নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু অপরি-
চিতা তরুণী ভদ্রকস্তারসহিত কিরূপে বাক্যা-

লাপ করিবেন? দুই দিনের কথা ক্ষণেক
চিন্তা করিয়া অবশেষে ভাবিলেন, যদি আমি
না জিজ্ঞাসা করি, বোধ হয়, কোন বিশেষ
মুহু কথা অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে—বোধ হয়,
যে কারণে রমণী মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা
নিষ্ফল হইবে।

যুবক ধীরে ধীরে বিমলার নিকটে যাইয়া
বলিলেন, “ভদ্রে! অপরিচিত হইয়াও আপ-
নার সহিত কথা কহিতেছি, বৃষ্টতা মার্জনা
করিবেন; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে,
আপনার কিছু বক্তব্য আছে—যদি থাকে,
আজ্ঞা করুন।”

বিমলার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, তাহার
শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, বিমলা মুখ অবনত
করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক দেখিলেন, কোন উত্তর নাই, অথচ
রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্রে! আপনার যদি
কিছু বক্তব্য থাকে, বলুন, আমি শুনিতোছি,
এখানে আর কেহই নাই।”

বিমলার বিহ্বলতা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে।
তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপ-
নার নাম কি?”

যুবক উত্তর করিলেন, “নাম এক্ষণে
অজ্ঞাত থাকিবে, আমাকে অধুনা ইন্দ্রনাথ
বলিয়া জানিবে।”

বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপ-
নার মহেশ্বর-মন্দিরে উপাসনার কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে পারি?”

ইন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে বলিতেছি। কোন
অনাথা আশ্রয়হীন স্ত্রীলোকের সাহায্যে
কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

বিমলা। ধন দ্বারা কোন সাহায্য হইতে
পারে?

ইন্দ্রনাথ। না; কিন্তু আপনাকে অপরি-

চিত্তের উপকারার্থ তৎপর দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।

বিমলা। তবে কিরূপে সাহায্য হইবার সম্ভব ?

ইন্দ্রনাথ। বিচার। আমি মুন্দের-যাত্রা করিয়া বিচার-প্রার্থনা করিব। কিন্তু আপনি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?

বিমলা মুন্দের নাম শুনিয়া পিতার কথা শ্রবণ করিলেন, পিতার বিপদ শ্রবণ করিলেন, তখন লজ্জা একেবারে দূরীভূত হইল; সন্তল-নয়নে ইন্দ্রনাথকে বলিলেন, “আপনি বোধ হয় বীরপুরুষ, আপনার ক্ষমতা অপার, প্রতিজ্ঞা করুন, দাসীর একটি ভিক্ষা প্রতিপালন করিবেন।”

ইন্দ্রনাথ। রমণি! আমার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্ববান হইব; আজ্ঞা করুন।

বিমলা। মুন্দেরে আপনি বন্ধদেশের দেওয়ান সতীশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তিনি এক্ষণে বিপদজালে বেষ্টিত, প্রতিজ্ঞা করুন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

ইন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইল; ললাট কুঞ্চিত হইল। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন, “এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? বিপদের বিপদশান্তি করাই বীরপুরুষের কার্য। আর যদি কখন তাঁহাকে অসং লোক বলিয়া শুনিয়া থাকেন, সে জঘন্য মিথ্যাকথা শকুনির প্রতারণা।”

ইন্দ্রনাথ। আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন। শকুনি কে?

বিমলা। শকুনি সতীশচন্দ্রের শনি। সেই পামরই সকল দোষে দোষী। সতীশচন্দ্রের উদার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। বীরপুরুষ। এই দেবালয়ে অঙ্গীকার করুন, আপনি সতীশচন্দ্রের সহায় হইবেন।

ইন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন, কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, “যদি স্বার্থই সতীশচন্দ্র নির্দোষী হন, তবে আমি নিজ শোণিত দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনার নাম কি বলুন। আপনি কে, কিরূপেই বা আমার উপাসনা, আমার প্রতিজ্ঞার কারণ জানিতে পারিলেন?”

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আপনার উদ্দেশ্য আমি জানি না, কিন্তু আপনি কোন মহৎ বীরপুরুষ, মুন্দেরে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, আমার হৃদয় আমাকে বলিতেছে। আপনার পরিচর্য কিছু পাইতে ইচ্ছা হইতেছে।”

ইন্দ্রনাথ। আমার পরিচর্য এই পর্য্যন্ত জানিবেন, আমি কোন কারস্ব জমীদারের সন্তান, যুদ্ধ-বাবসার শিথিলার জন্ত মুন্দের যাইতেছি।

ব্রাহ্মণকুমারী নিমন্ত্বে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত নৌকাস্বামী।

How he heard the ancient helmsman
Chant a song so wild & clear,
That the sailing sea-bird slowly
Poised upon the mast to hear.
Till his soul was full of longing,
and he cried with impulse strong.—
“Helmsman for the love of heaven
Teach me, too, that wondrous song!”
Longfellow.

গদানদীর উপর মুন্দেরের ভীমকান্ত হুর্গ শোভা পাইতেছে, কল কল শব্দে গদার তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, এক একবার

দুর্গের উপর আঘাত করিতেছে, আবার ফেনময় হইয়া জলবেগে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও তীরের মৃত্তিকারশি সশব্দে জলে পতিত হইয়াছে। বারিরাশি কিঙ্কিমাাত্র কলুষিত ও চঞ্চল হইয়া পুনরায় মূহূর্ত্তমধ্যে আপন গভীররূপ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে শুভ্র বালুকার চর দেখা যাইতেছে। সেই চরে নানাপ্রকার পক্ষী বিচরণ করে। কোথাও বা তীরবাসিগণ অবতরণ করিয়া সাংকালের ভোজ্য পাক করিতেছে, সেই তরী হহতে অসংখ্য দীপ তারকাভোম্মিতরূপে বহির্গত হইয়া গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে; আকাশেও ক্রমে ক্রমে দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, গঙ্গাতীরে দুই এক জন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে, নগর ক্রমে নিশুঙ্ক হইয়া আসিতেছে।

সেই গঙ্গাতীরে একজন যুবাপুরুষ একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি আমাদের পূর্ব-পরিচিত ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ অল্পই মুন্ডেরে পৌঁছিয়াছেন, চিন্তাময় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

ইন্দ্রনাথ কি করিতে মুন্ডেরে আসিয়াছেন? সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা সাধন জ্ঞাত! সত্য, কিন্তু সে প্রতিহিংসা কিসে সাধন হইবে? আপনি আশ্রয়হীন, সহায়-হীন, সম্পত্তিহীন, অপরিচিত জোক হইয়া কিরূপে সে প্রতিহিংসা সাধন করিবেন? রাজা টোডরমল্ল মুন্ডেরে আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে হয় না? রাজা টোডরমল্ল এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে যত্ন, এক্ষণে কিরূপে তিনি অল্প বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? বঙ্গদেশ এখনও জয় করিতে পারেন নাই, কিরূপে বঙ্গবাসিদিগের ভ্রাতৃ অস্ত্রায় বিচরণ করিবেন? আর যদিই বা সে বিচার করিতে এক্ষণে সক্ষম

হন, অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? যান্ত্রবর দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে একজন অপরিচিত ভ্রমীদারপুত্র যাহা বলিবেন, তাহা কি বিশ্বসনীয়? রাজা টোডরমল্ল বিচার করিতে সক্ষম হইলেও ইন্দ্রনাথ এমন প্রমাণ কোথায় পাইবেন যে, সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ হইবে?

আর সহসা দোষারোপ করা কি উচিত? মহেশ্বর-মন্দিরে অপরিচিতা রমণী বাহা বলিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বস্ত হন নাই। সে রমণী যে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় না; কিন্তু তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তবে সতীশচন্দ্র নিরপরাধী। নিশ্চয় না জানিয়া কি সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা উচিত?

আর সেই রমণী যাহার নাম করিয়াছিল, সে শকুনিই বা কে? ইন্দ্রনাথ যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই অধিকতর ইতিকর্তব্য-বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অনেকরূপ একাকী সেই গঙ্গাতীরে পাদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন, এক্ষণে কোন উপায় দেখিতেছি না; মুন্ডেরে কিছু দিন অবস্থান করা যাউক, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিব।

সহসা এক অপূর্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে ইন্দ্রনাথের চিন্তাভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির চম্ভ্রালোকোজ্জল বক্ষঃস্থলে একটি ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে, তাহার একমাত্র আরোহী সেই গান করিতেছে। গান বিশেষ মধুর কি না, জানি না, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কর্ণে স্বর্গীয় সঙ্গীতের স্ত্রায় বোধ হইল।

সেই গান একবার, দুইবার, তিনবার

গীত হইল ; গন্ধার অনন্ত গীতের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুপথে সঞ্চার করিতে লাগিল । ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে সেই নৌকা ইন্দ্রনাথ যে স্থানে ছিলেন, তাহারই নিকটে আসিল । ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, নৌকার উপর একজন ভদ্রলোক একাকী স্বহস্তে নৌকা বাহিতেছেন ও আপন মনে গান করিতেছেন ।

সেই ভদ্রলোককে দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল । প্রথমে তাঁহাকে মুদ্রের-সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও আগ্রহের সহিত উত্তর দিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার হইল ।

তখন ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “মহাশয় ! যদি অনুমতি দেন, তবে আমি আপনার নৌকার বাইরা আমিও একবার চন্দ্রলোকে দাঁড় বাহিব এবং আপনার অপূর্ণ গান আর একবার শুনিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিব ।”

নৌকারোহী উত্তর করিলেন, “আপনার ভ্রাতৃ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আমারই ভাগ্য, আসুন, নৌকার আরোহণ করুন ; আর যদি হতভাগ্যের গানে রুচি হয়, শ্রবণ করুন ।”

আবার নৌকা বাহিত হইল, আবার সুন্দর বেদপূর্ণ গীতে নৈশগগন পূর্ণ হইল ।

অনেকক্ষণ পর নৌকাষামী ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় মুদ্রের কবে আসিয়াছেন ?”

ইন্দ্রনাথ । আমি অজ্ঞই আসিয়াছি ।

নৌকাষামী । আপনার নাম কি ? নিবাস কোথায় ?

ইন্দ্রনাথ । আমাকে ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবেন, নিবাস অনেক দূরে, নদীয়া জিলায় ।

নৌকাষামী । নদীয়া জিলায় কোন গ্রামে ?

ইন্দ্রনাথ । ইচ্ছাপুর গ্রামে ।

নৌকাষামী । ইচ্ছাপুর গ্রামে ? আপনি কাহার পুত্র, জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

ইন্দ্রনাথ । কেন, আপনি ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলেন না কি ?

নৌকাষামী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, “আমার কার্য-বশতঃ সকল স্থানে যাইতে হয়, আপনার পিতার নাম কি ? হইতে পারে, আমি তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারি ।”

ইন্দ্রনাথ আপন পরিচয় সকলেরই নিকট লুকাইয়া রাখিতেন, শুণ্ডভাবেই দেশবিদেশ পর্যটন করিতেন, কিন্তু ইহার নিকট পিতার নাম লুকাইবার কারণ দেখিতে পাইলেন না । ভাবিলেন, আমি অনেক দিন পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, যদি এই ভদ্রলোক সম্প্রতি সে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পিতার কুশল সংবাদ দিলেও দিতে পারেন । বলিলেন, “ইচ্ছাপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার পিতা ।” অপরিচিত ভদ্রলোক শুনিয়া সহসা চমকিত হইলেন ; হস্ত দ্বারা নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া ধরিলেন—“হা নগেন্দ্রনাথ ! পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ !”

পরে চিত্তসংযম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি ইন্দ্রনাথ ?” ইন্দ্রনাথ তখন বলিলেন, “ইন্দ্রনাথ আমার কখনই নাম নহে, চিরকালই আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ ; তবে অজ্ঞাতরূপে দেশবিদেশ পর্যটন করিতে হয়, এই জন্ত মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করি ।”

“সুরেন্দ্রনাথ !” এই কথাষায় উচ্চারণ করাতে অপরিচিতের চক্ষে জল আসিল,

আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ক্ষণেক পর বলিলেন, “আমার খাল্যাবস্থার পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথের বাসিতে কিছু কাল ছিলাম, সেই হেতু আপনাকে শৈশবাবস্থার আমি দেখিরাছিলাম। এক্ষণে আমার পূর্ববন্ধুর সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। নগেন্দ্রনাথ ভাল আছেন?”

ইন্দ্র। আছেন।

নৌ। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক্ষণে কোথায়?

ইন্দ্র। আমার জ্যেষ্ঠের অনেক দিন

কাল হইয়াছে।

নৌ। তাহার নাম উপেন্দ্রনাথ ছিল না?

ইন্দ্র। হাঁ।

নৌ। তাঁহার কাল হয় কিরূপে?

ইন্দ্র। ইচ্ছাপুরে বড় বাঘের ভয়, আমার জ্যেষ্ঠকে বাঘে লইয়া যায়। আমার জ্যেষ্ঠকে প্রায় স্মরণ নাই। অনেক বৎসর হইল, তাঁহার কাল হইয়াছে।

নৌ। মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?

ইন্দ্র। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুবাস্তা শুনিয়া তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, সেই দুঃখে তাঁহার রোগ হয়, সেই রোগেই তাঁহার প্রাণ-বিরোগ হয়।

প্রায় এক দণ্ড কাল কেহ কথা কহিলেন না, এক দণ্ড কাল নৌকা জলে ভাসিতে লাগিল, এক দণ্ড কাল পরে ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, দর-বগলিত অশ্রুধারায় অপরিচিতের মুখমণ্ডল, বন্ধুস্থল ও সমস্ত বস্ত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন।

নৌকা প্রায় এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জল চন্দ্রালোকে ঝকঝক করিতেছে, আকাশে দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা বাইতেছে কখন কখন চন্দ্রকে ঈষৎ আবৃত করিতেছে, আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পুণ্য জ্যোতিঃ নদীর প্রশান্ত

বকে পতিত হইতেছে। আকাশ গভীর নীলবর্ণ, দুই একটি তারা লজ্জাবতী নববধূর স্তার কখন কখন যুগ দেখাইতেছে। জগতে সমস্ত জীব নিশ্চক, কেবল কখন কখন দূর হইতে একটি গীত বায়ুমার্গে ভাসিয়া আসিতেছে আর সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গা-বারিতে ও পার্শ্বস্থ শুভ্র সৈকতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গার আর একখানি নৌকাও চলিতেছে না, কেবল সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র তরী তর তর শব্দে ভাসিতেছে।

বাইতে বাইতে তীর হইতে একটি আলোক দৃষ্ট হইল। তখন অপরিচিত নৌকারোহী সেই আলোক দেখাইয়া ধীর-স্বরে বলিলেন, “এ আমার গৃহ, আর উহার অনতিদূরে যে নিকুঞ্জ দেখিতেছেন, এ স্থানে আমার হৃদয় সংস্থাপিত আছে।”

নৌকাধারীর গভীর ভাবে চমকিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন,—দেখিলেন, তাঁহার চক্রে অশ্রু-বিন্দু টল টল করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের হৃৎকের সঞ্চার হইল; স্নেহপূর্বক সেই জলমোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু, আপনার নাম আমি জানি না, আপনার কার্য জানি না, কিন্তু তথাপি আপনাকে বন্ধু বলিয়া—ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইতেছে। মনের দুঃখ বন্ধুর নিকট, ভ্রাতার নিকট, থলিয়া বলুন, যদি আমার সাধ্য থাকে, আপনার দুঃখ মোচন করিব।”

নৌকাধারী উত্তর করিলেন, “যদি আমার প্রতি আপনার রূপা হইয়া থাকে, অগ্রহবোধে আমার কুটীরে আয়ুন, আমি সমস্ত কথা আপনাকে নিবেদন করিব।”

সুরেন্দ্রনাথ সন্মত হইলেন। তরী তীরে লাগিল। দুই জনে নিঃশব্দে সেই তরী-চালকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

নৌকাস্বামীর পূর্বকথা ।

How sweet the days that I have spent.

In you sequestered bower ;

Those citrwon trees, still seat of Scent,

Had then some magic power.

Or some fair spirit did reside,

In that sweet purling brook,

Which runs by you green mountain side.

Now haunted by the rook.

No charm was in the spicy grove,

No spirit in the stream.

O'twas the smile of her I love.

Now vanished like a dream !

I. C. Dutt.

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নতুন বন্ধুর কুটীরে আসিলেন ;—দেখিলেন, কুটীর ক্ষুদ্র, কিন্তু বর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাহিরে একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে, তাহাতে কয়েকটি ফল-বৃক্ষ আছে, নিকটে একটি গ্রাম আছে, সম্মুখে অনন্ত নদী, পশ্চাতে সুন্দর কুল্লবন ও ধানক্ষেত্র। সেই কুটীরস্বামী মুক্কেরে সামান্য কার্য্য করিতেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চিন্তা ও খেদপরায়ণ হওয়ার নগর হইতে দূরে একটি গ্রামের নিকট বাটী করিয়া-ছিলেন, তথায় একাকী থাকিতেন, একাকী গীত গাইতেন এবং সারংকালে একাকী আপন নৌকা আপনি নদীবক্ষে বাহিতেন। উঃয়ে উপবেশন করিলে পর সেই অপরিচিত, সুরেন্দ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন, “যুবক! আপনার হৃদয়ে যদি ক্রোধ ও দর্প থাকে, তাহা ত্যাগ করুন। এই দর্পেই আমার সর্বনাশ হইয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে আমি অতিশয় গর্বী ছিলাম। শুনিয়াছি, অতি শৈশবেও আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছা যদি সম্পন্ন না হইত, তাহা হইলে

আমি একদিন, দুই দিন অনাহারে থাকিতাম, এই বিজাতীয় ক্রোধেই আমার সর্বনাশ হইয়াছে।

বাগ্যাবস্থারও এইরূপ ছিল। আমার মন স্বভাবতঃ পাঠাভ্যাসে রত হইত, কিন্তু কখন যদি গুরুমহাশয় অস্তায় তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে আমার সেই বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইত, পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিতাম, সহস্র বেত্রাঘাতেও আমি কথা কহিতাম না, ক্রন্দন করিতাম না। গুরুমহাশয় আমাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার উপর অতিশয় রুষ্ট হইতেন। একদা এরূপ রুষ্ট হইয়া আমাকে সহস্র ঘাতন দিলেন, আমি ক্রন্দন করিলাম না, মুহূর্ত্তমধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন গুরুমহাশয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি আমাকে পুস্তকংগ্ৰহ করিয়া ক্রোড়ে করিলেন, জল-সেচন দ্বারা আমাকে শীত্ৰই চুতন দান করিলেন। সেই অবধি আমার পড়া সাধু হইল। গুরুমহাশয় আর আমাকে পড়াইলেন না, আমি জন্মের মত মুখ রহিলাম।

আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কখন নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাট। তিনি আমার হৃদয় জানিতেন ও আমাকে এরূপ ভালবাসিতেন যে, কখনও তাঁহার একটি কথাতেও মনে বেদনা জন্মে নাই। আমি পিতার অবাধ্য হইয়াছি, গুরুর অবাধ্য হইয়াছি, কিন্তু কস্মিনকালেও মাতার একটি কথা অবহেলা করি নাই। গৃহের সমস্ত লোক উপরোধ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিলে, প্রহার করিলে, আমি যে কার্য্য না করিতাম, মাতা ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেই আমি তাহা করিতাম। হায়! সে স্নেহের প্রতিমাকে আমি আর দেখিতে পাইব না।”

বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখ নত করিয়া তিনি অনবরত অশ্রুবিন্দু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, আপনার মাতার কাল হইয়াছে?”

অপরিচিত উত্তর করিলেন, “শুনিয়াছি, তাঁহার কাল হইয়াছে।”

কণ্ঠে অশ্রুবিসর্জনের পর হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন। “আমার পিতা দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমীদার ছিলেন। তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা, লোকজন এবং সৈন্তসামন্ত ছিল এবং স্বভাবতঃ তিনি কিছু গর্বিত ও কষ্ট ছিলেন। আমাকে যথার্থ ভালবাসিতেন, আমার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার লোচন আনন্দে উৎফুল্ল হইত, আমার নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ শ্লান হইয়া যাইত, তিনি সর্বদা স্বাভাবিক ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেন না। এক দিন আমাকে নির্দোষে প্রহার করিলেন ও বলিলেন, ‘তোমার মুখ আর দেখিতে চাচি না, আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা।’ ‘চলিলাম’ বলিয়া আমি পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলাম।

প্রহারে ও তিরস্কারে অনেক বালক শান্ত হয়, কিন্তু আমি ক্রোধে অন্ধ হইলাম; হৃদয়ে হতাশন জ্বলিতে লাগিল। সেই হতাশন পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, সকলই নষ্ট করিল, সেই হতাশন আমার ভাবী সংসার-সুখ, পিতা-মাতার আশা-ভরসা একেবারে নষ্ট করিল। পিতা আমাকে দূর হইতে বলিলেন, আমি দূর হইলাম। সেই অবধি আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছি। তখন আমার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র।

তাঁহার পর কয়েক বৎসর আমার জীবন

যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুর স্রাব আমার জীবনের দশ বৎসর বহিঃ লাগিল। প্রচণ্ডতা আছে, কিন্তু ফল নাই অর্থ নাই, কাহারও উপকার নাই। নিষ্কল প্রাণিশূন্য পর্বতপার্শ্বে সমুদ্রগর্জনবৎ আমাঃ হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি-সমুদ্র গর্জন করিয়াছে, কিন্তু সে গর্জনের শ্রোতা নাই; সে গর্জনে কেহ আনন্দিত হয় নাই, কেহ বিম্বিত হয় নাই। পাতাল-প্রবাহিণী, ভৈরবকল্লোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার স্রাব আমার হৃদয়কন্দরে কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রবাহ ভোগবতীর স্রাব মনুষ্যের অদৃশ্য, অন্ধকারাচ্ছন্ন। দশ বৎসর অতীত হইলে সেই অন্ধকারাশি সঙ্গসা আলোক-চ্ছটার চমকিত ও উদ্দীপ্ত হইল।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা কণ্ঠে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিম্পন্দ-নেত্রে সেই অপূর্ণ উন্মত্তপ্রায় লোকের দিকে দেখিতে লাগিলেন; অনন্তমনে তাঁহার উন্মত্ততার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনিও কণ্ঠে পরে আরম্ভ করিলেন, “যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর কাল ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্বগ্রগণ্য। (সুরেন্দ্রনাথ অধিকতর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন সামান্য স্ত্রীলোকের প্রেম আমি আকাজক্ষা করিতাম না। যে প্রেম মানব-হৃদয়কে একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে, যে প্রেম জীবনের অংশস্বরূপ, দেহের আত্মাস্বরূপ, যে প্রেম শেষ হইলেই জীবন শেষ হয়, সেইরূপ প্রেম আমি আকাজক্ষা করিতাম। কতবার অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা করিতাম; চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক-স্নেহসম্পন্ন প্রেম-প্রতিমাকে জাগরিত করিয়া,

তাহারই সহিত কালহরণ করিতাম । সহসা সে মুষ্টি জলবিষের স্তার ভিন্ন হইয়া বাইত ; কল্লনাশক্তি প্রাপ্ত হইত ; আমি সহসা মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলাম ।

দিন দিন এইরূপ কল্লনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । দিবাকালে অর্ধেক সময় আমি এ জগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম । সে জগতে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল ক্ষেত্রবৃক্ষ, উজ্জ্বল অট্টালিকা, উজ্জ্বল গৃহদ্বারা—তন্মধ্যে উজ্জ্বল প্রেম-প্রতিমা আসীন রহিয়াছেন । নিবিড়কৃষ্ণকেশে জ্যোতির্ময় সুবর্ণকাস্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । বালিকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটি মল্ল প্রেমহাস্তে বিস্তারিত, ভ্রমর-কণ্ঠ চক্ষু দুটি প্রেমাক্রান্তে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢল ঢল করিতেছে । সহসা কল্লনা-ক্তি ছিন্ন-তার বীণাসম নীরব হইত ; আমিও মুচ্ছিত হইতাম ।

একদিন নিশাবসানে কল্লনা এইরূপ ছিন্ন ওয়াতে আমি মুচ্ছিত হইয়া এই গলাভীরে । নিকুঞ্জবনে শুইয়া রহিয়াছি, কতক্ষণ চিন্তিত ছিলাম, বলিতে পারি না । বোধ হইল, মস্তকে ও মুখে কে জলসিঞ্চন ও বাজন করিতেছেন । ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি—আপনি বিশ্বাস করিবেন না—সেই প্রেম-প্রতিমা ! সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা স্তিমিত হইয়া আমার মুখে জল দিতেছে !”

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন । রুরেন্দ্রনাথ এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন । কণেক পরে সেই অপরিচিত লোক আবার বলিতে লাগিলেন, রুরেন্দ্রনাথ ! আমি আর অধিক কথা হিতে পারি না । জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এই বালিকা কারস্বকল্প, অবিবাহিতা, নাথ্য এবং জাতির অন্তে পালিতা । আমি

বালিকার পাণিগ্রহণ করিলাম, তাহার পর কয়েক বৎসর যেরূপ সুখস্বপ্নে অতিবাহিত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত ।

ঐ যে নিকুঞ্জবন দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমরা বাস করিতাম । শরৎকালের উষা আকাশে যে পবিত্র বর্ণ বিস্তীর্ণ করে, প্রেম আমাদের হৃদয়-আকাশে তদপেক্ষা পবিত্র বর্ণে চিরকালই রঞ্জিত হইয়া থাকিত । সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার যেরূপ শান্ত ও নিস্তর, আমাদের হৃদয়ের প্রেম তদপেক্ষা নিস্তর ও শান্ত-ভাবে বিরাজ করিত । আমি সে রমণীকে কুঞ্জবাসিনী বলিতাম, কেন না, ঐ যে কুঞ্জবন দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থানে—”

আর কথা সরিল না । রুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, অপরিচিত উন্নতের স্তার সেই কুঞ্জবনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—মুখে কোন ভাবই নাই, সংজ্ঞার কোন লক্ষণ নাই । রুরেন্দ্রনাথ অনেক বড়ো তাঁহার চৈতন্যদান করিলেন । পরে অন্য কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অনেক হইল । দুই ত্রাতার মত দুই জন এক শয্যা শয়ন করিলেন, অচিরে নিদ্রা অন্তর্ভূত হইলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

বঙ্গবিজ্ঞেতা ।

A combination and a form indeed
Where every god did seem to set his seat
To give the world assurance of a man.
Shakespeare.

মন্দেরের প্রকাশ্য দুর্গের মধ্যে একটি প্রশস্ত গৃহে এক বীরপুরুষ উপবেশন করিয়া

রহিয়াছেন। ইনি কজ্রিকুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল।

তাহার নিকটে সে সময়ে অধিক লোক নাই, দুই চারি জন অতি বিখ্যাত বোদ্ধা আশীন ছিলেন। অতি যুদ্ধবরে যুদ্ধের পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল, “মহারাজ! একজন অশ্বারোহী আপনার সত্বে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, অহমতির ভয় দ্বারে দণ্ডায়মান আছে।”

টোড। তাহার বক্তব্য কি, জিজ্ঞাসা কর।

সৈন্য। জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিলেন, মহারাজের সহিত দর্শন ভিন্ন বলিতে পারি না, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

টোড। হিন্দু কি মুসলমান?

সৈন্য। কাশস্থ জমীদারপুত্র।

টোড। বঙ্গদেশে অনেক পরাক্রান্ত কাশস্থ জমীদার আছেন। শুনিয়াছি, তাহাদিগের আট লক্ষ সেনা আছে, সত্ৰাটের কার্যে তাহাদিগের সাহায্যতা আবশ্যক। আগন্তুককে আসিতে বল।

সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহীকে আনিতে যাইল।

এই অবসরে আমরা পাঠক-মহাশয়কে রাজা টোডরমল্লের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

কজ্রিকুলাবতংস টোডরমল্ল অপেক্ষা সৰ্বগুণবিকৃষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমে অনেক পুণ্যাশ্রা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বীরপ্রসূ কজ্রিকুলে অনেক বীরপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিন গুণেই বিভূষিত ছিলেন। হিন্দুধর্মে তাহার অচলা

ভক্তি ছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীস্থ আকবর শাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় ক্ষতভ্রমণবশতঃ তাহার দেবারাধন কার্যে বিঘ্ন হইয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কর্মই করিতেন না, জলগ্রহণ করিতেন না, স্তব্রাং দেবারাধনার বাধাত হওয়াতে তিনি অনাহারে রহিলেন। আকবর শাহ অনেক অসু-রোধ করিয়াও তাহাকে কোন কার্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুল ফজল প্রভৃতি আকবরের মুসলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে গোড়া হিন্দু বলিয়া সততই নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু মহাত্ম্যব দিল্লীস্থ স্বধর্মাস্ত্ররাগী বীরকে সম্মান করিতেন। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন, যখন তাহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, তিনি সেই সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া গজাতীরে মানবলীলা সংবরণ করিবেন, এই অভিলাষে দিল্লীস্থরের অমৃতমাতুলসারে রাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার গমন করেন।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহায্য ও যুদ্ধ-কৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথমবার মনাইম খাঁর ও দ্বিতীয়বার হোসেন কুলী খাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারই সাহায্যে দুইবারই জয়লাভ হয়। তৃতীয়বার তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন, কেবল বঙ্গদেশে নহে, তিনি যে স্থানে বাইরা-ছিলেন, সেই স্থানেই অপূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট-প্রদেশে বিজোহী-দিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধোলকার-যুদ্ধে সেনাপতি ভিজার খাঁ

এলায়ন-তংপর হইরাছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল তাঁহাকে নিবেদন করিয়া একপূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই অক্ষশায়িনী হইলেন। আকবর শাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে টোডরমল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই অধিক সাহস ও বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

আকবর শাহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব-স্থিরীকরণ-ভার রাজা টোডরমলের উপর স্তম্ভ করেন। সেইরূপ দুইরূপ কৰ্ম তিনি যেরূপে সম্পন্ন করেন, তাহাতে তাঁহার স্বস্ববুদ্ধি ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রাজা টোডরমল লাঠোরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা দারিদ্র্যজনিত যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াও শিশুকে অতি যত্নে লালন-পালন করেন। শিশুও অল্পবয়সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশ করেন ও প্রথমে কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচকৰ্ম হইতে তিনি আকবর শাহের রত্নপরিপূর্ণ সভার মধ্যে প্রধান রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সৈনিক পুরুষ সেই অপরিচিত আগন্তুককে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। তিনি পাঠকের অপরিচিত নহেন। টোডরমল জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবক! তোমার নাম কি?” যুবক উত্তর করিলেন, “ইন্দ্রনাথ চৌধুরী।”

টোড। নিবাস কোথায়?

ইন্দ্র। নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী ইচ্ছাপুর গ্রামে।

টোড। তোমার কত সৈন্ত আছে?

ইন্দ্র। সম্রাটের কার্য ও দেশ-সুশাসনের জন্ত পিতার দুই তিন সহস্র পদাতিক সৈন্ত

বদদেশে আছে। কিন্তু আপাততঃ আমি একাকী সম্রাটের কার্যসাধনার্থ বিহার-প্রদেশে আসিয়াছি।

রাজা টোডরমল কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে যুবকের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুবকের আকারে উদারভাষ ভিন্ন কিছুমান লক্ষিত হইল না। ক্ষণেক পর রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার পিতা কি সম্রাটের কার্যে কিছু সেনা এই স্থানে পাঠাইতে পানেন নাই?”

ইন্দ্র। “প্রভুর আজ্ঞা পাইলে পাঠাইবেন। অধুনা অমুমতি হইলে আমি প্রভুর কার্যসাধনের আশা রাখি।” এই বলিয়া কোষ হইতে একবার অসি বাহির করিয়া পুনরায় কোষে রাখিলেন।

সাদীক খাঁ নামক সেনাপতি বলিলেন, “যুবক! তুমি যেরূপ অসি ধারণ করিলে, আমার বিশ্বাস, যুদ্ধে তোমার হস্তে অসির অপমান হইবে না।”

তারসন খাঁ নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ! এ শত্রুদিগের গুপ্তচর, ইহাকে জ্ঞানদহন্তে অর্পণ করুন।”

রাজা টোডরমল কাহারও কথার উত্তর না দিয়া বার বার যুবকের উপর তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তাঁহার আকৃতিতে বা মুখভঙ্গীতে কোনরূপ বৈলক্ষ্য দেখিতে পাইলেন না; বিশেষ পরীক্ষার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “তুমি একাকী আমাদের কার্যসাধনে আসিয়াছ, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।”

ইন্দ্র। আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনাকে যদি প্রভুভক্তি-প্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে ভিক্ষা চাহিব, এক্ষণে সে ভিক্ষা বৃথা হইবে।

টোড। পক্ষপাত আমাদের সৈন্তমধ্যে
বিত্রোহ উত্থাপন করিবার জন্য অনেক চর
প্রেরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগের এক-
জন নহ, আমি কিরূপে বুঝি?

ইন্দ্র। কারহু জমীদারপুত্রের কথার উপর
বাস হয় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।

টোড। অনেক সময়ে অভ্র লোকও
ভক্তলোকের বেশ ধারণ করে; অনেক সময়ে
ভক্তবংশীয় লোক কপটাচারী হয়।

ইন্দ্র। “মহারাজ! কপটাচরণ কখন করি
নাই, আমাদের বংশে সে দোষ নাই।”
ক্রোধে ইন্দ্রনাথের স্বর বন্ধ হইল।

টোড। তোমার কথা উদারচেতা বীর-
পুরুষের স্থায়, কিন্তু অনেক সময়ে গভীর
খলতা বাহ্যিক শুদার্থ্য অবলম্বন করে।

ইন্দ্রনাথের মুখ ক্রোধে রক্তিম। ধারণ
করিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি
আপনার নিকট কপটাচরণ করিবার জন্য
আসিয়াছি বিশ্বাস হয়, তবে বিদায় লিন,
সলিয়া যাই।”

টোডরমন্ড তুষ্ট হইলেন, ইন্দ্রনাথকে
বন্দনপূরঃসর অখোরোহীর পদে নিমুক্ত
করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুর স্মরণার্থ।

Alas they had been friends in youth !

Coleridge.

কয়েক মাস বিগত হইল। ইন্দ্রনাথ ক্রমে
জ্ঞকার্যে নৈপুণ্য ও খ্যাতি লাভ করিলেন।
বিত্রোহিগণ ভাগলপুরে সমবেত হইয়াছিল,
তেরাং ভাগলপুর ও মুন্দের মধ্যদেশে
কঁদাই যুদ্ধাধি হইত।

একদিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত
বিত্রোহিগণ টোডরমন্ডের দুর্গ প্রবেশ করিবার
জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। টোডরমন্ড
তাহাদিগের উদ্দেশ্য পূর্বে জানিতে পারিয়া-
ছিলেন, স্তত্রাং অনায়াসে তাহাদিগের চেষ্টা
প্রতিরোধ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে
সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত তিনি দুর্গের এক স্থান হইতে
অন্ত স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন-
এবং তাহার উৎসাহ, তাহার বুদ্ধিবল ও
রণকৌশলে, দৈন্তগণ প্রোৎসাহিত হইয়া
অনায়াসে শত্রুদিগকে সকল স্থানে পরাস্ত
করিল। টোডরমন্ড ইতিপূর্বে ইন্দ্রনাথের
সাহস ও যুদ্ধে উৎসাহ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া-
ছিলেন, অতঃসমস্ত দিন ইন্দ্রনাথ যেক্রপ
সাহসের সহিত শত্রুদিগের সহিত বার বার
যুদ্ধদান করিলেন, তাহাতে সেনাপতি যার
পর নাই আনন্দিত হইলেন। সূর্যাস্তের সময়
শত্রুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুরের দিকে
প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর ইন্দ্রনাথ সেনাপতির সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন টোডরমন্ড
একাকী বিশ্রাম করিতেছেন, ইন্দ্রনাথকে
আসিতে অনুমতি দিলেন।

ইন্দ্রনাথের অন্তকার সাহসিক কার্য
দেখিয়া টোডরমন্ডের মন প্রফুল্ল হইয়াছিল,
তিনি যুবা সৈনিককে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া
নিকটে বসাইলেন। তাহাদের নিকটে তখন
আর কেহ ছিল না।

তখন টোডরমন্ড বলিলেন, “ইন্দ্রনাথ !
তুমি অতঃ যেক্রপ বিক্রম দেখাইয়াছ, তাহাতে
আমি তুষ্ট হইয়াছি। আজিকার যুদ্ধে
তোমার জীবন সংশয়স্থলে ছিল।”

ইন্দ্র। মহারাজ ! বেদিন সৈনিক তই-
লাম, সেই দিনই রাজকার্যে জীবন সমর্পণ
করিয়াছি, যদি এ যুদ্ধের পরও জীবিত

যুদ্ধবিজ্ঞেতা ।

কি, তবে সে আপনার আশীর্বাদ আর
তায় পুষাবলে ।

টোড । দেশে তোমার পিতা আছেন ?
ইন্দ্র । আছেন ।

টোড । তোমার ভ্রাতা-ভগিনী করজন ?
ইন্দ্র । আমার একজন ভ্রাতা ছিলেন,
হার কাল হইয়াছে । এক্ষণে আমিই
তার একমাত্র সন্তান ।

টোডরমলের মুখ গভীর হইল ; বলি-
ন, “যদি এই যুদ্ধে তোমার নিধন হয়,
ব তোমার পিতার কি মনঃপীড়া হইবে !
মারও পুত্র আছে, সেই ভক্তই এই ভাবনা
সিতেছে । ধারক বয়ঃক্রম তোমারই মত,
হার সাহস তোমারই মত ; তোমারই
সে বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, মরণকে
করে না । যদি সে যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত
তাহার পিতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে ।
পি রাজকাৰ্য্যে মরণাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর
আছে ? সম্রাট্ আকবর শাহের কাৰ্য্যে
রা পিতা-পুত্রে নিয়োজিত আছ, সে
ধা জীবন সমর্পণ করিতে আক্ষেপ নাই ।”
ইন্দ্র । বিধাতা সে দিন এখনও দূরে
ন ; তাহার পূর্বে প্রভু বহাদুর জীবিত
রা দিল্লীখরের কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করুন,
ব ও খ্যাতি অর্জন করুন । আপনার
গৌরবান্বিত নাম ভারতবর্ষের হিন্দু-
ব মধ্যে কাহারও নাই, আপনার হার
বের কাৰ্য্য কেহ সাধন করেন নাই ।

টোড । “আমার অপেক্ষা গৌরবের
আমার জীবনের একজন বন্ধু প্রাণ-
ন করিয়াছেন ।” টোডরমল এই কথা
একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ।

ইন্দ্রাণ নিশ্চল হইয়া রহিলেন । টোডর-
র বীরে কহিতে লাগিলেন, “অল্প
আনন্দের দিব, অল্প ঘেরাপ শত্রু

পরাস্ত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া দিল্লীখর অভি-
শয় তুষ্ট হইবেন, কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে
অল্প আমার একটি ছুঃখের কথা মনে উদয়
হইতেছে । এই মাসের এই দিনে আমার
বাল্যকালের একজন পরমসুন্দর জীবন বিস-
র্জন করিয়াছিলেন । সে আজ ঠিক বাদশ
বৎসর হইল ।

ইন্দ্র । সে মহাত্মাও বোধ হয় বোদ্ধা
ছিলেন, তিনিও বোধ হয়, দিল্লীখরের কাৰ্য্যে
জীবন দান করিয়াছিলেন ।

টোড । আশৈশব তাঁহার যুদ্ধ ভিন্ন অন্য
ব্যবসা ছিল না, কিন্তু তিনি দিল্লীখরের কাৰ্য্যে
জীবনদান করেন নাই, দিল্লীখরের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিয়া জীবন দিয়াছিলেন ।

টোডরমলের মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র-
নাথ চমকিত হইলেন । টোডরমল ঈষৎ
হাসিয়া বলিলেন, “দিল্লীখরের পুরাতন দাসের
নিকট দিল্লীখরের শত্রুর প্রশংসা শুনিয়া তুমি
চমকিত হইতেছ ; কিন্তু তুমি যদি দিল্লীতে
কখন গমন কর, স্বয়ং আকবর শাহের মুখে
তাঁহার পরম শত্রু রাণা প্রতাপসিংহের
প্রশংসা শুনিয়া আরও চমকিত হইবে । ইন্দ্র-
নাথ ! আকবরের কাৰ্য্যে আমার জীবন
অতিবাহিত হইয়াছে, আকবরের শত্রুই
আমার শত্রু, কিন্তু তথাপি সাহস, অধ্যবসায়
ও স্বদেশপ্রিয়তা দেখিলে কি শত্রু, কি मित्र,
সকলেই প্রশংসা করে । প্রতাপসিংহ স্বদেশের
স্বাধীনতার ঘেরাপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া
পর্যতকাল ও মরুভূমিতে বাস করিয়া, বৎ-
সর বৎসর আকবরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধদান
করিতেছেন, তাহাতে আকবর শাহ স্বয়ং
বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন । আজি চারি
বৎসর হইল, প্রতাপ হৃদীঘাটার যুদ্ধে
অনেক সৈন্য হারাইয়াছেন, তাহার পর
দুর্গ, ভূমি, সম্পত্তি সমস্তই হারাইয়াছেন,

কিন্তু মজ্জাবোর পণ, মজ্জাবোর সাহস ও অধ্য-
বসার হারান নাই। কন্দরবাসী প্রতাপ
এখনও স্বদেশের অন্ত্র যুঝিতেছেন, বত দিন
জীবিত থাকিবেন, যুঝিবেন। কি শত্রু, কি
মিত্র, ভারতবর্ষে একরূপ হিন্দু নাই, একরূপ
মুসলমান নাই যে, তাঁহার সাধুবাদ করে না।
ভারতবর্ষ আজ প্রতাপসিংহের গৌরবে পূর্ণ।

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া উৎসাহপূর্ণ
হৃদয়ে স্তব্ব হইয়া রহিলেন। টোডরমল্ল
দ্বীরে দ্বীরে বলিলেন, “কিন্তু প্রতাপসিংহের
কথা আমি অন্ত্র চিন্তা করি নাই। আর
একজন যোদ্ধা, যিনি দ্বাদশ বৎসর হইল,
সেই মেওয়ারের রাজধানী চিতোর-রক্ষার্থ
জীবনদান করিয়াছিলেন, তাঁহারই চিন্তা
করিতেছিলাম। ইন্দ্রনাথ! অন্ত্র তোমার
কার্য দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি, যে কথা
আমি সকলের সম্মুখে বলি না, তাহা
তোমাতে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি। একটি
গল্প শ্রবণ কর।

যৌবনের প্রারম্ভে আমি মেওয়ার দেশে
একবার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। একটি
বরাহ-শীকারে আমি প্রায় জীবন হারাইয়া-
ছিলাম। একজন অশুরবীর্য্য যোদ্ধার অব্যর্থ
বর্শার আঘাতে সে বরাহ হত হইল, আমি
পরিজ্ঞাপ পাইলাম। সে অশুরবীর্য্য যোদ্ধা
স্বর্ধ্যমহল দুর্গের তিলকসিংহ।

ক্রমে তিলকসিংহের সহিত আমার
বিশেষ সৌহৃদ্য হইল। তখন তাঁহার অসা-
ধারণ গুণ আমি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারি-
লাম, তিনিও আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে
লাগিলেন। ক্রমে আমাদের মধ্যে প্রকৃত
বন্ধুত্ব হইল।

জীবনের বহুত্ব একবার হয়, দুইবার হয়
না। ইন্দ্রনাথ! দারীর প্রণয়ের কথা তুমি
অনেক পড়িয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু

যৌবনে দুই জন সরলস্বভাব, উৎসাহপূর্ণ পুরু-
ষের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত
প্রণয় আমি এ জগতে কিছুই জানি না।

যখন আমি দিল্লীখরের কার্যে ব্রতী হই
লাম, তখন তিলকসিংহকেও সেই কার্যে
ব্রতী করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার
স্বার রণপণ্ডিত ও অশুরবীর্য্য যোদ্ধা যদি
দিল্লীখরের কার্যে স্বীকার করিতেন, তাহা
হইলে দিল্লীখরের একরূপ সেনাপতি ছিল না
যে, তিলককে গুরু বলিয়া না মানিত।
তিনি এত দিনে বহুদেশ বা দাক্ষিণাত্যের
শাসনকর্ত্তা হইতেন।

কিন্তু তিলকসিংহ সে কার্যে ব্রতী হই-
লেন না। তিনি আমার প্রস্তাবে যে উত্তর
দিলেন, তাহা অস্বাভাবি আমার হৃদয়ে
অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, “আমার
পিতা, আমার পিতামহ, আমার প্রপিতামহ
মেওয়ারের রাণার কার্য করিয়াছেন, আমিও
সেই কার্য করিব। দিল্লীখর চিরকালই
মেওয়ারের শত্রু, তাঁহার সহিত আমার
সম্পর্ক নাই, অথবা শুনিয়াছি, আকবর
চিতোর অধিকার করিবার জন্য উদ্বোধন
করিতেছেন; যদি তিনি সেই উদ্দেশ্যে
চিতোরে আইসেন, তবে তিলকসিংহের
সহিত তাঁহার একদিন লাক্ষ্য হইবে।”

বীর যে কথা বলিলেন, তাহা রক্ষা
করিয়াছিলেন। যখন দিল্লীখর চিতোর
আক্রমণ করিলেন, তখন তিলকসিংহ সিংহ-
বল প্রকাশ করিয়া চিতোর-রক্ষার্থ জীবন
দান করিলেন। স্বয়ং দিল্লীখর তাহা দেখিয়া-
ছিলেন, তিনি স্বয়ং আমাকে সে কথা
বলিয়াছিলেন।

টোডরমল্ল অনেককাল নিস্তব্ব হইয়া রহি-
লেন। দ্বীরে দ্বীরে বীর আকৃতি রান হইল,
সেই যোদ্ধার গণ্ডস্থল দিয়া এক বিদ্যুৎ অঙ্ক

বহিরা পড়িল। সে অশ্রু ঝোচন করিয়া টোডরমল্ল কহিলেন, “ইন্দ্রনাথ! প্রতাপসিংহ এক্ষণে আমাদের শত্রু। শুনিয়াছি, তিলকের পুত্র তেজসিংহ* এখন প্রতাপসিংহের অধীনে যুদ্ধ করিতেছেন। যদি দিল্লীর আমাকে যেওনারে প্রেরণ করেন, তবে বন্ধুপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সঙ্কুচিত হইব না। তথাপি শত্রুরও যদি গুণ থাকে, সে গুণ স্বীকার করা নিবিদ্ধ নহে, জীবনের পরমবন্ধু যদি বিধির বিড়ম্বনায় শত্রুপক্ষীয় হন, তাঁহার যত্নের জন্য এক বিন্দু অশ্রু-বিসর্জন করা নিবিদ্ধ নহে।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

অপরিচিত শত্রু ও পরিচিত বন্ধু ।

PRISONER ! pardon youthful fancies
Wedded ? If you can say no !
Blessed is and be you consyrt
Hopes ! cherished, let them go.

Wordsworth.

টোডরমল্লের শিবির হইতে ইন্দ্রনাথ চিন্তা, বিষয় ও খেদ-পূর্ণ হইয়া নিজ শিবিরে আসিলেন; একাকী নির্জনে বসিয়া মেওয়ার, প্রতাপসিংহ ও তিলকসিংহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া তিনি একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিলেন :

* বাহাদুর তেজসিংহের বীরদের কথা জানিতে হব, তাঁহারা জীবন-সম্ভা আধারিতা পাঠ করুন।

মর্ষগ্রহণ করিতে পারিলেন না। পরে এইরূপ লিখিত ছিল—

“তোমার বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে বাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই, তাহার চক্ষে ধূলি দিয়াছে। আমরাও ঐ পথ অবলম্বন করিব, কেন না, বে পতনোন্মুখ গৃহ অগ্রে তাগ করে, সেই বুদ্ধিমান। অস্ত্র এক প্রহর রজনীতে অশানঘাটে দেখা হইবে।”

ইন্দ্রনাথ এ পত্রের কিছুই অর্ধগ্রহণ করিতে পারিলেন না। “ভারতবর্ষে বাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই,” সে কে? বোধ হয়, রাজা টোডরমল্ল, কিন্তু তাঁহার চক্ষে ধূলা কে দিয়াছে? পতনোন্মুখ গৃহ কি? ইন্দ্রনাথের বোধ হইতে লাগিল যে, কোন বিদ্রোহীকর্তৃক এই পত্র লিখিত হইয়াছে। অশানঘাটে যাওয়া কি কর্তব্য? ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, বাওয়ার কোন হানি নাই, বরং কোন গুপ্ত-বিষয়ের সন্ধান পাওয়া বাইতে পারে।

ইন্দ্রনাথ নিরূপিত সময়ে অশানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই, অসিই তাঁহার একমাত্র সচর।

রজনী ঘোর তমসাক্ষর, আকাশ নিবিড় মেঘাক্ষর। আকাশে কালো মেঘ উড়িতেছে, এক একখানি করিয়া সেই মেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতেছে; সেই পশ্চিমদিক হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে, বিদ্যুৎ-আলোকে অশানের ভরানক বস্ত্র-সকল এক একবার দেখা বাইতেছে। কোন স্থানে সম্ভ্রান্ত শব্দ হইয়াছে, ভয়রাশির মধ্যে অগ্নি এক একবার দেখা বাইতেছে; কোন স্থানে বা উজ্জল অগ্নিশিখা চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারকে উদ্গোষ্ঠ করিতেছে। সেই আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে নানারূপ ছায়া দেখা

বাইতেছে, নিকটস্থ বৃক্ষরাশির মধ্য দিয়া বায়ুবেগবশতঃ নানারূপ অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতেছে। সেই ছায়া দেখিয়া, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রনাথের বভাবতঃ সাংশী হৃদয়ও এক একবার তন্ত্রিত হইতে লাগিল। কখন কখন তিনি দূরে বেন ভরানক আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, সেই দিকে গমন করিয়া কখন বা দেখেন, ধূম-রাশি উখিত হইতেছে, কখন বা বোধ হয় বেন, সেই আকৃতি ধীরে ধীরে বাইয়া বৃক্ষের অন্ধকারে লীন হইতেছে। গগনমণ্ডল ক্রমশই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বায়ু ক্রমশই গভীরতর শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল, গঙ্গার তরঙ্গ ক্রমশই ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। আকাশে নক্ষত্রমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, দূরে শিবাগণ মুহুমূহঃ বিকট শব্দ করিতেছে, যেন দূর হইতে প্রেত ও পিশাচের অটুহাসি শ্রুত হইতেছে।

যে দিকে মিবিড় জঙ্গল ছিল, সেই দিকে যেন বোধ হইল, দুইটি ভীষণ আকৃতি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। ইন্দ্রনাথ তাহা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু যতবার সেই দিকে নয়নপাত করেন, ততবারই সেই ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথ সেই দিকে আগমন করিলেন, বোধ হইল, যেন সেই আকৃতিদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়। ইন্দ্রনাথ সে দিক হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, বোধ হইল যেন, জঙ্গলের ভিতর হইতে অটুহাসি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া দেখিলেন, সেই ভীষণ আকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

“ভগবান্ সহায় হউন!” এই কথা বলিয়া ইন্দ্রনাথ অসি-হস্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে পুনরায় গমন করিলেন; অতিশয় সতর্কতার সহিত আকৃতিদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে

করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গলের নিকটে আসিতে না আসিতে আবার সেই আকৃতিদ্বয় অদৃশ্য হইল। আবার দূর হইতে সেই পৈশাচিক অটুহাসি শ্রুত হইল।

“ভগবান্ সহায় হউন!” বলিয়া ইন্দ্রনাথ সেই জঙ্গলমাধ্য প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে একপ নিবিড় অন্ধকার ব, চারি চতু দূরে কোনও দ্রবাই লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছে; ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে। সেই ধাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রনাথ বাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাহার শরীরের উপর যেন কে হস্ত স্থাপন করিল।

ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, প্রেত নহে; তাহারা দুই জন ছদ্মবেশী মনুষ্য। তাহারা ইঙ্গিত করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিল। ইন্দ্রনাথ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই দুই জন মনুষ্যের সহিত তিনি অনেকক্ষণ নীরবে বাইতে লাগিলেন। চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গল ও নিবিড় অন্ধকার, নিশেবে তিন জনে সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া বাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাহারা গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় মুখমণ্ডল হইতে আবরণ খুলিয়া লইল, ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। তাহারা হমায়ুন ও তর্খান নামক রাজা টোডরমল্লের অধীনস্থ দুই জন সেনাপতি।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এত রাজ্যে এই ভয়ঙ্কর বেশে এ স্থানে আপনারা কি করিতেছেন?”

হমায়ুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,

“সেনানী ইন্সনাথের সাহস পরীক্ষা করিতে-
ছিলাম ।”

ইন্সনাথ । আমি আপনাদিগের নিকট
পরীক্ষা দিতে যদি অসম্মত হই ?

হুমায়ুন । তাহা হইলে বোধ করিব,
আমরা যে অসমসাহসিক কার্যে নিযুক্ত হই-
রাছি, সেনানী ইন্সনাথ তাহা সমাধা করিতে
অক্ষম ।

ইন্সনাথ । ইন্সনাথ অক্ষম কি সক্ষম, কার্য-
কালে তাহা অস্ত্র লোকে বিবেচনা করিবেন ;
শাসনভূমিতে পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিলে
কি সাহসের পরিচর পাওয়া যায় ?

হুমায়ুন । সেনানী ইন্সনাথের যে অসাধা-
রণ সাহস আছে, তাহা আমাদের অবদিত
নাই । তাঁহার পৈশাচিক সাহস আছে কি
না, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলাম । পৈশা-
চিক কার্যে নিযুক্ত হইলে পৈশাচিক সাহস
আবশ্যক হয় ।

ইন্সনাথ । কি পৈশাচিক কার্যে নিযুক্ত
হইয়াছি ?

হুমায়ুন । তাহা কি জানেন না ? উপ-
হাস করিতেছেন কেন ? আপনি যে
কার্যের স্বত্বপাত করিয়াছেন, আপনি গৃহ-
মন্ত্রণায় ও চমৎকার কৌশলে যে কার্য-
সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সে
কার্য কি আপনি জানেন না ? আপনার
কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি ।
রাজা টোডরমল্লকে কেহ বঞ্চনা করিতে
পারেন নাই, আপনি তাহা করিয়াছেন ।
আপনি ষ্টরজীবী ইউন, একদিন বঙ্গদেশের
গৌরবস্থল হইবেন ।

ইন্সনাথ বিস্মিত হইয়া রহিলেন । তথান
বলিতে লাগিলেন, “বর্ষাধি হুমায়ুন ও
আমি কতবার অন্তরালে আপনার কৌশ-
লের ধন্যবাদ করিয়াছি । শিবিরে আমাদের

যত অনেকজনই বিদ্রোহোন্মুখ সেনানী
আছেন । ত্রিশংসহস্র অশ্বারোহী সেনাপতি
মানুষী কারাঘুরীও বিদ্রোহতৎপর । কিন্তু
রাজা টোডরমল্ল আমাদের সকলের অন্ত-
রের ভাব জানিয়াছেন, আমাদের সকলেরই
উপর একপ দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, আমরা
কামনা সিদ্ধ করিতে পারি নাই । কিন্তু
আপনি কি কুহকে, কি যুগাকৌশলে যে
রাজা টোডরমল্লকে অন্ধ করিয়াছেন, কিছুই
বুঝিতে পারি না । বহু আপনার বুদ্ধিবল ।”

তথান আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু ইন্স-
নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমি বিদ্রোহী
নহি । আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন,
আমি গুপ্তচর, কি কণ্ঠাচারী, কি বিদ্রোহ-
কামনা করিয়া রাজা টোডরমল্লের অধীনে
কর্ম করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা
যেহ ভ্রান্তিতে মগ্ন হইয়াছেন । আর
আপনারা যদি বিদ্রোহী হন, তবে আমাকে
বিদায় দিন । আমার সহিত আপনাদিগের
কোন সম্পর্ক নাই । আমি এইক্ষণেই রাজা
টোডরমল্লকে সর্ববৃত্তান্ত অবগত করাইব ।
কৃপণে আমার হস্তে আপনাদিগের লিপি
পড়িয়াছিল ।”

হুমায়ুন দিউরানা ও তথান ফামিলীর
মুখ গম্ভীর হইল, উভয়েই ভাবিতে লাগিল,
“আমরা এতদিন কি ভ্রান্ত ছিলাম, মানুষী
কারাঘুরী কি এই হিন্দুর অন্তর বিশেষ
জানেন না ?” উভয়েই কোষ হইতে ধড়ল
বহির্গত করিবার উদ্যম করিলেন । ইন্সনাথও
শস্ত্রবিষয়ে অপটু ছিলেন না, তিনিও কোষ
হইতে অসি বহির্গত করিলেন । এমত সময়ে
হুমায়ুন পুনরায় একটু হাসিয়া বলিলেন,
“বুঝিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখনও আমা-
দিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এই জন্য আমা-
দিগের নিকট বিদ্রোহ-মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে

চাহেন না। কিন্তু আমাদিগের নিকট মরণা উপ করিবার আরম্ভক নাই; আপনি এ কর্ণে নিযুক্ত হইবার পূর্বাধি আমরা বিদ্রো-
হোদ্ভব। এই দেখুন, বিদ্রোহীদিগের নিকট হইতে আমরা সরেকথানি পত্র পাইরাছি।”

ইন্দ্রনাথ ক্রোধে ও বিশ্বাসে অন্ধ হই-
লেন; বলিলেন, “পায়র মুসলমান। কাপুরুষ
বিদ্রোহী! তোমাদের পাপের সমুচিত
দণ্ড দিব।”

হুমায়ুন ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে অসিযুদ্ধ
আরম্ভ হইল। ইন্দ্রনাথ হুমায়ুন অপেক্ষা
অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন ও অল্পদিন মধ্যে চমৎ-
কার অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন।
মুহুর্তমধ্যে হুমায়ুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল,
মুহুর্তমধ্যে হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইলেন।

যখন প্রথমে ইন্দ্রনাথ ও হুমায়ুনের সহিত
যুদ্ধ হয়, তখন তর্ধান কিছু দূরে দণ্ডায়মান
ছিলেন। প্রথমেই যুদ্ধ একদম ভয়ঙ্কর বেগে
আরম্ভ হইয়াছিল যে, তর্ধান ইতিকর্ন্তব্য-
বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন; কিন্তু সে
কেবল মুহুর্তের জন্য। যখন দেখিলেন, হুমা-
য়ুন ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তখন একে-
বারে লক্ষ দিয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ
করিলেন।

ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ
করিতে করিতে হুমায়ুন উঠিয়া পুনরায় অসি-
হস্ত হইলেন। সুতরাং দুই জনে একেবারে
ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন।

এবার ইন্দ্রনাথের বিষম সঙ্কট উপস্থিত।
দুই জনের সহিত এক জনের অসি-যুদ্ধ সম্ভবে
না; বিশেষতঃ তর্ধান ও হুমায়ুন অসি-
চালনে নিত্য অপটু ছিলেন না। কেবল
হুমায়ুনের কাতরতা ও রজনীর অন্ধকার
বশতই কিছুক্ষণের জন্য তাহার প্রাণরক্ষার
সম্ভাবনা।

হুমায়ুন ক্রমে অবসন্ন-শরীর হইলেন;
তর্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করি-
লেন। তর্ধান সেই অবসরে সতেজে আক্র-
মণ করিলেন। দুই জনের সমরকালীন আক্র-
মণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য
ইন্দ্রনাথ হঠাৎ পশ্চাৎ বাইবার মানস করি-
লেন। তখন তিনি গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান
ছিলেন, লক্ষ দিয়া যেই পশ্চাতে বাইবেন,
অমনি গঙ্গাসলিলে নিপতিত হইলেন।
“মাতঃ পৃথিবী! এই দিগ্গালে তুমিও
স্থান দিলে না?” এইরূপ মনে ভাবিতে
ভাবিতে গঙ্গাসলিলে মগ্ন হইলেন। তর্ধান
ও হুমায়ুন ইন্দ্রনাথের মৃত্যু স্থির করিয়া
আপস কাব্যে প্রস্থান করিলেন।

হুমায়ুন ও তর্ধান বাহা ভাবিয়াছিলেন,
তাহা বড় মিথ্যা নহে; ইন্দ্রনাথ যেরূপ আহত
হইয়াছিলেন, তাহাতে উত্থানশক্তি ছিল
না। সম্ভরণ করা দূরে থাক, উচ্চ পাড়
হইতে পড়িয়া তিনি একেবারে চেতন হই-
লেন। ভাগ্যক্রমে নিকটবর্তী একখানি
নৌকা বাধা ছিল এবং সেই নৌকা একজন
ভ্রলোক জাগরিত ছিলেন। মৃৎক জলে
পড়িতে দেখিয়া তিনিও মালাগণকে জলে
নামাইয়া মৃতপ্রায় ইন্দ্রনাথের প্রাণ বাঁচাই-
লেন। মালাগণ ঘরে ঘরে ইন্দ্রনাথকে
নৌকার দিকে লইয়া চলিল; শেষে ইন্দ্র-
নাথকে নৌকার তুলিল।

যিনি মালাদিগকে উঠাইয়া ইন্দ্রনাথের
প্রাণ বাঁচায়াছেন, তিনি রমণী। অতিশয়
বস্ত্রসহকারে ইন্দ্রনাথের শরীর ধোত করিয়া
ছিলেন, তাহার পর সেই অস্রাবাতগুলি একে
একে সিক্ত বস্ত্রের দ্বারা বঁধিতে লাগিলেন;
দেখিলেন, যদিও অনেক স্থানে ক্ষত হইয়াছে,
তথাপি কোন ক্ষতই গভীর বা সাংঘাতিক
নহে। তাহার স্পষ্ট বোধ হইল, সমস্ত

রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইলে প্রাতঃকালে শরীরে অধিক বেদনা থাকিবে না ।

সমস্ত রাত্রি ইন্দ্রনাথের উত্তম নিদ্রা হইল । প্রাতঃকালে চতুঃকলীন করিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, পার্শ্বে এক পরমা সুন্দরী রমণী বসিয়া রহিয়াছেন । ইন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন, তিনি এই সুন্দরীকে পূর্বে দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন না ;—বলিলেন, “ভগ্নে! আপনি আমাকে প্রাণ দিয়াছেন, আপনি বোধ হয়, আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । আপনি কে? কি করিলে এ ধন শোধ করিতে পারিব? আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন, জানিলে রাজা টোডরমল্ল কিছুই দিতে অস্বীকৃত হইবেন না ।”

রমণী অনেকক্ষণ উত্তর দিলেন না ; ইন্দ্রনাথ বার বার প্রশ্ন করাতে অবশেষে বলিলেন, “সৈনিকবর! আমাকে কি ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছেন?”

সে কোকিলনির্মিত কণ্ঠধ্বনি ইন্দ্রনাথ এখনও তুলেন নাই ; উষ্ম হইয়া বলিলেন, “রমণীরত্ন! আমি জীবিত থাকিতে আপনাকে বিস্মৃত হইব না । আপনি কিরূপে এ স্থানে আসিলেন? মহেশ্বর-মন্দির কত দিন ত্যাগ করিয়াছেন?”

সেই নোকাবাসিনী রমণী বিমলা । ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিয়াছিলেন, অতঃপর এই স্থানে এই অবস্থায় দেখিয়া বিস্মৃত হইলেন । ইন্দ্রনাথের বিস্ময় দোষরা বিমলা এ রুটু হাসিলেন, অবগুষ্ঠন টানিয়া ধীরে ধীরে আহত সৈনিকের গুহ্বরা করিতে লাগিলেন ।

ইন্দ্রনাথ অনেক স্থানে আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু আঘাত গুরুতর নহে । বিমলা যত্নসহকারে আঘাতগুলিতে বস্ত্র বারিয়া

দিলেন । তৎপরে ইন্দ্রনাথ প্রস্থান করিবার উদ্ভোগ করিলেন ।

বাইবার সময় ইন্দ্রনাথ সেই রমণীকে শত-বার ধন্যবাদ দিলেন এবং কৌনরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিতে বার বার অনুরোধ করিলেন ।

বিমলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে সজল-নয়নে উত্তর করিলেন, “সৈনিক-বর! প্রভু! মহেশ্বর-মন্দিরে আপনার নিকট একটি ডিঙ্কা করিয়াছি—সতীশচন্দ্রের রক্ষা । তাহাই আমাকে পুরস্কারস্বরূপ দান করুন ।”

ইন্দ্রনাথ । কিন্তু সে ডিঙ্কা নহে, সতীশচন্দ্র যদি নির্দোষী হন, তবে তাঁহাকে রক্ষা করা মহাব্যায়াজেরই কর্তব্য । আমি আপনার আর কি করিতে পারি, আদেশ করুন, আমি পালন করিতে প্রতিকৃত হইতেছি ।

বিমলা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার দ্বিতীয় ডিঙ্কা এই—আপনি আমাকে মহেশ্বরমন্দিরে দেখিয়াছেন, মুষ্ণেরও দেখিলেন, এ কথা, বিস্মৃত হউন ।”

ইন্দ্রনাথ বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, “আপনি আজ আমাকে জীবনদান করিলেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না । আপনার এ বাচঞা কি জন্ত?”

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমি ব্রাহ্মণকুমারী, অতঃপর আপনার স্মরণপথে থাকিবার অযোগ্য । সরলা আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতঃপর অজ্ঞ নারী আপনার স্মরণপথে থাকিবার অযোগ্য ।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কমলা।

As in the bosom o' the stream,
The moon-beam dwells at dewy e'en
So trembling, pure was tender love,
Within the breast o' bonnie Jean,
And now she works her namies work,
And aye she sighs with care and pain,
Ye wist and what her ail might be,
Or what was make her weel again,
Burna.

বিমলা কি অল্প মুহুর্তে গমন করিয়া-
ছিলেন, জানিতে পাঠক মহাশয় উৎসুক হই-
বেন, কিন্তু সে কথা বলিতে হইলে আমাদের
তাহারও পূর্বকথা লইয়া আরম্ভ করিতে হয়।
সুতরাং ইচ্ছানাথ যে মন্দিরে সরলাকে রাখিয়া
আসিয়াছিলেন, সেই মন্দিরের কথা লইয়া
আমরা আরম্ভ করিব।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছামতীতীরস্থ
মহেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে একটি গ্রাম
ছিল, নাম বনগ্রাম। মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্র-
শেখর প্রায়ই দেবালয়ে থাকেন, কিন্তু মধো
নুধো এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে
ভালবাসিতেন।

দেবালয়ের মোহান্ত সচরাচর বেক্রপ
স্বার্থপর ও বিষয়লুপ্ত হইয়া থাকেন, চন্দ্রশেখর
সেইরূপ ছিলেন না। তিনি অতিশয় নির্মল-
চরিত্র ছিলেন ও অনেক অনাথা ব্রাহ্মণ ও
অনাথা ব্রাহ্মণীকে এই পল্লীগ্রামে রাখিয়া
ভাতাভার্য্য প্রায় ব্যবহার করিতেন। দেবা-
লয়ের কার্য্য অত্যন্ত বিধস্ত পূজকের হস্তে সম-
র্পণ করিয়া চন্দ্রশেখর আপন আশ্রিত কয়েক
ঘর লোক লইয়া এই গ্রামে উপাসনা করিতে
ভালবাসিতেন, আবার আবস্তক হইলে
স্বয়ংও মহেশ্বর-মন্দিরের কার্য্য করিতেন।

কমলানামী একটি অনাথা কারস্থ-কন্তাকে
পরিচারিকারূপে গৃহে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু
কন্তার ভার লালন-পালন করিতেন। চন্দ্র-
শেখর বেক্রপ নির্মলচরিত্র, সেইরূপ ধর্ম্মপরা-
য়ণ, তাঁহাকে দেখিলে পুরাকালের মুনিকবির
স্তায় বোধ হইত, তাঁহার গ্রামটিকেও তিনি
বর্ধাবধি পুরাকালের আশ্রমের স্তায় করিয়া
ভুলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শিষ্যগণ কথা-
জ্বলে তাঁহাকে কধমুনি এবং তাঁহার পালিতা
কমলাকে শঙ্করলা বলিত।

সায়ংকাল উপস্থিত। সেই সায়ংকালে
দুই জন নদীতীরে আসীন ছিলেন। তাঁহা-
দিগের মধ্যে একজন 'আমাদিগের পূর্বপরি-
চিত সরলা, অল্প কমলা।

কমলা অনেক দিন অবধি এই আশ্রমে
বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম উন-
বিংশ বৎসর মাত্র। তিনি কাহার দুহিতা,
কাহার বনিতা, তাঁহার স্বামীর কত দিন মৃত্যু
হইয়াছে, এ সকল কথা কেহ জানিতেন না,
জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ক্রন্দন করিতেন,
সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

কমলার স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া
আশ্রমবাসিগণ বিস্মিত হইতেন। কমলা
সততই শান্ত, অস্তমনস্কা ও চিন্তাশীলা। যে
স্থানে আশ্রমপাদপূজা অতিশয় নিবিড় ও
অন্ধকারময়, সে স্থানে মহুষ্যের শব্দমাত্র নাই,
মধ্যাহ্নকালে গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া কমলা
সেই নিভৃত স্থানে একাকী চিন্তা করিতে
ভালবাসিতেন, মধ্যাহ্নে অতি যত্ননিঃসৃত
পক্ষীর রব শুনিতে ভালবাসিতেন; যেখানে
আশ্রমক্ষেত্র পদপ্রক্ষালন করিয়া ইচ্ছামতী
কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইত, সন্ধ্যার সময়
কমলা সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে ভাল-
বাসিতেন; নদীর অনন্ত কুল কুল ধ্বনি
শুনিতে ভালবাসিতেন। সে অনন্ত ধ্বনি

তনিতে তনিতে কমলাকে অনন্ত চিন্তা করিতেন, সে চিন্তা কিসের?—কে বলিলে, কিসের? চন্দ্রশেখর কমলাকে আপন গৃহে রাখিয়াছিলেন, আপন কস্তার মত বহু করিতেন এবং গ্রামবাসিনী সকলেই কমলাকে ভালবাসিতেন এবং কমলার কথাবার্তার শ্রীত হইতেন। সে কথাবার্তা কি মধুর, কি ভাব-পরিপূর্ণ! শ্রোতার কর্ণে অমৃতবর্ণন করিত।

কমলা নিরুপম সুন্দরী। তাঁহার নয়ন দুটি অতিশয় শান্তভোতি ও চিন্তা-প্রকাশক, সমস্ত মুখখানি শান্ত ও গাঢ় চিন্তায় মগ্ন। দেহ অতি সুকুমার, বিধবার মলিন বস্ত্রে সে সুকুমার দেহ আবৃত করিয়া শৈবালবেষ্টিত পদ্মবৎ শোভা পাইত। কিন্তু সে প্রক্ষুটিত পদ্ম নহে, সারংকালের মৃদিতপ্রায় পদ্ম যেরূপ জলহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে, কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সেইরূপ সতত চিন্তায় মগ্ন, লোকালয়ে সেইরূপে মৃদিতপ্রায় হইয়া থাকিতেন। কমলা চন্দ্রশেখরকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, চন্দ্রশেখরের গৃহকার্য্য-সমাধা তিনিই নির্বাহ করিতেন, কার্য্যে অবসর পাইলেই আবার সেই নিভৃত নিবিড় পাদপার্বত স্থানে যাইতেন। শিখতিবাহন তাঁহাকে উপহাস করিয়া বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তদনুসারে আশ্রমের অনেকেই কমলাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত। ফলতঃ তিনি যেরূপ একাকী বনে বনে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই শান্ত পবিত্র ছায়া-বিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বোধ করা কিছুই বিচিত্র নহে।

অন্ত সন্ধ্যার সময় কমলা সরলাকে লইয়া বনবিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে দুই জনে নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন। কমলা

সরলাকে ভালবাসিতেন। সে সরলচিন্তা বালিকাকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? সরলাও কমলার তৎপরে তৎপরে প্রকাশ করিতেন, আপনাতঃ ক্রমে বিবৃত হইয়া সেই বিধবার হৃদয়ে স্থায়ী হইতেন। স্মরণীয় ক্রমশঃ তাঁহারিগের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিলেন, সরলার আবার তৎপরে কি? বালিকার হৃদয়ে চিন্তা কিসের? আমরা উত্তর করিব, সরলা আর বালিকা নাই, তাহার হৃদয়কোরকে প্রণয়-কীট প্রবেশ করিয়াছে।

যে দিন হঠাৎ ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সে দিন হইতে প্রণয় কাহাকে বলে, সরলা বুঝিল, চিন্তা কাহাকে বলে, বুঝিল। সরলা এখনও পূর্ব্বের জ্ঞান স্মরণ করিতে করিতে সততই আর এক জনের কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত, আর একখানি মুখ মনে পড়িত। এখনও সরলা পূর্ব্বের জ্ঞান পরিশ্রম করিত, কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত, লজ্জার অশ্রু মুছিয়া আবার কার্য্যে নিযুক্ত হইত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে চক্ষুঃ পরিপূর্ণ হইত, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে মুখখানি সিক্ত হইত।

চিন্তা কি? সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে পারিত না, কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি। “রুদ্রপুরে পূর্ণচন্দ্রালোকে যে দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, আবার কি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? বাঁহার কণ্ঠে লীলাক্রমে মালা পিতাম, তাহাকে কি আবার দেখিতে পাইব? যুদ্ধ হইতে ইন্দ্রনাথ

আবার কি কিরিয়া আসিবেন ?” এই চিন্তা করিতে করিতে সরলা কার্য-কৰ্ম তুলিয়া বাইত, চারিদিক শূন্য দেখিত, জ্ঞানচক্ষে সেই কল্পপুরের কুটার দেখিতে পাইত ; সেই কুটারের পাৰ্শ্বে সেই উজান—সে উজানে সেই পুষ্পচারা, উপরে পূর্ণচন্দ্র—সেই পুষ্প-চারামধ্যে সেই চঞ্জালোকে সেই হৃদয়ের ইচ্ছানাথ—সহসা নরনক্ষলে সরলার মুখখানি প্রাবিত হইয়া বাইত।

মন্দিরবাসীদিগের মধ্যে একজন যাত্র সরলার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। কমলা সরলাকে কখন কখন আপনার সঙ্গে নিম্নতর নদীকূলে অথবা সুস্বাদু ছায়াবৃত বৃক্ষতলে লইয়া যাইতেন এবং আপনার চিন্তার ভাগিনী করিতেন, সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন, ভগিনীর স্নায় ভালবাসিতেন। সরলা কমলার গল্প শুনিতে শুনিতে আপন হৃৎক তুলিয়া বাইত, কমলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন হৃৎক দূর করিত। যেরূপ জনশূন্য স্থানে যাইতে তাহার ভয় করিত, চিন্তাশীলা কমলার সঙ্গে সে সকল স্থানেও যাইত, যেরূপ গভীর ভাবময় চিন্তা তাহার বালিকা-হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, ভাবিনী কমলার নিকট তাহাও শুনিত। কলতঃ দুই জনে একত্র হইলে কমলা আপনার হৃদয়ের কবচ উন্মুক্ত করিয়া বালিকার নিকট নানারূপ গল্প করিতেন ও অন্তরের নানারূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। সরলা বালিকার মত একমনে সেই সমুদ্র শুনিত। সে ভাব তাহার বড় ভাল লাগিত, সে হৃদয়-গ্রাহী কথা শুনিতে শুনিতে আপন হৃৎকথা বিস্মৃত হইত।

আজি সন্ধ্যার সময় তাহারা দুই জনে নদীতীরে বসিয়া আছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—)*(—

কে বল দেখি ?

Manfred. Oblivioo, self-oblivion

Byron.

কমলা ডাকিলেন, “সরলা !”

সরলা উত্তর না করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তোমাকে এত শ্রান দেখিতেছি কেন ?”

সরলা মুখখানি নত করিল।

কমলা দেখিলেন, আজ হৃৎকবেগ প্রবল হইয়াছে। স্নেহসহকাৰে সরলার নিকট বসিয়া সরলার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “ভগিনি ! পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষাও হতভাগিনী আছে। তোমার রেহমত মাতা আছেন, জগৎসংসারে থাকিবার স্থান আছে, হৃদয়ের স্বর আঁবিত আছেন, তোমার আশাভরসা সকলই আছে ; পৃথিবীতে একজন হতভাগিনী আছে, বাহার কিছুমাত্র নাই, বাহার ভবিষ্যতের আশা নাই, অতীতের স্মৃতি নাই, কেবল অতুল চিন্তাঙ্কলে ভাসিতেছে।”

• সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল ;—বলিল, “দিদি, তোমার কথা ভাবিলে আমি আপন হৃৎক তুলিয়া বাই।”

কমলা। বিধাতা সহ্য করিবার জন্তই নারীজন্ম দিয়াছেন। পুরুষে বস সহ্য করিবে, আমরা তাহার দশ গুণ সহ্য করিব।

সরলা। যদি না পারি ?

কমলা। তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলে কেন ? দেখ, যজ্ঞবোয় মানসময় আছে, ধন-সম্পত্তি আছে, কৃষ্ণমাংস আছে, নামগৌরব আছে, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সহস্র

অবলম্বন আছে, সহস্র সুখের কারণ আছে, একটি না হইলে অষ্টটি অবলম্বন করিতে পারে, সেটি না পাইলে অপার একটি অলম্বন করিবে, সেই অলম্বনজনে জীবন যুগ্মবৎ অতিবাহিত হয়। চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, বত দিন চেষ্টা থাকে, বত দিন আশা থাকে, বত দিন জীবন ধূরহীন হয় না। আর আশা নাই কোন্ মহুযোর? যুবকের উচ্চাভিলাষ, মান সম্মান, ক্মতা ও খ্যাতিলাভে আকাঙ্ক্ষা; বৃদ্ধের ধন-কামনা, পুত্র-কামনা, বংশবৃদ্ধি-কামনা, সহস্র কামনা, সহস্র আকাঙ্ক্ষার জীবন অতিবাহিত হয়। আর অভাগিনী নারীকুলের কি আছে?

কমলা কণেক নিমন্ত হইলেন, সরলার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সরলা একাগ্র-চিত্তে শুনিতেছে আর তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন আবার বলিতে লাগিলেন, “অভাগিনী নারীকুলের কি আছে? সংসারস্বরূপ অপার সমুদ্রে তাহা-দিগের একটিমাত্র ক্ষুদ্র তরী আছে, সেটি ভালবাসা। সেই ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপার সংসারে আইসে। যদি সেই তরীটি ডুবি, তবে নারীর আর অবলম্বন নাই, আর সুখের কারণ নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই, অতল জলে মৃত্যু ভিন্ন আর উপার নাই।”

সরলা বলিল, “আমার বোধ হয়, দিদি, তুমি বড় দুঃখিনী, তোমার দুঃখকথা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।”

কমলা উত্তর করিলেন, “তথাপি সরলা, আমি দুঃখিনী নহি। চিত্তাই আমার জীবন-স্বরূপ হইয়াছে। এই যে গলিত বৃক্ষপত্রের মর্দন শব্দ শুনিতে পাইতেছি, মধ্যাহ্নে যখন এই বৃক্ষতলে বসিয়া এই মর্দনশব্দ শ্রবণ করি, তখন আমার হৃদয় শান্তিরূপে পরিপূরিত

হইতে থাকে; এই যে আকাশে খণ্ড-খণ্ড শুভ্র মেঘের ভিত্তর দিয়া চন্দ্র বাইতেছে দেখিতেছি, কণেক মাত্র দীর্ঘ অন্ধকার করিয়া আবার পরিষ্কার নীল গগনমণ্ডলে বাহির হইয়া আপন কোমলতা বিস্তার করিতেছে, এই চন্দ্র ও আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি নিরুপম শান্তিলাভ করি। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে অনন্ত ভাবের উদ্বেগ হয়, তাহাতেই আমার সুখ। সরলা, আমি দুঃখিনী নহি।”

সরলা কণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল, “দিদি, তোমার পূর্বকথা জানিতে আমার ইচ্ছা করে।”

কমলা বলিলেন, “সরলা, তুমিও আমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আশ্রম-বাসীদিগের নিকট আমি কিছুই বলি না, কিন্তু ভগিনি! তোমার নিকট আমার লুকাইবার কিছুই নাই। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আমার জীবন কোন অপকল্প মোহ-জালে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ভেদ করিতে পারি না—আমার পূর্বকথা কিছু-মাত্র স্মরণ নাই।”

সরলা আশ্চর্য হইল, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “কিছু মনে নাই? দিদি, তোমাদের বাড়ী কোথায়?”

কমলা। পশ্চিমদেশে; গ্রামের নাম স্মরণ নাই।

সরলা। তোমার পিতার নাম কি?

কমলা। আমি শৈশব হইতে অনাথা।

সরলা। তোমার স্বামীর নাম কি ছিল?

কমলা। নাম স্মরণ নাই। কেবল সে দেবমূর্তি হৃদয়ে আগরিত রহিয়াছে।

সরলা। দিদি, তুমি অকালে বিবাহ হইলে কিরূপে?

কমলা। একটা কি মহাবিপদে তাহাকে

হারাই। তাহার পর আমার ভরকর পীড়া হয়, তদবধি এই শবিত্র মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছি।

কমলা কণেক পর বলিতে লাগিলেন, “আমার কেবল এইমাত্র স্মরণ আছে যে, কিছুদিন পীড়ায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, স্বপ্নে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলাম। সেই পীড়ার সময় স্বপ্নেও স্বামীর দেবমূর্তি দেখিতাম। বোধ হইত ঘেন, অপরিণীত নীলাকাশের মধ্যে চন্দ্র-করোজ্জ্বল একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডে সেই দেব-মূর্তি বসিয়া রহিয়াছেন। এখনও আকাশের দিকে চাহিলে তাঁহাকেই দেখিতে পাই।”

কমলা আরও বলিতে লাগিলেন, “যখন আমি ধোর পীড়া সহ করিতেছিলাম, তখন সকল লোকই স্থির করিল-যে, আমি আর বাঁচিব না। পিতা চন্দ্রশেখর সে সময়ে তীর্থপর্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হন। পিতার দরায় শরীর, তিনিই আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় বিধবাকে পিতা আশ্রয়দান করিয়া আপন নৌকায় তুলিলেন। তখনও আমার ধোর পীড়া, গ্রামের সকলেই স্থির করিল যে, নৌকাতেই আমার মৃত্যু হইবে। অনেক দিন জলপথে আসিতে লাগিলাম, নদীর স্বাস্থ্যজনক বায়ুতে আর পিতার যত্নে আমি পুনরায় আরোগ্যলাভ করিলাম। কিছু দিন পরেই নৌকা আসিয়া এই বন্দরের ঘাটে লাগিল, সেই অবধি আমি পিতার গৃহেই রহিয়াছি।”

শুনিতে শুনিতে সরলায় চকুতে জল আসিল। সরলা ধীরে ধীরে কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণপূর্বক বলিল, “দিদি, আমি আর নিজের জন্ত দুঃখ করিব না,

তোমার দুঃখকথা শুনিয়া আমি নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি।”

তুই জনে অনেককণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে একজন লোক আসিয়া সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “কে বল দেখি?”

সরলা সে স্বর চিনিত, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল না, একে একে বনগ্রামবাসিনীদিগের নাম করিতে লাগিল।

“নিজারিণী”—চক্ষু হইতে হস্ত উঠিল না।

“মনোমোহিনী”—তথাপি হস্ত উঠিল না।

“যোগেন্দ্রমোহিনী”—তবু হইল না।

“তারা”

“তোমার মাথা, আমাকে ইহার মধ্যেই ভুলেছি? তবু এখনও বিবাহ হয় নাই।” না জানি বিবাহের জল গায়ে লাগিলে কি হইবে।—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলার প্রিয়সই অমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরলার বিশ্বয়ের সীমা থাকিল না—“সই—এখানে?—কবে আসিলে?” বাম্পপরিপূর্ণ-লোচনে সরলা অমলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার বকে আপন মুখ লুকাইল। অমলাও যখন অনেক দিন পরে সেই প্রেমপুতলাটিকে জ্বরে স্থান দিল, তখন তাহার চক্ষুও শুক ছিল না।

কণেক পর অমলা বলিল, “এই দুই প্রহর রাজিতে এই অন্ধকারে এখানে বসিয়া আছ? আমি যে তোমার জন্ত কত অশেষণ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।”

সরলা। এখানে কমলাদিগের সহিত আসিয়াছি, কথায় কথায় রাজি অধিক হইয়াছে। সই, তুমি অন্ধ আসিলে?

অমলা। হাঁ, আমি আজই আসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্ত কত দিন আসিব

আসিব মনে করি, তা 'বুদ্ধবানী' কি আমাকে
ছাড়ে ? আজ কত করিয়া তবে আসিলাম ।

রাত্রি ত্রিপ্রহরের সময় তিন জন আশ্রমে
কিরিয়া আসিল ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

ইচ্ছাপুরের জমিদার ।

BUT I have woes of other kind.
Trouble and sorrows more severe.
Give me to ease my tortured mind.
Lend to my woes a patient ear.

Crabbe,

চন্দ্রশেখর ও শিখণ্ডিবাহন ভিন্ন সে গ্রামে
আর কেহই মহাশেখতার প্রকৃত পরিচয় জানি-
তেন না । তাঁহারও এ কথা কাহারও নিকট
প্রকাশ করিবেন না, বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত
ছিলেন ।

মন্দিরের শান্ত ঘেষবিঘেষশূন্য নিবাসি-
গণের সহিত একত্র বাস করিতে করিতে
মহাশেখতার অন্তঃকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে
শান্ত হইয়া আসিয়াছিল । কিন্তু সে বয়সে
স্বভাবের পরিবর্তন কখনই হয় না । মহা-
শেখতার বিজাতীয় মান ও জিঘাংসা অন্তরে
সেইরূপ জাগরিত ছিল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া
তিনি সেইরূপই প্রতি রাত্রে বৈরনির্গাতনের
কৃত্ত শিবপূজা করিতেন ।

চন্দ্রশেখরের কুটারে অল্প একজন অতি-
সমুদ্রিশালী অতিথি আসিয়াছেন বলিয়া
অনেকেই খাওয়া দাওয়া সাজ হইলে তথায়
থাইয়া সমবেত হইলেন । গৃহের মধ্যস্থানে
চন্দ্রশেখর বসিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার বয়-
ক্রম পঞ্চাশ বর্ষেরও অধিক হইয়াছে । কিন্তু
দিন দিন মন্দিরের শান্ত দেবকার্য্য নিরীহ
করিয়াই হটক বা মানসিক শান্তি বশতই

হটক, তাঁহার প্রশস্ত লগাটে একটিমাত্র
বার্জিকা-চিহ্ন নাই । নরম ছুটি জ্যোতিঃপূর্ণ,
সমস্ত শরীর তেজঃপূর্ণ, সেই শরীরের উপর
বজ্রোপবীত লিখিত রহিয়াছে । তাঁহার
দক্ষিণপার্শ্বে সেই সমুদ্রিশালী অতিথি বসিয়া
আছেন, তাঁহারও বয়ঃক্রম চন্দ্রশেখরের
সহিত সমান হইবে, কিন্তু সংসার-চিন্তার ও
পার্থিব দুঃখে তাঁহার শরীর লীর্ণ করিয়াছে ।
মস্তকের কেশ অধিকাংশ শুক্ল হইয়াছে, অঙ্গুগ-
লের কেশও দুই একটি শুভ্রবর্ণ হইয়াছে ।
চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই, বদনমণ্ডলে কান্তি
নাই, বিশাল শরীরে এক্ষণে আর বল
নাই । তাঁহাদিগের দুই জনকে দোঁধলে
সংসার ও সংসারচিন্তার অকক্ষিংকারিতা ও
পুণ্যবলের মহিমা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । এই
সমুদ্রিশালী অতিথি পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত
অপরিচিত নহেন ; ইনি ইচ্ছাপুরের জমিদার
নগেন্দ্রনাথ ।

সেই দুই জনের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাতে
অনেক মন্দিরবাসী উপবেশন করিয়া রহিয়া-
ছেন । চন্দ্রশেখরের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ
অন্ধকারে মহাশেখতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া
বসিয়া রহিয়াছেন । তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডি-
বাহন বসিয়া রহিয়াছেন ; মুহূর্ত্ত কি কথা
কহিতেছেন, এক একবার নগেন্দ্রনাথের
দিকে লক্ষ্য করিতেছেন । চন্দ্রশেখরের বাম-
হস্তের নিকট কমলা বিনীতভাবে বসিয়া কি
চিন্তা করিতেছেন । কুটারের একপার্শ্বে
অমলা ও সরলা বসিয়া রহিয়াছে ; আজ
তাঁহাদিগের আনন্দ অপার, তাঁহাদিগের গল্প
শেষ হইতেছে না, তাঁহাদিগের স্মৃতি ওষ্ঠে
সুহাসি শুকাইবার সময় পাইতেছে না ।
অপর একটি পার্শ্বে নিম্ভারিণী, মনোমোহিনী,
যোগেন্দ্রমোহিনী ও তারাসুন্দরী প্রভৃতি অল্প-
বয়স্ক ব্রহ্মণ্যকন্যাগণ আয়োদ ও রহস্ত করি-

ভেদে । আমার এক একবার নিম্ন হইয়া
চন্দ্রশেখর ও নগেন্দ্রনাথের কথা ভাবিতেছে ।

নগেন্দ্রনাথ ঐকনিধান পরিভ্রমণ করিয়া
চন্দ্রশেখরকে দেখা করিয়া বলিলেন, “মহাশয়!
আমি আপনায় বিস্তীর্ণ বহুবর-বস্ত্র দেখিয়া
অস্থির হইত হইলাম । বহি-মোহনর সংসার
ভ্রম করিয়া আপনায় মত এই ধর্মপথ অব-
লম্বন করিতাম । তাহা হইলে এই বার্ককে
আমি অসীম দুঃখসাগরে ডাসিতাম না ।”

চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, “মহাশয়,
কেবল কি মন্দিরেই পুণ্যার্থ সম্ভবে?
শাস্ত্রে বলে, সত্য ও পরোপকারিতায় মত
পুণ্য বাগবত্তে তত নাই । বে জমিদার
পরোপকারিতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্ত সর্ব-
ত্রই সমাদৃত, তাহার কি মন্দিরবাসের জন্ত
আক্ষেপ উচিত ?”

নগে । মহাশয়! আপনি আমাকে অতি-
শয় সম্মান করিলেন, আমি সে সম্মানের
যোগ্য নহি । বহি-মোহন হইতাম, তবে আজ
পাপপ্রশমনার্থ মহাত্মা চন্দ্রশেখরের নিকট
আসিতাম না ।

চন্দ্র । এ জগতে সহস্র গুণ সম্বন্ধে কে
মহাপাপী নহে? কে বলিতে পারে, আমি
পাপ করি নাই? কে বলিতে পারে, আমি
নিষ্কল, নিরপরাধী ?

দুই জনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন
করিতে লাগিলেন । অবশেষে নগেন্দ্রনাথ
আপনার আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন ।

—*—

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

জমিদারের পূর্বকথা ।

AND let me if I may not find
A friend to help, find one to hear.

Orabbe.

নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়!
আমার মত দুঃখী আর কেহই নাই, আমার
দুঃখকথা শ্রবণ করুন ।

আমার সহধর্মিণী আমাকে বলিতেন যে,
যে দিন তাহার জন্ম হয়, সে দিন আকাশে
অপরূপ তিথি নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল ! ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিত গণিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুকল্পা
ঘোর উন্মাদিনী হইবেন । সে ভ্রম, আমার
সহধর্মিণী উন্মাদিনী হন নাই ; কিন্তু তাহার
কতকগুলি মনোবৃত্তি অতিশয় বেগবতী ছিল,
সে জন্ত আমি তাহাকে পাগলিনী বলিতাম ।
আজি ষাটবর্ষ হইল, সে স্নেহময়ী পাগলি-
নীর কাল হইয়াছে ।

পাগলিনীর গর্ভে আমার দুইটি পুত্র
জন্মে । দুই জনই তাহাদের গর্ভধারিণীর মত
পাগল । জ্যেষ্ঠটি চিন্তায় পাগল, কনিষ্ঠটি
কাজকর্মে পাগল । সে দুইটি পুত্র আমার
দুইটি নয়নের তারা ছিল । আজ তাহার
কোথায় ? হায়, দারুণ বিধি ! বার্ককে কি
আমার কপালে এই লিখিয়াছিলে ? আমার
দুইটি নয়নই গিয়াছে, আমি অন্ধ হইয়াছি ।
দুইটি রক্ত হারাইয়া আমি কালানী হইয়াছি ।”

সে দুঃখবচনে সকলেরই হৃদয় জ্বলিত
হইল । কথেক পরে নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগি-
লেন, “আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অল্পবয়সে ব্যাঘ্রে
লইয়া যায় । তাহারই শোকে তাহার মাতা
কালগ্রাসে পতিত হয় । কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র-
নাথের মুখ চাহিয়া আমি সে শোক সহ

করিয়াছিলাম। আহা! সেজন্য বীরপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই। বরা-বরে, বিজা-লোচনার, বল ও বিক্রমে সুরেন্দ্রনাথের মত কে ছিল? বৎস নবীন-বরসে সিংহরাজ ধারণ করিত, মল্লযুদ্ধে পাণ্ডোরামসিংহকে পরাস্ত করিত, বাহুবলে সকলকে বিম্বিত করিত, অরচালনার তাহার সমকক্ষ এ দেশে কাহা-কেও দেখি নাই। যে দেখিত, সুরেন্দ্রনাথকে হারার দাতা কর্তৃক বলিত, বলবিক্রমে ভীমা-বভার বলিত। বালক বাল্যকালেই রাজা সমরসিংহের নিকট বৃদ্ধবার্তা শুনিতে ভাল-বাসিত, শুনিতে শুনিতে বালকের মুখ গভীর হইত নয়নময় প্রজলিত হইত। শিশু সমর-সিংহের খড়্গ ধারণ করিত ও ‘যুদ্ধে বাই’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত। রাজা সমরসিংহ অশ্রুপূর্ণলোচনে বালককে চুম্বন করিতেন। বাল্যকালেই তাহাকে রাজা সমরসিংহ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে লইয়া বাইতেন। রাজা সর্বদাই বলি-তেন, ‘পাঠানেরা বাঙ্গালীকে ভীরা বলিয়া ভৎসনা করে, কিন্তু সেই বাঙ্গালীর মধ্যেও মধ্যে মধ্যে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ! আমি মরিলে তুমি আমার তর-বারি লইবে, তোমার হস্তে এ খড়্গের অপ-মান হইবে না।’ আজি সে সুরেন্দ্র কোথায়? বিধাতা: ! এক্ষণে আর কে আছে, বাহার মুখ চাহিয়া আমি সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ করিব?”

বৃদ্ধ একটি অশ্রুবিম্ব ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রশেখর শোকার্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুরেন্দ্রনাথের কোন অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়াছেন?”

মৃগেন্দ্রনাথ। আহা, যদি শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে আর এতক্ষণ জীবিত থাকি-তাম না।

চন্দ্র। তবে এত চিন্তিত হইতেছেন

কেন? সুরেন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন, উভয়-ইচ্ছায় অবশ্যই দূশদে প্রজাবর্তন করিবেন।

মৃগে। আশীর্বাদ করুন, যেন তাহাই হয়। কিন্তু আমি কল্যাণপ্রাপ্তিযোগে অস্তি-শয় হুৎত দেখিয়াছি, সেই অস্তই ব্যাধুল হইয়াছি, সেই অস্তই আপনাদের নিকট আসি-য়াছি। ঘোড় হইল যেন, তরুর তরঙ্গরাশির মধ্যে আমার পুত্রকে দেখিলাম, যেন সে তরঙ্গরাশিতে আমার দেবতুল্য পুত্র সিময় হইতেছে, দূরদেশে উপায়হীন বদ্ধহীন হইয়া নিময় হইতেছে। প্রভু! এ যন্ত্রের অর্থ করিয়া দিন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটয়া থাকে, তবে আমি এইক্ষেণে প্রাণত্যাগ করিব।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “শাস্ত হউন। ভগ-বান্ আপনাদের বীর পুত্রকে রক্ষা করিবেন, পুণ্যাত্মা প্রজাবৎসল জমীদারকে বৃদ্ধবরসে পুত্রহীন করিবেন না।”

মৃগেন্দ্রনাথ সজলনয়নে উত্তর করিলেন, “প্রভু! আমাকে পুণ্যাত্মা বলিবেন না, আমি বহুপাপে কলঙ্কিত। যদি রুচি হয়, যদি আমার প্রতি আপনাদের অহুগ্রহ হয়, আমার পাপকথা শ্রবণ করুন, তৎপরে উপায় বিধান করুন।

যখন আমার সুরেন্দ্রনাথের বয়স্ক্রম দ্বাদশ বর্ষ, তখন আমি সপুত্রে রাজা সমর-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আপনি জানেন, রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশীর কার্যে জমীদারদিগের শিরোরত্ন ছিলেন এবং আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন। একদিন আমরা দুইজনে কথা বলিতেছি, আমাদের পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ আর সমর-সংহের একমাত্র দ্বিহিতা ক্রীড়া করিতে-ছিল। ক্রীড়াফলে সেই দ্বিহিতা একটি পুশ-লাইয়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া

দিল। রাজা কস্তাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল-
বাসিতেন, কস্তার এই কার্যটি দেখিয়া
আনন্দে ভীষ্ম চকুতে জল আসিল;
আমাকে বলিলেন, “নগেন্দ্রনাথ, অনেক
বাকপুত্রের সহিত আমার এই কস্তাব সম্বন্ধ
হইতেছে, কিন্তু কস্তা বাহাকে আপনি বরণ
করিয়াছে, তাহারই সহিত আমি উহার
বিবাহ দিব।” আমার আনন্দের পরিসীমা
রহিল না, বন্ধুচুম্বন রাজা সমরসিংহ এক-
মাত্র হৃদিতাকে যে এই অক্লিষ্টকর জমী-
দারের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহা
আমার সৌভাগ্য, সেই দিনই আমরা অঙ্গী-
কারে বদ্ধ হইলাম, সে অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ
করিয়াছি।”

মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে
তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহার
শরীর কটকিত হইতেছিল। তিনি নগেন্দ্র-
নাথের মুখে এই কথা শুনিবার জন্ত তথায়
বসিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,
“আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। সমর-
সিংহের মৃত্যুর পর আমি নিরাশ্রয় বিধবার
কস্তার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে
অসম্মত হইলাম। তখন আমি অস্ত্র সম্বন্ধ
হির করিতে লাগিলাম। বঙ্গদেশে সমৃদ্ধি-
শালী কায়স্থ জমীদারের অভাব নাই, ইচ্ছা-
পূরে জমীদারকুলের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে
কেহই বিমুখ নহেন, নীষ্মই উপযুক্ত পাত্রী
পাইলাম। কিন্তু যদিও আমি অঙ্গীকারভঙ্গে
তৎপর হইরাছিলাম, আমার ধর্মপরায়ে পুত্র
তাঁহাতে অসম্মত হইল। একদিন আমাকে
বলিল, ‘পিতা, আমি আপনার কোন কথার
অবাধ্য হইতে পারি না, একটি বিষয়ে
আমাকে কমা করিবেন, আপনি রাজা সমর-
সিংহের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,

তাহা ভঙ্গ করিতে দিব না।’ পুত্রের এই
বথার্থ কথার আমি রুষ্ট হইলাম, তৎক্ষণাৎ
নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহের দিন স্থির
করিলাম, বলপূর্বক তাহার সহিত স্বরেন্দ্র
নাথের বিবাহ দিবার উপক্রম করিলাম।
কিন্তু আমার পুত্রের কথাই রহিল, আমার
পুত্র গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন
করিল, তাহাকে সেই অবধি আর দেখি নাই।”

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,
“সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি, সেই জন্ত
এই বৃদ্ধবয়সে আমার এই বাতনা। কোথার
এই বয়সে আমার অধিনীকুমারের স্মার দুই
পুত্র আমার হস্ত হইতে জমীদারীর ভার
লইবে, কোথার চন্দ্রাননা পুত্রবধূর বৃদ্ধ
ঋতুরের সেবা-শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া
আমান পুত্র নাই, পুত্রবধূ নাই, মেহময়ী
সহধর্মিণী নাই, আমি অগাধ সমুদ্রে ভাসি-
তেছি। প্রভু! আমার স্মার হতভাগ্য এ
তিন সংসারে আর কে আছে?”

এই কথা শাঙ্গ করিয়া, দুই হস্তে চক্ষু
আবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে
লাগিলেন, সে রোদন শুনিয়া সকলের হৃদয়
বিগলিত হইল। চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ
শাঙ্গনা করার অবশেষে বৃদ্ধ শাঙ্গলাভ
করিলেন।

তৎপরে শিখণ্ডিবাহন নগেন্দ্রনাথকে
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া
বদি অন্তায় করিয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা
পুনরায় পালন করিতে যত্নবান হউন।”

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন, “শিখণ্ডিবাহন!
আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব, রাজা সমর-
সিংহের অনাথা হৃদিতাকে আনিয়া দাও,
আমার স্বরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিব।
আর আমার পূর্ববৎ গর্ভ নাই, পূর্ববৎ
অজ্ঞান নাই, এবার বদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

করি, তাহা হইলে যেন আমি আর পুত্রের
মুখ কখন না দেখিতে পাই। ইহা অপেক্ষা
অভিশাপ আমি আর জানি না।”

শিখণ্ডিবাহন কোন উত্তর না করিয়া
মহাযেতাের সহিত পুনরায় কথা কহিতেলাসি-
লেন। সে কি কথা হইতেছিল, পাঠকমহাশয়
অন্যরাসে অনুভব করিতে পারিবেন।

শিখণ্ডিবাহন বলিতেছিলেন, “ভগিনি !
আর বিলম্বে কাজ কি ? আপনার পরিচর

মহাযেতা উত্তর করিলেন, “যদি বিধাতা
আমাদিগকে পূৰ্ব্বমত উন্নতিসম্পন্ন না করেন,
তাহা হইলে এ জন্মে পরিচর দিব না, এ
জন্মে কস্তার বিবাহ দিব না।”

শিখণ্ডি। কেন ?

মহাযেতা। পরের নিকট অন্নগ্রহ গ্রহণ
করা আমার স্বামীর রীতি ছিল না। তিনি
অপরকে অন্নগ্রহ বিতরণ করিতেন, কাহা-
রও নিকট অন্নগ্রহ গ্রহণ করিতেন না।

শিখণ্ডি। তবে আপনি আমাকে নগেজ-
নাথের নিকট প্রতিজ্ঞাপালনের প্রস্তাব
করিতে বলিলেন কেন ?

মহাযেতা। এ অবস্থার উনি প্রতিজ্ঞা-
পালনে সম্মত আছেন কি না, দেখিবার
জন্ত, আমি সম্মত নহি।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

বনগ্রাম-ত্যাগ ।

All prevailing foe !

I curse thee ! let suffering curse

Clasp thee, his toriurer, like-remerae.

Shelley

কুটীরে বাহারী আগিরাচিলেন, একে
একে তাঁহারা সকলেই প্রায় উঠিয়া পেলেন।

ব্রাহ্মণস্বামী ও ব্রাহ্মণকস্তাপণ সকলেই আপন
আপন ঘূহে গমন ককরিলেন। মহাযেতা
এখনও বসিয়া ছিলেন, আর অমলা প্রিয়-
সখীর মতক আপন কলরে বারণ করিয়া
বসিয়াছিল। অমলা এককণ কি জন্ত বসিয়া-
ছিল, পাঠক মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করেন
অমলা জাহিতেছে, “জমীদার মহাশয়ের
পুত্র বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া পিতার
গৃহত্যাগ করিয়াছেন, জমীদার মহাশয় এই-
রূপ বলিতেছেন ; হরি। হরি। যদি ইচ্ছা-
নাথ এই জমীদার মহাশয়ের পুত্র না হয়,
তবে আমি কৈবর্তের মেয়ে নহি। মন, স্থির
হও, পিতা বাহাকে বিবাহ করিতে বলে,
তাহাকে বিবাহ করিবে না, সময়সিংহের
মেয়েকে বিবাহ করিবে, সময়সিংহের বিধবা
একণে নিরাজস্র, ছদ্মবেশে আছেন, তাঁহার
মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্ত পাগল হই-
য়াছেন ; হরি ! হরি ! আমার সই কি সময়-
সিংহের কস্তা ? মহাযেতাকে দেখিলেও
রাজরাণীর মত বোধ হয়, সান্নিধ্য কীর্ত্তি-
বার মত বোধ হয় না, কাহারও সফিত
অধিক কথা কহেন না, প্রত্যহ শিব-পূজা
করেন, বৃদ্ধ-বয়সেও যুগে স্বর্গীয় মহিমা বিবাজ
করিতেছে। আর সরলা ! সই আমার
বকের উপর পাঠ নিদ্রার অভিভূত, আমার
বোধ হয়, উহার মন ইহা অপেক্ষাও পাঠ-
নিদ্রার অভিভূত। আপনি রাজকস্তা হইয়াও
তাহা জানেন না। রাজকুমারীর সহিত কি
আমি বন্ধুত্ব করিতে সাহস করিয়াছি ? রাজ-
কুমারীর পদবিক্ষেপে কি রুদ্রপুর ও বন-
গ্রামের পথ ও ঘাট পবিত্র হইয়াছে ? তগ-
বান্ ! তুমিই জান, আমি কিছু স্থির করিতে
পারিতেছি না।” অমলা এইরূপ চিন্তায়
অভিভূত হইয়া নিদ্রা তুলিয়া গিয়াছিল।
জমীদার নগেজনাথ শয়ন করিতে

গেলেন। স্নেহময়ী কমলা বৃদ্ধ শোকার্ত জমীদারের অনেক সেবা-পুত্রবা করিলেন। কমলা ও সরলা, দুই জনে আজি নিজ হস্তে বৃদ্ধন করিয়া স্বজাতীয় জমীদারকে খাওয়াইয়াছেন, সবচেহ জমীদারের শয্যা রচনা করিয়াছেন, জমীদারের অনেক সেবা করিয়াছেন, জমীদার এই শাস্ত্র নম্রমুখী রমণী-ঘরের বস্ত্র দেখিয়া প্রীত হইলেন, সজলনয়নে কহিলেন, “মা কমলা, তুমি আর ঐ বালিকা সরলা বৃদ্ধের জন্ত অল্প যে সেবা ও বস্ত্র করিলে, এ বৃদ্ধ এতটুকু বস্ত্র অনেক দিন পার নাই। আমি যদি অভাগা না হইতাম, তোমাদের মত স্নেহময়ী পুত্রবৃদ্ধর আজি আমার সেবা করিত, তোমাদের জ্ঞান শাস্ত্র, সুরূপা পুত্রবৃদ্ধর আমার ঘর আলো করিত। কিন্তু বিধাতা সে সুখ আমার কপালে কি লিখিয়াছেন? কার্তিকের জ্ঞান পুত্রবৃদ্ধ, লক্ষীর জ্ঞান স্নেহময়ী পুত্রবৃদ্ধর আমার গৃহ কি পূর্ণ করিবে? আমি সংসারে অনেক দেখিয়াছি, এই গ্রামের জ্ঞান শাস্ত্রপূর্ণ স্থান সংসারে বিরল। আমি অনেক কারস্থকুল দেখিয়াছি, তোমাদের জ্ঞান স্নেহময়ী সর্বগুণ-সম্পন্ন কারস্থকুল অতি বিরল।”

অমলাও শয়নার্থ গমন করিল। বাহিরের কুটারে কেবল মহাশ্বেতা সরলাকে লইয়া এখনও বসিয়া আছেন, শীত শয়নকক্ষে যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকাবেশে একজন নারী আসিয়া মহাশ্বেতার কানে কানে বলিল, “রাণী মা, একবার এদিকে আসুন।”

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন। এ গ্রামে তাঁহাকে “রাণী মা” বলিয়া কে চিনি? পরিচারিকা আবার বলিল, “রাণী-মা, আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমি যে আপনার পুরাতন দাসী।”

মহাশ্বেতা তখন তাহাকে চিনিলেন, সে চতুর্কোণিত দুর্গের একজন পুরাতন পরিচারিকা ছিল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এ কি! তুই এত দিন পরে কোথা হইতে আসিলি? কি জন্তুই বা আসিলি? আমরা এ গ্রামে আছি, কিরূপে জানিলি?”

পরিচারিকা। আপনারা চতুর্কোণিত দুর্গ হইতে চলিয়া বাইবার পর আপনার স্বস্তর-ফুলের লোক আপনার জন্ত কত অমুসন্ধান করিয়াছে, কচিমেয়ে সরলার জন্ত কত কাঁদাকাটি করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব মা! সে সব কথা পরে বলিব। অনেক অমুসন্ধান করিয়া শেষে আপনাদের পাইলাম। সরলা-দিদির পিসীমা একবার ভাইবীর মুখখানি দেখিবার জন্ত কত দেশে ঘুরিয়াছেন, তাহা আর কি বলিব? শেষে রুদ্রপুরে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া এই গ্রামে আসিয়াছেন। এখানে তাঁহার আসিতে ভয় হয়; যদি রাণী-মা কন্ডাকে লইয়া একবার নৌকায় যাইয়া দেখা করেন, তাহা হইলে পিসীমা আপনাদিগকে অনেক দিন পরে দেখিয়া একবার চক্ষু জুড়ান।”

পুরাতন কথা মনে উদয় হওয়ার মহাশ্বেতার পাশাপাশি বিগলিত হইল। নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সে অশ্রু সংবরণ করিয়া সরলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরিচারিকার সঙ্গে ঘাটের দিকে চলিলেন।

ঘাট অতি নিকটে। ঘাটে আসিয়া পরিচারিকা নৌকা দেখাইয়া দিল। নৌকাখানি অতি ক্ষিপ্ৰগামী, দশ বায়ো জন দাঁড়ী দাঁড় ধরিয়া রহিয়াছে। নৌকায় ভিতর হইতে অনেক বৃদ্ধা রমণী তাঁহাকে আসিতে ইচ্ছিত করার মহাশ্বেতা তৎক্ষণাৎ সরলাকে লইয়া নৌকার উঠিলেন। তদ্বহুর্ন্তে নৌকা

ছাড়িয়া দিল। পরিচারিকা দৌকার না উঠিয়া
অন্ত রিকে অদ্বন্দ্ব হইয়া গেল। দৌকার
ভিতর বৃদ্ধা নারী সরলার লিসীয়া নহেন,
শকুনির একজন চরমাত্র। মহাশেষতা ও
তাহার কষ্টা অতঃসৌচ্যের বন্দী হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

The pale stars of the morning
Shine on a misery, dire to the borne
Dast thou faint ?

Shelly.

প্রাতঃকালে স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি চতুর্দিকে
দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়ে) শোভা বর্ধন
করিতেছে; প্রাচীর, স্তম্ভ, গবাক্ষ, কক্ষ, ছাদ,
সকলই আলোকময় করিতেছে, দুর্গপদ-
চারিণী শাস্ত্রপ্রবাহিনী যমুনার উপর অক্ষয়
করিতেছে। নদীবক্ষে প্রকাণ্ড দুর্গের ছায়া
প্রতিফলিত রহিয়াছে, আর দুই একখান
ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে। শীতল সমীরণ ক্ষেত্র-
স্থিত শিশিরবিন্দুতে সিক্ত হইয়া অধিকতর
শীতল হইয়া বহিতেছে ও ঘাটে যে সকল
রমণী স্নান করিতে বা জল লইতে আসি-
য়াছে, তাহাদিগের শরীর পুলকিত করি-
তেছে। কুবাকগণ গরু লইয়া মাঠে বাইতেছে
ও রাহিয়া রাহিয়া আনন্দে গান করিতেছে
এবং পাশ্চগণ তরুণ অরুণ-কিরণে পুলকিত
হইয়া সেই গানে যোগ দিতেছে। সমস্ত
জগৎ আলোকময় ও আনন্দময়।

সেই প্রকাণ্ড দুর্গের নিয়ন্তলে একটি
নিভৃত ঘরে একটি হীনজ্যোতিঃ প্রদীপা-
লোকে মহাশেষতা ও সরলা শয়ন করিয়া

রহিয়াছেন। তাহার আনন্দ চর কষ্ট
আনীত হইয়া এই দুর্গে বন্দী হইয়াছেন।

সরলা নিদ্রিত। মাতৃকোড়ে শিশুর জ্বর
মহাশেষতার পার্শ্বে বালিকা নিদ্রিত রহি-
য়াছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সরলা
নিদ্রা বাইতেছে, সরলার শরীর কীণ হইয়াছে,
চক্ষু দুইটি কোঠরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, মুখ-
মণ্ডলে পূর্বের জ্বর প্রকুরতা বা বালিকা-
ভাব দেখা যায় না। সরলা আর বালিকা
নহে। সহসা অসীম শোক লাগরে নিকপ্ত
হইয়া বালিকা-মুণ্ডে মুখপ্রদ হইতে জাগ-
রিত হইয়াছে।

সরলার পার্শ্বে মহাশেষতা অনিদ্র হইয়া
শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাহার মুখে যে
ভাব লক্ষিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাভীত, সে
ভাব ভয়ের নহে, হুঃখের নহে, কেবল চিন্তার,
নহে। নয়ন জলিতেছিল, সূক্ষ্ম পটের উপর
দস্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে উন্মত্ত-
তার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। ললাটের
শিবা স্কীত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয় পুরুষত্ব
ও চিন্তাতরঙ্গে প্রাবিত হইতেছে।

কণেক পর সরলা জাগিল, উঠিয়া
মাতার মুখমণ্ডলে চাহিয়া বলিল, “মা, সমস্ত
রাত্রি তোমার নিদ্রা হয় নাই?”

মহাশেষতা কোনও উত্তর করিলেন না।
সরলা আবার বলিল, “মা, তোমার জন্ত কল্যা-
ণে অন্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা একপেণ্ডে স্পর্শ
কর নাই, বেরুণ ছিল, সেইরূপই আছে।”

মহাশেষতা উত্তর করিলেন, “না না,
আহারে ক্রটি নাই।”

সরলা। না থাইলে শরীর কত দিন
থাকিবে?

মহাশেষতা। বাছা, আর শরীর থাকার
আবশ্যক কি? ভগবান্ অহুগ্রহ করিয়া
যদি ইহার আগেই আমার মৃত্যু ঘটাইতেন,

তাহা হইলে তোমাকে এ অবস্থার দেখিতে হইত না।

সরলা। মা, তুমি না থাকিলে আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, কগতে আর আমার কে আছে যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?

মহাশ্বেতা সজলনয়নে উত্তর করিলেন, “না মা, হতভাগিনীর এখনও বাইবার সময় হয় নাই।”

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঘরের দ্বার খুলিল। মহাশ্বেতা ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটি নিরুপমা সুলক্ষী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। বলিবার আবশ্যক নাই যে, সে বিমলা।

বিমলা বাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে দুঃখে অধীর হইল। দেখিলেন, পূর্বদিনের খাত্তরবা এখনও স্পর্শ করা হয় নাই, বৃদ্ধা মহাশ্বেতা প্রায় উন্নতের স্তায় হইয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিকা নীরবে রোদন করিতেছে।

বিমলা আপন চক্ষু মুছিয়া, মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মাতঃ, আপনাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আপনারা রাহিরে আসুন।”

রমণীকণ্ঠনিঃসৃত কল্পনাসূচক কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা সেই দিকে চাহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” বিমলা উত্তর করিলেন, “এই দুর্গাধিপতি সতীশচন্দ্রের চুহিতা, আমার নাম বিমলা।”

ক্রোধে মহাশ্বেতা শিহরিয়া উঠিলেন; কণেক পর ধীরে ধীরে বলিলেন, “তোমার পিতাকে বলিও, আমাদের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই, যে কয়েক দিন আছি, আমাদের বিগকে নিঃকনে থাকিতে দাও, তোমরা আসিয়া বিরক্ত করিও না।”

অল্প সময়ে এরূপ উত্তর পাইলে মানিনী বিমলা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের লেশ-মাত্র উদয় হইল না। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমার পিতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, এই জবাব দর হইতে অন্ত বরে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।”

মহাশ্বেতা পুনরায় বলিলেন, “বন্দীর এইরূপ ঘরেই থাক। ভাল, বাহার চরণে শিকল, তাহার সে শিকল সুবর্ণের না হইয়া লৌহের হওয়াই উপযুক্ত! বাও বাছা, হতভাগিনীদের কষ্টের উপর আর উপহাস করিও না।”

বিমলা সজল-নয়নে উত্তর করিলে “মাতঃ, আমি যে আপনাদিগকে উপত্ করিতে আসি নাই, জগদীশ্বর জানেন।”

বিমলা আরও বলিতেন, কিন্তু মহাশ্বেতা তীব্রস্বরে বলিলেন, “জগদীশ্বরের নাম করিও না, তোমার পিতা যেন সে পবিত্র নাম কখনও গ্রহণ না করেন, এ বংশে যেন কে নাম কেহ গ্রহণ করিয়া অপবিত্র না করে।”

বিমলা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “মাতঃ! আপনি আমাদিগকে অন্তর্য তিরস্কার করিতেছেন। আপনি বরুণ হতভাগিনী, আমিও সেইরূপ; হতভাগিনীর জগদীশ্বরের নাম ভিন্ন আর কি আছে? বৃত্তাকাল পর্যন্ত সেই নাম স্মরণ করিব, এই দুঃখ-পরিপূর্ণ সংসারে হতভাগিনীর সেই নামই অবলম্বন, সেই নামই একমাত্র সুর।”

সে পবিত্র কথা শুনিয়া মহাশ্বেতার ক্রোধ লীন হইল। বিমলার ঈশ্বর-ভক্তি দেখিয়া মহাশ্বেতা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে দেখিতে

লাগিলেন ;—দেখিলেন,দেবকন্টার মত সেই উন্নত-প্রকৃতি স্বমীশ্বর হওয়ারমান আছেন । নয়নে অশ্রুজল ; মুখে স্বর্গীয় প্রেম ও ভয়ের ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না।

মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “বিমলা, ক্ষমা কর ; না জানিরা তিরস্কার করিয়াছি, হৃৎখে বিবেচনাশক্তির লোপ হয়।”

বিমলা মহাশ্বেতাকে আর কথা বলিতে না ; নিকটে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “মাতঃ, ক্ষমা-প্রার্থনার কিছুই কারণ নাই ; আপনিও দুঃখিনী, আমিও অল্প দুঃখিনী নহি, আমার অবস্থা জানিলে আপনিও আমার প্রতি দয়া করিবেন।”

মহাশ্বেতা বিমলার হাত ধরিয়া রহিলেন। দুই জনে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, হতভাগিনী সরলাও রোদন করিতে লাগিল। কণেক পর মহাশ্বেতা বলিলেন, “বিমলা, তোমার হৃৎখ আমি বুঝিতে পারিতেছি। পিতার পাপকর্ম দেখিয়া কোন্ ধর্মপরায়াণ কন্টার স্বয়ং না বিদার্য হয় ?”

বিমলা উত্তর করিলেন, “মাতঃ, আপনি এখনও ভ্রান্ত । আমরা যেরূপ হতভাগা, আমার পিতাও সেইরূপ হতভাগা, তাহার জীবন মরণ এখনও স্থির নাই। যে পামর আপনাকে ও আমাকে কষ্ট দিতেছে, সে পিতাকে হতভাগ্য করিয়াছে, আমি আশঙ্কা করি, সে পিতার স্বত্বাস্বকর করিতেছে।”

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন,—ভাবিলেন, সে কি, সত্যীশচন্দ্র ভিন্ন ইহার ভিতর আর কে আছে ?

বিমলা বলিলেন, “উপরে আশুন, আমি সকল কথা আপনাকে অবগত করাইব।”

তিন জনে ধীরে ধীরে সেই জবন্ত ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা সরলাকে

ভগিনীর মত স্নেহ করিয়া লইয়া বাহিলেন । তাহাদিগের আহাতিদিগে শব্দ হইলে বিমলা শব্দনিগূহিত সন্ত কথ্য মহাশ্বেতাকে অবগত করাইলেন ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

এ স্থল নহে—পূর্বস্থতি ।

WALL of my Sires, if ye could speak,
If ye could have a tongue,
Save by the howl's awful shriek
Or raven's uncouth song,
Fain would ask of days gone by,
And o'er each dale would heave a sigh.

F. O. Dutt.

পৃথিবীতে এক প্রকার লোক আছে যে, তাহাদিগের মুখদর্শন মাঝেই নির্দয়ের স্বপ্নের প্রেমের উদ্বেগ হয়, নিশ্চেষ্টের স্বপ্নের প্রেমের উদ্বেগ হয়, সকলেরই স্বপ্নের স্নেহের উদ্বেগ হয়। মুখের সে ভাব কেবল সৌন্দর্য্য নহে, কেন না, সৌন্দর্য্য সকল স্বপ্নকে সমস্তপে আকৃষ্ট করিতে পারে না ; কতক সৌন্দর্য্য, কতক আচারিকতা, কতক বালিকার লজ্জা, কতক বালিকার নির্দোষিতা। এক এক-ধানি মুখের সরলতা ও নব্রতা দেখিলে ইচ্ছা হয় যে, তাহাকে স্বপ্নের স্থান দিই, তাহার সুখসাধনের জন্য চিরকাল ত্রুতী হই। সরলা পরম সুন্দরী নহে, অথচ তাহার মুখে এইরূপ অনির্বচনীয় ভাব ছিল, স্বপ্নও মুখের অবিকল প্রতিচ্ছবি। স্তব্ধতা অল্পসময়ের মধ্যে বিমলা যে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিবেন, আশঙ্কা নহে। আর এক প্রকার আকৃতি আছে, তাহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করি-

বার জন্ত প্রকৃতি আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন। সে জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল, জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নযুগল, স্বচ্ছ ওষ্ঠাবর, উন্নত ললাটে, তুলিকাচিহ্নবৎ ক্রমুগল, তহু অঙ্গ, সুগঠিত সুদীর্ঘ অবয়ব দেখিলে হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইবার অগ্রে ভক্তির উদয় হয়। সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে, সে উন্নত প্রশস্ত ললাটে হৃদয়ের উন্নতত্ব প্রকাশ পায়, হৃদয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বিরাজ করে। বিমলার এইরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, তাঁহারও হৃদয় যুথের অবিকল প্রতিরূতি। এইরূপ দেবীর অবয়ব দেখিয়া সরলা যে তাঁহাকে জ্যোষ্ঠা ভগিনীর স্তায় ভক্তি করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

সরলার হৃদয় হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্ত বিমলা তাঁহাকে দুর্গের চারিদিক দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমে দুর্গের পশ্চাতে উদ্ভানে লইয়া গেলেন। তথায় আত্মবৃক্ষের নিবিড় ছায়া দিবা তুই প্রহরকেও সন্ধ্যার স্তায় সুরিন্দ্র করিয়াছে। তুই জনে সেই ছায়ার কণেক বসিলেন, তুই প্রহরের যুগ বায়ুতে অল্প অল্প পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে যুগ্মর অতি বৃহৎ অপরিষ্কৃত শব্দ শুনা যাইতেছে। সে শব্দে হৃদয় ঘোহিত ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

উত্তরে উদ্ভান হইতে সরোবরসমীপে গমন করিলেন। তাহার জল অতি বিস্তীর্ণ, চারি পার্শ্বে আপন স্থির বক্ষে আত্মচ্ছায়া ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তুই জনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সরোবরঘাটে বসিয়া রহিলেন, স্বভাবের নিস্তক শোভা দেখিয়া হৃদয় নিস্তক হইল। বিললা মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছেন, সরলার মুখে কথা নাই, নিস্তক হইয়া প্রবণ করিতেছে।

সূর্য্য অন্ত বাইবার অনেক পূর্বেই সে ঘনচ্ছায়াবৃত আত্মবেষ্টিত সরোবরে অন্ধকার

হইতে লাগল। বিমলার বোধ হইল, যেন তাঁহার প্রিয়সখীর অন্তঃকরণেও কোন দুঃখ-তিমির ঘনীভূত হইতেছে।

বিমলা অতি স্নেহসহকারে সরলাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া আপন হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন; বলিলেন, “সরলা, তোমার মনে কোন দুঃখ উদয় হইতেছে? আমার নিকট লুকাইতেছ কি জন্ত?”

সরলা উত্তর করিল, “তোমার কাছে লুকাইব কি জন্ত? সত্য, আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, কিন্তু বথার্থ বলিতেছি, কি দুঃখ, তাহা জানি না।”

বিমলা! তবে কিছু চিন্তা করিতেছ?

সরলা। জানি না, চিন্তা কিছুই নাই, এক একবার মন কেমন কেমন করিতেছে।

সরলা সম্পূর্ণ সত্যকথাই বলিতেছিল, মন কি জন্ত চঞ্চল হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই।

সন্ধ্যা হইল, বিমলা ও সরলা উদ্ভান হইতে পুনরায় দুর্গাভ্যন্তরে আসিলেন। তথায় আসিয়া বিমলা সরলাকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন ও নানা-রূপ অপরূপ ও বহুমূল্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। আপনাদিগের শরনাগারে লইয়া যাইলেন। তথায় একটি ময়নাপাখী ছিল, সে কথা কহিতে পারিত।

বিমলা সরলাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, “বল দেখি, এ কে?”

পাখী বলিল, “এ কে?”

বিমলা। তুই বল না, আমি বলব কেন? পাখী। বলব কেন?

বিমলা। তবে বুঝি তুই জানিস না?

পাখী। তুই জানিস না।

বিমলা। বল দেখি, সরলা বাহিরের মেয়ে, না বাড়ীর মেয়ে?

পাখী। বাড়ীর ঘরে।

বিমলা। পাবলিনি, দূরবাসী।

পাখী। দূর বাসী।

সরলা পাখীর কথা শুনিয়া বিমলা হইল,

ভাবিল,—“আমি কি এই বাড়ীর ঘরে?”

পাখীর কতদূর বিতা, বিমলা তাহা জানিতেন, পাখীকে যে কথা বলি-
য়াইত, সে তাহার শেষ কথা উচ্চারণ করিতে পারিত।

তাহার পর বিমলা সরলাকে অল্প একটি কক্ষে লইয়া যাইলেন। কক্ষ দেখিবামাত্র সরলার বিবরণ তাহা বুদ্ধি পাইল, হঠাৎ অশ্রুমনস্ক হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বিমলা স্নেহভরে বলিলেন, “আইস, আবার চিন্তা কেন?”

সরলা উত্তর করিল, “আমার মন আরও কমন করিতেছে, বেন স্বপ্ন দেখিতেছি; যা কোথা?”

বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষুতে জল, নিম্নে তাহাকে তাহার মাতার নিকট লইয়া গেলেন। সরলা জটবেগে মাতার নিকট যাইয়া অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে মাতার বক্ষস্থলে লুকাইল।

মহাশেতা অতিশয় ঔৎসুক্য ও স্নেহের সহিত সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি যা, কি হইয়াছে?”

সরলা উত্তর করিল, “মা, আমি জানি না, এ বাটতে কি আছে, আমি আজ সমস্ত দিন বেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। সকল জ্বাই বেন দেখিয়াছি বোধ হইতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেন এক দেবমূর্তি দেখিতে পাইলাম। মা, আমি পাগ-
লিনী, সহসা সেই মূর্তিকে পিতা বলিয়া ভাবিলাম। মা, আমি অজ্ঞান কিংবা স্বপ্ন দেখিতেছি।”

মহাশেতা আর শুনিতে পারিলেন না, উঠিয়াই রোদন করিয়া উঠিলেন। অজ্ঞান বালিকার কথার অল্প তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

সে শোকের প্রথম বেগ সঞ্চার হইলে মহা-
শেতা কতক পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “সরলা, এ স্বপ্ন নহে, পুরুষত্ব তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে যে কথা আমি এত দিন লুকাইয়া রাখিয়া ছিলাম, যে কথা তুমি এত দিনে ভুলিয়া গিয়াছ, বোধ করিয়া ছিলাম, সে কথা আপনা হইতেই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে, আর আমি তোমার নিকট কিছু লুকাইব না।”

এই বলিয়া মহাশেতা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সরলার নিকট বলিলেন। সরলার জন্মকথা, রাজা সমরসিংহের সম্মান ও গৌরবের কথা, তাঁহার অস্তায় মৃত্যুর কথা, আপনাদিগের পলায়ন ও ছদ্মবেশের কথা এ সমস্ত কথা বালিকার সশ্রুণে ভাসিয়া বলিলেন। সেই সকল কথা প্রথমে সরলার স্বপ্নের স্রাব বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোহজাল অন্তরিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দুই একটি কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঘর, দালান, শুভ্র দেহিতে দেখিতে পূর্বকথা জাগরিত হইতে লাগিল।

মহাশেতার শৌহদ্ভব ও অল্প দ্রবীভূত হইতেছিল, মাতা-কন্ডার পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিমলা পার্শ্বে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার জুগল সূক্ষিত, ওঠের উপর দস্ত স্থাপিত, নয়ন হইতে বিক্ষুব্ধ বাহির হইতেছে। তাঁহার মনের ভার পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিবেন। শুনিলি যে কতদূর পামর, পিতাকে যে কত দূর পাপকণ্ঠে দ্বিষ্ট করিয়াছে, কি জন্ত

মহাশেষতাকে বন্দী করিয়াছে, এ সমস্ত চিন্তা মহা-বাতার দ্বারা তাঁহার ক্রম আহত ও ব্যাধিত করিতেছিল ।

বিমলা সরলা চিন্তাভগ্ন হইতে আগ্রহিত হইয়া গভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, “মাতঃ, পামর শকুনির পাপ আমি এত দিনে জানিলাম । এ বিশ্বসংসারে উহার মত পাতকী আর নাই, নরকেও উহার মত কোট নাই । কিন্তু উপরে ভগবান আছে, এ ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে ।”

এই গভীর কথা শুনিয়া মহাশেষতা বলিলেন, “বৎসে বিমলা, ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার অভিব্রা, তাঁহার লীলাখেলা আমরা বুঝিতে পারি না, না হইলে এ সংসারে পাপের জর কি জন্ত ?”

বিমলা পূর্ববৎ স্বরে বলিলেন, “মাতঃ, আমার কথা অবধারণা করুন, পাপের জর ক্ষণস্থায়ী মাত্র, পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই । আমি এই পামরের যত্নের উপার দেখিতে পাইতেছি, আপনার স্বামীর যত্নের প্রতিহিংসার বিলম্ব নাই ।”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভিবা গায় রত্ন ।

HA sorrow thy young lays shaded
As o'er the morning fleet ?
Too fast have those young days faded
That oven in sorrow were sweet ?
Dost thou with his co wither
Each feeling that once was dear ?
Come, child of misfortune ! come hither,
T'll weep thee tear !

moore.

সন্ধ্যার সময় মহাশেষতা পূজার্থ যমুনাতীরে গমন করিলেন, শকুনির তাহাতে আপত্তি ছিল না । যে দুর্গে তাঁহার যৌবনাবস্থা,

তাঁহার যুথের দিন গত হইয়াছিল, বখার তিনি রাজকুলচূড়ামণি সমরসিংহের রাজ-মহিষী হইয়া কালবাশন করিয়াছিলেন, আজি সেই দুর্গের পার্শ্বে হীন, নিরাশ্রয় বিধবা বন্দী হইয়া উপাসনা করিতেছেন । পূর্বে দুর্গপার্শ্বে যে তরঙ্গময়ী যমুনা কল কল শব্দে প্রবাহিত হইত, আজিও সেই নদী সেইরূপ জলক্ৰটি করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে কোন পরিবর্তন নাই । দূরে যে গভীর বৃক্ষশ্রেণী দেখা বাইত, পার্শ্বে যে আশ্রয়কানন দেখা যাইত, সমুদ্রে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখা বাইত, তাহাতে কিছুই পরিবর্তন হয় নাই ; কিন্তু মহাশেষতার জীবনে কি পরিবর্তন হইয়াছে । আজি সে পূর্বগৌরব কোথায়, সে দুর্গাধিপতি কোথায়, সে বীর-শ্রেষ্ঠ কোথায় ? গ্রীষ্মকালে প্রবল বাতায় বেরূপ শুষ্কপত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে বারিবিদু বেরূপ লীন হয়, অতীতকালরূপ অনন্ত সাগরে সেইরূপ পূর্ব-গৌরব লীন হইয়াছে ।

এ দিকে বিমলা সরলাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া দুই সহোদরার দ্বারা এক শয্যায় শয়ন করিলেন । বিমলা সরলাকে কেহিলা অবধি তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু যখন জানিলেন যে, শকুনি ও পিতার পরামর্শে সরলা অনাথা হইয়াছে, তখন তাহার প্রতি মেহ ও মমতা দ্বিগুণ হইল । পিতা ঘোর পাপ করিয়াছেন, তাহার বধি পরিশোধ থাকে, মহাশেষতা ও সরলার প্রতি গাঢ় বন্ধ ও মেহ দ্বারা বিমলা তাহার পরিশোধ করিতে লাগিলেন । দুই জনে একত্র শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ অবধি কথোপকথন করিতে লাগিলেন । দুই জন অল্পবয়সী ও অবিবাহিতা, দুই জনের মধ্যে শ্রীহই প্রগাঢ় ও পবিত্র ভালবাসার সঞ্চার হইল ।

বিমলা বার বার সরলা ও মহাশয়ের
অজ্ঞাতবাস ও কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন, বার বার পরীক্ষায়ের কথা
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলার মুখ
হইতে সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বিম-
লার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, পিতার পাপ-
কর্মে ফলস্বরূপ যথাস্থিত বেদনা হইতে লাগিল,
শত্নির চক্রান্তে তাঁহার শরীর কোণে কষ্ট-
কিত হইতে লাগিল। অতি রেহ-সহকারে
দুই বাহ দ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া
বিমলা বার বার সেই বালিকার মুখে সেই
সারিষ্যের কথা, সেই পরীক্ষায়ের নিবাসের
কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার
চক্ষুজলে সরলার নয়ন, বদনমণ্ডল ও কেশ-
রাশি সিক্ত করিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা
যখন কদ্রপুরে ছিলে, তখন তোমাদের বন্ধু
কে ছিল? কৃষ্ণকপটীরাই কি তোমাদের
বন্ধু ছিল?”

সরলা বলিল, “মা কাহারও সহিত
অধিক কথা কহিতেন না, দিবাভাগে প্রায়
চিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় উপা-
সনা করিতেন। আমার সহিত দুই এক
জন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল। অমলা
নায়ে এক মহাজনের স্ত্রী ছিল, তাহারই
সহিত অধিক সময় আমার কথাবার্তা
হইত।”

বিমলা। সে কি জাতি?

সরলা। জাতিতে কৈবর্ত।

বিমলা। সে তোমাকে ভালবাসিত,
তোমাকে বড় করিত?

সরলা। বোধ হয়, আমার মাতা ভিন্ন
আর কেহ আমাকে সেরূপ ভালবাসিতে
পারে না, তাহার কথা বনে হইলে চক্ষুতে
জল আসে।

বিমলা। সরলা, তোমাদের প্রতি
কিরূপ অজ্ঞার করা হইয়াছে, তাহা আমি
বলিয়া শেব করিতে পারি না। যদি আমার
সাধ্য থাকে, আপনি ভিখারিণী হইয়াও
তোমাদের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিব।

সরলা। আমি সত্য বলিতেছি, পরীক্ষায়ের
সেরূপ অবস্থার আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইত
না, কিন্তু মাতা দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন,
সেই জন্য আমার দুঃখ হইত। মাতাকে সুখে
রাখ, এই আমার ভিক্ষা।

বিমলা। সরলা, আমারও সেই ইচ্ছা,
প্রাণ দিয়াও যদি তোমার মাতাকে সুখে
রাখিতে পারি, তাহাতেও সন্মত আছি।

সরলা। কেন, তোমার অসাধ্য কি?
তোমাদের এত ধন, এত মানসম্মত!

বিমলা। সৎসা, তুমি আমার সকল কথা
জান না, যদি জানিতেন, তবে আমাকে তোমা
অপেক্ষাও হতভাগিনী বোধ করিতে। এ
ধনমান আমাদের নহে।

সরলা। কেন?

বিমলা। আমি প্রাতঃকালেই বলিয়া-
ছিলাম যে, পামর শত্নি আমার পিতার
প্রাণসংহার করিয়া এই দুর্গ ও জমীদারী
হস্তগত করিবার উদ্ভোগ করিতেছে। দিবা-
রাত্রি পিতার চিন্তায় আমার নিদ্রা হয় না।
কিন্তু কেবল সেই দুঃখ নহে।

সরলা। আর কি?

বিমলা। সরলা, তোমার নিকট কিছুই
লুকাইব না। এই পামর আমাকে বিবাহ
করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর
পর অনায়াসে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে।
আমার বলিতে লজ্জা করে, এই পামর
কয়েক দিন অবধি প্রত্যহ বিবাহের প্রস্তাব
করিতেছে। আমি অস্বীকার করিতে সে
বলপূর্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহে। কল্য

প্রত্যয়ে সেই নরনাথক যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সরলা, আমি অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে?

সরলা বিস্মিত হইল, কণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল, “কাল পরিজ্ঞাপ পাইবে কিরূপে?”

বিমলা অতি গভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “কলা জগদীশ্বর আমাদের উদ্ধার করিবেন, তাঁহার কৃপায় কলা পরিজ্ঞাপের আশা আছে। তাহার পর নিশিযোগে পিতার নিকট পল্লারন করিব, তাহারও উপায় স্থির হইয়াছে, তাহার পর পামরের পাণের প্রায়-শ্চিত্ত হইবে, তাহারও উপায় পাইয়াছি। ভগবান! এই দুঃস্বপ্নে অবলার সহায় হও।”

সরলা নিশ্চক হইয়া রহিল। বিমলা আরও বলিতে লাগিলেন, “মুন্দের বাইরা পিতার পরিজ্ঞাপ করিব, পাণীর শান্তি দান করিব। তাহার পর পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এই দুঃ মহাশ্বেতাকে পুনরায় দান করিব। আমি পিতার অন্তঃকরণ জানি, শত্নির পরামর্শ হইতে মুক্ত হইলে তিনি জ্ঞানকর্য করিতে অস্বীকার করিবেন না। আর মুন্দের এক বীরপুত্র আছেন, তিনিও বোধ হয়, আমার সহায়তা করিবেন। ইন্দ্রনাথ! সত্য পালন করিও।”

“ইন্দ্রনাথ” নাম শুনিয়া সরলা চমকিত হইল, সহসা তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, বিমলা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরলা, তুমি অশ্রম করিয়া উঠিলে কেন? তুমি বেদনা পাইয়াছ?”

সরলা কোন উত্তর করিতে চাহে না, মুখ গোপন করিয়া রাখে। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসার বলিল, “ইন্দ্রনাথ নামক আমার পরিচিত একজন লোক তাছেন। তিনিও পশ্চিমবাসী করিয়াছেন।”

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমলার নিকট কোন কথা গোপন রহিল না। বিমলা সরলার নিকট হইতে একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। ইন্দ্রনাথ সরলার হৃদয়ে, ইন্দ্রনাথ সরলার প্রণয়ী, ইন্দ্রনাথ মহাশ্বেতা ও সরলার উদ্ধারার্থ দুই তিন মাস হইল পশ্চিমে গিয়াছেন, তবে কি সেই ইন্দ্রনাথকেই বিমলা মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিয়াছেন? বিমলার হৃৎকম্প হইল, তিনি ধীরে ধীরে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরলা, সেই বীরশ্রেষ্ঠের কোন স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন আছে, লক্ষ্য করিয়াছ?”

সরলা উত্তর করিল, “তাঁহার বামহস্তে একটি নিবিড় কৃষ্ণ বোতু-চিহ্ন আছে।”

বিমলার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, ইন্দ্রনাথের হস্তে সে চিহ্ন তিনিও দেখিয়াছেন।

দীর্ঘবে বিমলা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, তাঁহাকে নিত্রিতা বিবেচনা করিয়া বালিকা সরলাও ঘুমাইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কথা।

“O! do not tempt,” she said
“O! do not add to my distress,
I have tasted much of bitterness.”

But ah, fair maid, thou plead’st in vain
His heart is proof to prayers,
A bit like darksome foods of rain
Thou sheddest thy scalding tears.

S. C. Dutt.

রাত্রি প্রভাত হইল। আজ বিমলার পক্ষে ভয়ানক দিন। কিন্তু বিমলা বিপদ হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার উপায় উদ্ভাবন

করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বিমলা শয্যা-
গৃহ হইতে অস্ত্র একটি গৃহে যাইয়া উপাসনা
করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপা-
সনা করিতে লাগিলেন, অবিস্রান্ত অশ্রুধারা
কপোলদেশ প্রাণিত করিয়া বহিতে লাগিল।

উপাসনা সাক্ষ করিয়া বিমলা বাহিরে
আসিলেন; দেখিলেন, শকুনি তথার অপেক্ষা
করিতেছেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,
গায়ের রক্ত শুকাইয়া গেল।

শকুনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিম-
লার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।
সর্প যেরূপ ভেককে ভক্ষণ করিবার অগ্রে
নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ শকুনি বিমলার দিকে
অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিমলাও নিম্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান হইয়া
ভূমির দিকে একদৃষ্টে চাহিতেছিলেন।
ঊঁহার হৃদয় ভয়ে ও ক্রোধে জর্জরীভূত
হইতেছে। অবশেষে মুহূর্ত্তে কহিলেন,
“শকুনি, আমি হতভাগিনী, আমার মত
হতভাগিনী আর নাই, আমাকে আর হুঃখ
দিও না, ক্ষমা কর।”

সে বচনে পাষণ্ড দ্রবীভূত হইত, শকু-
নির হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। তিনি ঈষৎ
হাস্য করিয়া বলিলেন, “এই অস্ত্র বুঝি সময়
চাহিয়াছিলে?”

বিমলা। আমাকে সময় দিয়াছিলে
বলিয়া তোমাকে ধন্তবাদ দিতেছি, কিন্তু
আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়ে যে কষ্ট
হইতেছে, তাহা তুমি জান না। আমার
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শকুনি, আমাকে
ক্ষমা কর।

শকুনি। বিবাহের আগে সকল বালি-
কাই ঐরূপ বলে, স্বপ্তরবাকী যাইবার সময়
সকলেই কাদে, কিন্তু একবার গেলে আর
ফেরার বাকী আসিতে চাহে না।

বিমলা। শকুনি, উপহাস করিও না,
আমি হৃদয়ে মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছি,
উপহাস ডাল লাগে না।

শকুনি। আমি উপহাস করিতে আইসি
নাই, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা
পালন করিতে সম্মত আছ কি না?

বিমলা। আমি কোন প্রতিজ্ঞা করি
নাই।

শকুনি। প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাক,
আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ কি
না?

বিমলা। জীবন থাকিতে সম্মত হইব না।
শকুনি। আর আমার দোষ নাই, এক্ষণে
বলপ্রকাশ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

বিমলা। আমার পিতা থাকিলে তুমি
এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। পিতার
অবর্ত্তমানে, ব্রহ্মকর্ত্তার অবর্ত্তমানে, নিরাশ্রয়
অবলার উপর অত্যাচার ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে।

শকুনি। আমি বালিকাত্ব নিতটে ব্রাহ্ম-
ণের ধর্ম্ম শিখিতে আসি নাই।

বিমলা। তথাপি আমার কথা অবধারণ
কর। দেখ, আমার পিতা তোমাকে কত
অনুগ্রহ করেন, তোমাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে
পুত্রের মত লালনপালন কারিয়াছেন,
তোমাকে অত্যাগি পুত্রের মত বদ্ব করেন।
ঊঁহার কন্তার প্রতি অত্যাচার করা তোমার
বিধেয় নহে।

শকুনি আপনার পূর্ব্বকার দরিদ্রাবস্থার
কথা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তোমার
পিতা সহস্র পাপ করিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত
জীবিত রহিয়াছেন, সে আমার অনুগ্রহে।”

পিতার নিন্দাবাদে বিমলা আর ক্রোধ
সংবরণ করিতে পারিলেন না, আরক্ত-নরনে
কহিলেন, “তুমিই আমার পিতার সর্ব্বনাশ
করিয়াছ; তুমিই আমার ঊঁহাকে তিরস্কার

কর? কখনে কুতোর বেগে এই ভূর্গে আসিমাছিলে, এক্ষণে প্রভু হইতে চাহ? কুতোর সহিত বিবাহে বিমলা কখনও সম্মত হইবে না।”

শকুনি। কাহার সম্মুখে এরূপ কথা কহিতেছ, জান? তোমার জীবন মরণ আমার চতে, তাহা জান?

বিমলা। জানি—সতীশচন্দ্রের কথা সতীশচন্দ্রের কুতোর সহিত কথা কহিতেছে, সে দিন যে নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্র অন্নের জন্ত পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাহারই সহিত আমি কথা কহিতেছি।

বিমলা স্বভাবতঃ মানিনী, পিতার নিন্দা-কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল জলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নয়নদ্বয় জলিতেছিল, আলুশাঘিত কেশ কণোল ও উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর শড়াতে তাঁহাকে উন্নতের স্তায় দেখাইতেছিল। সে অপরূপ আকৃতি দেখিয়া শকুনিও কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন ও ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বিমলা ক্রোধ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার মিথ্যা রাগ, শকুনি, আমি জানি, আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন আছি। তোমাকে যে ভৎসনা করিলাম, সে কেবল ক্রোধে অন্ধ হইয়া। পিতৃনিন্দা আমি সঙ্ক করিতে পারি না, আমার নিকট পিতার নিন্দা করিও না।”

শকুনি। আমি তোমার পিতার নিন্দা করিতে আসি নাই; তোমার পিতা আমার প্রতি যে দয়া করিয়াছেন, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে বাহার জন্ত আসিরাছি, তাহার উত্তর কি?

বিমলা। আমি জীবন থাকিতে তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

শকুনি। বিমলা, তুমি অতিশয় বুদ্ধি-মতী। আমার হৃদয়ে দয়া, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতি নানারূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া আমার মনস্কামনা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছ; বিমলা, তাহা পারিবে না। আমি যে কর্ষে যখন দৃঢ়ত্ব হইয়াছি, জগৎসংসারে কোন লোকই আমাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। তুমি বালিকা হইয়া যে এত দিন আমাকে এই বিবাহ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু আর পারিবে না অগুই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে, সকল আয়োজনই প্রস্তুত আছে। তুমি বাধা দিলেই বল-প্রকাশ করিব, তবে মিথ্যা আর কি জন্ত আপত্তি কর? আইস, হই জনে নীচে যাই।

এই কথা শুনিয়া বিমলা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও মুহূর্ত্তের জন্ত যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, অজ্ঞানের স্তায় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, “পিতা, এ বিপত্তির সময় সহায় হও।”

শকুনি। তোমার পিতা মুক্তের, তোমার বৃথা প্রার্থনা।

বিমলা। “তবে জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও,” এই বলিয়া বিমলা হস্ত ঝোড় করিয়া উন্নতের স্তায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেশরাশিতে বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছে, বেশভূষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, নয়নদুটি ভলে পরিপূর্ণ অথচ অপার্থিব জ্যোতিতে জলিতেছে। উন্নতের স্তায় উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বিমলা বলিলেন, “জগৎপিতা জগদীশ্বর, আমার সহায় হও।”

সে অকৃতি দেখিয়া শকুনি আবার নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, একদৃষ্টে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, “শকুনি, তুমি জগদীশ্বরকে ভয় কর, এ পৃথিবীতে এত পাণ করিয়াছ, অবশ্যই জগদীশ্বরকে ভয় কর। আমি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার ভ্রাতাধরপ, আমি তোমার ভগ্নীধরপা, তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ, আমি তোমার মাতার স্বরূপা, আমাকে বিবাহ করিতে চাহিও না।”

জগদীশ্বরের পবিত্র নামে কোন্ পাণীর হৃদয় কম্পিত না হয়? শকুন আর সঙ্ক করিতে পারিলেন না; বলিলেন, “হতভাগিনি! নিকোঁধ! দেখিব, কে তোমার সহায় হয়! এক দণ্ড সময় দিলাম। এক দণ্ডের পর এ কার্য সম্পাদিত হইবে।”

এক দণ্ড একাকী বসিয়া বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এ রোদনের সময় নহে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী কয়েক দিন হইতে বে উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তাহাই স্থির করিলেন।

এক দণ্ড কাল পরে শকুনি পুনরায় দর্শন দিলেন। বিমলা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “শকুনি, আমাদের কপালে দাশ আছে, তাহাই হইবে। তোমার পৃথিবী হইবার জন্ত বিধি যদি আমাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাই হইবে।”

শকুনির মুখে আর হাসি ধরে না, তিনি যন্ত্রের সহিত বিমলার হাত ধরিলেন। বিমলা তাহাতে আপত্তি করিলেন না, নরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, “শকুনি, আমার একটি মাত্র ডিক্কা আছে। পিতার ক্রুর জন্ত আমি একটি ব্রত করিয়াছি, দাঁত আর তিন দিনে সমাপন হইবে, এই তিন দিন অবসর দাও, এ ডিক্কা-দানে

পরাক্ষুণ হইও না। শকুনি, এ ব্রত উৎসাপন না করিয়া আমি বিবাহ করিব না, বরং আত্মহতিনী হই, তুমি আমাকে পাইবে না।”

শকুনি কণেক চিন্তা করিতে লাগিলেন, অগত্যা আর তিন দিনের সময় দিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী বিমলা পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। বিব্রত পরিচারিকা দ্বারা দুর্গ হইতে এক ক্রোশ দূরে নৌকা স্থির করিয়াছিলেন। এক প্রহর যাত্রির সময় মহাশেতা ও সরলাকে অনেক আশ্বাস দিয়া কয়েকজন অনুচর ও পরিচারিকা লইয়া এক ক্রোশ পদব্রজে বাইরা নৌকার উঠিলেন। নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্বাসন।

AND shall my life in one sad tenour run.
AND end sorrow as first begun.

Pope

নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। উপরে নৈশ আকাশ নীল ও নিম্নজ, চারিদিকে ষাটক্ষেত্রে ও পল্লীগাম নিম্নিত ও নিম্নজ, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষিপ্তগ্রামী নৌকা ভাসিয়া বাইতেছে। নৌকার ভিতর একটিও দীপ নাই, কোনও প্রকার শব্দ নাই, নৈশ আকাশও জগতের স্তায় অন্ধকারময় ও শব্দশূন্য।

আকাশ অন্ধকারময়। বতবুর দৃষ্ট হয়, সমুদ্রে ও পল্লিতে নদীর জল ধুঁকু করিতেছে, রাশি রাশি মেঘ সেই নীলজলে প্রতিকলিত-

হইতেছে, অন্ন-বাহুতে নদীর কল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তরঙ্গমালা ও কেনরাশির মধ্য দিয়া নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে। উভয় পার্শ্বে কোথাও আত্মকানন নিশাচর-শ্রেণীর দ্বার নিবিড় অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বায়ুতে গভীর শব্দ করিতেছে, কোথাও বা কতদূর গুহ্র বায়ুকারাণি বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র দেখা বাইতেছে, মেঘ ক্রমাগত উড়িতেছে, কক্ষবর্ণ মেঘের পর কক্ষবর্ণ মেঘ পশ্চিমদিকে রালীকৃত হইতেছে। নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে।

বিমলা নৌকার পশ্চাভাগে বসিয়া চতুর্কোণিত দুর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে কত যে চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল, কে বলিবে? ছয় বৎসরকাল যে দুর্গে অতিবাহিত করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার যে দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, বাল্যকাল হইতে যে দুর্গে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজি সেই দুর্গে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। সে সাগরের কি কুল আছে? বিমলা কি সেই কুল পাইবেন? আশ্রয়হীনা রমণী কি পিতাকে ফিরিয়া পাইবেন? মহাশ্বেতা ও সরলায় কি উদ্ধারপাথন করিতে পারিবেন? পাপাচারী শকুনির কি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন?

যিনি কখন অনেক দিনের জন্ত দেশ-ত্যাগী হইয়া যাত্রা করিয়াছেন, পোতে আরোহণ করিয়া মাতৃভূমির দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু প্রিয় ও সুখকর আছে, সম্বল-নয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন, অন্ন বয়সে সহায়হীন, বন্ধুহীন, প্রবাসী হইয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন

তিনিই বিমলার সে রাজির ঘোর চিন্তা ও ঘোর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন। একাকিনী নৌকার পশ্চাভাগে বসিয়া বিমলা সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে চতুর্কোণিত দুর্গের দিকে দৃষ্টিতে লাগিলেন। জলের কল কল শব্দ শুনিতেছিলেন না, তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস ও কেনরাশির খেলা দেখিতেছিলেন না, কেবল চতুর্কোণিত দুর্গ দেখিতেছিলেন আর অনন্ত ভাবনা ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই, আকাশ বেক্ষণ অনন্ত, নদীর প্রোত বেক্ষণ অব্যাহত, সে চিন্তা সেইরূপ অনন্ত ও অব্যাহত। ভাবিতে ভাবিতে বিমলা চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ বীরাস্তঃকরণ অস্ত্র দ্রবীভূত হইতে লাগিল। যখন চাহিয়া চাহিয়া আর সে দুর্গ দেখিতে পাইলেন না, কেবল ছর্ত্তে ছর্ত্তে তিমিররাশি দেখিতে লাগিলেন, তখন হস্তদ্বয়ে মুখ আবরণ করিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জন করিলেন, তাঁহার অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া অশ্রুজল বাহির হইয়া বাহ-দ্বয় ও বক্ষঃস্থল একেবারে সিক্ত করিল; শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বিমলা যে নিরাপদে মুক্তের পাছিয়া ছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় জানেন।

ষড়্বিশ পরিচ্ছেদ ।

অপরূপ বাহ ।

YET thought thick the thafts as snow.
Though charging knights like whildwinds
go

Though billmen ply their ghastly blow,
Unbroken was the ring.

The stubborn spearmen still made good,
Their dark impenetrable wood,
Each stepping where his comrade stood,
The moment that he fell.

Scott.

শত্রুরা এক্ষণেও মুন্সেরের নিকট বসিয়া আছে, টোডরমল্ল এক্ষণেও অসাধারণ যুদ্ধ-কৌশল প্রকাশ করিয়া দুর্গরক্ষা করিতে-ছিলেন, ইচ্ছানাথ দিন দিন খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি আপনার পঞ্চশত অঝারোহী লইয়া শত্রু-দিগকে আক্রমণ করিতেন, অল্পসংখ্যক শত্রু-সৈন্য কোথায় আছে, এরূপ সংবাদ পাইলেই মহারাজার অমৃতমতি লইয়া, তাৎক্ষণিক আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতেন, অধিক শত্রু আসিবার পূর্বেই দুর্গে প্রবেশ করিতেন। বার বার এইরূপে কতিপয় হইয়া শত্রুরা ব্যতিব্যস্ত হইল, দুর্গবাসিগণ নব সেনাপতির রণকৌশল, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার বীর-ত্বের বশ বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

শত্রুরা ভাগলপুর হইতে অগ্রসর হইয়া মুন্সেরের নিকটে একটি শিবির স্থাপন করিয়া-ছিল। এক দিন সূর্য্য অস্ত বাইবার সময় রাজা টোডরমল্ল শত্রুদিগের শিবির দর্শনার্থ দুর্গের প্রাচীর ছাড়িয়া প্রায় অর্ধকোশ দূরে গিয়াছিলেন। শত্রু শিবির সে স্থান হইতে অনেক দূরে; সুতরাং কোন ভয়ের কারণ

ছিল না। বিশেষ মহারাজ ছদ্মবেশে গিয়া-ছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ জন অঝারোহী ছিল। অঝারোহিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, রাজা একদৃষ্টে শত্রুর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সতর্ক দূর হইতে একটি শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, দূরে হুলিয়াশি দেখা বাইতেছে। আরও দেখিল, একজন অঝারোহী বায়বেগে রাজার দিকে ধাবমান হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, অশ্ব ভূমিস্পর্শ করিতেছে না। সে অঝারোহী মুহূর্ত্তমধ্যে নিকটবর্তী হইল, সকলেই চিনিল, সে মহারাজের একজন সৈনিক। রাজার নিকটবর্তী হইয়া সে লক্ষ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইল, অশ্ব এত বেগে দৌড়িয়া আসিয়াছিল যে, অঝারোহী অবতীর্ণ হইবামাত্র ঘোটক পড়িয়া গেল ও দুই চারিবার চীৎকার ও শূন্ত পদধ্বনি করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ঘোটকের দিকে দেখিবার কাহারও অব-কাশ ছিল না। সৈনিক প্রণাম করিয়া ভীত-চিত্তে বলিল, “মহারাজ! আমাদের শিবিরে কোন বিদ্রোহানুগ্ন সেনার নিকট হইতে শত্রুরা সংবাদ পাইয়াছিল যে, অত মহারাজ সন্ধ্যার সময় দুর্গপ্রাচীরে বহির্গত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া অর্ধ কোশ দূরে দুই সহস্র অঝারোহী অপেক্ষা করিয়া ছিল, সেই দুই সহস্র অঝারোহী একত্রে আসিতেছে।” সৈনিক এইমাত্র বলিয়া প্রান্তবশতঃ ভূমিতে পড়িল।

রাজার অতঃপরো আশঙ্কার জ্ঞানশূন্য হইল। রাজা আজ্ঞা দিলেন, “তোমর ও অঝারোহী দুর্গের দিকে ধাবমান হও শত্রুরা আসিবার অনেক পূর্বেই আমার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব।” সকলেই বেগে দুর্গাভিমুখে অঞ্চালনা করিল।

অসুখ্যপন্নয়ন ইন্দ্রনাথ দ্বারা স্থানি দেখি-
য়াই আপন রণভেদী বাজাইয়াছিলেন,
তাহার পক্ষত আরোহীও সেই আক্রমণ-
নের এক অংশে কোন কারণবশতঃ স্থাপিত
ছিল। যুদ্ধমধ্যে তাহার আসিয়া মিলিত
হইল। তখন ইন্দ্রনাথ রাজাকে বলিলেন,
“মহারাজ! যদি আজ পাউ, আমার পক্ষ-
ত আরোহী লইয়া শত্রুদিগকে কণেক
বাধা দিতে পারি। ততক্ষণে আপনারা
অক্ষরে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি-
বেন।”

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,
“বালক! যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে
টোডরমল্ল কখনও পলায়নতৎপর হয় না।
বুঝা প্রাণ নষ্ট করা যুদ্ধ নহে, নরহত্যা যাত্র।”

সকলে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল।
দুর্গের সম্মুখে পরিখা : সকলে বিস্মিত ও
ভীত হইয়া দেখিল, পরিখার উপরিস্থিত
সেতু ভগ্ন হইয়াছে। যে নরায়ণ শত্রুদিগকে
গোপনে সর্বাঙ্গ দিয়াছিল, সেই সেতু
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং আরোহী-
দিগের দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

সকলেই সম্ভরণ করিয়া পরিখা পার
হইবার প্রয়াস করিল। রাজা শত্রুর দিকে
অজুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “পার
হইতে না হইতে শত্রুরা আসিয়া পড়িলে,
তখন কাপুরুষের স্ত্রীর শত্রু কর্তৃক সকলে
আহত হইয়া জলমগ্ন হইবে। বীরপুরুষের
কার্য্য কর, শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ দাও, এই
কণ্ঠেই কাঠের নুতন সেতু নির্মিত হউক,
যতক্ষণ নির্মিত না হয়, শত্রুর সহিত যুদ্ধ
করিব। ইন্দ্রনাথ, শত্রুদিগকে যুদ্ধ দান কর।”

“ভূত্যা সাধ্যমত কার্য্য করিবে” বলিয়া
ইন্দ্রনাথ ব্যাহিনীর্ণ্যে তৎপর হইলেন। ব্যাহ
অর্দ্ধচক্রাকৃতি ও পক্ষ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি

শ্রেণীতে একশত অশারোহী। প্রথম শ্রেণীর
পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডারমান রহিয়াছে,
তাহার পশ্চাতে তৃতীয় শ্রেণী ইত্যাদি।
সুতরাং যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী পরিশ্রান্ত
হইলে দ্বিতীয় শ্রেণী অগ্রসর হইতে পারিবে,
তাহার পর আবার তৃতীয় শ্রেণী সম্মুখীন
হইবে, এইরূপে ক্রমাগত প্রত্যেক শ্রেণীই এক
একবার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে।
সম্মুখে শত্রুর আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, পশ্চাতে
পরিখার জল, সে দিক হইতে আক্রমণের
সম্ভাবনা নাই। সেই পরিখার নিকট কয়েক-
জন ছই চারিটি যুদ্ধ কর্তন করিয়া সেতু
বন্ধন করিতেছিল। যুদ্ধমধ্যে শত্রু আসিয়া
পড়িল, ইন্দ্রনাথের স্ত্রীর উৎসাহে পরিপূর্ণ
হইল।

আজ প্রায় তিন চারি মাস পর্যন্ত যুদ্ধের
নগর বেষ্টিত ছিল, কিন্তু অল্প যেরূপ ছই
পক্ষই ভীষণ সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ
করিতে লাগিল, এরূপ কখনও দেখা যায়
নাই। ব্যাহভেদ করিতে পারিলেই রাজা
টোডরমল্ল বন্দী হইবেন, এই জানে শত্রুরা
সাগর-তরঙ্গের স্ত্রীর বার বার ভীষণ আক্রমণ
করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যাহ ভাঙ্গিবার
নহে, পর্ব্বতশিখরের স্ত্রীর বার বার শত্রু-
দলের তরঙ্গমালা দ্বারা নিক্ষেপ করিতে
লাগিল। শত্রুরা অধিকসংখ্যক বলিয়া
তাহাদিগের বড় সুবিধা হইল না, কেন না,
ইন্দ্রনাথ যেরূপ কৌশলে ব্যাহ নির্মাণ করিয়া-
ছিলেন, তাহাতে একেবারে এক শত জনের
অধিক শত্রু আসিয়া সে ব্যাহ আক্রমণ করিতে
পারিল না, বরং সেই অল্প স্থানের মধ্যে
ছই সহস্র সৈন্তের চলাচলের ব্যাঘাত হইতে
লাগিল। তথাপি শত্রুরা অল্প বার বার
সিংহপর্জন করিয়া সিংহদ্রিক্রম প্রকাশ
করিতেছিল, বীরমদে উত্তম হইয়া বার বার

শব্দ করিয়া সেই ব্যক্তির চোখা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের সৈন্তরাও সাহসে বীন ছিল না। অল্প স্বল্প রাজা চৌদ্রমন্ডের দ্বারা চালিত হইয়া, তাহারিগের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। ইন্দ্রনাথ ভীষ্মের মত ব্যূহের এ পার্শ্ব হইতে ওপার্শ্বে, এদিক হইতে ওদিকে অগ্রচালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে শত্রুর অস্তিত্ব পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, সেই সেই স্থানে সম্মুখীন হইতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আজি মহারাজ স্বয়ং তোমাদের যুদ্ধ দেখিতেছেন, আজি মহারাজের রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে, আজি দিল্লীর নাম ও গৌরব তোমরা রক্ষা করিবে।” এইরূপ উৎসাহবচন শ্রবণ করিয়া তাহার সৈন্তগণ উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, ভৈরব গর্জনে আকাশ বিভিন্ন হইল, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইল।

তথাপি দুই সহস্র সৈন্তের সহিত পঞ্চাশত সৈন্তের যুদ্ধ সম্ভবে না, ইন্দ্রনাথের সেনাগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল, শত্রুদিগের অনেক সৈন্ত হত ও আহত হইল, কিন্তু দুই সহস্রের মধ্যে এক শত কি দুই শত যুদ্ধে অক্ষম হইলে ক্ষতি নাই। দেখিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন, একবার ইন্দ্রনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, “ইন্দ্রনাথ! তুমি আপনার সৈন্তদিগকে যেরূপ রণ-শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম, কিন্তু সেনাগণ যেরূপ হত ও আহত হইতেছে, ভয় হয়, তাহারা রণে ভক্ত দিবে।”

ইন্দ্রনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন, “মহারাজ, আমার সৈন্তদিগকে সমুখ-যুদ্ধ করিতেই শিখাইয়াছি, রণে ভক্ত দিতে কখনও শিখাই নাই। বতকণ এক-

জন অথারোহী থাকিবে, ততকণ সমুখ-যুদ্ধ হইবে।

সন্ধার ছায়ার যুদ্ধক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে আবৃত হইতে লাগিল, কিন্তু সে চমৎকার ব্যূহ ভঙ্গ হইল না। একজন অথারোহী হত হয়, তাহার স্থানে অপর একজন অথারোহী আসিয়া ন্যায়মান হয়, সে হত হয়, আর একজন আসিয়া তথায় ন্যায়মান। শ্রেণী বত ক্রীণ হইতে লাগিল, সৈন্তগণের উৎসাহ ও উল্লাস বেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছিলেন, পলায়ন কাহাকে বলে, তাহার সৈন্তরা শিখে নাই। শত্রুগণ হতাশ হইয়া একবার বেগে শেষ আক্রমণ করিল, ভীষণ গর্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিল। দুই সহস্র অথারোহীর সে ভীষণ গর্জন এক ক্রোশ পর্যন্ত স্রুত হইল, দুই সহস্র অথার যুগপৎ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইল, কিন্তু সে শব্দে ও সে পদবিক্ষেপে ইন্দ্রনাথের ব্যূহ কম্পিত হইল না। যুদ্ধ সাধ হইল, সে অপরূপ ব্যূহ ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে সেতু নির্মিত হইল। রাজা পরিখা পার হইলেন, রাজা নিরাপদে পার হইয়াছেন শুনিয়া ইন্দ্রনাথের সৈন্তগণ একেবারে সিংহগর্জন করিল, সে গর্জনে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিল, তাহারা জানিল, যে স্রুত দুই সহস্র সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়াছে।

আক্রমণকারিগণ ভয়েচ্ছন্ন হইয়া নীরবে নিজ শিবিরান্তিমুখে প্রস্থান করিল। যতকণ রাজা চৌদ্রমন্ড সেতু পার হইতে গেলেন, ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টে তাহার দিকে দেখিতে ছিলেন। যখন দেখিলেন, রাজা নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, আপন অথ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিলেন,

কিন্তু সহসা পড়িয়া সেলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্তেরা তাঁহাকে উঠাইতে আসিয়া দেখিল, শত্রুর বন্দীতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিন্ন হইয়াছিল, শোণিতে তাঁহার শরীর প্রাণিত হইয়াছিল, বসন্ত-বশতঃ মুচ্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতে পতিত হইয়াছেন।

ইন্দ্রনাথের সৈন্তেরা অনেকেই সেতু পার হইয়াছিল। শত্রুগণ বাইবার সময় দেখিল, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়াছেন। উল্লাসে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রনাথকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া শিবিরান্তিমুখে চলিল। ইন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

The soldier's hope, the patriots's zeal,
For ever dimmed for ever crossed,
Oh ! who shall say what heroes, feel,
When all but life and honor's lost,
The last sad hour of freedom's dream,
And valor's task moved slowly by,
Whil mute they wached till

morning's beam,
Should rise and give them light to die,
There's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss
If death that world bright opening be,
Oh ! who would live a slave in this ?

moore.

শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ইন্দ্রনাথের চেতনা-সংকার হইল।

ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার চারিদিকে শত্রুসমূহ আসীন রহিয়াছে। সম্মুখে এক উচ্চ

সিংহাসনে মাস্তুমী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে মহামান্ত্র ওমরাহ অমাত্যগণ বসিয়া রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে টোডরমলের বিদ্রোহী সেনাপতি তর্ধান ও হমায়ুনকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথের পশ্চাতে জন্মান কুঠার-হস্তে দণ্ডারমান রহিয়াছে। প্রভুর দিকে নিমেষশূন্যলোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, আজ্ঞা বা ইঙ্গিত পাইলেই বন্দীর শিরশ্ছেদ করিবে। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিদ্রোহিতও ভীত হইলেন না, তীব্রদৃষ্টিতে মাস্তুমীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মাস্তুমীও ইন্দ্রনাথকে সচেতন দেখিয়া গভীরস্বরে বলিলেন, “হিন্দু! তুমি বীরপুরুষ, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ, বিদ্রোহাচরণের দণ্ড শিরশ্ছেদন।”

ইন্দ্রনাথ ভীষণস্বরে উত্তর করিলেন, “যোদ্ধা মৃত্যুর আশঙ্কা করে না, বাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমি বিদ্রোহাচরণ করি নাই।”

মাস্তুমী ইন্দ্রনাথের উগ্রভাবে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া বলিলেন, “টোডরমলের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গদেশের জারগীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্রোহাচরণ মতে?”

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্বে উত্তর করিলেন, “বঙ্গদেশের অধীশ্বর, সমস্ত ভাতরবর্ষের অধীশ্বর থাকবর শাহের জন্ত আমি বিদ্রোহী জারগীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি।”

সকলেই ভাবিলেন। ইন্দ্রনাথ আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছেন, সকলেই ভাবিলেন, মাস্তুমী সেইকণেই ইন্দ্রনাথের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিবেন। কিন্তু বহান্ন-ভব মাস্তুমী অসহ্য হিন্দুর এইরূপ নিষ্ঠা-কতা দর্শনে কুপিত হইলেন না, বরং আজ্ঞা-দিত হইলেন, বীরভাবে বলিতে লাগিলেন, “বীর! তোমার উগ্রতা কমা করিলাম,

তোমার বীরত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম ; কিন্তু তুমি বঙ্গদেশের জাগরিতারদিগকে আর কখন বিদ্রোহী বলিও না । আমরা মোগল-সন্তান, আমরা বন্ধবন্ধিতা, আমাদের বাহুবলে এ দেশ জয় হইয়াছে, আমরা এ দেশের প্রকৃত রাজা ।”

ইন্দ্রনাথ পূর্ববৎ সগর্বে উত্তর করিলেন, “আপনারা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছেন, আমি স্বীকার করি না । কিন্তু সম্রাট, আকবরের প্রত্যাপে আপনারা সে জয়লাভ করিয়াছেন, সেই সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ-চরণ করিতেছেন । বিধির নির্বন্ধের বিরুদ্ধা-চরণ করিয়া কেন শোণিতশ্রোতে সুন্দর বঙ্গদেশ প্রাবিত করিতেছেন ?”

মাসুমী । হিন্দু ! তোমরা বিধির নির্বন্ধের উপর প্রভু করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী মোগলেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না, অধীনতা স্বীকার করিবে না ।

ইন্দ্রনাথ । পাঠানগণও এই কথা বলিয়াছিল, এক্ষণে পাঠানরাজ্য কোথায় ? দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনারাও বৃথা যুদ্ধ করিতেছেন, বৃথা রক্তশ্রোতে বঙ্গদেশ প্রাবিত করিতেছেন ।

মাসুমী । হিন্দু ! তোমার জীবন মৃত্যু আমার হস্তে, তোমার কি জীবনের অভিলাষ নাই যে, আমার সম্মুখে এইরূপ কথা কহিতেছ ?

ইন্দ্রনাথ । আমার জীবনের অভিলাষ অনেক আছে, কিন্তু যখন আপনাদিগের হস্তে পড়িয়াছি, তখন আর জীবনের আশা রাখি না ।

মাসুমী । কেন ?

ইন্দ্রনাথ । সাহসী পুরুষ শত্রুকে কমা করিতে পারেন, বাহারা জয় নিশ্চয় জানেন, তাঁহারা শত্রুকে কমা করিতে পারেন ; কিন্তু

বাহারা নিজের অর সংশয় করেন, তাঁহারা শত্রুকে কখনও কমা করিতে পারেন না ।

অনেকক্ষণ কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের হীনবল শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছিল, তাহাতে বন্ধুহুল হইতে পুনরায় শোণিত নির্গত হইতে লাগিল ।

মাসুমী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, “পায়র ! কৌশল বাক্যের দ্বারা কমা পাইবার প্রত্যাশা করিও না ।”

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্বে উত্তর করিলেন, “আমি কোন প্রত্যাশা করি না, কেবল এই প্রত্যাশা করি যে, জন্মান্তর আপন কার্য্য শীঘ্রই নিশ্চয় করিবে ।”

কিন্তু জন্মান্তরে সে ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল না । ইন্দ্রনাথের মৃত হইতে রক্তশ্রোত ক্রমশঃ বন্ধি পাইতে লাগিল । স্বরাস শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল । ইন্দ্রনাথ পুনরায় চেতনাশূন্য হইয়া ধরাতে নিপতিত হইলেন ।

মাসুমীর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে । আহত, বলহীন, ১৫তম্রহীন বোদ্ধার শির-ছেদনের আজ্ঞা দিলেন না, বলিলেন, “অধুনা কারাগারে লইয়া যাও ।”

ইন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত হইলেন ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

রমণীর বীরত্ব ।

THE midnight passed, and to the masey door
A light step came—it paused—it moved
once more.
Slow turns the grating bolt and sullen key
‘Tis his heart foreboded—that fair she !
byron.

একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কারাগারে একজন বীরপুরুষ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়া

ছেন ; কাগাগারের একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া প্রাতঃকালের তরুণ রোদ্ভ আসিতেছে, অন্ধকাররাশি মধ্যে সেই রোদ্ভের রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ সেই রোদ্ভের খাষ খেলা করিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, একবার রোদ্ভের খাষ দেখা যাইতেছে, আবার অন্ধকাররাশিতে লীন হইতেছে । দুই একটি ক্ষুদ্র পক্ষী সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেছে, আবার ক্ষণেক পর উড়িয়া যাইতেছে, তাহার বন্দী নহে, পক্ষবিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষশাখার বিচরণ করিতেছে, জগৎসংসারে ও আকাশ-বগুলে ভ্রমণ করিতেছে । বীরপুরুষ সেই জুগলব্যায় শয়ন করিয়া সেই বাতায়নের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, অন্ধকারস্থিত লতাপল্লব বেরুগ বাহবিস্তার করিয়া আলোকের দিকে যায়, বন্দীর নয়ন সেইরূপ বাতায়নের দিকে রহিয়াছে । বন্দী কি চিন্তা করিতেছেন ? রোদ্ভের খাষ পতঙ্গমুহুর খেলা দেখিতেছেন ? বাতায়নাগত পক্ষিগণ বধন পুনরায় পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, বন্দী ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানস-পক্ষ বিস্তার করিয়া ক্ষুদ্র জগৎসংসার ও অনন্ত নীল আকাশে পর্যটন করিতেছে ।

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তা করিতেছেন না । তাঁহার হৃদয়ে অল্প চিন্তার উদ্রেক হইতেছে । ইন্দ্রনাথ বোকা, বোকার মত্বাতে ভয় নাই । কিন্তু তিনি মরিলে অন্তের কি রেশ হইবে, সেই চিন্তার তিনি অস্থির হইয়াছিলেন । তাঁহার পিতা পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ এই বার্ষিক্যে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবাস্তা শ্রবণ করিলে জীবনত্যাগ করিবেন । নগেন্দ্রনাথের আর কেহই নাই, ভাৰ্য্যা নাই, কন্যা নাই, অল্প পুত্র নাই, বন্ধু একমাত্র পুত্রের উপর চাহিয়া জীবনধারণ করিতেছিলেন,

সেই পুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণ করিলে বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিবেন । নগেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য হইবে ।

আর সেই অজ্ঞান বালিকা, সেই প্রেম-বিহ্বলা সরলা, সেই সহায়হীনা, সম্পত্তিহীনা কুটীরবাসিনী সরলা, তাহারই বা কি দশা ঘটিবে ? ইন্দ্রনাথ সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে বাইবার প্রীতিজা করিয়াছিলেন, সে সপ্তম পূর্ণিমা অতীত হইবে, বালিকা আশানুজ্ঞে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নয়ন মুদিত করিবে, জীবন অভাবে অপরিষ্কৃত পুষ্পের স্তায় নীরবে অসময়ে শুকাইবে । চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের মস্তক ঘূর্ণিতে লাগিল, নয়ন দৃষ্টিশূন্য হইল, বলিলেন, “ভগবন্ ! তোমার বাহা ইচ্ছা কর, বিধির নিয়মে যাহা আছে হউক, আমি আর এ চিন্তা-বাতনা সহ করিতে পারি না ।”

শক্রদিগের মধ্যে ইন্দ্রনাথকে পীড়ার সময় বন্ধু করে, এরূপ কেহই ছিল না । কারাগারের পার্শ্বে প্রহরিগণ নিঃশব্দে খড়গহস্তে দিবারাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত । সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একজন ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিত, আহার সাক্ষ হইলে একমাত্র দাসী নিঃশব্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া যাইত । ইহা ভিন্ন আর কেহই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না । শক্রশিবিরের মধ্যে ইন্দ্রনাথের কেবল একমাত্র বন্ধু ছিল । যে দাসী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই কারাগৃহ পরিষ্কার করিতে আসিত, সেই ইন্দ্রনাথের দুঃখে বর্ষাৰ্থ দুঃখিনী । প্রত্যহ নীরবে আসিয়া নীরবে প্রস্থান করিত বটে, কিন্তু সেই বীরের দুঃখ দেখিয়া সে অন্তরালে অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিত । নির্দয় শত্রুগণ বন্দীকে অতিশয় কষ্টে রাখিত, শয়নের অল্প ভূমিতে কেবল-

মাত্র তৃণশয্যা রচনা করিত। দাসী ইন্দ্রনাথের জন্য আপন বস্ত্র ছাড়া সেই তৃণশয্যা যুগিত করিয়া বাইত। শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে দিনের মধ্যে কেবল একবারমাত্র অপকৃত্ত আহার দিত, দাসী আপনি অনাহারে থাকিয়া ইন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার সুপথ্য আনিয়া দিত। শত্রুগণ ইন্দ্রনাথের চিকিৎসা করাইত না, দাসী তাঁহার ক্ষতগুলি জলে ধোত করিয়া পুনরায় পরিকার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিত এবং ঔষধ আনিয়া দিত। সেই করুণা-জলসেচনে ইন্দ্রনাথের ক্ষত আরাম হইতে লাগিল, তিনি দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ প্রায় আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি সময়ে সময়ে দাসীর বস্ত্র ও মমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কারাগৃহের অন্ধকারে দাসীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না, কোন কথা কহিতে চাহিলে দাসী ধীরে ধীরে প্রহরীর দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করিত। ইন্দ্রনাথ আবার নিশ্চল হইয়া আপন চিন্তায় অভিভূত হইতেন।

প্রহরিগণ দাসীর এই স্বাভাবিক মমতা দেখিয়া কখন কখন উপহাস করিয়া বলিত, “এ বিবি, এ হিন্দু কি তোমাকে দাসী করিবে?” এরূপ উপহাসে দাসী বিরক্ত হইত না, কখন কখন অতি নম্রভাবে উত্তর দিত, কখন কখন প্রহরীদিগকে সুরাপান করিতে দিত, সুতরাং সকল প্রহরীই দাসীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সমস্ত রাত্রি নভায়মান হইয়া চোঁকি দিবার সময় সেই নব-প্রস্ফুটিত পদ্মের স্তায় সুন্দরী দাসীর কথা ভাবিত, নিদ্রার সময়ে সাকী ও সুরাপেশালাস স্বপ্ন দেখিত।

অল্প রজনীতে দাসী রন্ধকক্ষকে সুরাপান করিতে দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, দাসী

সুরা লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া প্রহরীদের মন আক্লান্দে পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে সুরা বস্ত্রকে উঠিতে লাগিল, রজনী প্রহরীর মধ্যে প্রহরীর অজ্ঞান অবস্থার শয়ন করিল। সুরাপেশালা ও সাকীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দাসী কারাগারে প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতর তৃণশয্যার বীর-পুরুষ নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের ললাট পরিকার, ওষ্ঠে হাসির চিহ্ন। এ দৃশ্যসংগরে তিনি কি সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন?—দেখিতেছেন, যেন আজি পূর্ণিমা, যেন অস্ত্র তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় রক্তপূরে গিয়াছেন, যেন বহুদিন পরে হৃদয়ের সরলাকে পাইয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, যেন সরলার আনন্দাশ্রিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতছে! সহসা ইন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল; চমকিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার তৃণশয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একটি নারী যথার্থই রোদন করিতেছে, কারাগৃহের সেই দাসী নীরবে দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছে!

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। দাসীর দয়া ও মমতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। আপনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না—বলিলেন, “হতভাগার চরণে ভূমি কি জন্য চুঃখিনী? আমার আর জীবনের আশা নাই, পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।”

দাসী উত্তর করিল না, নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথকে আবার বলিলেন, “এ অসময়ে তুমি আমার প্রতি বেবে মমতা প্রকাশ করিলে, জগদীশ্বর তজ্জন্য তোমাকে সুখে রাখিবেন। আমি তোমাকে কিছু দিয়া পুরস্কার করি, এরূপ আমার কিছুই নাই। আমি বন্দী। এই স্ববর্ণের অঙ্গুরীটি

গ্রহণ কর, আমার বিশৃঙ্খল পীড়ার সময় বেকশ তত্বাবধি করিলে, দুঃখজনকভাবে হস্তে আমার রক্ত হইলে পর এই অঙ্গুরীটি দেওয়া এক একবার আমার কথা শ্রবণ করিও।”

দাসী অনেকক্ষণ কোন উত্তর করিল না, অনেকক্ষণ অধোবদনে অঙ্গবর্ষণ করিতে লাগিল, অবশেষে নীরবে হৃৎ-প্রসারণ করিয়া সেই রক্তুরীটি গ্রহণ করিল, নীরবে সেটি আপনার গলার কণ্ঠমালায় বাঁধিয়া রাখিল; কতক্ষণ পরে চক্ষুর জল মোচন করিয়া অর্ধকুটম্বরে বলিল, “সৈনিকবর! আপনি আমার প্রতি ভূট হইয়াছেন, আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাহারই চিরুপকল্প এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করিলাম, তাহারই স্মরণার্থ এটি আজীবন ধারণ করিব। সেনাপতি ইন্দ্রনাথ বোধ হয় দাসীকে বিস্মৃত হইয়াছেন।”

সে কোকিল-বিনিমিত স্বরে ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন, শব্দ্যার একেবারে উঠিয়া বসিলেন। বনগ্রামের মুহুর্ধরমন্দিরে সে স্বর একবার শুনিয়াছিলেন, গন্ধাবন্ধের উপর নৌকামধ্যে সে স্বর আর একবার শুনিয়াছিলেন। পক্ষার জলময় হইবার সময় যে নারী ইন্দ্রনাথকে একবার উদ্ধার করিয়াছিলেন, অস্ত্র সেই নারী—সেই বিমলা দাসীবেশ ধারণ করিয়া শত্রুশিবির হইতে ইন্দ্রনাথকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

চিন্তা ভরজমালায় ভ্রাস ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে উৎফলিত হইতে লাগিল, তাহার হৃদয় ক্ষীত হইল, নয়ন দুইটি জলে পূর্ণ হইল। শেষে বিমলার হস্তদুইটি ধরিয়া কক্ষণখরে বলিলেন, “মানবা কি দেবী! আপনি কে, আমি জানি না, কিন্তু বিপদকালে আপনি আমার চিরসহায়! এই বিপদপূর্ণ শত্রুশিবিরে

আপনি আমার উদ্ধারার্থ একাকিনী আসিয়াছেন, আপনাকে দাসী বলিয়া আমি কথা কহিয়াছি, আমার জীবন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তুচ্ছ অর্থ পুরস্কার দিতে চাহিয়াছি, এ সকল অপরাধ কি আপনি মাফনা করিবেন?”

ইন্দ্রনাথের কথাগুলি যেন বিমলার কর্ণে অন্তর্ভবণ করিল, ইন্দ্রনাথের হস্তসংস্পর্শে বিমলার শরীর কাঁপিতে লাগিল, গাভ্র কণ্টকিত হইল। কিন্তু বিমলা প্রত্যাশাপন্নমতি, যত্নে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত সরাইয়া লইলেন ও ধীরস্বরে উত্তর করিলেন, “সৈনিকবর, আপনার অপরাধ নাই, আমি দাসীবেশে আসিয়াছি, আপনি আমাকে দাসী বিবেচনার বশেষে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি যে পুরস্কার দিয়াছেন, তাহা আমি আজীবন হৃদয়ে ধারণ করিব, আজি যে আমার প্রতি একটু স্নেহ প্রকাশ করিলেন, আজীবন তাহা স্মরণ রাখিব; কিন্তু এক্ষণে এ সমস্ত কথা কহিবার অবসর নাই, এক্ষণে অন্ত কথা বলিতে আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমি আপনার উদ্ধারের উপায় সন্ধান করিয়াছি, কারাগৃহের সহস্র-ধর চৈতন্তশূন্য হইয়াছে, আপনি এই রমণীয় বেশ ধারণ করিয়া চলিয়া যাউন। কারাগৃহের বাহিরে সৈনিকগণ যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, বলিবেন—আমি ভিখারিণী দাসী।”

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, বিমলার সাহস ও স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু কণমাত্র চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, “দেবী! কমা করুন, আমি আপনাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছুক নহি। আপনি এইরূপে আমার

উদ্ধার করিয়াছেন জানিলে নৃশংস শত্রুগণ আপনাকে প্রাণে বধ করিবে ।”

বিমলা বলিলেন, “আমার জন্ত চিন্তা করিবেন না, আমার উদ্ধারের উপায় আছে, উদ্ধার না হইলেও অধিক ক্ষতি নাই । আমার জন্ত চিন্তা করিবে, আমার জন্ত শোক করিবে, জগতে এরূপ অধিক লোক নাই । অনন্ত সাগরের মধ্যে একটি জলবিধ ঘেরণ লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগৎসংসারে একজন হতভাগিনীর মৃত্যু অশ্রুত অলঙ্কিত থাকিবে । আপনি বশবী, কমতাশালী, বীরপুরুষ, আপনি সুখে থাকিলে অনেকে সুখে থাকিবে ।”

ইন্দ্রনাথ বিমলার প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন ; অবশেষে ধীরভাবে বলিলেন, “দেবি ! আপনি আমার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছেন, তাহার জন্ত আমি আজন্মকাল আপনার নিকট বাধিত রহিলাম ; কিন্তু আপনাকে এই স্থানে রাখিয়া আমি কারা-পরিত্যাগ করিব না, উপরোধ করিবেন না ।”

এবার বিমলা পরাস্ত হইলেন । অনেক অহরোধ করিলেন, অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন, কিছুতেই বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা বিচালিত করিতে পারিলেন না । ইন্দ্রনাথের একই উত্তর, “যিনি আমাকে একবার প্রাণদান করিয়াছেন, পুনরায় আমার উদ্ধারের জন্ত এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া আমি উদ্ধারপ্রার্থনা করি না, এরূপ উদ্ধারে, এরূপ জীবনে আমার কাজ নাই ।”

অবশেষে বিমলা অতি কষ্টে বলিলেন, “বীরপুরুষ ! আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষণী সরলা আজি চতুর্দশদিন ধরে আবদ্ধ রহিয়াছেন । আপনি শীঘ্র তাহার উদ্ধার না করেন, পায়র

শব্দনি নিজেই একজন ভৃত্যের সহিত সরলার বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছে ।”

ইন্দ্রনাথ সহসা বজ্রাহতের স্তায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন । তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ললাট হইতে ঘেদ-বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল । বিমলা তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন, ইন্দ্রনাথ নীরবে শুনিলেন, নীরবে হস্তের উপর ললাট স্তম্ভ করিয়া অধোবদনে রহিলেন । মস্তকে শিরা ক্ষীত হইতেছিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল ।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, “ভদ্রে ! আপনার কথাই থাকিবে, আমি পলায়ন করিব, কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা ?”

বিমলা । কি প্রতিজ্ঞা ?

ইন্দ্রনাথ । যদি কল্যা আপনার উদ্ধারের উপায় না হয়, যদি নৃশংস শত্রুরা আপনার বধের আজ্ঞা দেন, অঙ্গীকার করুন, রাস্তায় নিকট তিন দিবসের সময় প্রার্থনা করিবেন । আমি রাস্ত্যোকে বিলক্ষণ জানি, অবলার এ বাচ্ছ্য কখনই অস্বীকৃত হইবেন না । তিন দিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে ।”

বিমলা তাহাই প্রতিজ্ঞিত হইলেন ।

তখন বিমলা ইন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন । ইন্দ্রনাথ আপনার নূতন রূপ দেখিয়া হাসিলেন ; আবার বিমলার দিকে চাহিলেন ; উষ্মের সহিত বিমলার হস্ত দুইটি আপনার দুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, “ভদ্রে ! দুইবার আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন, জগদীশ্বর আমার সহায় হউন । আমি আপনার এ ধ্বংস পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব ।” এই কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের উকনিখাস বিমলার বাহুলতার উপর পড়িল, ইন্দ্রনাথের

গর্জনের বিষময় করণের স্বপ্ন করিল। বাতাস হত পত্রের স্তম্ভ বিবলার গাত্র কাঁপিতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইল। মুহূর্তমধ্যে ইন্দ্রনাথ অদৃশ্য হইলেন, বিমলা ললাটের বেদ মোচন করিয়া সেই অন্ধকারময় কুঠীতে বসিয়া পড়িলেন। নৈশ জগৎ দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিমলার নারীস্বপ্নও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের বীরত্ব।

HEARD ye the din of battle bray.

Lance to lance and horse to horse.

Grey.

ইন্দ্রনাথকে সহসা শিবিরে দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের বিষয় ও আত্মাদের সীমা রহিল না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ গভীরস্বরে বলিলেন, “কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অধীনস্থ অসারোহিণী মস্তক লইয়া প্রস্তুত হও, এইক্ষণেই নিঃশব্দে শত্রুশিবির আক্রমণ করিব।”

সৈন্তেরা বিষময়াপন্ন হইল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ এই অবসরে ভগবানের নাম লইলেন; দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, “ভগবন্! অস্ত্রকার মত অসমসাহসী কার্যে আমি কখনও লিপ্ত হই নাই; অস্ত্র প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিষমলাভ করিতে দিন, আমার উপকারিণীর উদ্ধার সাধন করিয়া যদি প্রাণে হত হই, কতি নাই।”

রজনী তিন প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার।

আকাশে দুই একটি তারা দেখা বাইতেছিল, আবার মেঘরাশিতে আবৃত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে পেচকের ভাষণ শব্দ শুনা বাইতেছে, নিকটই গভীর ভীম কল্লোল স্রুতিগোচর হইতেছে। সে গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথের সেনা নিঃশব্দে শত্রুশিবিরভিত্তিতে চলিল।

কণেক ঘাইতে ঘাইতে দূর হইতে একটি আলোক দৃষ্টিগোচর হইল, সে আলোক একবার দেখা যায়, অন্তবার নির্জ্ঞানপ্রায় হয়। ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, একজন দূতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূত নিঃশব্দে বাইয়া নিঃশব্দে প্রত্যাবর্তন করিল;—বলিল, “শত্রুপক্ষের চারিজন শিবিররক্ষক ঐ স্থানে পাহারা দিতেছে।” ইন্দ্রনাথ দশজন তীরন্দাজকে অগ্রে ঘাইতে বলিলেন ও আদেশ করিলেন, “যদি ঐ চারিজনের মধ্যে একজন পলাইয়া বাইয়া শিবিরে সংবাদ দেয়, তবে তোমাদের দশজনের প্রাণসংহার করিব।” তীরন্দাজগণ ধীরে ধীরে বাইয়া মুহূর্তমধ্যে চারি জনকেই ভূতলশায়ী করিল। ইন্দ্রনাথের সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরও দুই তিন স্থানে ঐরূপ পাহারা ছিল, রক্ষকগণ ঐরূপে নিহত হইল। অচিরে ইন্দ্রনাথ শত্রুদিগের পারিধার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেনাদিগকে পরিধা পার হইতে আদেশ দিলেন।

পরিধার অপর পার্শ্বের মুসলমানগণ সহসা শত্রুর আগমন দেখিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সজ্জিত হইবার পূর্বেই ইন্দ্রনাথ সৈন্তে পরিধা পার হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ তখন সৈন্তসমূহকে সেই পরিধা রক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া কেবল পঞ্চাশ জনমাত্র সঙ্গে লইয়া উদ্ধাধানে কারাগারের দিকে বাইলেন।

কারাগৃহের বাহিরে সৈনিকগণ দায়রকা করিতেছে। ইন্দ্রনাথ এখনও কারাগৃহে বদ্ধ আছে, তাহার। এইরূপ বিবেচনা করিতেছিল, সহসা ইন্দ্রনাথের বন্ধনাদ শুনিয়া এবং ইন্দ্রনাথ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বেগে পলায়ন করিল। ঘরের নিকট বাইরা ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার ঘরের রক্ষকদ্বয় এখনও স্ত্রীর অচেতন, নিকটে একটি দীপ জলিতেছে। ইন্দ্রনাথ দীপটি হাতে লইয়া ঘরের ভিতর বাইলেন, দেখিলেন, সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের তৃণশয্যার বিমলার শ্রান্ত শীর্ণ দেহলতা পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু মুদিত, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষঃস্থল দীর্ঘে দীর্ঘে ক্ষীণ হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত্তকাল সজল-নয়নে ভগবানকে শত শত ধনবাদ দিলেন। তৎপরে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ক্ষীণ দেহলতা তৃণশয্যা হইতে উঠাইয়া ঘর হইতে নিজাক্ত হইলেন। ক্ষণেক পর বিমলার ঘন চেতনা হইল, ইন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, "সেনাপতি ইন্দ্রনাথ আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন? ভগবান আপনার উপকার করিবেন। আমি বৃত্তাই স্থির করিয়াছিলাম, কেবল মৃত্যুর সময় পিতাকে দেখিলাম না, এই ভক্ত মনে বড় ক্লেশ হইতেছিল। সেনাপতি, আমার উদ্ধার-সাধন করুন, আমি পিতাকে আর একবার দেখিব।"

এই কাতর স্বর শুনিয়া, ইন্দ্রনাথের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, কিন্তু উত্তর দিবার অবসর ছিল না। ইন্দ্রনাথ অঝোরোহণ করিলেন এবং শিশুকে যেরূপ উঠাইয়া লয়, সেইরূপ বিমলার ক্ষীণ শরীর আপনার পক্ষে উঠাইয়া লইলেন। বিমলা না পড়িয়া বান, এই ভক্ত একটি পেট দিয়া বিমলার শরীর ইন্দ্রনাথের শরীরের সহিত বদ্ধ করা হইল।

যেখানে ইন্দ্রনাথের অঝোরোহিণী পরিখা

রক্ষা করিতেছিল, বিদ্যাপতিতে ইন্দ্রনাথ সেইখানে বাইলেন। চারিদিকে কক্ষমেষের ভায় প্রায় তিন চারি সহস্র বক্রসৈন্য সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রনাথ ক্ষতবেগে সসৈন্তে পরিখা পার হইয়া ক্ষতবেগে দুর্গাভিমুখে চলিলেন, শত্রুসেনা নিকটে আসিবার পূর্বেই তাহার। যুদ্ধে পৌছিলেন।

সমস্ত শিবির জয় জয় রবে পরিপূরিত হইল। ইন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়াছেন, হইয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষপত অঝোরোহীর সহিত শত্রুদিগের পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া, সর্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন, এরূপ সংবাদ পাইয়া মোগল-সৈন্যগণ উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইল। চৌদুরমল্ল মেহসহকারে ইন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অবসর রহিল না।

কয়েক জন অঝোরোহী ভিন্ন বিমলার কথা কেহ জানিল না। বিমলা, সেই রজনীযোগে পিজলায়ে বাইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

Out! out! brief candle! *William Shakespeare.*

উপর-উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রাজা চৌদুরমল্ল ও ইন্দ্রনাথ দুইজনে ছাগুর শ্রাটীরোপরি পান-চারণ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকদূর কথাপকথন হইতেছিল।

রাজা। ইন্দ্রনাথ! যুদ্ধে কেবল সাহস আবশ্যক করে না, রণকৌশলও আবশ্যক।

ইক্ষনাথ। কিন্তু আপনি কি বোধ করেন, যদি আমরা দুর্গ ছাড়িয়া সমুদ্র-পথে প্রস্থত হই, তাহা হইলে আমরা পরাস্ত হইব ?

রাজা। যুদ্ধ করিলে পরাস্ত হইব না, কিন্তু কয় জন যুদ্ধ করিবে ?

ইক্ষনাথ। মহারাজ, তবে আমরা কয় দিন এই অবস্থার দুর্গের ভিতরে থাকিব ?

রাজা। আর অধিক দিন নহে। ঐ যে একখানি শিবিকা আসিতেছে, উহার আরোহী আমাদের এক্ষণেই সংবাদ দিবেন যে, আর অল্প দিনের মধ্যে শত্রুর বিনাশ হইবে, আমাদের বিনা যুদ্ধে জয় হইবে।

ইক্ষনাথ। মহারাজ ! আপনার যুদ্ধ-কৌশল জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু আপনি ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, তাহা আমি জানিতাম না।

সেই শিবিকা নিকটে আসিলে তাহার ভিতর হইতে দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র অবতরণ করিলেন। ইক্ষনাথ তাঁহাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত রাজা টোডরমলের যে যে কথা হইল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক নাই। সতীশচন্দ্র রাজা টোডরমল কর্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু-জমীদারের নিকট প্রেরিত হইরাছিলেন। সতীশচন্দ্র কার্যদক্ষ, বাক্পটু ও বুদ্ধিমান। সেই সকল জমীদারের নিকট নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে একে একে শত্রুপক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটপক্ষ অবলম্বন করিতে লগ্ন হইয়াছিলেন। আকবর শাহ হিন্দুদিগের পরম বন্ধু ; হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করসমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন ; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন ; হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছেন ; হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহারের কোন কোন অংশ অবলম্বন করিয়াছেন ; বঙ্গদেশে

হিন্দুসেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, বিজয়লক্ষী স্বয়ং সে সেনাপতির হারা-ধরূপ ; তিনি ছইবার বঙ্গদেশ অর করিয়া-ছিলেন এবং এবারও অর করিবেন ; অর করিলে, বিদ্রোহী জারঙ্গীরাগদিগকে শাস্তি দিবেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সহায়তা করিলে সে কস্তুর মহাত্মা কখন সে স্বর্ণ বিষ্মত হইবেন না ;—ইত্যাদি নানারূপ প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন করিয়া সতীশচন্দ্র অনেক জমীদারকে সম্রাটপক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন। সেই জমীদারগণ এক্ষণে শত্রুসৈন্যদিগকে ষাণ্ডজব্য পাঠাইবেন না স্বীকার করিয়া-ছিলেন। সুতরাং আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে শত্রুগণ আহাির অভাবে রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া দিগ্বিদিক্ চলিয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা সতীশচন্দ্রকে বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, ইক্ষনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “ইক্ষনাথ, আমার কথা সত্য কি না ?”

ইক্ষ। মহাশয়, আপনি যুদ্ধে বেরাপ অজের, কৌশলে সেইরূপ অতুল্য। কিন্তু—

রাজা। কিন্তু কি ?

ইক্ষ। আমি কাহার বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু সতীশচন্দ্রের সমস্ত কথা আপনি কি বিশ্বাস করেন ?

রাজা। তরুণ সেনাপতি কি টোডরমলকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাহেন ? কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা ইক্ষনাথ কি আমা অপেক্ষা ভাল জানেন ?

ইক্ষ। মহারাজ ! আমার অপরাধ লইবেন না, কিন্তু হইতে পারে, এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে আপনি বাহা জানেন, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক জানি।

রাজা। হইতে পারে, ইক্ষনাথ বতবুদ

জানেন, আমিও তত্বর জানি, হইতে পারে, ইন্দ্রনাথের মনে এইকণে কি চিন্তা হইতেছে, তাহাও আমি জানি ।”

ইন্দ্রনাথ বিষয়ে অবাক হইয়া রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; রাজা পূর্বের ভায় পুনরায় ঐবৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এই সতীশচন্দ্র রাজা সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহাই চিন্তা করিতেছেন ।”

ইন্দ্রনাথ বিষয়ে সংজ্ঞানুস্তের ভায় হইলেন, বলিলেন, “মহারাজ ! কমা করুন । আপনি অন্তর্ধারী !”

রাজা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “ইন্দ্রনাথ ! কেবল ভগবান্ই অন্তর্ধারী, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি চারদিকের সন্ধান না রাখিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না । যুদ্ধ-কার্যে আমার কেশ গুরু হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধকৌশল কিছু শিথিয়াছি ।”

ইন্দ্রনাথ কণেক মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! তবে রাজা সমরসিংহের হত্যা-কথা আপনি অবগত আছেন ?”

রাজা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “সে হত্যা-কথা আমি জানি এবং বথাকালে সে হত্যার বিচার করিব । আমার পুত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে কমা করিতে পারি, কিন্তু রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে কমা করিতে পারি না ।”

সেই রাত্রি একপ্রহরের সময়ে সতীশচন্দ্র গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছেন । আঁকি তিনি রাজার নিকট সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্বপ্ন উল্লাসে পরিপূরিত হইয়াছে, মারাবিনী আশা তাঁহার কানে কানে বলিতেছে, ‘তুমি একদিন শাপের দণ্ডের ভয় করিয়াছিলে, সে শাপ কে জানিতে পারি-

রাছে ? দণ্ড কোথায় ? এখন মিন মিন ভোমার সন্ধানবুদ্ধি হটুক, পদবুদ্ধি হটুক ।” শূর্য্য অস্তে বাইবার সময় অবধি কুহকিনী আশা তাঁহার কানে কানে এই প্রকারে বলিতেছিল, সেই শূর্য্য পুনরায় উদয় হইবার আগে সতীশচন্দ্র বুলিলেন, আশা মারাবিনী—কুহকিনী—মিথ্যাবাদিনী ।

সহসা চন্দ্রালোকে সতীশচন্দ্র একজন দস্যুকে দেখিতে পাইলেন । দেখিতে দেখিতে সেই দস্যু ছুরিকা হস্তে সতীশচন্দ্রের দিকে দৌড়িয়া আসিল, সতীশচন্দ্র পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; সেই হত্যাকারী ছুরিকাধারী সতীশচন্দ্রকে আহত করিল । সতীশচন্দ্রের ভৃত্যগণ তখন দৌড়াইয়া আসিয়া খড়্গ দ্বারা দস্যুকে ভূতলশায়ী করিলেন ।

বৃতপ্রায় দস্যু বলিল, “সতীশচন্দ্র, আপনার মৃত্যু সন্নিকট ।”

সতীশচন্দ্র । নরাদম ! ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন, তোর আঘাতে সামান্য মাজ রক্ত পড়িয়াছে ।

দস্যু । সেই সামান্য আঘাতে আপনার প্রাণনাশ হইবে, আমার ছুরিকা বিষাক্ত । প্রভু ! আপনি আমাকে কি জানেন না ?

সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার পুরাতন ভৃত্যকে চিনিলেন ; বলিলেন, “নরাদম !” তাকে কে এত প্রভুতক্তি শিখাইয়াছিল ?

ভৃত্য অতি ক্রোধ ও অলিতভাবে উত্তর করিল, “পাপিষ্ঠ নহুনি ।”

সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, “আমিও ভাবিয়াছিলাম, সেই পামরেরই এই কার্য্য । পৃথিবীতে তাহার মত ভীষণ পাপী আর নাই, নরকেও নাই । কিন্তু তুমি আমার পুরাতন ভৃত্য হইয়া আমার বধে সন্মত করিয়াছিলি ?”

ভূতা আরও ক্ষীণবরে উত্তর করিল,
“ব—ব—বহুনি অনেক লোভ দেখাইয়া-
ছিল, লোভে পড়িলে জ্ঞান থাকে না।
লোভে পড়িয়া পাপ করিলাম, প্রাণ হারাই-
লাম।”

আর কথা বাহির হইল না, শরীর হইতে
প্রাণ বহির্গত হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে
স্থির হইল, নয়ন দুইটি আকাশের দিকে
চাহিয়া বহিল। চন্দ্রালোকে মৃতদেহের দিকে
চাহিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, “ভূতা, তোর
অপেক্ষা জানী লোকও লোভে পড়িয়া জ্ঞান
হারাইয়াছে, তোর অপেক্ষা ভীষণ পাপ
করিয়াছে, তোর মত প্রাণ হারাইবারও
বিলম্ব নাই, পরমেশ্বর তোকে ক্ষমা করুন,
আমার পাপের ক্ষমা নাই।”

প্রাতঃকালে রাজার নিকট সংবাদ আসিল,
দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন
করিয়া রহিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সতীশ-
চন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন, ইচ্ছনাথ সঙ্গে
সঙ্গে ছিলেন।

তথায় বাইরা দেখিলেন, সতীশচন্দ্র
শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে
চিকিৎসক বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যে
ভীষণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে,
তাছাতে পরিজ্ঞান নাই। রাজা এই অদ্ভুত
ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্থক্য
অনুসন্ধান সর্বশেষ অবগত করাইল। তখন
সতীশচন্দ্র অতি ক্ষীণবরে বলিতে লাগিলেন,
“মহারাজ! আমি পাণী, পাণিষ্ঠকে ক্ষমা
করুন।”

রাজা নিমন্ত হইয়া রহিলেন। সতীশচন্দ্র
পুনরায় বলিলেন, “আমি ভীষণ দোষ করি-
য়াছি, সে অপরাধ ক্ষমা করুন।”

রাজা তথাপি নিমন্ত হইয়া রহিলেন।
সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “মহারাজ!

আমি নরহত্যাকারী, কিন্তু সকল অপরাধেরই
ক্ষমা আছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি
নরহত্যাকারী; মৃত্যুশয্যায় ক্ষমা প্রার্থনা
করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।”

সে কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া রাজা আর
সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,
“রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে আমি
কখনও ক্ষমা করিব ভাবি নাই। কিন্তু জগ-
দীশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়াছেন, আমি
তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার জীবিত
ধাকিবার আর অধিক কাল নাই, ভগবানের
নাম গ্রহণ কর, তিনি দারার সাগর, যুত-
কালে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে
জীবনের পাপখণ্ডন হয়।”

চকিত হইয়া সতীশচন্দ্র আবার রাজাকে
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মহারাজ! তবে
আপনি সমরসিংহের মৃত্যুর কারণ সর্বশেষ
অবগত আছেন?”

রাজা উত্তর করিলেন, “আছি।”

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, নিমন্ত হইয়া
রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বলিলেন, “মহা-
রাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।
আমি পাণী বটে, কিন্তু জন্মাবধি পাণী
ছিলাম না, যৌবনে আমার জীবন পবিত্র
ছিল, উচ্চ মতি, উচ্চ আশ্রয়, উচ্চ প্রবৃত্তি
ছিল। লোভে, মহালোভে পড়িয়া সে
সকল হারাইয়াছি, জীবন পাণে কলুষিত
হইল, আজি প্রাণ হারাইলাম।”

সতীশচন্দ্রের ক্ষীণবর অধিকতর ক্ষীণ
হইয়া আসিল, আর কথা নিঃসৃত হইল না।
রাজা স্বপ্নেহে ওঠে দৃষ্ট দিলেন, রসমুখ ওঠ
পুনরায় সিক্ত হইল। সতীশচন্দ্র পুনরায়
বলিতে লাগিলেন, “আমি পাণী বটে, কিন্তু
আমার অপেক্ষাও ঘোরতর পাণী আছে।

মহারাজ ! আবার কৃত্য শুনিয়ে
বর্ষাব সময়সিংহকে বধ করিয়াছে,
সেই অন্য আবার বধ করিল, আপনি
তাহার বিচার করিবেন "

ক্রোধে রাজা চৌদরমন্ডের নয়নধর রক্ত-
বর্ণ হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া
বীরে বীরে বলিলেন, "চিন্তা নাই, অগদীষর
শাস্তির দণ্ড দিবেন।"

আবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব
হইয়া রহিল। সতীশচন্দ্রের আশু নিঃশেষিত
হইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে
সতীশচন্দ্র অধিকতর ক্ষীণ ও কাতরস্বরে
বলিলেন, "কত্যা, আমার স্নেহের বিমলা,"
সহসা বাকরোধ হইল।

রাজা পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে ছন্দ
দান করিলেন। ক্ষণেক পর আবার বলিতে
লাগিলেন, "হতভাগিনী বিমলা, তোমার
মাতা নাই, তুমি আজ পিতৃহীনা হইলে!"
এই কথা বলিতে বলিতে পার্শ্বের গৃহ
হইতে হৃদয়বিদারক রমণীকণ্ঠজাত ক্রন্দন-
ধ্বনি উত্থিত হইল, সে ধ্বনি শুনিয়া
সতীশচন্দ্রের স্পন্দনহীন নয়নধর জলে পরি-
পূর্ণ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিমলা বেগে পিতার
নিকটে আসিলেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ
ছিল, কিন্তু সে সময় সে জান কোন রমণীর
থাকে ?

ইন্দ্রনাথ পূর্বপরিচিত রমণীকে সতীশ-
চন্দ্রের কত্যা বিমলা বলিয়া জানিয়া বিস্মিত
হইলেন।

বিমলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া
তাঁহার পদ-বন্দনা করিলেন, বোধ হইল
যেন, সেই পরিজ্ঞ আলিঙ্গনে সতীশচন্দ্রের
হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল; যুগমণ্ডল শান্তভাবে
ধারণ করিল, নয়ন দুইটি চিরনিদ্রায় স্থিত
হইল।

তখন বিমলা বার বার সেই কৃত্যবধ
আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে
লাগিলেন। আজি বিমলার নয়নের
আলোক বিক্ষিপ্ত হইল, আজি চারিদিক
অন্ধকার হইল, আজি হৃদয় বিদীর্ণ হইল,
আজি জগৎ শূন্য হইল।

সেই দৃষ্ট দর্শন করিয়া রাজা নয়নধর
আবৃত্ত করিয়া গৃহ হইতে নিঃস্রান্ত হইলেন।
ইন্দ্রনাথ খড়্গের উপর ভর দিয়া বালিকার
স্তায় অব্যাহত নয়নধারা বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্কেষ্টিত দুর্গে প্রত্যাগমন।

If after every tempest come such calms,
May the winds blow till they have
wakened death.
Shakespeare.

আজি পূর্ণিমা তিথি, কিন্তু আকাশ
দেখিলে কে বলিবে আজি পূর্ণিমা ? গভীর
ধূস্রবর্ণ মেঘরাশিতে আকাশ অস্ত্র আচ্ছন্ন রহি-
য়াছে, জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।
মধ্যে মধ্যে বিভ্রান্ততার ভীষণ আলোকে
সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের অস্ত্র উদ্দীপ্ত হইতেছে,
আবার পূর্ণাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার হই-
তেছে। মূলধারা বৃষ্টিতে কেজ, প্রায়, পথ,
ঘাট সকল ভাসিয়া বাইতেছে। মুহূর্ত্তে
মুহূর্ত্তে যেন সেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে, বায়ু
রহিয়া রহিয়া অতিশয় শব্দ করিয়া প্রবাহিত
হইতেছিল, সেই বায়ু-শব্দের মধ্যে মধ্যে
মেঘের অনেকক্ষণস্থায়ী গর্জন ভগৎসংসার
দ্রষ্ট ও কণ্ঠিত করিতেছিল।

এরূপ ভয়ঙ্কর বাতায় সন্ধ্যা চতুর্কেষ্টিত
দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্ভানের মধ্যস্থ একটি
জনশূন্য কুটীরান্তরে একাকিনী বসিয়া

আছে, কি শব্দ? বাসিকার হৃদয়ে কি ভর
নাই? এই অন্ধকারে এই ভরাবহ মেঘগর্জনে
বাসিকার হৃদয়ে কি শব্দ হইতেছে না?—
না, অন্ধ সরলার দিকে আর ভর নাই, অন্ধ
সরলা কাঁহাকেও ভর করে না। সুখের
আশা, জীবনের আশা অন্ধ শব্দ হইয়াছিল।

বাহার আশা নাই, তাহার ভর কিসের?
আকাশে যে ভীষণ বিদ্যুৎ কণে কণে নরন
ঝলসিতেছিল, সরলা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার
দিকে অবলোকন করিতেছিল; তাহার পর
যে ভয়ানক মেঘগর্জন হইতেছিল, সরলা
স্থিরচিত্তে তাহাও শ্রবণ করিতেছিল। আজি
ছয় মাস হইল, ইন্দ্রনাথ পশ্চিম গিয়াছেন,
তিনি সরলাকে ভুলিয়াছেন, পামর শকুনি
সরলার অন্ধ বিবাহ স্থির করিয়াছে।

একবার বালাবহর কথা মনে আসিল।

মহামাঙ্গ সময়সিংহের একমাত্র দুহিতা এই
বিত্তীর্ণ উত্তানে বেড়াইত, পিতার কোড়ে
উঠিয়া শাখা হইতে ফুল পাড়িত, মাতার
কোড়ে উঠিয়া একদিন একটা পাখী ধরিবার
চেষ্টা করিয়াছিল, পাখী উড়িয়া গেল,
নির্কোষ শিশু কাদিল, নির্কোষ শিশু জানিত
না যে, জীবনের আশা-ভরসা সকলই
সেই পাখীর মত একে একে উড়িয়া
যায়!

তাহার পর ছয় বৎসর কাল রুদ্রপুরে
অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীগ্রামে
দরিদ্র কুটারে সেই ছয় বৎসর কাটিয়াছে,
কিন্তু এখন হইলেই সুখ হয় না, দারিদ্র্য হই-
লেই দুঃখ হয় না। সরলার অন্তঃকরণে সেই
ছয় বৎসর পরম সুখের কাল বলিয়া বোধ
হইল। প্রাণের সখী অমলা! তাহাকে কি আর
বোঝিতে পাইবে? প্রাতঃকালে সেই অমলার
সহিত প্রত্যহ বাটে জল আনিতে যাইত,
সন্ধ্যার সময়ে সেই অমলার সহিত অনন্ত

উপকথা, অনন্ত প্রণয়ের কথা হইত। সুখের
সময় অমলা নিকটে থাকিলে সুখ দ্বিগুণ
হইত, দুঃখের সময় অমলার প্রবোধ-বাক্যে
দুঃখশান্তি হইত। আজি সে অমলা কোথায়?
পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর বনগ্রামের আশ্রমবাসিনী
কমলা, তিনিও সরলাকে বড় ভালবাসিতেন,
আর এই দুর্গবাসিনী বিমলা, তিনিও সর-
লাকে কত বড় করিয়াছেন। তাঁহারা
কোথায়? তাঁহারাও কি পাখীর মত উড়িয়া
গিয়াছেন?

আর সেই ইন্দ্রনাথ! বাহার চিন্তায়
আজি ছয় মাস সরলার হৃদয় পরিশূর্ণ রহি-
য়াছে, বাহার আশার আজি ছয় মাস সরলা
জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই ইন্দ্রনাথ
কোথায়? বালাকালে ইচ্ছামতীতীরে বাহার
পার্শ্বে বসিয়া বালিকা গল্প শুনিত, গল্প শুনিত
আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া
থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময়
মুখখানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত
আবার সেই মুখখানি দেখিয়া হৃদয় শীতল
করিত, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? রুদ্রপুরের
কুটারপার্শ্বে চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনাথ শিশুর
লইয়াছিলেন, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? হায়!
তিনিও পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়া-
ছেন, অনন্ত সংসারাকাশে বিচরণ করিতে-
ছেন।

সরলা ভাবিয়া ভাবিয়া হতজ্ঞান হইল।
মাথা ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু চকুতে জল
নাই। বাসিকার হৃদয়ে আজি যে ব্যতনা,
অজ্ঞানে তাহা নিবারণিত হয় না। বতদিন
জীবনে একটি আশা থাকে, ততদিন জীবন
সহনীয় হয়, কিন্তু সরলার পক্ষে এক একটি
করিয়া সকল আশাই তিরোহিত হইয়াছিল,
পৃথিবী শূন্য হইয়াছিল, সংসার তমেয়র

হইয়াছিল। এক একটি করিয়া নাট্যশালায় লীল নির্বাহ হইল, সরলা বীরে বীরে সেই নাট্যশালা ত্যাগ করিবার আশায় রসিয়া আছে।

কিন্তু আমাদের সুখ-সম্পদের মধ্যে অনেক সময় বিপদ আইসে, আবার নৈরাশ্রের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। সরলার বোধ হইল যেন একটা শব্দ হইল। সরলা বীরে বীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চারিদিক্ দেখিল, কিন্তু সে নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। অল্প দিন হইলে সরলা ভীত হইত, কিন্তু আজি বালিকার হৃদয়ে ভয় নাই।

এমত সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোক দেখা দিল। সে আলোকে সরলা সম্মুখে কি দেখিতে পাইল? সরলার সম্মুখে, কেবল দশ হস্ত দূরে, একটি মহাবীর আকৃতি! দীর্ঘ আকৃতি, দীর্ঘ বাহু, উন্নত ললাটের উপর বোদ্ধার উজ্জ্বল শোভা পাইতেছে, কটিদেশে বোদ্ধার অসি লবমান রহিয়াছে। সে আকৃতি, সে বদনমণ্ডল, সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয় সরলার অপরিচিত নহে, মুহূর্ত্তমধ্যে সরলার পতনোন্মুখ কল্পিত দেহখানি সেনাপতি ইন্দ্রনাথ হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

প্রাতঃকালে ইন্দ্রনাথ আপন নৌকা হইতে কয়েক জন সৈনিক পুরুষকে ডাকাইলেন; পরে রাজা চৌডরমন্দের আজ্ঞানুসারে শকুনকে বন্দী করিয়া লইয়া ইচ্ছাপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রাজা স্বয়ং অচিরে ইচ্ছাপুরে সুরেন্দ্রনাথের ভদ্রাসনে আসিবেন, প্রতীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহা-বেতা, সরলা ও বিমলা এক নৌকার যাত্রা করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ইচ্ছাপুরে পৌছিয়া ইন্দ্রনাথ পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন।

বাজ্রিশ পরিচ্ছেদ।

ইচ্ছাপুরে প্রত্যাগমন।

WHEN will war's deadly blast was blown
And gentel peace returning.
With many a sweet babe fatherless.
And many a window moorning,
I left the lines and tented field
Where long I'd been a lodger.

BURDE.

বরকালের পর আত্মীয়-স্বজনের পরস্পর মিলনে বে অপরিপাষ্ট সুখ লাভ করিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। নগেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন; পুত্রকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া সহস্র আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

বনগ্রাম হইতে চন্দ্রশেখর কমলাকে সঙ্গে করিয়া ইচ্ছাপুরে আসিলেন। রুদ্রপুর হইতে অমলা স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিла। রাজা চৌডরমন্দের আসিবেন শুনিয়া সকলেই সকল দিক্ হইতে ইচ্ছাপুরে আসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ বে জমীদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র, তাহা সকলেই জানিতে পারিল। সরলা একদিন গোপনে ইন্দ্রনাথকে কহিল, “আমি তোমাকে দরিদ্র ভদ্রসন্তান জানিয়া কথা কহিতাম, জমীদার-পুত্র জানিলে তবু কথা কহিতাম না।”

ইন্দ্রনাথ সহাস্রবদনে উত্তর করিলেন, “সে অল্প এখন যেন পুরাতন ডালবালা তুলিও না।”

সরলা যনে যনে ভাবিল, “পারিব কেন?” লজ্জাবতনমুখা বেগে পলায়ন করিল।

অমলা রক্তপুরে ইন্দ্রনাথকে সামান্য কারতপুত্র বলিয়া কত তামাসা করিত, এক্ষণে তাঁহাকে জমীদারপুত্র জানিয়া লজ্জায় কণা কহিতে পারিল না, কিন্তু ইন্দ্রনাথ অল্পে চাড়িয়ার লোক নহেন, একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নবীন দাসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমলা তাঁহাকে দেখিয়া দেড় হাত ঘোমটা টানিল।

ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বটে, এই বুঝ পুরাতন ভালবাসা।”

অমলা লজ্জিত হইল, অথচ তামাসা ছাড়িল না, অবগুষ্ঠনয় ভিতর হইতে বলিল, “আপনি পরের বাড়ীর ভিতর গিয়া এইরূপ ঘেরেঘেরে সঙ্গে আলাপ করেন, আমি সরলাকে বলিয়া দিব।”

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, “অমলা, তুমি আমাকে পর মনে কর, আমি তোমাকে পর মনে করি না।”

অমলা এবার অপ্রতিভ হইল, অবগুষ্ঠন বলিয়া বলিল, “আমায় কমা কর, আর তোমার নিকট লজ্জা করিব না।” সেই অবধি অমলার লজ্জাভঙ্গ হইল।

মহাশেতা যে রাজা সমরাসিংহের বিধবা, তাহা জানিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। এখন আর মহাশেতা দরিদ্রা নহেন, রাজা টোডরমলের আজ্ঞামুত্রে সমরসিংহের বিত্তার্ণ অধিকার তাঁহার বিধবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সকলের মুখ দেখিয়া বিমলাও আপনার দুঃখ কিরদংশ বিস্মৃত হইলেন। সরলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হইয়াছিল; সরলা আজি পিতার বিত্তার্ণ জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী, পাপাত্মা শকুনি এক্ষণে বন্দী, সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বিমলা মনের ক্লেশ কথ-কিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চিন্তাশীলা কমলাও তাঁহাদিগের সহিত থাকিতেন। তিনি এক্ষণে নগেন্দ্রনাথের গৃহে বাস করেন এবং প্রত্যহ নিজহস্তে পাক করিয়া নগেন্দ্রনাথকে খাওয়ান। নগেন্দ্রনাথ কমলার কজাতুল্য স্বত্রে শ্রীত হইলেন।

ইচ্ছাপুরে আনন্দের উৎস বহিতে লাগিল, রাজা টোডরমল আসিবেন বলিয়া বড় ধুমধাম ও আয়োজন হইতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

জমিদারের পুত্র ও পুত্রবধূ।

SHE gazed—she reddened like a rose,

Sine pale like only lily ;

She sank within my arms and cried.

“Art thou my ain dear Willie ?”

“By him who made you sun and sky,

By whom true love's reargarded,

I am the man ; and thus way still,

True lovers be rewarded.”

BURNS.

সন্ধ্যাকাল আগত। কমলা একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছাপুরের নিকটস্থ যমুনা নদীর তীরে যাঁরা পড়িলেন। একাকী যমুনার তীরে বসিয়া স্বভাবের নিস্তর ভাব অবলোকন করিতেছিলেন, ঘন বৃক্ষাবলীর মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খজোতমালা খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। নীল আকাশে দুই একটি শুভ্র মেঘ ভাসিয়া বাইতেছে, শান্ত নদীর উপর অনেকগুলি নৌকা ভাসিতেছে। রাজা টোডরমলের ইচ্ছাপুর আগমন উপলক্ষে অনেক দেশের লোক তথার আসিতেছে।

কমলা সতত চিন্তাশীলা, কিন্তু অজ্ঞ যেন কোন বিশেষ চিন্তার অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন; সেই নদীতীরে বসিয়া শান্ত নয়ন দুইটি কিরাইরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে

দেখিতেছেন। তারার শাস্ত জ্যোতিঃ সেই শাস্ত নয়ন ও মুখমণ্ডলের উপর পড়িয়াছে। আল্লায়িত কেশ পৃষ্ঠদেশে লখিত রহিয়াছে, বা বদনমণ্ডল দ্বয় আবৃত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহর উপর বদনমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। কমলা কি চিন্তা করিতেছেন ?

কমলা আজি পূর্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁহার স্মরণ হইতেছে, স্বামীর দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। স্বামীর প্রাণের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে ! বোধ হইতেছে যেন, সন্ধ্যার বায়ুর সঙ্গিত তাঁহার স্বামীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বহিয়া যাইতেছে। সঙ্গীতশব্দে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিলেন, নদীর উপর দেবাকৃতি একজন মনুষ্য একখানি তরীচালন করিতেছেন এবং আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইতেছেন।

কমলা বার বার সেই দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সহস্র চিন্তা জাগরিত হইতে লাগিল। আবার নৌকা-রোহী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আবার সে সঙ্গীত কমলার হৃদয় উদ্বেলিত করিল। এক দণ্ড ধরিয়া কমলা সে গান শুনিতে লাগিলেন। যৌবনে কমলা সে গান শুনিয়াছিলেন; গানের কথায় কথায় মাদুরীষ করিতেছে; গানের অক্ষরে অক্ষরে পূর্বস্মৃতি গ্রথিত রহিয়াছে ! এ কি স্বপ্ন, না সত্য, না পূর্বস্মৃতিমাত্র ?

আকাশে চাঁদ উঠিল। সেই নীল আকাশ, সেই অনন্ত বৃক্ষাবলী, সেই নদী আলোক-পরিপূর্ণ করিয়া চক্ষু উদিত হইল। নৌকাখানি ভাসিতে ভাসিতে নিকটে আসিল। কমলা সেই চক্ষুগোকে নৌকা-

রোহীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা নারী পতির কণ্ঠস্বর বিশ্বত হন না, পতির দেবমূর্ত্তি বিশ্বত হন না, বাতাহত পত্রের দ্বার কমলার দেহলতা কাপিতে লাগিল; অচিরে মূর্ত্তিতা হইয়া কমলা ভূমিতলে পতিত হইলেন।

কণেক পর কমলা চৈতন্তলাভ করিয়া দেখিলেন, সেই যৌবনের হৃদয়ের ঠাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সমস্ত ললাটে জলসিকন করিতেছেন, সম্মুখে সেই কম্পাপিত ওষ্ঠ চূষন করিতেছেন। চির-হত-ভাগিনী কমলা এই সৌভাগ্যের স্পর্শে শিহরিয়া উঠিলেন, পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, “ভগবান্ ! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ স্নানিদ্ধা হৃদয়ে জাগরিত না হই।”

সেই চক্ষুগোকে, সেই জনশ্রুত নদীতীরে সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বে, উপেক্ষনাথ অনিমেষ-লোচনে সেই বহুপূর্বদৃষ্ট বদনমণ্ডলের দিকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই স্কন্দর ললাট, সেই নিবিড় কৃষ্ণ জয়গল, সেই স্নেহপরিপূর্ণ চিন্তাপ্রকাশ-নয়ন, সেই মধুর ওষ্ঠ ও সেই নিবড কেশরাশি, সেই উন্নতহৃদয় ও সুসৌষ্ঠব বাহু যুগল। উপেক্ষ দেখিতে দেখিতে পাগলের দ্বার হইয়া সেই হৃদয়ের প্রতিমাকে চূষন করিতে লাগিলেন। জগতের মধ্যে ভাগ্য-বতী কমলা দেবতুলা পতিকে পাইলে-
তাঁহার পুলকিত শরীর স্বামীর আলিঙ্গন
বহু স্বামীর ওষ্ঠে তাঁহার ওষ্ঠ, স্বামীর হৃদয়
তাঁহার হৃদয়।

অনেকক্ষণ পর উপেক্ষ বলিলেন, নিশ্চয় বাসিনী কমলা ! আমার নৌকা মগ্ন হইবার পর আমি পরিজ্ঞান পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে আর পাইব, আমার আশা ছিল

না। গ্রামে কিরিয়া আসিলে গ্রামের লোকে
আনাকে বলিয়াছিল, পীড়ায় তোমার কাল
হইয়াছে।”

কমলা বলিলেন, “কনরেশ্বর! তোমার
স্বহৃদ-সংবাদ পাইয়া আমার সৰ্ব্বট পীড়া হইয়া-
ছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে নিস্তার পাইয়া-
ছিলাম। যখন নিস্তার পাইলাম, তখন আমি
বনগ্রামের আশ্রমে।”

উপেক্ষ। জগদীশ্বর আমাদিগকে রক্ষা
করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ কর।
একণে আইস, তোমাকে তোমার গুণ্ডালরে
লইয়া যাই।

কমলা। আমার গুণ্ডালর কোথায়?

উপেক্ষনাথ কমলাকে লইয়া জমীদার
নগরেন্দ্রনাথের আলয়ে উপস্থিত হইলেন।
সমস্ত কথা তখন প্রকাশিত হইল, তখন জমী-
দার-গৃহে যে ছলছল পড়িয়া গেল, তাহা
বর্ণনা করিতে আরম্ভ অক্ষম। জমীদারের
কোষ্ঠপুত্রের বহুদিন পূর্বে কাল হইয়াছে
বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিল; সেই কোষ্ঠ
পুত্র আজি গৃহে কিরিয়া আসিলেন; লক্ষ্মী-
স্বরূপা পুত্রবধূ গৃহ আলো করিলেন; এ সকল
কথা জমীদার-গৃহ হইতে সমস্ত গ্রামে, গ্রাম
হইতে সমস্ত দেশে প্রচার হইল। ইচ্ছাপুর-
নগর জয়চাকের নামে পরিপূর্ণ হইল,
বিবানিলি লোকের আনন্দ-শব্দে শব্দিত
হইল।

বৃদ্ধ নগরেন্দ্রনাথ বার বার কোষ্ঠ পুত্রকে
আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতে
লাগিলেন, কস্তান্ত্রীয়া কমলাকে পুত্রবধূ
জানিয়া বার পর নাই আনন্দিত হইয়া
আশীর্বাদ করিলেন।

পথে, বাটে, গৃহে, কূটীরে শতধ্বনি
হইতে লাগিল, আনন্দের চাক বাজিতে
লাগিল, পুরবাসিগণ উপেক্ষনাথের উপর পুষ্প

বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা
পর্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত পুরজন
ও পুরনারীদিগের আনন্দলহরী বহিতে
লাগিল।

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথ কোষ্ঠের চরণ-
ধূলিতে প্রণিপাত করিয়া সাশ্রুশোভনে বলি-
লেন, “প্রাতঃ! আপনার অজ্ঞাতবাসে আমি
আপনার প্রতি মুগ্ধে। কত অশ্রুদ্বা দেখাই-
রাছি, তাহা কমা করিবেন, আমি জানিতাম
না, ভ্রমবশতঃ করিয়াছি।”

উপেক্ষনাথ উত্তর করিলেন, “সুরেন-
নাথ! তোমার কমা চাহিবার আবশ্যক নাই।
জগৎসংসারে তোমার মত প্রাতঃ ভুলভ।
তোমার সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের বশে
বঙ্গদেশ যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তোমার
দয়া, প্রজাবাংল্যা ও অমায়িকতা প্রভৃতি
সদগুণেও আমাদের দেশ সেইরূপ পরিপূর্ণ
ও আনন্দিত হইয়াছে। বাহাদুরের হাতে
কমতা ও ধন থাকে, তাহার সকলেই যদি
তোমার মত অমায়িক হইত, তাহা হইলে এ
জগৎসংসার স্বর্ণ হইত।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

Behold where stands
The usurpers cured head.

Shakespeare.

রাজা টোডরমল ইচ্ছাপুরে আসিয়াছেন,
আজি আনন্দে ইচ্ছাপুরবাসিগণ মত্ত
হইয়াছে।

বিত্তীর্ণ ক্ষেত্রে রাজার সভা হইয়াছে।
উপরে অতি বিত্তীর্ণ চম্ভাতপ লম্বিত রহি-
য়াছে। সে পট্টবস্ত্র-নির্মিত চম্ভাতপ জরীতে
কল্মস করিতেছে। চম্ভাতপ হইতে সুল্লর

গন্ধ পুষ্পমালা ভূষিতে লম্বিত রহিয়াছে ।
 ন, রক্তবর্ণ, নীল, পীত প্রভৃতি নানাপ্রকার
 পুষ্পে সেই চম্ভাতপ অধিকতর শোভিত
 হইয়াছে । চম্ভাতপের নীচে বিস্তীর্ণ শয্যা
 রচিত হইয়াছে, সে শয্যা পারশ্বদেশীয়
 গলিচায় মণ্ডিত, স্থানে স্থানে সুল্লর পুষ্প,
 সুল্লর লতা ও অপরূপ পত্র চিত্রিত রহিয়াছে,
 এত সুল্লর যে, সহসা সেই পুষ্পলতার উপর
 পদবিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় । সভার মধ্য-
 স্থলে একটি বিরদ-রদ ও রৌপ্যনির্মিত এবং
 সুবর্ণে অলঙ্কৃত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে ।
 তাহার চারিপার্শ্বে বোদ্ধা ও জমীদারগণ সম-
 বেত রহিয়াছেন । মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপাকারে
 সুগন্ধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, চতুর্দিকে ভূতা-
 গণ বহুমুখ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া চামরব্যঞ্জন
 করিতেছে । জমীদার ও বোদ্ধাগণ সকলেই
 সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত বহুমুখ্য বস্ত্রে শোভা
 পাইতেছিলেন ।

সভার তিনদিকে পদাতিগণ রণসজ্জায়
 সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাহার
 পশ্চাতে অখারোহিগণ নিক্ষেপিত অসি-হস্তে
 প্রস্তরপুতানকার স্তায় নিশ্পন্দ হইয়া রহি-
 য়াছে, তাহার পশ্চাতে আবার মাতঙ্গশ্রেণী
 দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এইরূপে তিন দিক্
 সৈন্যসামন্তে বেষ্টিত । সমুখে রাজ্যের আসি-
 বার জন্ত প্রশস্ত ও অতি দীর্ঘ একটা পথ ;
 সে পথ রক্তবর্ণ মক্কুল দিয়া মণ্ডিত, তাহার
 দুই পার্শ্বে আবার সৈন্যগণ সেইরূপে সন্নি-
 বেশিত । নিরুটে দ্বজবহ পদাতিক পতাকা-
 হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে অখারোহী
 কৃপাণপাণি হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে ।
 তরুণ-অরুণ-কিরণে সেই নিক্ষেপিত ধ্বজ
 বকুমকু করিয়া উঠিল, প্রাতঃকালের নীতল
 বায়ুতে সেই উচ্চ পতাকা পত পত শব্দে
 উজ্জীন হইতে লাগিল, শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে

জয়পতাকা উজ্জীন হইয়াছিল, আজি ইচ্ছা-
 পুরে সেই জয়পতাকা উজ্জীন হইতেছে
 দেখিয়া নিবাসিগণ আনন্দে নিমগ্ন হইতে
 লাগিল, বোদ্ধাগণের হৃদয় সাহস ও উৎসাহে
 পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ।

সুৰ্য্যোদয় হইবার পরই রাজা টোড়রমল্ল
 সভার শুভাগমন করিলেন, তদদর্শনে সভাসদ-
 সকলেই একবাক্যে “মহারাজের জয় হউক”
 বলিয়া উঠিল । তাহার নিম্নক হইলে সৈন্য-
 গণ ক্রমান্বয়ে সেই জয়ন্ততি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চা-
 রণ করিতে লাগিল । সে জয়নার চতুর্পার্শ্ব
 গ্রাম পর্য্যন্ত ঞ্জত হইল ; বোধ হইল যেন,
 দিগন্তব্যাপী মেঘগর্জন গিরিগুহার বার বার
 প্রতিধ্বনিত হইল ।

রাজা ধীবে ধীরে সভার দিকে আসিতে-
 ছিলেন । তাহার দক্ষিণপার্শ্বে নগেন্দ্রনাথ ও
 উপেন্দ্রনাথ, অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ ।
 পশ্চাতে আর কতিপয় ব্যাতিসম্পন্ন জমীদার
 ও সৈনিকপুরুষ ধীরে ধীরে বাইতেছেন ।
 রাজা ধীবে ধীরে বাইয়া সিংহাসনোপরি
 উপবেশন করিলেন ।

তখন একেবারে শত জয়তাক হইতে
 রণবাদ্য আরম্ভ হইল ; সে সুরাবা গম্ভীর
 দিগন্তব্যাপী রণবাদ্য গ্রামে গ্রামে ঞ্জত হইতে
 লাগিল, নির্মল প্রাতঃকালের নীল গগন-
 মণ্ডলে উদ্ভিত হইতে লাগিল । সে শব্দ
 শুনিয়া সৈনিকদিগের রণক্ষেত্রের কথা মনে
 পড়িল, একেবারে সহস্র অসি কোষ হইতে
 বজ্রনাশকে বহির্গত হইয়া রবিকিরণে ঞ্জ-
 মক করিতে লাগিল ।

সে বায়ু নিম্নক হইল, তাহার পর কত-
 রূপ দর্শন ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইল ।
 আজি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি ও প্রতিনিধি
 বদদেশ জয় করিয়া ইচ্ছাপুরে উপস্থিত
 হইয়াছেন, আজি একজন হিন্দু সেনাপতি

কদেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন, তরায় বঙ্গদেশের মধ্যে যে স্থানে যে কোন শাস্ত্রাধ্য বস্তু ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার জন্য সমানীত হইয়াছিল। দূরদেশ হইতে ধ্যাতিসম্পন্ন নিপুণ বাতকর আপনাব বাস্ত শুনাইয়া রাজা ও সভাসদগণকে সন্তুষ্ট করিল, দেশ-বিদেশ হইতে আস্ত শুল্কর গারকগণ স্থলগিত গীতধ্বনিতে সকলের মন মুগ্ধ করিল; নর্তকীগণ আপন অতুণ্য রূপরাশি বিস্তার করিয়া স্থলগিত স্বরে গীত গাইয়া সকলের হৃদয় অপহরণ করিল; ঐশ্বর্যজালিকগণ বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইয়া যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া, ষাণ্ডকগণ বিষয়কর তীর নিক্ষেপ করিয়া সভাসদগণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে কবি ও কথকদিগের কথকতা আরম্ভ হইল। বঙ্গদেশে তৎকালে ষাহারা কবিত্ব-শক্তিতে বা কথকতায় পারদর্শী ছিলেন, সকলেই রাজার নিকট আপনাপন গুণের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, একে একে সকলেই আপনাপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। কেহ বা যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কেহ বা দেবদেবীর স্তুতিপাঠ করিয়া সকলের মন ভক্তিপরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেহ প্রেমের কথা আনিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন, আবার কেহ দুঃখের কথা বলিয়া সভাসদগণের চক্ষু জলে প্রাবিত করিতে লাগিলেন। কবিতার মোহিনী শক্তিতে যোদ্ধার হৃদয়ও গলিতে লাগিল, যোদ্ধার নয়নেও জল আসিল।

পরে রাজা আদেশ দিলেন, “আর আয়োদ-প্রয়োদ আবশ্যক নাই, এখনও

যামাদিগের প্রধান কার্য বাকি আছে, যাক্ষকে লইয়া আইস।”

চারি জন সৈনিক পুরুষ শত্নিকে লইয়া আসিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ সশুধীন হইয়া বজ্রনাথে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! আমি মহাত্মা সমরসিংহের নরপ্রিয় বিধবা ও অনাথা কন্তার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরপ্রথম রাজা সমরসিংহের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল।” আমি দেওয়ান সতীশচন্দ্রের অনাথা কন্তার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরপ্রথম সতীশচন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে।”

শত্নির দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না। শত্নি যে কাগজ জাল করিয়াছিলেন, তাহা রাজার হস্তেই ছিল, তাহা বার বার পাঠ করিয়া দেখিলেন, সেই পত্র-সকল সমরসিংহের দ্বারা পাঠান-সেনাপতিগণকে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু সে সকল পত্রে শত্নির হস্তাকর আর সমরসিংহের মোহর; সেই মোহরের প্রকৃতিটা একটি শত্নির নিজ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল মহাশেখতা যেরূপে ছিলেন, শত্নির শত শত চর যেরূপে মহাশেখতাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়না করিয়াছিল, যেরূপে মহাশেখতা কন্তার সহিত পরিশেষে চতুর্দেহী ও দুর্গের অভ্যন্তরে রুদ্ধ হন, কোন বিষয়েই প্রমাণের অভাব ছিল না। আর সতীশচন্দ্রের হত্যার কথা রাজ আপনাই জানিতেন।

তখন রাজা টোডরমল্ল সিংহের নত গর্জন করিয়া বলিলেন, “পামর! তোর জীবন পাপরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখনও ভগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, পরকালে

ভাল হইতে পারে, ইহকালে তোর পাপের
মা নাই ।”

শকুনি ধীরে ধীরে বলিল, “মহারাজ,
মগনি আমার শত্রুদিগের কথা শুনিয়াছেন,
মামার একটি নিবেদন আছে ।”

রাজা বলিলেন, “শীঘ্র নিবেদন কর,
তার আর অধিক পরমামু নাই ।”

শকুনি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল,
আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে,
তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অবধ্য । আপনি
হিন্দুধর্মের পরম ভক্ত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ,
হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য । শত সহস্র
দাশ করিলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য । আমি
মরাত্ম্য বন্দী, যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই
দিকেই আমার শত্রু ; সুতরাং আপনার
রাজ্যবাহা দিবার কেহ নাই, আমাকে
হায়তা করিবার কেহ নাই । এক্ষণে
আপনি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলে
বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে
আমাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন । প্রায় চারি
ত বৎসর হইতে মুসলমান বঙ্গদেশ শাসন
করিতেছে, তাহার অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও
মুজ্জ, তথাপি তাহাদের মধ্যেও বোধ হয়,
এই ব্রাহ্মণকে বধ করে নাই । আজি
রেজার একজন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরম-
শ্রদ্ধি রাজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া-
ছেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা, ব্রাহ্মণ বধ করা
তাঁহার শাসনের প্রথম কার্য্য হইবে ?
মহারাজ ! আজি আপনি যে পুণ্যকর্ম্ম
করিবেন, চিরকাল তাহার যশ থাকিবে,
আজি আপনি যে পাপকর্ম্ম করিবেন, চির-
কাল তাহার অপযশ থাকিবে । আমি
রাজ্য বন্দী, আমাকে বধ করা
আমাদের বিরুদ্ধে কার্য্য, কিন্তু রাজা টোডরমল্লের শুভ
কলঙ্ক যশোরশিরি মধ্যে সে কর্ম্ম কলঙ্কের

স্বরূপ হইবে, রাজা টোডরমল্লের জীবনচরিত
হইতে দুঃখপনের কলঙ্ক শত শতাব্দীতেও
বিলীন হইবে না । সমস্ত ভারতক্ষেত্রে সে
কলঙ্ক রটিবে ; আমাদের নিকট হইতে
আমাদিগের পুত্রেরা, তাহাদিগের পর আমা-
দিগের পৌত্রেরা এ কথা স্মরণ করিয়া
রাখিবে । সহস্র বৎসর পরেও বালকগণ
পুরাতত্ত্বে পাঠ করিবে যে, রাজা টোডরমল্ল
বঙ্গদেশে আগমনের পর, প্রথমেই এক
ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছেন ; সহস্র বৎসর
পরে বুদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমান-
দিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা
টোডরমল্লের শাসনকালে তাহা হইয়াছিল—
ব্রাহ্মণহত্যা হইয়াছিল । মহারাজ ! আমাদের
দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু দেশদেশান্তরে
যুগ-যুগান্তরে আপনার এ কলঙ্ক অপনীত
হইবে না, ব্রাহ্মণহত্যারূপ মহাপাপে আপন
বিস্তীর্ণ যশোরশিরি মলিন হইয়া যাইবে ।”

শকুনি নিস্তব্ধ হইল । তাহার কথা
শুনিয়া রাজা চিন্তাশীল হইয়া মস্তক অবনত
করিলেন । সমস্ত সভা নির্বাক—নিস্তব্ধ !

সাদীক খাঁ বলিলেন, “মহারাজ ! আপনি
সেনাপতি, সেনাপতির ধর্ম্ম ভুলিবেন না ;
আপনি শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তার ধর্ম্ম ভুলি-
বেন না । দোষীকে দণ্ডবিধান করুন ।”

রাজা উত্তর দিলেন না ।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “এই বিধবা ও
অনাথার আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই ।
ইহাদের বিচার করুন, দোষীকে দণ্ড দিন ।
দেওরান সতীশচন্দ্র বৃদ্ধকালে আপনার
নিকট বিচারপ্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি
তাঁহার হত্যার বিচার করুন ।”

রাজা উত্তর দিলেন না ।

মভাসদগণ বলিল, “মহারাজ ! আপনি
শিষ্টের পালন করিবেন, দুষ্টের দমন করি-

বেদ। আপনি শাস্তি না দিলে এই মহাপাপীকে কে দণ্ড দিবে ?”

রাজার উত্তর শিলেদ না।

ইতিমধ্যে সেই সভার কিছু দূরে একটা অতিশয় গোলমাল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে একজন দ্বীর্ঘকায়, শীর্ণকলেবর, কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবেশ স্ত্রীলোক সেই সভার নিকট বোড়িয়া আসিল; চীৎকার শব্দ করিয়া ক্রমিতে পতিত হইল। সে বিবেচনায় পাপগমিনী।

শকুনি এতক্ষণ স্থিরভাবে ছিল, কিন্তু পাপগমিনীকে দেখিয়া একেবারে কম্পিতকলেবর হইল। পাপগমিনী দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, “মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন। পামর আমার মাতাকে বধ করিয়াছে। আমি তাহা স্বক্ষে দেখিয়াছি। আমার মাতার বিকট মুখ এখনও দেখিতে পাইতেছি, আমি তাহার বিচার প্রার্থনা করি।”

সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করার পাপগমিনী রহিয়া রহিয়া আত্মবিবরণ দিতে লাগল।

পাপগমিনী গোপকন্যা, তাহার মাতা গ্রামের মধ্যে স্কন্দরী ছিল, স্কন্দরী গোপবিধবাকে দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ মোহিত হন। তাঁহার গুরুর সেই গোপস্বরীর গর্ভে শকুনির জন্ম হয়।

শকুনির পিতা ষত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সে গোপবনিতা ও তাহার পুত্র-স্বামীর গুরসজাত কন্যা বিবেচনায় লালন-পালন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর শকুনি অন্ন বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। সকলে তাহাকে জারজ বলাতে শকুনি অল্পবয়সে অতিশয় ক্ষুদ্র হইল; মাতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিত ও প্রহার করিত।

সে বিধবা অচিরে শরীরের ও মনের ক্ষেপে পীড়িত হইল, সেই পীড়ার প্রাপ্ত হারাইল। বিবেচনায় পলাইল, মাতার মৃত্যু হইতে পাপগমিনী হইল। শকুনি এই মহাপাতকের পর দেশ ত্যাগ করিয়া সত্যীচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিল।

বিবেচনায় প্রাণভয়ে অনেক দিন অবধি দেশদেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইত। অবশেষে যে দিন বনগ্রাম হইতে মহাশেষতা ও সরলা চতুর্কেষ্টিত দুর্গে বন্দীরূপে নীত হন, সেই দিন বিবেচনায়ও বন্দীরূপে চতুর্কেষ্টিত দুর্গে নীত হয়। পাছে বিবেচনায় শকুনির জন্মের কলঙ্কের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, সেই ভয় তাহাকে চতুর্কেষ্টিত দুর্গের মধ্যে এত দিন বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এক্ষণে শকুনি বন্দী হইলে পর বিবেচনায় সেই কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কারাগারে তাহাকে যে কষ্টে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীর কেবল অস্থিচর্খ অবশিষ্ট ছিল। তাহাকে দেখিয়াও তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া সভাসদগণ ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন।

শকুনি দেখিলেন, আর পরিচয় নাই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রস্তুতমতি শকুনি তখন নির্ভয়ে শেষ উপায় অবলম্বন করিল; ধীরে ধীরে বস্ত্রে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া সমস্ত সভাসদসমক্ষে আপনাকে আঘাত করিল। ছিন্ন তরুর ত্রায় শকুনির মৃতদেহ ভূতলে পতিত হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অঙ্গুরীয়-প্রতিদান ।

WHY lea the sticken deer go weep,
The hart ungalled play,
While some must watch
while some must sleep.
Thus runs the world away.

Shakespeare.

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরেই রাজা চৌভরমন্ড ইচ্ছাপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ পুত্রদিগকে জমিদারীর ভার দিতে ইচ্ছা করিলেন, পিতার অমুরোধে উপেন্দ্রনাথ ইচ্ছাপুরের জমিদারীর ভার লইলেন, সুরেন্দ্রনাথ চতুর্কোষিত জমিদারীর ভার লইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার পূর্বের মত প্রজাবাৎসল্য, পূর্বের মত অমায়িকতা এখনও রহিল। এখনও ছন্দবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা জানিতেন, সাধ্যমতে সে অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যতবান হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ পুরাতন বন্ধু নবীন দাসকে আপনায় দেওয়ান করিলেন; রুদ্রপুরে বিবেচনারী পাগলিনী অমলার হাত দেখিয়া বাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা যথার্থ হইল, অমলা দেওয়ানের গৃহিণী হইলেন। অমলা সরলাকে সেইরূপ ভগ্নীর দ্বারা ভালবাসিতে লাগিলেন, তাঁহার পুরাতন বন্ধু ইন্দ্রনাথের সহিত সেইরূপ আশ্রয়-রক্ষা করিতেন।

আমাদের টঙ্কা, এই স্থানে আধ্যাত্মিক শেষ করি; কিন্তু জগতে সকলের কপালে সুখ ঘটে না, কাহারও কপালে সুখ থাকে, কাহারও কপালে দুঃখ থাকে, দুই একটি দুঃখের কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

পাঠক-বাহাদুর জানেন, শত্রুজিৎসিংহ মহাশয়ের জীবনের গ্রন্থরূপ হইয়াছিল বৃদ্ধাবস্থায় যে চিন্তার ছয় বৎসর কাল আন্ত-ভূত ছিলেন, সেই চিন্তা তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতিরূপ, জীবনের অবলম্বনরূপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে চিন্তা শেষ হইল, জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইল, সরলার বিবাহের কয়েক দিন পর কোন রোগ কি পীড়া বিনা মহাশয়ের কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আর বিমলা? উন্নতচরিত্রা, ধর্মপরায়াণ, রূপলাবণ্যসম্পন্ন বিমলার কি হইল? যে দিন বিমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়াছিল; সেই দিন অবধি বিমলার পক্ষে জগৎ-সংসার অন্ধকার-ময় হইয়াছিল। সেই দিন অবধি বিমলার কোন আশা ছিল না, কোন ভরসা ছিল না, কোন সুখের অভিলাষ ছিল না, কোন দুঃখের ভয় ছিল না। মানবজাতি যে মায়াভালে জড়িত হইয়া জগতে সুখ-দুঃখ অমুভব করে, বিমলার সে মায়াভাল ছিন্ন হইয়াছিল।

প্রিয়সখী সরলার বিবাহের পর বিমলা বনগ্রামের মহেশ্বর-মন্দিরে চলিয়া গেলেন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে চতুর্কোষিত দুর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে অনেক অমুরোধ করিলেন; সরলা প্রিয়সখীর হাত ধরিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিল; কিন্তু বিমলা সহাস্তবদনে কহিলেন, “সংসারের আমার লীলা-খেলা সাক্ষ হইয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া দাও।” অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ ও সরলা বিমলাকে বিদায় দিলেন।

বিমলা বনগ্রামের মহেশ্বর-মন্দিরে চলিয়া গেলেন; শরীরে হারিদ্রবাস ধারণ করিলেন, কঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলেন, দিবারাত্রি মহেশ্বরের স্তব করিতেন এবং গ্রামের দরিদ্র-দুঃখিনীকে প্রাণপণে সাহায্য

করিয়া পুণ্য জীবন বাশন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর এই পুণ্যভূমী তাপনীকে মা বলিয়া ডাকিতেন, আশ্রমের সকলে তাঁহার মায়া, বাহুল্য ও পরোপকারিতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও পূজা করিতে লাগিল। আশ্রমবাসিনী বিমলার পুণ্যজীবন পবিত্র স্রুথে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কয়েক ঘাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। তৎপরে সরলা একদিন বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মহেশ্বর-মন্দিরে আসিল, পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া প্রণিপাত করিল।

যোগিনীবেশধারিণী বিমলার হাত ধরিয়া স্নেহময়ী সরলা অবু ববু করিয়া অশ্রুজল ভাগ করিতে লাগিল; চক্ষু মুছিয়া বলিল, “দিদি, আমার কষ্টের দিন, বিপদের দিন তুমিই আমার প্রতি স্নেহ করিয়াছিলে। আজি কি আমি তোমার জন্ত কিছু করিতে পারি না?”

শান্তনয়না শান্তবদনা বিমলা সহাস্তমুখে উত্তর করিলেন, “সরলা, তুমি স্নেহময়ী, তোমার মায়ার শরীর, কিন্তু আমার এমন কি প্রয়োজন বল? এই শান্ত আশ্রম অপেক্ষা জগতে কোথায় সুখের স্থান আছে? পিতা চন্দ্রশেখর অপেক্ষা স্নেহপরায়ণ স্বজন কোথায় পাইব? দুঃখের সময়, চিন্তার সময়, স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর আমাকে সাহায্য করেন, তাঁহার নিয়মাত্মবস্তিনী হইলে আমি এ জগতে ক্লেশ পাইব না, পরন্তু শান্তিলাভ করিব।”

হুই সখীতে অনেক প্রকার কথাবার্তা

দ্বারা সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। আশ্রমের মধ্যে যে যে স্থানে সরলা পূর্বে পদচারণ করিতে ভালবাসিত, সেই সেই স্থানে প্রিয়সখী বিমলাকে সঙ্গে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সরলা বিমলার নিকট বিদায় লইয়া শিবিকা আরোহণ করিল। বিমলা সখীর সঙ্গে সঙ্গে শিবিকা পর্যন্ত আসিয়া হাসিয়া বলিল, “সরলা, এখন তুমি রাজরাণী, এখন কি দারুণ আশ্রমবাসিনীকে মনে থাকিবে?”

সরলা। দিদি, তোমাকে কি আমি ভুলিতে পারি?

বিমলা। সরলা! তোমার স্নেহের শরীর। তুমি আমাকে কখনও ভুলিবে না, তাহা জানি; তথাপি একটি স্মরণচিহ্ন তোমার নিকট রাখিব, তাহাতে না বলিও না।

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠমালা হইতে ধীরে ধীরে একটি স্বর্ণের অঙ্গুরীয় খসাইয়া সরলার অঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। সরলা বিস্মিত হইয়া বলিল, “এ কি দিদি? এ যে স্বর্ণের অঙ্গুরীয়! এ আমি লইব না। তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অবশিষ্ট হুই এ আমি গহনা বাহা আছে, তাহা কি আমি লইতে পারি? সে সমস্ত তোমারই নিকট শোভা পায়।”

বিমলা একটু হাসিয়া বলিলেন, “সরলা, এ অঙ্গুরীয় আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে, ইহাতে আমার আধকার নাই। তুমি ইহার অধিকারিণী; আজীবন এই অঙ্গুরীয় ধারণ করিও, জগদীশ্বর তোমাকে স্রুথে রাখুন।”

সন্ধ্যার ছায়াতে ধীরে ধীরে বিমলা আপন কুটীরভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

End

প্রিয়সুহৃৎ সুরেন্দ্র !

নন্দ বৎসর গত হইল, তুমি, সুহৃদ্বর বিহারীলাল ও আমি এই তিন জনে একদিন প্রাতঃকালে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া একত্রে, একই উদ্দেশ্যে, বহুমুদ্র-পার বিদেশযাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদের জীবনের মধ্যে এই স্মরণীয় দিনটি স্মরণ করিয়া অগ্নি ও পুষ্পকথানি তোমাকে অর্পণ করিলাম। অগ্নি আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে ব্রতী হইয়াছি, তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। মহৎকার্যে সফল হও, এই মঙ্গলাকাজ্জ্বল্য সহিত এই সামান্য পুষ্পকথানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর,

१२८७ वक्राक

}

তোমার মেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।



মাধবীকঙ্কণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বালক-বালিকা ।

All the world's a stage.
And all the men and women merely playars,
They have their exits and their entrances.
Shakespeare.

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বীরনগর গ্রামে গ্রীষ্মঋতুর একদিন সাংকালে গঙ্গাসৈকতে দুইটি বালক ও একটি বালিকা ক্রীড়া করিতেছে । সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া গ্রাম, গ্রামের ও গ্রামস্থ গঙ্গানদী আচ্ছাদন করিতেছে । জলের উপর কয়েকখানি পোত ভাসিতেছে, দিনের পরিশ্রমের পর নাবিকেরা রক্তনাদিতে বাস্ত রহিয়াছে, পোত হইতে দীপালোক নদীর চঞ্চল বক্ষে বড় সুন্দর নৃত্য করিতেছে । বীরনগরের নদীকূলস্থ আশ্রয়-কানন অন্ধকার হইয়া ক্রমে নিস্তরূ ভাব ধারণ করিতেছে । কেবল বৃক্ষের মধ্য হইতে স্থানে স্থানে এক একটি দীপশিখা দেখা বাইতেছে, আর সময়ে সময়ে পর্ণকুটীরাবলী হইতে রক্তনাদি সংসার-কার্য্যসম্বন্ধীয় ক্লমক-পত্নীদিগের কণ্ঠস্ব শুন্য বাইতেছে । ক্লমক-পত্নী লাজল লইয়া ও পুরুষ পাল হাওয়ার করিতে করিতে ঐ ঐ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছে । বাট হইতে স্বীলোকেরা একে একে সকলেই কলস লইয়া চলিয়া গিয়াছে, নিস্তরূ অন্ধকারে বিলাস শাস্ত প্রবাহিণী

ভাগীরথী সমুদ্রের দিকে বহিয়া বাইতেছে । অপর পার্শ্বে প্রাণ্ড বালুকাতট ও অসীম কান্তার অন্ধকারে দ্রবৎ দৃষ্ট হইতেছে । গ্রীষ্ম-পীড়িত ক্রান্ত জগৎ স্বাস্থ্য সাংকালে নিস্তরূ ও শান্ত ।

তিনটি বালকবালিকায় ক্রীড়া করিতেছে । বালিকার বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইবে । লগাট, বদনমণ্ডল ও গণ্ডস্থল বড় উজ্জ্বল, তাহার উপর নিবিড় কৃষ্ণকেশগুচ্ছ পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে । হেমলতার নয়নের তারা দুটি অতিশয় কৃষ্ণ, অতিশয় উজ্জ্বল ; সুন্দরী চঞ্চলা বালিকা পরীকন্টার মত সেই নৈশ গঙ্গাতীরে খেলা করিতেছে ।

কনিষ্ঠ বালকটির বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর হইবে, দেখিলেই বেন হেমলতার জাতা বলিয়া বোধ হয় । মুখমণ্ডল সেইরূপ উজ্জ্বল, প্রকৃতি সেইরূপ চঞ্চল । কেবল উজ্জ্বল নয়ন দুটিতে পুরুষোচিত তেজোরশি লক্ষিত হইত ও উন্নত প্রশস্ত লগাটের শিখা এই বয়সেই কখন কখন ক্রোধে ক্ষোভ হইত । নরেন্দ্রকে দেখিলে তেজস্বী ক্রোধপরবশ বালক বলিয়া বোধ হয় ।

শ্রীশচন্দ্র ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, কিন্তু মনুষ্যের গম্ভীর ভাব ও অবিচলিতস্থির বুদ্ধির চিহ্ন বালকের মুখমণ্ডলে বিরাজ করিত । শ্রীশচন্দ্র বুদ্ধিমান, শাস্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি বালক ।

দুইটি বালকে বালুকার গৃহ নির্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয়, হেমলতা

দেখিবে। রমেশ গৃহ-নির্মাণে অধিকতর চতুর, কিন্তু চকল; হেম যখন নিকটে গাঁড়ায়, নরেনের ঘর ভাঙে হয়; আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন রাগ করে, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহা বিপদ, দুই তিনবার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল।

হেম এবার আর শ্রীশের নিকট যাবে না, সত্য যাবে না, বার্থ যাবে না, নরেন, আঁধ একবার ঘর কর। নরেন মতা আঁজাদে চক্কের জল মুছিয়া ঘর আরম্ভ করিল।

ঘর প্রায় সমাধা হইল। হেম ভাবিল, “নরেনের ত জয় হইবে, কিন্তু শ্রীশ একাকী আছে, একবার উহার নিকট না যাইলে কি মনে করিবে?” কেশগুচ্ছগুলি নাচাইতে নাচাইতে উজ্জল জলহিল্লোলের স্থায় একবার শ্রীশের নিকটে গেল। শ্রীশ ক্ষিপ্তহস্ত নহে, বালুকাগৃহ নির্মাণে চতুর নহে, কিন্তু ধৈর্য্য ও দুর্দ্ববলে একপ্রকার গৃহ করিয়াছে, বড় ভাল হয় নাই।

নরেন একবার গৃহ করে, একবার হেমের দিকে চাহে। রাগ হইল, হাত ঝাপিয়া গেল, উত্তম গৃহ পড়িয়া যাইল। ক্ষুব্ধ হইয়া বালুকা লইয়া হেম শ্রীশের গারে হুড়কিয়া দিল। শ্রীশের জিত, ঘর হইল না।

নরেননাথ, সাবধান! আজ বালুকা-গৃহ নির্মাণ করিতে পারিলে না, দেখো, যেন সংসার-গৃহ ঐরূপে ছারখার হয় না। দেখো, যেন জীবন-খেলার, শ্রীশচন্দ্র তোমাকে হারাইয়া বিধর ও হেমলতাকে জিতিয়া ধর না!

নরেননাথের ক্রোধধ্বনি শুনিয়া ষাট হইতে একটি সপ্তদশ-বর্ষীয়া বিধবা স্ত্রীলোক টিয়া আসিল। তিনি শ্রীশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। নাম শৈবলিনী।

শৈবলিনী আসিয়া আপন ভ্রাতাকে

তিরস্কার করিল। শ্রীশ ধীরে ধীরে বলিল, “না দিদি, আমি কিছুই করি নাই, নরেন ঘর করিতে পারে না, সেই জন্ত কাদিতেছে, হেমকে জিজ্ঞাসা কর।” “তা না পারুক, আমি নরেনের ঘর করিয়া দিব” এইরূপ সাঙ্ঘনা করিয়া শৈবলিনী চলিয়া গেলেন। শ্রীশ দিদির সঙ্গে চলিয়া গেল।

হেম ও নরেনের কলহ শ্রীশ শেব হইল।

হেম নরেনের ক্রন্দন দেখিয়া সজলনরনে বলিল, “ভাই, তুমি কাদ কেন? আমি একটবার শ্রীশের ঘর দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই ঘর ভাল হইয়াছিল, তুমি ভাবিলে কেন? তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম, শ্রীশের কাছে একবার গিয়াছিলাম বৈ ত নয়। তুমি ভাই রাগ করিও না, তুমি ভাই কাদ কেন?” নরেন কি আর রাগ করিতে পারে? নরেন কি কখন হেমের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে?

তাহার পর বালক-বালিকার কি কথা?

আকাশে কেমন তারা ফুটিয়াছে! ওগুলো কি ফুল, না মানিক? নরেন যদি একটি কুড়াইয়া পায়, তাহা হইলে কি করে? তাহা হইলে গাঁধাইয়া হেমের গলায় পরায়! ঐ দেখ, ঠান্ড উঠিবার আগে কেমন রাত্রা হইয়াছে! ও আলোকোখা হইতে আসিতেছে? বোধ হয়, নদী পার হইয়া খানিক বাইলে ঐ আলোকোখা যায়। না, তাহা হইলেও পারের লোকে ধরিত। বোধ হয়, নোকা করিয়া অনেক দূর বাইতে বাইতে ঠান্ড যে দেশে উঠে, তথায় বাওয়া যায়, সে দেশে কি রকম লোক, দেখিতে ইচ্ছা করে। নরেন বড় হইলে একবার যাবে, হেম, তুমি সঙ্গে বেও

বালক-বালিকার কথা কহিতে থাকুক, আমরা এই অবসরে তাহাদের পরিচয় দিব। এই সংসারে বয়োবৃদ্ধ বালকবালি-

আর বখন সায়াংকালে শান্ত নিস্তর নদীর প্রশস্ত বক্ষে চন্দ্রতারাভিভূষিত স্বর্গের প্রতি-
বিম্ব দেখিয়া ভগবানের কথা মনে পড়িত,
যিনি চন্দ্র, তারা ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন,
যিনি পক্ষীকে শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ
দিয়াছেন, সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত,
তখনই শৈবলিনীর হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত
হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই;
শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল
না, সুতরাং বর্ষাকালের নদী-স্রোতের জায়
শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া
যাইত। গ্রামের সমস্ত বালকবালিকাকে
শৈব বড় ভালবাসিত; শৈব অনাথা, দরিদ্র-
দিগের সমুৎসাহিনী; পশুপক্ষীও শৈবের
প্রেমের ভাগী; জগতে শৈবলিনীর জায়
প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ
বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ
যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ
বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত।

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে শৈব-
লিনীর মাতার কাল হইল; ধীর-স্বভাব,
রূপবান্, ভদ্রবংশজাত শ্রীশচন্দ্রকেও নব-
কুমার আপন কন্ডার সহিত বিবাহ দিবার
ইচ্ছায় বীরনগরে লইয়া গেলেন। বাহাদুর
জন্ত শৈবলিনী স্বশ্রুগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন,
তাহারা না থাকায় শৈবলিনী পুনরায় স্বশ্রু-
লায়ে গেলেন ও তথায় বাস করিতে
লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকা কাহার ?

If love be folly the severe divine,
Has felt folly though he censures mine.
Dryden.

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর পর চারি বৎসর
কাল অতিবাহিত হইল। বৎসরে ক্রিষ্ণ

পরিবর্তন হয়, পাঠকমহাশয় তাহা অনুভব
করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের
যুবক, ধীর, শান্ত, বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ।
তাহার প্রশস্ত উদার মুখমণ্ডল ও উন্নত অবয়ব
দেখিলেই তাহার গভীর প্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি
জানিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষের উগ্র যুবা, শ্রীশ
অপেক্ষাও উজ্জল গৌরবর্ণ, উন্নতকায় ও
তেজস্বী, কিন্তু অতিশয় উগ্র, ক্রোধপরবশ ও
অসহিষ্ণু। নবকুমারের দৃষ্টি সে সহ্য করিতে
পারিত না, শ্রীশচন্দ্রের যথার্থ গুণের কথাও সে
সহ্য করিতে পারিত না, সর্বদা তাহার মুখ-
মণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিত। এখনও
পর্যন্ত যে নরেন্দ্র এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিল,
সে কেবল হেমলতার জন্ত। মরুভূমিতে এক-
মাত্র প্রস্রবণের জায় হেমলতার অমৃতমাখা
মুখখানি নরেন্দ্রের উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত ও
শীতল করিত, হেমলতার জন্ত নবকুমারের
তিরস্কারও সহ্য করিত, আপন বিজাতীয়
ক্রোধ সংবরণ করিত।

হেমলতা জ্যোতিষবর্ষের বালিকা।
আকাশে প্রথম উদ্যোতনের জায় প্রথম
যৌবনচিহ্ন হেমলতার শরীরে প্রকাশ পাই-
তেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি লম্বমান
হইয়া বক্ষঃস্থল ও গণ্ডস্থল আবরণ করি-
তেছে। উজ্জল গৌরবর্ণ যৌবনারম্ভে অধিক-
তর উজ্জল আভার প্রকাশ পাইতেছে।
হৃদয়ের আরম্ভ নয়ন দুটি বাল্যকালস্থলভ
চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ধীর শান্ত-
ভাব ধারণ করিতেছে, সমস্ত অবয়বও ক্রমে
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই গঠিত, কুসুম-বিনিমিত শরীরে কি
নব নব ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা বর্ণনার
আমরা অক্ষম, তবে হেমলতার আচরণে বাহ্য

লক্ষিত হয়, তাহাই বলিতে পারি। হেম এখনও নরেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু বালিকা অধোবদনে ধীরে ধীরে কথা কহে, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে নয়ন উঠাইয়া আবার মন্তক অবনত করে। আহা, সেই আয়ত নয়ন দুইটি নরেন্দ্রের মুখের উপর চাহিতে বড় ভালবাসে। সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নরেন্দ্রের কথা ভাবিতে বড় ভালবাসে। যখন সায়ংকালে

নৌকা আরোহণ করিয়া গঙ্গার প্রাশস্ত বক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্থিরনয়নে তাহাই দেখে; যখন নৌকা অনেক দূর ভাসিয়া যায়, সন্ধ্যার অপরিষ্কৃত আলোকে বতদূর দেখা যায়, বালিকা সেই গঙ্গার অনন্ত স্রোত নিরীক্ষণ করে। সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া যখন নরেন্দ্র “হেম” বলিয়া কথা কহিতে আইসে, তখন সেই আনন্দদায়িনীর কথার হেমের হৃদয় ঈষৎ নৃত্য করিয়া উঠে। যখন ছই এক দিনের ক্ষণেও নরেন্দ্র ভিন্নগ্রামে গমন করে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে হেম অন্তমনা চইয়া থাকে।

তথাপি হেমের মনের কথা কেহ জানে না। কপোতী যেরূপ আপন শাবকটিকে অতি বড়ে কুলায়ে লুকাইয়া রাখে, বালিকা নূতন ভাবটিকে অতি সঙ্কোপনে হৃদয়ের হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিত। বালিকা নিজে সে ভাবটি ঠিক বুঝিতে পারে না, না বুঝিয়াও সে প্রিয়ভাবটি সত্যে জগতের নিকট হইতে সঙ্কোপন করিত।

বৃদ্ধ নবকুমার হেমকে এখনও বালিকা মনে করিতেন, উদার সরল মুখখানি দেখিলে কেনই বা না মনে করিবেন? বিবাহ মিলে একমাত্র কল্পা পরের হইবে, এই ভয়ে বত দিন পারিলেন, বিবাহ না দিয়া রাখিলেন।

শ্রীশচন্দ্রও হেমের হৃদয়ের পরিচয় পাইল না, কিরূপেই বা পাইবে? হেম তাহার সহিত সর্বদাই একপটে সরল-হৃদয়ে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। শ্রীশচন্দ্রের নিকট প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িতে শিখিত, পাঠ বলিয়া লইত, পড়া হইলে পড়া দিত, যন্ত্রের সহিত শ্রীশচন্দ্রের উপদেশবাক্য গ্রহণ করিত। নরেন্দ্র পড়াইতে আসিলে বালিকা মনস্থির করিতে পারিত না, নরেন্দ্র পড়া লইতে আসিলে বালিকা ভাল করিয়া বলিতে পারিত না, সমস্ত ভুলিয়া বাইত। সংসারকাব্যের তাবৎ ঘটনাই হেম শ্রীশচন্দ্রের নিকট বলিত, শ্রীশের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিত না। নরেন্দ্র উপদেশদাতা নহেন, নরেন্দ্র আসিলে অল্প কথা হইত অথবা অনেক সময় কথা হইত না। সুতরাং শ্রীশ মনে করিত যে, বালিকার হৃদয়ে যেটুকু প্রণয় বা প্রেহ আছে, তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

*Death only death can break the last link.
Chain pope.*

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে শ্রীশ ও নরেন্দ্র একখানি নৌকার আরোহণ করিয়া গঙ্গার বিচরণ করিতেছিল। নরেন্দ্র আপন বলপ্রকাশ অভিলাষে দ্রুতকৌ উঠাইয়া দিয়া ছই হস্তে দুইটি দাঁড় ধারণ করিয়া নৌকা ফাঁকিতেছে, শ্রীশ স্থিরভাবে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করিতেছিল। শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে কখনই যথার্থ প্রণয় ছিল না, অল্প অল্প কথা লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের হস্ত হইতে সহসা একটি দাঁড় অলিত হওয়াতে নরেন্দ্র

পড়িয়া গেল, শ্রীশ উচ্চহাস্ত হাসিয়া বলিল, “তাহার কাজ, তাহাকে দাও, বীরবে আব-
শ্যক নাই।”

সেই সময়ে তীরস্থ অষ্টালিকা হইতে
হেমলতা দেখিতেছিল, হেমলতার সম্মুখে
অপদস্থ হইয়া নরেন্দ্র মর্শ্বান্তিক কষ্ট পাইয়া-
ছিল, তাহার উপর শ্রীশের রহস্যকথা সহ
হইল না, অস্তিনয় কঠোর উক্তি প্রত্যুত্তর
করিল। ক্রমে বিবাদ বাড়িতে লাগিল,
নরেন্দ্র অতি নীচ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া
উঠিল এবং অস্ত্রায় কটুভাষায় শ্রীশকে তির-
স্কার করিল। শ্রীশ এবার ক্রোধ সংবরণ
করিতে পারিল না, বলিল, “তোমার মত
অভদ্র লোকের সহিত কলহ করিলেও অপ-
মান আছে।”

এই অপমানসূচক কথার নরেন্দ্রের ললা-
টের শিরা ক্ষীত হইল, নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইল,
সে শ্রীশকে প্রহার করিতে উঠিল; শ্রীশও
উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রুদ্ধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র সহসা
শ্রীশকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। “বাবু
জলে পড়িল, জলে পড়িল” বলিয়া মাঝারা
শব্দ করিয়া উঠিল, একজন বাঁপ দিয়া জলে
পড়িল এবং শ্রীশকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়
নৌকায় উঠাইল।

সন্ধ্যার সময় নবকুমার নরেন্দ্রকে ডাকা-
ইয়া যথেষ্ট ভৎসনা করিয়া বলিলেন, “তুমি
না কি শ্রীশকে আজ গঙ্গার জলে ফেলিয়া
দিয়াছিলে? মাঝারা না থাকিলে সে আজ
ডুবিয়া মরিত।”

নির্বোধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র উত্তর করিল, “সে
আমার সহিত কলহ করিতে আসে কেন?”

নবকুমার। শ্রীশের সহিত কলহ করিতে
তোমার লজ্জা হয় না? জান না, তুমি কে
আর শ্রীশ কে? তুমি কি শ্রীশের সমান?

নরেন্দ্র ক্রোধকম্পিত-স্বরে বলিল, “আমি

শ্রীশের সমান নহি। আমি জমীদার
বীরেন্দ্রসিংহের পুত্র, শ্রীশ পথের কাড়ালী,
পরের অরে পালিত, তাহার সমান আমি
কিহুপে?”

নবকুমার এরূপ উত্তর কখন শুনে-
নাই; বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,
“কাহার সহিত কথা করিতেছ, জান?”

নরেন্দ্র। জানি, যে দ্বিহীন সজ্ঞান আমার
পিতাকর্তৃক পালিত হইয়া কালসপের জার
তাঁহাকে নগ্নন করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার
বিষয়টি লইয়াছে, সেই নবকুমার বাবুর
সহিত কথা করিতেছি।

নবকুমার এক মুহূর্তের জন্য নিকম্বর
হইলেন। কি বিষয় তাঁহার স্মরণ হইতেছিল,
বলিতে পারি না। পরক্ষণেই বলিলেন,
“কৃত্য বালক! তোর পিতা নিজ মোহে
জমীদারী হারাইয়াছে, অনাথকে এত দিন
পালন করিলাম, তাহার এই কল। আজ
শ্রীশকে ডুবাইয়াছিলি, কাল আমার গলায়
ছুরি দিবি! তুই অতই আমার বাড়ী হইতে
দূর হ।”

নরেন্দ্র। চলিলাম! কিন্তু যদি ঠৈহুয়ে
কি পরজন্মে বিচার থাকে, তুমি তাহার ফল
ভোগ করিবে।

সারংকালে গঙ্গাতীরে হেমলতা একাকী
বিচরণ করিতেছিল। যে যে ঘটনা হইয়া-
ছিল, হেমলতা সমস্ত শুনিয়াছিল। হেম-
লতাকে দেখিয়া নরেন্দ্র একবার দাঁড়াইল
দেখিল, হেম চক্ষুতে বস্ত্র দিয়া বার বার
করিয়া কাঁদিতোছে।

নরেন্দ্রের ক্রোধ গেল, সে হেমের নিকট
আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “হেম,
কাঁদিতোছে কেন?”

কাতরস্বরে হেম উত্তর করিল, “নরেন্দ্র,
নরেন্দ্র, আমার হাত ছাড়িয়া দাও। শ্রীশকে

আমি দানার ভায় মাত্র করি, তাহাকে তুমি জলে কেলিয়া দিয়াছিলে। আমার পিতাকে তুমি কালসর্প বলিয়া গালি দিলে? আমাদের তুমি ঘৃণা কর? নরেন্দ্র! আমার হাত ছাড়িয়া দাও।”

শ্রীশকে জলে কেলিয়া দিয়াও ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রের সংজ্ঞা হয় নাই, নবকুমারের তিরস্কারেও তাহার সংজ্ঞা হয় নাই, কিন্তু এখন হেমের চক্ষুতে জল দেখিয়া ও বালিকার কয়েকটি কাতর-কথা শুনিয়া নির্বোধ হৃৎকের সংজ্ঞা হইল। ধীরে ধীরে হেমের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া নরেন্দ্র কাতরস্বরে বলিল, “হেম, ক্ষমা কর, আমি অপরাধ করিয়াছি। শ্রীশ শাস্ত, ধীর ও নির্দোষ, তাহাকে জলে কেলিয়া দিয়া আমি নির্বোধের ভায় কার্য্য করিয়াছি; তোমার পিতাকে গালি দিয়া আমি চণ্ডালের ভায় কার্য্য করিয়াছি; কিন্তু হেম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ভিন্ন স্নেহপূর্ব্বক কথা কহিবার জগতে আমার আর কেহ নাই। আজি আমি দেশত্যাগী হইয়াছি, যাইবার পূর্বে তোমার দুইটি স্নেহের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হেম, আমাকে ক্ষমা কর।”

হেম ক্ষমা করিল, নরেন্দ্রকে গলাতীরে বসাইল, আপনি নিকটে বসিল, অশ্রুজল মুছিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল। “নরেন্দ্র, কেন দেশত্যাগী হইতেছ? পিতা রাগ করিয়া একটি কথা বলিয়াছেন বলিয়া, নরেন্দ্র, কেন বীরনগর ত্যাগ করিবে? হেম নিজে পিতার নিকট অহরোধ করিয়া পিতার ক্রোধ অপনোদন করিবে, নরেন্দ্র, তুমি বীরনগর ছাড়িয়া যাইও না।”

কিন্তু হেমলতার এ অহুন্নর বার্তা হইল। উদ্ধত নরেন্দ্র হেমলতার অশ্রুজল দেখিয়া

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে আজ যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহার শাস্তি নাই। নরেন্দ্র বলিল, “হেমলতা, তোমার অহরোধ কথা, বস্ত্ত: বীরনগরে আমার স্থান নাই। কয়েক মাস অবধি, কয়েক বৎসর অবধি আমি এই পৈতৃক ভবনে যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সে যাতনা তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসার জন্ত সজ্জ করিয়াছি। যে দেশে আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতা রাজা ছিলেন, সে দেশে পরপালিত, ঘৃণিত, পদদলিত হইয়া বাস করিয়াছি, সে কেবল তোমার স্নেহের জন্ত! হেম, তোমারই স্নেহের জন্ত, তোমারই ভালবাসার জন্ত, তোমারই আশার এত দিন ছিলাম, সে আশাও সাক্ষ হইয়াছে! আশা ছিল, তোমার পিতা আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। আমার কথায় রাগ করিও না, লজ্জা করিও না, লজ্জা বা রাগ করিবার এখন আর সময় নাই। তোমার পিতার মন বুঝিয়াছি, বিনীত শ্রীশচন্দ্রকে তিনি স্নেহ করেন, আমি তাঁহার চক্ষের শূল! শ্রীশচন্দ্রকে তিনি কষ্টাদান করিবেন, তাহা কি আমি চক্ষু দেখিব? তাহা দেখিয়া এই গৃহে বাস করিব? হেমলতা, হেমলতা, ক্ষমা যে আঘাত সহ্য করিতে পারে না, অথবা সুনিশ্চয়ির সেরূপ সহিষ্ণুতা আছে। হেমলতা, আমি ঋণী নহি। হেম, আমাকে বিদায় দাও, বীরনগরে আমার স্থান নাই।”

কণেক পর নরেন্দ্র পুনরায় ধীরস্বরে কহিতে লাগিল, “হেমলতা, কাদিও না। সমস্ত জীবন কাদিবার সময় আছে, একবার আমার কথা শুন। আমি আজি জন্মের মত চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, কি করিব, তাহা আমি জানি না। কিন্তু সে চিন্তা করি না, জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রহিয়াছে,

আমারও থাকিবার স্থান হইবে। কিন্তু এই জনাকীর্ণ জগতে আমি আজ হইতে একাকী। নানা দেশে নানা স্থানে অনেক লোক দেখিব, তাহাদের মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাবিবে, এরূপ লোক নাই, নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক করিবে, এরূপ লোক নাই।”

হেমলতার চক্ষুজলে বস্ত্র ও শরীর সিক্ত হইতেছিল, এক্ষণে আর থাকিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নরেন্দ্রের চক্ষু উজ্জ্বল, কিন্তু জলশূন্য, নরেন্দ্র আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, “হেম, কখনেক হির হও, কাঁদিও না, আমি এক্ষণে কাঁদিতে পারি না। আমার মনে যে ভাব হইতেছে, তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেম, তুমি আমাকে ভালবাস, জগতের মধ্যে কেবল তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি স্নেহ দৃষ্টিতে দেখ, নরেন্দ্রের বিষয় স্নেহ-চিন্তে ভাব; কিন্তু নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসে, অন্ধকার, সুখশূন্য জীবনাকাশের মধ্যে একটি প্রণয়-তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকে, তাহা হেমলতা, জান না, বালিকার হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু এ স্বপ্ন অল্প সাক্ষ্য হইল, জীবনের একমাত্র আলোক অস্ত্র নির্মাণ হইল, অস্ত্র হইতে অন্ধকারে দেশে দেশে অরণ্যে অরণ্যে যাব-জীবন পরিভ্রমণ করিব।”

নরেন্দ্র কখনে নিশ্চয় হইয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল, “হেমলতা, আমার আর একটি কথা। বাস্যাকালে আমরা দুই জনে এই মাধবীকঙ্কণটি পুতিয়াছিলাম, আমাদের ভালবাসার স্মারক লতাটি বাড়িয়াছে, আজ আর ইহার থাকিবার আবশ্যক কি?”

নরেন্দ্র সেই লতাটি উৎপাটন করিল ও

তদ্বারা একটি কঙ্কণ প্রস্তুত করিল, ধীরে ধীরে হেমলতাকে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিল, “হেম, ফুল বত শীত শুকান, লতা তত শীত শুকান না, বোধ হয়, তুমিও আমাকে কিছু দিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, বত দিন নরেন্দ্রের জন্ত তোমার স্নেহ থাকিবে, তত দিন এই মাধবী কঙ্কণটি রাখিও, যখন অভাগাকে তুলিয়া বাইবে, নদীতলে শুদ্ধলতা ফেলিয়া দিও।”

শোকবিহ্বলা দম্ভহৃদয়া হেমলতা বিম্বিত হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র স্থির। নরেন্দ্রের স্বর গভীর ও অকম্পিত, নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল নাই, কিন্তু অগ্নি জলিতেছে। ধীরে ধীরে হেমের হাত ছাড়িয়া নরেন্দ্র চলিয়া গেল, সে অন্ধকার রজনীতে আর নরেন্দ্রকে দেখা গেল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংসারে একাকিনী।

Hear thee view thee gaze o'er all thy
charm
And round thy bhantum glue my
clasping arms,
Cope.

সারংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাতীরে বসিয়া ত্র্যাদশদর্শনা বালিকা অসংখ্য উর্ধ্ব-রাশির দিকে কি জন্ত চাহিয়া রহিয়াছে? যতদূর অন্ধকারে দেখা যায়, বীচিমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে তাহার পর একটি ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর আর অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখিতে দেখিতে হেমের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, তথাপি হেম কিছু দেখিতে পাইল না, রজনী গাঢ় হইয়া আসিল, ক্রমে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল, তথাপি হেমের দেখা হইল না।

রজনীতে রজনীর বাকীর সকলে নিদ্রিত হইল। হেমচন্দ্র পক্ষে সে রজনী কি ভীষণ। বালিকা বীরে বীরে শব্দ হইতে উঠিয়া গবাক্ষের নিকট আসিল, বীরে বীরে গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখিল; দেখিল, তারা পরিপূর্ণ অন্ধকার আকাশের নীচে বিশাল গঙ্গা অনন্তশ্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই নৈশগঙ্গার দিকে দেখিতে দেখিতে কি হৃদয়বিদারক ভাব হেমচন্দ্রের হৃদয়ে আগরিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের ক্রীড়া, কিশোর-বয়সের প্রথম ভাল-বাসা, কত কথা, কত কোতুক, একে একে জাগরিত হইয়া বালিকার হৃদয় দলিত করিতে লাগিল। এক একটি কথা মনে হয়, আর হৃদয়ে দুঃখ উথলিয়া উঠে, অবিরল অশ্রু-ধারার চক্ষু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। আবার বালিকা শাস্ত হইয়া গঙ্গার দিকে দেখে, আবার একটি কথা স্মরণ হয়, আবার শোক-বিহ্বলা হইয়া অজস্র রোদন করে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা অবসর হইল, হায়! সে ক্রন্দনের শেষ নাই, সে ক্রন্দন অব্যাহত, অশান্তিপ্ৰদ। রজনী এক প্রহর, দ্বিপ্রহর হইল, তথাপি বালিকা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মানা অথবা ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

শোকের প্রথম বেগের উপশম হইল, কিন্তু শোকচিন্তাপরম্পরা নিবারণ হইবার নহে। গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিয়া হেমচন্দ্র ভাবিতে লাগিল। এক একবার হেমচন্দ্রের মনে একবিন্দু জল জ্বলিতে লাগিল, বীরে বীরে সেটি গড়াইয়া পড়িল, আবার একবিন্দু জল হইতে লাগিল। সে বিন্দু-পরম্পরা শুকাই না, সে চিন্তা-পরম্পরা শেষ হয় না।

রজনী শেষ হইল, পূর্বাকাশে রক্তিমচ্ছটা

দেখা হাইতে লাগিল, মলিনা বালিকা তখনও গণ্ডে হস্ত দিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া আছে; তখনও চিন্তা-সূত্র শেষ হয় নাই। জীবনে কি শেষ হইবে?

রজনী প্রভাত হইল, প্রথম সূর্যালোকে হেমচন্দ্র চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু কোটির-প্রবিষ্ট, বদনমণ্ডল মলিন, শরীর অবসন্ন। বীরে বীরে বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে হইতে উঠিল, শূন্তহৃদয়ে শূন্তগৃহে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই কি এক দিন? দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে বালিকা সেই গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিত, যে গঙ্গাভীরে নরেন্দ্র বিদায় লইয়াছে, সেই গঙ্গার দিকে দেখিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াংকালে, গভীর রজনীতে শূন্তহৃদয়া বালিকা সেই গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত, কত ভাবিত, কত কথা মনে আসিত, কে বলিবে? একদিন নরেন্দ্রনাথ হেমের কানে কানে কি বলিয়াছিল, একদিন ওপার হইতে হেমের জন্ত কি আনিয়াছিল, একদিন পাছ হইতে আত্র পাড়িয়া হেম ও নরেন্দ্র লুকাইয়া খাইয়াছিল, একদিন পিতাকে না বন্দিয়া হেম সন্ধ্যার সময়ে নরেন্দ্রের সহিত নৌকায় চড়িয়াছিল, একদিন নরেন্দ্রকে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল, একদিন নরেন্দ্র হেমের কেশ ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, সহস্র সহস্র কথা একে একে নদীজলের হিল্লোলের স্তায় হেমের হৃদয়ে উঠিত। দ্বিপ্রহর হইতে সায়াংকাল পর্য্যন্ত, কখন কখন সন্ধ্যা হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত হেমচন্দ্র ভাবিত, এক একবার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইত, পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বালিকা জল মুছিয়া কেলিত। নবকুমারের বিপুল সংসারে সে দুঃখের ভাগিনী কে হইবে? হেম কাহাকেও মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিত না। বালিকা সকলের

নিকটেই সন্ধান করিত, বাড়ীর লোক-
দিগের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া
ভাসিত। কখন কখন শোকপারাবার উৎ-
লিলে গোপন করিতে পারিত না, নয়ন
হইতে অবিরল বারিধারা বহিত।

ক্রমে বসন্তকালের পর গ্রীষ্মকাল আসিল;
প্রকৃতি বঙ্গদেশকে সুবাস্ত্র ফল, সুদস্ত ফল,
সুকঠ পক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। নবপল্ল-
বিত বৃক্ষগণ সুমন্দ বায়ুতে মধুর গান করিতে
লাগিল, তাহার সঙ্গে সুন্দর পক্ষিগণ আনন্দে
গান করিয়া নিজ নিজ কুলায়নির্মাণ করিতে
লাগিল। মধ্যাহ্নে ছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষমূলে উপ-
বেশন করিয়া, পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া,
পক্ষিবাক ও পক্ষিদম্পতির দিকে চাহিয়া,
বালিকা হস্তে গুণ্ড-স্থাপন করিয়া চিন্তা
করিত; যতক্ষণ না সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই
বৃক্ষাবলী আবৃত করিত, হেমলতার চিন্তাসূত্র
ছিদ্র হইত না। তাহার পর বর্ষা আসিয়া
চন্দ্রশেখর প্রাবৃত করিল, বর্ষা শেষ হইল।
কৃষ্ণকর্ণা আনন্দে ধাতু কাটিতে লাগিল।
গ্রামে, গৃহে, গোলায় ধাতু পরিপূর্ণ হইল।
জগৎ আনন্দিত হইল, কিন্তু হেমের নিরানন্দ
হৃদয় শান্ত হইল না। সুন্দর আশ্বিন মাসে
শ্রীজার রব উঠিল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি
উঠিল, আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু হেম-
লতার হৃদয়াকাশ তমসাক্ষর। আবার শীত-
কাল আসিল, আনন্দে কৃষ্ণকর্ণা আবার
ধান কাটিল, আনন্দে সংসারী, গৃহস্থ, ধনী,
কান্দালী সকলেই পৌষপার্বণ করিল, হেম-
লতার পার্বণের দিন কি ইহজন্মে আর
আসিবে?

নবকুমারের বিপুল সংসার। কাহারও
কিছু কোভ নাহি, অভাব নাহি, চুৎখ নাহি।
সেই সংসারে স্নেহপালিতা একমাত্র ছুঁহিতা
বৈষ্ণবী। বিপুল সংসারেও হেমলতা একাকিনী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:—

জগতে একাকী।

And loves the world to darkness and
to me.
Gray

নরেন্দ্র অতিশয় সন্তরপণটু ছিলেন,
সেই রাত্রিতে সন্তরপ দিয়া গঙ্গা পার হইয়া
অপর পারে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে
অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবল বালুকা, তাহার
পর কেবল অনন্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে।
নরেন্দ্র সেই অন্ধকার নিশীথে দিক্‌শরীর
ও সিন্ধবনে সেই বালুকাক্ষেত্রে বিচরণ
করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র গঙ্গার অপরপার্শ্বের দিকে দৃষ্টি
করিলেন। অন্ধকারেও বীরনগরের খেত
প্রাসাদ ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে, নরেন্দ্র সেই দিকে
দেখিলেন, আবার চক্ষু ফিরাইয়া বিচরণ
করিতে লাগিলেন। আবার স্থির হইয়া সেই
দিকে চাহিলেন। নিম্নক অন্ধকারে গঙ্গার
কল্ কল্ শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে
পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, আর
এক একবার দূর শৃগালের কোলাহল শ্রুত
হইতেছে। নরেন্দ্র গঙ্গা দেখিতেছিলেন না,
নরেন্দ্র পেচক বা শৃগালের ধ্বনি শুনিতে-
ছিলেন না, তিনি নিঃশব্দে অন্ধকারে বিচরণ
করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর আবার
বীরনগরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর
অন্ধকারে আর সে গৃহ দেখা যায় না।
নরেন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া
ফিরিলেন। সম্মুখে যে পথ পাইলেন, সেই
দিকে চলিলেন।

কোথায় যাইতেছেন, নরেন্দ্র জানেন
না। উপরে অসীম গগন, নীচে অসীম প্রান্তর,
নরেন্দ্রের চিন্তাও অসীম ও অনন্ত, নরেন্দ্র যে

দিকে পাইলেন চলিলেন। পথ-পার্শ্বে বটবৃক্ষ হইতে নিশাচর পক্ষী নরেন্দ্রকে দেখিয়া কুলার ছাড়িয়া পলায়ন করিল, নিশাবিহারী শৃগাল-পাল নরেন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, নরেন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিল না।

অনেক দূর বাইয়া একটি গ্রামে আসিলেন, গ্রাম নিম্নতর, সফলেই যুগ্ম। কক্ষবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার দেখা বাইতেছে ও বৃক্ষপত্রমধ্যে কোন কোন স্থানে ক্ষোভোতমালা বিকসিত করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিয়া গ্রাম্য কুকুর শব্দ করিতে লাগিল; দুই এক জন যুগ্ম ঘরের দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল; নরেন্দ্র কোন দিকে চাহিলেন না; পথ অতিবাহান করিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ ঠিক জানেন না, স্থানে স্থানে বৃক্ষের নীচে ও ঘোড়পার ভিতর দিয়া বাইতে নরেন্দ্রের শরীর কত-বিকত হইল। নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না, কতক্ষণে গ্রাম-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া এক প্রান্তরে পড়িলেন।

আরার প্রান্তর পার হইলেন, অল্প গ্রামে পড়িলেন; আবার নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন। সেই রজনীযোগে কত গ্রাম অতিক্রম করিলেন, কতদূর বাইলেন, জানি না, নরেন্দ্রও বলিতে পারেন না।

সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দূর-প্রান্তরে একটি আলোক দেখিতে পাউলেন, সেই আলোক অহসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রায় এক ক্রোশ বাইয়া আলোকের নিকট পৌছিয়া দেখিলেন, স্বতকগুলি লোক একটি শবদাহ করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ তখন একবার দাঁড়াইলেন। শব্দ দেখিয়া একবার দাঁড়াইলেন। কাষ্ঠের অগ্নি এক একবার জলিয়া উঠিতেছিল; আবার মধ্যে মধ্যে নিভেজ হইয়া বাইতেছিল। ঐরূপ

স্তিমিত আলোকে নরেন্দ্রের আকৃতি ও বিকট মুখমণ্ডল এক একবার দেখা বাইতে লাগিল। যাঁহারা শবদাহ করিতে আসিয়াছিল, তাঁহারা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল; প্রান্ত পথিক যনে করিয়া নিকটে আসিতে বলিল, নরেন্দ্র নিকটে গেলেন না; পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র পরিচয় দিলেন না। শবদাহিগণ কণেক নরেন্দ্রের অচল দীর্ঘ অবয়ব ও বিকৃত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শব্দ ছাড়িয়া উল্লুখাসে পলায়ন করিল।

প্রত্যুষে গ্রামের স্থালোকেরা কলস শইয়া বাটে বাইতেছিল, এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ বিকৃত মনুষ্যমূর্ত্তি পথে শয়ান দেখিয়া সভয়ে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। গ্রামের লোক সমবেত হইয়া অপরিচিত ঘোর নিলোভিভূত পুরুষকে জাগাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, “আমার নাম নাই, আমার নিবাস নাই, আমি জগতে একাকী।” নরেন্দ্র ঘোর উন্মত্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

র'জমহল।

Seldom alas ! the power of
logic reigns
With much pulificency in
royal brains.
cawfer.

নরেন্দ্র সেই দিনেই পীড়াক্রান্ত হইলেন, গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। অনেক দিন পর নরেন্দ্র ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। বধন চলিবার শক্তি হইল,

তখন সেই ভক্তলোককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া নরেন্দ্র সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন ।

প্রথম শোক ও নৈরাশ্রের বেগ তখন কান্ত হইয়াছে, নরেন্দ্র তখন হেমলতাকে পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, সুবাদারের নিকট আপন বিষয় পাইবার আবেদন করিব । পৈতৃক জমিদারী আমার হইলে আর্থপর নবকুমার অবশ্যই আমাকে কতাদান করিবেন ।

এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র সুবাদার সুজার রাজধানীতে পৌঁছিলেন । সম্রাট শাজিহানের পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকা হইতে রাজ-হাটস্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং শিখতিবৎসর সুশাসন দ্বারা বঙ্গদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার শাসনকালে দেশে প্রায় যুদ্ধ বা কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই, প্রজাবর্গ নিকৃৎবেগে কাল-যাপন করিতেছিললেন । ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায় । তিনি যুদ্ধে যেক্রম বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন, অতঃসময়ে সেইরূপ স্তায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন । তাঁহার দয়া ও স্তায়পরতা দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে, কি জমিদার কি জায়গীরদার, সকলেই তাঁহাকে ভাস্বাসিত । কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার জন্ত খেদ করিয়া-ছিল ; কিন্তু তাঁহার উদারস্বভাব হুই একটি দোষে কলঙ্কিত ছিল । যুদ্ধের সময় তিনি যেক্রম সাহসী, অস্ত্র সময়ে তিনি সেইরূপ বিলাসী । সুজা নিরস্তির সুশ্রী পুরুষ ছিলেন এবং সর্বদাই সুন্দরী রমণীমণ্ডলীতে পরিবৃত্ত থাকিতে ভালবাসিতেন । তাঁহার প্রধান রাজ্ঞী প্যারি বাহু বঙ্গদেশে রূপে,

ওণে ও চতুরতার অধিষ্ঠিতা বলিয়া খ্যাতা ছিলেন । তিনি বাকপটুতা ও স্মরণ-কৌতুকে সর্বদাই সুবাদারের হৃদয় প্রেম-রসে সিক্ত করিয়া রাখিতেন । কিন্তু প্যারি বাহুও একাকী সুজার প্রণয়-ভাগিনী ছিলেন না, শত শত বেগম উচ্চানস্থিত পুষ্পের স্তায় সুজার রাজমন্দির আলো করিয়া থাকিত । তাহাদের রূপে বিবাহিত হইয়া সুজা রাজকার্য্যে বিন্মত হইতেন কখন কখন হুই তিন দিন ক্রমাঘয়ে মত্তপান ও আমোদে অতিবাহিত করিতেন ।

নরেন্দ্রনাথ সুবাদারের নিকট আবেদন করিতে বাইলেন । এরূপ সুবাদারের নিকট উচিত বিচার-প্রভ্যাশা সম্ভব নহে । গদ্যভীরে সুন্দর রাজমহলনগরী এখনও দেখিতে মনোহর, কিন্তু যখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন রাজমহলের শোভা অতুলনীয় ছিল । সুবাদারের উচ্চ প্রাসাদ, রাজবাটী, ওমরাহ ও স্তায়দারদিগের সুদৃশ্য হর্য্যাবলী এবং বঙ্গদেশের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সমাগমে রাজমহল যথার্থই রাজ-পুরী বলিয়া বোধ হইত । স্বয়ং গঙ্গা সহস্র ধনাঢ্য বণিকের সহস্র পোত বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিত । প্রশস্ত রাজপথে যুদ্ধবিলাসী গর্জিত ওমরাহ ও মুসলমান জমিদারগণ সর্বদাই অথ, হস্তী অথবা শিবিকায় গমন করিত । হিন্দু বণিক-ব্যবসায়ী লোক শান্তভাবে নগরের একপার্শ্বে বাস করিত ও নিজ নিজ ব্যবসারে রত থাকিত ।

এ সমস্ত দেখিবার জন্ত নরেন্দ্রনাথ রাজ-মহলে বান নাই, এ সমস্ত দেখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না ; কিরূপে সুবাদারের নিকট আবেদন জানাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনেক ধনাঢ্য হিন্দু-

বণিক নরেন্দ্রের পিতাকে চিনিতেন, কিন্তু নরেন্দ্র এক্ষণে দরিদ্র, দরিদ্রের জন্ত কে চেষ্টা করে? নরেন্দ্র বাহার নিকট যাইলেন, তিনিই বলিলেন, “হাঁ বাপু, তোমার পিতা মহাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল্যাম, কয়েক দিন এই স্থানে অবস্থিতি কর, পরে দেখা যাইবে,” ইত্যাদি। নরেন্দ্র বিকলপ্রায় হইয়া রহিলেন।

অনেক দিন পরে ঘটনাক্রমে একাঁন খাঁ নামক কোন মোগল জায়গীরদারের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয় হইল। একাঁন খাঁ বীরেন্দ্রের পরম বন্ধু এবং যথার্থ মহাশয় লোক ছিলেন, তিনি সাদরে নরেন্দ্রকে আশ্বাস করিয়া স্বয়ং তাঁহার জন্ত সুবাদারের নিকট যাইতে প্রতীক্ষিত হইলেন। তথাপি দরিদ্রের আবেদন বিচারাসন পর্যন্ত যায় না, অনেক যত্নে, অনেক দিন পর একাঁন খাঁ বহু অর্থে সুবাদার ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মন পরিভূষ্ট করিয়া একদিন নরেন্দ্রনাথের আবেদন সুজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সুন্দর রোপা ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সুবাদার বসিয়াছেন, রাজবেশে সুন্দর অবরবে বড় সুন্দর শোভা পাইয়াছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মোগল যোদ্ধাগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও বহুবিধ লোকে বিস্তীর্ণ বিচারপ্রাসাদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রস্তরবিনির্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারু খচিত ছাদ শোভা পাউতেছে ও সিংহাসনের দুই দিকে পরিচারক চামর হুলাইতেছে। প্রাসাদের বাহিরে বহুদূর দেখা যায়, লোকে সমাকীর্ণ, সুবাদার সর্বদা দেখা দেন না, সেই জন্ত জন্ত সকলেই দেখিতে আসিয়াছে।

সুবাদারের সম্মুখে বসে একাঁন খাঁ উঠিয়া আবেদন করিলেন, “জ়ে হাঁপনা, এ দাস প্রায় বিংশতি বৎসর সন্তোষে কৰ্ম করিয়াছে, সুবাদারের কাছে আমার কেশ পুরু হইয়াছে, ললাট খড়্গে ক্ষত হইয়াছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।”

সুবাদার বলিলেন, “একাঁন, তুমি আমাদের প্রধান অম্ভচর ও অতিশয় প্রিয়পাত্র, তোমার এমন কি যাচঞা আছে, বাহা আমাদের অদেয়?”

একাঁন তুমি পর্যন্ত শির নোয়াইয়া পুনরায় বলিলেন, “জ়ে হাঁপনা! বঙ্গদেশ-বাসিগণ অতি দুর্বল; তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পরাক্রান্ত জমীদারগণ আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করে, তাহারা সুবাদারের প্রীতিভাজন সন্দেহ নাই। জমীদার বীরেন্দ্র-সিংহ একজন ধৈর্যরূপ লোক ছিলেন।”

সুবাদার বলিলেন, “হাঁ, আমি সেই হিন্দুর নাম শুনিয়াছি, পাঠানদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধে সে সাহায্য করিয়াছিল।”

একাঁন পুনরায় তললীম করিয়া বলিল, “জ়ে হাঁপনা! যাহা কহিলেন, যথার্থ। এই দাস যখন উড়িষ্যার যুদ্ধে গিয়াছিল, তখন বীরেন্দ্রের যুদ্ধকৌশল ও রাজভক্তি দেখিয়াছিল। এই রাজসভার অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন; কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্যন্ত দেখে নাই।”

সভাস্থদিগের কোষে অসি-স্বনূনার শব্দ হইল, মুসলমানদিগের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সুজা সহাস্ত-বদনে বলিলেন, “একাঁন, তুমি কাকেরের অভ্যন্ত প্রাণশ্বাস করিয়াছ, কিন্তু অব্যর্থ নহে, সে হিন্দু যথার্থ সাহসী ছিল শুনিয়াছি। এক্ষণে তাহার জন্ত কি বলিবার আছে বল,

তোমার উপরোধে আমি তাহাকে যে কোন পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।”

একান্ন গভীরভাবে বলিলেন, “যিনি স্বাধীনতার উপর স্বাধীন, বাদশাহের উপর বাদশাহ, তিনিই কেবল এক্ষেপে বীরেরূপে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারেন। আমি তাঁহার অনাথ বালকের জন্ত আবেদন করিতেছি। বালক এক্ষেপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কান্দু মহাশয়ের যোগে এক শঠ তাঁহার পৈতৃক জমিদারী কাড়িয়া লইয়াছে।”

ঐ কণ্ঠিত করিয়া স্বাধীন কান্দুকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সময়ে সমস্ত খাজানা ও জমিদারীর বিষয় কান্দু মহাশয়ের হস্তে থাকিত। এমন কি, বঙ্গদেশের স্বাধীন যে সমস্ত কাগজাং দিল্লীতে পাঠাইতেন, তাহাও কান্দুর সহি না হইলে গ্রাহ্য হইত না। কান্দু মহাশয় নবকুমারের অর্থ-ভোগী, বিনীতভাবে বলিলেন, “স্বাধীন মহাশয়ের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য; বীরের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর খাজানা আদায় না হওয়ার জেহাপনা সেই জমিদারী নবকুমারকে দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।”

সুজাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ছিল না, কান্দু মহাশয় যাহা বুঝাইলেন, স্বাধীন তাহাই বুঝিলেন; একান্নের আবেদন কান্দু গেল। একান্ন রোষে নতশির হইয়া রহিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে নরেন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া কান্দু মহাশয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছিলেন।

স্বাধীন শেষে বলিলেন, “একান্ন বা! স্বর্গ যে রশ্মি জগতে দান করেন, তাহা ফিরাইয়া লন না, জমিদারী স্বয়ং দান করিয়া ফিরাইয়া লওয়া রাজবন্দ্য নহে; বীরেন্দ্রের বালক তেজস্বী দেখিতেছি, বীরেন্দ্রের মত

যুদ্ধব্যবসায় শিক্ষা করুক, অবশ্যই উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও অস্ত্র জমিদারী এনার পাইবে।”

সত্যম্ব সকলে “কেরামৎ “কেরামৎ” বলিয়া স্বাধীনতার কথায় প্রশংসা করিল; একান্ন অগত্যা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিন হইতেই নরেন্দ্রকে নিকটে রাখিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

কাশীর যুদ্ধ ।

The diadem with mighty projects lined.
To catch renown by ruining mankind.
Is worth, with all its gold and glittering

store.

Just what the toy mill wofor and no more,
Cawper.

পূর্বোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী ও জ্ঞানগণের বড় হলহুল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বারলোকে সমাকর্ষ, সমগ্র নগরবাসী ভীত ও শশবাত, বাজার দোকান সমগ্র বন্ধ ওমরাহ, মনসবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহীন। কার্য্যকর্য বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট শাজিহান কয়েক দিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি সংবাদ রটনা হইল যে, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদে শিউই সমুদ্র জারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মোরাদ রণসজ্জায় বহিষ্কৃত হইলেন; পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোভুপ হইলেন। পর যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজিহান জীবিত আছেন, তখনও রাজপুত

পণ রণোত্তম হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার কারণ এই যে, ইতিপূর্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট পীড়াবশতঃ রাজকাৰ্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দার্যা এই অবসরে সমস্ত রাজকাৰ্য্য আপনিই করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না, জন্মের মত পিতাকে কষ্ট রাখিয়া আপনি রাজকাৰ্য্য করিবেন, এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিল যে বিষপ্রয়োগ দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিষ্কটক করিবেন। দার্যার ভ্রাতৃগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন না, এই জন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে বারাণসীর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে সীতাকালের সাংস্কারের আলোকে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শবরাশিতে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া রুতিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ-সমুদ্র পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিতেছে : কোথাও মূৰ্ম্ম অবস্থার অঙ্গহীন সিপাহী কণিষ্ঠের “জল—জল” করিয়া চীৎকার করিতেছে ; কোথাও দুই একজন সেনা নিজ নিজ ভ্রাতা বা বন্ধুর অঙ্গসন্ধান করিতেছে। হার! তাহাদের এ জগৎ আর ফিরিয়া পাইবে না। দুই একজন তরুর বহুমূল্য বস্ত্র বা স্বর্ণালঙ্কার বা অস্ত্রাদির অধেষণে ফিরিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে এবং শৃগালগণ মহাকালাহলে রব করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসিতেছে। দুই এক স্থানে অগ্নিরাশি দেখা যাইতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে আলোকচ্ছটার ক্ষেত্র ও শবরাশি উজ্জ্বল করিতেছে। দূরে গঙ্গার পবিত্র জল কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে ; নদীর বিশাল বকঃস্থল শান্ত,

বিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল ; ক্ষুদ্র মানবের সুখ বা দুঃখ জয় বা পরাজয়ে বিচলিত হয় না।

ক্রমে রাজনী গভীর হইল, চন্দ্র উদিত হইল, তাহার নির্মল নিরুলক কিরণে মানবের কি কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পরের শোণিতপানে লোলূপ হইয়া এই যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে ; শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও স্বজাতির উপর হিংসা করে না! সেই চন্দ্রালোকে দুই জন রাজপুত্র কোন বন্ধুর অঙ্গসন্ধানে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। এক স্থানে কতকগুলি শব পড়িয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বেদনাশূচক স্বর বহির্গত হইল। রাজপুত্র সেনাস্বয় দেখিল, একজন যুবক মূৰ্ম্ম অবস্থায় পড়িয়া শব্দ করিতেছে। হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে ও সেই ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিত নির্গত হওয়ার প্রায় অচেতন হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর আশু সম্ভাবনা নাই।

যুবকের আকৃতি দেখিয়া রাজপুত্র দুই জন বিস্মিত হইল। বয়ঃক্রম অতিশয় অল্প, বোধ হয়, অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা স্ত্রীলোকের সম্ভবে, পুরুষের প্রায় সম্ভবে না। চিন্তা অথবা বয়সের একটি রেখাও এ পর্য্যন্ত ললাটে অঙ্কিত হয় নাই, ললাটস্থ পরিষ্কার ও উন্নত। সমস্ত বদনমণ্ডল দেখিলে যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয় না, বালক বলিয়া বোধ হয়, বাগ্যাবস্থাতেই হতভাগা স্বজন ও স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া আজি প্রাণ হারা-ইতে বসিয়াছে।

রাজপুত্রসেনা দুই জনেরই যুদ্ধব্যবসারে হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া অনেক হ্রাস

হইয়াছে, বালককে দেখিয়া তাহারা হাস্ত করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল ;—

প্রথম সেনা। এ বালক এই বয়সেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে ?

দ্বিতীয় সেনা। দেখিতেছি, সূজার পক্ষের সেনা। বালক যুদ্ধে পরাজিত নহে, আমাদের রেখা পর্যন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। এ কোন্ দেশের লোক ?

প্রথম সেনা। জানি না।

দ্বিতীয় সেনা। আমার বোধ হয়, বঙ্গদেশের হিন্দু। মোগল বা পাঠান হইলে এরূপ বেশ হইত না।

প্রথম সেনা। হা হা হা ! সূজা এই বাঙ্গালী শিশু লইয়া মহারাজ জয়সিংহ ও সুলতামানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন ? পুনরায় যখন আসিবেন, আমরা যুদ্ধে না আসিয়া আমাদের বালকদিগকে পাঠাইয়া দিব। চল, এখানে আর কেন ? আমাদের বন্ধুর অন্বেষণ করি।

দ্বিতীয় সেনা। এ লোকটা জীবিত আছে, একটু সাহায্য করিলে বোধ হয় বাঁচিবে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব ?

প্রথম সেনা। শত্রুকে বাঁচাইতে গেলে আমাদের সময় থাকে না। আমি এক দণ্ডে ইহার দফা শেষ করিতেছি।

এই বলিয়া সেনা অসি নিক্ষেপিত করিল। দ্বিতীয় সেনা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল, “না না, যমুখ্ লোকের প্রাণ-নাশ করিতে আমাদের প্রভু মহারাজা যশোবন্ত সিংহ নিষেধ করিয়াছেন, তুমি যাও, আমি ইহাকে বাঁচাইব।”

প্রথম সেনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, দ্বিতীয় সেনা জলসেচন দ্বারা যমুখ্ বা ক রাস দ্বারা । যুবা নেত্র উন্মী-

লিত করিয়া চলিল, চারিদিকে শব্দ শুনিয়া রহিয়াছে, অকস্মেৎ চক্ৰ উদয় হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, “যদি আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছ, তোমার নাম কি ? কোন্ পক্ষের জয় হইয়াছে, কোথায় গিয়াছেন ?”

সেনা বলিল, “আমার নাম গজপতি সিংহ, আমি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের একজন সেনানী, এক্ষণে মহারাজা জয়সিংহের আত্মাধীন। তোমার সূজা অভি-শয় বিলাসপ্রিয়, এতদ্বারা বেগমদিগের বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া উদ্ধ্বাসে বঙ্গদেশাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন ! হা—হা!”

যুবক অভিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর বলিল, “তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে আর একটু সাহায্য কর। একটু জল দাও, আর দুই এক দিন থাকিবান স্থান দাও। আমার দেশ অনেক দূর, এখানে আমার একজনও বন্ধু নাই, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জল দাও, জল দাও।”

নরেন্দ্রের বালকাকৃতি দেখিয়া গজপতি সিংহের দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, বালকের কাতরোক্তি শুনিয়া একটু মমতা হইল, শুক্রবা করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

রাজা জয়সিংহের শিবির ।

Where judgment its clear sighted and
surveys
The chain of reason with unerring gazes.
Thompson.

একটি প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুই জন মহাবীর বসিয়া কথোপকথন করিতে-

ছিলেন। একজন রাজপুত রাজা জয়সিংহ, অপর জন তাঁহার পরম সূহৃৎ দেবের খাঁ, জাতিতে পাঠান।

রাজার বরংক্রম অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুখমণ্ডল ঘোবনের তেজে পরিপূর্ণ, শরীর ঘোবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল-সম্রাটদিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত ছিলেন। রাজপুত-দিগের বাহুবীর্য্যই মোগলগণ নিদ্ধ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপদ্ বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, সেই স্থানেই রাজপুত সেনাপতি প্রেরিত হইতেন ও প্রায়ই বিজয়লাভ করিয়া আসিতেন। আধ্যাত্মিক-বিবৃতকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুই জন বিশেষ ক্রমতালী ও প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন;—রাজা জয়সিংহ ও রাজা বশোবন্তসিংহ। সম্রাট শাজিহান উজর-কেই বিশ্বাস করিতেন ও বিশতির সময় ইহাদিগকেই রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল, কোন সেনাপতিরই জয়সিংহের স্তায় প্রতাপ, ক্রমতা বা রণকৌশল ছিল না। তাৎ-কালিক একজন বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারতবর্ষে অনেক দিন ছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, জয়সিংহের মত কার্য্যদক্ষ লোক সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। শাজিহান ও যুবরাজ দারা যখন পুলাইমান সেথকে সুলতান সূজার বিরুদ্ধে পাঠান, সঙ্গে জয়সিংহকে তাঁহার রাজপুত-সৈন্তের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বারান-সীর যুদ্ধে সূজা পরাভূ হইয়া বঙ্গদেশাভি-মুখে পলায়ন করিয়াছিলেন।

শিবিরে উজ্জল দীপাবলী জলিতেছে,

বাহিরে প্রহরী, তাহার চারিদিকে অস্ত্র শিবির। সে সময়ে রাজার শিবিরের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না। কেবল রাজা ও তাঁহার সূহৃৎ দেবের খাঁ গুপ্তকথা করিতেছিলেন।

দেবের খাঁ বলিলেন, “বখাওঁই জয়সিংহ নাম পাঠাইয়াছিলেন, আপনি যে স্থানে, জয় সে স্থানে।”

রাজা বলিলেন, “অত্কার যুদ্ধের কথা বলিতেছেন? যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধ কি যুদ্ধ?”

দেবের। কিন্তু অস্ত্র যুদ্ধের সময় সুলতান সূজা কি সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন নাই?

রাজা। তাহা স্বীকার করি। যুদ্ধের সময় তিনি সাহসের পরিচয় দেন, কাধের সময় বিলাস বিস্মৃত হন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না।

দেবের। সম্রাট-পুত্রদিগের মধ্যে কাহার অধিক রণকৌশল আছে? আপনি আরং-জীবকে কি মনে করেন?

রাজা। উঃ! তাঁহার নাম করিবেন না, সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব, সেইরূপ কৌশল। ওনিয়াছি, তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য রাজা বশোবন্ত সিংহ নন্দাদাতীরে বাইতেছেন। বশোবন্ত সিংহ রাণার জামাতা ও সেইরূপ যোদ্ধা ও বিক্রমশালী; কিন্তু আরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয়, জানি না। বশোবন্তের সাহস আছে, কৌশল নাই। আমার বোধ হয়, এই ভ্রাতৃবিরোধে অবশেষে আরংজীবের জয় হইবে।

দেবের। আপনি দারাকে পরিত্যাগ করিবেন?

রাজা। ইচ্ছামত কখনই নহে, কিন্তু

যুদ্ধে যদি অবশেষে আরঞ্জীবের জয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট, বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন, যিনি যখন সম্রাট হইবেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ রাজবিরোধিতা।

দেবের। ভাল, অতঃ আপনি ইচ্ছা করিলে অনার্যাসে সজাকে বন্দী করিতে পারিতেন। সজা যখন পলায়ন করিলেন, আপনি অনার্যাসে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুবরাজ দারাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। আপনি সেক্ষপ না করিলেন কেন?

রাজা। অতঃ সজাকে পলাইতে দিয়াছি, তাহার কারণ আছে। ভ্রাতার ভ্রাতার যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ, যদি সজাকে দারার সম্মুখে লইয়া যাইতাম, বোধ হয়, যুবরাজ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতেন অথবা যাবজ্জীবন কারাকন্ড রাখিতেন। তাহা কি বিধেয়? বিশেষ, আমি এই যুদ্ধে আসিবার সময় সম্রাট শাজিহান, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সজার হানি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সম্রাটের এই কথা অহুসারে আমি সন্ধিস্থাপনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সজাও একপ্রকার সন্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু মুলাইমান যুবা পুরুষ, আপনি বিক্রম দেখাইবার জন্ত অধৈর্য হইয়া সহসা গঙ্গাপার হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এরূপ সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, “মহারাজ, সেনানী গজপতি সিংহ একবার সাক্ষাৎ কবিত্তে গাহেন।” রাজা আসিতে আজ্ঞা দিলেন।

কণেক পর গজপতি সিংহ আসিয়া

বলিলেন, “মহারাজ! বঙ্গদেশের একজন হিন্দু বন্দী হইয়াছে, সে আহত। তাহার নিকট হইতে বঙ্গদেশীয় অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।”

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপাততঃ আমার শিবিরে থাকিতে দাও।” নরেন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরে জরসিংহ গজপতিক্তে সোধোধন করিয়া বলিলেন, “গজপতি, অতঃ তুমি যুদ্ধে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছ, সে জন্ত তোমাকে ও তোমার প্রভু যশোবন্ত সিংহকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে কি কথা বলিবার জন্ত যশোবন্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, নিবেদন কর।”

উভয়ে গুপ্তকথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জেলেশ।

My heart is sair, I dare no tell
My heart is sair, for some body.

I could range the world around,
For the sake o' some body.

Burns

তাহার পর কয়েক দিন নরেন্দ্রনাথ জরে অচেতন অবস্থায় থাকিলেন। মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা হইত, বোধ হইত যেন, তরীতে অতি ক্ষুব্ধবেগে গদার উপর দিয়া যাইতেছেন। পুনরায় কি দেশে কিরিয়া যাইতেছেন? বোধ হইত যেন, এক অল্পবয়স্ক রমণী তাঁহার শুক্রবা করিতেছে। আবার কি হেয়লভাকে কিরিয়া পাইলেন? রৌদ্রের চক্ষু জল আসিল।

কয়েক দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। রোগের ক্রমশঃ উপশম হইল। যখন সম্পূর্ণ চৈতন্ত হইল, দেখিলেন, এক অপূর্ব ঘরে একটি দীপ জলিতেছে। তিনি একটি শয্যার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। এরূপ সুস্বাদু ঘর তিনি কখনও দেখেন নাই। সমস্ত ঘর সুন্দর খেতপ্রস্তর দ্বারা নির্মিত। রোপ্যের শাখাদ্বারা দীপ জলিতেছে ও সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আনন্দিত করিতেছে। তাঁহার পালক দ্বিধরদ-খচিত, সুবর্ণ ও রোপ্য দ্বারা বিভূষিত। সম্মুখে একটি রোপ্য আধারের উপর এক রোপ্য-পাত্রে জল রহিয়াছে, নীচে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি বিচিত্র গালিচার উপর এক যবনকস্তা ও এক খোজা বসিয়া অতি মৃদু স্বরে কথোপকথন করিতেছে। যবনকস্তা যুবতী, তথাকী এবং সুন্দরী। মুখে সৌন্দর্য্য বলমূল করিতেছে, নয়ন হইতে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, ললিত বাহুল্য ও কমলীয় দেহলতার সৌন্দর্য্য প্রবাহিত হইতেছে। হেমলতার অবয়ব নরেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নরেন্দ্র কোথাও দেখেন নাই, এরূপ স্বর্গীয় পরীর স্তার অবয়ব কখন দেখেন নাই। যবনকস্তার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গীতে যেন তেঁজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে। যবনকস্তা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষমভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মুহূর্ত্তে খোজার সহিত কথা কহিতেছে। খোজা ক্রমশঃ বলাবান্। তাহাদের কি কথা হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল দুই একটা কথা শুনিতে পাইলেন।

যবনকস্তা বলিতেছিল, “মসরুর, কেন

এ হিন্দুর ও আমার সর্বনাশ করিবে? নিদোষী নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবননাশে কি তোমাদের আনন্দ?”

মসরুর। জেলেখা, তবু তুমি কাকেরকে এ স্থলে আনিলে কেন?

জেলেখা। সে আমার দোষ; ইহার কি দোষ? ইনি ত নিদোষী।

মসরুর। কেন, এত মায়া কিসের জন্য? এ কাকের কি তোমার আসেক?

জেলেখা বোদ্ধ-কন্ডা, সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল, রক্তোজ্জ্বল মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া যাইল; সক্রোধে বলিল, “মসরুর! যদি তুমি জীলোক হইতে, তাহা হইলে আমার কাতরতা বুঝিতে, যদি পুরুষ হইতে, তথাপি হৃদয়ে দয়া থাকিত। তোমার পুরুষত্বের সহিত দয়া অন্তর্ধান হইয়াছে, এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অশেফা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য।”

মসরুর হাসিয়া বলিল, “ঐ দেখ, কাকের উঠিয়াছে, আমি চলিলাম।” মসরুর বাহিরে চলিয়া যাইল।

জেলেখাও উঠিল, শয্যার দিকে আসিবার জন্তই উঠিল, কিন্তু কণেক স্থির হইয়া ভূমির দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কণেক পর জেলেখা ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল। ক্ষত প্রায় আরাম হইয়াছে, জ্বরও গিয়াছে, কেবল শরীর দুর্বল। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিক চাহিয়া রহিলেন। জেলেখার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, শরীরের রক্ত বেগে লগাট, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আরক্ত করিল।

পূর্বেও এই গৃহ ও শয্যা দেখিয়া নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কোথা

হাসিয়াছেন, কে তাঁহাকে আনিব, কে সেবা করিতেছে? জেলেখা ও মসকরের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এখন জেলেখার আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কোথায় আছি,—এই কি বন্দদেশ,—আপনি কে, আপনার নাম কি?”

নিমন্তক নিশাবোগে সহসা বজ্রধ্বনি হইলে লোকে যেরূপ চমকিত হয়, জেলেখা সহসা নরেন্দ্রের এই প্রথম কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইল; কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে স্তম্ভ ওষ্ঠদ্বরে অঙ্গুলি-স্থাপন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, “আমি অস-
হায় ও নিরাশ্রয়। আমি কোথায় আছি,
অন্তর্গ্রহ করিয়া বলুন।”

জেলেখা আবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি-স্থাপন
করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রনাথের
বোধ হইল যেন, তিনি জেলেখার উজ্জ্বল
চক্রে জল দেখিতে পাইলেন; কিছু বুঝিতে
পারিলেন না, চিন্তা করিতে করিতে আবার
নিদ্রিত হইলেন।

দাদশ পরিচ্ছেদ ।

স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল?

Ye high exalted, virtuous damers.
Tied up in godly laces.
are ye give poor frailty names.
Suppose a change o' cases.

Burns.

কয়েক দিবসের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ
আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু শারীরিক
আরোগ্য হইলে কি হইবে, অন্তঃকরণ

চিন্তার ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সেই
ঘরে কেবল মসকর বা জেলেখা ভিন্ন কেহ
আইসে না, কেহই কথা কহে না, মসকরকে
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া চলিয়া
যায়, জেলেখা ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন
করে, অথচ স্পষ্ট বোধ হয়, জেলেখা তাঁহার
দুঃখে চুঃখিনী, তাঁহার বিপদে বিপদাপমা।
নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে
পারিলেন না। তিনি কি বন্দদেশে আসিয়া-
ছেন? সুলতান সূজা নরেন্দ্রনাথকে ভাল-
বাসিতেন, সুলতানই কি স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া
নরেন্দ্রের পীড়ার সময় রাজমন্ডলে আনাইয়া-
ছেন? সম্ভব বটে, রাজ-অট্টালিকা না
হইলে একদা বহুমুখ্য দ্রব্য কোথায় সম্ভবে?
কিন্তু সূজা কালীর হুছে পরাত হইয়াছিলেন,
নরেন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় হইয়া শত্রুহস্তে পড়িয়া-
ছিলেন, তাহা তাঁহার অন্ন অন্ন স্মরণ ছিল।
শত্রুরা কি অবশেষে তাঁহাকে ও জলাদহস্তে
দিবার জন্ত এইরূপ শুশ্রূষা করিতেছিলেন?
নরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন
না।

রজনী বিগ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি
দ্বিরদ-বদ-খচিত আসনে উপবেশন করিয়া
রহিয়াছেন। সম্মুখে একটি দীপ জলিতেছে।
নরেন্দ্র হস্তে গণ্ড-স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায়
মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তা-সমুদ্র স্থির হইল, একবার
বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন।
কি দেখিলেন?—জেলেখা নিঃশব্দে সম্মুখে
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জেলেখার মুখমণ্ডল ও
ওষ্ঠদ্বয় পাণ্ডুর, কেশপাশ আনুলালিত, বদন
বিষর, নয়নদ্বয় জলে ছল্ ছল্ করিতেছে।
নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা
করিলেন, “রমণি! আপনি কে, আনি না,
আপনার অভিশ্রুত প্রকাশ করিয়া বলুন।”

জ্যেলেখা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে একবিন্দু চক্ষের জল ঘোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, “আপনাকে দেখিয়া বোধ হয়, কোন বিপদ বা ভয় সন্নি-
কট। প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি উদ্ধারের
উপায় থাকে, আমি চেষ্টা করিব।”

জ্যেলেখা তথাপি নীরব; নীরবে অশ্রু-
ঘোচন করিল। ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।
নরেন্দ্র বিম্বিত হইলেন। নিশাযোগে এই
সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে
পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন,
কোন ঘোর লকট সন্নি-কট। তিনি হস্তে
গত-স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,
অন্তমনে হইয়া, নানা বিপদের চিন্তা করিতে
লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নিৰ্ভাণ হইল, সেট
ঘোর অন্ধকারে একজন খোজা আসিয়া
নরেন্দ্রকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত
করিল। নরেন্দ্র সতয়ে তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে নিস্তরঙ্গ কত ঘর,
কত প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন, তাহা বলা
যায় না। নরেন্দ্র রাজমহলের প্রাসাদ
দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রাসাদ কখনও
দেখেন নাই। কোথাও খেত-প্রস্তর-বিনি-
শ্চিত ঘরের ভিতর সুন্দর গন্ধদীপ জলি-
তেছে, খেত-প্রস্তর স্তম্ভাকারে উন্নত
ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে, শুভে, ছাদে ও চারি-
দিকে বহুলা প্রস্তরের ও সুবর্ণ-প্রাঙ্গণ
বে কান্ধকাঁচী, তাহা বর্ণনা করা যায় না।
কোথাও প্রাঙ্গণে ঈষৎ চম্পাকোকে সুন্দর
সুন্দর বাগান, পুষ্পলতা; তাহার উপর
কোরারাজ জল খেলিতেছে; চারিদিক
বিরাট নৈশ সমীরণ নিস্তরঙ্গ বহিয়া যাই-
তেছে। কোথাও বা উদ্ভান-বৃক্ষতলে
জ্বালীন হইয়া দুই একজন উজ্জলবর্ণা উজ্জল

বেশধারিণী রমণী বীণা বাজাইতেছে অথবা
নিজার বসীকৃত হইয় সুখে শ্রীয়া যাইতেছে।
বাহিরে খোজাগণ নিঃশব্দে পদাঙ্গণ করি-
তেছে আর রহিয়া রহিয়া সুবর্ণ-প্রাঙ্গণে নৈশ বাস
সেই ইন্দ্রপুরীর উপর বহিয়া যাইতেছে।
নরেন্দ্র আপন বিপদকথা ভুলিয়া গেলেন,
এই সুন্দর প্রাসাদ, সুন্দর ঘর ও প্রাঙ্গণ,
সুন্দর উদ্ভান ও এই অপূর্ব পরিবেশধারিণী
রমণীদিগকে দেখিয়া বিম্বিত হইলেন। তিনি
কোথায়? এ কোন্ স্থান?

কতক্ষণ পরে তিনি একটি উন্নত সুবর্ণ-
খচিত কবাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।
সহসা সেই কবাট ভিতর হইতে খুলিয়া
গেল। নরেন্দ্র একটি উন্নত আলোক-পূর্ণ
ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহসা অন্ধকার
হইতে উজ্জল আলোকে আনীত ওয়ার
কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আলোক
সহ করিতে না পারিয়া হস্ত দ্বারা নয়ন
আবৃত করিলেন, অমনি শত শত নারী-কণ্ঠ-
বিনিম্বিত হস্তধ্বনিতে সে উন্নত প্রাঙ্গণ
ধ্বনিত হইল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ দৃশ্য
হন নাই। কোথায় আসিলেন? এ কি
প্রকৃত ঘটনা, না স্বপ্ন? এ কি পার্শ্ব ঘটনা,
না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন
করিলেন, পুনরায় উজ্জল আলোক-স্রোত
তাঁহার নয়ন বলসিত হইল; আবার হস্ত
দ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন। পুনরায় শত-
নারী-কণ্ঠ-ধ্বনিতে প্রাঙ্গণ শব্দিত হইল।

কণেক পরে যখন নরেন্দ্র চাহিতে লক্ষ্য
হইলেন, তখন বাহা দেখিলেন, তাহাতে
তাঁহার বিশ্বাস নশ গুণ বদ্ধিত হইল। দেখি-
লেন, খেত-প্রস্তর-বিনিশ্চিত একটি উচ্চ
প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন।
সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিয়া

রহিয়াছে, সে ছাদে ও সে শুভে বেরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। শুভ হইতে শুভান্তরে সুগন্ধ পুষ্পমালা লবিত রহিয়াছে, নীচে শুবকে শুবকে পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে, শত-নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা দোচ্ছল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, শুভ হইতে, পুষ্প ও পঙ্করশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন ঝলসিত করিতেছে ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধপরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোক-প্রতিঘাতী রত্নরাজিবিম্বিত উচ্চ সিংহাসনে তাহারিগের রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন। এ স্বপ্ন না ইচ্ছাকাল? নরেন্দ্র আলকলারলার পড়িয়াছিলেন যে, এমনহাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি একদিন নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া সহসা দেখিলেন, যেন তিনি বোঙ্গাদেশ কালিক হইয়াছেন। নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোন্মাদে আপনাকে অমরাবোষ্টিত দেখিলেন।

নরেন্দ্র সেই অমরা বা নারীরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সকলেই বক্রেত উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দেখিলে জীবমশূন্য পুতলির স্তার বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিহুঙ্কা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে, উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ-শাপেক হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতশব্দে বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত

হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ও উন্নততা এখনও বিলীন হয় নাই, বোধ হয়, যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ চট্টে একটিমাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধকধক করিতেছে। নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল, মলমলের অলঙুঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাতবয় হইতে কোন স্বর্গীয় তান উখিত হইতে লাগিল, তাহার সহিত সেই শত অমরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেইরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই, তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া, নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নৈশ গগনবিচারী অদৃষ্ট জীবগণ সেই গীতের সহিত বোগ দিয়া শতশব্দে বর্জিত করিতে লাগিল। ক্রমে আবার মলীকূত হইয়া সে গীত বীরে বীরে লীন হইয়া গেল, আবার প্রাসাদ নিম্নরূপ শব্দশূন্য। এইরূপ একবার, দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি শ্রুত হইল, তিনবার সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করার সেই প্রাসাদের একদিকের একটি রক্তবর্ণ বরনিকা পতিত হইল। নরেন্দ্র সজোরে চাহিয়া দেখি-

লেন, তাহার অপর পাখে চারি জন কঠার-
ধারী রক্তবর্ণ খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান
করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজী পুনরায়
পদাঘাত করার তাহাদের মধ্যে প্রধান এক-
জন রাজীর সিংহাসন-পার্শ্বে যাঁহারা দণ্ডায়-
মান হইল। নরেন্দ্র দেখিলেন, সে মসরুর।
নরেন্দ্রের হৃদয়ীতে শোণিত শুক হইয়া গেল।

মসরুর রাজীর সহিত অনেকক্ষণ অতি
বৃহৎ কথ্য কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল,
নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু
কথ্য কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের
দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে
মধ্যে দস্তে দস্তে বর্ষণ করিয়া, নগ্ন আরক্ত
করিয়া, যেন কি উদ্ভেজনা করিতে লাগিল।
মসরুর কি বলিতেছিল, নরেন্দ্র তাহা
জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার আকৃতি
ও রক্তভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের
সঞ্চার হইতে লাগিল। নরেন্দ্রকে এই
অপরিসীম দেশে জলাদ-হস্তে প্রাণ দিতে
হইবে, তাহার প্রতীতি হইল।

রাজী পুনরায় পদাঘাত করিলেন। তৎ-
ক্ষণে প্রাসাদের অস্ত্র পাখে একটি হরিষ্রণ
বনিকা পতিত হইল। তাহার অপর পাখে
চারি জন পরিচারিকা হরিষ্রণ পরিচ্ছদে
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার পদাঘাত
করায় সেই পরিচারিকাগণ একজন বন্দীকে
রাজীর নিকট ধরিয়া আনিла। নরেন্দ্র সবি-
শ্রমে দেখিলেন, সে বন্দী জেলখা।

জেলখা কি বলিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে
পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গ-
ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সে রাজীর অঙ্গুগ্রহ
প্রার্থনা করিতেছে, অশ্রুত্যাগ করিয়া রাজীর
পদে নৃত্য হইতেছে।

রাজী বার বার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া
দেখিলেন। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, তাহার

নয়ন জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ, ললাট উন্নত, বদন-
যুগল উগ্র ও তেজোব্যঞ্জক। সাদৃশী,
অল্পবয়স্ক, সুন্দর যুবক উন্নত ললাট ও প্রশস্ত
মুখযুগলের দিকে রাজী বার বার নয়নক্ষেপণ
করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিতে
চাহিতে রাজী নরেন্দ্রের অঙ্গুলিতে একটি
অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন। হৃৎকম্পিত
জেলখা নরেন্দ্রের পীড়ার সময়ে একদিন
লীলাক্রমে সে অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিয়াছিল,
সেই অবধি তাহা নরেন্দ্রের হাতে ছিল।
অঙ্গুরীয় রাজীর পরিচারিকাগণ চিনিла, রাজী
স্বয়ং চিনিলেন। তখন ক্রোধে রাজীর সুন্দর
ললাট রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি বহি-
র্গত হইল।

বিচার শেষ হইল। নির্দয়রূপ রাজী
আদেশ দিলেন, “জেলখা অপরাধিনী, পাণী-
য়সীকে শূল দাও! কাফেরকে সইয়া বাও,
হস্তিপদে দলিত করিয়া কাফেরকে হনন
কর!”

একেবারে দীপাবলী নির্বাণ হইল।
নিঃশব্দে অন্ধকারে খোজাগণ রক্ত ধারী
নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের যুগ্মের নিকট
একটি পাত্র ধারণ করিল। নরেন্দ্র বিষয় ও
উদ্বেগে তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলেন, সেই পাত্র
হইতে পানীয় পান করিলেন, অচিরে অচে-
তন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল,
তিনি জানিলেন না, কেবল বোধ হইল, যেন
সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাহার হস্ত
হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল, আর
কে যেন সেই অন্ধকারে রোদন করিতেছিল।
তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, অঙ্গাগিনী
জেলখা।

নরেন্দ্রনাথ বখন আগন্ত হইলেন, তখন

দবিলেন, সূর্যোদয় হইয়াছে, সূর্যের রশ্মিতে তিনি একটি প্রশস্ত বাজারের মধ্যে একটি শর্গকীরের ধারে শুইয়া রহিয়াছেন। সূর্যের নবজাত রশ্মি তাঁহার মুখে পতিত হইয়াছে ও পথ, বাট, অট্টালিকা, দোকান, বাজার, বস্তা আলোকময় করিয়াছে। এ কোন্ গহর ? এ কি বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল ? সুলতান সূজা কি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বারাদশী হইতে এই স্থানে আনিয়াছেন ? গত নিশার কি তিনি এই ভূমিশ্যার শুইয়া প্রাসাদ ও পরীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

গজপতি সিংহ ।

Hail majesty most excellent !
While nobles strive to please ye.
While ye accept a compliment
Simple poet gies eye ?

Burns.

নরেন্দ্রের বিশ্বয়ের পরিসীমা রহিল না। সে স্থানটি তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। সেই স্থান একটি প্রকাণ্ড সরাইয়ের মত বোধ হইল। মধ্যস্থানে একটি প্রশস্ত গ্রাফণ, তাহার চারিপার্শ্বে দ্বিতল হর্ম্যাজেবী, এতোক প্রকোষ্ঠেই দুই একটি করিয়া লোক আছে। সমস্ত লোক অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত পারস্ত প্রবেক, পাঠান বা হিন্দু বাণিজ্য-ব্যবসারী লোক, প্রথমে নগরে আসিয়া এই সরাইয়ে বসিয়া করিয়া আছে। সকল লোক সরাইয়ে আসিলে নিশার ছায় রুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে প্রাতঃকালে পুনরায় সরাইয়ের বহির্ভাগ উন্মোচিত হইল, লোকে গমনাগমন করিতে লাগিল।

এক বৃদ্ধ পারস্তদেশীয় সেথ একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

নরেন্দ্র বাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেথজী, এটি কোন্ স্থান ? আমি এখানে নতুন আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” সেথজী বলিলেন, “বৎস, আমিও বাণিজ্যকর্মে এই সহরে কল্যাণ আসিয়াছি, সহরের বিশেষ কিছু জানি না।”

নরেন্দ্র। আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। এই স্থানের কথা কিঞ্চিৎ আমাকে বলুন।

সেথজী। আমি বথার্থই বলিতেছি, এ সহরের কিছুই জানি না। তবে শুনিলাম, এই স্থানটি বেগম সাহেবের সরাই। সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা পাদশা বেগম সহরে নতুন আগন্তকের থাকিবার সুবিধার জন্য এই উৎকৃষ্ট সরাই নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি হুমরকন্দ ও বোখারা দেখিয়াছি, সিরাজ ও ইম্পাহান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর সহর দেখি নাই।

নরেন্দ্র। এ সহরের নাম কি ? পাদশা বেগমই বা কে ?

বৃদ্ধ বণিক অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে দুবকের দিকে চাহিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “এ কাকের দেখিতেছি জাননুত্ত, পাগ্‌লাটাকে তাড়াইয়া দাও। পাগ্‌লাবী চড়িলেই এইক্ষণে কি করিয়া বসিবে।

নরেন্দ্র গতকল্য যন্দ দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। পরে দেখিলেন, একজন পাঠান-স্ত্রী কতকগুলি কলমূল লইয়া বিক্রয়ার্থ ধনী বণিকদিগের নিকট বাইতেছে। নরেন্দ্র তাহার কাছে বাইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিবি, এ সহরের নাম কি, এ স্থানকেই বা লোকে কি বলে ?” বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া কণেক নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিল, “কাকের, আমার সে বরস নাই, উপহাস করিতে হয়, অস্ত্র স্থানে বাও, এ

খবরস্বত মুখ দেখিলে অনেক কক্ষনীও
ভুলিয়া বাইবে।”

নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন; দেখি-
লেন, একজন রাজপুত সৈনিক-পুরুষ দাঁড়া-
ইয়া রহিয়াছেন, একজন তৃত্য তাঁহার অথের
সেবা করিতেছে, সৈনিক সসজ্জ হইয়া
তৃত্যকে শীঘ্র কার্য সমাধা করিতে বলিতে-
ছেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি
এই স্থানে নূতন আসিয়াছি, এ স্থানটির নাম
কি, জানি না। আপনি বোধ হয়, অনেক
দিন এ স্থানে আছেন, আমাকে এ নগরের
কথা কিছু বলিতে পারেন?”

রাজপুত অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের দিকে
দেখিয়া উত্তর করিলেন, “বালক, তোমার
মুখ আমি পূর্বে দেখিয়াছি, তুমি বঙ্গদেশ
হইতে আসিয়াছ, না? হাঁ, স্বরণ হইয়াছে,
তুমি আমাকে ইহার মধ্যে বিন্ধত হইয়াছ?”

নরেন্দ্র তখন রাজপুতকে ভাল করিয়া
দেখিয়া বলিলেন, “না, বিন্ধত হই নাট,
গজপতি, তুমি কালীর বৃদ্ধের পর আমার
জীবন রক্ষা করিয়াছ, জীবন থাকিতে আমি
তোমাকে বিন্ধত হইতে পারিব না।”

হুই জনে অনেকক্ষণ আলাপ-পরিচয়
হইতে লাগিল। বিন্ধিত হইয়া নরেন্দ্র জানি-
লেন যে, নগর হিন্দুস্থানের রাজধানী প্রসিদ্ধ
দিল্লী নগর। কথার কথার গজপতি প্রকাশ
করিলেন, “আমি মহারাজ কবসিংহের
নিকট হইতে কতিপয় পত্রাদি লইয়া মহা-
রাজ যশোবন্ত সিংহের নিকট বাইতেছি।
তিনি আপাততঃ উজ্জয়িনীতে আরাজীবের
সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন, যুদ্ধ না হইতে হই-
তেই আমি তথায় পৌঁছিতে পারিলেই
বন্দ। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে আমার
সঙ্গে আইস, আমি মহারাজকে বলিয়া
তোমাকে অধারাহীর কার্যে নিযুক্ত করিয়া

দিব।” নরেন্দ্র সে দেশে বঙ্গদীন ও অর্ধদীন,
তারিয়া চিত্তিয়া সেই প্রভাবে সম্মত হই-
লেন। তৎপরে হুই জনে দিল্লীনগর-প্রমাণে
বাহির হইলেন।

মহানগরে বিবৃত ইন্দ্রপ্রস্ত নগর যে
স্থানে ছিল, ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু-সম্রাট
পৃথুরায়ের রাজধানী দিল্লীর যে স্থানে
ছিল, এই আধ্যাত্মিক-বিবৃত সময়ের কয়েক
বৎসর পূর্বে সম্রাট, শাজিহান সেই স্থানে
নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া ও স্থল
প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করিয়া নগরের শাজি-
হানাবাদ নাম দেন। কিন্তু নগরের সে নাম
কেহ জানে না, অত্যাগি শাজিহানের নগর
নূতন দিল্লী নামে বিখ্যাত। পৃথুরায়ের স্য-
রের হিন্দু নাম অত্যাগি পরিবর্তিত হয়
নাই।

দিল্লী এক দিকে বম্বানদী ও অত্র তিন
দিকে অর্ধগোলাকৃতিরূপে প্রাচীর দিয়া
বেষ্টিত। সে প্রাচীর প্রশস্ত ও তাহার উপর
দিয়া বাতায়াতের একটি পথ ছিল। বম্বনা
ও এই প্রাচীরের মধ্যে দিল্লীর পথ রহিবেনিত,
কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও তিন চারিটি বৃহৎ
বৃহৎ পল্লী ছিল ও ধনাঢ্য ও বহুত্ব ও হিন্দু-
রাজগণের অট্টালিকা ও বাগান অনেক বহু
অবধি দেখা বাইত। দিল্লীর ভিতরে বম্বনার
অনতিদূরে প্রস্তর-প্রাচীর পরিবেষ্টিত দু
আছে, তাহার ভিতর সম্রাটের প্রাচীর
ও বগতে অভূত্যা বর্ষর-নির্মিত হইল,
বলী।

গজপতি ও নরেন্দ্র দিল্লীর একটি প্রমাণ
পথ দিয়া দুর্গাতিমুখে বাঁতে লাগিলেন।
সমস্ত দিল্লীই প্রায় সৈনিকের বাস, সে নগর।
পক্ষিংশং সহস্র সৈন্ত বাস করিত। সৈনিক
গণের স্ত্রী, পরিবার ও বহুসংখ্যক তৃত্য সিন্ধ
নগরে বৃত্তিকা ও পর্ণকূটীয়ে বাস করিত।

হুজুরাং দিল্লী এইরূপ পর্যটকদেরই পরিপূর্ণ।
বদিক দেখা যায়, এইরূপ কুটীরভোগ্যই
বিকাশ দেখা যায়। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি-
বিক্রয়ার্থে দোকান ছিল, তাহাও অধি-
নাশে পর্যটকীয়, সর্বদাই অধি-
নাশে বৎসরে প্রায় বহু বহু পর্যটকীয়
একবারে নষ্ট হইয়া বাইত। নরেন্দ্র দুই
বারে এইরূপ কুটীর দেখিতে দেখিতে চলি-
লেন। দোকানী-পশারী নানারূপ দ্রব্য
বিক্রয় করিতেছে; পথ লোকারণ্য; অধি-
নাশই অতি সামান্য লোক, অতি সামান্য-
রূপে নিজ নিজ কর্ণে বাইতেছে। দিল্লীতে
একদেবে বহু মধ্যশ্রেণী বাবসারী ও অন্যান্য
লোক ইটকালর নির্মাণ করিয়া নগর পরি-
পূর্ণ ও সুশোভিত করিয়াছে, দুই শত বৎসর
পূর্বে তাহা ছিল না। তখন কেবল মহল্লোক
বা ইতরলোক ছিল, প্রাসাদ বা পর্যটকীয়।

বাইতে বাইতে নরেন্দ্র একটি বড় রাজ-
পথে গিয়া পড়িলেন। সে পথে অনেকগুলি
প্রশস্ত ও বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাই-
লেন। মনুষ্যবাহার, কাজী, বণিক, ওয়সাহ,
রাজা প্রভৃতি মহল্লোকের হর্ম্যভোগ্যে পথ
সুন্দর দেখাইতেছে। নরেন্দ্র এরূপ সুন্দর
অট্টালিকাভোগ্যী কোথাও দেখেন নাই,
প্রাসাদ সমূহের পার্শ্ব দিয়া বাইতে বাইতে
পথের সহিত তিনি কথোপকথন করিতে
গেলেন।

একদেবে বাইতে বাইতে উভয়ে প্রসিক
মসজিদ দেখিতে পাইলেন। ভারত-
সেনাপতি মসজিদ আর একটিও ছিল না,
হয়, অগতে সেরূপ নাই। নরেন্দ্রনাথ
বত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সমুদ্রে
মসজিদ কি?”

পরিচয়। ওটী জুয়া মসজিদ। তিনি
একটি পল্লভের উপরিভাগ সমতল

করিয়া তাহার উপর ঐ মসজিদ নির্মিত
হইয়াছে। উহার আরম্ভবর্ষে নরেন্দ্র
সাইয়া বাইতেছে, তাহার উপর খেতপ্রস্ত-
রের তিনটি গম্বুজ উঠিয়াছে। বাবসাহ বখন
দিল্লীতে থাকেন, বয়ঃ ঐ মসজিদে প্রতি
সপ্তাহকার যান, সে সময়েই দুই একদিন
দেখিলে কখনও ভুলিতে পারিবে না। দুর্গ
হইতে মসজিদ পথও চারি পাঁচ শত সিপাহী
সারি দিয়া দাঁড়ায়, তাহাদের বন্দুকের উপর
হইতে সুন্দর রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে
থাকে। পাঁচ ছয় জন অঝোরোহী পথ পরি-
কার করিতে করিতে আগে যায়, পরে বাব-
সাহ হস্তীর উপর জাজ্বল্যমান সিংহাসনে
আরোহণ করিয়া যান, তাহার পর ওয়সাহ
ও মনুষ্যবাহারগণ অপরূপ সজ্জা করিয়া মস-
জিদে গমন করে। কিছু আর এ স্থানে
দাঁড়াইয়া কি হইবে? চল, আমরা দুর্গের
ভিতর বাইয়া রাজবাটী দেখি।

দূর হইতেই রক্তবর্ণ উন্নত দুর্গ-প্রাচীরের
অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চমৎ-
কৃত হইলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে
দেশের যে লোক আসিয়াছেন, তিনি দিল্লীর
দুর্গ ও রাজবাটীর খেতপ্রস্তনির্মিত মসজিদ,
প্রাসাদ ও হর্ম্যাবলীকে অসংখ্য মধ্য অজুলা
বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গ-প্রবে-
শের স্থানে একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, তাহার
মধ্যে একজন হিন্দুসাহাব শিবিরভোগ্যী রহি-
য়াছে, রাজা দুর্গের দাররক্ষা করিতেছেন।
অঝোরোহী ও ওয়সাহগণ সর্বদাই এদিক
ওদিক বাতায়িত করিতেছেন, এবং দুর্গের
ভিতর হইতে সিপাহিগণ বাহিরে আসি-
তেছে, আবার ভিতরে বাইতেছে। বিদেশীর
বণিকগণ দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে এবং
নরেন্দ্র সহস্র ইতরলোকও নদীর প্রান্তের
ভার এদিক ওদিক বাহিত হইতেছে।

বার্ষিকে দুইটি প্রান্তর-নির্মিত হস্তীর আকৃতি, তাহার উপর দুইটি মনুষ্যের প্রতিমূর্তি। নবম্র উৎসব হইয়া, এ কাহার প্রতিমূর্তি, জিজ্ঞাসা করিলেন। গজপতি বলিলেন, “আপনি হিন্দু, আপনি জানেন, ঈশ্বর ইহার দুই জন রাজপুত্র বীরপুরুষ। চিতোরের জয়মল ও পদ্ম সম্রাট আকবরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে যখন আর পারিলেন না, অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া যুদ্ধে হত হন। আমার পিতামহ তিলকসিংহ সেই যুদ্ধে জীবনদান করিয়াছিলেন, পিতা তেজসিংহের নিকট বাল্যকালে সে অপূর্ণ কাহিনী শুনিলাম। পদ্মের মাতা ও বনিতা বীরমণী ছিলেন, তাহারাও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হন। তাহাদিগের কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সম্রাট আকবর এই প্রতিমূর্তি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন।” পরে সগর্বে গজপতি বলিলেন, “কিন্তু রাজপুত্র রাজাদিগের কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতিমূর্তি স্থাপনকর নাই, যত দিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত্র নাম কেহ ক্ষিত হইবে না, রাজপুত্রানার প্রত্যেক পরম্পরশত্রে রাজপুত্রের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগবতী নদীতরঙ্গে রাজপুত্রের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।

প্রশস্ত পথ অভিযান করিয়া দুই জনে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথের দুই ধারে অট্টালিকা, তাহার উপর রাজকপট-চারিগণ রাজকাৰ্য্য করিতেছেন। দুর্গের দ্বারের বাহিরে বেরূপ হিন্দুরাজগণ দ্বার রক্ষা করিতেন, ভিতরে এই পথের উপর মল্লবার ও গুহরাহরণ সেইরূপ দ্বাররক্ষা করিতেন।

দুর্গের ভিতর উভয়ে বড় বড় কারখানা দেখিতে পাইলেন। রাজসম্মিতির বে সমুদায় বিচিত্র দ্রব্য আবস্তক হইত, এই স্থানে তাহা প্রস্তুত হইত। এক স্থানে রেশম-কার্যের কারখানা, অন্য স্থানে চিত্রকার-দিগের। ছুতার, দরজী, চর্মবাবসারী, বস্ত্র-বাবসারী প্রভৃতি সকল প্রকার লোকের কারখানা ছিল। দেশে যত উৎকৃষ্ট কারিকর ছিল, তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্য্য করিত ও মাসিক বেতন পাইত।

দে সমস্ত কারখানা পশ্চাতে রাখিয়া উভয়ে ভিতরে যাইতে লাগিলেন। অনেক সমারোহের মধ্য দিয়া, অনেক বিন্মরকর হর্ষা ও প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া যাইয়া অবশেষে জগদ্বিখ্যাত মর্খরপ্রাসাদ, “দেওয়ান খাস” দেখিতে পাইলেন; প্রাসাদের চারু সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ও রৌদ্র-তাপে বলমল করিতেছে। প্রাসাদের ভিতরে সুবর্ণ ও হীরক-পচিত দিবালোক-প্রতিমাতী রত্ন-বিনির্মিত রাজসিংহাসনের উপর সম্রাট শাজিহান উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; তাহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এখনও শীতল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে; তিনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই। দক্ষিণপার্শ্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বসিয়া রহিয়াছেন; তাহার ললাট ও বদনমণ্ডল সুন্দর ও প্রশস্ত, কিন্তু মুখে দুর্দমনীয় রূপ ও অভিমান বিরাজ করিতেছে। বামদিকে পৌত্র সুলতান সলাইমান দণ্ডারমান রহিয়াছেন; বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, অবয়ব ও আকৃতি সুন্দর ও উন্নত। পশ্চাতে খোজাগণ মনুষ্যপুঞ্জ বিনির্মিত চামর হেলাই-তেছে। তাহার চারিদিকে রোণা-নির্মিত দেয় আছে, দেলের বাহিরে রাজা, ওদরাহ,

স্বর্গীয়, বৃত্ত, সেনাপতি ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক উচিত বেশভূষার ভূষিত হইয়া কুতাজলিপুটে ভূমির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সমুদয় সমকূমি লোকে পরিপূর্ণ। কি ধনী, কি নিধন, কি উচ্চ, কি নীচ, সে স্থানে বাইরা, রাজ্যের দর্শন করিবার সকলেরই অধিকার আছে। সেই অপূর্ণ প্রাসাদে বসাই লিখিত হি-
রাছে,—“যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ, এই স্বর্গ।”

সম্রাটের সম্মুখে প্রথমে সুলতান সুলতান আরবদেশীয় অশ্ব প্রদর্শিত হইল। পরে বৃহৎকার হস্তিপ্রেরী পরিদর্শিত হইল। হস্তি-
গণ কর উত্তোলন করিয়া বাদশাহকে “তসলীম” করিয়া চলিয়া গেল। পরে হরিণ, বৃষ, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকল জন্তু ও তৎপরে নানারূপ পক্ষী একে একে পরিদর্শিত হইল। সম্রাটের বর্মধারী
অম্বারোহিণী, তৎপরে বহুদর্শী কয়েক শত পদাতিক, তৎপরে অস্ত্রাস্ত্র সেনাগণ একে একে সম্রাটের সম্মুখে দিয়া চলিয়া গেল; তাহাদিগের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইল।

প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে পর বাদশাহ দয়াদায়ক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কি নীচ, কি উচ্চ, সকলেই আদিয়া রাজ্যবিরাজ ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট আপন আপন
দুঃখ জানাইতে লাগিল, সম্রাট, ছই একটি আদেশ দিয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। সম্রাট, যে বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সকল প্রধান প্রধান
ওমরাহগণ “কেরামৎ” “কেরামৎ” বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

ছই দাঁটার মধ্যে রাজকাৰ্য্য সমাধা হইয়া গেল, সম্রাট, কয়েক জন প্রধান প্রধান
ওমরাহের সহিত গোসলখানার গেলেন।

গোসলখানা কেমন হৃৎস্পন্দ-প্রকাশনের ভর
নিখিত হয় নাই, তাহার প্রধান প্রধান
অমাত্যদিগের সহিত রাজকাৰ্য্যের গৃহ-
মন্ত্রণাদি হইত।

নরেন্দ্র গোসলখানার পশ্চাতে উচ্চ
প্রাচীর দেখিতে পাইলেন, তাহার ভিতরে
অনেক হর্য্য ও প্রাসাদ আছে। গজপতি
কহিলেন, “এ প্রাচীরের পশ্চাতে রাজ-
বাটীর বেগমদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে।
তিনিরাছি, সে সমস্ত মহল অতিশয় চমৎকার।
প্রত্যেক বেগমের মর্ম্মর-প্রাসাদের চারিদিকে
উত্তান ও ফুলবন, গ্রীষ্মকালে দিব্যর থাকি-
বার অস্ত্র যুক্তিকার অভ্যন্তরে ঘর এবং
নিশায় শরনের অস্ত্র প্রস্তর-নিখিত উচ্চ উচ্চ
ছাদ আছে। কিন্তু সম্রাট, ভিন্ন অস্ত্রপুরুষের
নয়ন সে সৌন্দর্য্য কখন দেখে নাই, পুরুষের
পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হয় নাই।”

নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বজ্ঞানের কথা সহসা
শ্রবণ হইল। তাহার বোধ হইল, এ প্রাচী-
রের পশ্চাতে বেগমদিগের প্রাসাদ-সমূহের
সৌন্দর্য্য তাহার নয়ন দর্শন করিয়াছে,
তাঁহার পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হই-
য়াছে; কিন্তু সে পূর্ব্বজ্ঞানের বিষয়ক
কথা তিনি গজপতির নিকট প্রকাশ করি-
লেন না, আপনিও ঠিক বৃত্তিতে পারিলেন
না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানা তাতার-বালক।

—Beware of the day
When the lowlands shall meet the in
battle's array.
Campbell.

দুই জনে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহি-
র্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন।
সে স্থান তখনও জনাকীর্ণ; বড় বড় লোক
কেহ নিবিড়ায়, কেহ হস্তীর উপর, কেহ
অঝারোহী হইয়া এদিকে ওদিকে যাতায়াত
করিতেছে এবং শত শত ব্যবসায়ী লোক
মানা অপক্লপ ও বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করি-
তেছে, তাহা ক্রয় করিতে বা দেখিতে সহস্র
সহস্র লোক বুঁকিয়া আসিতেছে। কেহ
গান করিয়া বা নৃত্য করিয়া অর্থপ্রাপ্ত করি-
তেছে, কেহ ডেকী দেখাইতেছে, কেহ সাপ
খেলাইতেছে, কেহ হাত গব্বিয়া বলিতেছে।
গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকেই তথায়
আসিয়াছে এবং রৌদ্রে আপন জীর্ণ বস্ত্র
পাতিরা বসিরা রহিয়াছে। একদিকে এক-
পান্না বস্ত্র আর একদিকে একখানি করিয়া
পুস্তক। অনেক লোক তাহাদের নিকট
ছুটিতেছে, কুলকামিনীরাও শুভবসনে মণ্ডিত
হইয়া ব্যগ্র হইয়া আসিতেছে এবং এক এক
প্রসাদ দিয়া হাত দেখাইয়া লইতেছে।

তাহাদের মধ্যে নরেন্দ্র এক অপক্লপ
গণক দেখিতে পাইলেন। তাহার বয়স
চতুর্দশ বৎসরের অধিক হইবে না, মুখমণ্ডল
অতিশয় কোমল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, সূর্য-
তাপে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু, গণ্ডফল
এবং কন্দের উপর জটা পড়িয়াছে; জটা
দ্বারা ঈষৎ আবৃত হইলেও চক্ষু হইতে যেন

অগ্নিদুলিদরূপে জ্যোতিঃ-বাতির হইতেছে।
মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত সমস্ত শরীর কৃষ্ণ-
বসনে আবৃত, কোমরে একটি বহুমূল্য পেট
রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে। বালক তাতার-
দেশীয় মুসলমান, কাহারও নিকট প্রসাদ না
লইয়া হাত দেখিতেছে।

তাতার-বালকের আকৃতি দেখিয়াই
অনেকে তাহার নিকট যাইতেছে। গজ-
পতি ও নরেন্দ্র উভয়েই তাহার নিকটে
গেলেন। গজপতি প্রথমে হাত দেখাইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, “অতঃ সন্ধ্যার সময়েই
আমরা দিল্লী নগর পরিত্যাগ করিয়া কোথায়
যাইব, বল দেখি?”

তাতার গজপতির মুখ ও বসন বিশেষ
করিয়া দেখিয়া বলিল, “মহারাজা বশোবস্ত
সিংহ নর্থদাতীয়ে গিয়াছেন, তুমি সেই
স্থানে যাইবে।”

গজপতি উচ্ছ্বাস করিয়া বলিলেন,
“মহারাজা বশোবস্ত সিংহ আয়ংজীবের
সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, তাহা
আবাল-বৃদ্ধ-বিনতা সকলেই জানে আর
আমি রাজপুত, আমার বসন দেখিয়া সক-
লেই বলিতে পারে। ইহার অধিক বলিবার
তোমার বিজ্ঞা নাই?”

তাতার প্রজলিত-নরেন্দ্র গজপতির উপর
হিরদৃষ্টি করিয়া কণেক পর মস্তক নাড়িয়া
জটাতার পশ্চাদিকে ফেলিয়া বলিল, “রাজ-
পুত! আরও বলিতে পারি, আয়ংজীবের
হস্তে সমস্ত রাজপুতের নিধন হইবে। মহা-
রাজকে বলিও, যেন দ্রুতগতি একটি অশ্ব
বাছিয়া লয়েন, নতুবা পলাইবার সময় পাই-
বেন না। সপ্ত সহস্র রাজপুতের মধ্যে
সপ্ত শতেরও বৃদ্ধা নাই। রাজপুত! সে
যুদ্ধে তোমার নিশ্চয় নিধন।”

গজপতি সাহসী বোকা, কিন্তু তাতার-

পালকের আকার ও গভীর স্বর ও প্রজলিত ক্ষুদেখিয়া ও কথা শুনিয়া মুহূর্তের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্তমধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, অতিশয় গভীরস্বরে বলিলেন, “ক্ষতি নাই, যদি জগদীশ্বর লগাটে তাহাই লিখিয়া থাকেন, মহারাজের যুদ্ধে হৃদয়ের শোণিতদান অপেক্ষা রাজপুত অধিকতর পৌরবের কার্য জানে না।”

সকলে কণকাল নিস্তক হইয়া রহিল। পরে নরেন্দ্র আপন হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যদি যথার্থ হাত দেখিতে জান, বল দেখি, কল্যা নিশাকালে আমি কোথা ছিলাম এবং কাহাকেই বা দেখিয়াছিলাম?”

তাতার অনেকক্ষণ নিস্তক হইয়া তুমির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, “যুবক! কোন মুসলমানী তোমার প্রণয়িনী, তুমি কল্য রজনীতে তাহাকে দেখিয়াছিলে।”

গজপতিসিংহ হাসিয়া উঠিলেন, সকলে হাসিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, তাতারের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর তাতার নরেন্দ্রকে এক দিকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “যুবক, দিল্লীতে তোমার মহাবিপদ, তুমি কি তাহা জান না? দিল্লী ত্যাগ করিয়া অতুই পলায়ন কর, তোমার বন্ধুর সহিত অতুই নন্দদাতীকে গমন কর। এ দেওয়ানাও সেই দিকে যাইতেছে। যদি অহুমতি দাও, তোমার সঙ্গে যাইব। দেওয়ানা তোমার অপকার করিবে না, বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।”

নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। এ বালক কে? বালক কি যথার্থই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলিতে পারে? বালক

কি যথার্থই গত রাজির কথা জানে? দেওয়ানা বেই হউক, নরেন্দ্রনাথের হিতাকাঙ্ক্ষী; সম্ভবতঃ নরেন্দ্রনাথকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। তাহারা চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই গজপতি, নরেন্দ্র ও তাতার-বালক দিল্লীত্যাগ করিয়া নন্দদাতীমুখে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিবির ।

But hark the trump ! To-morrow thou,
In glory's fires shalt dry the tears !

Campbell.

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ও তরঙ্গবাহিনী সিপ্রানদী অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিল। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার উজ্জল কিরণে সিপ্রানদীর উভয় কূলে যতদূর দেখা যায়, শুভ্র শিবির-শ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদিকে রাজা যশোবন্ত ও তাঁহার সহবোদ্ধা কাসেম খাঁর অসংখ্য সেনা চন্দ্রকরোজ্জ্বল শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, অপরতীরে এক পর্বতোপরি আরাজীব ও মোরাদের মোগল সৈন্যদল রহিয়াছে। মধ্যে কল-নাদিনী সিপ্রানদী প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন মোগল ও রাজপুত-দিগের যুদ্ধের আরোজন দেখিয়া ভীত না হইয়া উপহাস করিয়া যাইতেছে। দূরে ভারতবর্ষের কটিবন্ধনস্বরূপ বিষ্ণুপর্বত চন্দ্রলোকে দেখা যাইতেছে। কল্যা ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অতু সমস্ত জগৎ সুস্থ। কেবল

সময়ে সময়ে গ্রন্থাবলীর স্বর মিত্রক রজনীতে
সুস্থ পৰ্য্যন্ত জ্ঞাত হইতেছে, কেবল সিপ্রা
নদীর তরঙ্গমালা কলকল করিতেছে, কেবল
সুস্থ হইতে নৈশ শৃঙ্গালের শব্দ নদীকূলে ও
পৰ্বত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একটি শিবিরে নরেন্দ্র শয়ন করিয়া
মিষ্ট্রিত আছেন, তথাপি যুদ্ধের নানারূপ
চিত্রা স্বপ্নরূপে তাহার হৃদয়ে জাগরিত হই-
তেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কথা হৃদয়ে
জাগরিত হইতেছে। সিপ্রানদীর কল কল
শব্দ যেন ভাগীরথীর শব্দ বোধ হইল, সেই
ভাগীরথীতীরে সেই কুঞ্জবন-বেষ্টিত উচ্চ অট্টা-
লিকা দেখিতে পাইলেন। তীরে বালুকা-
রাশি, বালুকারাশিতে দুই জন বালক ক্রীড়া
করিতেছে আর একজন বালিকা দাঁড়াইয়া
যেন গান গাইতেছে। সে প্রেম-পুত্রলী
কে? সে কোথায়? ভাগীরথীতীরে কুঞ্জবনে
সেই তিনটি শিশু রজনীতে ক্রীড়া করিত
সত্য, কিন্তু কালের নির্ভর গতিতে সে চিত্রটি
বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন পরিবর্তিত হইল। ভাগীরথীর কল্লোল
নহে, এ রমণীর গীতধ্বনি! রমণী না অপ্সরা?
উচ্চ প্রাসাদ, তাহার ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ ও
রৌপ্যমণ্ডিত, তাহার মধ্যে এক অপ্সরা গান
করিতেছে, সে বড় হৃৎখের গীত, জেলেখা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে হৃৎখের গীত গাইতেছে।
ঐ যে জেলেখা দাঁড়াইয়া আছে; ঐ যে
তাহার রত্নরাশি-বিভূষিত কেশপাশে উজ্জ্বল
বহনমণ্ডল কিংবা আবৃত রহিয়াছে; ঐ যে
তাহার প্রজলিত নয়নদ্বয় হইতে দুই এক
বিলুপ্ত পড়িতেছে।

স্বপ্ন পরিবর্তিত হইল। এ জেলেখা নহে,
এ সেই তাতার-বালক গীত গাইতেছে। যে
বার্ষ্য জেব করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায়
নাই, সে দেওয়ানা হইয়া দেশে দেশে বেড়াই-

তেছে, তাহারই গান। গান শুনিতে শুনিতে
নরেন্দ্রের মিত্রাভক্ত হইল। তিনি শিবির
হইতে বাহিরে আসিলেন। জগৎ মিত্রক,
মিত্রহর নিশার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া
যাইতেছে, চন্দ্রকিরণে নদী, পৰ্বত, শিবির ও
মাঠ দৃষ্ট হইতেছে আর সেই অভাগা দেও-
রানা তাতার-বালক শিবিরদ্বারে বসিয়া
উচ্চঃস্বরে গান করিতেছে। সপ্তাঙ্গমিলিত
সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া দেশ গগনে
উখিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে
বিস্তৃত হইতেছে।

নরেন্দ্র সাক্ষরনয়নে বালকের হস্তধারণ
করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, “তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্ত
দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোন
গভীর দুঃখ আছে? তাহা যদি হয়, আমাকে
বল, আমি তোমার দুঃখের সমুদ্রবী হইব।
মন খুলিয়া আমার নিকট সমস্ত কথা বল।”

বালক একদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে চাহিতে
লাগিল, শরীর কঁপিতে লাগিল। কণেক
পর হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে
করণস্বরে বলিল, “মার্জনা করুন, আমি
দেওয়ানা, যখন যাহা মনে আইসে, তাহাই
গান করি।” নরেন্দ্র অনেক প্রবোধবাচ্য-
প্রয়োগ করিয়া বার বার তাহার হৃৎখের
কারণ ও এই অল্পবয়সে ককির্বা গ্রন্থের
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তাহার
উত্তর দিল না, কেবল বলিল, “আমি
দেওয়ানা।”

নিশা-অবসানে নরেন্দ্র রণসজ্জা করিয়া
আপন বন্ধু গজপতি সিংহের শিবিরে গেলেন,
দেখিলেন, তিনিও বোদ্ধার কার্য করিতে-
ছেন; আপন তরবার, চর্ম, বর্শা প্রভৃতি স্বয়ং
শাণাইতেছেন, অস্ত্রগুলি দোপোর দত্ত
উজ্জল হইয়াছে, তথাপি আশ্রয় উজ্জল

গিরিতেছেন। দেখিয়া নয়রজ্জ কিছু বিমিত
ইলেন; পরে শবার দিকে চাহিয়া দেখি-
লেন, গজপতি সমস্ত রাজি শয়ন করেন নাই,
শয়ন রাজিই এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার
ঘনমণ্ডল অতিশয় শাণ্ডবর্ণ, চক্ষুর ঈষৎ
কালিমাবোড়িত। কেন? নয়রজ্জ গত কয়েক
দিন অবধি গজপতির বে ভাব-গতিক
দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কারণ কিছু কিছু
বুঝিতে পারিলেন। দেওয়ানা বালক হাত
দেখা অবধি গজপতি স্থির-নিশ্চয় করিয়া-
ছিলেন, উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নিধন
হইবে। বোধ হয়, গত নিশায় মৃত্যুর জন্ত
প্রস্তুত হইয়াছেন, শয়নের অবসর পান নাই।

পাঠক গজপতিকে ভীক মনে করিতেছ? রাজপুত সকলেই সাহসী, তথাপি তাহাদের মধ্যে তেজসিংহের পুত্র গজপতি অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না। তথাপি কল্য নিশয় মৃত্যু জানিলে সাহসীর লগাটও চিন্তারেখায় অঙ্কিত হয়। বোদ্ধা বোবনমদে মত্ত থাকিয়া, জীবনের স্মৃতি মগ্ন থাকিয়া, যুদ্ধের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিয়া, জয়ের আশার আশ্রিত হইয়া মৃত্যুর চিন্তা দূর করে; যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে আমোদমাত্র, অনেক লোক মরিতেছে, তাহারাও একদিন মরিবে, তাহাতে কতি কি? কিন্তু “কল্যা মরিবে” বজ্রধ্বনিতে যদি এই শব্দ সহসা কণ্ঠে অধিকৃত হয়, তাহা হইলে সে উৎসাহ ও সে প্রফুল্লতা হ্রাস পায়। গজপতি যে সময়ের সকল লোকের স্তায় গণনা-বিস্তার দূরবিশ্বাস করিতেন, অস্ত্র যুদ্ধে তিনি মরিবেন, তাহা তাঁহার স্থিরবিশ্বাস ছিল। গত রজনীতে অনিদ্র হইয়া মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অস্ত্র পরিহার করা কেবল কাল কাটাইবার একটি উপায়মাত্র।

নয়রজ্জ আসিবামাত্র গজপতি উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলি-

লেন, “দেখ দেখি, অস্ত্রগুলি পরিহার হই-
য়াছে কি না?”

নয়রজ্জ। বখাৰ্খই কি আপনি অস্ত্র
যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন? দেওয়ানা ককিরের
কথা শ্রবণ করুন।

গজপতি। সন্তুখে রণ করিয়া রাজপুত
কখনও পশ্চাতে চাহে না, পিতা তেজসিংহ
আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

গজপতি আরও বলিলেন, “নয়রজ্জ, এক
যুদ্ধে আমি মহারাজা যশোবন্ত সিংহের উপ-
কার করিয়াছিলাম, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া
আমাকে এই মুক্তাহার প্রদান করেন।
সেই অবধি সকল যুদ্ধেই আমি এই হার
লগাটে পরিধান করিয়াছি। অস্ত্রকার যুদ্ধে
তুমি নিস্তার পাইবে। এই হার রাজাকে দিও
এবং বলিও, দেশে আমার দুইটি শিশু-সন্তান
আছে, হতভাগাদের মাতা নাই। মহা-
রাজকে বলিও যেন, অস্ত্রগ্রহ করিয়া তাহা-
দিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন,” বালক রঘু-
নাথও* কালে রাজার আজ্ঞার পিতার জ্ঞার
সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়, ইহা অপেক্ষা
অধিক মঙ্গল ইচ্ছা তাহার পিতা জানে না।”

নয়রজ্জ নিস্তক হইয়া রহিলেন, তাঁহার
নয়ন হইতে এক বিন্দু জল পড়িল। গজ-
পতির নয়নধর শুষ্ক ও অতিশয় উজ্জ্বল।

সহসা ভেরী-শব্দ শুনা যাইল, আরংজীব
সিপ্রানদী পার হইবার উত্তোগ করিতে-
ছেন। গজপতি রণসজ্জ। পরিধান করিয়া
বাহিরে আসিলেন, লক্ষ দিয়া অশ্বে আরো-
হণ করিয়া তীরবেগে নদীমুখে চলিলেন।

নয়রজ্জও নির্বৃত্ত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে
চলিলেন।

* বীহারা রঘুনাথের কথা কথিত হইলে, তাঁহার
“জীবন-একান্ত” কাব্যটিকা পাঠ করিবে।

বোড়শ পরিচ্ছেদ।

মোগল-শিবির।

On ye brave

Who rush to glory or to grave.

Campbell.

যুদ্ধের পূর্বনিশায় রাজপুত-শিবির পাঠক
দর্শন করিয়াছ; একবার সেই নিশায়
মোগল-শিবির দর্শন কর।

আরংজীব পূর্বেই সেই স্থানে পৌছিয়া-
ছিলেন, মোরাদের অস্ত্র অপেক্ষা করিতে-
ছিলেন। দুই তিন দিন পরে মোরাদ সৈন্যে
আরংজীবের সহিত যোগ দিলেন, দুই তিন
দিনের মধ্যে যদি যশোবন্ত সিংহ আরংজীবকে
আক্রমণ করিতেন, আরংজীব অবশ্যই পরাস্ত
হইতেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন
যে, আরংজীবের অল্পমাত্র সৈন্য আছে, এ
কথা যশোবন্ত জানিতেন না, সেই জন্তই
আক্রমণ করেন নাই। আবার কেহ কেহ
বলেন, মহাহুভব রাজপুত সেনাপতি সে
কথা জানিয়াও অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত
যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ, এই জন্তই অপেক্ষা
করিয়াছিলেন।

আজি আরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতার
সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে। জয়
জয় নামে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। পটবস্ত্র-
যুক্ত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত একটি
প্রশস্ত শিবিরে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে
ধসিয়াছেন, চারিদিকে জগদ্বিমোহিনী নর্তকী
ও প্রায়কীগণ নৃত্যগীতাদি করিয়া রাজপুত-
বরের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোরাদের
প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, বীর আকৃতি
ও অকপট ক্রোধ; আরংজীবের ললাট
বুদ্ধিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও তীব্র, মন সর্বদাই সহস্র

চিন্তায় অভিভূত। তথাপি আরংজীব কি
স্বপ্নের সরল হাসিই হাসিতেছেন, কি লক্ষ্যান
সহকারে মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে-
ছেন, যেন ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি আর
আনন্দ রাখিতে পারিতেছেন না, যেন ভ্রাতার
কার্যসাধন অপেক্ষা জগতে তাঁহার অস্ত
আমোদ বা অস্ত্র কোনও প্রকার উদ্বেগ নাই।

ভোজন সাক্ষ হইল, ভৃত্যেরা কল ও
মদিরা লইয়া আসিল। গারকীগণ পুনরায়
সপ্তবরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমো-
দিত হইল। কেশে হীষকের সহিত কটাক-
দৃষ্টির জ্যোতিঃ মিশিয়া বাইতে লাগিল,
সুন্দরিত গানের সহিত স্মৃষ্টি হস্তধ্বনি
মিশিয়া বাইতে লাগিল, মোরাদ একেবারে
বিমোহিত হইলেন। অবশেষে আরংজীবের
ইঙ্গিতে নর্তকীগণ চলিয়া গেল।

আরংজীব সুবর্ণপাঞ্চে মদিরা ঢালিয়া
মোরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, “আজি
সেবার আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি,
আজি আমার জীবন সার্থক।”

মোরাদ। আরংজীব, আপনার ভ্রাতার
অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। ওহু
মদিরা আপনার জন্য লউন।

আরংজীব। “কমা করুন, আপনি
জানেন, আমার জীবনে সুখের বাহা নাই।
হৃদয়ে বড় মানস আছে; আপনার মত বীর
পুরুষকে পিতৃ-সিংহাসনে একবার দেখিব,
তাঁহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই। পৈগ-
বর যদি এই এরালা সকল করেন, তাহা
হইলে সন্তুষ্টমনে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মক্কার
বাইব।” এই বলিয়া আরংজীব আর এক
পাঞ্জ মদিরা দিলেন।

মোরাদ। আরংজীব, আপনি যথার্থই
ধার্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্য
আপনি এরূপ যত্ন করিবেন কেন?

আরংজীব। তাহার জন্ত করিব ? তৈমুরের সিংহাসনে অধিকৃত হইবার উপ-
যুক্ত আর কে আছে ? সুজা বিশাসপ্রিয়
ও ভীক, সুজা তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত
করিবে ? আত্মাভিমানী মুখ কাকের দ্বারা
তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে ? তাহা
অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাকেরদিগের
হস্তে ষাটক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক ।
ইহাঘের জন্ত আমি যুদ্ধ করিব না ; যাহার
সাহস অপরিসম, যাহার বশোরাশিতে
ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, যিনি মোগল-
সিংহাসনের স্তম্ভরূপ, যিনি মোগলকুলের
কুলতিলকস্বরূপ, তাহার জন্ত যুদ্ধ করিব ।
আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি
করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপ-
নাকে দেখি, আমার যথার্থই বোধ হয় যেন,
আপনার উদার ললাটে 'সম্রাট' শব্দ খোদিত
রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ
বাহুতে 'যোদ্ধা' শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে,
আমার জীবন ধন্য যে, এই বীরপুরুষের
কার্য্য-সাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি ।" এই
বলিয়া আরংজীব সুবর্ণপাত্র আর একবার
মদে পরিপূর্ণ করিলেন ।

মোরাদ। আরংজীব, আমি যথার্থই
আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম । কালি
যুদ্ধ হইবে, সৈন্ত সকল প্রস্তুত আছে ?

আরংজীব। আমি তিন চারি দিন
হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসারে
আমি এখনও অপরিপক্ক, একাকী সাহস
হয় না । আপনি নিকটে থাকিলে আমার
যেন বোধ হয়, আমি পর্ত্ত-পার্শ্বে
নিরাপদে আছি, আমার সাহস বিগুণ
হয় ।

মোরাদ একরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন
যে, প্রবন্ধনা এবং চাটুবাক্যও তাহার সত্য

বলিয়া জ্ঞান হইত; বিশেষতঃ এক্ষণে অধিক
মদ্যাসেবনে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানশূন্য
হইয়াছেন, আরংজীবের প্রশংসাবাক্যে
সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ ! আপনি
কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে কিছু দিন
আমার উপর নির্ভর করুন । আর আমি,
আমি অগতে কাহারও উপর নির্ভর করি
না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির
উপর ভরসা করি ।" এই বলিয়া মোরাদ
অগ্নি নিক্ষেপিত করিলেন, দীপালোকে
অগ্নি স্বক্ৰমক্ করিয়া উঠিল । পুনরায়
অগ্নি কোষে রাখিতে গেলেন, কিন্তু অতি-
শয় মদ্যাসেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অগ্নি
মুক্তিকার পড়িয়া বাইল । আরংজীব হস্ত
সংবরণ করিয়া আর এক পাত্র মদ্য
দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন ।

আরংজীব বলিলেন, "ভ্রাতঃ ! তবে
বিদায় হই, রণক্ষেত্রে আবার আপনার
দর্শন পাইব ।"

মোরাদ। যাও, আরংজীব, যাও, আমি
আপনার উপর বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম,
আইদ, আলিঙ্গন করি ।

মোরাদ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, কিন্তু
অধিক মদ্যাসেবন বশতঃ ভূমিতে ঢলিয়া
পড়িলেন ।

আরংজীবের মুখের ভাব তখন পরি-
বর্ত্তিত হইল, ভ্রাতাকে যে সহাস্ত মুখ
দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তিত
হইল । মুখ গম্ভীরভাবে ধারণ করিল,
ললাটে দুই তিনটি ভীষণ রেখা অঙ্কিত
হইল ; নিঃশব্দে সেই শিবিরমধ্যে পদ-
সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন ; মধ্যে মধ্যে
এক একবার হঠাৎ দণ্ডায়মান হন, স্থির-
দৃষ্টিতে এক একবার দেখেন, যেন সম্মুখে
কোম জ্বালা দেখিতে পাইতেছেন, আবার

পৰস্কারণ করিতে থাকেন। এক একবার মুখে ঈশং হস্ত লক্ষিত হয়, আবার বমন-মণ্ডল কঠোরভাবে ধারণ করে, ললাট কৃষ্ণিত হয়।

একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, একরিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অর্ধ-ফুট বচনে বলিতে লাগিলেন, “উজ্জয়িনীর যুদ্ধে, মন্থর-সিংহাসন। প্রথম ভারতপ্রদেশ পিতার দুর্বল হস্ত হইতে স্থলিত হইতেছে। কে লইবে? দারী, সাবধান। তোমার সাহস আছে, বল আছে, কিন্তু আমিও দুর্বল হস্তে আমি ধারণ করি নাই, পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিব। তুমি আত্মাভিমানী, দর্পী, কিন্তু তোমা অপেক্ষা জীবন দর্পী ও দৃঢ়তর ব্রত সহাস্ত বদনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মোরার! তুমি সাহসী বীর! সিংহাসনে বলিবে? তবে শূকর বেকরূপ কর্দমে পড়ে, সেইরূপ তুমি ধরাতলে স্টাইয়া পড়িলে কেন? বজ শূকরেরও তোমার জ্ঞান সাহস আছে! অচেতন? কল্যা যুদ্ধ হইবে, অস্ত্র বিলাসবিহীন? বস্ত দিন আবশ্যক, তোমার দ্বারা আমার কার্যাসিকি করিব, তাহার পর এইরূপ পদাঘাত করিয়া তোমাকে দূরে কেলিয়া দিব! কল্যা যুদ্ধ হইবে, ললাটের লিখন কি আছে? পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জীবন উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। কদম! সাহসে নির্ভর কর, আরও অগ্রসর হইব। অসিহস্তে কণ্টকময় পথ পরিষ্কার করিব, আবশ্যক হয়, উজ্জয়িনী হইতে আত্মা পর্যন্ত পথ নররক্তে রঞ্জিত করিব, কিন্তু এ জীবন প্রভিজ্ঞা বিচলিত হইবে না। পিতামহ ষ্টেডমর। তোমার

মুহুর্তে এই ললাট শোভিত করিব, নচেৎ কল্যা কদমশোণিতে সিংহাবারি রঞ্জিত করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীর যুদ্ধ।

Another deadly blow,
Another mighty empire overthrown.
Wordsworth.

১৩৫৮ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে জীবন যুদ্ধ হইল। মোরার ও আরংজীবের সৈন্তেরা সিংহাসন দ্বারা হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আরংজীব, সৈন্যের পায় হইবার জন্য অতিশয় নিপুণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্নত স্থানে তাঁহার কামান সাজাইয়া, সমুখে শত্রুর আগমন রোধ করিয়া, নিজ সৈন্তকে নদী পার হইতে বলিলেন। শত্রুরাও কামান সাজাইয়াছিল ও তন্দ্বারা আরংজীবের সৈন্তের নদী পার হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অনেকাংশে তুমুল-সংগ্রাম হইতে লাগিল। বশোবন্ত সিংহ অপূর্ণ বীর্যবল প্রকাশ করিয়া মোগল-দিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগী কাসেম খাঁ সেরূপ বর করিলেন না। তাৎকালিক লেখকেরা সন্দেহ করেন যে, তিনি আরংজীবের অর্থে বশীভূত হইয়া আপন গোলা ও বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্তের কামান অচিরেই নিশ্চয় হইল। এ অবস্থায় শত্রুর কামানের সমুখে যুদ্ধ করা বশোবন্তের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল; কিন্তু তিনি ভরবিহীন না হইয়া অমাত্রবিক বীরত্ব

পূর্বক শক্রদিগের গতি রোধ করিতে লাগিলেন । সে স্থান ওরুতময় ; স্ততরাং আক্রমণকারিগণ সহজে নদী পার হইতে পারিল না, কিন্তু সাহসী মোরার্দ কতিপয় সৈন্ত লইয়া, সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া, জয় জয় নাদে নদী পার হইলেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্য নদী পার হইল । ভীকু কাসের বাঁ তৎক্ষণাৎ সৈন্তকে পলায়ন করিলেন স্ততরাং যশোবন্ত সিংহের বিপদের সীমা রহিল না । কিন্তু সেই অসমসাহসী রাজপুত চতুর্দিকে শত্রুকর্তৃক বেষ্টিত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তাহার সেনা-সংখ্যা ক্রীণ হইতে লাগিল, তাহার প্রিয় অমুচরেরা চতুর্দিকে হত হইতে লাগিল, যোগলেরা জয় জয় নাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিল ; তথাপি বীর রাজপুতেরা রণে ভঙ্গ দিল না । অনেক-ক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া যশোবন্ত সিংহ কেবলমাত্র পঞ্চ শত সেনা লইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন । সপ্ত সহস্র রাজপুত সেই দিন সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিল ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

চিতোর ।

Where like a man beloved of god,
through glooms, where never
woodman trod,
How oft pursuing fancies holy,
By moonlight way often flowering
weeds wound,
Inspired beyond the guess of folly.
By each rude shape and wild
unconquerable sound !
O ye loud waves ; and o ye forests
high

And ye clouds that far above me soared !
Thou rising sun ! and blue rejoicing sky !
Yea everything that is and will be free !
Bear witness for the wheresoe'er ye be
With what deep worship I have still adored
The spirit of divine Libery.

Coleridge.

যশোবন্ত সিংহের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সেনা রাজপুতানা-অভিমুখে আসিতে লাগিল । নরেন্দ্র তাহার পরম বন্ধু-পতির মরণে অভিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রতাহ নূতন নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে সে দুঃখ কিঞ্চিত্তপরিমাণে বিস্মৃত হইলেন । কয়েক দিন আসিতে আসিতে সৈন্তেরা অবশেষে রাজপুতানার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িল । যশোবন্ত সিংহ রাড়ওয়ার দেশের রাজা, সে দেশে আসিতে হইলে যেওয়ার দেশের অভ্যন্তর দিয়া আসিতে হয় ।

যেওয়ার দেশের অসংখ্য দুর্গ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন । দুর্গগুলি প্রায়ই পর্বত-চূড়ায় নির্মিত, সহসা হস্তগত করা শক্রর দুঃসাধ্য । পর্বতগুলি উন্নত শিরে মুকুটস্বরূপ দুর্গ ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে । সে সমস্ত দুর্গে উষ্টিবার পথ নাই, কেবল একদিকে সোপানের ন্যায় পথ আছে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করে । যুদ্ধকালে দুর্গের শিতর খাল্যসামগ্রী সঞ্চিত হয়, সেই একটামাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়, পরে শত্রুগণ বাহাই করুক না, দুর্গবাসিগণ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে । শত্রুরা দুর্গে উষ্টিবার উপক্রম করিলে উপর হইতে প্রস্তররাশি নিক্ষেপ হয়, ঐ প্রস্তর-ঘাতে একেবারে বহুসংখ্যক শত্রু বিনষ্ট হয় ।

এইরূপ দুর্গ দেখিতে দেখিতে সৈন্যেরা অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় চিতোরের দুর্গের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল

সৈন্তেরা আহাৰ্য্যি সমাজ করিয়া আপন আপন শিবিরে বিজ্ঞান করিতে গেল, কিন্তু নরেন্দ্র কতিপয় রাজপুত্রের সহিত চিতোর-পৰ্বতে উঠিয়া তাহার উপরস্থ দুৰ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বিস্থিত, নয়নে কুন্তরাকার স্ফুটন তত্ত্ব দেখিলেন, পদ্মিনী রাজ্যীয় প্রাসাদ ও সরোবর দেখিলেন, যে সিংহদ্বারে রাজপুত্র-বাহু গণ বার বার অসি-হস্তে জীবনদান করিয়াছেন, তাহা দেখিলেন, যে চিতার রাজপুত্র-রমণীগণ চিতারোহণ করিয়া কুলমান রক্ষা করিয়াছেন, সে গহবর দেখিলেন।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র-দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিনি চিতোরের পুরাতন “চারণ”। চারণগণ পূৰ্ব্বকালে রাজপুত্র-নার রাজাদিগের গৌরবগীত গাইয়া রাজ-পুত্রব ও নগরবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিতেন; রাজপুত্রনার এখন পর্যন্ত সন্ধ্যার সময়ে লোকে সমবেত হইয়া চারণের গীত শুনিতে ভালবাসে ও পূৰ্ব্বগৌরবগান শুনিতে শুনিতে তাহাদিগের নয়ন বীরাশ্রুতে আশ্রুত হয়।

নরেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী রাজপুত্রগণ চারণকে একটি শিলার উপর বসাইলেন ও আপনারা চারিদিকে বসিয়া প্রতাপসিংহের গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারণ সেই গান আরম্ভ করিলেন।

গীত।

“রাজপুত্রগণ! এটি আমার গীত নহে, অশ্বরাজ-প্রাণী পৰ্বতশৃঙ্গের গীত, বজ্র-নারী জলপ্রপাতের গীত, ভোমরা প্রবণ কর। যে পৰ্বতকন্দৰ্ব্ব একজন রাজপুত্র-

সেনার অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গহবর হইতে গীত বহির্গত হইতেছে। যে পৰ্বত-তরঙ্গবাহিনীর জল এক বিন্দু রাজপুত্রের শোণিতেও আৱদ্ধ হইয়াছে, সেই তটিনীর কূলে এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। প্রতাপ-সিংহ! এটি তোমার গীত।

ঐ দেখ, আকুবরের ভাষণপ্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে, চিত্র প্রতাপের হৃদয় কম্পিত হইল না। চিতোর নগর আর তাঁহার নাই, তাঁহার পিতার রাজত্ব-কালে নিষ্ঠুর আকুবর চিতোর কাড়িয়া লইয়াছে। দুর্গরক্ষার্থ জয়মল্ল জীবন দিয়াছিল, পত্নী মাতা ও বনিতা স্বপ্নে বুদ্ধ করিয়া জীবনদান করিয়াছিল, তথাপি রাজপুত্রের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া আকুবর চিতোর কাড়িয়া লইলেন। প্রতাপ যখন রাজা হইলেন, তখন চিতোর নাই, সৈন্ত নাই, অর্থ নাই, কিন্তু তাহার বীরাঙ্গকরণ ছিল, বীরের দুঃসাধ্য কি আছে? প্রবলপ্রতাপাবিত রাজপুত্ররাজগণ দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিলেন, প্রতাপ করিলেন না। অশ্বরের গুণ-বান্ধাস ও মাড়ওয়ারের যন্ত্রদেব নিজ নিজ দুহিতাকে দিল্লীর সম্রাট-হস্তে অর্পণ করিলেন, মহাহতভব প্রতাপ স্নেহের কুটুম্ব হইতে অস্বীকার করিলেন। কেন স্বীকার করিবেন? মেওয়ারাধিপতিরা সূর্য্যবংশ-বতংস, সে উন্নত বংশ কেন কলুণিত করিবেন?

সাগরতরঙ্গের স্তায় দিল্লীর সেনা মেওয়ার প্রাবিত করিল, তাহার সঙ্কে—হা জগদীশ! এ লজ্জার অঙ্ক কেন রাজস্থানের লগাটে অঙ্কিত করিলে!—তাহার সঙ্কে রাজপুত্ররাজগণ বোগ দিলেন। মাড়ওয়ার, অশ্বর, বিকানীর, বৃন্দী প্রভৃতি নানাদেশের রাজারা আপনাদিগের দাসত্বের কলত

অপনীত করিবার জন্ত, প্রতাপকেও দিল্লীর দাস করিবার জন্ত, আকবরের সহিত যোগ দিলেন। অঘরের মানসিংহ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, মহাভূতব প্রতাপ স্নেহের কুটুম্বের সহিত ভোজন করিতে অস্বীকার করিলেন। সরোষে মানসিংহ দিল্লী বাইরা অসংখ্য সেনাতরঙ্গে মেওয়ার দেশ প্রাণিত করিলেন। মানসিংহ! তুমি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়পতাকা উজ্জীন করিয়া শত্রুদমন করিয়াছিলে,—কাহার জন্ত? হায়! স্নেহের অধীন হইয়া রাজপুত নাম ডুবািলে? স্নেহের পদব্রজ: রাজপুতের ললাটে কি সুন্দর শোভা পাইয়াছে!

অন্ধকারে ঐ জলপ্রপাতের ভীষণ ভেজ দেখিতে পাইতেছ? না, তোমরা পাইবে না, কিন্তু আমি অন্ধকারে থাকি, আমি দেখিতেছি। উহার মধ্যস্থলে উন্নত শিলাখণ্ড সগর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, জলপ্রপাতেও কল্লিত হইতেছে না। জলপ্রপাত অপেক্ষা অধিক ভেজে সাগরগর্জনে মোগলৈক্য আসিয়া মেওয়ার দেশ প্রাণিত করিল, শিলাখণ্ডের দ্বার সগর্বে প্রতাপ দণ্ডায়মান রহিলেন। হলুদীঘাটে মহাবুদ্ধ হইল, সেনাদিগের রথ পর্ত্তকন্দর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আকাশে উজ্জ্বিত হইয়া মেঘ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে কি হইবে? মোগলের অসংখ্য সেনা। ষাণ্মাং সহস্র রাজপুতের মধ্যে কেবল অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট হলুদীঘাটের ভীষণ উপত্যকার চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন।

এই কি একবার? বৎসর বৎসর এই-রূপ সংগ্রাম হইল, বৎসর বৎসর প্রভুর

সেনা, ধন, রাজ্য হ্রাস পাইতে লাগিল, বৎসর বৎসর তাঁহার জীবনাকাশ অন্ধ কারাঙ্কর হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার বীরত্ব হ্রাস হইল না, তিনি দিল্লীর দাস হইলেন না।

রাজপুত! তোমাদিগের চক্ষুতে যদি জন থাকে, বিসর্জন কর, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে, বিসর্জন কর! ঐ বেষ প্রতাপের রাজরানী পর্ত্তকন্দরে শয়ন করিগা রহিয়াছেন। আকাশ মেঘাঙ্কর, মুঘলধারার বৃষ্টি হইতেছে, রাজরানী পর্ত্তকন্দরে শয়ন করিয়া আছেন, প্রতাপ খড়্গহস্তে জাগরিত হইয়া আছেন। ঐ দেখ, বৃক্ষ হইতে রঞ্জু লম্বিত হইয়াছে, কাষ্ঠাসনে কি ভুলিতেছে? জগদীশ! রাজার শিশু পুত্রেরা বুলিতেছে, নীচে রাখিলে হিংস্রক জন্তু লইয়া বাইবে। ঐ দেখ, প্রতাপের পুত্রবধু শুকপজ আলাইয়া খাওয় প্রস্তুত করিতেছেন, রুটী প্রস্তুত হইল, সকল খাইও না, অর্ধেক খাও, অর্ধেক রাখিরা দাও, আবার ক্ষুধা পাইবে কোথায় পাইবে? ঐ শুন, কন্দনধ্বনি শ্রুত হইল! একটি বালিকার হস্ত হইতে বস্ত্রবিড়াল রুটী কাড়িয়া লইয়া গেল! রাজকন্যা ক্ষুধার চীৎকার করিয়া কন্দন করিতেছে।

রাজপুতগণ! প্রতাপের জয়গীত গাও, তিনি পঞ্চবিংশ বৎসর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ত্তশিখরে বাস করিয়াছেন, পর্ত্ত-উপত্যকার যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্ত্তকন্দরে দ্রৌণিবিহারকে পালন করিয়াছেন: তথাপি ইহজন্মে আকবরের অগ্রী-নভা স্বীকার করেন নাই। পর্ত্তে পর্ত্তে এই গীত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক, সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক,

হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া সাগরবারি পর্যন্ত সঞ্চার করুক, হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত ভগতে বায়ু হউক, আর যদি স্বর্গে সাহস ও স্বদেশান্তরাগের গৌরব থাকে, এই গীত আকাশে উখিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে আঘাত করিয়া-মানবের বশঃ-কীৰ্ত্তি বিস্তার করুক।”

চারণের ভীষণ গর্জনে গুনিয়া সকলেই শুভিত হইয়া রহিল। ক্ষণপরে সকলে চাহিয়া দেখিল, চারণ নাই, তাহার চিরুমাত্রও নাই, কেবল আকাশে মেঘরাশি ভীষণ গর্জনে করিয়া যেন তাঁহার ভয়াবহ গীত বার বার ধ্বনিত করিতে লাগিল।

রাজপুতেরা স্বদেশের পূর্বগৌরব স্মরণ করিতে করিতে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, যেনাদিগের চক্ষু বীরাশ্রিতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর তাহারা উঠিয়া আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র তাহাদের সহিত প্রস্থান করিলেন না, তিনি হস্তে গুণ্ডল স্থাপন করিয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ চিতোর-দুর্গের তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না। আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুতলাভা ভগৎ ও গগনমার্গ চমকিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া মেঘ ভীষণ গর্জনে পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু ভীষণ উচ্চাসে বহিতে লাগিল, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, “স্বদেশেও মহাবলপরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে স্বন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ, সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা

বিসর্জন দেয় নাই। তাহাদের গ্রাম দহ হইয়াছে, নগর ভূঁঠ হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরাবলীর কন্দরে ও উপত্যকার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিণী গঙ্গানদী তাহার গৌরবগীত গায় না, উজ্জ-পুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা প্রজা সকলেই বড় হুখে নিজা বাইতেছে! ভগতে তাহাদিগের নাম নাই, বীরমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যোধপুর।

Upon the mountain's dizzy brink she
stood ;
She spake not, breathed not moved ;
not—there was thrown
On her look the shadow of a mood
Which only clothes the heart in solitude,
A thought of voiceless death !
Shelley

পরদিন প্রভাতে নরেন্দ্র অতুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উক্ত চারণ শৈশবে মেঘনারাধিপতি প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালাবধি চারণ প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতগুহা ও উপত্যকার বাস করিতেন ও সেই অল্পকালেই রাজার কীৰ্ত্তিগান রচনা কবিতা কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

দিল্লীখরের সহিত অসংখ্য সংগ্রামের পর প্রতাপের যখন কাল হইল, তখন চারণের বয়ঃক্রম বিংশবৎসর। সে আজ বাট বৎসরের কথা, সুতরাং চারণের বয়ঃক্রম

একণে প্রায় অশীতি বৎসর। তথাপি চারণ এখনও চিতোরের পর্বতদুর্গে রজনীতে বিচরণ করেন। সকলেই বলে, চারণ দৈব বলে বলিষ্ঠ।

প্রতাপের মৃত্যুর সময়ে তিনি মৃত্যুশয্যা নিকটে পুত্র অমরসিংহকে আনিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, তিনিও পিতার জায় চিরকাল মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, পিত্রাজ্ঞা-পালনের জন্ত অমরসিংহ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আকবর ও তাঁহার পুত্র জেহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও পিতার জায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে চারণ সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও সর্বসময়ে পিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উত্তেজনা করিতেন। কিন্তু সে উত্তেজনা বিফল, শেষে অমরসিংহ জেহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে নাম-মাত্র অধীনতা, তিনিই স্বদেশে রাজা রহিলেন, দিল্লীতে যে কর পাঠাইতেন, তাহা বিগুণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতেন। অমরসিংহকে দিল্লী যাইতে হইত না, তাঁহার পুত্র করুণ ও পৌত্র জগৎসিংহকে জেহাঙ্গীর ও তাঁহার মহিষী জর-জাহান সর্বদাই সমাদরের সহিত আহ্বান করিতেন ও অনেক মণিমুক্তা দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাকে প্রকৃত অধীনতা বলে না, তথাপি চারণ রোষে ও অভিমানে অমরসিংহকে রাজা জ্ঞান না করিয়া অনেক কটুক্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহও লজ্জিত হইলেন এবং পিতার নিকট যে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরণ করিয়া রাজগদী ত্যাগ করিলেন; করুণ রাজা হইলেন।

আকবর কর্তৃক চিতোর ধ্বংস হওনের পরই উদয়পুর নামে এক সুন্দর রাজধানী

নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু চারণ ভয় চিতোরদুর্গে বাস করিতে লাগিলেন, এক দিন দুই দিন অন্তর দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেন, নীচে পল্লীগ্রামবাসীরা যাহা দিত, তাহাই খাইতেন, আবার দুর্গে আরোহণ করিয়া থাকিতেন। এইরূপ নির্জনে বাস করিয়া চারণ উন্নত হইয়া গিয়াছেন। পর্বত-গহ্বর তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে, মেঘগর্জন ও ঝটিকায় বন কম্পিত হইলে তাঁহার বড় উল্লাস হয়, তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন, আবার প্রতাপ আকবরশাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজপুত-সেনাগণ কয়েক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে আরাবলী পার হইয়া যাইত। সেনাগণ কখন উপত্যকা দিয়া যাইল, দুই দিকে পর্বতরাশি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, শিখরগুলি যেন আকাশ হইতে নীচে অবলোকন করিতেছে। সেই সমস্ত শিখর হইতে অসংখ্য দলপ্রপাত দূর হইতে রোপ্যপুষ্কের জায় দেখা যাইতেছে, কখন বা অন্ধকারে দৃষ্ট হইতেছে না। বরণার জল নিয়ে পড়িয়া কোন স্থানে শৈল-নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে, আবার কোথাও বা চারিদিকে পর্বত থাকায় সুন্দর স্বচ্ছ হ্রদের জায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহার জল পরিষ্কার ও নিষ্কম্প, তাহার উপর চারিদিকে পর্বতশিখরের ভায়া যেন নিদ্রিত রহিয়াছে।

কখন বা সেনাগণ নিশাকালে পর্বতপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। সে নৈশ পর্বতের শোভা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। দুই দিকে পর্বতচূড়া চক্ষুরে সমুজ্জল, কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে নিস্তরু ও শান্ত, যেন যোগীপুরুষ পার্থিব সকল প্রবৃত্তি নমন করিয়া পরিকার আকাশে ললাট উন্নত করিয়া ধ্যানে

বসিয়াছেন। সেই শান্ত রজনীতে উত্তর দিকের পর্বতের সেইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে বধ্যস্থ পথ দিয়া সৈন্তগণ বাইতে বাগিল।

পর্বতের সহস্র উপত্যকা ও কলরে অসংখ্য আদিমবাসী ভীলগণ বাস করিতেছে। তারতবর্ষের অসংখ্য স্থানেও যেরূপ, রাজপুতানারও সেইরূপ, আদিবাসীদের অসংখ্যে আসিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী সমস্ত দেশ কাড়িয়া লইয়াছে। আদিমবাসীরা পর্বতগুহার বাস করিতেছে। তাহারা রাজপুতানার রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে না, তাহাপি যোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় অনেকে বহুক্ষণবহুতে পর্বতে আরোহণ করিয়া রাজপুতদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

পর্বত অতিক্রম করিয়া যশোবন্ত অতি-রাং আপন মাড়ওয়ার দেশে আসিয়া পড়িলেন। যেওয়ার ও মাড়ওয়ার দুই দেশ দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রকৃতি লীলাক্রমে দুই দেশের বিভিন্নতা-সাধন করিয়াছেন। যেওয়ারের যেরূপ পর্বতরাশি ও বিশাল বৃক্ষাদি ও লতাপত্রের গোরব, মাড়ওয়ারে তাহার বিপরীত। পর্বত নাই, উর্বরা-ক্ষেত্র নাই, বেগবতী তরঙ্গিণী নাই, পর্বত-বেষ্টিত হ্রদ নাই, কেবল মরুভূমিতে বালুকারাশি বৃদ্ধ করিতেছে ও স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্র-কার কটকমর বাবুল ও অজস্র বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এই মরুভূমির উপর দিয়া সেনাগণ যাইবার সময় যেওয়ারীদের সেনাগণ মাড়ওয়ারী সেনাদিগকে বিজ্ঞপ করিয়া বলিল;—

“আজ রা বোপ, কোকরা ার,
বাকার রা যোদি, ঘোঠ রা দাথ,
দেখো যো রাজা ডেরি মাড়ওয়ার।”

মাড়ওয়ারিগণ পক্ষের উত্তর করিল,
“আমাদের ভয়ভূমি উর্বরা নহে, কিন্তু বীর-
প্রদবিনী বটে।” প্রকৃত মাড়ওয়ারের রাজ-
পুতরা কঠোর জাতি, রাজপুতানার তাহা-
দের অপেক্ষা সাহসী জাতি আর ছিল না।
সৈন্তগণ এইরূপে অনেক দিন ভ্রমণ
করিতে করিতে রাজধানী যোধপুরের
সম্মুখে পৌছিল ও শিবির সন্নিবেশিত
করিল। তখন নরেন্দ্র বীর বহু গজপতির
কথা শ্রবণ করিয়া একবার রাজার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। রাজা যশোবন্ত
সিংহ শিবিরে একাকী বিষম-বদনে বসিয়া
আছেন, নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া
পৌছিলেন।

রাজার অদেশ পাইয়া নরেন্দ্র কহিলেন,
“মহারাজ! সিপ্রাতীরে আপনার একজন
অমুচর হত হইয়াছেন। পূর্বে একবার
মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
এই মুক্তামালা তাঁহাকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন, তিনিও আপনার দানের অপমান
করেন নাই, সম্মুখবুদ্ধে হত হইয়াছেন।
মৃত্যুর পূর্বে গজপতি সিংহ এ মুক্তামালা
আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আমাকে
আদেশ দিয়া গিয়াছেন।”

রাজা সেই মুক্তামালা কণেক নিরীক্ষণ
করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলি-
লেন, “হা গজপতি! মাড়ওয়ারে তোমা
অপেক্ষা সাহসী বোদ্ধা কেহ ছিল না।
তোমার পিতা-তেজসিংহকে আমি জানি-
তাম, স্বর্ঘ্যমহল-দুর্গে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ
করিয়াছিলাম। গজপতি! তুমি আমারই
অজুরোধে মাড়ওয়ারে আসিয়াছিলে, বার
বার যুদ্ধে পৈতৃক বিক্রম দেখাইয়াছ। এক-
বার যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে,
সেই জন্য তোমাকে মুক্তামালা দিয়াছিলাম,

এবার আপনাদের জীবন আমার জন্য বিসর্জন দিয়া সেই মালা কিরাইয়া দিলে। বৎস, নদীর জল একবার বাইলে আর কিরিয়া আইসে না, রাজা একবার দান করিলে আর কিরিয়া লন না। তোমার বন্ধুর মুক্তামালা তুমি লগাটে ধারণ করিও এবং যুদ্ধের সময় তাহার বীরত্ব যেন তোমার স্বরণ থাকে।”

নরেন্দ্র রাজাকে শত ধন্যবাদ দিয়া সেই মালা শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আমার একটি আবেদন আছে। গজপতির দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাহাদের মাতা নাই। গজপতি মহারাজকে বলিয়াছেন, যেন অমুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, যেন কালে শিশু রঘুনাথও রাজ্যভার পিতার ভায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামনা তাহার পিতাও জানেন না।”

এই করুণবাক্য শুনিয়া রাজার নয়নে জল আসিল। তিনি বলিলেন, “বৎস, কান্ত হও, আমি সেই শিশুদের পিতাধরূপ হইব, যোধপুরের রাজ্য স্বয়ং তাহাদের মাতা হইবেন। এখনও রাজ্যকে আমাদের আগমন-সংবাদ দেওয়া হয় নাই, আমাদের দূত বাইতেছে। বাও, তুমি স্বয়ং দূতের সঙ্গে যাইয়া রাজ্যের নিকট গজপতির আবেদন জানাও এবং তাহার শিশুর জন্ত দুটি কথা বলিও।”

রাজার আজ্ঞামুতাবে নরেন্দ্র করেকজন রাক্ষুস দূতের সহিত যোধপুরের দুর্গে গমন করিলেন। যোধপুর-দুর্গে বাণীরা একবার দেখিয়াছেন, তাহার কখনও বিন্দ্রণ হইতে পারিবেন না। চতুর্দিকে কেবল বালুকারাশি ও মল্লভূমি, তাহার মধ্যে একটি উন্নত পর্বত, সেই পর্বতের শিখরের উপর যোধপুর-দুর্গ

যেন কোয়ার ক্রীটের ভায় শোভা পাইতেছে। পর্বতভূলে নগর বিস্তৃত রহিয়াছে এবং নগরের ভিতর দুইটি নুসর হ্রদ, পূর্বদিকে হান্দিলাও, দক্ষিণদিকে গোলাপ-নাগর। নগরবাসিনী শত শত কামিনী হ্রদ হইতে জল লইতে আসিতেছে, হ্রদের পার্শ্ব নুসর উজানে শত শত মাড়িষুক ফল ধারণ করিয়াছে ও নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই উজানে বিচরণ করিতেছে। নগর নীচে রাখিয়া, একদণ্ড ধরিয়া পর্বত আরোহণ করিয়া নরেন্দ্র প্রাণাদে পৌঁছিলেন। রাজ্যের আদেশে দূতগণও নরেন্দ্র প্রাণাদে প্রবেশ করিলেন।

শ্বেত-প্রস্তরনির্মিত রাজসিংহাসনে মহারাজ্য বসিয়া আছেন, চারিদিকে সহস্রা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও চারিদিকে চুল্লী-তেছে। রাজ্যের বহনমণ্ডল অবগুষ্ঠনে ক্রিষ্ণ আবৃত হইয়াছে, তথাপি সে নয়নের আগবৎ উজ্জলতা সম্যক লুকায়িত হয় নাই। গরীয়সী বামা বর্ষাধই রাজমহিষীর ভায় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, নিবিড় কৃষ্ণকেশে উজ্জল রত্নরাজি ধকধক করিতেছে।

দূত প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে সভয়ে সকল সংবাদ জানাইলেন। মহারাজ্য ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিম্পন্দ হইয়া রহিলেন, বস্ত্রপাতি ও ঝটিকার পূর্বে আকাশমণ্ডল বেল্প নিম্পন্দ থাকে, সেইরূপ নিম্পন্দ হইয়া রহিলেন; সহসা অবগুষ্ঠন ত্যাগ করিয়া আন্তরনয়নে দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “কাপুরুষ! সেই সিংহাসনীতে আপনাদের অধিকার-কর শোণিত বিসর্জন করিতে পার নাই? আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আর তোমার প্রভু সেই কাপুরুষকে বলিও, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কলঙ্করাশিতে কলঙ্ক হইয়াছেন, তিনি আমার এ পরিজ দুর্গে

প্রবেশ করিতে পাইবেন না।” এই কথাবলিতে বলিতে রাজী হুজু তা হইয়া গড়িলেন।

রাজার সহচরীগণ অনেক বহু রাজার চৈতন্যসাধন করিল। তখন রাজী কোণে প্রায় জানশূন্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, “কি বলিলি ? তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করিয়াছেন ? যিনি পলায়ন করিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, আমার স্বামী নহেন, এ নহেন যশোবন্ত সিংহকে আর দেখিবে না। আমি যেওয়ারের রাণার দুহিতা ; প্রতাপ-সিংহের কুলে যিনি বিবাহ করেন, তিনি ভীকৃ কাপুরুষ কেন হইবেন ? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখরণে হত হইলেন না ? দূতগণ! এখনও দণ্ডায়মান আছে ? আমার বোদ্ধগণ কোথায় ? দূত-গণকে পর্ত্তের, উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ কর, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর !”

রাজার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, কোণে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অতিশয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “মহারাজি, আমাদের মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন, আমরা মৃত্যুর ভয় করি না, কিন্তু মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে কাপুরুষ বলিবেন না। এই নয়মে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, যত দিন জীবিত থাকিব, সেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কখনও দেখিব না।”

রাজী কণ্ঠে স্থির-নয়নে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, “বথার্থই যশোবন্ত সিংহ সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? তুমি বিদেশীয়, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই, বথার্থ কথা বিস্তার করিয়া বল।”

নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলেন ; রাজপুত-সৈন্তের বৈরূপ সাহস

দেখিয়াছিলেন, মহারাজের বৈরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। শেষে বলিলেন, “যখন মেঘরাশির স্তার চারিদিকে মোগল-সেনা আগিয়া বেটন করিল, যখন ধূম ও ধূলার ক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া বাইল, যখন ভীকৃ কাসেম ধী পলায়ন করিল, তখনও মহারাজ রাজপুতের উচিত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে রাজপুত-শোণিতে পর্ত্ত; উপত্যকা ও সিপ্রানদী আরক্ত হইয়াছে, রাজার চতুর্দিকে অল্পসংখ্যকমাত্র রাজপুত আছে, আরংজীব ও মোরাদ সহস্র মোগল সৈন্য সহিত রাজার উপর আক্রমণ করিতেছেন, তখনও মহারাজা যশোবন্ত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজার পদতলে শত শত রাজপুত হত হইতে লাগিল, রাজপুতসংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, মোগলের জয়-নাদে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহারাজের হৃদয় কম্পিত হইল না। অষ্ট সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্টশতও জীবিত ছিল না, তথাপি মহারাজ যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। ঘোর কল্লোলিনী সিপ্রানদী ও ভীষণ বিক্ষিপর্ত্ত রাজা যশোবন্তের বীরত্বের সাক্ষী আছে।”

শুনিতে শুনিতে রাজার নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল,—বলিলেন, “ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি, আমার যশোবন্ত রাজপুতের নাম রাখিয়াছেন! বিদেশীয় দূত, এ কথায় আমার হৃদয় শীতল হইল। বল, তাহার পর কি হইল ?”

নরেন্দ্র। মন্ত্রব্যের বাহা সাধ্য, রাজপুতের বাহা সাধ্য, যশোবন্ত তাহা করিয়াছেন। যখন কেবলমাত্র পঞ্চশত সৈন্য জীবিত আছে দেখিলেন, তখন রাজা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

রাজী। "পলায়ন করিলেন। বা বিধাতঃ।
রাণার আঁমাতা পলায়ন করিলেন।"—
বন্ধুত্বের সজোরে করাবাত করিয়া রাজী
পুনরায় মুক্তি হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ দাসীগণ রাজীর মুখে জলসিক্কন
করিতে লাগিল। রাজীও অল্পক্ষণমধ্যেই
চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া এবার করুণবরে বলি-
লেন, "সহচরী! চিতা প্রস্তুত কর, আমার
স্বামী বৃদ্ধক্কে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্ণ-
ধামে আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন,
আমি তথায় বাই। যশোবন্তের নামে যে
আসিয়াছে, সে প্রবঞ্চক। আর তুই দূত,
তোর সঙ্গিগণের সহিত ঐক্কেই মাড়ওটার
দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ. নচেৎ প্রাণদণ্ড
হইবে।"

নবেঙ্গ ও দূতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই-
লেন, রাজীর আঁজার দুর্গের দ্বার বন্ধ হইল।
বাহিরে ঘাইবার সময় বোধপুরের রাজমন্ত্রী
দূতের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন,
"মহারাজের সহিত তোমাদের দেখা
করিবার আবশ্যকতা নাই, এই পত্র লইয়া
শীঘ্র মেওয়ার দেশের রাজধানী উদয়পুরে
যাও। তথায় রাণা রাজসিংহকে এই পত্র
দিও, তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন।
আমাদের মহারাজীর আঁজা অলঙ্ঘনীয়,
মাড়ওরারে আর থাকিতে পাইবে না। মহা-
রাজীর মাতা তথায় আছেন, এই পত্র প্রাপ্তি-
মাত্র তিনি বোধপুরে আসিবেন, তিনি ভিন্ন
ঠাহার কন্ডাকে আর কেহ সাক্ষাৎ করিতে
পারিবেন না।"

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বোধপুরের
রাজী আট নয় দিবস অবধি উন্নতপ্রায়
হইয়া রহিলেন। পরে উদয়পুর হইতে
ঠাহার মাতা আসিয়া ঠাহাকে সাক্ষাৎ করি-
লেন, তখন তিনি যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে সম্মত হইলেন। পুনরায় সৈন্ত
সংগ্রহ করিয়া যশোবন্ত সিংহ আরাজীবের
সহিত অচিরাত্ত বুদ্ধ করিতে বাইবেন স্থির
হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়পুর।

He lingered pouring on memorials
Of the world's youth ; through the
long pouring day
Gazed on those speechless ; nor when the
moon
Filled the magesterial halls floating
shades
Suspended he that ask, but ever gazed
and gazed, till meaning on his vacant
mind
Flashed like strong inspiration.
Shelly.

মেওয়ার দেশে পূর্বে চিতার প্রধান
নগরী ছিল, এক্ষণে উদয়পুর।, মাড়ওর, লু
বালুকারাশি ও মরুভূমি ইহুজার সহিত ঞ্জের
মেওয়ার দেশে পুনরায় অঁক। আশ্রম মাসে
বড়ই আনন্দাভব করি নরেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ষটা ও
বলীর উচ্চ শেখর উন্নতলেন, তাহা বর্ণনা করা
পার্কীয় নদী ও পূর্বপুরুষগণ যে সমস্ত অস্ত্র
সন্দর্শন করিলেন, জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে
হদের শোভা দিয়াছেন, বোদ্ধাগণ এখন মহা
আনন্দোদয় হইসেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে
করিয়া নরেন্দ্র করিয়া মহাসমারোহে তাহার
উদয়পুরে উপরিত হইলেন, দেবীর মন্দিরে
নরেন্দ্রনাথ মন্দির ও মেব বলি হইল,
স্থানে সেই দিবসে মহাসমারোহে দুর্গার পূজা
দেখেন হইল, তাহার পর-দিবসে মহারাণা সমস্ত
নির্মল বোদ্ধাগণকে আহ্বান করিয়া বৎসলে

হাঙ্গারী নগরে বসে বসে করিতেছে। তখন
দিকে হুসর পর্বতরাশির পর পর্বতরাশি,
যেন প্রকৃতি এই মনোহর উচ্চ প্রাচীর দিয়া
এই স্থানের আবাসস্থানকে রক্ষা করিতেছে।
হুসর নিকটবর্তী একটি পর্বতশ্রেণীর উপর
হুসর রাজপ্রাসাদ ও খেতবর্গ সৌখ্যমালা
যেন সহস্র-বন্দে নির্মল রূপে আগমার
হুসর প্রতিরূপ অবলোকন করিতেছে।

স্বর্গাচার দিয়া যোধপুরের দূত নগরে
প্রবেশ করিলেন। যোধপুরে ও উদয়পুরে
তখন বন্ধু ছিল, সুতরাং যোধপুরের দূত-
গণকে তাহান করিবার জন্য নাগরিকগণ
অবধান করিতে লাগিল। এতদ পথ দিয়া
নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাজপ্রাসাদ-
ভিমুখে বাইতে লাগিলেন, চারগণ "টপ্পা"
অর্থাৎ মঙ্গলমুচক গীত গাইতে লাগিলেন, দুই
পার্শ্বের স্বীলোকগণ কলসককে দণ্ডায়মান
হইয়া "সুহেলিয়া" অর্থাৎ আনন্দগীত গাইয়া
যোধপুরের দূতদিগকে আহ্বান করিলেন।

দূতগণ সকলকেই দুই এক মুদ্রা পুরস্কার
দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

"নরেন্দ্রনাথ আমাকে কলে রাজপ্রাসাদে পৌছিয়া
ছেন, আমরা মৃত্যুর ভয়ে প্রাসাদের উপর উঠি-
রাজা যশোবন্ত সিংহকে বিনিশ্চিত সোপান দায়া
না। এই নয়নে তাঁহাকে ধাক্কাহলে প্রবেশ করি-
রাছি, যত দিন জীবিত থাকি তাপা বিদেশীয় দূত-
মুদ্রা কখনও দেখিব না।"

বংশের আদি-
রাজা কণেক স্থির-নয়নে স্ত্রী সেই গৃহের
দিকে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে সেই অস্ত্র উচ্চ
"বখাখই যশোবন্ত সিংহ সম্মুখ-বুদ্ধ
ছিলেন? তুমি বিদেশীয়, তোমার গ-রহিবিনিশ্চিত
কোন ভয় নাই, বখাখ কথা বিস্তারিত বক্তব্য মহা-
বল।"

আছেন।

নরেন্দ্র মুদ্রার বিবরণ সবিশেষ বর্ণনা উপর
করিলেন; রাজপুত্র-সৈন্তের যেকোন সাহস করি-

তেছে। কিকিছুই পারিষদগণ উপস্থাপন
করিয়াছেন ও চারগণ অভিযুক্ত। এই
অবস্থা-ভী-ভূয়া রাজসভার রাণার সাহুবাধ
করিতেছেন। এক্ষণ সময়ে যোধপুরের দূত
প্রবেশ করিলেন।

দূত বিনীতভাবে সমস্ত সমাচার অবগত
করাইলেন। যশোবন্ত সিংহের পরাজয় ও
দেশে প্রত্যাগমন, মহারাজার জ্যেষ্ঠ ও
রাজার হৃদশা, এই সমস্ত অবগত করাইয়া
যোধপুরের মন্ত্রীর পত্র রাণার হস্তে সমর্পণ
করিলেন। রাণা রাজসিংহ সমস্ত বিবরণ
অবগত হইয়া যশোবন্তের জন্য শোক প্রকাশ
করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন ও তাঁহা-
দের উদয়পুরে থাকিবার জন্য উপযুক্ত স্থান
নির্দিষ্ট করিতে মন্ত্রিবরকে আদেশ করি-
লেন। অল্পদিন পরেই যোধপুর-রাজার
মাতা উদয়পুর হইতে যোধপুরে গমন
করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে কয়েক মাস বাস
করিয়া পরম শ্রীতি লাভ করিলেন। হেমের
প্রতিমূর্তি তাঁহার স্বপ্নের অনপনের অন্ধে অন্ধিত
হইয়াছিল, হেমের চিন্তা তিরোহিত হইবার
নহে, তথাপি সেই হুসর উপত্যকায় বাস-
কালীন সে চিন্তাও কিকিছু পরিমাণে লাভব
হইল। উদয়পুর হইতে অল্প দূরে
অনেক বুদ্ধস্থান, অনেক কীর্তিগুহ, অনেক
পূজাহান আছে, নরেন্দ্র একে একে সমুদয়
সন্ধান করিতে লাগিলেন। কখন একাকী,
কখন দেওয়ানা ভাতার-বালককে সঙ্গে
লইয়া নরেন্দ্র নানা পর্বত উন্নয়ন করিতেন,
হুসর এক অংশ হইতে অস্ত্র অংশে, এক
পর্বত হইতে অস্ত্র পর্বতে, এক বুদ্ধকে
হইতে অস্ত্র বুদ্ধকে বিচরণ করিতেন;
কখন কখন প্রাতঃকাল হইতে বিপ্রহর
পর্যন্ত, বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পর্বত

। উপত্যকার বিচরণ করিতেন। প্রাতঃ-
কালে ক্রীড়াসভা রাজপুত-বালকগণ অঙ্ক-
নর্দেণ পূর্বক সেই অপরিচিত ভ্রমণকারীকে
দখাইত, সাংকালে রাজপুত-মহিলাগণ
দললককে ব্রত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়
সহি বিদেশীকে চারণ বিবেচনার প্রণাম
করিয়া চলিয়া বাইত।

দেওয়ানাও নিত্যক্কে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে
বিচরণ করিত, নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফল
আহরণ করিয়া আনিয়া দিত ও সাংকালে
নৌকা আনিয়া আপনি দাঁড় করিয়া প্রভুকে
উদয়পুরে পুনরায় লইয়া বাইত। নিত্যক
শান্ত হ্রদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৌকা
ভাসিয়া বাইত, সে শান্ত সাংকালীন
আকাশ, নিত্যক পর্বতরাশি ও নির্ঝল শব্দ-
শ্রুত হ্রদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্তি-
রসে পরিপূর্ণ হইত। কখনও বা দেওয়ানা
সপ্তম্বরে গীত আরম্ভ করিত, সে বাল-কণ্ঠ-
বিনিস্তৃত সুবিমল স্বরে সেই নৈশব্রত,
পর্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া বাইত।
তাতার-ভাষায় গীত, সে গান নরেন্দ্র বৃথিতে
পারিতেন না, তথাপি ছুই একটি কথা
শুনিয়া বোধ হইত যেন, তাহা প্রেমের
গান। অভাগা উন্নত বালক! তুই এই
বয়সে কি প্রেমে উন্নত হইয়াছিস? না
হইলে সে দেওয়ানা হঠবে কেন, তাহার
চক্ষু এরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিতে দীপ্ত
কেন, সে দেশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া
উন্নত হইয়া দেশে দেশে বিচরণ করে
কেন? দেওয়ানা নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত
ভৃত্য!

রজনীযোগে চম্ভাপোকে সেই হ্রদের
নির্ঝল জল বড় সুন্দর শোভা পাইত।
জলহিল্লোলে চম্ভের আলোক বড় সুন্দর
নৃত্য করিত, বায়ু রহিয়া রহিয়া সেই সুন্দর

উন্মীলনকে চুবন করিয়া বাইত নরেন্দ্রনাথ
নৌকার উপর শয়ান হইয়া চারিদিকের
সেই অনন্ত পর্বতরাশি দেখিতেন, অনন্ত
আকাশে নির্ঝল নীল আভা দেখিতেন, ছুই
একখানি চক্ষু-কেন্দ্রিত শুভ্রমেঘ দেখিতেন।
এই সমস্ত দেখিতেন আর বাল্যকালের কথা
তাহার স্মরণ হইত, হেয়লতার কথা স্মরণ
হইত, অলঙ্কিত অস্ত্রবিশ্রুতে বোদ্ধার বদন
সিক্ত হইয়া বাইত।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল।
ক্রমে আশ্বিন মাসে অধিকাংশের সময়
সমাগত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজা।

Go Where glory waits thee.

Moore.

শরৎকাল উপস্থিত। রাজপুতানার
এই সময় যুদ্ধ আরম্ভের সময়, স্বতরাং
রাজহানে অধিকার পূজার সহিত ষড়্ভেগর
পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে
উপধূপরি দশদিন নরেন্দ্রনাথ বৈরাগ্য ষটা ও
সমারোহ দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করা
যায় না। পূর্বপূর্বকরণ যে সমস্ত অস্ত্র
লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন বা যুদ্ধে
প্রাণ দিয়াছেন, বোদ্ধাগণ এখন মহা
উৎসাহে সেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে
বাহির করিয়া মহাসমারোহে তাহার
পূজার রত হইলেন, দেবীর মন্দিরে
প্রতিদিন মহিষ ও মেঘ বলি হইল,
কলম দিবসে মহাসমারোহে ভূগাঁর পূজা
হইল, তাহার পর-দিবসে মহারাণা সমস্ত
বোদ্ধাগণকে আহ্বান করিয়া বরণহলে

উপস্থিত হইলেন। সে দিন সমস্ত উদয়পুর নৃত্য শোকার শোভিত হইয়াছে; বাকান, লোকান, গণ, শাউ পুষ্পালা ও বৃক্ষগণে পরিশোভিত হইয়াছে, ঘরে ঘরে স্কন্দ ও ব্রহ্মোভিত তোরণ বৃহৎ হইতেছে, গৃহে গৃহে বিজয়-পতাকা উজ্জ্বল হইতেছে। প্রাতঃকালে জয়চাকের শব্দে রাজপুত্র সৈন্তগণ সজ্জিত হইয়া রণস্থলে গমন করিতেছে, উদয়পুরের অধীনস্থ নানাহান হইতে অনেক সেনানী নিজ নিজ সৈন্ত-সামন্ত লইয়া সমবেত হইয়াছে, নানাহানীর লোকের নানারূপ পরিচ্ছদ, নানারূপ পতাকা ও নানারূপ অস্ত্রশর আজি উদয়পুরে সম্মিলিত হইতেছে। গজদল সহস্র যোদ্ধা আজি মহারাণাকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদের পদভরে যেন মেদিনী কম্পিত হইতেছে।

বেলা এক প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রণস্থল সৈন্তে ভ্রমাকীর্ণ এবং তাহাদিগের বুদ্ধকৌশল দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী কীৰ্ত্তিক্ষা পড়িয়াছে। রাণার আদেশে সৈন্তগণ তীরনিক্ষেপে বা বর্ষাচালনে, খড়্গ-যুদ্ধে অথবা অশ্বচালনে নিজ নিজ কৌশল দেখাইতে লাগিল এবং মেওয়ারের নানা স্থান ও নানা দুর্গ হইতে আগত নানা কুলের রাজপুত্রগণ নিজ নিজ রণনৈপুণ্য দর্শাইতে লাগিল। চন্দাওয়ারকুল, জগাওয়ারকুল, রাঠোরকুল, প্রমারকুল, ঝালাকুল প্রভৃতি নানা কুলের রাজপুত্রগণ অচ্ছ উদয়পুরে মহারাণার নিকট রাজভক্তি ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে এবং তাহাদিগের স্ব স্ব চারুগণগণ সেই সেই কুলের গৌরবস্থচক গীত গাইতেছে। নরেন্দ্র সমস্ত দিন এইরূপ সমরোৎসব দেখিয়া এবং চারণদিগের গীত শুনিয়া পুলকিত হইলেন। অতাবধি রাজ-

স্থানে শারদীয়া-পূজার শ্বেদদিনে এরূপ বটী হয়, অতাবধি রাজপুত্র-যোদ্ধাগণ এই সময়ে নিজ নিজ রাজ্যের নিকট বুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করে, অতাবধি রাজপুত্র-নগরবাসি-গণ দেবীপূজার অবসানে রক্তস্থলে সমবেত হইয়া দেবীর রাজভক্তি প্রদর্শন করে। (বর্তমান লেখক রাজস্থানে) ভ্রমণকালীন শারদীয় বড়গপুজা ও শারদীয় সমারোহ অবলোকন করিয়াছে, সহস্র নগরবাসি-দিগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে বাধীন রাজপুত্র-দিগের শরণকালের আনন্দোৎসব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছে।

সমস্ত দিন এইরূপ উৎসব দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় একটি বৃক্ষতলে বাইয়া কিছু ফলমূল আহারের আয়োজন করিলেন এবং নিকটস্থ একটি কূপ হইতে জল আনিতে গেলেন। কূপের নিকট গোস্বামিবেশে একজন দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও জল আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে কিঞ্চিৎ পরুষভাবে ঠেলিয়া দিয়া আগে নিজে জল তুলিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর এই অকৃত্যচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তিরস্কার করিলেন। গোস্বামী দ্বিগুণ কটুভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুমি বিদেশীয়, রাজস্থানে আসিয়া রাজপুত্রদিগের সহিত কলহ করিতে তোমার ভয় বোধ হয় না?”

নরেন্দ্র। আমি বিদেশীয় বটে, কিন্তু বহুকাল অবধি রাজপুত্রদিগের সহিত সহবাস করিয়াছি, তোমার স্বায় অজ্ঞ রাজপুত্র দেখি নাই।

গোস্বামী। যদি রাজপুত্রদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয়, জান যে, রাজপুত্রমাত্রেই অসি ও চাল

চালাইতে জানে; অতএব চূপ করিয়া থাক।

নরেন্দ্র। গরিত রাকপুত্ৰ আমিও অসি ও চাল চালনা কিছু শিকা করিয়াছি, আমার নিকট গরু করিও না। তুমি গোস্বামী বলিয়া এবার কমা করিলাম।

কথায় কথায় বিবাহ বাড়িতে লাগিল, গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রকে প্রহার করিলেন, নরেন্দ্রও প্রহার করিলেন, অল্পকণ্ঠে উভয়ে জানশূন্য হইয়া অসি ও চাল বাহির করিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছে, সে স্থান নির্জন, আর সকলে চলিয়া গিয়াছে।

দুই জনে একেবারে বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, অপরকাল তাঁহাদের কাহাকেও ভাল করিয়া দেখা গেল না। যুদ্ধের মধ্যে নরেন্দ্র পরাজিত হইলেন। সেই অপূর্ণ বলবান গোস্বামীর প্রচণ্ড আঘাতে নরেন্দ্রের অসি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র স্বয়ং ভূমিতে নিপতিত হইলেন।

তীব্রস্বরে গোস্বামী বলিলেন, “বিদেশীয় বোদ্ধা, তুমি বালক, তোমার অপরাধ কমা করিলাম। পুনরায় রাজপুত-গোস্বামীর সহিত কলহ করিও না, গোস্বামীর চির-জীবন কেবল পূজাকার্য্যে অতিবাহিত হয় নাই, সেও যুদ্ধ-ব্যবসা কিছু কিছু জানে।”

নরেন্দ্র কর্ণশব্দে বলিলেন, “রাজপুত! আমি তোমার নিকট জীবন ভিক্ষা চাহি না। তোমার বাহা ইচ্ছা, বাহা সাধ্য কর, আমি অস্বগ্রহ চাহি না।”

গোস্বামী তখন গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “বোদ্ধা, আমিও যুদ্ধব্যবসায় করিয়া থাকি, বোদ্ধার নিকট ভিক্ষা চাহিতে বোদ্ধার কোন অপমান নাই। নরেন্দ্র, আমি তোমাকে জানি, তুমিও আমাকে শীত

জানিবে, আমার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে কোনও অপমান নাই। তিন দিবসের মধ্যে আমার আবার শাস্তাং হইবে, সে দিন আমিও তোমার নিকট একটি ভিক্ষা গ্রহণ করিব। আমার নাম শৈলেশ্বর।”

এই বলিয়া গোস্বামী সহসা অন্ধকারে অন্তর হইলেন। নরেন্দ্র বিম্বিত হইয়া রহিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

একলিঙ্গের মন্দির।

For thee young warrior welcome !
thou hast yet,
Some tasks to learn, some frailties
to forget
Moore.

রাজস্থানে নূতন নূতন দেশ ও নূতন নূতন আচার-ব্যবহার দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় কিছু দিন শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যয়ে যে অন্ধ ধোঁয়া দিত হয়, একেবারে বিলুপ্ত হয় না। বঙ্গদেশ হইতে উদয়পুর শত শত ক্রোশ অন্তর, কত নদ, নদী, পর্বত, যক্ষুক্ষ্মি পার হইয়া নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। তথাপি প্রাতঃকালে যখন পূর্বদিকে আকাশে রক্তমাছটা অবলোকন করিতেন, তখন সেই পূর্বদেশবাসিনী বালিকা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত। রক্তনীতে যখন নরেন্দ্রনাথ একাকী ছাদের উপর অন্ধকারে বিচরণ করিতেন, বোধ হইত যেন, সেই প্রথমপ্রতিমা তাহার জ্যোতিতে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রেম-দৃষ্টি করিতেছে। কোথায় বীরনগরের খাটা, কোথায় কলনাদিনী ভাগীরথী, আর কোথায় নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বদেশ হইতে পলায়ন

করিলে কি চিন্তা হইতে পলায়ন করা যায়? যত্নর আগে আর একবার সেই হেমলতাকে দেখিবেন, প্রাতঃকালে, সারাকালে, নিশীথে তিনি যে চিন্তা করেন, হেমলতাকে একবার সেই সমস্ত কথা বলিবেন, নরেন্দ্রনাথের কেবল এই ইচ্ছা। যত্নর আগে কি আর একবার দেখা হইবে না? নরেন্দ্রনাথ দেও-রামার নিকটে শুনিলেন, ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরের কোন এক গোস্থামী ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ একদিন সেই মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

রজনী এক প্রহরের পর নরেন্দ্র মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন ও মন্দিরের যে শোভা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মন্দির একটি উপত্যকায় নির্মিত, তাহার চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবল অন্ধকারময় পর্বতশ্রেণি অন্ধকার আকাশের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, চারিদিকে যেন প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দিয়া রত্নের উপ-গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় নরেন্দ্র সেই প্রেক্ষাপট মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সারি সারি খেত-প্রস্তর-বিনির্মিত স্তম্ভের স্তম্ভের মধ্য দিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রস্তরালয়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে মহাদেবের বসু ও নন্দীর পিতৃ-প্রতিমূর্ত্তি বিহাছে, ডিওয়ে শুভ প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভসারি উজ্জল সুগন্ধ দীপাবলীতে রত্নময় করিতেছে, মধ্যে ভোলানাথের প্রস্তর-বিনির্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রাতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দিরের একজন দীর্ঘকায় তেজস্বী জটাদারী গোস্থামী এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, প্রশস্ত ললাটে অর্ধশঙ্করের ছায় চন্দনরেখা, বিশাল স্বল্পে যজ্ঞোপবীত লবিত রহিয়াছে। অল্প ছুই চারি জন গোস্থামী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। ঐ মন্দি-

রের প্রধান গোস্থামী দ্বিরকাল অবিরাহিত থাকেন, তাহার যত্নর পর শিষ্যের মধ্যে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্দিরের সাহা-য্যার্থে অনেকসংখ্যক গ্রাম নির্দিষ্ট ছিল, তাহা ভিন্ন বাত্রিদিগের দানও অল্প ছিল না।

দ্বিপ্রহরের ঘটাবধি সেই স্তম্ভের শিব-মন্দিরে প্রতিশ্রুতি হইল, বসু বসু হর হর শব্দে মন্দির পরিপূরিত হইল ও তৎপরে বসু-সন্মিলিত উচ্চ গীতস্বনিতে ভোলানাথের স্তব আরম্ভ হইল। প্রৌঢ়বোবনসম্পন্ন নর্ত্তকীগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল, গায়কগণ সপ্তস্বরে মহাদেবের অনন্ত গীত গাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণেক পর গীত সাধ হইল, সেই জটাদারী গোস্থামী ইঙ্গিত করায় নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল, গায়কগণ নিবৃত্ত হইল, দীপাবলী নির্বাপিত হইল, পূজা সাধ হইল। নরেন্দ্রনাথ সে অন্ধকারে ইতিকর্ষ্যাবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর বোধ হইল, যেন অন্ধকারে সেই দীর্ঘকায় জটাদারী গোস্থামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে যাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় কি এ মন্দিরের এবজন গোস্থামী?” গোস্থামী কিছু-মাত্র না বলিয়া ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। তৎপরে গোস্থামী অঙ্গুলি ধারায় মূরে এক দিক নির্দেশ করিলেন, নরেন্দ্র সেই দিকে চাহিলেন; নিবিড় দুর্ভেদ অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার চাহিলেন, বাধ হইল যেন, অন্ধকারে একটি দীপশিখা দেখা বাইতেছে। গোস্থামী নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ছুই জনে অনেক পথ সেই অন্ধকারে অতিবাহিত করিলেন। এ অন্ধকারে এই

মোনাবলম্বী বোগী পুরুষ কে ? ইহার উদ্দেশ্য কি ? শৈবগণ কখন কখন নরহত্যার ব্যাঘ্র পূজাসাধন করে, এ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বিকট বোগীর কি তাহাই উদ্দেশ্য ? একবার নরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, আবার খড়্গে হাত দিয়া ভাবিলেন, "আমি কি কাপুরুষ ? এই প্রশান্ত-মুষ্টি বোগীর সহিত বাইতে ভয় করিতেছি ?" আবার গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই "দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ পর শৈব গোস্বামী এক পর্বত-গহবরে প্রবেশ করিলেন, নরেন্দ্রও প্রবেশ করিলেন । তাহার ভিতর বাহা দেখিলেন, তাহাতে নরেন্দ্র আরও বিস্মিত হইলেন । সম্মুখে করালবদনা কালীর ভীষণ প্রতি-মূর্তি, তাহার নিকট কয়েকখানি কাষ্ঠ জলিতোছে, তাহার আলোক সেই গহবরের শিলার চারিদিকে প্রতিফলিত হইতেছে । অগ্নির পার্শ্বে কয়েকখানি হস্তলিপি, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ ও স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে । দূরজলস্রোতের স্রোতায় একটি শব্দ সেই গহবরে শ্রুত হইতেছিল ।

গোস্বামীর আকৃতি অপূর্ণ । ঈষৎ বেতশ্লথ বক্ষঃস্থল পর্যাস্ত লম্বিত রহিয়াছে, কেশের জটাবার পৃষ্ঠে ঢুলিতেছে, শরীর অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় বলিষ্ঠ, অতিশয় তেজোময় বলিয়া অনুভব হয় । নয়নদ্বয় সেই অগ্নির আলোকে ধক্ ধক্ করিয়া জলিতোছে । উন্নত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দন-রেখা শোভা পাইতেছে ।

গোস্বামী জগজ্জকৃষ্ট নির্দোষ করিলেন, পরে তাহার অপর পার্শ্বে বাইরা সেই রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইলেন । বিকীর্ণ অগ্নিকণাতে তাহার মুখমণ্ডল ও দীর্ঘ অবয়ব আরও বিকট বোধ হইল, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়

ভস্মিত হইল । তিনি অগত্যা একপদ পড়াতে বাইরা শিলারশিতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিলেন । সাহসে ভয় করিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাহার হৃৎকম্প একেবারে অবসান হইল না ।

অতি গম্ভীরস্বরে গোস্বামী ডাকিলেন, "নরেন্দ্রনাথ !"

নরেন্দ্রনাথ এতকণে বুঝিলেন, শৈব সেই উদয়পুরের বোদ্ধা, — শৈলেশ্বর !

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পর্বত-গহবর ।

Thy fatal tiam
Is cursed in silence, sorrow shame,—
A passion without hope or pleasure,
In thy soul's darkness buried deep
It lies some ill-gotten treasure
Some idol without shine or name,
O'er which its pale eyed votaries
Unholy watch while others sleep.

Moore.

শৈলেশ্বর । নরেন্দ্রনাথ ! ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে গোস্বামিগণ বোগবলে মানব-হৃদয় জানিতে পারেন । নরেন্দ্রনাথ ! তুমি পাপ হনরে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ । তোমার মনে পাপচিন্তা আছে ।

নরেন্দ্র । আপনি কে জানি না, আপনার কথা উত্তর দিতে বাধ্য নহি । শৈলেশ্বর । আমি ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামী, মন্দির-কলুবিতাকারীকে প্রদ্বন্দ্ব করিবার আমার অধিকার আছে ।

নরেন্দ্র । আপনি আমাকে কিরূপে

চিনিলেন, জানি না, আপনি আমার কি পাপ দেখিয়েছেন, জানি না।

শৈলেশ্বর। এ যদিও প্রভারণা অন্য-বস্তুর। একটা রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই নারীকে পুনরায় পাইবার লালসার তুমি এই স্থানে আসিয়াছ।

নরেন্দ্র। যদি তাহাই হয়, তাহাতে পাপ কি? পোষামিগণ যদিও রমণীপ্রেমে বঞ্চিত, তথাপি রমণী-প্রেম-আকাজ্জক পাপ নহে। স্বয়ং শূলপাণি অপর্যায় প্রেম আকাজ্জক করেন।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র! এ প্রবন্ধনার স্থান নহে। তুমি কেবল রমণীর প্রেমা-কাজ্জকী নহ, তুমি পরতীর প্রেমাকাজ্জকী। জগতে এরূপ যন্ত্রণা কি আছে, নরকে এরূপ অগ্নি কি আছে, যাহাতে এ পাপের প্রার-শিষ্ট হয়?

নরেন্দ্র। আমি যখন একটা বালিকাকে ভালবাসিতাম, তখন সে অবিবাহিতা ছিল। এক্ষণে যদি সে বিবাহিতা হইয়া থাকে, তবে সে আমার অপ্স্রুতা।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর। সুন্দর জাহবীকূলে সেই সুন্দর অট্টালিকা স্মরণ কর। পবিত্রাত্মা ত্রীশচন্দ্র, পবিত্ররূপরা হেমলতা, পবিত্র সংসার! পাপিষ্ঠ, তোমার মনোরথ কি? সেই সংসার ছারখার হয়, সেই ত্রীশচন্দ্রের সর্কনাশ হয়, সেই হেমলতা তোমার হয়! সেই খেতপদ্ম-সন্নিভা পুণ্য-রূপা হেমলতা বাল্যকালে যে তোমার সহিত খেলা করিয়াছিল, এখনও সহোদরী অপেক্ষা তোমাকে যে স্নেহ করে, তোমার ভক্ত চিন্তা করে, সেই স্নেহময়ী পতিব্রতা

নারী কুলটা হইয়া তোমাকে সেবা করে। শতীর লগ্নাতে কুলকলঙ্কিনী, দুর্ভাগিনী শব্দ অনশনের অর্থে অঙ্কিত হয়। তাহার হৃদ-কেননিড যেত যশে অলসবর্ণ সৌপামান হয়। তোমার ভক্ত সে সংসার ঋণে প্রাপ্ত হয়! তাহা রেস্তোনাথ! আপনাকে ভুলাইও না। সত্য তুমি এতদূর ভাব নাই, কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে ইহা ভিন্ন আর কি ফল হয়? এই পাপ মনোরথে তুমি এই পাবত্র মন্দিরে আসিয়াছ।

শৈলেশ্বরের কথা সাক্ষ হইল, কিন্তু সে বজ্রধ্বনি তখনও নরেন্দ্রের কর্ণমূলে কম্পিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, তাহার শরীর কম্পিত হইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার ক্রোধ লীন হইল, মনন হইতে দুই একটি অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “স্বামিন্! আমি পাপিষ্ঠ। আমাকে সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।”

শৈলেশ্বর। বৎস! এ সংসারে এরূপ ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধি নাই, এরূপ পাপ নাই, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তোমার সংশোধন কামনা করি, দণ্ডবিধান কাঙ্ক্ষা করিও না।

নরেন্দ্র। স্বামিন্! আমি দয়ার উপযুক্ত নহি; যে পাপিষ্ঠ হেমলতার জ্ঞান পবিত্র-পুণ্ডরীর অপকার কামনা করে, তাহার ইহ-জীবনে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র, তুমি আপনাকে যতদূর পাপী বিবেচনা করিতেছ, ততদূর পাপী মহ। আমার নিকট কিছুই অসম্ভব নাই। তুমি হেমলতাকে পাইবার মানস কর নাই, জীবনে আর একবার তাহাকে দেখিবে, এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছিলে,

সেই যাকসেই বোকাগের আদিরাহিলে। কিন্তু তুমি বালাক, জান না, হেমলতাকে আর একবার দেখিলে তাহার সর্বনাশ সাধন হইবে।

নরেন্দ্র। প্রভো! আপনি বাহা আদেশ করিলেন, বথার্থ, হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাহার শরীরের একটি কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য আমি জীবন দিতে পারি, ভাগবান্ অস্ত্রধারী, তিনি তাহা আনেন।

শৈলেশ্বর। তবে তাহার হৃদয়ে যে কণ্টকটি তুমিই স্থাপন করিয়াছ, সেটি তুলিতে যত্নবান্ হও না কেন?

নরেন্দ্র। কিরূপে? আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। বালাকাবাবি তুমি তাহার হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ কণ্টক রোপণ করিয়াছ, সেটি তুমি উৎপাটন কর, না হইলে তাহা উৎপাটিত হইবে না, হেমলতা জীবন্ত তা থাকিবে। হেমলতা এক্ষণে সচ্চরিত্র ধর্ম-পরায়ণ স্বামী পাইয়াছে, সংসারকার্যে ব্রতী হইয়াছে, কেবল সময়ে সময়ে তোমার চিন্তা তাহার মনে উদয় হয়, কেবল সেই সময়ে স্বামীর প্রতি হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতিনী হয়। সেই চিন্তা তুমি দূর কর।

নরেন্দ্র। কিরূপে দূর করিব? আপনি বলিতেছেন, তাহার সহিত দেখা করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে।

শৈলেশ্বর। উপায় আছে। হেমলতার সহিত একেবারে চিরজন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটান আবশ্যক। নরেন্দ্র, তুমি যদি বথার্থ হেমলতাকে ভালবাস, যদি বথার্থ তাহার কণ্টকোদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে সম্মত থাক, তবে বোগী হইয়া নারী-সংসর্গ ত্যাগ কর, কিংবা মুসলমান হইয়া মুসলমানকন্যা বিবাহ কর। হেম বখন শুনিবে যে, নরেন্দ্র আমার

বালাকাগের ভাণ্ডালা তুমিরা যোগী হইয়াছে, অথবা বিবাহী হইয়া অস্ত্র ছোকে গ্রহণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার হৃদয় জন্মে পরিত্রস্ত হইবে। বালাক-হৃদয় গতায়ত শুক কাঠে জড়াইয়া থাকে না। যে আমাকে একেবারে বিব্রত হইয়াছে, বাহার অস্ত্র আশা, অস্ত্র প্রেম, অস্ত্র উদ্বেগ, অস্ত্র চিন্তা, তাহার প্রতি আত্মরক্তি কখনও চিরকাল থাকে না। নরেন্দ্র। তোমার বিষম পাপের এই বিষম প্রারম্ভিত।

নরেন্দ্র। ভগবান্ জানেন, আমি তাহার জন্য অনেক ক্রেশ স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা অসম্ভব। আমি! ঐ ঐযথ অতিশয় ভিত্ত, অস্ত্র ঐযথের ব্যবস্থা করুন।

শৈলেশ্বর। উৎকট রোগে উৎকট ঐযথ আবশ্যক।

নরেন্দ্র। আমি! আপনি পরম ধার্মিক। শৈব হইয়া আমাকে মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিবার আদেশ করিতেছেন?

শৈলেশ্বর। পাপের জন্য মহত্ব গোজন্ম পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়, কেবল জাতিনাশে ভীত হইতেছ?

তুমি জনে অনেককণ নিস্তর হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ হস্তে গণ্ডল স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিকুলিদের দিকে চাহিয়া একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শৈলেশ্বর সেই পরীক্ষণসময়ে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনেককণ পর শৈলেশ্বর গভীরস্বরে বলিলেন, "নরেন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর?"

নরেন্দ্র। আমার ধর্ম গ্রহণ করুন, আর কি প্রমাণ দিব?

শৈলেশ্বর। তবে একটি কথা শুন।

গ্রেব নারীর একমাত্র অবলম্বন, গ্রেব নারীর জীবন, পুরুষের তাহা নহে। পুরুষের অনেক জ্ঞান, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক বহু উদ্বেগ আছে। তুমি যুবক, সাহসী, অজ্ঞানী, এ প্রশস্ত জগতে কি আপন অগ্নি স্ফূর্ত করিয়া আপনার বশের পথ পরিষ্কার করিতে পার না? স্রোতের বড় কি কেবল ক্রন্দন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চাও? তুমিরাহি, তোমাদের বহুদেহ বীরশূত্র—বংশশূত্র। বাও, নরেন্দ্রনাথ! সেই দূর বহুদেশে বংশ-শূত্র স্থাপন কর, বাও, দেশের গৌরব-সাধন কর, সিংহবীর্ষ্য প্রকাশ করিয়া আপন কীৰ্ত্তি স্থাপন কর, এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর। আকাশে এরূপ দেবতা নাই, বিনি এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার সহায়তা না করিবেন; স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর, স্বয়ং শূলপাণি মহাবেব তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

শৈলেশ্বর নিতরু হইলেন। নরেন্দ্রের নয়নস্বর জ্বলিতে লাগিল, তিনি একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ণ শৈবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্বে একদিন এই শৈবকে বেরূপ যুদ্ধনিপুণ দেখিয়াছিলেন, অন্য মানব-হৃদয়-জ্ঞানে তাঁহাকে সেইরূপ নিপুণ দেখিলেন।

শৈব আবার বলিতে লাগিলেন, “নরেন্দ্র! এই ঘোর রক্তনীতে তুমি বিদেশে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছ।” কি অজ্ঞ? দেশের হিতসাধনের অজ্ঞ আসিয়াছ? কোন্ বীর-ব্রতে ব্রতী হইয়া আসিয়াছ? কোন্ দেবোচিত মহত্বকেন্দ্র-সাধনার্থ আসিয়াছ? দিক্ নরেন্দ্র! তোমার জ্ঞান বীরপুরুষ একটি বালিকার নৃ দেখিবার অজ্ঞ জীবনের বহৎ

উদ্বেগ ভুলিয়া থাকে? প্রেমচিন্তা দূর কর, অথবা যদি প্রেম বিনা জীবন স্তব্ধ বোধ হই, তবে বীরোচিত প্রণয়ে-বদ্ধ হও। পুরুষ-সিংহ! সিংহী গ্রহণ কর।”

নরেন্দ্র। ভগবন্! আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। এ জগৎ অহুসঙ্কান কর।

পীড়ার সময় সাবিত্রীর জ্ঞান তোমার সেবা করিবে, বিপদের সময় নৃমুণ্ডমালিনীর জ্ঞান তোমার পার্শ্বে অসিহস্তে দাঁড়াইবে, কৃশলের সময় বিমল প্রণয়দানে তোমার কৃষ্ণ তৃপ্ত করিবে, যুদ্ধের সময় বংশাঙ্গী তোমার শরীর কটকিত করিবে, এরূপ ব্রহ্মী যদি পাও, তাহাকে গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। এরূপ নারী কি জগতে আছে?

শৈলেশ্বর। স্বয়ং দেখিতে পাইবে।

নরেন্দ্র! আমার যোগফল মিথ্যা? হ, এরূপ নারী না থাকিলে আমি বুঝা তোমার এই গহ্বরে আস্থান করি নাই। আ একটি কথা শুন। বে নারীর কথা আমি বা তিহি, সে হেমলতা অপেক্ষা তোমাকে তা পাসে, এ নারীকে তুমি পূর্বে দেখিয়াছ।

নরেন্দ্র। স্বরণ নাই।

শৈলেশ্বর। অস্ত্র স্বপ্নে দেখিবে। আমি চগিলাম, এই কলসে বে মন্দির আছে, তাহা পান করিয়া আজ এই গহ্বরে শয়ন কর। এই নির্দোষপ্রায় অগ্নির দিকে দেখ, বখন শৈব অগ্নিকণা সমস্ত উত্ত হইয়া বাইবে, তখন সেই স্বপ্ন দেখিবে। বে নারীকে দেখিবে, সে এই জগতের মধ্যে তোমার প্রেমা-কাজিগী, তোমার জ্ঞান অভিমানিনী। বীর-পুরুষ! সেই উপযুক্ত বীরনারী।

নরেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কথার বিস্মিত হইলাম।

শৈলেশ্বর। আর একটি কথা আছে, এটি মন দিয়া শুন। এই স্বপ্ন দেখিরা কাল

প্রাতে তুমি এই গল্পের হইতে বাহিরে বাইও।
তিন দিন তোমাকে সময় দিলাম, অপহৃষ্টা
নারীকে বিবাহ করিবে কি না, তিন দিনের
মধ্যে স্থির করিবে। যদি সম্মত হও, তবে
তিন দিন পরে বেঁটচন্দ্রেরেখা ললাটে ধারণ
করিয়া অমাবস্তার সারাকালে আমার সহিত
এই গল্পেরে সাক্ষাৎ করিও, কিন্তু সে কত
পাইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিব, যদি এ
বিবাহে সম্মত না হও, তবে রক্তচন্দ্রেরেখা
ললাটে ধারণ করিয়া ঐ অমাবস্তার সারং-
কালে এই স্থানে আমার সঙ্গিত সাক্ষাৎ
করিও, তোমার পাণের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান
করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুত হও, নচেৎ কালী
তোমাকে স্বপ্ন দিবেন না।

নরেন্দ্র। প্রতিশ্রুত হইলাম, তিন দিন
পর অমাবস্তার সন্ধ্যার আপনার সহিত এই
গল্পেরে সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে যে প্রকার
অস্বাভাবিক করিতে বলেন, করিতে প্রস্তুত
আছি।

শৈলেশ্বর। তুমি বীর-পুরুষ, তোমার
কথাই অস্বাভাবিক। রজনী তিন প্রহর হই-
য়াছে, আমি বিদায় হইলাম।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাণী হস্তে।

Who is this maid ? What means her lay ?
Scott.

নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার
গল্পেরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, বালা-
কালের ভালবাসা, যৌবনের প্রেম সহসা উৎ-
পাটিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একান্ত
অনেকক্ষণ সেই গল্পেরে পদচারণ করিতে
লাগিলেন, কি ভীষণ চিত্তের তাহার স্বর

উৎকীর্ণ হইতেছিল, তাহা আশ্রয়-অনুভব
করিতে সাহস করি না।

অনেকক্ষণ পর অরি নির্ঝাঁপপ্রায় দেখিয়া
তিনি শৈবের আবেশ স্বরণ করিলেন,
কলসে যে খদিয়া ছিল, সমস্ত পান করিলেন।
মত্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অরির একপার্শ্বে
নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অরি দেখিতে লাগিলেন।
এক একবার কাষ্ঠের এক অংশ প্রসীপ্ত হয়,
আবার নির্ঝাঁপিত হয়, এক একটি ক্ষুণ্ণ
দেখা যায়, আবার অন্ধার হইয়া যায়। দেখিতে
দেখিতে অসংখ্য অন্ধারগুলি প্রায় সমস্ত নির্ঝাঁ-
পিত হইল, হঠাৎ আলোকে সেই শিলা-
গুহের শিলাভিত্তি আরও অপূর্ণ দেখাইতে
লাগিল। নরেন্দ্রনাথ সেই ভিত্তির উপর
আলোক ও ছায়ার নৃত্যে বেন অস্বাভাবিক
জীবের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন, কালীর
নরনর বেন ধক্ ধক্ করিয়া জলিতে লাগিল,
কালীর হস্তের ঝড় বেন নরেন্দ্রের দিকে
প্রসারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র উত্তীয়ার
চোঁটা করিলেন, উত্তীয়ার শক্তি নাই। জাগ্রত
না হুণ্ড ?

অচিরেই শব্দ অগ্রিকণা নির্ঝাঁপ হইল।
নরেন্দ্র তাহা দেখিতেছিলেন না, তিনি স্বপ্ন
দেখিতেছিলেন। একজন দূরস্থ জলের শব্দ
বাহা শুনা যাঁইতেছিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল
বেন, তাহা সহসা পরিবর্তিত হইয়া স্বর্গীয়
সঙ্গীতধ্বনি হইল। গভীর অন্ধকারে বেন
ক্রমে আলোককণ্টিকা বিকীর্ণ হইতে লাগিল।
যে স্থানে গল্পেরে গতি ছিল, তাহার বেন
একটি প্রস্তর সহসা সরিয়া যাঁইল, তাহার
ভিতর হইতে অপূর্ণ সঙ্গীতধ্বনি, অপূর্ণ
চান্দ-আলোকের স্তার আলোক বাহির
হইতে লাগিল। ক্রমে বেন চন্দ্রের উপর
হইতে মেঘ সরিয়া গেল, সে আলোকস্থান

সম্পূর্ণ হৃদয় হইল। এ কি অল্প মা যথার্থ? স্বর্গীয় রূপরাশি-বিকুরিত। একটি ঘোড়ার বোঝাতে উপবেশন করিয়া অপূর্ণ বাচ্চ করিতেছে। নরেন্দ্র দ্বন্দ্বের ভিত্তিত হইয়া সেই অপূর্ণ স্বর দেখিতে লাগিলেন।

কি অপূর্ণ সৌন্দর্য, কি উজ্জল নয়ন, কি কক কেশপাশ, কি কীর্ণ অঙ্গ! এ কি মানবী? নরেন্দ্রনাথ, ভাল করিয়া দেখ, এ স্বয়ম্ভুগ, এ চাকনয়ন, ও ওঠ কি তুমি কখনও দেখ নাই? সুদূরপ্রসার সজীভের জার বৃত্তিভক্তি নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে আগরিত হইতে লাগিল। কানীর হৃদ, দিল্লী, দিল্লীতে একজন মুসলমান-নারী,— উঃ! এ সেই জেলেখা।

নরেন্দ্রের চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। সহসা সপ্তস্বরসম্বিত অমরাকর্ষণিনিসৃত অপূর্ণ গীত সেই পর্তকন্দর আমোদিত করিল; নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিল। জেলেখা সেই বোণার সঙ্গে সঙ্গে গান সংযোজন করিয়াছে। আহা! কি মধুর, কি স্বদয়গ্রাহী, কি ভাবপরিপূর্ণ! নরেন্দ্র এক-দৃষ্টিতে জেলেখার দিকে চাহিয়া রহিলেন, গাইতে গাইতে জেলেখার কণ্ঠ একবার রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া দুই এক বিক্ষুব্ধ জল গওহল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

গীত।

“নারীর ধর্ম কি? সত্য কি সাধিতে পারে? আজীবন প্রেমবারিদানে পতির প্রেমভূকা নিবারণ করিতে পারে। সম্পদ-কালে প্রেমালোক আলিয়া লক্ষীরূপিণী পতির আনন্দবর্ধন করিতে পারে। রূপের মাঝে বীর্ধ্যবতী প্রদীপ্ত আশা-রূপিণী হইয়া পতির হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ করিতে পারে। দুঃখ-অন্ধকারে জীবনের আশা-

প্রদীপ একে একে নির্ঝাঁপ হইয়া গেলে সমুদ্রখে হুংখিনী হইয়া স্বামীর রেন্ধবিমো-চন করিতে পারে। জীব-আকাশ হইতে জীবতারা যখন খসিয়া যায়, পতিব্রতা নারী উল্লাসে প্রিয়ের পার্শ্বে সহস্রতা হইতে পারে।”

এই মধুর স্বন্দর গান সমাপ্ত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠস্থলে তখনও সেই সঙ্গীত শেষ হইল না। এক একবার মধুর বীরশব্দে, এক একবার বজ্রনাগে তাঁহার কণ্ঠে সে গান এখনও শব্দিত হইতে লাগিল। জেলেখা মানবী কি পরী-কন্ডা? হউক, নরেন্দ্র তাহার মুখমণ্ডল বার বার পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যে পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখন জেলেখা তাহা অপেক্ষা উজ্জলতর সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে। তথাপি শোকের পাণ্ডুবর্ণ ললাটে ভক্ত রহিয়াছে, বাহ ও অঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত কীর্ণ, নয়নদ্বয়ে যেন দুঃখ নিবাস করিতেছে! নরেন্দ্র আর দেখিবার সময় পাইলেন না, আবার অপূর্ণ সঙ্গীতধ্বনি পর্তকন্দর কাঁপাইতে লাগিল, আবার দুঃখের গানে নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত ও দ্রবীভূত হইল।

গীত।

“পতির নিকট পতিব্রতা নারী কি ভিক্ষা চাহে? প্রেমভিক্ষা ভিন্ন এ জগতে দাসীর আর কি ভিক্ষা আছে? প্রেমভক্তিকার বেশে তোমার পদযুগল ধরিয়াছে, বেহকণা দিয়া সজীব করিও, যেন ধরদীপনা লুটায়। জাতি, বন্ধু, দেশ ঘূরে রাখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, যেন তোমার স্নেহে স্থখিনী হয়, তোমার দুঃখে হুংখিনী হয়, তোমার পদদ্বারা যেন পায়। যত দিন প্রাণ থাকে, ইহা ভিন্ন অন্য ভিক্ষা নাই,

আয়ুশের হইলে পতির চরণ ধরিয়া, পতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা ভিন্ন সতীর আর কি ভিক্ষা আছে ?”

গান সমাপ্ত হইল । নরনকলে সে পাণ্ডু বদনখানি ও উরঃস্থল ঘোত হইয়া গেল । ধীরে ধীরে মেঘচ্ছায়ার সেন স্বৰ্য্যকান্তি আচ্ছন্ন হইল, আলোকবার ক্রমে রুদ্ধ হইল, সে স্বর্গীয় মৃষ্টি ঢাকিয়া গেল, গভীর অন্ধকারে বীণাধিনি খামিয়া গেল, পূৰ্ব্বজন্ম দূরস্থ জন্ম-শব্দ ভিন্ন নরেন্দ্র আর কিছু শুনিতে পাইলেন না । নরেন্দ্র গাঢ় নিদ্রার অভিভূত হইলেন, আর কি স্বপ্ন দেখিলেন, প্রান্তে তাহা যেন রহিল না । নিদ্রাস্তে নরেন্দ্র গাত্রোখান করিলেন । তাঁহার মত্ততা আর নাই, গহ্বর হইতে খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন । দেখিলেন, নবজাত স্বর্ঘ্যরশ্মিতে বৃক্ষলতা ও দূর্ঝাঙ্গল ত্রিকম্বিক করিতেছে, ডালে ডালে পক্ষিগণ গান করিতেছে, দূরে একনিদের প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত মন্দির স্বর্ঘ্য-কিরণে বড় শোভা পাইতেছে । মন্দির লোকসমাকীর্ণ আর চতুর্দিকে বহুদূরে পৰ্ব্বতের উপর পৰ্ব্বত স্বর্ঘ্যরশ্মিতে স্তম্বর দেখা বাইতেছে ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

খড়্গহস্তে ।

A naked dirk gleamed in her hand.

Scott.

সেই তিন দিন নরেন্দ্রনাথ কি চিন্তা-জালে বেষ্টিত ও ব্যথিত হইয়া ছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না । শত চিন্তা নরেন্দ্র-

নাথক শত বৃত্তিক-বন্দনাপেকা অধিক রূপে দিতে লাগিল ।

সেই পৰ্ব্বত-পঙ্কজে শৈলেশ্বর যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল না । শ্রীশচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছে, তাহা নরেন্দ্র অনেক দিন হইল শুনিয়াছেন । হেমলতা পরের গৃহিণী, তাহার চিন্তা, তাহার প্রতি ভালবাসা কি উচিত কার্য্য ? নরেন্দ্রনাথ, এই কি ধীরের উপযুক্ত কার্য্য ? শৈবের উন্নত আদেশ গ্রহণ কর, প্রেবচিন্তা উৎপাটন কর, বশের পথ পরিষ্কার কর, দেশের গৌরব-সাধন কর, ইহা অপেক্ষা ধীরের উপযুক্ত কার্য্য আর কি আছে ? নরেন্দ্র স্থির করিলেন, শৈবের আদেশ শিরোধার্য্য ।

আবার সেই গন্ধাতীয়ে বিলায়ের কালে নরেন্দ্রের আলোকে যে পাণ্ডুবর্ণ শুক মুখখানি দেখিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই ছুঃখিনী হেমলতার কথা মনে পড়িল । নরেন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল । সেই হেম বাল্যকালে নরেন্দ্রের সহিত খেলা করিয়াছে, যে দিন নরেন্দ্র গৃহত্যাগী হয়, সেই দিন হেম যেন আপন জীবনকে বিলায় দিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রের মনে পড়িল । বাল্যকালে হেম নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না, যৌবনের প্রারম্ভে প্রাতঃসন্ধ্যা নরেন্দ্রের মুখ দেখিলে যেন হেম উবেগশূন্য ও শান্ত হইত । বাল্যকালের সহস্র কথা অজস্র বারিভরনের দ্বার নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত করিতে লাগিল, নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একাকী মন্দিরপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন ।

আবার চিন্তা আনিতে লাগিল । নরেন্দ্র-

হের দেশ নাই, দুঃখ নাই, বন্ধু নাই, পরিজন নাই, নরেন্দ্র একাকী দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেবল হেমের চিত্তাধরণ লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসার-সমুদ্রে বিচরণ করিতেছেন। নিদারুণ শৈব! অভাগার একমাত্র সুখচিন্তা, একমাত্র সুখস্বপ্ন হ্র করিও না, এ নিদারুণ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্রেশ সহ করিয়াছে, আরও যে ক্রেশ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্রেশ সহ করিয়াছে, আরও যে ক্রেশ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্রেশ সহ করিতে প্রস্তুত আছে। নরেন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিবে, বীরমর্যাদা ত্যাগ করিবে, অরুণ ভোগ করিতে সক্ষম আছে, জগতের নিন্দাতার বহন করিতে সক্ষম আছে অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সিংহ-ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সহিত ঘোর অরণ্যে জীবন অভিবাহিত করিতে সক্ষম আছে। শৈলেশ্বর। আদেশ কর, ইহাতে যদি পাণের প্রায়শ্চিত্ত হয়, নরেন্দ্র আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে, ইহাতে যদি নরেন্দ্র মুহুর্তের জন্ত সকাচ করে, করালবননার সমুখে তাহার যন্ত্রকাজে দন করিও। কিন্তু বাল্যকাল অবধি যে চিন্তা অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র জীবনধারণ করিতেছে, যে আলোকজ্ঞানরূপ চিন্তার জ্যোতিতে নরেন্দ্র দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে, নিদারুণ শৈব! সে চিন্তা হ্র করিতে বলিও না। এখন হেম পরের গৃহিণী, তথাপি নরেন্দ্রের ভালবাসা বিশ্বস্ত হয় নাই, নরেন্দ্র তাহার চিন্তা ত্যাগ করিবে? নরেন্দ্র মুসলমান হইয়া ববনীকে বিবাহ করিবে? হেম তাহা শুনিবে? সে ভাবনা অসহ্য। প্রবঞ্চক শৈব! হিন্দু-পুত্রোহিত হইয়া তুমি ববনীর পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দাও? বিধি! কপটালারিন! হ্র হও।

আবার শৈলেশ্বরের গভীর আদেশ বনে

পড়িল। “হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আবার ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ঘোর পাণে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর।” শৈব কি মিথ্যাবাদী? পরনারী-চিন্তা কি পাপ নহে? নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আপনি পাণে লিপ্ত হইতেছ, শৈব তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, তাহার নিন্দা করিও না। নরেন্দ্রনাথ তাবিয়া তাবিয়া সে দিন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিন দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিবস রজনীতে নির্দিষ্ট। সময়ের দুই দণ্ড পূর্বে নরেন্দ্রনাথ-গৃহবরমুখে একাকী দণ্ডারমান রহিয়াছেন, এক একবার এদিক ওদিক নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছেন, এক একবার অন্ধকার আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিতেছেন, আবার গৃহবরমুখে আসিয়া দণ্ডারমান হইতেছেন। হস্তে নিকোবিত অসি, আকৃতি স্থির ও গভীর।

কণেক পর শৈলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নরেন্দ্রকে আশীর্বাদ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ গোহার্মীকে প্রণাম করিতে বিশ্বস্ত হইলেন।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছ?”

গভীর ও ঈষৎ কক্‌শব্দে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “হইয়াছি।” উভয়ে গৃহঘরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহঘরে পূর্বদিনের জ্বর অতি উজ্জল আলোক জলিতেছিল, সেই আলোকজটায় শৈলেশ্বর যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমকিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের লগাট, গুণ্ডুল, ক্ষুদ্র, বাহ ও বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনে একেবারে স্নানিত রহিয়াছে।

শৈলেশ্বর। রাশি! পরসী-আকাজা
ভাগ করিতে পারিলে না?

নরেন্দ্র। পরসী আকাজা রাশি না।

শৈলেশ্বর। হেমলতাকে এ জীবনে
ভাগ দেখিতে চাহ না?

নরেন্দ্র। তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত
আছি।

শৈলেশ্বর। তবে ববনীকে বিবাহ
করিতে স্বীকৃত আছি?

নরেন্দ্র। এ জীবনে নহে।

শৈলেশ্বর অগত্যা নিতান্ত হইয়া রহি-
লেন; আবার বলিলেন, “তবে প্রতিজ্ঞা-
পালনে প্রস্তুত হও। খড়্গ ভাগ কর,
কালীর সম্মুখে জীবনদানে প্রস্তুত হও।”

নরেন্দ্র। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করি-
রাছি, তাহা পালন করিয়াছি। আগনার
সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম।

শৈলেশ্বর। হু! সিংহের গৃহস্থে
আসিয়াও জীবনের প্রত্যাশা আছে? এ
স্থলে কে তোমার সহায় হইবে?

নরেন্দ্র। এই অসি আমার সহায়।

শৈলেশ্বর নিঃশব্দে গৃহস্থের এক স্থান
হইতে আপন অসি বাহির করিলেন।
উদয়পুরে একবার বেঙ্গল যুদ্ধ হইয়াছিল,
অতঃপরে দুই জনে সেইরূপ অসি ও ঢাল
লইয়া যুদ্ধ হইল। নরেন্দ্র সে দিন অপেক্ষা
অধিক সাবধানে অধিক যত্নে যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন, কিন্তু সে যত্ন বৃথা। সিংহবীর্ষ্য
শৈব অল্পকণমধ্যেই নরেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া
তাঁহার অসি কাড়িয়া লইলেন।

শৈলেশ্বর। কেবল পূজা-বাবসারে এই
কেশ স্তব্ধ হয় নাই। রাজস্থান-ভূমি বীর-
প্রসবিনী, যুদ্ধকালে শৈব-গোবামিগণও বীর্ষ্য-
প্রকাশে রাজস্থানে অগ্রগণ্য। বালক! তোমার
সহিত যুদ্ধ করিলাম, এই আমার কলঙ্ক রহিল।

নরেন্দ্র। আমি তাহার কলঙ্ক প্রত্যক্ষ
আছি, তোমার বাহা ইচ্ছা, বাহা দাবী,
কর।

শৈলেশ্বর একপাশি রক্ষা বাহির করি-
লেন, নরেন্দ্রের দুই হস্ত সেই রক্ষা দ্বারা
সম্মোহে বদ্ধ করিলেন। একশ জোরে
বাধিলেন যে, হস্তের শিরা স্তীত হইয়া উঠিল।
নরেন্দ্র শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেন না। পরে
পূর্বের ভাষা কলস লইয়া নরেন্দ্রের মূখের
নিকট ধরিয়া মস্তপান করিতে বলিলেন,
নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। গোবামী গহ্বর
হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

মস্তভাহেতু নরেন্দ্র অতিরিক্ত ভূমিতে
নিপতিত হইলেন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে
লাগিলেন, গহ্বর-পার্শ্বে দুই জন বেন ধীরে
ধীরে কথা কহিতেছে, এইরূপ তাঁহার বোধ
হইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র
মদিরা-প্রভাবে নিজের অতিকৃত হইলেন,
পরে কি হইল, স্মরণ রহিল না।

কিন্তু সে নিজা গভীর নহে। নরেন্দ্র
সমস্ত রজনী যত্ন দেখিতে লাগিলেন, কখন
যত্ন দেখেন, কখন অর্ধেক জাগ্রত হইয়া
থাকেন। কখন যত্ন দেখেন, কখন জাগ্রত
থাকেন, মস্তভাযুক্ত কিছুই হির করিতে
পারিলেন না।

অনেককণ পরে বোধ হইল যেন, পূর্বের
একদিনের ভাষা আবার অন্ধকার হইতে
আলোকছটা প্রকাশ হইতে লাগিল, আবার
যেন প্রত্যক্ষ স্মৃতি সরিয়া গেল, যেন সরিয়া
গেল যেন চক্ষুগোক প্রকাশিত হইল।
সেই আলোকে সেই উজ্জ্বল রমণী! কিন্তু
জেলখা অন্ধ গান গাইতেছে না, অতঃ
বীণাহস্তে আইসে নাই, অতঃ বীণাহস্তে।

কি ভয়ঙ্করী সৃষ্টি! নরেন্দ্র হইতে
অসি-মূলিক বাহির হইতেছে, অন্ধ রক্তবর্ণ

ডাঙের উপর কখন চাপিয়া হইয়াছে, সবল বহনমণ্ডল কোথায় রক্তবর্ণ। বাবার করে সেই শৈশবের বীৰ্য বজ্র, বাবার বকে একখানি তীর ছুরিকা। নরেন্দ্র বিন্মিত হইলেন, তাঁহার লম্বাট হইতে শ্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি উঠিবার উত্তম করিলেন, কিন্তু যথেষ্ট বিপদাপন্ন ব্যক্তির জার পলাইতে অক্ষম, উঠিতে অক্ষম।

বাবা স্থান-করে দীর্ঘ খণ্ড ধারণ করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল; একবার দণ্ডায়মান হইল, একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। হস্ত হইতে খণ্ড পড়িয়া গেল।

একবার সেই তীর ছুরিকা বাহির করিল, এবার অকম্পিত-হস্তে সে ছুরিকা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থলের উপর ধরিল। আবার কি চিন্তা আসিল, ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইল, বাবা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র চীৎকারশব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, ঘর্ষে তাঁহার লম্বা শরীর আগ্নেয় হইয়াছে, উগ্রত্বা গিয়াছে, গহ্বর অন্ধকার ও নিষ্কর। ধীরে ধীরে তিনি গহ্বরের বাহিরে আসিলেন। রক্তনৌ অবসানপ্রাপ্ত, পূর্বদিকে রক্তমাচ্ছটার আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। নির্ভাগপ্রায় প্রদীপের জ্বালা ছুই একটি তারা দেখা বাইতেছে, প্রভাতের ঐশ্বর্য বারু সেই পর্বতশ্রেণী ও শিবমন্দিরের উপর বহিয়া বাইতেছে ও নবজাত পুষ্প-পরিমল বহিয়া নিম্নোখিত জগৎকে আমোদিত করিতেছে। ছুই একটি নিকুঞ্জন হইতে ছুই একটি পক্ষী সুন্দর গীত করিতেছে।

বড় বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রামনগরের যুদ্ধ।

Like fabled goods, their mighty war
Shook realms and nations in its jur.

Scott.

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছু পর যোধ-পুরাধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহ পুনরায় সৈন্ত-সামন্ত লইয়া আরংকোটে বিক্কাচরণ-করণাভিলাষে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেই সৈন্তের সহিত রাজস্থান ত্যাগ করিলেন। যে কয়েক মাস নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে ছিলেন, তাহার মধ্যে আগ্রায় একটি রাজবিপ্লব ঘটয়াছিল। আগ্রায় একগুণে সে সম্রাট নাই, সে রাজত্ব নাই। সে বিপ্লবের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া বাইতে পারেন।

এই ভীষণ ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অবধি প্রথমে বারাণসীতে সুলতান সুল্লা ও তৎপরে উজ্জয়িনীতে যশোবন্ত সিংহ পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই শেষঘটনার বিষয় শুনিয়া সম্রাট শাজিহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও সফল নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া মোরাদ ও আরংকোবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহার ঐ নদীর অপর পাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোরাদ বেঙ্গল সাহসী, সেইরূপ যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ, তিনি নদী পার হইয়া সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৌশলগঠি আরংকোব তাহা না করিয়া দারাকে

তুলাইবার জঙ্গ শিবির সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া গোপনে সৈন্তসংহত নদীর অপর এক স্থানে পার হইলেন ও আগ্রা হইতে ৭৮ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে শ্রামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু চমক পার হইয়াছে ও আগ্রার নিকট যমুনা-তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া দারা একেবারে বিস্ময়গ্ৰস্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্ত লইয়া সেই গ্রামের নিকট যমুনাতীরে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

শ্রামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন, চারি দিবস কাল উভয় সৈন্ত উভয়ের সম্মুখীন হইয়া রহিল, পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা দিগের আবশ্যক নাই। দারার বামপার্শ্বে রাজপুত-রাজ রামসিংহ ও চম্বর-শাল বীরোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন, দারার দক্ষিণদিকে কালীউল্লা নামক মুসলমানসেনাপতি বিক্রোহী, আরং-জীবের অর্ধভুক্ত, তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন না। অবশেষে আরংজীবের জয় হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলপটু আরংজীব কালী-উল্লায় সম্মান করিলেন ও মোরাদকে ভারত-বর্ষের সম্রাট, বলিয়া তাঁহার মনঃকষ্টসাধন করিলেন।

অচিরে আরংজীব চলে, বলে, কৌশলে আগ্রা হস্তগত করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। শাজিহানের দুই কস্তার মধ্যে কনিষ্ঠা রোশন-আরা সকল বিষয়ে আরং-জীবকে সমাচার প্রদান করিয়া তাঁহার অনেক সহায়তা করিলেন। আরংজীবের জয় হওয়ার রোশন-আরার প্রভুত্ব ও

কমতার ইয়ত্তা রহিল না। শাজিহানের জ্যেষ্ঠা কস্তা জেহান-আরা রূপে, শুণে, কৌশলে কনিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠা,— সে লাষণ্যময়ী সম্রাট-পুত্রকে পাঠক একদিন বেগমমহলে দেখিয়াছেন। আরংজীবের জেহান-আরা হতমানা হইলেন, অতঃপর পিতার সেবার জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

আগ্রা হস্তগত করিয়া আরংজীব দিল্লী-যাত্রা করিলেন। পথে যমপুরাতে মোরাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মোরাদ যদিরাপানে এবং সুন্দরী গায়কী ও নর্তকীগণের সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মোরাদকে মথো করিয়া সেই জগদ্বিমোহিনীগণ চারিদিকে বেটন করিয়া বসিল, মোরাদ একেবারে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। আরংজীবের তাহাই উদ্দেশ্য, মোরাদ সেই রজনীতেই কান্নারুদ্ধ হইলেন।

তাঁহার পর? তাঁহার পর আরংজীব রাজচ্ছত্র আপন মন্তকের উপর ধারণ করিলেন। দারা শিকুনদীর দিকে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুলতান সুলতা পুনরায় সৈন্ত লইয়া যুদ্ধবেশে বহির্গত হইলেন। রাজস্থানে যশোবন্ত সিংহ পরাজয়ের অপমান এখনও বিষ্মত হন নাই। তিনিও সৈন্তে বহির্গত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

দপথে প্রতিবৃতি ।

"Tis something yet if, as she passed,
her shade is o'er the lattice cast.
"What is my life, my hope?" he said—
"Alas! transitory shade;"

Scott.

কয়েক দিবস ভ্রমণানন্তর বশোবন্ত সিংহের সেনা আগ্রা নগরে উপনীত হইল। আরংজীবের পরাক্রম অসীম, তাহার সহিত সম্মুখ করা বশোবন্ত সিংহের সাধ্য নহে, তিনি সুবোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আরংজীবের মিত্রবেশে পরমশত্রু আগ্রা নগরে প্রবেশ করিল।

যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও আগ্রা নগরের অপূর্ণ শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হইয়াছে? খেতপ্রস্তর বিনির্মিত অপূর্ণ চাক্র শিল্পখচিত, জগতে অতুল্য তাম্রমহল সন্কার নীল-গগনে একটি প্রতিকৃতির তায় বোধ হয়; তাহার চতুর্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুজবন, সুন্দর ফোঁসারা; পার্শ্বে শ্রামা যমুনা! আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ; তন্মধ্যে মন্দির-প্রস্তর-বিনির্মিত সুন্দর মতি-মসজিদ, দেওরানখাস, দেওরান আম-রংমহল, শীশমহল! আগ্রার সৌন্দর্য্য কত বর্ণনা করিব? পাঠকগণ! যদি এই অপূর্ণ নগরী না দেখিয়া থাকেন, অন্তই যাইবার উদযোগ করুন। "তিনি" ব্যয়ের ওজর করিবেন, তাহা শুনিবেন না, আপনাদিগের অন্তরোধ অলঙ্ঘনীয়, আপনাদিগের অন্তর্জলে সকল আপত্তি ভাসিয়া যাইবে।

প্রসিদ্ধ মন্দির-সিংহাসনে অজ্ঞ সত্ৰাট আরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদের খেত ভক্তসারি বড় শোভা পাইতেছে।

রক্তবর্ণ চম্ভ্রাতপ হইতে পুষ্পমাল্যের সহিত যপি-মাপিকা সুলিতেছে ও প্রাতঃকালের আলোকম্পর্শে অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমরাহ মলবদার প্রভৃতি ভারতের অগ্রগণ্য বীর, ধনী ও মাত্র লোকে অথ রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুত্রী করিয়াছে।

সেই প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত শিবির সরিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের চতুর্দিকে রোপ্য-নির্মিত স্তম্ভ বক্রমক করিতেছে। উপরের বস্ত্র উজ্জল রক্তবর্ণ, ভিতরে মসলী-পত্তনের ছিট, সেই ছিটে লতা-পুষ্প একরূপ সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে যে, শিবিরের পার্শ্বে বর্ষাৰ্ধ পুষ্প ফুটিয়াছে, দর্শকদিগের একরূপ ভ্রম হয়। ভূমিতে অপরূপ গালিচা, তাহাতেও পুষ্পগুলি একরূপ সুন্দরভাবে বুন। হইয়াছে যে, শিবির ব্যক্তি পুষ্প দলিত হইবে ভরে সহসা পদক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করেন।

তাহার বাহিরে দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত জয়পতাকা ও পুষ্পপত্র দ্বারা দুর্গ সশোভিত হইয়াছে। সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হই। বিজয়-বাণ্ডে সকলের মন উত্তেজিত করিতেছে, নবজাত স্বাধীনতাকে তাহাদের বন্দুক বক্রমক করিতেছে। দুর্গপ্রাচীরের উপর ইংরাজ করাসীস ও ওলন্দাজ সৈনিকগণ ঘন ঘন কামান ছাড়িতেছে। তাহারা বহুদূর হইতে রক্তগর্ভা ভারতবর্ষের রক্ত ফুড়াইবার জন্ত আসিয়াছে ও সম্রাটের বেতনভোগী হইয়া অজ্ঞ কামানের শব্দে সম্রাটের বিজয় প্রচার করিতেছে। দুর্গের বাহিরে নগরের পথে, ঘাটে, গৃহে, দ্বারে ও যমুনাতীরে রাশি রাশি লোক নিজ নিজ সুপরিচ্ছদে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত আগ্রানগর ও যমুনাতীর পরিপূর্ণ করিতেছে।

পুরাতন রীত্যনুসারে আরংজীব স্ববর্ণের

সহিত ওজন হইলেন, তাহার পর প্রধান ওমরাহগণ ঐক্ৰমে ওজন হইলেন, প্রত্যেক ওমরাহ, রাজা ও মন্ত্রীদের সুবর্ণ, মুক্তা ও হীরক নজর দিয়া সম্রাটের মনস্তৃষ্টি করিলেন ।

তাহার পর অগভিষোনি কঙ্কনীগণ প্রোট-বোবন-মদে উন্নত হইয়া অপূৰ্ণ সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা সভাসঙ্গগণের হৃদয় বিমোহিত করিল । কঙ্কনীগণ নর্তকী, বড় বড় ওমরাহদিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইলে তাহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে যাইত । শাজিহান তাহাদিগকে সরুদাই নিকটে রাখিতে ডাকবাসিতেন ও বেগমদিগের আলয়ে লইয়া বাইতেন । কিন্তু ইশ্রয়মুখ-পরামুখ আরংজীব তাহাদিগকে প্রায় নিকটে আসিতে দিতেন না, তবে আজি আনন্দের দিনে কঙ্কনীগণ কেন না সমাদৃত হইবে ?

তাহার পর দুর্গের পূর্বদিকে অর্থাৎ যমুনা-তীরে মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল ; প্রাসাদের উপর হইতে বেগমগণ দেখিতে পাঠিবেন, এই জন্ত এই স্থলে যুদ্ধ হইত । অবশেষে দুইটি মস্ত হস্তীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মধ্যে আন্সাজ দুই হাত উচ্চ একটি যুগ্মকার প্রাচীর, তাহার দুই দিক হইতে দুইটি মস্ত হস্তী মাহত দ্বারা পরিচালিত হইয়া রণে লিপ্ত হইল । অনেক-ক্ষণ যমুনার উভয় পার্শ্ব হইতে লোকে সবিস্ময়ে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, শুণ্ডের চপেটাঘাতে ও দস্তদ্বানিত আঘাতে হস্তিঘরের মস্তক ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইল । প্রত্যেক হস্তীর দুই জন করিয়া মাহুত ছিল ; একটি হস্তীর এক জন মাহুত পড়িয়া গেল ও সহসা হস্তী দ্বারা পদদলিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিল, অপর পক্ষের একজন মাহুতের ঐক্ৰমে জন্মের মত হাত

ডালিয়া গেল । এই হতভাগারা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াই হস্তিঘরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বহু অৰ্ঘলোভে স্বা পুত্র সকলের নিকট বিদায় লইয়া ডালিয়া-ছিল । অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটি হস্তী অস্ত্রকে পরাণ্ড করিয়, যুদ্ধিকাপ্রাচীর উন্নয়ন করিয়া পক্ষাত্তাবমান হইল । তাহাদিগকে ছাড়াইবার জন্য অনেকে চরকা প্রভৃতি আগুনের বাকী ছুড়িল, কিন্তু সজাত-ক্রোধ হস্তী তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অপর হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । অবশেষে পরাক্রান্ত হস্তী সমুদ্রগ করিয়া যমুনা পার হইয়া গেল, পশ্চিমধ্যে দুই একজন লোক বাহারা সমুদ্রে পড়িল তাহারাও নিহত হইল ।

এ সমস্ত আয়োদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যমুনাগুলিনে বাইলেন ও হৃৎ-মুখ প্রকাশন করিয়া একটি সুন্দর বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন, যে স্থানে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন, সেটি অতি মনোহর স্থান । বিশাল তমাল-বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটি পক্ষী যেন দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি যত্নসহকারে ডাকিতেছে । নিকটে বৃক্ষের এক পার্শ্বে একটি পুরাতন কবর আছে, প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অল্পখ প্রভৃতি বৃক্ষলতাাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে । কবরের একপার্শ্বে পার্শ্ব ভাষায় একটি বায়েৎ লেখা আছে, তাহার অর্থ, “এহু ! আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি ? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম । তুমি যদি হতভাগা হও, আমার জন্য এক-বিন্দু অশ্রুপর্ণ করিও ।” মন্দ মন্দ যমুনায়াই সেই নীতল স্থানকে আরও স্মৃতিতল করিতেছে, কল্লোলিনী যমুনা স্তম্ভধর কল কল শব্দে বহিয়া বাইতেছে ! নরেন্দ্রনাথ অচিরে নিদ্রাগ্রস্ত হইলেন ।

তিনি কতক্ষণ নিদ্রিত রহিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নিদ্রার একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। বোধ হইল যেন, সেই অপূর্ণ গোরস্থান হইতে মৃত মল্লভা পুনর্জীবিত হইল, সে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক। মৃত্যুর ষেতবর্ণ স্ত্রীলোকের মুখে এখনও দেদীপমান। স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, শরীর ক্ষীণ, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক। গোরস্থানে যে বায়েংটি লেখা ছিল, স্ত্রীলোক যেন সেই বায়েংটি গান করিল, সে দুঃখব্যঞ্জক গীতধ্বনিতে নরেন্দ্রের মূর্তি নেত্র হইতে এক বিন্দু জলভূতপে পতিত হইল। মুসলমানী যেন সহসা আর একটি গীত আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, সে স্বর তাঁহার অপরিচিত নহে, বোধ হইল যেন, সে স্বর সেই অভাগিনী জেলেখার কর্ণনিঃসৃত। নরেন্দ্র, ভাল করিয়া দেখে, স্বয়ং জেলেখা গোরের উপর বসিয়া এই দুঃখগান গাইতেছে।

নরেন্দ্রের স্বপ্নভঙ্গ হইল; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। স্বপ্ন অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ললাটে একটি উজ্জল তারা বড় শোভা পাইতেছে, সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বৃহগান করিতেছে, যমুনায় নীল জল অধিকতর নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র বিম্মিত হইলেন। এই জেলেখার গান তিনি নিজাবোগে ইতিপূর্বে তিন চারিবার শ্রবণ করিয়াছেন। জেলেখার প্রতি কি নরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে? নরেন্দ্র হৃদয় অহুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হৃদয় হেমলতাময়! জেলেখা কি মানবী নহে, জেলেখা কি পরী? তবে মানবের প্রেমাকাজক্ষী কেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে সেই গোরস্থান নিকট আসিলেন,

সহসা গোরের পার্শ্ব হইতে স্বয়ং জেলেখা দণ্ডায়মান হইল। তাহার ক্ষীণ শরীরে পাতুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন, যথার্থই কবর-গবরর মৃতদেহ পুনর্জীবিত হইল। বদন পাতুবর্ণ বটে, কিন্তু নয়ন হইতে পূর্ববৎ তীব্র-জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তীব্র-জ্যোতিঃ নারী বামা সরোষে অধর দংশন করিয়া নরেন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে, বক্ষঃস্থলে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। এই নারী কি দুঃখগান গাইয়াছিল? বোধ হয়, না।

জেলেখা নরেন্দ্রকে আসিতে ইচ্ছিত করিয়া আপনি অগ্রে চলিল, অনেক দূর যাইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজ-প্রাসাদের একটি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ইতিকর্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, এক্ষণে গৃহের ভিতর অন্ধকারে রমণীর সহিত যাইতে সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন, “তুমি কে জানি না, আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার অমুমতি পাই নাই।”

জেলেখা। প্রাসাদে যাইবার আমার অধিকার না থাকিলে তোমাকে আসিতে বলিতাম না।

নরেন্দ্র। তথাপি তুমি কে জানি না, অজ্ঞাত স্থানে যাইব না।

জেলেখা কর্ণধ্বরে বলিল, “মৃত্যুর করিতেছ? তোমাকে হনন করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তাতারদেশীয়া, আমি এই ছুরিকা এতক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম না? কিন্তু এই লও, ছুরিকা ত্যাগ করিলাম, রক্তহস্ত স্ত্রীলোকের সহিত যাইতে বোধ হয়, বীরপুরুষের কোন আপত্তি নাই।”

জেলেখার বিকট হাস্যধ্বনিতে নরেন্দ্রের

মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিঃশব্দে জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কণেক যাইলে পর জেলেখা এক স্থানে তাহা পরিধান করিতে কহিল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন, তাহা তাতারদেশীয় রমণীর পরিচ্ছদ। বিস্মিত হইয়া আবার জেলেখার দিকে চাহিলেন। জেলেখা এবার গম্ভীরস্বরে বলিল, “বিলম্ব করিও না, আমরা যে দ্বার দিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে সে দ্বার বন্ধ হইয়াছে, চারিদিকে খোজাগণ নিক্ষেপিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ বেগমদিগের প্রাসাদ, তুমি পুরুষ জানিলে এইক্ষণেই তোমার প্রাণবিমাশ করিবে।”

নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, জেলেখার কথা সত্য। অগত্যা নরেন্দ্র কাঁচলি ও ঘাগরা পরিলেন, জেলেখা হাসিতে হাসিতে তাহাকে পরচুলী পরাইয়া দিয়া মস্তকের উপর খোঁপা করিয়া দিল। নরেন্দ্র এই অদ্ভুত বেশে জেলেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরে চলিলেন।

নরেন্দ্র জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; কত গৃহ ও পথ অভিবাহিত করিলেন, তাহা গণনা করা যায় না। ঘারে ঘারে অসি-হস্তে খোজাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও শত শত পরিচারিকা এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। জেলেখাকে দেখিয়া সকলেই দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নরেন্দ্রনাথ বেগমদিগের মহলের অভ্যন্তরে বসত যাইতে লাগিলেন, ততই বিস্মিত হইলেন, “ঐশ্বর্য্য, শিল্পকার্য্য ও বিলাসপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্বেতমর্দরপ্রস্তর-বিনির্মিত কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ, কত সুন্দর স্তম্ভসারি, কত উন্নত ছাদ, তাহা গণনা করা যায় না। সেই প্রস্তরে

কি অশূর্য্য শিল্পকার্য্য! দেয়ালে, স্তম্ভে, প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর শ্বেতপ্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র, বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে, যেন সুন্দর শ্বেত দেয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্প লম্বিত রহিয়াছে অথবা উজ্জ্বল সুবর্ণ-মণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। শ্বেত-প্রস্তরবিনির্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোরারা, সুন্দর পুষ্পাধার; তাহার উপর মনোহর সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আলোকিত করিতেছে। শ্বেত, পীত, নীলবর্ণের আলোক সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহিরে দেখা যাইতেছে। জগতে অতুল্য রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠ ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্পচয়ন করিয়া কেশ ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজ আনন্দের দিন, রাজপ্রাসাদ আনন্দে ও নৃত্য-গীতে পরিপূর্ণ।

এই দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র যে স্থানে স্বয়ং আরঞ্জীব ছিলেন, তথায় বাইরা উপনীত হইলেন; দেখিলেন, সাম্রাট্ আরঞ্জীব বেগমদিগের সহিত পচিশী খেলিতেছেন। পচিশীর ঘর শ্বেতপ্রস্তরবিনির্মিত ও প্রকাণ্ড এক একটি রূপবতী কামিনী এক একটি ঘুঁটা। ঘুঁটা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হওয়া আবশ্যক, এই জন্ম কামিনীগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন।

তথা হইতে নরেন্দ্র জেলেখার সঙ্গে একটি মর্দর-প্রস্তরবিনির্মিত ঘরে প্রবেশ করিলেন। মর্দরপ্রস্তরবিনির্মিত স্তম্ভসারি সাটিন ও মকমলে বিভূষিত এবং নানা বর্ণের গন্ধদীপ আলোক ও গন্ধদানে ঘর আয়োজিত করিতেছে। ভিতরে তিন

চারি জন বেগম বাজ ও শীত করিতেছে, সপ্তস্বর-মিলিত সেই শীতধ্বনি উন্নত ছাদ উন্নত করিয়া যমুনাতীরে ও নৈশ গগনে প্রধাবিত হইতেছে।

সে গৃহ হইতে কিছু দূরে যমুনানদীর দিকে একটি খেতপ্রস্তরনির্মিত বারান্দার সুন্দর চক্রালোক পতিত হইরাছে। এ স্থানটি নিস্তর ও রমণীয়। উপরে আকাশ নীলবর্ণ, দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, শারদীয় চন্দ্র সুধাবর্ণ করিয়া গগনকে শোভিত ও জগৎকেতুপ্ত করিতেছে। নীচে নীলবর্ণ যমুনানদী কল কল শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। তাহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষের উপর দুই একখানি ক্ষুদ্র শোভা সমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দর তাজমহল চন্দ্রকরে অধিকতর সুন্দর দেখা যাইতেছে। বারান্দা জন-শূন্য, কেবল একজন রাজদাসী বীণা-হস্তে গান করিতেছিল, এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া বারান্দার খেত প্রস্তরে মন্তক রাখিয়া বোধ হয় সুখের বা দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছে। যমুনার বায়ু রমণীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল কেশপাশ লইয়া জীড়া করিতেছে অথবা সে বীণার উপর কখন কখন সুখের গান করিতেছে। বারান্দার দণ্ডায়মান হইয়া ও যমুনার সুন্দর গান ও শীতলবায়ু ভোগ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে নব নব ভাব উদ্ভিত হইতে লাগিল। এই-রূপ নিস্তর রজনীতে এইরূপ নদীতীরে নরেন্দ্র দূরবদলে হেমকে শেষবার দেখিয়া ছিলেন। আহা! সে সুন্দর মুখখানি চন্দ্র হইতেও সুধাপূর্ণ ও জ্যোতির্ময়। মুহূর্ত্তের জন্য নরেন্দ্রের হৃদয় হেমলভাপূর্ণ হইল, নরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া অন্তরিকে বাইলেন।

যে দিকে বাইলেন, সে দিক হইতে

লোকের কলরব শুনিতে পাইলেন। প্রাসাদের মধ্যে এই কলরব শুনিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন এবং ঔৎসুক্যের সহিত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। বত নিকটে আসিলেন, ততই নারীকর্ণ-নিঃসৃত সুমধুর কথা ও হাস্যধ্বনি আবার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই দিকে যাইয়া অবশেষে একটি জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটি অতি বিস্তার প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণে বত সুন্দর পুষ্পচারা ও পুষ্পলতিকা, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুর্দিক হৃদয়প্রীতি হইতে পুষ্পমালা ছলিতেছে, বৃক্ষলতার পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে শুপাংকার পুষ্প রহিয়াছে, চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প বিকীরণ রহিয়াছে। সুন্দর ফোয়ারা যেন দ্রব রৌপ্য-সুস্ত নৈশ আকাশে উত্তোলন করিয়া আবার মুক্তারূপে চারিদিকে বিকীরিত-তেছে। ঘোপে, বৃক্ষের শাখা, সম্মুখে, পার্শ্বে, উচ্চে, নীচে নানাবর্ণের সুগন্ধ দীপাবলী জ্বলিতেছে, যে আজ ইন্দ্রের অমরাপুরী লঙ্ঘিত করি। এই বেগমমহল অপূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণে একটি বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা-বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে। অস্ত্রাস্ত্র বাজার হইতে এই ভেদ যে, সকলেই রমণী। বিক্রেতা ভারত-বর্ষের প্রধান প্রধান রাজা, মহারাজা ও ওমরাহের মহিলাগণ,—ক্রেতা সম্রাটের বেগমগণ। যে সমস্ত অর্ধাসুস্থম্ভ্রা কোমলাঙ্গী লাভ্যময়ী যুবতীগণ ক্রম-বিক্রয় করিতেছেন, তাহাদিগের হাবভাব, রসিকতা ও বাক-প্রগল্ভতার নরেন্দ্র চমকিত হইলেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বৎসর

বৎসর নওরোজার দিন দিল্লীর সম্রাট্‌গণ বেগমমহলে এইরূপ একটা করিয়া বাজার বসাইতেন, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহিলা-গণ এই বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতেন। ওমরাহ ও রাজগণ পরিবারস্থ রমণীদিগকে বেগমদিগের সহিত পরিচিতা করিবার জন্য বাজারে পাঠাইতেন। পুরুষের মধ্যে কেবল স্বয়ং সম্রাট্‌ আসিতেন। পূর্ক-প্রথামতে এই আনন্দের দিনে আরংজীব সেইরূপ বাজার বসাইয়াছেন ও স্বয়ং দুই একজন বেগমের সহিত এক দোকান হইতে অল্প দোকানে পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন। ত্রাত্মকে আরংজীবের ভগিনী রোশন-আরা আরংজীবের অনেক সহায়তা করিয়াছেন, সে বাজারের মধ্যে রোশন-আরার স্থায় কাহার গোরব, কাহার প্রভুত্ব? অল্প ভগিনী জেহান-আরা দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, অল্প এই মহোৎসবের মধ্যে জেহান-আরা নাই।

দিল্লীর ফুললোচনে মরেন্দ্রমাথ এই মহোৎসব দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সম্রাট্‌ একজন রূপবতী মোগলকস্তার নিকটে কতকগুলি অলঙ্কার ও সাতিন ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিতেছেন। দর করিতে উভয়পক্ষই সমান পটু, কখন কখন এক পরসার বিভিন্নতার জন্য মহা গুণ্ডগোল উপস্থিত হইতেছে। আরংজীব বলিলেন, “তোমার জিনিস মেকি, তুমি এখানে ঠকাইতে আসিয়াছ?” চতুরা মোগল-কস্তা বলিলেন, “তুমি কিরূপ খরিদদার? এরূপ জিনিস কখনও দেখ নাই, ইহার দর তুমি কি জানিবে? তুমি ইহার উপযুক্ত নও, অল্প স্থানে বাও, তোমার যোগ্য দ্রব্য পাইবে।” এইরূপ বহু বাধিতবার পর মূল্য অবধারিত হইল। ক্রেতা তখন যেন

ক্রমক্রমে দুই চারিটি রোপামুজার পানে বিক্রেতাকে সুবর্ণমুদ্রা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অনেকরূপ এইরূপ বাজার দেখিয়া নরেন্দ্র জেলেখার আদেশানুসারে “শীশ-মহলে” প্রবেশ করিলেন, তথায় আবার অশ্রুপূর্ণ অপকৃপ দৃষ্ট দেখিলেন। সম্রাট্‌ ও বেগমদিগের আনার্থে এই মহল নির্মিত হইয়াছে। ষেতপ্রস্তরবিনির্মিত শাণের উপর দিয়া নির্মল জল প্রবাহিত হইতেছে, সেই শাণে অস্থিত প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বোধ হয় যেন, জলের নীচে অসংখ্য মৎস্য জীড়া করিতেছে। চতুর্দিক হইতে কোয়ারার নির্মল জল বেগে উঠিতেছে, আবার মুক্তারাশির স্থায় প্রভের উপর পতিত হইতেছে। ছাদ হইতে অসংখ্য দীপাবলী লম্বিত রহিয়াছে ও সেই সমস্ত দীপের বিবিধবর্ণের আলোক কোয়ারার জলের উপর বড় সুন্দরভাবে প্রতিহত হইতেছে। চতুর্দিক হইতে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজ্যখচিত হইয়া দেয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেন না, মানকারিণী চতুর্দিকেই আপনার সুন্দর অনাবৃত অবয়ব দেখিতে পাইবেন! বিলাসপটু সম্রাট্‌গণ বেগমদিগকে লইয়া এই গৃহে স্নান ও জলকেলি করিতে পারিবেন, এই জন্য কত দেশ হইতে অর্থ আনীত হইয়া এই অপূর্ণ বিলাসগৃহ বিনির্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে।

নানাদেশ হইতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু-রমণী অল্প প্রাণাদে সমবেত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকেই শীশমহলের অপূর্ণ শোভা দেখিতেছিলেন। জেলেখা তাঁহা-দিগের ভিতর দিয়া, নরেন্দ্রকে হাত ধরিয়া একপার্শ্বে লইয়া গিয়া, একটি দর্পণের নিকট আনিয়া এবং সেই দর্পণের ভিতর

একটি ছায়া দেখাইল। চকিত ও নিম্পন্দ হইয়া নরেন্দ্র সেই দর্পণের ভিতর সেই ছায়া দেখিতে লাগিলেন, তথা হইতে আর নয়ন কিরাইতে পারিলেন না, আলোকে আকৃষ্ট পতঙ্গবৎ নরেন্দ্র সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অনিমেষলোচনে সেই দর্পণস্থ প্রতিমূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? নরেন্দ্র কি উন্মত্ত হইয়াছেন? নরেন্দ্রের শরীর কাঁপিতেছে, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতেছে, তাঁহার নয়ন স্পন্দহীন! ক্রমে সে প্রতিমূর্তি দর্পণ হইতে সরিয়া গেল, সে রমণী অবগুষ্ঠন টানিয়া শীশমহল হইতে বাহির হইলেন, উন্মত্ত নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রমণী রাজপুত-বেশধারিণী। নরেন্দ্র ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্ত ক্রমে নিকটে আসিলেন, তথাপি রমণীর অনাবৃত বাহু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, মুখমণ্ডল অবগুষ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখা যায় না।

নরেন্দ্রেরও নারীবেশ। একবার ইচ্ছা হইল, রমণীর নাম-বাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল, রমণীর হস্তে আপন হস্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত উঠিল না, হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল! অচিরেই সেই রমণী ও তাঁহার রাজপুত-সঙ্গিনীগণ সেই বাজার পরিভ্রাম্য করিলেন, নরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক ঘর, অনেক দ্বার, অনেক পুষ্পোচ্ছন্ন ও প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক শিবিকা ছিল, রাজপুতকামিনীগণ নিজ নিজ শিবিকার আরোহণ করিলেন। যে রমণীর দিকে

নরেন্দ্র দেখিতেছিলেন, তিনিও শিবিকার আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। বোধ হইল যেন, তিনি যমুনানদী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ পূর্বে দেখেন নাই, কেন না, শিবিকার আরোহণ করিবার পূর্বে একবার প্রাসাদ ও নদীর দিকে স্থির-দৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যমুনায় বায়ুতে তাঁহার চিত্ত নড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় ক্ষীত হইতে লাগিল! কিন্তু সে অবগুষ্ঠন উড়িয়া গেল না, নরেন্দ্র মুখ দেখিতে পাইলেন না। অচিরেই শিবিকা-যোগে সে রাজপুত-বেশধারিণী চলিয়া গেলেন।

এ কি হেমলতা? সেই গঠন, সেই চলন, সেই বাহ! দর্পণে সেই মধুমাধা মুখখানি প্রতিকলিত হইয়াছিল! কিন্তু হেমলতা আগ্রার বেগমহালে কেন? রাজপুত-বেশ কি জন্ত? নরেন্দ্রনাথ! প্রেমাক হইয়া কাহাকে হেমলতা মনে করিতেছ? নরেন্দ্রনাথ! কেন দেশে দেশে সেই ছায়ার অনুধাবন করিতেছ?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃস্নেহ।

But he who stems a stream with sand.
And fetters flame with flaxen band
Has yet a harder task to prove
By firm resolve to conquer love.

Scott.

বীরনগরের জমীদারের প্রকাণ্ড আট্টা-লিকার পার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত উপবন ছিল, সেই উপবন দিয়া নদীতীরে আসা যাইত। সেই উপবনে রাজপুত-সঙ্গিনীগণ

হেমলতা নোড়ানোড়ি করিত, সেই নদীকূলে
কালকবালিকার নচে খেলা করিত, হাসিত,
কান্দিত, আবার উচ্চহাসে উপবন আঘোষিত
করিত। আজি সে দিন পরিবর্তিত হই-
রাছে, নরেন্দ্রনাথ শান্তিশূন্য-জ্বরে দেশে দেশে
বেড়াইতেছেন, শ্রীশচন্দ্র স্বপ্নের সম্প্রতি
মৃত্যু হওয়ার জমীনার হইরাছেন, হেমলতা
আজি বালিকা নহেন, নবজমীনারের
গৃহিণী ।

সারংকালে সেই উপবন দিরা দুটটি
রমণী ঘাটে বাইতেছিলেন ; একজন
হেমলতা, অপরটি শ্রীশচন্দ্রের বিধবা ভগিনী
শৈবলিনী ।

হেমলতার বয়ঃক্রম একদশ পঞ্চদশ বর্ষ
হইবে, অবয়ব ক্লীণ, কোমল ও উজ্জল
রূপরাশিতে পরিপূর্ণ । নয়ন দুইটি জ্যোতি-
র্ময়, জয়গল সূচিকণ, ওষ্ঠ সুন্দর, গণ্ডস্থল
রক্তিমাক্ষটার আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জল ও
লাবণ্যময় । তথাপি যৌবনপ্রারম্ভের প্রফুল-
লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের
উন্নততা মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না । বোধ
হয় যেন, সে সুন্দর ললাটে, সেই স্থির চন্দ্র-
বর্ষে, সেই সূচিকণ ওষ্ঠে, অল্পকালেই চিত্তার
অঙ্ক অঙ্কিত হইরাছে । নয়নের উজ্জল
জ্যোতিঃ কেবল ভিত্তিত হইরাছে, মুখ-
মণ্ডলের প্রফুল্ল আলোকের উপর জীবনের
সন্ধ্যার ছায়া বিকীর্ণ হইরাছে । যৌবনের
সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু
যৌবনের প্রফুল্লতা কৈ, প্রফুল্লতা থাকিলে
কি ছেয় এরূপ নব্রভাবে ধীরে ধীরে
বাইত ? ঐ ক্ষুদ্র নতশির পুষ্পটিকে
ভুলিয়া কি উহার নিকটে এরূপ স্থিরভাবে
চাহিত ? বে কক্ষবর্ণ সূচিকণ কেশপাশে
উহার বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয় কেবল আবৃত
হইরাছে, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সন্ধ্যাই

দেখ, নয়নদ্বয়ে কল নাই, তথাপি নয়নদ্বয়
স্থির, শান্ত, যৌবনোচিত তপলভাস্কৃত ।
নিকটে বাইরা দেখ, হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস
ত্যাগ করিতেছে না, তথাপি যেন ভারাক্রান্ত
জ্বর হইতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহির্গত
হইতেছে । অর্ধ-প্রক্ষুটিত কোরক হৃৎ-
কোট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক
জীবনাভাবে যেন কেবল শুষ্ক ও নতশির ।
জীবনের অকণ্ঠোদর যেন মেঘচ্ছটার
বিমিশ্রিত ।

শৈবলিনীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশবর্ষ হইবে ।
শৈবলিনী বিধবা, অবয়বে যৌবনের রূপ
নাই, কিন্তু অনির্কটনীর পবিত্র গৌরব
আছে । মস্তক হইতে নিবিড় কৃষ্ণ কেশ-
পাশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, ললাট সুন্দর,
চক্ষু বিশাল ও শান্তপ্রভ মুখমণ্ডল গভীর
অধঃ কোমল, অবয়ব উন্নত ও বিধবার
শুভ্রবসনে আবৃত । শৈবলিনী হেমলতাকে
কনিষ্ঠার ভ্রাতা ভালবাসিত, লরেহ-বচনে
তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘাটে
বাইতেছিল । শৈবলিনীর জীবন যেন মেঘ-
শূন্য, বায়ুশূন্য সারংকাল, গভীর, নিস্তর, শান্ত ।

বাল্যকালে হেমলতা নরেন্দ্রনাথের মুখ
দেখিলে ভাল থাকিত । যৌবনপ্রারম্ভে নরেন্দ্র-
নাথ হেমলতার জ্বরে স্থান পাইরাছিল,
হেমলতা ব্রুজিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার
জ্বর নরেন্দ্রনাথ-পূর্ণ হইরাছিল । যখন সেই
নরেন্দ্রের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল, যখন হেম
আর একজনের সহধর্মিণী হইরা নরেন্দ্রের
প্রতিমাকে জ্বর হইতে বিসর্জন দিতে বাধ্য
হইল, তখন প্রেয় কি পরার্থ, হেম ব্রুজিতে
পারিল, তখন মর্ষভেদী হৃৎখ আদিরা হেমের
জ্বর বিদীর্ণ করিতে লাগিল । বালিকা
সরলা নবোঢ়া বয়স, সে কথা কাহার কাছে
বলিবে ? সে হৃৎখ তাহার কাছে জানাইবে ?

শৈবলিনী, পক্ষবর্ধের সময়েই বিধবা হইয়াছিল, বংশস্বাধীনই থাকিত, কখন কখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। শৈবলিনী তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী, দুই তিনবার বীর-গ্রামে অগ্নিসরাই হেমলতার অন্তরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, মনে মনে সঙ্কল্প করিল, “বহি বালিকাকে আমি বস্ত্র না করি, বোধ হয়, আত্মার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।” শৈবলিনী সেই অবধি বীরগ্রামে রহিল।

শৈবলিনীর সমগ্র ব্যবহারে ও প্রবোধ-বাক্যে হেমলতার দুঃখভার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। শৈবলিনী মানব-চরিত্র বিশেষরূপ বুঝিত, একবারও হেমকে তিরস্কার করিত না, কনিষ্ঠা ভগিনীকে যেন প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিত। তাহার সারগর্ভ মেহপরি-পূর্ণ কথাই কোন্‌ দুঃখিনীর দুঃখ নাটুবিদূরিত হয়? শৈবলিনী গল্প করিতে অতিশয় পটু, সর্বদাই হেমলতাকে পুরাণের গল্প বলিত। সে পবিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে হেমলতা রজনীতে নিজা বিস্মরণ হইত। গভীর রজনী, গভীর বন, চারিদিকে বৃক্ষের অন্ধকার দেখা যাইতেছে, বায়ুর শব্দ ও হিংস্রক জন্তুর নাদ শুনা যাইতেছে। রাজকন্তা দয়রস্কা অস্ত্র স্বামীর প্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া ধন, মান, রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভিখারিণীবেশে বিচরণ করিতেছে। স্বামী ভুক্তার্ত হইলে গণ্ডুষ করিয়া জল দিতেছে, স্বামী বস্ত্রহীন হইলে আপনাত বস্ত্র দিতেছে, স্বামী পরিজ্ঞাত হইলে আপন অঙ্গে তাঁহার মন্তক স্থাপন করিয়া স্বয়ং অনিচ্ছ হইয়া উপবেশন করিয়া আছে, সেই স্বামী বধন মায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া অভা-গিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল, তখনও জ্ঞানগিনীর স্বামীচিন্তা ভিন্ন এ জগতে আর

চিন্তা নাই, স্বামীর পুনর্খলন ভিন্ন এ জগতে আর আশা নাই।

অথবা সেই মহর্ষি বায়ীকির কুটীরে চিরদুঃখিনী বৈদেহী হস্তে গণ্ডুস্থাপন করিয়া এখনও হৃদয়েধরকে চিন্তা করিতেছে। সম্মুখে পুত্র দুইটি ধেনা করিতেছে, তাহা-দিগের মুখ অবলোকন করিতেছে, আবার শ্রীরামের চিন্তা করিতেছে। যিনি নিরাশ্রয়া, নিরুলকা, অন্তঃসত্তা, রাজকন্তা, রাজরাণীকে চিরনির্ব্বাহ করিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর পতিকেও অভাবধি হৃদয়ে স্থান দিয়া অভা-গিনী চিন্তা করিতেছে, পতিই সীতার জীবনের জীবন, হৃদয়ের সর্বস্বত্ব! পতি-ব্রতার কি মাহাত্ম্য!

রজনী তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হেমলতা তাহার ধর্মপরাধনা নন্দিনীর মিকট এই সকল পুণ্যকথা শুনিত। দুঃখকথা শুনিয়া হেমলতার হৃদয় আলোড়িত হইত, নন্দিনীর হৃদয়ে বদন ঢাকিয়া দয়-বিগলিত-ধারার যৌদন করিত; আবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র কথা শুনিত, আবার শোকাকুল হইয়া অবস্রিত অশ্রুজল ত্যাগ করিত। হেমলতা ভাবিত, “সংসারে সকলেই দুঃখিনী, পুণ্যাত্মা সীতা দুঃখিনী, ধর্মপরাধনা সাবিত্রী দুঃখিনী, আমি কে অভাগিনী যে, নিজ দুঃখে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছি? তাঁহারা সাধু ছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন, অভাগিনী হেমলতা আজি নরেন্দ্রের চিন্তা করে, দেবভূল্য স্বামীকে বিস্মরণ হইয়া আছে। আমি অবলা, আমার বল নাই। ভগবান! সহায় হও, পাণচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত কর, অব-লার যতদূর সাধা করিবে।”

শৈবলিনীর অপকল্প মেহ ও প্রবোধবাক্যে হেমলতা ক্রমশঃ শান্তিলাভ করিল, হৃদয়ের প্রথম প্রেববরূপ ভীষণ শেল উৎপাটিত

হইল, কিন্তু অনেক দিনে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, সে কললাভ হইল। সেই পরিশ্রম ও চেষ্টায় বোবনের প্রফুল্লতা তরু হইয়া গেল, অবশেষে চিত্তার রেখা অক্ষিত হইল। হেমলতা আজি আর দুঃখিনী নহে, কিন্তু স্বভাবতঃ বীর, নম্র ও নভলির ।

একণে হেমলতা ও শৈবলিনী সর্বদাই নরেন্দ্রের কথা কহিত, বালাকাল হইতে শৈবলিনী নরেন্দ্রকে ভ্রাতা স্বলিত, এখন হেমও তাহাকে ভ্রাতার স্বরূপ জ্ঞান করিত। ভ্রাতার বিপদে বা অবর্তমানে ভগিনীর চিন্তা হয়, হেমও নরেন্দ্রের জন্ত ভাবিত, কিন্তু তাহার হৃদয় আর পূর্ববৎ বিচলিত হইত না কিংবা যদি কখন কখন সায়াংকালে এই উপরনে একাকিনী বিচরণ করিতে করিতে হেমের বালাকালের কথা মনে পড়িত, ভাগী-রথীর কল্ কল্ শব্দ শুনিয়া, নীল গগনমণ্ডলে উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া, শীতল হরিৎ কুঞ্জে উপবেশন করিয়া, বালাকালের সজীব কথা মনে পড়িত, যদি সে কথা মনে পড়িয়া হেমের চক্ষে একবিন্দু জল লক্ষিত হইত,—পাঠক, তাহা মাতৃস্নেহের নিদর্শন-স্বরূপ বলিয়া মার্জনা করিও। অস্ত্র ভাব তিরোহিত করিবার জন্ত হেম অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক সঙ্কল্প করিয়াছে, অভাগিনী অনেক কাঁদিয়াছে, সে ভাব তিরোহিত করিয়াছে। যদি হৃদয়ের কন্দরে অজ্ঞাতরূপে সে ভাবের একবিন্দুও লুক্কায়িত থাকে, পাঠক, সেটুকু অভাগিনী হেমকে কমা করিও না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পুরাণ-কথা ।

yet, oh yet thyself deceive not.
Love may sink by slow decay.
But by sudden wrench believe not
Hearts can thus be torn away,

Byron.

বাট হইতে কিরিয়া আসিয়া হেমলতা ও শৈবলিনী গৃহের সমস্ত কার্যাদি সমাপন করিল। পরে দুই জনে একটি ঘরে বসিয়া হেম বলিল, “দিদি! অনেক দিন অবধি গল্প শুনি নাই, আজ একটু অবসর আছে, একটি গল্প বল।”

শৈবলিনী স্নেহ-বচনে উত্তর দিল,
“বলিব বৈ কি বোঁ, কোন্ গল্পটি বলিব বল।”

হেম বলিল, “রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প অনেক দিন শুনি নাই, সেই গল্প বল।”

শৈবলিনী হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলিতে লাগিল। মহাভারতের কথা বার্থাই অমৃতের তুল্য, তাহার গল্প কি মিষ্ট, কি স্থললিত, কি হৃদয়-গ্রাহী! রাজার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজ-মহিষী শৈব্যা একণে রাজার একমাত্র রত্ন। সুখের সময়, সম্পদের সময় রমণী অহিরা চঞ্চলচিত্তা মানিনী! কত আশ্বাস করে! কত অভিমান করে, কত মিথ্যা ক্রোধ করে! কিন্তু যখন জীবনাকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আইসে, যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ নাট্যাভিনয়ের শেষে দীপ-শ্রেণীর স্তায় একে একে নির্বাপিত হইতে থাকে, যখন আশা মরীচিকারূপে আয়াদিগকে অনেক পথ লইয়া বাইয়া শেষে মরুভূমিতে রাখিয়া অদৃষ্ট হয়, যখন বহুগণ আয়াদিগকে ত্যাগ

করে ও লক্ষী বিবৃথ হয়, তখন কে অনন্ত-মনা ও অনন্তজনরা হইয়া অভাগার শুদ্ধবা করে? বাতা বাতীত আর কে হতভাগার শয্যা রচনা করে? দুহিতা ব্যতীত আর কে রোগীর শুক কর্তে জলদান করে? ভার্য্যা ব্যতীত আর কে নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া, দিবানিশি হতভাগার সেবার রত থাকে? রমণীর প্রেম অগাধ, অপরি-সীম। দারিদ্র্যে, দুঃখে, কষ্টেও শৈব্যা হরি-চন্দ্রকে সেবা করিতে লাগিলেন। সে দুঃখের কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার পর আরও দুঃখ। রাজা শৈব্যাকে ও পুত্রটিকে বিক্রয় করিলেন, আপনাকে চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিলেন, অভাগিনী শৈব্যা দামিবিবিরেহে কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও পুত্রটির ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সে পুত্রটিও অকালে কাল-প্রাপ্ত হইল।—হেমলতা আর থাকিতে পারিল না, নন্দিনীর হৃদয়ে মন্তক স্থাপন করিয়া দরবিগলিত-ধারার রোদন করিতে লাগিল।

গল্প সাধ হইলে, রাজা রাজ্যীকে ফিরিয়া পাইলেন, পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, রাজ্য-সম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন। হেমলতার হৃদয় শান্ত হইল। অনেকক্ষণ, প্রায় এক দশকাল উভয়েই নিমন্ত হইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর হেমলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া একটি বাতায়ন খুলিল। বাহিরে চন্দ্রকরে জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, নৈশ বায়ুতে বৃক্ষ-সকল ধীরে ধীরে মন্তক নাড়িতেছে, দূর হইতে গন্ধার জলের কল্ কল্ শব্দ শুনা যাইতেছে।

শৈবলিনী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকটে আসিয়া ভগিনীর স্তায় সম্মেহে তাহার হস্ত ধারণ করিল। হেম কি ভাবিতেছিল?

ভাবিতেছিল, ঐ বৃক্ষের পাতার পাতার কত জোনাকী পোকা দেখা যাইতেছে, উহাদেরও জীবন আছে, সুখ, দুঃখ, ভরসা, ইচ্ছা আছে। যে ভগবান! রাজা হরিচন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই এই নিশার অনিদ্র হইয়া ঐ পোকাগুলিকে ধাত যোগাইতে-ছেন, উহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। এই বিপুল বিশ্বসংসারে সকল জীবজন্তুকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে নিবিষ্ট-মনে পূজা করি, আমাদেরিগকে তিনি রক্ষা করিবেন।

হেমলতা বালিকা-মূলত পাতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি, যি পাতার সাগর, তিনি তোমাকে অল্পবয়সে বিয়া করিলেন কেন?”

শৈবলিনী। সকলের কামনা কি সকল সুখ থাকে? তিনি আমাকে বিয়া করিয়া-ছেন, কিন্তু দুঃখিনী করেন না। দেবতুল্য ভ্রাতা দিয়াছেন, ভোমার স্তায় ভ্রাতা দিয়াছেন, এই সোনার স্তরে স্থান দিয়াছেন। আমার আর কি কামনা নাই, কেবল একবার তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া পূজা করিব, এই ইচ্ছা আছে।

হেমলতা। আমাদের কানী বৃন্দাবন বাগরার কথা স্থির হইয়াছিল না?

শৈবলিনী। হা, ত্রিশ আমার উপরোধে সম্মত হইয়াছে, বোধ হয়, শীঘ্রই বাগরা হইবে।

হেমলতা। দিদি, তোমার সঙ্গে তীর্থে বাইব ভাবিলে আমার বড় আনন্দ হয়; কত দেশ দেখিব, কত তীর্থ দেখিব। আর শুনিয়াছি, নরেন্দ্র না কি পশ্চিমে আছেন, হয় ও তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইবে।

শৈবলিনী। হইতে পারে।

এমন সময়ে ত্রিশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করি-

লেন। শৈবলিনী একপাশে দিয়া বাহির
হইয়া বাইল। তাহার লগাট চিত্তাকুল।

শৈবলিনীকে কি চিন্তা? বাহিরে দণ্ডায়-
মানা হইয়া শৈবলিনী ভাবিতেছিল, “হেম! তুমি আমাকে বিধবা বলিয়া অভাগিনী বল,
কিন্তু নারীতে যাহা কখনও সহ করিতে
পারে না, বালিকা! তুমি তাহা সহ করি-
য়াছ। সে আঘাতে তোমার হৃদয় চূর্ণ হই-
য়াছে, তোমার জীবন শুষ্ক হইয়াছে, এ বয়সে
তোমার দুর্বল শরীর ও নীরস ওষ্ঠ দেখিলে
হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ বিষয় চিন্তার কথা
ভ্রাতা কিছুই জানে না, তুমি বালিকা, তুমিও
ভাবিয়াছ, এ চিন্তা নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু
নরেন্দ্রের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে কি
হয় জানি না। ভগবান্ অনাধার নাথ, অস-
হায়ের সহায় হইবেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

Upon her face was the tint of grief,
The settled shadow of an inward strife,
And an unquiet drooping of the eye,
As if its lids were charged with

inshed tears.
Byron.

শৈবলিনী পুনরায় ঘরের ভিতরে আসিল
ও ভ্রাতাকে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়া,
আপনি পাশে বসিয়া ব্যঞ্জন করিতে
লাগিল। হেমলতা সে ঘর হইতে বাহির
হইয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া স্বামীর
ভোজন দেখিতে লাগিল।

ভ্রাতা-ভগিনীকে অনেকক্ষণ কথোপকথন
হইতে লাগিল। অবশেষে ত্রিশচন্দ্রের ধারণা
সাক্ষ্য হইল। রাজি অধিক হওয়ার তিনি

শরনের উল্লেখ করিলেন, শৈবলিনী অত্যন্ত
গৃহে গেল।

তখন হেমলতা ধীরে ধীরে স্বামীর পাশে
আসিল ও বিনীতভাবে তাহুল দিল। অতঃ
প্রাণের অন্তঃকরণ কিছু আলোড়িত ছিল,
তিনি রহস্ত করিয়া বলিলেন, “আমি পান
খাইব না।”

হেম। কেন?

ত্রিশ। তোমার মুখে কথা নাই কেন?

হেম। কি কথা কহিব বল, কহিতেছি।

আগে পানটি খাও।

ত্রিশ। চিরকালই কি এই শুষ্ক মুখখানি
দেখিব? কবে তুমি শরীরে একটু সারিবে,
কবে তোমার মুখখানি প্রসন্ন দেখিব?

হেম। আমার শরীর ত এখন ভাল আছে।

ত্রিশ। হাঁ, ঈশ্বরের শরীর অল্প
সারিরাছ, কিন্তু মনে উল্লাস কৈ?

হেম। উল্লাস আবার কি?

ত্রিশ। মনের ক্ষুধা কই? কবে
তোমাকে সুখী দেখিব?

হেম। কৈ, আমার মনে ত কোন কষ্ট
নাই। তবে দিদির কাছে একটু দুঃখের
গল্প শুনিতেছিলাম, তাই এক বিন্দু চক্ষুর জল
কেলিয়াছিলাম।

ত্রিশ এ কথাও তুষ্ট হইলেন না;
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মুখখানি
সহ্যস্ত দেখিব কবে?”

হেম আর উত্তর করিতে পারিল না,
ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটী
কথা মনে পড়িল, এবার হেম অল্প হাসিয়া
বলিল, “কবে তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন
করিবে।”

ত্রিশ। কি প্রতিজ্ঞা?

হেম। তীর্থযাত্রা।

ত্রিশচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন।

হেমলতা ও শৈবলিনীর উপরোধে অনেক-
বার তীর্থযাত্রা করিবেন অলীকার করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন-উদ্দেশ্যে করেন
নাই। অতঃপর হেমলতার কথার কিঞ্চিৎ নিস্তর
ধাক্কায় পরে বলিলেন, “যদি বার্থ্যই তীর্থ-
যাত্রা করিলে তোমার শরীর ও মন ভাল
থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইব।
কল্যাণ হইতে আমি যাত্রার আয়োজন করিবা”

হেম পরিতুষ্ট হইল। হেমকে একটু
প্রকৃত দেখিয়া শ্রীশ আনন্দিত হইলেন, সে
কোন দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সম্মুখে
হেমকে চুম্বন করিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার অল্প দিন পরেই
শ্রীশচন্দ্র নগরিস্থানে পশ্চিমযাত্রা করিলেন।

গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া অব-
শেষে মথুরা ও বৃন্দাবন যাইবার মানসে
আগ্রা পৌছিলেন। তথায় শ্রীশচন্দ্র প্রধান
প্রধান হিন্দুজাতিদিগের সহিত আলাপ
করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন
রাজার উপরোধে শ্রীশ সেই রাজার পরি-
বারের সহিত আপন পরিবারকে নভরো-
জার দিন প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়া-
ছিলেন। হেমলতা অগত্যা রাজপুত-মহি-
লার বেশ ধরিয়া রক্তপুতরমণীদিগের সহিত
আগ্রার বেগমহলে গিয়াছিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জেলেখার পত্র।

The cold in clime are cold in blood,
Their love doth scarce deserve the name,
But mine was like the lava flood,
That boils in Etna's breast flame.

Byron

নরেন্দ্র আগ্রাজুর্গের ভিতরে নগণ্য হেম-
লতার মুখাবি দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইয়া-

ছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।
অনেকক্ষণ পরে নিস্তর আকাশ ও শান্ত-
প্রবাহিণী নদীর দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরে
ধীরে আপন গৃহে যাইলেন।

নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন, একটি
প্রদীপ জলিতেছে, লোক কেহ নাই, নরেন্দ্র
হার রুদ্ধ করিয়া স্বাণের বস্ত্র খুলিতে
লাগিলেন। সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে
একখানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া যাইল। নরেন্দ্র
তুলিয়া দেখিলেন, তাহা ভাষার লিখিত।
নরেন্দ্র প্রদীপের নিকটে গিয়া পত্র খুলিয়া
পড়িতে লাগিলেন। অর্ধেক না পড়িতে
পড়িতেই বুকিতে পারিলেন, পত্রখানি পত্র।
তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতে
লাগিলেন। পত্রে এই লেখা ছিল,—

“নরেন্দ্র।

আমি পাগলিনী, আমি হতভাগিনী,
সেইজন্য এই পত্র লিখিতেছি। আমি চক্ষুতে
আর দেখিতে পাইতেছি না, আগ্রার মস্তক
ঘুরিতেছে, তথাপি মৃত্যুর পূর্বে একবার
মনের কথা তোমাকে বলিয়া দিই। তুমি
যখন এই পত্র পড়িবে, তখন অজ্ঞানিনী আর
এ জগতে থাকিবে না।

আমি শাস্ত্রহানের জোষ্ঠা কস্তা জেহান-
আরা বেগমের পরিচারিকা। যে দিন বারা-
ণসীর যুদ্ধ হয়, কার্যাবশতঃ আমি ও মসরুর
নামক খোজা রাজা জয়সিংহের শিবিরে
ছিলাম। সেই দিন আহত ও অচেতন হইয়া
তুমি সেই শিবিরে আনীত হও, সেই দিন
তোমাকে দর্শন করিয়া হৃদয়ে কালসর্প ধারণ
করলাম।

দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, আমি
হলাহল পান করিতে লাগিলাম। অশ্রান্ত
হইয়া সেই পীড়াময় উপর নত হইয়া
থাকিতাম, অনিদ্রিত হইয়া সেই নিদ্রিত

কলেবর নিরীক্ষণ করিতাম। ঐ প্রথম
গলাট, ঐ রক্তবর্ণ ওষ্ঠ ভুটীর দিকে দেখিতাম,
আর পাগলিনী প্রায় হইতাম। পীড়াবশতঃ
কখন তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার
করিতে, আমি নিঃশব্দে মনের হুঃখে রোদন
করিতাম। পীড়াবশতঃ কখন সন্নেহে আমার
হস্ত ধরিতে, আমি পাগলিনী, আমার সমস্ত
শরীর কটকিত হইত। ঘরে কেহ না
 থাকিলে আগ্রহের সহিত তোমাকে চুম্বন
করিতাম। ক্ষমা কর, আমি পাগলিনী।

ক্রমে বারাণসী হইতে নৌকাযোগে
তুমি দিল্লীতে আনীত হইলে। আমি কোন
ছলে তোমাকে রাজপ্রাসাদের ভিতরে
আনিয়া আপন ঘরে রাখিলাম; কেবল
তোমাকে চক্ষে দেখিবার জন্ত আপন ঘরে
রাখিলাম। তোমার মুখের দিকে চাহিয়া
চাহিয়া হৃজনীবাগন করিতাম; কখন কখন
আত্মসংযম করিতে না পারিলে তোমার
সংজ্ঞাশূন্য দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলাম।

দুই মসরুর তোমার কথা সাহেব-বেগ-
মকে জানাইল। প্রাসাদের ভিতরে পুরুষ-
আনিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার ও তোমার
প্রাণসংহারের আদেশ দিলেন। আবার
মসরুর বাইরা সাহেব-বেগমকে তোমার
অপূর্ববীর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা
বলিল। বেগম পূর্বের আজ্ঞা রোধ করি-
লেন, আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন
ও তোমার আরোগ্যের পর স্বয়ং আমাদের
দোষের বিচার করিবেন, এইরূপ আদেশ
দিলেন।

আমি বন্দী হইলাম, দিবারাজি ঘরে
একাকিনী বসিয়া থাকিতাম; তোমাকে
না দেখিয়া অসহ্য যাতনা হইত। অবশেষে
তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষক
ও মসরুরের অনেক ধোঁসামোদ কবির

গোপনে তোমাকে দেখিতে বাইতাম। তখন
তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, কখন কখন
আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে, তাহা কি
স্বরণ হয়? আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারি-
তাম না, কথা কহিতে পারিতাম না। নিষ্ঠুর
মসরুর আমাকে শীঘ্রই আপন ঘরে পাঠাইয়া
দিত, তথায় বাইরা আমি আবার সেই দেব-
কান্তির চিন্তা করিতাম।

ক্রমে বিচারের দিন সমাগত হইল; সে
দিন তোমার স্বরণ আছে? সিংহাসনোপ-
বিষ্টা জেহান-আবাব চারিদিকে সহচরীগণ
দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তোমার স্বরণ আছে?
সাহেব-বেগম সেই দিন প্রথমে তোমাকে
দেখিলেন, যে কঠোর আজ্ঞা দিলেন, তোমার
স্বরণ আছে? শাহজাদি। আমার পাপের
কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক,
তোমার হৃদয় কি পাবান, কখনও বিচলিত
হয় নাই? তবে আমি বন্দী, আমার স্বামী
নতা নাই, সেই জন্ত আমার পাপের
দিলে। কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রা-
জহিতা, আমি অপেক্ষাও বে ঘোর পাপী
তাহার কি দণ্ড নাই? *

কি কৌশলে সেই রাজে আমি
হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম
তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই
সৈনিকবেশে তুমি দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ
অভাগিনীও দেওরানা নাম ধারণ করিয়া
পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে বাইল।
নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব, এরূপ
আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই, দিবারাজি
তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাজি ভূবার্ভ

* জেহান-আবা বা সাহেব-বেগমের প্রণয়ের অনেক
গল্প কথা সে সময়ে প্রচলিত ছিল। কবী জমশাদী
বেগীয়ে তাহার ভক্তগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চাতকের দ্বার তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃতকথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে বিপ্রহর পর্যন্ত, কখন কখন বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তি দেখিরা রুদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশার আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে সিপ্রাতীরে, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশার অভাগিনী হইতে পরামুখ ?”

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

অ।

পত্র সমাপ্ত ।

প্রাণ it she fall by bowl or steel
করিব that dark love shedared to fell.

রাজ।

Byron.

বারে: “নরেন্দ্র ! ভালবাসিয়াছি। বে হিন্দুরমণী জার মির প্রণয়ের পাণ্ডী, তাহাকেও আমি ছিলেম্বাছি। কিন্তু তুমি কখনও ভালবাসার লার হ দেওয়ানা হও নাই ! আমার তাতার-আদেশে জন্ম, তথাকার সকলেই উগ্রস্বভাব, কিন্তু আমি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় উগ্রস্বভাবা ছিলাম। আমি ক্রুদ্ধ হইলে বালকগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া বাইত। একটি বৃদ্ধ আমার পিতা হত হন, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বাঁধী অবস্থায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিক্রীত হইলাম। স্বাধীনতা গেল, কিন্তু উগ্রস্বভাব গেল না, বোধ হয়, ভারত-বর্ষের উচ্চতার সূর্য্যতাপে আমার শোণিত ক্রমশঃ উকতর হইল। প্রাসাদে তাতার-

রমণীদিগের কি কাজ, বোধ হয়, তুমি জাম না। আমরা বেগমদিগর বহল রক্ষা করি, খড়গ ও ছুরিকা-ব্যবহারে আমরা অপটু নহি, বেগমদিগের আদেশে কত কত ভরসার কার্য সম্পাদন করি, তাহা অগৎসাধারণ কি জানিবে ? আমি এ সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সকলের অসাধ্য কার্য সাধন করিতাম। আমার এই উগ্রস্বভাবই সাহেব-বেগম আমার এরূপ সন্তুষ্ট করিতেন।

যখন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার সহিত আসিলাম, আমার স্বভাব কিছুমাত্র অন্তথা হইল না, দেওয়ানা হইয়া তোমার সহিত আসিলাম।

উদয়পুরের হুদে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে বেড়াইতে বাইতে, অরণ হয় ? তোমাকে সন্ধ্যাই চিত্তিত দেখিতাম, কিন্তু তুমি কি ভাবিতে, স্থির করিতে পারিতাম না। এক দিন আ নৌকার বসিয়া ছিলাম, তুমি আমার অস্তিত্ব রাখিয়া গুইয়াছিলে ও চন্দ্রের দিকে দেখিতেছিলে, অরণ হয় ? আমি সমস্ত সন্ধ্যায় তোমার চন্দ্র-করোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম, তোমার কেশবিভ্রাস করিয়া দিতেছিলাম। তোমার অঙ্গুলি সহিয়া খেলা করিতেছিলাম। সহসা তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলে, ‘হেম ! আর কি তোমাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব ?’ আমি বন্ধভাষা জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝিলাম। আমার মনে সন্দেহ জাগ্রত হইল।

জীলোকের মনে একবার সন্দেহ উদয় হইলে তাহা শীঘ্র তিরোহিত হয় না। দিবাত্রি তোমার হেমের কথা জানিতে উৎসুক থাকিতাম, তোমার কাগজপত্র চুরি করিয়া পড়াইয়া লইতাম, কথার কথায় তোমার নিকট হইতে বীরনগরের সমস্ত কথা বাহির

করিয়া লইলাম । তখন তোমার হেঁসকে তোমার মন হইতে দূর করিয়া সেই স্থান অধিকার করিবার জন্ত আমার হৃদয় জলিতে লাগিল ।

তোমার হিন্দুধর্মে আস্থা দেখিয়া আমি একলিঙ্গ-মন্দিরের গোষ্ঠ্যমণ্ডিরের নিকট আপনাদি ইষ্টলাভের জন্ত বাইলাম । প্রথম বাহার নিকট বাইলাম, তিনি পরম তেজস্বী ও ধার্মিক, আমার সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া ঠাড়াইয়া দিলেন । এইরূপে তিন চারি জনের নিকট অবমানিত হইয়া অবশেষে সেই শৈলেশ্বরের নিকট বাইলাম । তিনি অনেক অর্থলোভে সন্মত হইলেন । আমি তৎক্ষণাৎ তিন শত মুদ্রার একটি হীরক-বলয় তাঁহার হস্তে দিলাম, আর সহস্র মুদ্রার একটি মুক্তমালা তাঁহার সম্মুখে দোলাইয়া বলিলাম, “যদি ছলে বলে কৌশলে নরেন্দ্রকে হেমলতার চিন্তা ত্যাগ করাইতে পার, মুসলমানধর্ম অবলম্বন করাইতে পার, আমাকে গ্রহণ করাইতে পার, তবে এই মুক্তমালা তোমার গলায় স্বহস্তে পরাইয়া দিব ।”

এত অর্থ কোথার পাইলাম, জিজ্ঞাসা করিবে । জেহান-আরার দাসদাসীরও অর্থের অভাব ছিল না । দেশের বড় বড় লোক সম্রাটের নিকট কোন আবেদন করিতে আসিলে বেগম-সাহেবকে উপচৌকন না দিলে কোন কার্যই সম্পাদিত হইত না । কেহ একটি উচ্চ কর্মের প্রার্থী, কেহ একটি বিষয়ের প্রার্থী, কেহ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার ক্ষমা চাহেন, কেহ পরের জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহার একটি সনন্দপত্র চাহেন, কোন বোকা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন, তাহার ক্ষমাপ্রার্থী, কাহারও উপর সম্রাটের অজ্ঞার

ক্রোধ হইয়াছে, সে ক্রোধ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যিক,—সকলেই রাশি রাশি হীরা, মুক্তা ও অর্থ বেগম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আপন আপন আবেদন জানাইতেন । বেগম সাহেবের দাসীরাও অর্থে বঞ্চিত হইত না ।

তাহার পর শৈলেশ্বর যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান । সে উপায় বিফল হইল, আমার আশা বিফল হইল । দুই দিন পর্তুগল্লের নিজে নারী-বেশে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তুমি স্ত্রীর উদ্ভূত ছিলে, দেখিয়াছিলে কি না, জানি না । প্রথম দিন তোমার পদ-তলে পড়িয়া রোদন করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবস তোমার প্রাণসংহারে উদ্ভূত হইয়াছিলাম । হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল, তাতারের হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া যায়, কখনও জানিতাম না, আমি এরূপ ক্ষীণ, তাহা জানিতাম না ।

পরে তোমার সহিত পুনরায় আগ্রায় আসিলাম । অমুসন্ধানে জানিলাম, বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনাঢ্য অমীর আসিয়াছে, —তোমার হেমকে দেখিলাম । পাপিষ্ঠ ! পরস্তু তোমার হেম ! উঃ ! আর বাতনা সূত্র করিতে পারি না । যথুবার গোলোকনাথের মন্দিরে তিন দিন পর এক প্রহর রাত্রির সময় বাইও, পরস্তুকে আবার দোখও । তুমি আমাকে হস্তভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হস্তভাগা করিব, সেই জন্ত এই সমাচার দিলাম । সেই জন্ত আগ্রার দুর্গে লইয়া বাইরা হেমকে দেখাইয়াছিলাম ।

আমার মৃত্যু সন্নিহিত, কিন্তু জিয়াংসা তাতারের ধর্ম, আমি অধর্ম ভুলি নাই, আমার শোধিত নীতল হয় নাই ।

উঃ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে।
যদি এ ভূকান্তকে পেরেবারি দান করিতে,
তবে মুসলমানী অকৃতজ্ঞ হইত না, বত দিন
জীবন থাকিত—কিন্তু সে কবার আর কাজ
কি? নরেন্দ্র! এ জীবনের অন্ত বিদায়
দাও, যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়,
নিঃস্বপ্ন নরেন্দ্র! এই ক্ষণ বিদীর্ণ করিয়া
অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র!
তখন তুমি আমাকে ভালবাসিবে,—নতুবা
এই ছুরিকা বারা তোমার পাবাণ জ্বর চূর্ণ
করিব।

উদ্গাদিনী জ্বলেথা।”

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্রের নয়ন
হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল।
তিনি নিমন্ত্বে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ
হইতে বাহির হইলেন। রজনী প্রায় শেষ
হইয়াছে, সমস্ত নগর নিমন্ত্বে। নরেন্দ্র পদ-
চারণ করিতে করিতে অনেক দূর বাইরা
পড়িলেন; দেখিলেন, সমুখে বমুনা।

একটি দীর্ঘনিবাস ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র
প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, একরূপ সময়ে
দেখিলেন, বমুনা তীরে একস্থানে কতকগুলি
লোক সমবেত হইয়া একটি মৃতদেহ
জ্বলিতে সন্নিবেশিত করিতেছে! জিজ্ঞাসা
করার সেই লোকের মধ্যে একজন উত্তর
দিল, “মৃত ব্যক্তি পূর্বে বেগমমহলে দাসী
ছিল। একজন কাকের সৈনিকের সহিত
ব্যক্তিচোরিণী হইয়া বাণির হইয়া যায়।
বোধ হয়, সে সৈনিক উহাকে এক্ষণে হত্যা
করিয়াছে, দাসীর বক্ষঃস্থলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা
বসান দেখিলাম। হতভাগিনীর নাম
জ্বলেথা।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মথুরা।

Allured bird as the become blaze allures
The bird of passage, till he madly strikes
Against it and beats out his weary life.

Tennyson.

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিনী বমুনাকূলে
মথুরা নগরী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।
সূর্য্য অনেকদূর অন্ত গিয়াছে, গগনে
নবজ্বল এক একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে,
বমুনীর বিশাল বক্ষের উপর দিয়া সন্ধ্যার
বায়ু রহিয়া রহিয়া যাইতেছে, সমস্ত
জগৎ শীতল ও শান্ত। মথুরার প্রান্তর-
বিনির্মিত ঘাটশ্রেণী জল পর্য্যন্ত নামি-
য়াছে। বৃক্ষ ও কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া মথ-
ুরার গোলোকনৃত্যের মন্দির দেখা যাই-
তেছে।

ক্রমে রজনী অধিক হইল, হেমন্তকালের
চন্দ্রালোকে নদী, গ্রাম, বৃক্ষ ও মন্দির অতি
সুন্দর কান্তি ধারণ করিল। নীল গগনে
সুধাও যেন ধীরে ধীরে ভাসিতেছে। নদী-
বক্ষে দুই একখানি ক্ষুদ্রতরী ভাসমান রহি-
য়াছে। নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণ বৃক্ষ-
শ্রেণী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বোধ
হইতেছে যেন, চন্দ্রের সুধাবর্ষণে সমগ্র জগৎ
তুষ্ট হইয়া সুখে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

সহসা নগরের মধ্যে সায়ংকালীন পূজা
আরম্ভ হইল, শত দেবালয় হইতে শব্দ-
ঘণ্টার নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। সায়ং-
কালীন বায়ুহিল্লোলে সুদূরশ্রুত, সে নিনাদ
কি সুমধুর, কি মিষ্ট! সেই ঘণ্টার ঘীরে
ঘীরে নদীর বক্ষে ও নগরের চতুর্দিকোদ্ভিত
হইতে লাগিল, ঘীরে ঘীরে সেই নীল অনন্ত

নৈশ গগনে উখিত হইতে লাগিল, উপাসক-দিগের মন বেন মুহূর্ত্তের জন্তও পৃথিবীর চিন্তা বিস্মরণ হইয়া সেই পবিত্র ষষ্ঠারবের সহিত গগনের দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

নদীকূলে একটি প্রস্তরবিনির্মিত সোপান শ্রেণীর উপরেই গোলোকনাথের মন্দির; সেই দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পুজক উচ্চৈঃস্বরে সায়ংকালীন গীত গাইতেছিল, অনেক বাড়ী সে পূজার উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, বহুদূর হইতে, বহু দেশ হইতে এই পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়া অস্ত্র মন্দির দর্শন করিয়া বেন জীবন চরিতার্থ করিল।

আরতি শেষ হইল, যাত্রীগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল, কেবল দুই জন স্ত্রীলোক সেই মন্দির-পার্শ্বে একটি বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “দিদি, মুসলমানী বলিয়াছিল, আজ এই মন্দিরে একপ্রহর রাত্রির সময় নরেনের সঙ্গে দেখা হইবে, কৈ, তাহা হইল না?”

শৈবলিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী, হেমের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, যদিও হেম হাসিতে হাসিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল, তথাপি হেমের হৃদয় বখাধই উদ্বেগে পরিপূর্ণ। সেই আশার হেমের হৃদয় আজি সজোরে আঘাত করিতেছে, হেমের শরীর এক একবার অন্ন অন্ন কম্পিত হইতেছে।

শৈবলিনী মনে মনে ভাবিল, “আজি না জানি কি কপালে আছে, হেম বালিকামাত্র, নরেনকে দেখিলে আবার পূর্ব্বকথা মনে পড়িবে, সে অসহ্য ব্যতনা বালিকা কি সহ করিতে পারিবে?” প্রকাশে বলিল, “সে

পারগলিনীর কথাই কি বিশ্বাস করে? নরেনকে কোথায় কোন্ দেশে আছে, তাহার সহিত মথুরায় দেখা হইবার আশা করিতেছ?”

হেমলতা। কিন্তু দিদি, জেলেখার অস্ত্র কথামূলি ঠিক হইয়াছিল।

শৈবলিনী। ঐ প্রকারে উহারা মিথ্যা আশা জন্মায়, দুটা সত্য কথা বলে, একটা মিথ্যা কথা বলে। কৈ, আমাদের দাদী আসিল না? আমি যে পথ ঠিক চিনি না, না হইলে আমরা দুই জনেই বাড়ী বাইতাম।

হেম। দেখ দিদি, আমার বোধ হইতেছে বেন, এই আমাদের বীরনগর, বেন এই গঙ্গা। আর বাল্যকালে চন্দ্রালোকে গঙ্গা-তীরে খেলা করিতাম, তোমার সহিত খেলা করিতাম আর,—আর,—আর, সকলের সহিত খেলা করিতাম, সেই কথা মনে পড়িতেছে।

শৈবলিনীর মুখ আরও গম্ভীর হইল, দাদীর আশিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া শৈবলিনী বৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল। হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিতে লাগিল, “দেখ দিদি, ঐ নৌকাখনি কেমন তীরের মত আশিতেছে! উঃ! মাঝীরা কি জোরে দাঁড় বাহিতেছে! উঃ! বেন উড়িয়া আসিতেছে।”

শৈবলিনী সেই দিকে দেখিল; তাহার ভয়। ষণ্ডণ হইল। শৈবলিনী বাহা ভয় করিতেছিল, তাহাই হইল, নৌকা ঘাট হইতে চারি হস্ত দূরে থাকিতে থাকিতে একজন সৈনিক লক্ষ্য দিয়া ঘাটে পড়িল,—সৈনিক নরেন্দ্রনাথ।

হেম বৃক্ষের ছায়ার ছিল, নরেন তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মন্দিরের ভিতর বাইলেন। কিন্তু হেম নরেনকে দেখিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে বেন শরীরের সমস্ত রক্ত হেমের

মুখমণ্ডল দুই হইল; চক্ষু, কর্ণ, নাসাট, ওষ্ঠ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। পরমুহুর্তে সমস্ত মুখমণ্ডল শাণ্ডূর্ণ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নাসাট হইতে রক্তবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী সত্বে হেমকে ধরিল। হেম কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিলেন। শৈবলিনী সন্তোরবরে বলিল, “হেম, আমি তোমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাসি। আমি বলিতেছি, আজ নরেনের সহিত দেখা করিও না, বাড়ী চল। তুমি আমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাস, আমার এই কথাটি শুন, বাড়ী চল। তুমি বালিকা, আপনাত্মক মন জান না, নরেনের সহিত অত্ৰ তোমার কথোপকথন হইলে কি বিপদ ঘটবে, ভগবান্ জানেন।”

হেমলতা মুখ নত করিয়া এই কথা শুনি, অনেকক্ষণ ভূমির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল, নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু বর্ষ বালুকার পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিল। তখন উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নাই; হেমের মুখখানি শান্ত, নির্মল, স্থির; নয়নে কেবল একবিন্দু অশ্রুজল।

হেম শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, “দিদি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, তুমি আমাকে অবিবাহিত করিও না। দিনে দিনে, মাসে মাসে, তুমি আমাকে কত ধর্ম-উপদেশ দিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই। দিদি, আমি অবিবাহিত নহি। আজি এইমাত্র দেবপূজা সাধ করিলাম, এই পূণ্য-ভূমিতে ঠাঁড়াইয়া এই পূণ্য দেবমন্দিরে আমি অবিবাহিত হইব না। যিনি আমার প্রধান দেবতা, যে দেবতুল্য আমি আমাকে ভালবাসেন, আমার জীবনের যিনি সর্বস্বদান, জীবন থাকিতে এ দাসী তাঁহার অবিবাহিত

হইবে না। দিদি, আমাকে সন্মোহ করিও না, আমাকে মন্দ ভাবিও না, তুমি আমাকে মন্দ ভাবিলে এ সংসারে অভাগিনীকে কে ভালবাসিবে?”

হেমলতার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়া সমস্ত মুখমণ্ডল সিঁক্ত হইতেছিল।

তখন শৈবলিনীর মন শান্ত হইল, শৈবলিনীর চক্ষুতে জল আসিল। শৈবলিনী সম্মুখে হেমের চক্ষু মুছাইয়া বলিল, “হেম, আমাকে কমা কর। তুমি ধর্মপরায়াণা, তুমি পতিব্রতা, আমি যে মুহুর্তের জন্তও তোমাকে সন্মোহ করিয়াছিলাম, সে জন্ত কমা কর।”

হেম। দিদি, তুমি কমা চাহিও না, তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। জন্মে জন্মে বেন তোমার ভগিনী হই, আর আমার কিছু প্রার্থনা নাই।

আবার দুইজনে দুইজনকে ধরিয়া ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, দুইজনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। পরে শৈবলিনী বলিল, “রাজি হইয়াছ, যাও, নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আইস।”

শৈবলিনী সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিল, হেমলতা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। হেমলতার এক্ষণে উদ্বেগ নাই, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ঠাঁড়াইল ও নন্দ্র-ভাবে বৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিল।

এতদিনের পর হৃদয়ের হেমকে পাইয়া নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইল। নরেন্দ্র কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল মাত্র হেমের হাত ধরিয়া পিপাসিতের স্তায় সেই অমৃতমাধা মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হেম আর সন্ম

করিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া রহিল ।
তাহার নয়ন ছল ছল করিতেছিল ।

অনেকক্ষণ পর হেমলতা নরেন্দ্রের দিকে
স্থিরদৃষ্টি করিয়া বলিল, “নরেন্দ্র !”

নরেন্দ্র দেখিলেন, হেমের মুখে আর
উষেগের চিহ্ন নাই, লজ্জার চিহ্ন নাই, মুখ-
মণ্ডল নিখল ও পরিষ্কার । ধীরে ধীরে হেম-
লতা বলিল, “নরেন্দ্র !”

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

মাধবীকরণ যমুনার বিসর্জন ।

So she strove against her weakness,
Thought at times her spirit sank
Shaped her heart with woman's meekness
To all duties of her rank.

Tennyson.

দেবালয়ের সমস্ত নীপ তখন নির্বাণ হই-
য়াছে ও সমস্ত লোক সুপ্ত অথবা চলিয়া
গিয়াছে । স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠের উপর সুন্দর
চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ও সারি সারি
শুভ্ৰচ্ছায়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে । পার্শ্বে
বিশাল যমুনানদী চন্দ্রকরে নিম্নতলে বহিয়া
যাইতেছে ও রহিয়া রহিয়া নীতল যমুনার
বায়ু মন্দিরের ভিতর দিয়া গাইয়া যাইতেছে ।
সেই সুস্বিষ্ট রজনীতে পবিত্র মন্দিরের একটি
শুভ্ৰচ্ছায়াতে নিম্নতল নরেন্দ্র ও হেম দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে ।

হেম স্থিরভাবে বলিল, “নরেন্দ্র ! অনেক
দিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আমার
বোধ হয়, অনেক দিন দেখা হইবে না,
আইস, আমাদের মনের যা কথা, তাহাই কহি ।
নরেন্দ্র ! বাল্যকালে আমরা দুইজনে গঙ্গা-
তীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম ।
এক্ষণে তুমি সৈনিকের ব্রতে ব্রতী হইয়াছ,
আমি পরের স্ত্রী । নরেন্দ্র, বাল্যকালের
স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হও ।”

হেমলতা কণেক নিম্নতল হইয়া রহিল,
আবার বলিল, “বিধাতা যদি অন্তরঙ্গ ঘটাই-
তেন, তবে আমাদের জীবন অন্তরঙ্গ হইত,
বাল্যকালের স্বপ্ন সকল হইত কিম্ব নরেন্দ্র,
আমরা যেন ভ্রমের বিধাতার নিকা না করি ।
যিনি তোমাকে পরাক্রম দিয়াছেন, বশ
দিয়াছেন, তাহার নাম লও, অবশ্য তোমাকে
সুখী করিবেন । যিনি আমাকে এই ক্ষমায়
স্থান দিয়াছেন, দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন,
শৈবলিনীর স্তায় নন্দিনী দিয়াছেন, ধন ঐশ্বর্য্য
দিয়াছেন, তিনি দয়ার সাগর, তাহাকে আমি
প্রণাম করি ।”

হেমলতা গলার বস্ত্র দিয়া করবোড়ে
বিশ্বের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম
করিল । তাহার মুখমণ্ডল উজ্জল, পবিত্র,
শান্তি-রসে পরিপূর্ণ ।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া হেমলতার মুখের
দিকে চাহিল, তাহার বাক্যক্ষুণ্ণি হইল না ।
হেমলতা আবার বলিতে লাগিল, “নরেন্দ্র,
আমি শুনিয়াছি, তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ,
অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সকল দেশেই
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছ । তুমি পুণ্যাত্মা,
জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন । কিন্তু
যদি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা কর,
যদি বিপদ বা দারিদ্র্যে পতিত হও, আবার
বীর্য্যনগরে বাইও, তুমি বাইলে সকলেই
আজ্ঞাদিত হইবে । আমার স্বামীর স্বয়ং
আমি জানি, তিনি তোমাকে কনিষ্ঠের স্তায়
ভালবাসেন, সর্বদাই স্নেহে তোমার কথা
কহেন, তুমি বাইলেই তিনি অতিশয় আজ্ঞা-
দিত হইবেন ।”

নরেন্দ্র নিম্নতল হইয়া ছিল ; হেমের কথা-
গুলি তাহার কর্ণে অপূর্ণ সঙ্গীতধ্বনির স্তায়
বোধ হইতেছিল । তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ,
তাহার নয়ন দুটিও পরিপূর্ণ ।

হেম আবার বলিতে লাগিল, “আর তুমি হাইলে শৈবলিনীও কত আত্মান্বিত হইবেন। আবার হেমলতা বত দিন জীবিত থাকিবে, কনিষ্ঠা ভগিনীর দ্বারা তোমার সেবা-তত্ত্বা করিবে। ভাই নরেন! আমি তোমাকে যখন দেখিব, তখনই আত্মান্বিত হইব।”

এই ব্রহ্মবাক্য শুনিয়া নরেন্দ্রের চক্ষুতে আবার জল আসিল; আবার দুই জনে অনেকক্ষণ নিমন্ত হইয়া রহিল।

শেষে হেম জীবৎ গভীরস্থরে বলিল, “নরেন্দ্র, আর একটি কথা আছে, কিছু মনে করিও না, আমার দোষ গ্রহণ করিও না। নরেন্দ্র, আমাদের বিদায়কালে প্রণয়চিহ্নরূপ আমাকে একটি দ্রব্য দিয়াছিলে, সেটি এখন পরিধান করিতে আমি অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, সেটি ফিরাইয়া লও।”

হেমলতা আপন হস্তের বস্ত্র তুলিয়া লইল, নরেন্দ্র দেখিল, যে মাধবীকঙ্কণ নরেন দিয়াছিল, তাহা এখনও রহিয়াছে। লতা শুক হইয়া ঋণ ঋণ হইয়া গিয়াছিল, হেমলতা সেই অসংখ্য ঋণকে একে একে সূতার দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল, অতঃপর তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছে।

উভয়ের পূর্বকথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিবাদজ্বালায় আচ্ছন্ন হইল, উভয়ে অনেকক্ষণ নিমন্ত হইয়া রহিল। নরেন্দ্র হেমলতার সেই সুন্দর বাহ ও সেই মাধবীকঙ্কণ দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, আর দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দর-বিগলিত-দ্বারার অশ্রুবারি পড়িয়া হেমলতার হস্ত ও বাহ সিক্ত করিল। অবশেষে নরেন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “হেম, তবে কি জন্মের মত আমাকে বিবৃত হইবে?”

হেম বলিল, “জীবিত থাকিতে তোমাকে বিবৃত হইব না; চিরকাল সন্তোষদায়ক তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কণ অল্প প্রণয়ের চিহ্নরূপ আমাকে দিয়াছিলে, নরেন্দ্র, আমি প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, মনে ক্লেশবোধ করিও না, আমি এই কয় বৎসর এ কঙ্কণটি পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার বত কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না। কিন্তু উটি উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই। নরেন্দ্র, আমি অবিখ্যাসিনী পত্নী নহি।”

নরেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে হেমলতার হস্ত হইতে সেই কঙ্কণ খুলিয়া লইলেন।

তখন হেমলতা বলিল, “নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্মপরায়ণ, বাল্যকাল হইতেই তোমার ধর্মে আস্থা আছে, সে ধর্ম কখনও বিস্মৃত হইও না, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন। তিনি যাহাকে বাহা করিয়াছেন, বেন আমার সেইরূপ থাকি। এই চেষ্টা করি। পুষ্পটি দুই এক দিন গন্ধ বিস্তার করিয়া শুক হইয়া যার, পক্ষীটি আলোকে প্রফুল্ল হইয়া গান করে, তাহাদের সেই কার্য। নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত স্বীণের প্রতি দয়া করিও। আর ভগবান্ আমাকে দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, তিনি সহায় হউন, সেই স্বামীর সেবার বেন কখনও ক্ষতি না করি, সেই স্বামীতে বেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমি বেন তাঁহারই চিরপতিব্রতা দাসী হইয়া থাকি। নরেন্দ্র! ভাই নরেন! বাল্যকালে তুমি আমাকে ধর্ম-শিক্ষা দিয়াছিলে। এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা লাভ। এস ভাই, আমরা

প্রতিষ্ঠিত হই, যখন কখন ভাঙ্গ করিব না, আমি জন্মে মরণে চিরপতিব্রতা হইয়া থাকিব।" কথা সাক্ষ করিয়া হেমলতা দেব-প্রতিমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইল, নরেন্দ্র নিঃশব্দে প্রণত হইলেন।

উদ্ভিগা আবার সবদে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া হেমলতা বলিল, "তাই নরেন, এক্ষণে রাজি অধিক হইয়াছে, বিদায় নাও, আমি চিরকাল তোমাকে কোঠভ্রাতার স্থায় ভালবাসিব, তুমিও তোমার কনিষ্ঠ ভগিনীকে মনে রাখিও।"

একবিষ্ম জল নয়ন হইতে মোচন করিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিজ্জাত হইল। বতকণ দেখা যাইল, নরেন্দ্র হেমের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর? তাহার পর এ জগতের মধ্যে নিতান্ত তর্ভাগা লোকও নরেন্দ্রের সে রজনীর শোক ও বিবাদ দেখিলে বিষম হইত। অভাগার স্বয়ং আজ শূন্য হইল, অভাগার প্রণয়-ইতিহাস আজ সমাপ্ত হইল।

মাধবকঙ্কণটি হ্রবরে ধারণ করিয়া নরেন্দ্র যমুনাতীরে বসিয়াছিলেন। হেমলতার কথা-গুলি তাঁহার মনে বার বার উদয় হইতে লাগিল,—“উটি উন্মোচন কর, উহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবি-ধাসিনী পত্নী নহি।” নরেন্দ্রের কি সে প্রণয়-নিদর্শনটি রাখিবার অধিকার আছে? সমস্ত রজনী নরেন্দ্র সেটি হ্রবরে ধারণ করিয়া রহিলেন, প্রাতঃকালে শূন্য-হ্রবরে সেটি বিসর্জন দিলেন, যমুনার জলে ভাসিতে ভাসিতে শুক কঙ্কণটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগের যুদ্ধ।

Suddenly, as if arrested by fear or
feeling of wonder,
Stile she stood, with her colorless lips.
art while a shudder
Ram through her frame * * *
Sweet was to light of his eyes ; but
it suddenly sank into darkness.
As when a lamp is blown ou by a
gust of wind casemet.
Longfellow.

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল, কেবল আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকাদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে বাকী আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রা বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিতে-ছিলেন। শীতকালে প্রয়াগের নিকট সূজাও আরংজীবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর সূজা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যশোবন্ত সিং এই যুদ্ধে আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মহাদোদ্ধার অধিক ক্ষতি করিতে পারিলেন না, কোড়ে রাজহানে প্রত্যাঘাত করিলেন।

সূজা প্রয়াগ হইতে পাটনা, পাটনা হইতে মুন্সের, মুন্সের হইতে রাজমহল এবং তথা হইতে পলা পাই হইয়া তওয়ার পলায়ন করিলেন। আরংজীবের পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি আমির জুমলা তাঁহার পক্ষাভাবন করিতেছিলেন। তওয়ার রাজপুত্র মহম্মদ, সূজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সূজার পক্ষ-বলধন করিলেন; কিন্তু উভয়েই আমির জুমলার নিকট পরাস্ত হইলেন। তৎপরে মহম্মদ পিতার কণ্ঠপদ্রে বিশ্বাস করিয়া

শ্রীশচন্দ্রের গৃহবিবাহ

সহীক স্ত্রীর পক্ষ ত্যাগ করিলেন, অত্যাচারী আত্মকানে পলায়ন করিলেন। তৎকাল রাজার সহিত বিরোধ হওয়ার ফলে সৈন্তে হত হইলেন, তাঁহার কন্যাকে রাজা বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, স্ত্রীর রূপবতী সহধর্মিণী পার্শ্ববাসী বিবাহে আত্মহত্যা করিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, যিনি বুদ্ধে সাহস, শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্ততার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন, ষাঁহার রাজমহলের প্রাসাদ মধ্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দলহরীতে ডাসিত, তিনি যুতুকালে মৃত্যু রাত্রিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশে শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।

দ্বারা শ্রামনগর অথবা কতে-আবাদের বুদ্ধে পরাজয়ের পর সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, আরংজীবের সৈন্ত তথা হইতে দ্বারাকে দিল্লী লইয়া আইসে। মুশংস সম্রাট জ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট অপমান করিয়া পরে হত্যা করেন। কাকারুদ্ধ মোরাদও অচিরে রাজাজ্ঞার হত হইলেন। ত্রাত্তরক্ষেপাত হইয়া আরংজীব ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

যে দিন মথুরার হেমের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর নরেন্দ্র নিরুদ্ধ হইলেন। হেমলতা বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নরেন্দ্রের অনেক অনুলন্ধান করাইলেন, মহাভূতব শ্রীশচন্দ্র দেশে দেশে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র কিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমীদারীর অর্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিবেন; কিন্তু সেই দিনের পর নরেন্দ্রকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

হেমলতা বীরনগরে শ্রীশচন্দ্রের সহিত পান করিতে লাগিলেন, মথুরা-মন্দিরে যে

অত্যাচার করিয়াছিলেন, হেম তাহা বিবর্তন নাই, পতিসেবার ধর্মপরাগণ হেমের অস্ত চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন অস্ত ধর্ম তিনি জানিতেন না। ক্রমে শ্রীশচন্দ্রের ঔরসে তাঁহার হেমন্তকুমারী ও সরস্বতী নামক দুইটি কন্যা ও প্রতাপ নামক একটি পুত্র জন্মিল। বিংশতি বৎসর পূর্বে শ্রীশ, নরেন্দ্র ও হেমলতা যেরূপ সায়ংকালে গঙ্গাতীরে খেলা করিত, বাশ্পোৎফুল্ললোচনে হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার পুত্র-কাগণ সেই স্থানে সেইরূপে খেলা করিতেছে, মৌড়া-মৌড়ি করিতেছে, আনন্দলহরীতে চারিদিকের কুলবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সংসারের এই গতি, একদল ইতেছে, অজ্ঞদল আসিতেছে। শিশুটি ললাট পরিহার, নয়ন উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল শাস্ত, এখনও মানব-জীবনের চিন্তার স্বর্গী বরব অঙ্কিত হয় নাই।

হেমলতার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পর হেমলতা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের আবাস দেখিতে গেলেন। গঙ্গার তীরে হইতে কয়েক কোশ দূরে একটি সন্দ্র শিমূলবৃক্ষ ছিল। শিমূল বৃক্ষের গুড়ি হইতে প্রায় তিনদিকে তিনটি দেওয়ারালের মত পাট বাহির হয়, এই বৃক্ষের পাটগুলি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেখিলে বোধ হয় যেন, একটি উন্নত ঘর হইয়াছে। সেই অপকল্প ঘরে একজন সন্ন্যাসী কয়েক বৎসর অবধি বাস করিতেছিলেন। পল্লীগাম্য গৃহিণী ও বালিকাগণ সন্নেহে সেই সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ চন্দ্র ও কলমূল আনিয়া দিত তাহাতেই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। সমস্ত দিন প্রায় ধ্যানের রত থাকিতেন, সায়ংকালে সেই গ্রামের ভিতর গৃহে গৃহে যাইতেন, শোক-বিদগ্ধকে সাহসনা করা, পীড়িতকে শুশ্রূষা

করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মানবের কষ্ট নিবারণ করা তাহার জীবনের কার্য। গভীর স্বভাবী পর্যন্ত এই কার্য করিয়া আবার তিনি সেই তরুণকে কিরিয়া আসিতেন, তথায় বাসের উপর কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকল কালেই তিনি সমভাবে নিদ্রা বাইতেন। সেই তরুণ ও সেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য অনেক দেশ হইতে অনেক লোক আসিত।

হেমলতা বৃক্ষের কিকিদ্ধুরে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে পদ-ব্রজে তরুর নিকট বাইরা সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি প্রণাম করিলেন; পরে আপন শিশু পুত্রটিকে কোড়ে লইয়া লগ্নায়মান হইয়া সেই সন্ন্যাসীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। সে দিক হইতে আর নরন কিরাইতে পারিলেন না, নিস্পন্দভাবে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীও হেমলতার দিকে দৃষ্টিতে

চাহিতেছিলেন, তিনি দীর্ঘ-মরমে হেমলতাকে প্রণাম করিতে দেখিলেন, সত্বক-মরমে হেমলতার কমনীয় কভা-পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল যেন, দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর মন একবার আলোড়িত হইল, বোধ হইল, চক্ষু একবিন্দু জলে আবৃত হইল; অবশেষে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে হেমের নিকটে আসিয়া শিশুদিগের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন; পরে হেমলতার দিকে দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া বলিলেন, “আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার দেবত্বা স্বামীতে যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে, অগ্নে মরণে যেন চির-পতিব্রতা হইয়া থাক।”

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আর কেহ সে তরুতলে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না, সন্ন্যাসী যে সে গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ আর জানিতে পারিল না।

উপহার।



বিজ্ঞানোৎসাহী, সংযতমনা, উদারচরিত্র,

কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত।

প্রিয় ভ্রাতঃ।

ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিজ্ঞা আহরণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা যথন চিন্তা করি, তখনই আনন্দিত হই। কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য রত্নের অধিকারী! সে রত্ন, নির্মল উদারচরিত্র, মনঃসংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞানচর্চার অনিন্দনীয় উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা।

এই অসাধারণ সঙ্গুণ-সমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গলসাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলোচ্ছাস। ভ্রাতার জীবনব্যাপী স্নেহের সামান্য নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।

দক্ষিণ শাহবাড়পুৰ,

১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

মহারাক্ষ জীবন-প্রভাত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

জীবন-উষা ।

দেও করতালি, অব অব বসি,

করিয়া অস্ত্রাদি কুহুম লহ ।

ঐ বে-প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে

উদয় অরুণ উষায় সহ ।

হেসচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ।

খৃষ্টের ষাটশ শতাব্দীর শেষে মহম্মদ বোরী আর্ঘ্যাবর্ত-প্রদেশ জয় করেন । সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিল, বিদ্বাচল ও নন্দনারূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইয়া দাক্ষিণাত্য জয় করিবার কোন উত্তম করে নাই । অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর সুব্রাজ আলা-উদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনার সহিত নন্দনাদানী পার হইলেন এবং সহসা হিন্দুরাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । দেবগড়ের রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলা-উদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল এবং হিন্দুরাজ বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ প্রদান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন । পরে আলা-উদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাসুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া নন্দনাদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিশেষতঃ ও ব্যতি-

বাস্ত করেন । দেবগড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য দিল্লীর মুসলমান-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল ।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ টোগলক দিল্লীর সম্রাট হইয়া মুসলমান দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস করেন এবং দেবগড়ের নাম পরিবর্তন করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন । কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল । হিন্দুগণ বিজয়নগরে নতুন রাজধানী স্থাপন করিয়া, একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল এবং মুসলমানগণ দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান-রাজ্য স্থাপন করিল । কালক্রমে বিজয়-নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল । প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোন চেষ্টা করেন নাই ।

কিন্তু দিল্লীর উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দুসাম্রাজ্য বিপদভ্রষ্ট ছিল না । হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমানরাজ্যকে স্থান দিয়াছিল । সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয়

চাল; পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখানেন।
অখারোহীর বয়সের অষ্টাদশবর্ষ হইবে,
অবরর উন্নত ও পৌরষ; কিন্তু পরিষ্কার ও
মৌলোত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ড-
লের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে। শরীর
শুষ্ক ও দৃঢ়ীকৃত, ললাট উন্নত, চক্ষুর
জ্যোতিঃপূর্ণ। মুখমণ্ডল উদারব্যাক্ত ও
অতিশয় তেজঃপূর্ণ। বৃক অথকে অন্ন বিজ্ঞান
দিবার লক্ষ লক্ষ দিয়া জ্বিতে অবতীর্ণ হই-
লেন, বরা বৃকোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্ষা
বৃকশাখার হেলাইরা রাখিলেন ও হস্ত দ্বারা
ললাটের বর্ষ মোচন করিয়া নিবিড় কৃষ্ণ
কেশগুল পক্ষাঙ্কিত সরাইরা কণেক আকা-
শের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক,
অচিরং তুমুল বাত্যা আসিবে, তাহার সংশয়
নাই। হস্ত মঞ্চ বায়ু বহিতে আরম্ভ হই-
তেছে এবং অনন্তপর্কত ও পাদপঞ্জেরী
হইতে গভীর শব্দ উদ্ভিত হইতেছে। দুই
একটি ভিত্তিত মেঘগর্জন শুনা যাইতেছে
এবং যুবকের শুক ওঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজল
পতিত হইল। এখন বাইবার সময় নহে,
আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও
অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু যুবকের চিন্তা
করিবার সময় ছিল না। তিনি যে কার্যে
আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিলম্ব সহে না,
তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন, তিনি
কোন আপত্তি শুনে ন, যুবকেরও বিলম্ব
বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই, পুনরায়
বর্ষা হস্তে লইয়া লক্ষ দিয়া তিনি অধঃপৃষ্ঠে
উঠিলেন, আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে
নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় বেগে অধ-
চালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্কত-প্রদেশের
স্থপ প্রতিধ্বনি আগরিত করিয়া চলিলেন।

অলক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ

হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অল্প
প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুন্নতা চমকিত হইল। কেবল
পর্কত্রে সেই অনন্ত পর্কত-প্রদেশ যেন শব্দ-
বার শব্দিত হইল। অচিরং কোটি-রাক্ষস-
বল বিজ্ঞপ করিয়া ভীষণ-পর্কত পবন প্রবাহ-
হিত হইয়া যেন সেই অনন্ত পর্কতকেও
সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। শব্দ
পর্কতের অসংখ্য পাদপঞ্জেরী হইতে কৰ্ণভেদী
শব্দ উদ্ভিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত
পর্কত-ওরঙ্গীর জল উৎক্লিষ্ট হইয়া চারি-
দিকে বিকীরণ হইতে লাগিল, যন যন বিদ্যু-
দালোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতি এই ঘোর
বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল ও সমগ্র মধ্যে বহু-
শব্দে অগৎ কল্পিত ও শুক হইতে লাগিল।
অরার মূলধারার বৃষ্টি পড়িয়া পর্কত, অরণ্য
ও উপত্যকা প্রাবিত করিল, জলপ্রপাত ও
তরঙ্গিনী-সমূহকে দ্রুতকার ও উচ্ছলিত
করিয়া তুলিল।

অখারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া
সাবধানে চলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে
বোধ হইল যেন, অথ ও অখারোহী বায়ুবেগে
পর্কত হইতে সম্বোরে নাচে নিক্ষিপ্ত হইবে।
বায়ুপীড়িত বৃকশাখার সজোর আঘাতে
অখারোহীর উজ্জ্বল ছিন্ন হইল, তাঁহার ললাট
হইতে দুই এক বিন্দু কৃষ্ণ পড়িতে লাগিল,
তথাপি যে কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে
অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, স্তবরাং যুবক মুহূর্ত্ত-
বাক্ত ও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য, সতর্ক-
ভাবে অধঃচালনা করিতে লাগিলেন। দুই
তিন দণ্ড মূলধারার বৃষ্টি হওয়াতে ক্রমে
আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অচিরং
বৃষ্টি ধামিরা গেল। অতঃপর চূড়াবলী শব্দের
আলোকে সেই পর্কতরাশি ও নবম্বাত বৃক-
সমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল।

যুবক ছুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অধ

ধামাইলেন ও নিত কোনও পুস্তক গ্রন্থের অক্ষর প্রশস্ত লগাট হইতে অপসৃত করিয়া নির-
বিক্রী পাত করিলেন। বহুদূর দেখা যায়,
হুই তিন সহস্র উন্নত পর্কতশব্দগুলি
শোভা পাইতেছে ও সেই পর্কতসমূহের
পার্শ্বে, বহুকে, চারিদিকে সবস্নাত নিবিড়
হরিকণ অনন্ত পাদপদ্মে স্বর্বাণ্যলোকে চিক্
চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত
সমস্ত শব্দকার হইয়া বর্জিত-পৌরবে শব্দ
হইতে শব্দান্তরে নৃত্য করিতেছে ও স্বর্ষ্যের
সুবর্ণ-রশ্মিতে বহু স্নান ক্রীড়া করিতেছে।
পর্কত ও শিখরের উপর স্বর্ষ্যরশ্মি নানাবর্ণ
ধারণ করিয়াছে, জলপ্রপাতের উপর রামধন
খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড বহু
নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূর বায়ু
দ্বারা তাড়িত হইয়া মেঘরাশি বৃষ্টিরূপে
গণিত হইতেছে।

স্বক ক্ষণমাত্র এই শোভার মুগ্ধ রহিলেন।
পরে স্বর্ষ্যের দিকে অবলোকন করিয়া ক্ষীণ
দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন; অচিরে
আগুন পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।
তখন স্বর্ষ্য অস্ত হইতেছে, অমনি কনকনা
শব্দে দ্বার বন্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের
দিকে চাহিয়া কহিলেন, “অধিক সকালে
শৌছেন নাই; আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে
অন্য রাজ্যে প্রাচীরের বাহিরে অভিবাহিত
করিতে হইত।”

যুবক। সেই এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় নাই;
প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ভবানীর
প্রসাদে তাহা রাখিব, অতঃপর কিম্বাদারের
নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।

দ্বাররক্ষক। কিম্বাদারও আপনার জন্ত
প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যুবক তৎক্ষণাৎ কিম্বাদারের প্রাসাদে বাই-

লেন ও সম্রাট অভিযান করিয়া নির-
কটিনে হইতে বহন হুইয়া কতকগুলি
লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।
কিম্বাদার হাতীসীতার একজন শিবজীর
বিষয় বোঝা, তিনি লিপিসমূহের প্রতীক্ষা
করিতেছিলেন, দুতের দিকে না চাহিয়াই
মনোনিবেশ পূর্বক সেইগুলি পাঠ করিতে
লাগিলেন।

দ্বিতীয় সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের
আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিম্বাদার শিবজীর
বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন ও কোন
বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপিপাঠে
সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই
লিপি পাঠ করিয়া কিম্বাদার অবশেষে পত্র-
বাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশ-
বর্ষীয় যুবকের কালকোচিত উদার মুখমণ্ডল
ও আনন্দনামলবী গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণকেশ
দেখিয়া কিম্বাদার একবার চকিত হইলেন।
লিপির দিকে দেখিলেন, আবার বালক বা
যুবক দিকে মর্দভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাই-
লেন; অবশেষে বলিলেন, “হাবিলদার!
তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে
রাজপুত?”

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নামাইয়া
প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিম্বাদার। তুমি আকৃতি ও ছিলেন
বালক মাত্র; কিন্তু বিবেচনা করসিঁহে
কালে পরামুখ নহে। প্রথম বিজিত

রঘুনাথজী। বহু ও দে। তাঁহার পুত্র
সাধ্য, বোধ হয়, তাহাতে কত বশেষত্যাগে
দেখেন নাই। সিদ্ধি ভরনি এক কল্পিতকল্প
কিম্বাদার। তুমি সিদ্ধি হইয়াছিলেন। কত
দুর্গে এত ক্ষীণ আসিবেশের পরমবন্ধ ছিলে
রঘুনাথজী। অন্যদিনের দ্রীক ভাগ

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কস্তার পিতামাতার

উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কার্য-সাধনে তোমার বৈয়াকরণীয়, তোমার আকৃতিই তাহার পরিচয় দিতেছে।” রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিন্ধু ও লগাটের ঈষৎ কত দেখা বাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা, মহারাজার, যোগল ও রাজপুত সেনার অবস্থা ও সংখ্যা ত্বরিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী বতদূর পারিলেন, উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন, “তবে কল্যাণ প্রাপ্তে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রেরিত থাকিবে। আর প্রভু শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে, তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষয় কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে হাবিলদার কার্যের অল্প-যুক্ত নহে।” প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গুঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সেগুলি লিপির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রু-কারণে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সেগুলি আসিয়াই রচনা বাইতে পারে কি না, অর্থাৎ তিনি যে প্রভুরায়ে শত্রুর বশবর্তী হইয়া গুঢ় কোন আপত্তি গুরুত প্রকাশ করা রঘুনাথের বা আপত্তি করার কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করি। হস্তে লইয়া লক্ষ্যরঘুনাথ নয়নপথের বহি-উঠিলেন, আর এক মুহূর্তের ঈষৎ হাস্ত করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, পরে এ বিষয়ে অসাধারণ চালন করিয়া সেই নিঃশর্তা যথার্থই উপযুক্ত স্থপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত হইল।

অন্যকণমধ্যেই ডয়ানক—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সদ্রঘুবালা।

সজনি। ভাল করি পেশন না ভেল।
 মেঘবালা। সঙ্গে ভড়িতলতা লহু কদরে শেল
 আখ আঁচল বসি, আখবসনে
 আখ উরজ হেরি, আখ ভর তব
 একে তহু গোরা কনক গোরা অতহু
 হরি হরি কহ সব অহু হরি
 দশন মুহুতাগতি অধর নি
 বিদ্যাগতি কহ, অতরে সে
 হেরি না পু
 কাশ।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদ্যাগতি পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে বাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অন্নদিন পরেই ভবানীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোন ও অধরদেবীর অতি উচ্চকুলোদ্ভব এক গুণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবার নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্যে লিপ্ত হইতেন না।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধীত যুদ্ধরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন।

যখন মন্দিরের নিকটে আসিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমদিকের আকাশের স্তিমিত আলোকে বেত-মন্দির স্থলর শোভা পাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র উদ্ভান প্রায় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বাগীতে মাই,

তরায় রঘুনাথ উত্তানে একটি প্রস্তরের উপর বসিয়া কণেক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।

সন্ধ্যার সময়ে সেই উত্তানে একজন বালিকা ফুল তুলিতে আসিলেন । রঘুনাথ দেখিয়া দ্বিবে বিস্মিত হইলেন, কেন না, বালিকা এ দেশের নহে, পরিচ্ছন্ন দেখিয়া বুঝিলেন, বালিকা রাজপুত । বহুদিন পরে একজন স্বদেশীয় রমণীকে দেখিয়া রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল । ইচ্ছা হইল, রাজপুত বালিকার নিকট বাইরা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন ; কিন্তু রঘুনাথ সেই ইচ্ছা দমন করিলেন, বৃক্ষতলে সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া কণেক সেই বালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । যত দেখিতে লাগিলেন, রঘুনাথের হৃদয় আরও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল ।

বালিকা অসুখমান ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া । তাঁহার বেশম-বিনিন্দিত সুমার্জিত অতি রূক্ষ কেশপাশ গণ্ডস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে এবং উজ্জল মুখমণ্ডল ও ভ্রমর-বিনিন্দিত চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে । ক্রমশঃ যেন তুলী দ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে । ওষ্ঠদ্বয় সুন্দর রক্তবর্ণ, হস্ত ও বাহু সুগোল এবং স্তবর্ণের বলয় ও কঙ্কণ দ্বারা সুশোভিত । কস্তার ললাটে আকাশের রক্তিমাক্ষটা পতিত হইয়া সেই তপ্ত কাকীন-বর্ণকে সম-ধিক উজ্জল করিতেছে । কণ্ঠ ও ঈষৎদূরত বক্ষস্থলের উপর একটি কর্ণমালা দোহলা-মান রহিয়াছে । রঘুনাথ অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের ভিমিত আলোকে সেই অপূর্ণদৃষ্টা রাজপুতকস্তার দিকে চাহিয়া ছিলেন ; তাঁহার হৃদয় পূর্বে অনহত আনন্দ-স্রোতে সিক্ত হইতেছিল ।

কস্তা ফুল তুলিয়া গৃহে বাইবার উপক্রম

করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, অনতি-দূরে একজন দীর্ঘকায় রাজপুত যুবক তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন । ঈষৎ লজ্জার কস্তার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন ; আবার চাহিয়া দেখিলেন । যুবক তখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুহু গুহু কক্ষকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃ-পূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে ; কোঁবে খড়্গ, ধক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা । যুবক অনিমেষ-লোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । বহুদিন পরে একজন দেশীয় যোদ্ধাকে এই মহারাজু-চূর্ণে দেখিয়া রাজপুত-বালা প্রথমে বিস্মিত হইলেন । যুবকের আকৃতি ও উজ্জল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি চকিত হইলেন, মুখমণ্ডল নত করিয়া ফুলের সাজি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্ত প্রাপ্ত হই-লেন ; মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত দীর্ঘ দীর্ঘে চিন্তিতভাবে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও পুরোহিতের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এই অবসরে আয়রা পাঠককে পুরোহিতের পরিচয় দিব ।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অধর-দেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ । তাঁহার নাম জনার্দন দেব । তিনি অধরের প্রসিদ্ধ রাজা জয়সিংহের একজন সভাসদ ছিলেন, পরে শিবজীর বহু অহুরোধে জয়সিংহের অহুযত্নানুসারে শিবজীর সর্বপ্রথম বিজিত ভোরগড়গুণে আগমন করেন । তাঁহার পুত্র-কস্তা কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশত্যাগের অতিরিক্তপূর্বেই তিনি এক ক্ষত্রিয়কস্তার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন । কস্তার পিতা জনার্দনের আশৈশব পরমবন্ধু ছিলেন, কস্তার মাতাও জনার্দনের স্বীকৃত ভগিনী সখোদন করিতেছেন । কস্তার পিতামাতার

কাল হওয়ার নিঃসন্তান জনাৰ্দ্দন ও তাঁহার গৃহিণী ঐ শিশু কস্তুরবালার লালন-পালনভার লইলেন ও ভোরপহুর্গে আসিরা সেই শিশুকে অগত্যনির্কীর্ষেবে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনাৰ্দ্দনের স্ত্রীর কাল হইলে কস্তা সরযু জিন্ন যুদ্ধের মেহের জন্য আর কেহ বহিল না, সরযুবালাও জনাৰ্দ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভালবাসিতেন। কালক্রমে সরযুবালা নিকপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, সুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনাৰ্দ্দনকে কণ্ঠ মুনি ও তাঁহার পালিতা নিকপমা লাবণ্যময়ী কস্তুরবালাকে শঙ্কুস্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনাৰ্দ্দনও কস্তার সৌন্দর্য্য ও রেহে পরিভূট হইয়া রাজস্থান হইতে নিরুাসনের চুঃখ বিষ্মত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনাৰ্দ্দন দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছে, অবয়ব দীৰ্ঘ ও এঘনও বলিষ্ঠ, চক্ষুঃশান্তিরদগ্ধপূর্ণ, বকঃস্থল বিশাল, বাহু-দ্বয় দীৰ্ঘ ও বলিষ্ঠ। জনাৰ্দ্দনের বর্ণ গৌর এবং স্বক হইতে বজ্রোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র মন ও সরল হৃদয় তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনাৰ্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিরা রঘুনাথ সসম্মানে আসনত্যাগ করিরা গাজোপাধন করিলেন।

সংক্ষেপে বিষ্টালাপ করিরা উভয়ে আসনগ্রহণ করিলেন ও জনাৰ্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন, যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন ও শিবজীর প্রণয় জানাইয়া পূজকের হস্তে করেকটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন, “প্রভুর প্রার্থনা যে, তিনি এক্ষণে যোগলদিগের সহিত রণে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার

জয়ের জন্ত ভবানীর নিকটে পূজা করিবেন। দেবীপ্রসাদ ভিন্ন যত্নব্য-চেষ্টা বৃথা।”

জনাৰ্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক হির গজীর-ধরে উত্তর করিলেন, “সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষার জন্ত বাহুশ লোকের চিরকালই ব্য-করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরীধৰ্ম্ম শিব-জীর বি জয়ের জন্ত অবশ্যই পূজা দিব। মহা-শ্রমকে জানাইও, সে বিষয়ে জ্ঞাতি করিব না।”

রঘুনাথ। দেবীপদে প্রভুর আর একটি আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রযুক্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।

জনাৰ্দ্দন কণেক চক্ষু মুদিত করিরা রহিলেন, পরে পুনরায় গজীরধরে বলিলেন, “রজনীঘোণে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।”

রঘুনাথ ধন্তবাদ দিয়া বিদায় হইবার উদ্দেশ্যে করিতেছেন, এমন সময়ে জনাৰ্দ্দন বলিলেন, “তোমাকে ইতিপূর্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অজ্ঞ কি এই প্রথম এ স্থলে আসিরাছা ?”

রঘুনাথ। অজ্ঞই আসিরাছি।

জনাৰ্দ্দন। দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে ? থাকিবার স্থান আছে ?

রঘুনাথ। পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রাতেই চলিরা যাইব।

জনাৰ্দ্দন। কি জন্ত অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে ?

রঘুনাথ। প্রভুর অহুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদিগের সর্বদাই এইরূপে রাজি অতিবাহিত করিতে হয়।

জনার্দন । বৎস ! যুদ্ধ-সময়ে ক্রেশ অনি-
র্বা, কিন্তু অস্ত্র-সহনের কোন আবশ্য-
কতা নাই । আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি
কর । আমার পালিতকত্তা তোমার খাওয়ার
আয়োজন করিয়া দিবে । পরে রাজিতে
বিশ্রাম করিয়া কলা শিবকীর মিকটে দেবীর
আজ্ঞা লইয়া বাইবে ।

রঘুনাথকীর বক্ষঃস্থল সহসা ক্ষীত হইল,
তাহার হৃদয়ে বেন কে সজোরে আঘাত
করিল । এ বাতনা, না আনন্দের উদ্বোধন ?
জনার্দনের পালিতকত্তা কে ? তিনি কি সেই
পুষ্পোদ্ভানে দৃষ্টা লাভণ্যময়ী রাজপুতবালা ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কণ্ঠমালা ।

[[যন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পঠন ।

ভারতচন্দ্র রায় ।

রজনী প্রায় একপ্রহর হইলে, সরযুবালা
পিতার আদেশে অতিথির খাওয়ার আয়োজন
করিয়া দিলেন । রঘুনাথ আসন গ্রহণ করি-
লেন, সরযু পশ্চাতে নতুনায়মান রহিলেন ।
মহারাষ্ট্র-দেশে অভাববিধি আহৃত ব্যক্তিকে
পরিবারের মধ্যে কোন একজন রমণী
আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে ।

রঘুনাথ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু
রঘুনাথের হৃদয় আজি চাকলা-পরিপূর্ণ ও
অস্থির । সরযু বস্ত্র করিয়া অনেক প্রকার
আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ
অন্ত কি খাইলেন, ঠিক জানেন না । জনার্দন
ঔষ্মক্য-সহকারে রাজস্থানের কথা কহিতে
লাগিলেন, রঘুনাথ সময়ে সময়ে উত্তর দেন,
সময়ে সময়ে একটু অস্তমনক হন ।

আহার শেষ হইল । বেতপ্রস্তরবিনির্মিত

আধারে সরযু মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন,
রঘুনাথ পাত্ৰধারিণীর দিকে দোষগচিৎ
চাহিলেন, বেন তাহার হৃদয় সে দৃষ্টির
সহিত মিশিত হইয়া সেই কত্তার দিকে, বাব-
বান হইল, চান্দিচন্দ্র মিলন হইল, সরযু
মুখমণ্ডল লজ্জার ঐবৎ রক্তবর্ণ হইল, মুখ
অবনত করিয়া সরযু বীরে বীরে সরিয়া
গেলেন । রঘুনাথও বৎপরাণোত্তাপি লাজিত
হইয়া অধোবদন হইলেন ।

হস্তমুখ-প্রক্ষালনের জন্ত সরযু জল
আনিয়া দিলেন । রঘুনাথ বর্ষর নহেন,
এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রহিলেন,
কেবল সরযুর সুন্দর সুবর্ণ-বরণ-বিকড়িত
সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন । একটি
দীর্ঘশ্বাস-তাগ করিলেন ।

রঘুনাথের শয্যারচনা হইল । রঘুনাথ
শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার বীরে বীরে
উন্মোচন করিয়া নক্ষত্রালোকে সেই পুষ্পো-
দ্ভানে পদচারণ করিতে লাগিলেন ।

সেই গভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত
নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্প-
বয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন ? নিশার
ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই
সুশ্রদ্ধ ছায়ার মহাবা, জীব, জন্ত, সমগ্র
জগৎ সুপ্ত হইয়াছে । হুর্গে শব্দমাত্র নাই,
কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দমাত্র শুনা
যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘটাবব সেই
নিভক হুর্গে ও চতুর্দিকস্থ পর্কতে প্রতিহত
হইতেছে । এ গভীর অন্ধকার রজনীতে
রঘুনাথ অন্ত্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন ?

রঘুনাথ অদ্য কেন সেই উদ্যানে পদ-
চারণ করিতেছেন, তাহা রঘুনাথ জানেন
না । এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য
বেন সহসা তাহার শাস্ত্র, নীল জীবনা-
কাশের উপর একটি নূতন আলোক উদ্ভিত

হইল, তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠা ও বেগবতী মনের
বৃত্তি সহসা আগরিত হইল। শতবার
সেই রাজপুত্রবালার আনন্দময়ী মুক্তি তাঁহার
মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্যালিখিত
কমলগল, পুষ্পবিনিমিত্ত রম্যময় ওষ্ঠ, সেই
সুগোল বাহুগল, সেই আরক্ত ব্রহ্মপূর্ণ
নয়ন, সেই চিত্তহারী অভুল লাভ্যা! রঘু-
নাথ! এ সুলক্ষ্মী কি তোমার হইবে?
তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র,
জনার্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত্র, তাঁহার
পালিতকন্যা রাজাদিগেবও প্রার্থনীয়। কি
জন্য এরূপ আশার হৃদয় বৃথা ব্যথিত করি-
তেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণার কেন
হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়,
শীঘ্র আমাদের হৃদয়ে নৈরাশ হয় না, অসাধ্য
আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও
সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে
চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে
ছিলেন। অনেকক্ষণ পর দণ্ডায়মান হই-
লেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু
স্থাপন করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন,
মনে মনে বলিলেন, “ভগবান্, সহায় হও,
অবশ্য কৃতকার্য হইব। বশ, মান, খ্যাতি
মাহুবা-সাধ্য, কি জন্ম আমার অসাধ্য হইবে?
আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু
কি অন্য অপেক্ষা দুর্বল? দেবগণ, আমার
সহায় হও, আমি যুদ্ধে পিতার নাম রক্ষা
করিব, রাজপুত্রের উচিত সম্মান লাভ
করিব। তাহার পর? যদি কৃতকার্য
হই, তাহা হইলে সরস্ব! আমি তোমার
অবোগ্য হইব না, তখন সরস্ব! তোমাকে
গল্পম্বলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব,
তখন তোমার সুলক্ষ্মীর হস্তদ্বয় আমার এই
কম্পিত হস্তদ্বয়ে স্থাপন করিব, তখন ঐ

লাবণ্যময়ী দেহলতা এই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ধারণ
করিব, তখন ঐ সুলক্ষ্মীর বিষবিনিন্দিত ওষ্ঠ-
বহর”—রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে
গৃহের দিকে কিরিলেন। সহসা দেখিলেন,
একটি কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে। ছুটি
করিয়া মুক্তা, পরে একটি করিয়া পলা,—
রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা
পূর্বাধিন সন্ধ্যাকালে সরস্ব কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে
ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, অদাবধানতা
বশতঃ ঐ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ
আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভগবান্!
এ কি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্বলক্ষণ
দান করিলেন?”

মালাটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রঘুনাথ
নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রাতে রঘুনাথের
নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দনদেবের নিকট
ভুবান্বিত আজ্ঞা জানিলেন, “রোহিণীগের
সহিত যুদ্ধে জয়, অশ্বমেধদিগের সহিত যুদ্ধে
পরাজয়।”

দুর্গত্যাগের পূর্বে রঘুনাথ একবার
সরস্বর সহিত দেখা করিলেন। সরস্ব
যখন পুনরায় উদ্যানে ফুল ভূমিতে আসিয়া
ছেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথও তথায় বাইলেন।
হৃদয়ের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ
কম্পিতস্বরে রঘুনাথ বলিলেন, “ভদ্রে!
কল্যাণিনিবোধে এই কণ্ঠমালাটি এই স্থানে
পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসিয়াছি,
অপরিচিতের ধৃষ্টতা মাফনা করুন।”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরস্ব কিরিয়া
চাহিলেন। দেখিলেন, সেই কমলীয় উদার
মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত্ত উন্নত ললাট, সেই
উজ্জ্বল নয়নদ্বয়, সেই তরুণ বোদ্ধা। রমণীর
গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া
উঠিল।

রঘুনাথ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, দেখিলেন, সেই আরত নরন দুইটি হুন্ হুন্ করিতেছে, তাঁহার আপনার নরনও তক ছিল না।

—

এই অস্থগ্ৰহটি আমাকে প্রাণান করুন, ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখিবেন।”

সরযু ললজ্জনরনে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, সে বিশাল আরত নরনের কণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় কণ্ঠিত হইল। তৎক্ষণাৎ রক্তিমুখী লজ্জার আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। সম্মতির লক্ষণ পাইয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কঠমালা পরাইয়া দিলেন, কণ্ঠার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।

ক্ষণেক পর রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, “তবে অতিথিকে বিদায় দিন।”

সরযু এবার লজ্জা ও উবেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, “আপনার নিষ্ঠুর অঙ্গগৃহীত রহিলাম, পুনরায় যদি ভ্রূগে আইসেন, ভরসা করি, পুনরায় পিতার এই মন্দিরে অবস্থান করিবেন।”

লিপাসার্ভ চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টি+ বিন্দুর স্রাব, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে উবার প্রথম রক্তিমাক্ষতার স্রাব, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃতকথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্রাবিত করিল। তিনি উত্তর করিলেন, “ভদ্রে, আমি পরের দাস, বৃদ্ধ আখ্যার ব্যবসা, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না, জানি না। কিন্তু যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন আপনার দেবনিমিত্ত মুক্তি মুহূর্তের জন্যও বিবৃত হইব না।”

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না। রঘুনাথ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সারেস্তু থাঁ।

কেন চিন্তাকুল আশি নবাবের মন?

নবীনচন্দ্র সেন।

যদি করেক বৎসর অবাধি শিবজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং চর্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খৃঃ অকের পূর্বে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে বলীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর সারেস্তু থাঁ আমীর উল উমরা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণদেশের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। সায়েস্তা থাঁ সেই বৎসরেই পুনা, চানকদুর্গ ও অন্ত করেক স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা-বিবৃত-সময়ে সারেস্তু থাঁ শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে বাড়ওয়ারের রাজা প্রসিকনামা বশোবস্ত সিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খৃঃ) বহু সৈন্য লইয়া সারেস্তু থাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। যোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবশিত করিয়াছিল ও সারেস্তু থাঁ স্বয়ং দানাজী কানাইদেবের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাসকালে যাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। সারেস্তু থাঁ শিবজীর চাতুরী

বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, অসুস্থতাপন্ন বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিবজী মিকটবর্জী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রেরা সে সময়ে বুদ্ধবাবসারে অধিক পরিপক হয় নাই, দিল্লীর শিক্ষিত সেনার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, সুতরাং শিবজী কোশল ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা করা ও হিন্দুরাজ্যবিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগে একদিন সাংসকালে পরাক্রান্ত যোগেশেনাপতি সায়ের্তা খাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভার বসিয়াছেন। ক্রুরূপে শিবজীকে পরাজয় করিবেন, তাহারই পরামর্শ হইতেছিল। দাদাজী কানাই-দেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহে এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জলিতেছে। জানালার ভিতর দিয়া সাংসকালের শীতল বায়ু উত্তানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে।

আনওয়ারীনায়ে সায়ের্তা খাঁর একজন চাটুকার বলিল, “আমাদের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহা-বাত্যার সম্মুখে তরু-পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিবে।”

চাঁদ খাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল-বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “আমি বোধ করি, তাহাদের এই দুইটি ক্ষমতাই আছে।”

সায়ের্তা খাঁ। কেন?

চাঁদ খাঁ। গতবৎসর কতিপয় পার্শ্ব-ভীরা মহারাষ্ট্রীয় বধন চাকন-দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া ক্রুরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গদ্বার করিয়াছে, তাহা জাহাঁপনার স্বরণ আছে। একটি দুর্গ হস্তগত করিতে অনেক যোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতোও নিতাইজী কাম্বান দিয়া আহম্মদনগর ও আরকানবদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছার-খার করিয়া আসিয়াছে।

সায়ের্তা খাঁ। চাঁদ খাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন! পূর্বে তাহার এরূপ ভয় ছিল না।

চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আনওয়ারী। জাহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রেরা ইন্দুরবিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, আঁহী অস্বীকার করি না।

চাঁদ খাঁ। পর্ব্বত-ইন্দুর পুনার ভিতর গর্ভ করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!

সায়ের্তা খাঁ। এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নথায়ুধ বিভাল আছে, ইন্দুরে সহস্র কিছু করিতে পারিবে না।

সভাসদ সকলেই “কেয়াং” “কেয়াং” বলিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অসু্যোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিবরে এইরূপ অনেক রহস্ত হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে, তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন-দুর্গ

হস্তগত হইয়া অবশিষ্ট সারেন্তা থা। দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হইবে, কখনও সিদ্ধ হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।”

চাঁদ খাঁ। জাহাঁপনা! দুর্গই মহারাজীর-দিগের বল, উহারা সম্মুখ-রণ করিবে না অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই। কেন না, দেশ পর্ত্তময়, উহাদিগের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া অস্ত্র স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ্য পাইব না; কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাজীরদিগকে অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

সারেন্তা থা। কেন? মহারাজীরদিগের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাৎকার করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী সেনা নাই, পশ্চাৎকার করিয়া সমস্ত মহারাজীরসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?

চাঁদ খাঁ। যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাজীর সেনা বিনাশ করিব, তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ত্ত-প্রদেশে মহারাজীর অশ্বারোহীকে পশ্চাৎকার করিয়া ধরিতে পারে, এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ধারূত ও বহু অল্পসম্মিত, সমভূমিতে, সম্মুখ-ক্ষেত্রে তাহাদের তেজ দুর্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু এই পর্ত্ত-প্রদেশে তাহাদিগের যাতারাতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র মহারাজীর অশ্ব ও অশ্ব-

রোহিণ্য যের ছাঙ্গের জায় হুসুদে লক্ষ দিয়া উঠে ও হরিণের জায় উপভোজ্য ও সুরাধের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জাহাঁপনা, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন, সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন, এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লী-শ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাজীরদিগের ক্ষমতা অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের পশ্চাৎকারের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন, নিতাইজী অনারাসে আমাদের নিকট দিয়া বাইয়া আহম্মদ নগর ও আরকাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, কণ্ঠম জমান তাহার পশ্চাৎকার করিয়া কি করিল?

সারেন্তা থা। সজ্ঞাধে বলিলেন, “কণ্ঠম জমান বিজোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নিতাইজীকে পলাইতে দিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব।” চাঁদ খাঁ, তুমিও সম্মুখ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে কি কেহই সাহসী নাই?”

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আবার আন্তরিক হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন, পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “পরামর্শ দিতে পারি, এরূপ সাধ্য নাই, সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, বৈরূপ লক্ষ্য হইবে, তামিল করিতে এ দাস পরামুখ হইবে না।”

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী জ্ঞানশাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। সারেন্তা থা। তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে

আনিবার আজা দিলেন। সভার সকলে এই দৃতকে দেখিবার, জন্ত উৎসুক হইলেন।

ক্লেপের পর মহাদেওজী জারশাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। জারশাস্ত্রীর বয়স এখনও চত্বারিংশ বৎসর হয় নাই, অবরূপ মহারাত্রিরদিগের জার ঈষৎ ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মূখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলকচন্দন, স্বল্পে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর তুলার কৃষ্ণিতে আবৃত, স্তভরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উকীষ একপ্রণ প্রকাণ্ড যে, বদনমণ্ডল বেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। সায়ন্তা ঐ সাগরে দৃতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সায়ন্তা ঐ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সিংহ-গড়ের সংবাদ কি?”

মহাদেওজী একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

“সস্তি নদ্যো দগুকেসু তথা পঞ্চবটীবনে।

সরসু-বিচ্ছেদশোকং রাঘবন্ত কথং সসেং ॥”

অর্থাৎ “দগুকারণ্যো পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরসু নদীর বিচ্ছেদ-দুঃখ তুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ একপ্রণ শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সত্তাপ কি তিনি তুলিতে পারেন?”

সায়ন্তা ঐ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বাও, তোমার প্রভুকে বলিও, প্রধান দুর্গ হস্তগত করিয়াছি, একপ্রণ তাঁহার বুদ্ধ করা বিকল, দিল্লীরবরের অধীনতা-স্বীকার করিলে স্বয়ং এখনও আশা আছে।”

ব্রাহ্মণ ঈবদ্বাণ্য করিয়া পুনরায় একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

“ন শক্তো হি বাতিলাবং জাপরিতুং চাতকঃ।

জাত্য তু তৎ বারিধরস্তোবধতি হি যাতকম্ ॥”

অর্থাৎ “চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ সেই অভিলাষ বৃষ্টিয়া আপনার দয়াবশতই তাহা পূর্ণ করে। মহাজনের যাতককে দিবার এইরূপ রীতি। প্রভু শিবজী একপ্রণ পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহাত্মক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অল্পগ্রহ করিয়া বাহা দান করিবেন, তাহাই শিরো-ধার্য্য।”

সায়ন্তা ঐ আনন্দ সংবরণ করিতে পারিলেন না;—বলিলেন, “পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্য আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম, বলিতে পারি না, তোমাদিগের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাব-পরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন।”

মহাদেওজী বলিলেন,—

“কেশরিণঃ প্রতাপেন ভগবিবলচেতনঃ।

জাহি দেব জাহি রাজনু ইতি ক্রবন্তি ভূচরাঃ ॥”

অর্থাৎ “দিল্লীরবরের সৈন্তের দোঁড়িও-প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল জাহি জাহি এই শব্দ করিতেছি।”

সায়ন্তা ঐ এবার আহ্লাদ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, “ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনার সন্তুষ্ট হইলাম, একপ্রণ যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন, তবে শিবজী আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ?”

ব্রাহ্মণ তখন গভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর

হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন । অনেকক্ষণ পর্যন্ত সারেন্তা খাঁ সেইটি দেখিলেন ; পরে বলিলেন, “হাঁ, নিদর্শনপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে, বলুন ।”

মহাদেওজী । প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে, এখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা ।

সারেন্তা খাঁ । ভাল ।

মহাদেওজী । সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন ।

সারেন্তা খাঁ । ভাল ।

মহাদেওজী । এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন, তাহা জানিতে তিনি উৎসুক । জানিলে সেইগুলি পালন করিতে যত্ববান হইবেন ।

সারেন্তা খাঁ । দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার । তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন ?

মহাদেওজী । তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই । মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন, তাহাই আমি তাহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন ।

সারেন্তা খাঁ । ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার । দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে । তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে ।

মহাদেওজী । সে কোন্ কোন্ট ?

সারেন্তা খাঁ । তাহা ছই এক দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব । চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে

রাখিবেন, তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়-গীরখরূপ ভোগ করিবেন, তাহার অন্ত কর দিতে হইবে । এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত, তহা বেন আমি ছই চারি দিনের মধ্যে জানিতে পারি ।

মহাদেওজী । বেরূপ আদেশ করিলেন, সেইরূপ করিব । এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, তখন বত দিন সন্ধিহাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ কাহা থাকিতে পারে ?

সারেন্তা খাঁ । কদাচ নহে । ধৃত কপট-চায়ী মহারাজীদিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমত ধৃততা নাই যে, তাহাদিগের অসাধ্য । বত দিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদিগের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার, আমরা দিগের অনিষ্ট করিও

“এবমন্ত” বলিয়া ত্রাঙ্কণ বিদ্যার গ্রহণ করিলেন, তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুকাণা বহির্গত হইতেছিল ।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অব-তীর্ণ হইলেন । প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক দর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন । একজন মোগল গ্রহরী কিঞ্চিৎ বিম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দূত মহা-শয়, কি দেখিতেছেন ?”

দূত উত্তর করিলেন, “এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহাই দেখিতেছি । এটিও তোমাদিগের হস্তগত হইয়াছে । বোধ হয়, একে একে সমস্ত দুর্গ-গুলিই তোমরা লইবে । হা ভগবন্ !”

গ্রহরী হস্ত করিয়া বলিল, “সে অন্ত আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে ? আপন কার্যে বাও ।”

ব্রাহ্মণ শীত্ৰই বহু-জনাধীর্ণ পুনানগরীর
লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্যের পুরোহিত।

অন্যে শিথিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজজ্যোতিগণ।

নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতি-
বাহন করিলেন, যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগি-
লেন, সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে
লাগিলেন। দুই একটি দোকানে দ্রব্য-ক্রয়ের
ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয়
জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন।
প্রশস্ত রাজপুত্র হইতে একটি গলীতে প্রবেশ
করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত
নির্কাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ
করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন।
আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটি তারা
দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ
নিস্তর। ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল। তাঁহার
বোধ হইল যেন, পশ্চাতে তিনি পদশব্দ
শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান
রহিলেন, কিন্তু সে পদশব্দ আর শুনিতে
পাইলেন না।

পুনরায় পথ অতিবাহিত করিতে লাগি-
লেন, কণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন,
পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের
হৃদয় ঝবৎ চকল হইল। এই গভীর নিশীথে
কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? শত্রু না
মিত্র? শত্রু চাইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারি-

রাছে? উদ্বেগ-পরিপূর্ণ-হৃদয়ে কণেক চিন্তা
করিলেন, পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্মিত কুর্তির
আত্তিনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ
ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্ব
দেশে দণ্ডায়মান হইলেন, গভীর অন্ধকারের
দিকে কণেক নিরীক্ষণ করিয়া রাহিলেন।
কৈ, কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য
ও নিস্তর।

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ আলোকপূর্ণ
বাজারে ফিরিয়া গেলেন। তথায় অনেক
দোকান, নানাজাতীয় বিস্তর লোক এখনও
ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া
যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা
হইতে সহসা এক গলীর ভিতর প্রবেশ
করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অস্ত্রাজ গলীর
ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন।
তথায় নিঃশব্দে অনেকক্ষণ খাস-রুদ্ধ করিয়া
দণ্ডায়মান রহিলেন, শব্দমাত্র নাই, চারি-
দিকে পথ, ঘাট, কুটার, অট্টালিকা সমস্ত
নিস্তর, নৈশ গগন হৃৎকৃত অন্ধকার দ্বারা
সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। সহসা
একটি চীৎকার-শব্দ শ্রুত হইল, ব্রাহ্মণের
হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে
দণ্ডায়মান রহিলেন।

কণেক পর আবার সেই শব্দ হইল,
মহাদেওজীর ভর দূর হইল, সে নাগরিক
প্রহরী পাহারা দিতেছে। দূর্তাগ্যক্রমে মহা-
দেও যে গলীতে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই গলী-
তেই প্রহরী আসিল। গলী অতি সঙ্কীর্ণ।
মহাদেওজী পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া
দ্রুতগতি অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে
চাহিতে সেই স্থানে আসিল, মহাদেওজী যে
স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে চাহিল।
মহাদেওজীর হৃদয় দ্রুত দ্রুত করিতে লাগিল,

তিনি খাঁস রুদ্ধ করিয়া, হস্তে সেই ছুরিকা
দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল
না, ধীরে ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল।
মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির
হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন,
পরে নিকটবর্তী একটি ঘারে আশ্রয়
করিলেন, সারৈস্তা খাঁর একজন মহারায়ী
সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুই জনে অতি
সঙ্কোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও
মন্তব্যের অগম্য স্থানে বাইয়া উপস্থিত হই-
লেন। তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। সমস্ত প্রস্তুত ?

সেনা। প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ। অহুমতিপত্র পাইয়াছ ?

সেনা। পাইয়াছি।

আবার অস্পষ্ট পদস্রব্দ শ্রুত হইল। মহা-
দেওজী এবার 'ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া
ছুরিকা হস্তে সম্মুখে বাইয়া দেখিলেন; অন্ধ-
কারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন,
কিছু দেখিতে পাইলেন না, ধীরে
ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, পরে সেনাকে
বলিলেন, “রক্তহস্তে আসিয়াছ ?”

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির
করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “ভাল,
সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে ?”

সেনা। কল্যা।

ব্রাহ্মণ। অহুমতি পাইয়াছ ?

সেনা। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। কত জন লোকের ?

সেনা। বাদ্যকর দশ জন ও অন্ত্রধারী
ত্রিশ জন, ইহার অধিক অহুমতি পাইলাম
না।

ব্রাহ্মণ। এই বধেই, কোন্ সময়ে ?

সেনা। রজনী এক প্রহর।

ব্রাহ্মণ। ভাল, এই দিক হইতে বরষাঝা
আরম্ভ হইবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। বাদ্যকরেরা সজ্ঞারে বাদ্য
করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। জাতি-কুটুম্ব যত পারিবে
জড় করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ তখন অন্ন হস্ত করিয়া বলি-
লেন, “আমি সেই শুভকার্যের পুরোহিত।
সে শুভকার্যের ষটা সমস্ত ভারতবর্ষে
রাষ্ট্র হইবে।”

সহসা সজ্ঞারে নিকষ্প একটা তীর
আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল। সে
তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের
কুস্তির নীচে লৌহ-বর্ষে লাগিয়া তীর
পড়িয়া গেল।

তৎপরেই একটি বর্ষা। বর্ষার আঘাতে
ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে
দুর্ভেদ্য বর্ষা ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায়
উঠিলেন; সম্মুখে দেখিলেন, নিক্ষেপিত
অনিহন্তে একজন দীর্ঘ মোগল বোদ্ধা,—
তিনি চাঁদ খাঁ।

অন্য সভাতে সেনাপতি সারৈস্তা খাঁ
চাঁদ খাঁকে ভীত বলিয়াছেন।

চাঁদ খাঁর কেশ শুষ্ক হইয়াছিল, এ অপবাদ
কেহ তাঁহাকে কখনও দেয় নাই। মনে
মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অস্ত্রকে
তাঁহা কি জানাইবেন, মনে মনে স্থির
করিলেন, কার্য্য ব্যাঘ্র এ অপবাদ দূর করিব,
নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চৎকর প্রাণ
ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার
সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ

করিয়া জানিডেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ণ ও দ্রুতগামী অসামান্য সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্যস্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু-স্বাধীনতা-স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদ খাঁর অগোচর ছিল না। যোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয়-স্বীকার ও সন্ধি বাজ্ঞা করিবেন, এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শনপত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার শুধু অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদ খাঁর সম্বন্ধ জড়িয়াছিল, মহারাষ্ট্রদিগের নিন্দা শুনিয়া বখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সম্বন্ধের কথা সায়েস্তা খাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ শুনিবেন? কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, এই ভণ্ড দৃতকে পরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলীতে গলীতে অদৃশ্যভাবে অহু-সরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্তও ব্রাহ্মণ চাঁদ খাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারে নাই। সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয়, তাহাও চাঁদ খাঁ শুনিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দৃতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসমনে লইয়া বাইরা প্রতিপত্তিলাভের সঙ্কল্প করিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, “সায়ের্ত্তা খাঁ! যুদ্ধব্যবসায়ের বুধা এ বেশ স্তুর করি নাই, আমি তীক্ষ্ণও নহি, দিল্লীরের বিরুদ্ধাচারীও নহি। অত্বে যে বড় বস্ত্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব, তাহার পর বোধ হয়, এ প্রাচীন কাসের কথা ছুঁমি অবহেলা করিবেন না।” কিন্তু আশা মারাবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদ খাঁ তীর ও বর্ষা অর্ধ দেখিয়া লক্ষ্য দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ বর্ষে লাগিয়া সেবারও প্রতিহত হইল।

“কৃষ্ণে আমার অহুসরণ করিয়াছিল,” এই বলিয়া মহাদেওজী আপন আত্মন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন। নিমেষমধ্যে বজ্রশূট চাঁদ খাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল, চাঁদ খাঁর মৃতদেহ ধরাতলশরী হইল।

ব্রাহ্মণ হুহু অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন, “সায়ের্ত্তা খাঁ! মহারাষ্ট্রদিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভাবানীর কল্যাণে, দ্বিতীয় ফল কল্যাণ ফলিবো।”

ঘোড়ার কর্তব্যকার্যে যে সময়ে চাঁদ খাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিজা বাইতেছিলেন, শিবজীকে বন্দীকরণ-বিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপার বিস্মিত হইয়া বলিল, “প্রভু, কি করিলেন? কল্যাণ এ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সঙ্কল্প বুধা হইবে।”

ব্রাহ্মণ। কিছুমাত্র হইবে না। আমি জানিয়াছি, চাঁদ খাঁ অদ্য সভার অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েক দিন সভায় না যাইলেও কেহ সম্বোধ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর অরণ্য রাখিও, কল্যাণ রজনী এক প্রহরকালে।

সেনা। রজনী এক প্রহরকালে।

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি সায়েস্তা খাঁর আকরিত

অমৃতপত্র দে। এই নিরাপদে পুনা হইতে
বর্জিত হইলে।

করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠা-
ইয়াছেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—:—

রাজা যশোবন্ত সিংহ ।

কোন বসতে কহ দাসে জনি,
আতিথ্য দাতৃ আতি—এ সকলে দিলা
জলাভাস ! শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন তথাপি
নিওণ স্বজন জেয়ঃ পর পর সদা ।

মধুসূদন দত্ত ।

রজনী প্রহর-সময় রাজপুত-রাজা যশো-
বন্ত সিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন ।
হস্তে গণ্ডমূল-স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশী-
থেও তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে
কেবল একটিমাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে
অন্ত লোকমাত্র নাই । সংবাদ আসিল,
মহারাজীয়দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ।
যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন,
তাঁহারই জন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ।

মহাদেওজী ত্রায়শাস্ত্রী শিবিরে আসি-
লেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান
করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন । উভয়ে
উপবেশন করিলেন ।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিমন্ত্র হইয়া রহিলেন,
কি চিন্তা করিতেছিলেন । মহাদেও নিঃশব্দে
রাজপুতের দিকে স্তবীক দৃষ্টি করিতেছিলেন ।
পরে যশোবন্ত বলিলেন, “আমি আপনার
প্রভুর পত্র পাইয়াছি । তাহাতে বাহা
লিখিত আছে, অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন
অন্ত কোন প্রস্তাব আছে ?”

মহাদেও । প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব

বশোবন্ত । কেবল পুনা ও চাকন-দুর্গ
আবাদিগের হস্তগত হইয়াছে যাত্র, এই
কত খেদ ?

মহাদেও । দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন,
তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে ।

যশোবন্ত । যোগল-বুদ্ধস্বরূপ বিপদে
পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন ?

মহাদেও । বিপদে পড়িলে খেদ করা
তাঁহার অভ্যাস নাই ।

যশোবন্ত । তবে কি জন্ত খেদ
করিতেছেন ?

মহাদেও । যিনি হিন্দুরাজতিলক, যিনি
কজ্রিয়কুলাবতংস, যিনি সনাতন ধর্মের
রক্ষাকর্তা, তাঁহাকে অদ্য রেজের দাস দেখিয়া
প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ।

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল ।
মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না,
গভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, “উদয়পুরের
রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন,
মাতৃওয়ারের রাজকুমারী বাহার মন্তকের উপর
বৃত্ত হইয়াছে, রাজস্থান বাহার সূচ্যাতিতে
পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে বাহার বাহ-
বিক্রম দেখিয়া আরজীব ভীত ও বিস্মিত
হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ বাহাকে সনা-
তন হিন্দুধর্মের স্তম্ভরূপ জ্ঞান করে, দেশে
দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে বাহার
জয়ের জন্য হিন্দুযাজেই, ব্রাহ্মণযাজেই অগ-
দীপের নিটক প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে
মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ।
রাজন ! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি
বলিতেছি, জানি না, অপরাধ হইলে মার্জনা
করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসম্মান কেন ? এ সৈনা-

সামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি
জন্ত উড়ান হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি
করিবার জন্ত? হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করি-
বার জন্ত? কত্ৰিয়োরচিত বশোলাভের জন্ত?
আপনি ক্ষত্রকুলধর্ম। আপনি বিবেচনা
করুন, আমি জানি না।”

বশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও
আরও বলিতে লাগিলেন, “আপনি রাজ-
পুত্র, মহারাজার পুত্র, রাজপুত্র-পুত্র, পিতা-
পুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না, স্বয়ং ডুবানী এ যুদ্ধ
নিবেদ্য করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন,
আমরা পালন করিব। রাজপুত্রের গৌরবই
অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব, রাজ-
পুত্রের বশোচিত আমাদের রমণীগণ
এখনও গাইরা থাকে, রাজপুত্রদিগের উদা-
হরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত
হয়। ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত্র-শোণিতে
আমাদের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্বে যেন
মহারাজ-নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়,
আমরা যেন বর্ষা ও খড়্গ ভ্যাগ করিয়া পুন-
রায় লাঞ্ছন ধারণ করিতে শিখি।”

বশোবন্ত সিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে
ধীরে বলিলেন, “দূতপ্রধান! তোমার কথা-
গুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীর
অধীন, মহারাজার সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া
আসিয়াছি, মহারাজার সহিত যুদ্ধ করিব।”

মহাদেও। এবং শত শত বর্ষজীকে
নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মতকচ্ছেদন
করিবেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা
বসাইবেন, কত্ৰিয়ের শোণিতস্রোতে কত্ৰিয়-
শোণিতস্রোত মিশাইবেন, শেষে রক্ত-স্রা-
টের সম্পূর্ণ জয় হইবে।

বশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু
উদ্বেগ সংবরণ করিয়া কক্ষিক কর্ণশভাবে
বলিলেন, “কেবল দিল্লীর জয়ের জন্ত

যুদ্ধ নহে, আমি তোমার প্রভুর সহিত
কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিজোহা-
চারী, চতুর শিবজী অত্যাচার, অত্যাচার
অনার্য্যে কল্যা ভঙ্গ করে।”

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইল,
তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “মহারাজ,
সাবধান, অলীক নিন্দা আপনাকে সাজে
না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য-
দান করিয়াছেন, তাহার অত্যাচার করিয়াছেন?
কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন,
কত্ৰিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
তাঁহা বিশ্বস্ত হইয়াছেন? দেশে শত শত
গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, অত্যাচার
করুন, শিবজী সত্যপালন করিতে, ব্রাহ্মণকে
আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গো
বৎসারি রক্ষা করিতে, দেবদেবীর পূজা দিতে
কবে পরাভূত? তবে মুসলমানদিগের সহিত
যুদ্ধ! জৈতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে
কোন দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে
ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া
থাকে; মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ
করিবামাত্র জর্জরিত-শরীর নাগরাজ সময়
পাইয়া দংশন করে। এটি বিজোহাচার,
না স্বভাবের রীতি? কুকুর যখন ধরগসকে
ধরিবার চেষ্টা করে, ধরগস প্রাণরক্ষার জন্ত
কত বদ্ধ করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ
করিয়া সহসা অস্ত্র দিকে বার। এটি চাতুরী,
ন স্বভাবের রীতি? যাবতীর জীবজন্তকে
জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার বদ্ধ ও উপায়
শিখাইয়াছেন, যত্নব্যকে কি তিনি সে উপায়
শিখান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ,
জীবনের জীবনরূপ স্বাধীনতা যে মুসল-
মানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করি-
রাছে, হৃদয়ের শোণিতরূপ বল, মান,
দেশ, গৌরব ও ধর্ম বিনাশ করিতেছে,

তাহাদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ও সভ্যসম্বন্ধ ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায় দেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বার্থ ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা ? সে উপায় কি নিষ্কলুষ ? জীবনরক্ষার্থ পলায়ন-পটু যুগের নীতিগতি কি বিদ্রোহ ? শাৰককে বাচাইবার জন্য পক্ষী যে অগ্নিহরকে অস্ত্রদিকে লটুয়া যাইতে যত্ন করে, সেটি কি নিষ্কলুষ ? ক্ষত্রিয়রাজ ! দিনে দিনে মুসলমানদিগের নিকটে মহারাজ্যের চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দু-প্রবর ! আপনি হিন্দু-জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না ।—মহাদেওজীর অলঙ্ঘন নয়নদ্বয় জলে প্রাবিত হইল ।

ব্রাহ্মণের চক্ষু জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন,—বলিলেন, “দূতপ্রবর ! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না, যদি অস্তায় বলিয়া থাকি, মার্জনা করিবেন । আমি কেবল এইমাত্র বলিতে-ছিলাম যে, রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় করেন না । মহারাজ্যেরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না ?”

মহাদেও । মহারাজ ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ণ রণশিক্ষা আছে, মহারাজ্যদিগের ইহার কোনটি আছে ? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা । আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীত্যাচরণে

যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্ধর্ষ ভেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্যক রাজপুত-সেনার সম্মুখে দিল্লীর সেনা পলায়ন করে । আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব ? পূর্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্ত নাই, বাহারা আছে, তাহারা কখনও রণ দেখে নাই । যখন দিল্লীর কবুল, পঞ্জাব, অম্বোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানকুমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী বোঝা প্রেরণ করে,—যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য রণ-অর্থ ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রোপামুদ্রা, বর্ণমুদ্রা সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রানীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাজ্যেরা কি করিবে ? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অর্থ-গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই । অরিতগতি ও পর্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদিগের আর কি উপায় আছে ? ক্ষত্রিয়রাজ । জীবনপ্রাণে দরিদ্রতাভিগ্ন এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই । জগদীশ্বর করুন, মহারাজ্যেরাও দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থাপন হইলে, তই তিন শত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অমুকরণ করিবে ।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাটস্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন । মহাদেও দেখিলেন, তাহার বাক্য-গুলি নিতান্ত নিফল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “আপনি হিন্দু-প্রভু হিন্দুগৌরবসাধনে সন্বেদন করিতেছেন কেন ? হিন্দুধর্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীর ইচ্ছা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা

নাই। মুসলমানশাসন-ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয়-স্থাপন, সনাতন ধর্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অস্ত্র উদ্দেশ্য নাই। এ বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হন, তবে বহুতে এই কার্যসাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন, দুর্গের দ্বার এইরূপেই উন্মোচিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান্, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত। শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংসসাধন করিবেন। তাঁহার অস্ত্র বাঁসনা নাই।”

এই প্রস্তাবে উচ্ছালিতাশী যশোবন্তের নরন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেক-ক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, “মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্রে অনেক দূর, এক রাজার অধীনে থাকিতে পারেন না।”

মহাদেও। তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকেই এই রাজ্য দিন। নচেৎ কোন আত্মীয় বোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয়-রাজার অধীনে কার্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।

যশোবন্ত। এই বিপদকালে আরং-জীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে, এমন আত্মীয় নাই।

মহাদেও। কোন ক্ষত্রিয় সেনাপত্তিকে নিযুক্ত করুন। হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে,

শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।

যশোবন্ত। সেরূপ সেনাপতি নাই।

মহাদেও। তবে যিনি এই মহৎ কার্যসাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশের ও স্বধর্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রিয়বোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এজন্য আপনাকে প্রশংসাবাদ না করিবেন।

যশোবন্ত। দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীখ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে এরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?

মহাদেও। দিল্লীখ্বর যে হিন্দুগণকে কাকের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবদেবীর অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কালীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ বরিয়া তাঁহার প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন, “দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে। অত্যাধি-শিবজী, আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র; অত্যাধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন! সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীখ্বরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন, সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।”

ব্রাহ্মণবেশধারী দূত তখন ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণের উকীষের নীচে বোন্ধার শিরস্ত্রাণ দৃষ্ট হইল, তুলার কুর্ভির নীচে লোহ-বর্ষ প্রকাশিত হইল ! মহা-রাস্ত্রীয় বীর ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন্ ! ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, সে দোষ গ্রহণ করিবেন না। এ দাস ব্রাহ্মণ নহে, মহারাস্ত্রীয় ক্ষত্রিয় ;—নাম মহাদেওজী নহে, দাসের নাম শিবজী।”

রাজা যশোবন্ত সিংহ বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে সেই খাতনামা মহারাজ্জীবন-বোন্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চকিত হইয়া সেই দিল্লীধরের প্রতিষন্দ্বী, দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠ শিবজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গাত্রোথান করিয়া সানন্দে ও সজল-নয়নে সেই পরম-শত্রুকে আলিঙ্গন করিলেন। শিবজীও সম্মান ও প্রণয়ের সহিত খাতনামা রাজপুত-বীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইল, যুদ্ধের সমস্ত কথা ঠিক হইল, তৎপরে শিবজী বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময়ে কহিলেন, “মহারাজ, অহুগ্রহ করিয়া কল্যাণ কোন ছলে পূনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।”

যশোবন্ত। কেন, কল্যাণ তুমি পূনা হস্ত-গত করিবার চেষ্টা করিবে ?

মহারাস্ত্রীয়বীর হাস্ত করিয়া বলিলেন ; “না, একটি বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।”

যশোবন্ত। ভাল, দূরেই থাকিব। বিবাহকার্য্যের মতাদ্রি ভায়শাস্ত্রী মহাশয়ের এক্ষণে স্বরণ আছে কি ?

শিবজী। আছে বৈ কি ! আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখিয়া দিল্লীর সেনাপতি সারেন্তা খাঁ বিস্মিত হইয়াছেন। কল্যাণ তিনি অন্তরূপ বিদ্যা দেখিবেন।

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে বাইলেন, পরে বিদায়ের সময়ে বলিলেন, “তবে যুদ্ধবিষয়ে বৈরূপ কথোপকথন হইল, সেইরূপ কার্য্য করিবেন।”

শিবজী। সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্ত প্রভু শিবজীকে বলিব !

যশোবন্ত। “হাঁ, বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে আপনার প্রভুকে বলিবেন।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোবন্তসিংহ শিবিরান্তর্য্যে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

শিবজী ।

অমর উচ্ছ্রিৎ প্রাসি পুট কলেবর !
অমর-পদাঙ্করজঃ শোভিত মন্তকে !
ভায় চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্ষ্য সময়ের শ্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হবে নিঃশেষ ।

হেবচল বক্ষোপাধার ।

পূর্বদিকে রক্তমাচ্ছটা দেখা বাইতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহ-গড়ে প্রবেশ করিলেন। উকীষ ও তুলার কুর্ভি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মন্তকের লোহ-শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ষ বক্ষু করিয়া উঠিল। বক্ষুহলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোবে “ভবানী” নামক প্রসিদ্ধ বধু। বক্ষুহল বিশাল শরীর টবৎ

বরু বটে, কিন্তু অস্বচ্ছ, সুসুড়বন্ধনী ও পেই-
জনি বর্ণের নীচে হইতেও দেখা যাইতেছে।
পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল সানকে তাঁহাকে
আজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, “ভবানীর জর
হটুক ! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে কিরিয়া
আসিলেন।”

শিবজী আপনার আশীর্বাদে কোন্
বিপদ হইতে উদ্ধার না পাইয়াছি ?

মুরেশ্বর। সমস্ত স্থির হইয়াছে ?

শিবজী। সমস্ত।

মুরেশ্বর। অত রাত্রে বিবাহ ?

শিবজী। অজাই।

মুরেশ্বর। সারেস্বতা খাঁ কিছু জানেন
না ? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চান খাঁ কিছু জানেন না ?

শিবজী। সারেস্বতা খাঁ ভীত শিবজীর
নিকট হইতে সন্ধিপ্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতে-
ছেন ; যোদ্ধা চান খাঁ চিরনিদ্রার নিদ্রিত,
তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না।

মুরেশ্বর। রাজা যশোবন্ত ?

শিবজী। আপনি পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি
দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন বিচ-
লিত হইয়াছিল। আমি বাইরাই দেখিলাম,
তিনি কংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন,
সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য সিদ্ধ
হইল।

মুরেশ্বর। ভবানীর জর হটুক !
আপনি এক রাত্রে একাকী যে কার্যসাধন
করিলেন, তাহা মহত্বের অসাধ্য ! যে
অদম্যমাহা কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,
তাঁহািলে এখনও ক্লংকল্প হয়। প্রভো,
এতদূর কার্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপ-
নার অস্বচ্ছ হইলে মহারাষ্ট্রের কি
ধাক্কাবে ?

শিবজী। মুরেশ্বর ! বিপদে ভর করিলে
অভাববি আশীর্বাদ মাত্র থাকিতাম,

বিপদে ভর করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে
সাধন হইবে ? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন
ধাক্কা, ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন,
মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।

মুরেশ্বর। বীরশ্রেষ্ঠ ! আপনার জর
অনিবার্য, অরু ভবানী সহায়তা করিবেন।
কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে,
একাকী ছদ্মবেশে ?

শিবজী। এ তো শিবজীর অভ্যস্ত
কার্য। কিন্তু অস্ত সত্যই অস্ত একটি মহা
বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।

মুরেশ্বর। কি ?

শিবজী। এমন মূর্খকেও আপনি
সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন ? যে আপ-
নার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে
শ্লোক স্মরণ রাখিবে ?

মুরেশ্বর। কেন, কি হইয়াছিল ?

শিবজী। আর কিছু নহে, সারেস্বতা
খাঁর সভার বাইরা ভারশাস্ত্রী মহাশয় প্রায়
সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুরেশ্বর। তাহার পর ?

শিবজী। দুই একটি মনে ছিল, তদ্দ্বা-
রাই কার্যসিদ্ধি হইল।

শিবজীর সহিত আমাদিগের এই
প্রথম পরিচয় ; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব-
বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই। ঐতি-
হাসিক পাঠক ইচ্ছা করিলে এই পরিচ্ছেদের
অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে
পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ
করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা-বিবৃতি সময়ে
তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার
পিতার নাম শাহজী ; পিতামহের নাম
মল্লজী। আমরা প্রথম অধ্যায়ের ফুলতন
দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিখলকরবংশের

কথা বলিয়াছি, সেই বংশের যোগপাল রাণানায়কের তগিনী দীপাবাইকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেকদিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ার আহম্মদনগরবাসী শাহশরীক নামক একজন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অতুরোধ করেন এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটি সন্তান হওয়ার্তে মল্লজী সেই পীরের নাগাহুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

সে সময়ে বাদবরাও নামে আহম্মদ-নগরে প্রসিদ্ধনামা একজন সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অধারোহীর নেতা এবং প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে হুলীর দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া বাদবরাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, বাদবরাওয়ের কস্তা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালক-বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদর্শনে বাদবরাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কস্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কেমন, তুই এই বালকটিকে বিবাহ করিবি?” পরে অন্তান্ত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “হুই জনে কি সুন্দর যোড় মিলিয়াছে!” এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে কাগ্ন নিক্ষেপ করার সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ! সাক্ষী থাকিও, বাদবরাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অল্প প্রতিশ্রুত হইলেন।” সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বাদবরাও উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপনার কস্তার বিবাহ দিতে কখনই

বাসনা করেন নাই, কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিমিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন বাদবরাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী বাইবেন না, বলিয়া পাঠাইলেন। বাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। বাদবরাওয়ের গৃহিণী বাদবরাও হইতেও বংশমর্যাদার অধিক অতিনানিনী। কথিত আছে যে, বাদবরাও রহস্ত করিয়া আপন হুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ ছুই চারি কথা শুনাটয়া দিলেন। মল্লজী সরোবে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, ভবানী সাক্ষ্য অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছেন, “মল্লজী! তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শত্ৰুর ভার গুণাধিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ভার-বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কালগণনা হইবে ও তাঁহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।”

সে বাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার স্ত্রীলক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদ-নগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অধারোহীর সেনাপতি হইলেন ও রাজা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণী ও চাকন-দুর্গ

এবং তৎপার্বস্থ দেশের ভার গ্রাপ্ত হইলেন। তিনি জায়গীরদারপুত্রা ও সোপা-নগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওরের কোন আপত্তি রহিল না। ১৮-৪ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, আহম্মদনগরের সুলতান যখন সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে যদুজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীখর আকবরশাহ আহম্মদনগর-রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। আকবরশাহ কতক পরিমাণে জয়লাভ করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরও সেই উত্তমে ব্যাপৃত রহিলেন। এই যুদ্ধকালে শাহজী অস্থূল ছিলেন না। ১৬২০ খৃঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অমরের অধীনে ছিলেন ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাট শাজিহান সেনাপতি শাহজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিয়া অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাটদিগের অশুকার অহু-গ্রহ কলা থাকে না, তিন বৎসর পর সম্রাট শাহজীর কতকগুলি জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। শাহজী বিরক্ত হইয়া বিজয়পুরে সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগররাজ্যের স্বাধীনতার জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান

শত্রু-হস্তে পরিত্ত হইলে শাহজী সেই বংশের আর একজনকে সুলতান করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশশাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট শাজিহান এই সময়ক দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার পুত্র বিজয়পুরের সুলতানকে দমন করিবার জন্য বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীখরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর স্থাপন হইল; আহম্মদনগর-রাজ্য বিনষ্ট হইল (১৬৩৭)। শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন এবং সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন। সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনর নিকট তাঁহার যেক্রপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণ কর্ণাট-দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাইয়ের গর্ভে শঙ্কুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতারণ, একরূপ জন-শ্রুতি আছে। একথা যদি বথার্থ হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে শাহজী টুকাবাই-নামী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শাহজীকে লইয়া পুনর জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। শাহজী টুকাবাইকে লইয়া

কর্ণাট্টে থাকিতেন ও তাঁহার পক্ষে বেন-
কাজী নামে একটি পুত্র হইল ।

শাহজীর দুই জন অতি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহী
ও কৰ্মচারী ছিলেন । তদ্বারা দাদাজী
কানাইদেব পুনার কার্যসীম এবং জীজী ও
শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ।

১৬২৭ খৃঃ অব্দে সুবর্ণোদ্বর্গে শিবজীর জন্ম
হয় । এই দুর্গ পুনা হইতে অল্পমান ২৫ ক্রোশ
উত্তরে অবস্থিত । শিবজীর তিন বৎসর
বয়সের সময় শাহজী চুকাবাইকে বিবাহ
করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত তাঁহার
বিচ্ছেদ জমিল । জীজী সপুল পুনার আসিয়া
দাদাজী কানাইদেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস
করিতে লাগিলেন । শিবজীর বাসার্থে
দাদাজী পুনানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নির্মাণ
করাইলেন, আমরা ইতিপূর্বে সেই গৃহে
সারোত্তা থাকে দেখিয়াছি ।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে
লাগিলেন । বাল্যকালাবধি শিবজী দাদা-
জীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ।
শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই,
কিন্তু অল্পবয়সেই ধর্ম্মরূপ-ব্যবহার, বর্শা-
নিষ্কেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা-
চালন এবং অথারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি
লাভ করিলেন । মহারাষ্ট্রীয় মাদ্রেই অশ্ব-
চালনার তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও
শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন ।
এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষার বালকের দেহ
শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল ।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যার শিবজী কাল
অতিবাহিত করিতেন না, বখন অবসর পাই-
তেন, দাদাজীর চরণোপাঙ্গে বসিয়া মহা-
ভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প
শ্রবণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন । শুনিতে
শুনিতেন বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক

হইত, হিন্দুধর্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইত, সেই
পূর্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অল্পকরণ করি-
বার ইচ্ছা প্রবল হইত, ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমান-
দিগের প্রতি বিবেক জন্মিত । এইরূপ কথা
শুনিতেন শিবজীর এরূপ আগ্রহ ছিল যে,
অনেক বৎসর পর বখন তিনি দেশে খ্যাতি
ও রাজ্য লাভ করিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন
স্থানে কথা হইবে শুনিলে, বহু বিপদ ও বহু
কষ্ট সহ করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার
চেষ্টা করিতেন ।

এইরূপে দাদাজীর মধ্যে শিবজী অল্পকাল-
মধ্যেই স্বধর্ম্মাচরিত ও অতিশয় মুসলমান-
বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন । তিনি বোড়শ বর্ষ
বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগীর হইবার জন্ত নানা-
রূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন । আপনার
জ্ঞায় উৎসাহী যুবকদিগকে চারিদিকে এক-
ত্রিত করিতে লাগিলেন । তিনি পর্ব্বতপরি-
পূর্ণ কর্ণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই
যাতায়াত করিতেন । সেই পর্ব্বত কিরূপে
উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে,
কোন পথে কোন দুর্গে যায়, কোন কোন দুর্গ
অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা
করা যায়, এ সকল চিন্তার বালকের দিন
অতিবাহিত হইত । কখন কখন কয়েকদিন
ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে
বাগন করিতেন, কোনও দুর্গ, কোনও পথ,
কোনও উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না ।
শেষে কিরূপে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করি-
বেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ
দেখিয়া বুদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন ।
তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে
সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া বাহাতে জার-
গীর সূচরুরূপে রঞ্জিত হয়, তাহাই শিখাই
বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে

যে বীরস্বরের অমূল্য হাণ্ডি হইয়াছিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাবা-জীকে পিতৃভৃত্য্য সন্মান করিতেন, কিন্তু যে পথে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার যৌবনসুহৃৎ-গণের মধ্যে বশজী-কঙ্ক, তরজী-মালতী ও বাজীকামলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণ-দুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আধ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে, এই প্রথম-বিজয়ের সময় শিবজীর বয়সক্রমে ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র; ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের দেড় কোশ দক্ষিণ-পূর্বে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করা-ইয়া তাহার নাম রাজগড় রাখিলেন।

বিজয়পুরের শুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহ-জীকে ভিন্নকার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশস্ত কর্ণাচারী শাহজী এ সমস্ত বিষয়ের বিন্দুবিবর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন, এইরূপ আচরণে সন্ধান হই-বার সম্ভাবনা, তাহা অনেক বুঝাইলেন; তাঁহার পিতা বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বুঝাই-লেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবে, মিষ্টবাক্য দ্বারা উত্তর দান

করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরন্তর হই-লেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজী মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিব-জীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎসনা করিবে, এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় বাই-লেন, কিন্তু বাহা শুনিলেন, তাহাতে বিম্বিত হইলেন। মৃত্যুশয্যাগ বেন দাদাজীর দিব্য-চক্ষু উদ্বীলিত হইল। তিনি শিবজীকে সম্মুখে বলিলেন, “বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অহুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি এবং কৃষক-গণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কলুষিতকারী-দিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিতেছেন, সেই পথ অহুসরণ কর।” এই বলিয়া বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দম্ভগুণ ক্ষীভ হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়সক্রমে বিংশ বর্ষ মাত্র।

সেই বৎসরেই চাকন ও কান্দান দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন ও কান্দান নাম পরিবর্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আধ্যায়িকার চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী সোপ্রা দুর্গের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন ত্রিগ্রহর রজনীতে আপন মাউলীসৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাঁহাকে কর্বাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে পুরন্দর-দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ার তাহার পুত্রদিগের

মধ্যে প্রাতঃকাল হই, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার সহায়তা করিবার জন্যে আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী বধন দেশের স্বাধীনতার স্বাক্ষর আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে ব্যক্ত করিলেন, বধন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য প্রাতঃকাল হইতে সহায়তা ব্যক্তি করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না, শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহাদিগের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪৮ খ্রীঃ অব্দে শিবজীর কর্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী-প্রদেশ জয় করিলেন। তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারাবদ্ধ করিলেন ও আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা-স্বীকার না করিলে সেই কারাগৃহের দ্বার একেবারে বন্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীর দরবারে নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসর কাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও বধন তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া সুহসা রাজ্যযোগে আক্রমণ করত সেই দুর্গ হস্তগত করেন। তিনি সমস্ত জৌলী-প্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ঐ বৎসরেই প্রতাপগড় নামক একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ

করাইলেন। ইহার দুই বৎসর পর শিবজী মুরখর ও জিমুল পিল্লীকে পেশোরা করেন এবং সমস্ত ককণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে আবুল কাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ বোদ্ধা ৫০০০ অঝোরাই ও ১০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি পরিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই অকিঞ্চিৎকর বিজোহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়-তখতের নিকট উপস্থিত করিবেন।

এত সৈন্তের সহিত সমুদ্র-যুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সজ্জি করিলেন। আবুল কাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সম্মুখে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড়-দুর্গের নিকট সভামধ্যে দূতের সহিত সাক্ষাৎ ও নানারূপ কথাবার্তা হইল। রজনীবাগনাথে গোপীনাথের জন্য একটি স্থান নির্দেশ করা হইল।

রজনীবাগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাকপটুতা ছিল। তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি বাহা করিয়াছি, সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্মের জন্য করিয়াছি। স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু দেব ও দেবীদের নিগ্রহকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন ও পৃথর্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন এবং আপনি

ভাভার ও দেশের দোষের মধ্যে অজ্ঞে
বাস করুন ।”

গোপীনাথ এই সময় থাকো তুট হইয়া
শিবজীর লহায়ত্তা করিতে স্বাকার করিলেন ।
পর্যম্পন্ন হির হইল যে, কার্যাসিদ্ধির জন্য
আবুল ফাজলের সহিত শিবজীর কোন
হানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যিক ।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড়-দুর্গের নিক-
টেই সাক্ষাৎ হইল । আবুল ফাজলের
পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে
রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত
শিবিকারোহণে নির্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপ-
স্থিত হইলেন । শিবজী সেই দিন বহু বস্তু
প্রাপ্তে আনন্দপ্রসাদ সমাপন করিলেন ;
সেইদিন মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া
তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ; ভুলার
কুর্তি ও উকীলের নীচে লোহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ
ধারণ করিলেন ; অবশেষে শিবজী দুর্গ
হইতে অকর্তব্য হইয়া ও বালাসহচর তমজী
মালজীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজলের
নিকটে আসিলেন । সহসা আলিঙ্গনচ্ছলে
তাকি ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভুলশায়ী
করিলেন । তৎক্ষণাৎ শিবজীর সেনা আবুল
ফাজলের সেনাকে পুরাত্ত করিল এবং
শিবজী অনেক দুর্গ হস্তগত করিয়া বিজয়-
পুরের দ্বার পর্য্যন্ত বাইরা দেশ লুণ্ঠন করিয়া
আসিলেন ।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন
বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল ; কিন্তু কোন
পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না ।
অবশেষে ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্তী
হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি-
সংস্থাপন করিয়া দিলেন । শাহজী যখন
শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী
পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া-

ছিলেন । আপনি অব হইতে অবতরণ
করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন
করিলেন ; পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে
পদব্রজে চলিলেন ও পিতা বসিতে আদেশ
করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ
করিলেন না । কয়েক দিন পুত্রের নিকট
থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে
বাইলেন ও সন্ধিস্থাপন করিয়া দিলেন ।
শিবজী পিতা কর্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির
বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, শাহজীর ক্রীতদশার
বিজয়পুরের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করেন নাই ।
তাঁহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী
আক্রমণকারী ছিলেন না ।

১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে এই সন্ধিস্থাপন হয়,
পুত্রের বলা হইয়াছে, এই বৎসরেই মোগল-
দিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয় । আমাদের আখ্যা-
রিকা এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে ।
মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত
কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন
এবং তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বরোহী ও
পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল ।
শিবজীর বয়স তখন পঞ্চত্রিংশ বৎসর ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

—৪—

শুভকার্য্য-সম্পাদন ।

যুগে যুগে কলে কলে নিত্য নিরন্তর,
অলুৎ গদনব্যাপী অনন্ত বহিতে ।
অলুৎ সে দেবভেজ স্বর্ণ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিজ্ঞাত প্রদীপ্ত শিখার,
দহক দানবহুল দেবের বিরুদ্ধে,
পুত্র পরম্পরা দক্ষ চিরশোকানলে ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সূর্য্য অন্তাচলচূড়া অবলম্বন করিয়া-
ছেন, সিংহগড়-দুর্গের ভিতর সৈন্তগণ

নিঃশেষে সজ্জিত হইতেছে, এমন নিঃশেষে যে, দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কয়েকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই দুর্গ-চূড়া হইতে দৃষ্ট অতি মনোহর। পূর্বদিকে স্মরণ নীরানন্দী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও পূর্বদিকে সুশোভিত হওয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্যন্ত স্মরণ হরিশর্প ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী স্মরণ শোভা পাইতেছে, যোদ্ধাগণ প্রায় সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অল্প রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পর্বতের পর পর্বত, বতদূর বেধা যায়, অনন্ত পর্বত অশাচলচূড়াবলসী সূর্য্যকিরণে অপূর্ণ শোভা পাইতেছে। কিন্তু বোধ করি, যোদ্ধাগণ এই চমৎকার পর্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না, অল্প চিন্তার অভিকূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে বা এককালে সর্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহুর্তের অল্প অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ হয়। অল্প সায়েস্তা থা ও মোংগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে অথবা অসমসাহসে মহারাত্রীসূর্য্য একেবারে চির-অন্ধকারে অন্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্বেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, তথাপি যখন নিঃশেষে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুপ্তায়িত রহিল

না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ যোদ্ধা সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে বাইরা আক্রমণ করিলেন, এমন ভীষণ কার্য্যে শিবজী কখনও লিপ্ত হইয়াছেন কি না সম্বোধন। কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহুর্তের অল্প চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদূর পেশোয়া মুরের খ্রিয়ুল ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসারে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্মাণ করেন। চারি বৎসরাবধি পেশোয়াগণ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পাদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল কাজীকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোংগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওনাবধি তিনিই পরাতিক সৈন্তের সুরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিকলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী মুরেরের অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্মচারী ও প্রকৃত বদ্ধ শিবজীর আর কেহ ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব তথার দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলপদ স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খ্রীঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী-প্রদেশ হস্তগত করেন এবং সম্প্রতি বায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্ত ও অল্প সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্বে তিনি পবনগড় হস্তগত করেন এবং শিবজীর কর্মচারীমধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অধারোহীর সরলোৎসর্গ অর্থাৎ সেনাপতি নিভাইজী সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে যোগল-সৈন্তের সমুখ দিয়া বাইরা আরম্ভাবাদ ও আহম্মদনগর দ্বারদ্বার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা নায়েজ। বীর সত্যার তাঁর বীর প্রযুক্তি তুমিরাহি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অধারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজর নামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিত করিতেছিল।

পূর্ব-অধারে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বালা-সুহৃদদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তদ্বধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তরজী মালজী ও যশজী-কক অল্প সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্য, যৌবনের বিবাহ সাহস, ইহারা এখনও ভুলেন নাই। ইহারা শিবজীকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী-সৈন্ত লইয়া শিবজীর সহিত শতপক্ষতর্কণে নিঃশেষে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

স্বর্গ্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া যেমন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধা-মণ্ডলী চুর্ণশূন্যে নিঃশেষে দগ্ধমান, এমনত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গভীর ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-বাক্য, ভরের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ষ ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অস্ত্র নিশির অসমসাহসিক কার্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যোদ্ধার নয়ন উজ্জল, দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

শিবজী ধীরে ধীরে বলিলেন, “শমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।”

মুরেশ্বর। তবে স্থির করিয়াছেন, অস্ত্র রজনীতে স্বর্ণদেব কি অল্পজী কি আমাকে

সঙ্গে বাইতে দিবেন না? মহাশয়! বিপদ-কালে কবে আমরা আপনার সদ পরিভ্যাগ করিয়াছি?

শিবজী। পেশোয়াজী। কনা করুন, আর অহুরোধ করিবেন না। আপনাদের সাহস, আপনাদের বিজয়, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিস্মৃত নাই, কিন্তু অস্ত্র কমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অস্ত্র বিধম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অস্ত্র আমিই এই কার্য সাধন করিব, নচেৎ আকৃষ্টকর প্রাণ বিসর্জন দিব। আশীর্বাদ করুন, জয়লাভ করিব; কিন্তু যদি অমঙ্গল হয়, যদি অত্যাচার কার্যে নিধনপ্রাপ্ত হই ৫থাপিও আপনারা তিনজন থাকি। মহারাষ্ট্রের সকলেই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুজিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগোত্রকে রক্ষা করিবে? বাক্রাকালে আর অহুরোধ করিবেন না।

পেশোয়া বুঝিলেন, আর অহুরোধ করা স্থগা; সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে শিবজী পেশোয়াকে সঙ্ঘোদন করিয়া বলিলেন, “মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্বাদ করুন যেন, আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ অবশ্যই কলিবে। আবাজী! অল্পজী! আশীর্বাদ করুন, আমি কার্যে প্রস্থান করি।”

মুরেশ্বর, আবাজী ও অল্পজী সজলনয়নে মহারাষ্ট্র-বীরকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপর শিবজী তাঁহার মাউলী সুহৃদদের তরজী ও যশজীকে সঙ্ঘোদন করিয়া বলিলেন, “বাল্যসুহৃদ! বিদায় নাও।”

তরজী। প্রভু! কি অপরাধে আমা-

দিককে সঙ্গে যাইতে নিবেদন করিতেছেন ?
কোন নৈশ বাপারে, কোন দুর্গজয়ের সময়
আমরা প্রভুর সঙ্গে না ডিলাম ? পূর্বকাল
স্মরণ করিয়া দেখুন, কল্যাণদেশে আপনার
সহিত কে ভ্রমণ করিত ? শৈলচূড়ে, উপত্য-
কার, পর্বতগহ্বরে, তরঙ্গিত্তীরে কে আপ-
নার সহিত দিবার শীকার করিত, রজনীতে
একত্র শয়ন করিত বা দুর্গজয়ের পরামর্শ
করিত ?—যশজী, মৃত বাজী আর এই দাস
তন্নজী । বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে,
আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই ।
অনুযুক্তি করুন, অত প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়-
লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আননিত হইব,
যদি প্রভু বিনষ্ট হন, আমাদের এ স্থানে
জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই ।
আমাদের এতদুপ বৃদ্ধিবল নাই যে, রাজকার্য্যে
কোন সাহায্য করি । আপনার বাংলা-
সুহৃদকে বঞ্চিত করিবেন না ।

শিবজী দেখিলেন, তন্নজীর চক্ষে জল ।
মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন
করিয়া বলিলেন, “ভ্রাতাঃ ! তোমাদিগকে
অদেয় আমার কিছুই নাই, শীঘ্র রণসজ্জা
করিয়া লও ।”

তৎপরে শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করি-
লেন । চুঃখিনী জীজী একাকিনী একটি
ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন,
পুত্রের অগ্গকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতে-
ছিলেন, এমন সময়ে শিবজী আসিয়া বলি-
লেন, “মাতঃ ! আশীর্বাদ করুন, বিদায়
হই ।”

“জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, “বৎস !
আইস, একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি ।
কবে তোমার এ বিপদরাশি শেষ হইবে,
কবে এ চুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ
হইবে ?”

শিবজী । মাতঃ ! আপনার আশীর্বাদে
কবে কোন বিপদ হইতে উদ্ধার না হই-
রাছি ? কোন যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি ?

জীজী । “বৎস ! শীর্ণ-জীবী হও, দেশানী
তোমাকে রক্ষা করুন ।” এই বলিয়া মাতা
সঙ্গেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই
মঘন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর
পড়িতে লাগিল ।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়া-
ছেন ; এতকণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর
অকম্পিত ছিল । এক্ষণে আর সংবরণ
করিতে পারিলেন না, চক্ষুর জল ছল
করিতে লাগিল । উদ্বেগকম্পিতস্বরে শিবজী
বলিলেন, “স্নেহময়ি জননি ! আপনিই
আমার দেশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে
চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্বাদে
সকল বিপদ তুচ্ছ জান করিব ।”

বৃদ্ধা জীজী বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়-
কালে বলিলেন, “বৎস ! হিন্দুধর্মের জয়-
সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শত্ৰু তোমার
সাহায্য করিবেন । আমার পিতৃকুল দেব-
গড়ের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্মের অব-
লম্বন ছিলেন । বাছা ! আমি আশীর্বাদ করি-
তেছি, তুমিও মহারাষ্ট্র-দেশে রাজা হও,
দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের অবলম্বন হও ।”

সমস্ত সেনা সজ্জিত । শিবজী নিঃশব্দে
অশ্বারোহণ করিলেন, নিঃশব্দে সৈন্তগণ দুর্গ-
বার অতিক্রম করিল ।

দুর্গবার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন
অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে
আসিয়া শির নামাইল । শিবজী তাহাকে
চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “রঘুনাথজী
হাবিলদার ! এ সময়ে তোমার কি
প্রার্থনা ?”

রঘুনাথ । প্রভু, যে দিন তোরগদুর্গ

হইতে গজাদি আকিরাছিলাম, সে দিন এসব হইয়া পুরস্কার স্বীকার করিয়াছিলেন।

শিবজী। অল্প এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভ কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। এই পুরস্কার চাই যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে বাইতে দিন। যে পক্ষবিশ্ব বাউলী বোকার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, হাসকে তাহাদের সহিত বাইতে আদেশ করুন।

শিবজী। রাজপুত্রবালক! কেন ইচ্ছা-পূর্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? অল্পবয়সে কেন প্রাণ হারাইতে উৎসুক হইয়াছ?

রঘুনাথ। রাজন! আপনার সঙ্গে বাইলে প্রাণ হারাইব, এরূপ আশঙ্কা করি না। যদি হারাই, আমার জন্ত আক্ষেপ করিবে, জগতে এরূপ কেহই নাই। আর যদি প্রভূকে কার্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিমিত্ত নয়নের উপর পড়িয়াছে, বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এই কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অমুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পায় লক্ষ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দ সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জলিলে বা সৈন্তেরা শব্দ করিলে পুনার তাঁহার এই কার্য প্রকাশ হইতে পারে,

সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল। শিবজী, তরঙ্গী ও বশজী ২৫ জন মাত্র বাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটি বৃহৎ বাগানে পৌছিয়া তথায় লুকায়িত রহিলেন। রঘুনাথ হারার মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আত্ম-কাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্মরশব্দ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পশ্চিম একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া বাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিশ্চয় তইল, দীপাবলী নির্বাণ হইল, নিশ্চয় নগরে কেবল প্রহরীগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল ও সময়ে সময়ে শৃগালের স্বর বায়ুপথে আসিতে লাগিল। ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল, শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল।

ইদিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলীর মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার, শিবজী চাহিয়া দেখিলেন। বহুলোকে দীপাবলী লইয়া বাত্ম করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে,—এই বরষাত্রা!

বরষাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা বাইতেছে। পথ লোক-সমাকীর্ণ ও নানা বাস্তব্য দ্বারা অতি উচ্চরব হইতেছে। অনেক অস্বাভাবী, অধিকাংশ পনাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ তরঙ্গী ও

বনজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের বিকে চাহিলেন রাজ। “হর ত এই শেব বিদায়” — এই ভাব সকলের মধ্যে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্য অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই রাজীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রিগণ সারেসতা ধীর বাটার নিকট দিয়া বাইল, বাটার কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রিগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন, রাজীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন ধী সাহেবের গৃহের নিকট সূক্ষ্মরিত রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে বরষাক্রান্ত গোল ধামিয়া গেল।

রজনী আরও গভীর হইল। সারেসতা ধীর রন্ধন-গৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। ধী সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও প্রায় করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, সব্ব করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, ছিঁড়ের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা পিপীলিকা-সারের জ্ঞান গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তখন চীৎকার-শব্দ করিয়া বাইরা সারেসতা ধীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্ৰার্থনার মিনতি করিতেছেন, ধী সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন,

শিবজী পূনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাঙ্গণ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নাৎ ধী সাহেব এক ঘরে আসিলেন, দেখিলেন, বর্ষধারী মহারাষ্ট্রীয় বোদ্ধা। অস্ত্রধারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিলেন, “হর হর মহাদেও” বলিয়া মহারাষ্ট্রীগণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাক্ষুসী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোলা হইল। প্রাঙ্গণের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রত্নরক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পক্ষবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেঁটন করিল।

শীঘ্রই ভীষণরূপে সেই প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। প্রাঙ্গণের আলোক নির্মাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ চীৎকার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্ধকারে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে। কবাতের কনকনা শব্দ, আক্রমণকারীদের মুহুমুহঃ উল্লাস-রব এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের আর্ন্তনাদে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্ষা-হস্তে লক্ষ দিয়া বোদ্ধা-দিগের মধ্যে পড়িলেন, “হর হর মহাদেও” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুকার করিয়া উঠিল, মোগল-প্রহরিগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্ষাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া সারেসতা ধীর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল। শিবজী দেখিলেন, সমুখে যত চাঁদ ধীর

বিক্রমশালী পুত্র শম্ভুর খাঁ। পিতা অপ-
মানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি
পুত্র সেই প্রভুর রক্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও
অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত নতায়মান
হইলেন, কোবে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন,
“ধূমক, তোমার পিতার রক্তে এখনও
আমার হস্ত কলবিত রহিয়াছে, তোমার
জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দাও।”

শম্ভুর খাঁ উত্তর করিলেন না। শম-
শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জলন্ত। শিবজী
আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্বেই শম-
শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আগন মস্তকোপরি
দেখিলেন।

শিবজী মুহূর্ত্তর জন্ত প্রাণের আশা
ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ডুবানীর নাম লই-
লেন। সচসা দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটি
বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শম্ভুরকে কৃতল-
শায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন, রঘু-
নাথজী হাবিলদার।

শিবজী। “হাবিলদার! এ কার্য আমার
স্বপ্ন থাকিবে।” কেবল এইমাত্র বলিয়া
শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ দিয়া রজ্জু অবলম্বন
করিয়া সারোস্তা খাঁ পলাইলেন। কয়েকজন
মাউলী সেই গবাক্‌মুখে ধাবমান হইরাছিল,
একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল, তাহা
সারোস্তা খাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী
ছেদন করিল, কিন্তু সারোস্তা খাঁ আর পশ্চাতে
না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র
আবদুল কতর্গা ও সমস্ত গ্রহরী নিহত হইল।
তখন শিবজী দেখিলেন স্বর বারান্দা রক্তে
রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে গ্রহরিগণের
মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, ত্রিলোক ও পলা-
তকগণের আত্মনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হই-
তেছে, মাউলীগণ যোগলদিগের ক্ষেমাধনার্থ

চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের
অশ্লিষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও
ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত-প্রণালী ভীষণ
দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলী-
দিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে
সকল বুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর
বুধা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন এবং
শত্রুগণ সেরূপ প্রাণনাশ বাহাতে না হয়, সে
জগৎগণেই যত্ন করিতেন। শিবজী আদেশ করি-
লেন, “আমাদের কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, ভীক
সারোস্তা খাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে
না, এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়ের দিকে চল।”

অন্ধকার-রজনীতে শিবজী অনারাদে
পুনা হইতে বহির্গত হইয়া সিংহগড়ের দিকে
ধাবমান হইলেন। প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া
মশাল আলিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক
মশাল জলিল। পুনা হইতে সারোস্তা খাঁ
দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র-সেনা নিরাপদে
সিংহগড়ে উঠিল।

পরদিন প্রাতে ক্রুদ্ধ যোগলগণ সিংহ-
গড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের
কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন
করিল। কর্ত্তা কী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ
মহারাষ্ট্রীয় অধাঃগোহিগণ বহুদূর পর্যন্ত
পশ্চাচ্ছাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী বোন্ধার আরও যুদ্ধ-
পিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সারোস্তা খাঁ সেরূপ
যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি আরজীবকে এক-
ধানি পত্র লিখিলেন; তাহাতে নিজ সৈন্তের
যথেষ্ট নিশ্চা করিলেন ও বশোবস্ত অর্থে
বন্দীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে,
এইরূপ জানাইলেন। আরজীব দুই জনকেই
অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাই-
লেন এবং নিজ পুত্র সুলতান মোরাদজীকে
দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা

করিবার জন্য বশোবস্তকে পুনর্বার পাঠাইলেন ।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না । ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই জাদ্বাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে বাইরা রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন । আমরা এখন এই নব-ভূপতির দিকট বিদায় লইব ।

পাঠক ! বহুবিস হইল, তোরণ-দুর্গ হইতে আসিয়াছি ; চল, এই অবসরে একবার সেই দুর্গে কি হইতেছে, দেখি ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

আশা ।

হৃদি পোড়া অগ্নি বসি রমালের তলে,
জান্তিমদে বাতি ভাবি পাইব সমরে
পানপদ্ম । কাণে হিয়া তরু তরু করি
শুনি যদি পরশক ।

মধুসূদন দত্ত ।

যে দিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যে দিন তাহার হৃদয় উৎক্লিষ্ট হয়, সেই দিন প্রথম-প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল । উচ্চানে সজ্জার সময় যখন সরযুর দুটি সহসা সেই তরুণ স্বদেশীয় যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকা সহসা চমকিত হইলেন । আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর বাইলেন ।

রজনীতে সরযু সেই স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে তোজন করাইতে বাইলেন, পাঁচ

দণ্ডারমান হইয়া দেববিনিমিত্ত অবরবেদ্য দিকে চাহিয়া রহিলেন । যখন চারি চক্কর মিলন হইল, তখন লজ্জাতরুতরুনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন ।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল । রঘুনাথ তাহার দিকে সোপায়ে দৃষ্টি করিলেন কেন ? রঘুনাথ কি স্বদেশীয় বালিকার প্রতি একটু স্নেহের সহিত নরনক্কেপ করিয়াছেন ? তরুণ যোদ্ধার কি সরযুর প্রতি একটু যমতা ভ্রমিয়াছে ?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয় একটু উন্মিষ হইল । পরে যখন রঘুনাথের আনন্দনয়ী বাক্যগুলি শুনিলেন, রঘুনাথ যখন সরযুর গলায় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় আনন্দ ও উবেগে প্রাবিত হইল । যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অস্বারূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযু গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গরাক্ষপার্শ্বে দণ্ডারমান রহিলেন । অথ ও অথারোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিম্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন । দিবালোকে পর্কৃতমালা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা বাইতেছে, তাহার উপর বতদূর দেখা যায়, পর্কৃতবৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বাহুতে ভুলিতেছে । উপরে পর্কৃতশৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল একটিনদীর্ণপে বহিয়া বাইতেছে । নীচে সুল্লর উপত্যকার গ্রামের কুটার দেখা বাইতেছে, সুল্লর হরিদবর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা বাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্কৃতকত্তা তরঙ্গিত ধীরে ধীরে বহিয়া বাইতেছে ও যেনবিবর্জিত সূর্য্য এই সুল্লর দৃষ্টের উপর দিয়া আপন আলোক-হিলোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছে ;

কিন্তু সরসু এ সময় দেখিতেছিলেন না, মম এ সময় দৃষ্টে ভ্রষ্ট ছিল না।

সরসু অন্য সময় দিন একটু অল্পমনস্ক রহিলেন। সাংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন, বহুতে পিতার শব্দা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে বাইলেন। নিতম্ব রজনীতে সরসু উত্তীর্ণা ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপার্শ্বে বাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চন্দ্রালোক দেখিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

চিন্তা।

এস তুমি, এস বাথ, রথ পরিহারি
কেলি হুয়ে বর্ষ, চর্ষ, অসি, কুণ, বহুঃ,
ভ্যাজি রথ পদক্ষেপে এস ঘোর পাশে।

সরসুঃ নমঃ।

জনार्দন অভাবতই সরলভাবে লোক ছিলেন, সময় দিন শাস্ত্রাভিলাষী বা দেবপূজার রত থাকিতেন, প্রভাতে সাংকালে কিল্লা-দ্বারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে বাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। পালিতকল্পকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কন্ডাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহ্বান হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরসু বসিয়া শুনিতেন। এতদ্বিধি প্রায়ই আপন কার্যে রত থাকিতেন, বালিকার মনে একদিন একটু নতন ভাব উদয় হইল, বুদ্ধ জনार्দন কেমন করিয়া জানিবেন?

বালিকার মনে একদিন সহসা যে ভাব উদয় হয়, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয় না, একদিন সন্ধ্যাকালে সরসুর মনে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা দুই চারি দিবসের

মধ্যে অনেকটা হাস প্রাপ্ত হইল। তথাপি মনে এরূপ ভাব একেবারে দীন হয় না, মধ্যে মধ্যে সেই তরুণ বোদ্ধার কথা সরসুর মনে জাগরিত হইত। বিশেষ সরসু জন্মাবধি একাকিনী, জনार्দন ভিন্ন তিনি ভালবাসিবার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই দীর্ঘ, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম-বোবনে বেরূপ দেখিয়া একদিন সরসুর মনে আলো-ভিত হইল, সাংকালে, প্রভাতে ও গভীর রজনীতে সেই রূপটি সময়ে সময়ে সরসুর মনে জাগরিত হইত।

কল্পনা মারাবিনী! সরসু যখন দিনান্তে একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, অথবা নিশীথে চন্দ্রালোকে সেই পুশোদ্যানে বিচরণ করিতেন, তখন কতকল্প কল্পনা তাঁহার মনে জাগরিত হইত। সেই তরুণ বোদ্ধা এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিয়াছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, সরসুর কথা কি এক একবার তাঁহার মনে জাগরিত হয়? পুরুষের মন, নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, নানা আশায় অতিবাহিত হয়, আশাফলবতী, হটুক আর নাই হটুক, জীবন সর্বদা উল্লাস-পূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শৌকগৃহে বা নাট্যশালার, নানা কার্য্যে নানা চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তাহারা কি এক চিন্তা চিরকাল মনে ধারণ করে? তথাপি মারাবিনী আশা সরসুকে কানে কানে বলিয়া দিত, বোধ হয়, কখনও কখনও সরসুর কথা তরুণ বোদ্ধার মনে জাগরিত হয়।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ বোদ্ধা কি এখনও এ ভোরণ-দুর্গের কথা ভাবেন? এ কালে, এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির

আছে ? হায় ! নবীন জীবন পথে
পুষ্পটিকে লইয়া কণকাল খেলা করে,
পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর
উর্ধ্ব কোণার চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া
যায় ; কিন্তু অল আর করে না ! তথাপি
মায়াবিনী আশা সরসুর কানে কানে বলিয়া
দিত— বোধ হয়, একদিন সেই তরুণ বোদ্ধা
তোরণ-ভূর্গে কিরিয়া আসিবেন।

নিশীথে বধন সেই উন্নত ভূর্গ ও চারি-
দিকে পর্বতমালা চক্রেয় সুধাকিরণে নিম্নে
সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র
চক্রেয় দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার
হৃদয়ে কত কল্পনা উদয় হইত, কে বলিবে ?
বোধ হইত যেন, সেই পর্বত-পথ দিয়া এক-
জন নবীন অধারোহী আসিতেছেন, অথ
বেতবর্ণ, আরোহীর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট
ও নয়ন জীবৎ আবৃত করিয়াছে। যেন
ভূর্গে আসিয়া অধারোহী অবতরণ করিলেন,
যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ,
বলিষ্ঠ স্রুগোল বাহুতে সুবর্ণের বাজু, দক্ষিণ-
হস্তে দীর্ঘ বর্শা। যেন বোদ্ধা আবার আহা
করিতে বসিলেন, সরসু তাঁহাকে ভোজন
করাইতেছেন। অথবা রজনীতে সেই ছাদে
সরসু সেই বোদ্ধার নিকট সলজ্জ হইয়া
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, বোদ্ধাও যেন আন-
ন্দে সহিত সরসুর নিকট যুদ্ধ-কথা বর্ণনা
করিতেছেন।

কল্পনার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্র-
হিল্লোলের স্থায় একটির পর একটি
আইসে, তাহার পর আর একটি। সরসু
আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,
তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন,
বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরসুকে
ভুলেন নাই। যেন শিতা তাহার সহিত
সরসুর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন পর

লোকে পরিশুদ্ধ, চারিদিকে লীল আসিতেছে,
বাধা বালিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত
কি হইতেছে, সরসু আনন্দে না, জ্বল দেখিতে
পাইতেছেন না। যেন সরসু অবশুষ্ঠন বৃত্তী
হইয়া সেই দেব-প্রতিমূর্তির নিকট বসিলেন,
যেন হুবকের হস্তে আপন বোদ্ধা কল্পিত
হস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই
জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। আনন্দে বালিকা-
কণর স্রীত হইল। সরসু! সরসু! পাগলিনী
হইও না।

আবার কল্পনা আসিল। রঘুনাথ
খ্যাতিপন্ন হন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত
হন নাই, রঘুনাথ নরিন্দ্র, কিন্তু সরসুকে
বিবাহ করিয়াছেন। পর্বতের নীচে ঐ
যে স্মার উপত্যকা দেখা বাইতেছে,
যেখানে শান্তপ্রবাণী নদী চক্সালোকে ধীরে
ধীরে বহিয়া বাইতেছে, যেখানে হরিশর্বা
স্মার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চক্সালোকে সুপ্ত রহি-
রাছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটারের
মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুটার সরসুর, যেন
দিবাবসানে সরসু বহুতে রজন্যকার্য সমাপন
করিয়াছেন, যেন বহু পূর্বক জীবিতনাথের
জন্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটার-
সম্মুখে স্মার দুর্বার উপর বসিয়া রহিয়া-
ছেন, যেন দুর্গ-ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়াছেন,
যেন সেই দিক হইতেই সমস্ত দিনের পরি-
শ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটারভি-
মুখে আসিতেছেন। সরসুর কণর নৃত্য করিয়া
উঠিল, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া সরসুকে
একটি নূতন কণমালা পরাইয়া দিলেন।
পুলকে বালিকার কণর আবার স্রীত হইল।
সরসু! সরসু! পাগলিনী হইও না।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস
অতিত হইল, বৎসর অভিবাহিত হইল, কিন্তু
সরসুর কল্পনালহরী শেষ হইল না। যে

যদেন্দ্রীয় তরুণ বোদ্ধাকে সরস্ব এই বিদেশে একদিন সমস্ত খাওয়ারই ছিলেন, তাঁহার কমনীয় মুখখানি করুণার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে বালিকার মনে জাগরিত হইত । যে নীর্থকার পুরুষ সমস্ত সরস্ববালার গলায় প্রিয় কর্তৃহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আনন্দনীর রূপ ও দেবতুল্য আকৃতি করুণার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই সরস্বর হৃদয়ে উদ্ভিত হইত । করুণা কি মায়াবিনী ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

পুনর্নির্গমন ।

—চেতন পাইয়া

নিশি বাবে আঁখি দেখি তোমার সম্মুখে ।

বধূহৃদয় রক্ত ।

করুণা, মায়াবিনী নহে, সরস্ববালার চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে, বালিকার আশা বিশ্বাস-যাতি নী নহে ।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরস্ব পুনরায় সেই পুষ্পোদ্যানে পুষ্প তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কি মনে করিয়া হৃদয়ের সেই কর্তৃহারের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । সরস্বর রূপ পূর্ববৎ স্নিগ্ধ ও আনন্দীয়, সরস্বর মুখমণ্ডল পূর্ববৎ কমনীয় ও শান্ত । তথাপি এক বৎসরে সে রূপের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, নব আশা ও উল্লাসে সে মুখমণ্ডল অধিক-তর কমনীয় কাণ্ডি ধারণ করিয়াছে । নূতন জ্যোতিতে সে চন্দ্রবর্ষ আলোকিত হইয়াছে, নূতন উষ্ম ও নূতন জীবনোৎসাহ সে শরীর টল-মল করিতেছে, সরস্বর হৃদয়, মন, দেহ পরি-বর্তিত হইয়াছে, সরস্ব বালিকা নহেন, প্রথম-যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন । রূপবতী, চিন্তাবতী, যৌবন-সম্পন্ন সরস্বালা পুষ্প

তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই কর্তৃমালার দিকে দেখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে যারদেখে একজন তরুণ রাজপুত্র বোদ্ধা লব্ধ হইতে অবতরণ করিলেন । পুষ্প তুলিতে তুলিতে রাজপুত্রকুমারী সেই দিকে চাহি-লেন,—সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, সে দিক হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না ।

রাজপুত্র বোদ্ধাও সেই পুষ্পোদ্যানে সেই রাজপুত্র বালাকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন । একদিন নিশীথে বাহার রূপ দেখিয়া বিমো-হিত হইয়াছিলেন, একদিন প্রভাতে বাহার পবিত্র কণ্ঠে প্রিয় কর্তৃমালার পরাইয়া দিয়া-ছিলেন, যুদ্ধে ও সঙ্কটে, শিবিরে ও সৈন্তমধ্যে বাহার চিন্তা মধ্যে-মধ্যে বোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে, নিশীথে স্বপ্নযোগে বাহার কমনীয় লজ্জারঞ্জিত মুখখানি সর্বদাই বোদ্ধার সম্মুখে রূপ হইয়াছে, অজ্ঞ বহুদিন পর সেই আনন্দনীর রূপলাবণ্য, সেই লজ্জারঞ্জিত মুখ-খানি দেখিয়া রঘুনাথ কণেক, বাক্যশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন ।

চন্দ্রবর্ষরঘুনাথ ও সরস্বর উপস্থিত স্বধাবর্ষণ কর, ভূমি নিশীথে জাগরণ করিয়া মকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখি নাই । তরুণ-বরসে যখন মন প্রথম প্রণয়োন্মাদে উৎক্লিষ্ট হয়, যখন নবজাত চন্দ্রকরের স্তায় নবজাত প্রণয়ের আনন্দ-হিলোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন যৌবনের প্রথম-প্রণয়ে সমস্ত জগৎ সিক্ত করে, আকাশ ও মেদিনী প্রাবীণ্য করে, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুত্রী অবতীর্ণ হয় ! কণেক পর সরস্বালা অবনতমুখী হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও পিতাকে এই রঘুনাথজীর আগমনের সংবাদ দিলেন । জনাৰ্দ্ধনদেবও বহু সম্মান সহকারে শিবজীর হৃৎকে আহ্বান করিলেন ।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুরোহিতের সন্ধুখে উপবেশন করিয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সারৈস্তা ধী পরাত্ত হইয়া দিল্লী-প্রভ্যা-বন্ধন করিয়াছেন, শিবজী রাজগড়ে বাইরা রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, দেশশাসনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দিল্লীর শিবজীকে অন্ন করিবার জন্য অধরাধিপতি মহাপরাক্রান্ত রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ করিতেছেন, তাহা শুনিয়া মহারাষ্ট্ররাজ চিন্তিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ সম্ভবতঃ রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবেন এবং সেই কার্য্য-সম্পাদনার্থ অম্বরদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ জনার্দনদেবকে স্মরণ করিয়াছেন। রাজার আজ্ঞায় রঘুনাথ পুরোহিতকে লইতে আসিয়াছেন, শিবজীদি প্রস্তুত আছে। যদি পুরোহিত-মহাশয়ের সুবিধা হয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজগড় গমন করিলে ভাল হয়, রাজা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন।

ঘরের একপার্শ্বে সরযুবালা আহারের আয়োজন করিতেছিলেন, পাঠককে বলা বাহুল্য যে, এ কথাগুলি সমস্ত সরযুর কানে উঠিল। পিতা রাজধানীতে বাইবেন? রাজ্যদেশে এই তরুণ বোঙ্কা আমাদিগকে লইতে আসিয়াছেন—সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, হস্ত হইতে অলের পাত্র পড়িয়া গেল, লজ্জাবনতমুখী পুলকিতগাত্রী সরযুবালা ঘর হইতে নিম্নপ্রান্ত হইল।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে জনার্দনের সহিত কি কথা কহিতে লাগিলেন। আপনার দেশের কথা কহিলেন, জাতিভুলের পরিচয় দিলেন, পিতামাতার পরিচয় দিলেন, জনার্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। জনার্দনও রঘুনাথের উন্নত কুলের পরিচয় পাইয়া এবং যুদ্ধের বীরা, সৌন্দর্য্যবান ও বিনয় আলো-

চনা করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং রঘুনাথকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রঘুনাথের আহারের সময় হইয়াছে, সরযু সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃদ্ধ জনার্দন গাজোথান করিয়া ফুটিতে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস রঘুনাথ, এখন আহার করিতে বইয়া আজ তোমার পরিচয় পাইয়া বড় তুষ্ট হইলাম, তোমার বংশ আমার অপরিচিত নহে, তোমার গুণও বংশোচিত। আর সরযুকে আমি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকেও আজ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর যদি ভগবান করেন, এই যুদ্ধ-শেষে তোমার জ্ঞায় উপযুক্ত পাত্রের সরযুকে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা তইলে নিশ্চিন্ত হইয়া এই মানবলীলা সংবরণ করিব। জগদীশ্বর তোমাকে ও মা সরযুকে সুখে রাখুন।”

এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের চক্রেতে জল আসিল, ধীরে ধীরে পুরোহিতের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন, “পিতা, আশীর্বাদ করুন যেন, এ দরিদ্র সৈনিক আপনার অভিশ্রম পূর্ণ করিতে পারে। রঘুনাথ দরিদ্র হাবিলদার মাত্র, এক্ষণে তাহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই; কিন্তু জগদীশ্বর সহায় হউন, পিতা আশীর্বাদ করুন, রঘুনাথ এ অমূল্য রত্ন লাভ করিতে যত্নবান হইবে।”

এ আনন্দময়ী কথা সরযুবার কানে পৌছিল, বায়ু-তাড়িত পত্রের স্তায় তাহার দেহলতা কম্পিত হইতেছিল।

সে দিন রঘুনাথ কিছুই আহার করিতে পারিলেন না, আরক্তমুখী সরযুও ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজগড়-যাত্রা।

দেখিব প্রেবের বয়স আশি হে হুজনে।

রঘুনাথন দত্ত।

যাত্রার আয়োজন করিতে পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইল। রঘুনাথ পুরোহিতের আলয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সরযুকে উদ্ভানে কুল তুলিতে দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সরযুর প্রিয় হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। এ পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রঘুনাথ সাহস করিয়া সরযুর সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। সরযুকে দেখিলেই রঘুনাথের হৃদয় সজোরে আঘাত করিত, কুমারীও অবগুষ্ঠন টানিয়া সরিয়া যাইতেন।

তোরণ-দুর্গ হইতে রাজগড়-যাত্রাকালে সরযুর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে একজন অখারোহী চালিত, পর্কত-পথে বা জঙ্গলে, বৃক্ষ-শূন্ত মরুদানে বা নদীতীরে সে অখারোহী মুহুর্তের জন্তও শিবিকা হইতে দূরে যাইত না। নিশীথে যখন সরযু সহচরীর সহিত সামান্য কোন মনিরে, দোকানে বা জঙ্গল-গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিতেন, রজনীতে সময়ে সময়ে একজন অনিদ্র বোদ্ধা বর্শা-হস্তে তথায় পদচারণ করিত।

নারীমাজেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারে, এ সকল বিষয় দেখিতে পারে। পুরুষের বস্ত্র, পুরুষের আগ্রহ, পুরুষের হৃদয়ের আবেগ নারীর চক্ষুতে গোপন থাকে না। সরযু শিবিকার ভিতর হইতে সেই অবিজ্ঞাত অখারোহীকে দেখিতেন, নিশিতে সেই অনিদ্র বোদ্ধাকে দেখিতেন। সেই দেবনির্ধিত আকৃতি দেখিতে দেখিতে সরযুর নয়ন কল-

সিত হইল, সেই হৃদয়নির আশ্রয়হীন দেখিয়া সরযুর হৃদয় আনন্দ, প্রেয় ও উদ্বেগে প্রাবল্য হইল।

সন্ধ্যার সময় যখন সরযু সেই বোদ্ধাকে ভোজন করাইতে আসিতেন, মৌনাবলম্বী বোদ্ধার দর্শনে সরযু অবনতমুখী হইতেন, ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে শিবিকার আরোহণের সময় যখন সরযু সেই বোদ্ধাকে অস্থপূটে উপবিষ্ট দেখিতেন, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল হইতে সরযু সহজে নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না।

কয়েক দিন এইরূপে ভ্রমণানন্তর সকলে রাজগড়ে উপস্থিত হইলেন। জনাৰ্দ্দন সন্ধ্যার সময় দুর্গের নীচে একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্র-রাজের নিকট সমাচার পাঠাইলেন, রাজার অজ্ঞমতি হইলে পরদিনসহ দুর্গে প্রবেশ করিবেন।

সেই দিন রজনীতে আহারাদি প্রস্তুত করিতে কিছু বিলম্ব হইল। জনাৰ্দ্দন কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতে যাইলেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় সরযুবাম্বুনাথকে ভোজন করাইলেন।

ভোজনান্তে রঘুনাথ অঙ্গমিনে। স্নান পূৰ্ণ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন না, ক্রমশঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর যেখানে সরযু একাকী বসিয়া ছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে যাইয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন; হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া স্থিরভাবে কহিলেন, “দেবি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।”

রঘুনাথের উচ্চারিত এই কথাগুলি যেন ত্বষিতে পকে বারিধারার স্রাব সরযুর কানে লাগিল। সরযুর হৃদয় নাচিয়া উঠিল, সরযু আরক্তমুখ নত করিয়া কণেক দণ্ডায়মান হইলেন।

রঘুনাথ পুনরায় বলিলেন, “দেবি, বিদায়

দিন, কল্যা আপনারা রাজপ্রাসাদে বাইবেন, এ দরিদ্র সৈনিক পুনরায় নিজকাৰ্য্যে বাইতে বাসনা করে।”

এই কথা শুনিয়া সরযু লজ্জা বিম্বিত হইলেন, মরনধরের জল মুছিয়া নারীর বস্তা-পূর্ণ হারে বলিলেন, “আপনি আমাদিগের কত যে বন্ধ করিয়াছেন, পিতার জন্ত, আমার জন্ত যে পরিত্রাণ করিয়াছেন, তাহার জন্য ভগবান আপনাকে যুদ্ধে জয়ী করুন, আপনার মনকাযনা পূর্ণ করুন। আমরা সে বয়ের কি প্রতিদান করিতে পারি?”

রঘুনাথ বিনীতধরে উত্তর দিলেন, “রাজা-বশে আপনাদিগকে রাজগড়ে নিরাপদে আনিতে পারিরাছি, এটি আমার পরম ভাগ্য, ইহাতে আমার কিছু গুণ নাই। তথাপি দরিদ্র সৈনিকের বস্ত্রে যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে,— তবে—এ দরিদ্র সৈনিককে বিম্বিত হইবেন না।”

কথাটি সরযু বুঝিলেন, মুখখানি অবনত করিলেন। রঘুনাথ তখন সাচস পাইয়া লজ্জা বিস্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “এ দরিদ্র সৈনিক যদি উচ্চ আশা করিয়া থাকে, আপনি অপরাধ লইবেন না। আপনার পিতা প্রসন্ন-চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, ভরসা করি, আপনিও আমার প্রতি অগ্রসর হইবেন না। যদি ভগবান আমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, যদি জীবনের চেষ্টা ও আশা ফলবতী হয়, তবে একদিন মনের কথা বলিব, সে পর্য্যন্ত এ দরিদ্র সৈনিককে এক একবার স্মরণপথে স্থান দিবেন।”

বিনীতভাবে বিদায় লইয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। সরযু একদণ্ড কাল সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; দ্বিপ্রহর রজনীর সময় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে

বলিলেন, “সৈনিকজ্ঞে! তুমি চিরকাল এ দাসীর স্মরণপথে আগরিত থাকিবে, ভগবান সাক্ষী থাকিবেন।”

চতুর্থ পর্বে

রাজা জয়সিংহ।

মরহুমোত্তম ভূমি—

বিদ্যা বুদ্ধি বাহুবলে অতুল অগতে।

মহাবীর দত্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আয়াজীব সায়ের্তা খাঁ ও বশোবন্ত সিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন ও নিজ পুত্র মুলতান মোরাজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সহায়তার জন্য বশো-বন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সম্রাট অবশেষে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলওয়ার খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্র-মাসের শেষযোগে জয়সিংহ পুনরায় উপস্থিত হইবেন। সায়ের্তা খাঁর ন্যায় নিকরুংসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি দিলওয়ার খাঁকে পুরন্দর-দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং সিংহগড় বেটন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাজিত, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোদীপ্তপ্রতাপ তাঁহার নিকট অবিস্মৃত ছিল না। সেরগ

পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট আরজাওরের আর কেহই ছিলেন না। তাৎকালিক করাদী ভ্রমণকারী বৈদ্যে শিবিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের স্তায় চিকিৎসা, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভয়োভয় হইলেন ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ প্রথমে এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপছ স্তায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুঃতা করিতেছেন না। তিনিও ক্ষত্রিয়, কত্রিযোচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ রাজ্যের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “জিজ্ঞাস্য, আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম। রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে, দিল্লীর সম্রাট তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলবেন, আমি রাজপুত্র, রাজপুত্রের বাক্য অস্তথা হয় না।”

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, “মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।”

সভাসভ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে

শিবিরের বাহিরে বাইলেন; কহ সম্রাট নূরুৎ তাহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাত্তরে আনিলেন ও রাজ্য-গদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সম্রাটর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ কণেক মিঠালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, “রাজন! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপনার গৃহের স্তায় বিবেচনা করিবেন।”

শিবজী। রাজন! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিরূপ? রঘুনাথপছ দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

জয়সিংহ। হাঁ, রঘুনাথ স্তায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ আছে, রাজন! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা করিব, দিল্লীর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন। এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, রাজপুত্রের কথা অস্তথা হয় না।

এইরূপে কণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল, শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিল না। তখন শিবজী কপট আনন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্ত গণ্ডহস্ত স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্রে জল।

জয়সিংহ। রাজন! আপনি যদি আজ্ঞামর্পণ করিয়া ক্ষুর হইয়া থাকেন, সে খেদ নিস্তরোজন। আপনি বিশ্বাস

করিয়া আবার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিব না। অতঃপর রজনীতে আমার অবশালা হইতে অব্যাহিয়া লউন, পুনরায় গ্রহান করুন। আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে বাইবেন, আবার আদেশে কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। পরে বৃদ্ধ জয় লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি, কতি নাই, কিন্তু কত্মিরর্থ কদাচ বিশ্বস্ত হইব না।

শিবজী। মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দুধর্মের জন্ত, যে হিন্দুগৌরবের জন্ত চেষ্টা করিয়াছি, সে মহৎ উদ্ভব, সে উন্নত উদ্দেশ্য শেষ হইল, সেই চিন্তায় জন্ম বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়া-ছিলাম, সেজন্তও এখন খেদ করিতেছি না।

জয়সিংহ। তবে কি জন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন?

শিবজী। বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাহিতে ভালবাদিতাম, অতঃপর দেখিলাম, সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম থাকে, তবে রাজপুত-শরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনের অধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়সিংহ কি যবন আরাজীবের সেনাপতি?

জয়সিংহ। কত্মিররাজ! সেটি প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করে নাই, বত দিন সাধ্য, দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, বিধির নির্বন্ধে পরাজয় হইয়াছে। মেওয়ারের বীরপ্রবর প্রাচ্যঃসরসীর প্রতাপ অসাধ্য-সাধনেও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সন্ততিও

দিল্লীর করগ্রহ, এ সমস্ত বোধ হইয়া অবগত আছেন।

শিবজী। আহি, সেই জন্তই জিজ্ঞাসা করিতেছি, বাহাদুরের সহিত আপনাদিগের ঐক্য দিমের বৈরতাব্য, তাহাদের কার্যে আগনি এরূপ বহুশীল কি জন্ত?

জয়সিংহ। যখন দিল্লীধরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহার কার্যসিদ্ধির জন্ত সত্যদান করিয়াছি। যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি, তাহা করিব।

শিবজী। সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয়? বাহাদুর আমাদের দেশের শত্রু, ধর্মের বিরুদ্ধাচারী, তাহাদের সহিত সত্য-সম্বন্ধ কি?

জয়সিংহ। আপনি কত্মির হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, তাহারা বহুশত বৎসর মুসলমানদিগের সহিত 'যুদ্ধ' করিয়াছে, কখনও সত্য লঙ্ঘন করে নাই। কখনও জয়লাভ করিয়াছে, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছে, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদ্বিপদে সর্বদা সত্যপালন করিয়াছে। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, শিক্ৰমধ্যে, শত্রুমধ্যে, রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত। কত্মিররাজ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, যানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত দিল্লীধরের বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন, কেহ কখনও জন্ত বিধাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকট বাহা সত্য করিয়া-ছিলেন, তাহা পালন করিতে ক্রটি করেন নাই। মহারাজ্জীবন! রাজপুতের কথাই

কপাল, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুত্রের কথা লঙ্ঘন হয় নাই।

শিবজী। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ হিন্দু-ধর্মের একজন প্রধান প্রেরী, তিনি মুসলমানের ভক্ত হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ। যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দু-ধর্মের প্রেরী সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমি, তাঁহার মাড়ওয়ার-সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া, সেই সেনার সাহায্যে হিন্দু-স্বাধীনতা-রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জরী হইয়া আরাজীবেকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উজ্জীন করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট, বালিয়া সম্মান করিতাম অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, স্বদেশ ও স্বধর্মরক্ষার্থে সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীখয়ের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ব্রত গ্রহণ করিয়া, তাহা লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য হয় নাই, যশের কলঙ্কে আপন যশোরশি জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদীতীরে আরাজীবেক নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরাজীবেক অতিশয় বিধেয়ী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য করিতেন না।

চতুর শিবজী দেখিলেন, জয়সিংহ যশোবন্ত সিংহ নহেন। ক্ষণেক পর আবার বলিলেন, “হিন্দুধর্মের উন্নতি-চেষ্টা কি গর্হিত কার্য? হিন্দুকে ভাড়া মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য?”

জয়সিংহ। আমি তাহা বলি নাই।

যশোবন্ত কেন আরাজীবেক কার্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে ভগবানের সাক্ষাতে আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি ভক্ত? সম্রাটের কার্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ ক্ষত্রোচিত কার্য নহে।

শিবজী। তিনি আমার সহিত প্রকৃত্তে যোগ দিলে দিল্লীখর অস্ত্র সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।

জয়সিংহ। যুদ্ধে মরণ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য, কপটাচরণ ক্ষত্রিয়ের অবমাননা।

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন, “রাজপুত্র মহারাজীরেও মৃত্যু-ভয় করেন না, যদি এই ঐকিঞ্চিংকর জীবন-দান করিলে আমার উদ্দেশ্য-সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারি অথবা রাজপুত্র আপন অব্যর্থ বর্শা ধারণ করুন, এই ক্ষুদ্রে আঘাত করুন, সহাস্ত্রবদনে প্রাণত্যাগ করি। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে শ্রবণে দেখিতাম, বাহার জন্ত শতযুদ্ধ ঘূষিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিশ বৎসর পর্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে চিন্তা করিয়াছি, সে গৌরব ও স্বাধীনতার আশা ত্যাগ করিতে ক্রমে ব্যথা লাগে। যুদ্ধে প্রাণ দিলে কি সে স্বাধীনতা রক্ষা হইবে?”

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন; কিন্তু পূর্ব-বৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, “সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষা না হয়, সত্য-

লক্ষ্যে হইবে ? বীরের শোণিতে যদি আমি
নভা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের
চাতুরীতে কি হইবে ?

শিবজী পরাত হইলেন ; অনেককণ পর
পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, “মহারাজ !
আমি আপনাকে পিতৃত্বলা জ্ঞান করি, আপ-
নার জ্ঞান ধর্মজ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বোদ্ধা আমি কখনও
দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রত্বলা, একটি
কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃত্বলা, সং-
পরামর্শ দিন । আমি বালাকালে যখন কঙ্কণ-
প্রদেশের অসংখ্য পক্ষী ও উপত্যকায় ভ্রমণ
করিতাম, আমার দ্বশরে চিন্তা আসিত, স্বপ্ন
উদিত হইত । ভাবিতাম, যেন সাক্ষাৎ ভবানী
আমাকে স্বাধীনতা-স্থাপনের জন্ত আদেশ
করিতেছেন, যেন দেবালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি
করিতে, ব্রাহ্মণদিগের সন্মান বৃদ্ধি করিতে,
গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্মবিরোধী মুসল-
মানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উদ্ভে-
জনা করিতেছেন । আমি বালক ছিলাম,
সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সমর্পে খজা গ্রহণ করি-
লাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ
অধিকার করিতে লাগিলাম । যৌবনেও
সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, হিন্দুনামের গৌরব,
হিন্দুধর্মের প্রাধান্ত, হিন্দুস্বাধীনতা-সংস্থাপন ।
সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয়
করিয়াছি, রাজ্য বিস্তার করিয়াছি, দেবালয়
স্থাপন করিয়াছি । কজিরাজ ! আমার এ
উদ্দেশ্য কি মন্দ ? স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্নমাত্র ?
আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন ।”

বহুদূরদর্শী ধর্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ
কণেক নিম্ন হইয়া রহিলেন, পরে গভীর-
স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন্ ! আপ-
নার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বহুতর উদ্দেশ্য আমি
জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর
কিছুই আমি জানি না । শিবজী ! আপনার

মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকটে অবিকৃত নাই,
আমি শত্রুর নিকট আপনার উদ্দেশ্যের প্রশংসা
করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে আপনার উদ্য-
হরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত্র স্বাধী-
নতার গৌরব এখনও বিস্তৃত হয় নাই । আর
শিবজী ! আপনার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে, চারি-
দিকে যত দেখি, মনে মনে চিন্তা করি, বোধ
হয়, মোগল-রাজ্য আর থাকে না । বয়,
চেষ্টা সকলই বিফল । মুসলমান-রাজ্য কলঙ্ক-
রাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিশাসপ্রিয়তার ভঞ্-
জিত হইয়াছে, হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে শাপ-
গ্রস্ত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের জ্ঞান আর
দাঁড়াইতে পারে না । শীঘ্র কি বিলম্বে এই
প্রাসাদভূম্য মোগল-রাজ্য বোধ হয়, ধূলি-
সাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর
প্রাধান্ত । মহারাজীর জীবন অঙ্কুরিত হই-
তেছে, মহারাজীর যৌবন-তেজে বোধ হয়,
ভারতবর্ষ প্রাবৃত হইবে । শিবজী ! আপ-
নার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা
উদ্ভেজনা করেন নাই ।”

উৎসাহে, আনন্দে শিবজীর শরীর কট-
কিত হইয়া উঠিল । তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিলেন, “তবে ভবানুশ মঙ্গল্য সেই
পতনোন্মুখ মোগল-প্রাসাদের একমাত্র শুভ-
স্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্ত ?”

জয়সিংহ । সত্যপালন কজিরাজ, বাহা
সত্য করিয়াছি, তাহা পালন করিব । কিন্তু
অসাধা-সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত
হইবে ।

শিবজী । ভাল, সত্যপালন করুন, কপটা-
চারী আরংজীবের নিকটেও আপনার ধর্ম-
চরণ দেখিয়া দেবতারাত্ত বিস্মিত হইয়া আপ-
নার মাধুবাদ করিবেন । কিন্তু আমি আরং-
জীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি
যদি বুদ্ধিবলে স্বদেশের উন্নতি-সাধনের প্রয়াস

পাই, আরংজীবকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহা কি নিশ্চয় ?

জরসিংহ। কল্পিতরাজ ! চাতুরী বোঝার পক্ষে সকল সময়ে নিশ্চয়, বিশেষতঃ মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে চাতুরী অধিকতর নিশ্চয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য, বোধ হয়, তাহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয়, তাহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবে।

কিন্তু শিবজী ! অত আপনি যে শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা কল্যাণ কুলিবে না। আমার কথার দোষ গ্রহণ করিবেন না, অত আপান নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, তথা তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অত আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখযুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যশুক্র, শুক্রর জ্ঞান ধর্ম-শিক্ষা দিন। অত আপনি মন্বশিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বুদ্ধ বহুদর্শী রাজপুত্রের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে সম্মুখরণশিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বসুন। আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, আপনার মহৎ উদ্দেশ্যে আমি শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে ? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাশুক্র ! সাবধান ! আপনার প্রত্যেক কার্যের ফল বহুকাল-ব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে।

এই মহৎবাক্য শুনিয়া শিবজী কণেক স্তম্ভিত রহিলেন, শেষে বলিলেন, “আপনি শুক্রর শুক্র, আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য। কিন্তু অত আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব ?”

জরসিংহ। জয়-পরাজয়ের স্থিরতা নাই।

অত আমার অর হইল, কল্যাণ আপনার জয়

হইতে পারে। অত আপনি আরংজীবের অধীন হইলেন, ঘটনাক্রমে কল্যাণ স্বাধীন হইতে পারেন।

শিবজী। অগভীর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বুধা। অরং ভবানী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিয়াছেন।

জরসিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “শরীর কণ্ডভঙ্গ, এ বুদ্ধ শরীর কত দিন থাকিবে ? কিন্তু বত দিন থাকিবে, সত্যপালনে বিরত হইবে না।”

শিবজী। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।

জরসিংহ। শিবজী ! এক্ষণে বিদায় দিন, আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য করিতেছি, বত দিন জীবিত থাকিবে, দিল্লীর এ বুদ্ধ সেনা বিজ্রোহচরণ করিবে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর ! নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাষ্ট্রের গৌরব ও হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করুন, যোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দু-তেজ আর নিবাণ হয় না। অচিরে দেশে দেশে হিন্দুর গৌরব নাম, আপনার গৌরবনাম প্রতিধ্বনিত হইবে।

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জরসিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ধন্যাত্মন ! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই বেন সার্থক হয়। আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর ! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দুর্গবিজয় ।

তৌমিকে এবে সময়তরঙ্গ

উবলিল দিল্ল বধা বধি বায়ু সহ নির্ধোবে ।

রঘুদত্তন বস্ত ।

শীঘ্রই সন্ধি-স্থাপন হইল । শিবজী যোগল-
দিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়া-
ছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহ-
ম্মদনগর-রাজ্যের মধ্যে যে স্বাভিংশং দুর্গ
অধিকার বা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার
মধ্যেও বিংশটি ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট
দ্বাদশটিমাত্র আরম্ভজীবের অধীনে জায়গীর-
স্বরূপ রাখিলেন । যে প্রদেশ তিনি সম্রাটকে
দিলেন, তাহার বিনিময়ে বিজয়পুর-রাজ্যের
অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট শিবজীকে
দান করিলেন ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক
শম্ভুজী পাঁচ-হাজারী মসাবদার পদ প্রাপ্ত
হইলেন ।

শিবজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা
জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া
সেই প্রদেশ দিল্লীখের অধীনে আনিবার
বস্ত করিতে লাগিলেন । শিবজীর পিতা
বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন
করিয়াছিলেন, শিবজীর বিপদকালে বিজয়-
পুরের সুলতান সন্ধি বিস্তুত হইয়া শিবজীর
রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কচিত হন নাই ।
সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষা-
লম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলী
আদিলশাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং
আপন মাউলী সৈন্ত দ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ
হস্তগত করিলেন ।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সম্ভাব উত্ত-
রোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং পরস্পরের

বন্যো অতিশয় ঘেহ করিল । উভয়ে সর্বদাই
একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহা-
য়তা করতেন । বলা বাহুল্য যে, শিবজীর
একজন তরুণ হাবিলদার সর্বদাই জয়সিংহের
একজন পুরোহিত-সমনে বাইতেন । নাম
হলিবার কি আবশ্যক আছে ?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনাৰ্দ্দন ক্রমে
রঘুনাথকে পূজ্যবৎ ঘোষণা লাগিলেন, সর্ব-
দাই গৃহে আহ্বান করিতেন । রঘুনাথও
অবসর পাইলেই সেই সরল-স্বভাব পুরো-
হিতের নিকট আসিতেন, তাহার নিকট
রাজস্থানের সংবাদ পাইতেন, রাজা জয়-
সিংহের কথা শুনিতেন, স্বদেশের কথা শুনি-
তেন । কখন কখন বা রজনী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত
বসিয়া যুদ্ধের কথা কহিতেন, পর্বতদুর্গ
আক্রমণের কথা, শত্রু-শিবির আক্রমণের
কথা, জঙ্গল বা গিরিচূড়ার ভীষণ যুদ্ধের কথা
বর্ণনা করিতেন । এ সকল কথা বলিতে
বলিতে যোদ্ধার নয়ন প্রজ্জ্বলিত হইত, বর
কম্পিত হইত, মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিত ।

যুদ্ধ জনাৰ্দ্দন সভয়ে যুদ্ধবাক্তা শুনিতেন,
পার্শ্বের ঘরে নীরবে বসিয়া সরস্বালা সেই
জলন্ত কথাগুলি শুনিতেন, নীরবে অশ্রুজল
ত্যাগ করিতেন, নীরবে ভগবানের নিকট
সেই তরুণ যোদ্ধাকে রক্ষা করিবার জন্য
প্রার্থনা করিতেন । রজনী দ্বিপ্রহরের সময়
কথা সাঙ্গ হইত, সরস্বালা আহার আনিয়া
দিতেন । যতক্ষণ রঘুনাথ আহার করিতেন,
সরস্ব নীরবে সেই দেবমূর্তির দিকে চাহিয়া
চাহিয়া ভূপ্তিলাভ করিতেন না । ভোজনান্তে
যদি যোদ্ধা বৃদ্ধবয়ে বিদায় চাহিতেন বা অন্য
কিছু একটি কথা কহিতেন, বেগমুখবতী উষ্মা
সরস্বালা তাহার উত্তর দিতে পারিতেন
না । লজ্জায় তাহার গণ্ডস্থল আরক্তবর্ণ হইত,
নয়ন দুইটি মূদিত হইত, অবগুণ্ঠনটনির

সরহু সরিয়া বাইতেন, লক্ষ্যরীকে দিয়া উত্তর পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু উত্তরের আবশ্যক কি? সরহু নরনের ভাবা স্বঘৃণ্য বৃদ্ধিতেন, স্বঘৃণ্যের নরনের ভাবা সরহু বৃদ্ধিতেন। উত্তরের জীবন, মন, প্রাণ, প্রথম-প্রণয়ের অনির্বচনীয় আনন্দ-লহরীতে প্রাবৃত হইতেছিল, উত্তরের হৃদয় প্রথম-প্রণয়ের উষ্মে উৎক্লিষ্ট হইতেছিল।

অন্নদিনমধ্যে বিজয়পুরের অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পর্বত-দুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্বে কাহাকেও তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্তেরাও পূর্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫৬ কোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটেই তাঁহার শিবির ছিল, সারংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাত্রীর সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রচুর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে, রত্নমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসঙ্গেত দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর রত্নমণ্ডল-দুর্গ নির্মিত হইয়াছে। পর্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে। অস্ত্রাশ্রয় দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাট, কেবল ভ্রমল ও শিলা-রাশি-পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্বত আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন, তাঁহার মাউলী ও মহারাত্রীর সেনা যেন পর্বত-বিড়ালের ভায়

বৃক্ক বীরের শৈল হইতে শৈলাভরে লক্ষ্য দিতে বিতে পর্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃকের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও লক্ষ্য দিয়া সৈন্তগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাত্রীর সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্ত এরূপ পর্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ।

অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর কতকগুলি মশালের আলোক জ্বলিল। চিন্তাকুল হইয়া কণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্তা শুনিতে পাইয়াছে? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক জ্বলি কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুকে প্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বলিয়াছে, যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। শিবজী নিজ সৈন্তগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ক ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাত্রীগণ সেই পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ক, যেখানে কোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বৃক্ক হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কমাত্র নাট, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্বতে উঠিতে লাগিলেন।

কণেক পর মহারাত্রীগণ একটি পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথার স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্য বাইলে উপর হইতে দেখা যাইবার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃকের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে

দেখিতে লাগিলেন । শব্দে দেখিলেন, গ্রাম-
শত-হস্ত-পরিমাণ স্থানে বৃক্ষরাজ্য নাই, পরে
পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে । এই শত হস্ত
কিভাবে বাওয়া যায় ? পার্শ্বে দেখিলেন,
বাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন,
অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে
বাইয়া অস্ত্র পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে
আসিবার পুর্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে ।
শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।
পরে বলাকালের স্তম্ভ বিখ্যাতী মাউলী
বোঝা তন্নজী-মাংশ্রীকে ডাকাইলেন, দুই
জনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া
ক্ষণেক অতি মুদ্রবরে পরামর্শ করিতে লাগি-
লেন । ক্ষণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইল,
শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহার
সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল ।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া
আসিল; শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মুদ্র-
বরে কি কহিল । শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা
করিয়া বলিলেন, “তাহাই হউক, অস্ত্র
উপায় নাই ।”

বৃষ্টির জল অবতরণে এক স্থান ধৌত ও
ক্ষত হইয়া প্রণালীর দ্বার হইয়াছিল । দুই
পার্শ্বে উচ্চ, মধ্যস্থল গভীর, সেই প্রণালী
বুকে হাঁটিয়া যাইলে সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে
পাঙ্ক থাকার শঙ্করা দেখিতে পাইবে; এই
পরামর্শ স্থির হইল । সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে
সেই প্রণালীর মধ্যে দিয়া পরস্পর আরোহণ
করিতে লাগিল । শত শত শিলাথণ্ডের উপর
দিয়া নিম্নক অন্ধকার রজনীতে সহস্র সেনা
নিঃশব্দে পঙ্ক আরোহণ করিতে লাগিল ।
অচিরে উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে বাইয়া
প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভুবানীকে
ধন্যবাদ করিলেন ।

মহা তীহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা

পতিত হইল । শিবজী দেখিলেন, তাহার
বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে । আর একটি তীর,
আর একটি, আরও বহুসংখ্যক তীর ।
শত্রুগণ আগ্রিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর
সৈন্য প্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার
সময় তাহারা দেখিতে পাইয়াছে এবং সেই
দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে ।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে
দণ্ডায়মান হইল, তীরনিক্ষেপ ধামিয়া গেল ;
কিন্তু শিবজী বুঝিলেন, শত্রুগণ তাহার আগ-
মন জানিতে পারিয়াছে । তিনি দুর্গদিকে
চাহিয়া দেখিলেন, “এখন অনেকগুলি
আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে
গ্রহবিগল এমিক্ ওমিক্ বাইতেছে । তখন
তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র পঙ্কাশ
হস্ত দূরে । বুঝিলেন, সৈন্যগণ সতর্ক হইয়াছে,
জীবন যুদ্ধ বিনা অস্ত্র দুর্গ হস্তগত হইবার
নহে ।

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী এ সমস্ত
দেখিল ; ধীরে ধীরে বলিল, “রাজন্ !
এখনও নামিয়া যাউবার সময় আছে, অস্ত্র
দুর্গ হস্তগত না হয়, কল্যাণ হইবে, কিন্তু অস্ত্র
চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভা-
বনা ।” শিবজী গভীরবরে বলিলেন, “অর-
সিংহের নিকট বাহা বলিয়াছি, তাহা করিব,
অস্ত্র কল্পমণ্ডল লইব, অথবা এই যুদ্ধে প্রাণ-
ত্যাগ করিব ।”

শিবজী নিম্নক সেই বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর
দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । শত্রুকে
তুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের
অপর পার্শ্বে বাইয়া গোল করিতে আদেশ
করিলেন । অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর
পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শ্রুতা গেল, সেই দিক্
হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন
বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ গ্রহরী ও সৈন্য-সকল

সেই দিকে দাবমান হইল, এদিকে প্রাচী-
রোপরি বে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহা
নিব্বা বাইল। তখন শিবজী বলিলেন,
“মহারাক্ষীরগণ! শত যুদ্ধে ভোবরা আপন
বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখি-
য়াছ, অস্ত্র আর একবার সেই পরিচয় দাও।
শিবজী! বালাকালের দৌদ্ধদের পরিচয় অস্ত্র
প্রদান কর।”

প্রভুবাকো সকলের হৃদয় সাহসে পরি-
পূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে
সকলে অগ্রসর হইল, অচিরে দুর্গ-প্রাচীরের
নিকট পৌছিল। রজনী বিপ্রহর অতীত
হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, অগতে
শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু
সেই পর্বত-বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্মরশব্দে
প্রবাহিত হইতেছে।

ক্রমশঃ প্রাচীর হইতে শিবজী বিংশ
হস্ত দূরে আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন,
প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী; বৃক্ষের
ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই
দিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে
একটি তীর নিক্ষেপ করিল, হতভাগ্য
প্রহরীর মৃত-শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত
হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন,
দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন
সৈনিক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল।
শিবজী রোবে ওঠের উপর দস্ত হাখন করি-
লেন; আর লুকায়িত থাকিবার উপায়
দেখিলেন না, সৈন্তকে অগ্রসর হইবার
আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাক্ষীরদিগের “হর হর
মহাদেব” যুদ্ধনাদ গগনে উখিত হইল,
একদল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্ত
দৌড়িয়া গেল, আর একদল বৃক্ষের ভিতর

থাকিয়াই কিপ্রহস্তু প্রতীকারোহী মুসলমান-
দিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।
মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছুমাত্র
ভীত না লইয়া “আল্লাহ আকবর” শব্দে
আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা
প্রাচীরের উপর হইতে তীর নিক্ষেপ
করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহ-পরি-
পূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া আসিয়া
বৃক্ষমধ্যেই মহারাক্ষীরদিগকে আক্রমণ
করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে যুদ্ধ
আরম্ভ হইল। প্রাচীরতলের উপরিস্থ মুসল-
মানেরা বর্ষাচালনে আক্রমণকারীদিগকে
হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ
তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ
করিতে লাগিল। রাশি রাশি যুদ্ধদেহে
প্রাচীরপার্শ্ব পারিপূর্ণ হইল, বোম্বার্ড সেই
যুদ্ধদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভগ্ন বা
বর্ষাচালন করিতে লাগিল। শত মুসল-
মান বৃক্ষের ভিতর পর্যাস্ত গিয়াছিল,
শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাত্তের জ্বা
লক্ষ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল,
প্রবলপ্রতাপ আকগানেরাও যুদ্ধে অপটু
নহে, রক্তশ্রোত সেই পর্বত দিয়া বহিয়া
পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে, কোণের
ভিতর, শিলারশির পার্শ্বে, শত শত মহা-
রাক্ষীরগণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর-
সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষ-
শাখার ভিতর দিয়া সেই অব্যর্থ তীরশ্রেণী
মুসলমান-সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর
হইতে “শিবজীকি জয়” এইরূপ বজ্রনাদ
উখিত হইল, মুহুর্তের জন্ত সকলেই সেই
দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্ত
ভেদ করিয়া রক্তাপ্রুত বর্ষার উপর ভর

মহারাজী জীবন প্রত্যাহার

দিয়া, একজন রাজপুত্র যোদ্ধা এক লক্ষ
সহস্রকালের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন।
ভাষার পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে
কেলিয়া দিয়াছেন। পতাকাধারী প্রহরীকে
খড়্গচালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি
দণ্ডারমান হইয়া সেই অপূর্ণ বোদ্ধা বজ্রনাথে
“শিবজীকি জয়” শব্দ করিয়াছিল। সেই
বোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার।

হিন্দু ও মুসলমান এক মহর্ষের জন্ত যুদ্ধে
লক্ষ হইয়া বিস্ময়াৎকুল লাভনে তারকা-
লোকে সেই দীর্ঘযুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি করিল।
বোদ্ধার লৌহনির্ভিত শিরদ্বার তারকালোকে
চক্ চক্ করিতেছে, হস্ত ও বাহুদ্বয় রক্তে
আগ্নিত, বিশাল বক্ষের উপর দুই একটি
তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘহস্তে রক্তাশ্রুত
দীর্ঘ বর্শা, উজ্জল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে
আবৃত। পোতের সম্মুখে উর্ধ্বাশিরি জ্বার
শক্ররা এই শোকার দুই পার্শ্বে মহর্ষের জন্ত
সচকিত হইয়া সরিয়া গেল, মহর্ষের জন্ত
বোধ হইল, যেন অসং রণদেব দীর্ঘ বর্শা-হস্তে
আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ
হইয়াছেন।

ক্ষণকালমাত্র সকলে নিমন্ত্ৰ রহিল, পরে
আকগানগণ শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে
দেখিয়া, চারিদিক্ হইতে বেগে আসিতে
লাগিল, রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কক্ষ-
বেধের জ্বার আসিয়া বেটন করিল। রঘু-
নাথ খড়্গ ও বর্শা-চালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু
শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের
জীবন-সংশয়।

তখন মাউলীগণ রঘুনাথের বিক্রম
দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সেই প্রাচীরের
দিকে ধাবমান হইল, ব্যাঘ্রের জ্বার লক্ষ দিয়া
প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে
করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দশ, পঞ্চাশ,

দুই তিন শত শত্রুই আসিয়া এক হইল, হিন্দু
পতাকাধারে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন-ভিন্ন
করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মর্জানাদে দুর্গ
পরিপূরিত করিল। সহস্র মহারাষ্ট্রের
সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা
সম্ভব নহে, তাহার মহারাষ্ট্রের গতিবোধ
করিতে পারিল না।

তখন শিবজী ও তরলী প্রাচীর হইতে
লক্ষ দিয়া দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান
হইতেছেন; সৈন্তগণ যুগ্ম, আর এ স্থানে
যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পতাকা
পতাকা দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইল।

শিবজী বিচ্যুতগতিতে কিল্লাদারের
প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সে প্রাসাদ অতি-
শয় কঠিন ও সুরক্ষিত। শিবজীর আদেশ
অনুসারে মহারাষ্ট্রেরা সেই প্রাসাদ বেটন
করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত
করিল। শিবজী তখন বজ্রনাথে কিল্লাদারকে
বলিলেন, “হার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ
নাহ করিব।” নির্ভীক পাঠান উত্তর করি-
লেন, “অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাকেরের
সম্মুখে হার খুলিব না।”

তৎক্ষণাৎ মহারাজীরা মশাল আনিয়া
হারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল।
উপর হইতে কিল্লাদার ও তাহার সঙ্গিগণ
তীরনির্ভেদে হার প্রাসাদে অগ্নিদান-নিবারণ
করিবার চেষ্টা পাইলেন। অনেক মহারাষ্ট্রীয়
মশাল-হস্তে ভূতলশরী হইল, কিন্তু অগ্নি
জলিল।

প্রথমে হার, গবাক, পরে কড়িকাঠ, পরে
সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জলিয়া
উঠিল। সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণভাবে
আকাশের দিকে উখিত হইল ও রাজনীর
অন্ধকারকে আলোকময় করিল। বহুদূর

পৰ্যন্ত পৰ্কতে ও উপত্যকা হইতে সেই আলোক দৃষ্ট হইল, সেই দাতের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল, শিবজীর হৃদয়মণী ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুৰ্গ অর করিয়াছে।

বীরের বাহা বাধ্য, পাঠান-কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বীরের স্তায় মরিতে বাকী ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎ খাঁ ও সদিগণ লক্ষ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। এক একজন এক এক মহাবীরের স্তায় খড়্গচালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গচালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেঠেন করিল, তাহারা শত্রুর মধ্যে একে একে হত হইতে লাগিল। একজন, দুইজন, দশজন হত হইল। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্লীণ, কিন্তু তখনও সিংহবীর্যের সজ্জিত যুদ্ধ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে চারিদিকে বেঠেন করিয়াছেন, চারিদিকে খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এক্ষণ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ শ্রুত হইল, “কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণ-সংহার করিও না।” ক্লীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে শিবজীর সেনাগণ খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্তবন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্বাপন করিতেছে, এমন সময়ে শিবজী দেখিলেন, দুৰ্গের অপর দিকে কক্ষবর্ষ মেঘের স্তায় প্রায় পাঁচশত আফগান-সৈন্য সম্ভ্রুত হইয়া পৰ্কতে উঠিতেছে। শিবজী দুৰ্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূৰ্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিচ্ছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুৰ্গের অধিকাংশ

সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল। হিত্র যদা রাষ্ট্রীয়গণ ক্রমেক বৃদ্ধির অন্তরাল হইতে যুদ্ধ কবির্য ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পৰ্কতের সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপরদিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুৰ্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পৰ্কত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম ভাঙিতে পারিয়া পুনরায় দুৰ্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃত-সম্মত হইল। শিবজী অল্পসংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুৰ্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন, পাঁচশত যোদ্ধা ক্রতবেগে সেই পৰ্কতদুৰ্গ আরোহণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

সুতীক্ষ্ণ-নয়নে দেখিলেন, চতুর্দিকে যথো কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্বাপেক্ষা উন্নত স্থান। চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। প্রাসাদের দ্বার গবাক্স জলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর স্তুপাকার হইয়াছে। তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিকসংখ্যক সৈন্যের বিক্রেমে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর হইতে পারে না।

মুহূর্তমধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন। তন্নজীও দুইশত সেনাকে সেই প্রাসাদে সন্নিবেশিত করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার ও গবাক্সের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, জাদের উপর বর্ষাধারী বোম্ব গণকে সন্নিবেশিত করিলেন। কোথাও

প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, যুদ্ধওমাধো সমস্ত প্রস্তর । তখন হস্ত করিয়া তরঙ্গীকে কহিলেন, “তরঙ্গী, শত্রুরা যদি এই প্রাসাদ আক্রমণ করে, তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে । কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্বেই বোধ হয়, পরাস্ত করা বাইতে পারে, তাহার। এখনও পর্বত আরোহণ করিতেছে, এই সময়ে আক্রমণ করা উচিত । তরঙ্গী, দুই শত সৈন্ত সহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্ভোগ করিয়া দেখি ।”

তরঙ্গী । তরঙ্গী এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাজীরও এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না । ক্ষত্রিয়রাজ ! আপনি এই প্রাসাদ রক্ষা করুন, সমস্ত সুশৃঙ্খলা করুন, আগন্তুক শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিতে আপনার ভৃত্যেরা কি সক্ষম নহে ?

শিবজী দ্রব্য হস্ত করিয়া বলিলেন, “তরঙ্গী ! তোমার কথাই ঠিক ! আমি সমুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধ-লুপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পরামর্শই উৎকৃষ্ট, এই স্থানেই আমার থাকা কর্তব্য । আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে দুই শত নাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানদিগকে অঙ্ককারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে ?”

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল । রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, বিশেষে যুক্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন, “হাবিলদার ! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহতে তুমি অশ্রুবর্ষা ধারণ কর, অত

তোমার বিক্রম দেখিরা পরিতুষ্ট হইয়াছি । রঘুনাথ তুমি অস্ত্র দুর্গ বিজয় আরম্ভ করি-
রাহ, তুমিই শেষ কর ।”

রঘুনাথ বিশেষে তুমি পর্বাঙ্গ শির নামা-
ইরা দুই শত সেনার সহিত বিদ্রোহগতিতে
নরনের বহির্গত হইলেন । শিবজী তরঙ্গীর
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ঐ হাবিলদার
রাজপুতজাতীয়, উহার বৃথমূল ও আচরণ
দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া
বোধ হয় । কিন্তু হাবিলদার কখনও বংশের
বিষয় একটি কথাও বলে না, আপন অসা-
ধারণ সাহস-সম্বন্ধে একটি গর্ভিত বাঁকাও
উচ্চারণ করে না । একদিন পুনরায় রঘুনাথ
আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর রঘুনাথই
দুর্গবিজয়ের অগ্রসর হইয়াছিল । আমি এ
পর্বাঙ্গ কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্যা
রাজসভার রাজা জরসিংহের সম্মুখে
রাজপুত হাবিলদারকে উচিত পুরস্কার
দিব ।”

রঘুনাথজী যে কার্যের ভার লইলেন,
তাঁহা সম্পন্ন করিলেন । আফগানগণ এখনও
পর্বত আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে
প্রাচীরের উপর হইতে মহারাজীয়গণ বর্শা
নিষ্ক্ষেপ করিল, পরে “হর হর মহাবেণ্ড”
ভাষণদে বৃদ্ধের উপক্রম করিল । সে যুদ্ধ
হইল না । প্রাচীরের উপর যশালের
আলোকে অসংখ্যক শত্রু দেখিয়া আফগান-
গণ দুর্গ উদ্ধার করা হুঃসাধ্য জানিয়া পুনরায়
পর্বত অবতরণ করিয়া পলাইল । মাউলী-
গণ পশ্চাদ্ধাবন করিল, উন্নত মাউলীদিগের
অবারিত ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে আফগানগণ
নিপতিত হইতে লাগিল ।

রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ
দিলেন, “পশ্চাতকরে বাইতে দাও, হত্যা
করিও না, শিবজীর আদেশ পালন কর ।”

হুই শেষ হইল, আকস্মিকপৰ্ণ পৰ্ণিত অবতরণ
করিয়া পলাইক।

তখন রঘুনাথ দুর্গের প্রাচীরের হানে
হানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন, গোলা,
বাক্স ও অস্ত্রসমূহের দ্বারা আপন প্রহরী
সম্মিলিত করিলেন, দুর্গের সমস্ত দর,
সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ
দিয়া শিবজীকে নিকট বাইরা শির নামাইয়া
সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

বখন উবার রক্তমাছটা পূর্বদিকে দৃষ্ট
হইল, প্রাতঃকালের স্নানস্থলীতে বায়ু বহিতে
লাগিল, তখন সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ।
যেন এই স্নানর শব্দ পাদপদ্মিত পূর্বত-
শেখর যোগী-ঋষির আশ্রম, যেন বুকের পৈশা-
চিক রব কখনও এ স্থানে স্রুত হয় নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞাতার পুরস্কার।

হিন্ন ডুবায়ের ন্যায়, বাল্য-বাল্য হুই বায়,
ভাষনক জীবনের স্বা-বায়-এবারে।
পাণ্ডে থাকে দুঃগত, জীর্ণ অভিল্যাব বত,
হিন্ন পতাকার মত ভয় দুর্গপ্রাকারে ॥

কেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অপরাহ্নে সেই দুর্গোপরি অ-
রুপ সভা সম্মিলিত হইল। রৌপ্য-বিনির্মিত
চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চক্রাতপ,
নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর
রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন
করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ
বন্দুক লইয়া জেগীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহি-
রাছে, সেই বন্দুকের কীরচ হইতে রক্তবর্ণের
পতাকা অপরাহ্নের বায়ুচলোলে নৃত্য করি-
তেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লী-

ধরের, জয়সিংহের ও শিবজীর জয়নাথ
করিতেছে।

জয়সিংহ সহানুভবদনে শিবজীকে বলি-
লেন, “আপনি দিল্লীধরের পক্ষাবলম্বন
করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্তরূপ
হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীধর কখনই
বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার
ফল হইয়াছে।”

শিবজী। যেখানে জয়সিংহ, সেইখানেই
জয়।

জয়সিংহ। বোধ করি, আমরা দ্বীপেই
বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি
এক রাজ্যের মধ্যে এই দুর্গ অধিকার
করিবেন, তাহা আমি কখনই আশা করি
নাই।

শিবজী। মহারাজ! দুর্গ-বিজয়
বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি
যে রূপ অনায়াসে দুর্গ লইব বিবেচনা করিয়া-
ছিলাম, সে রূপ পারি নাই।

জয়সিংহ। কেন?

শিবজী। মুসলমানদিগকে সুলভ পাইব
বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম, সকলে
জাগ্রত ও সসজ্জ। পূর্বে কখন দুর্গ জয়
করিতে আমার এত সৈন্য হত হয় নাই।

জয়সিংহ। বোধ করি, একদা বুকের
সময় বলিয়া রজনীতে সর্বদাই শত্রুরা সসজ্জ
থাকে।

শিবজী। সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয়
করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে একরূপ প্রস্তুত
দেখি নাই।

জয়সিংহ। শিক্ষা পাইয়া ক্রমেই সতর্ক
হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক আর নাই
থাকুক, রাজা শিবজীর গতিবোধ করা
অসম্ভব, শিবজীর জয় অনিবার্য।

শিবজী। মহারাজের প্রসাদে দুর্গজয়

হইরাছে বটে, কিন্তু কলা রক্ষণীর কতি
জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণ-
কারীর মধ্যে ছই তিনি শত জনকে আমি
আর এই জীবনে দেখিব না, সেজন্য দুঃখপ্রতিভা
বিবস্ত্র সেনা বোধ হয় আর পাইব না।

শিবজী কণেক শোকাবুল হইয়া রহি-
লেন, পরে বন্ধিগণকে আনিবনের আদেশ
করিলেন।

রহমৎ খাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই
দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের
পর কেবল ছই এক শত বন্দীরূপে আছে,
অল্প সময় হত বা পলায়ন করিয়াছে।
বন্দীদিগের হস্তবর পক্ষাদিকে বন্ধ, তাহার
সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন, “সকলের
হস্ত খুলিয়া দাও। আক্রমণ সেনাগণ।
তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের
আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইরাছি। তোমরা
স্বাধীন। ইচ্ছা হয়, দিল্লীখরের কার্যে নিযুক্ত
হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুল-
তানের নিকট চলিয়া যাও, আমার আদেশে
কেহ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।”

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই
বিস্মিত হইল না। সকল যুদ্ধে সকল দুর্গ-
বিজয়ের পর তিনি বিধি তদিগের প্রতি
যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন,
ঊহার বন্ধুগণ কখন কখন ঊহাকে এজন্য
দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন
না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া
আক্রমণগণ অনেকেই দিল্লীখরের বেতন-
ভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাহার রহমৎ খাঁকে
আনিবার আদেশ দিলেন। ঊহারও
হস্তবর পক্ষাদিকে বন্ধ, ঊহার ললাটে
খড়্গের আঘাত, বাহুতে ভীর বিদ্ধ হইয়া

বদ্ধ হইরাছে। বীর সর্বপে সন্তানসম্মুখে
দণ্ডায়মান হইলেন, সর্বপে শিবজীর দিকে
চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া
স্বয়ং আসন-তাগ করিয়া খড়্গের ধারা
হস্তের রক্ত কাটিয়া ফেলিলেন, পরে বীরে
বীরে বলিলেন, “বীরবধ! যুদ্ধের নিয়মা-
নুসারে আপনার হস্ত বদ্ধ হইরাছিল,
আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন,
আমার দোষ স্বীকার করুন। আপনি
একপে স্বাধীন। জয়-পরাজয় ভাগ্যক্রমে
ঘটে, কিন্তু আপনার ক্তার ঘোড়ার সহিত
যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইরাছি।”

রহমৎ খাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা
করিতেছিলেন, তাহাতেও ঊহার স্থির
পার্বিত্য নয়নের একটি পত্রও কম্পিত হয়
নাই, কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভক্ততা
দেখিয়া ঊহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধ-
সময়ের শত্রুসম্মুখে কেহ কখনও রহমৎ খাঁর
কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অল্প যুদ্ধের ছই
উজ্জল চক্ষু হইতে ছই বিন্দু অশ্রু পতিত
হইল। রহমৎ খাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন
করিলেন, বীরে বীরে বলিলেন, “কন্ডিরাজ!
কলা নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত
হইরাছিলাম, অল্প আপনার ভ্রাতাচরণে তদ-
ধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসল-
মানদিগের অধীশ্বর, যিনি বাদশাহের উপর
বাদশাহ, জমীন ও আশমানের সুলতান,
তিনি এই জন আপনাকে নূতন রাজ্যবিস্তা-
রের ক্ষমতা দিয়াছেন।”

জয়সিংহ। পাঠান-সেনাপতি, আপ-
নারও উচ্চপদের বোম্বাস্তা আপনি গ্রহণ
করিয়াছেন। দিল্লীখর আপনার ক্তার সেনা
পাইলে আরও পরবৃদ্ধি করিবেন সম্ভে
নাই। দিল্লীখরকে কি নিষিদ্ধে পারি যে,

আপনার ভায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্তের একজন প্রধান কৰ্মচারী হইতে সম্মত হইরাছেন ?

রহস্যং ধী। মহারাজ ! আপনার প্রভাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাতার কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না। বত দিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্ত ধরিতে।

শিবজী। তাহাই হউক। আপনি অস্ত্র রাত্রি বিজায় করুন, কল্যা প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবে।

রহস্যং ধী। ক্ষত্রিয়প্রবর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না; আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অমুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্যা দুর্গাক্রমণের গোপনামুসন্ধান আমি পূর্বেই প্রাপ্ত হইরাছিলাম, সেই জন্তই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সজ্জা ও প্রস্তুত ছিল। অমুসন্ধানবাতা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বিলিতে পারি না, সত্যলজ্জন করিব না।

এই বলিয়া রহস্যং ধী ধীরে ধীরে প্রহরীগণের সহিত প্রাসাদভিমুখে চলিয়া গেলেন। রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একেবারে ক্রুদ্ধবর্ণ ধারণ করিল, মন হইতে অগ্নিকলিক বাতির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ বুঝলেন, এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বুঝা, তাঁহার সৈন্তগণ বুঝিল, অন্য প্রকার উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থার দেখিয়া, তাঁহাকে কথাকথ শান্ত করিয়া, পরে সৈন্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন জানিয়াছিলে ?”

সৈন্তগণ উত্তর দিল, “এক প্রহর রজনীতে।”

জয়সিংহ। তাহার পূর্বে কেহই এ কথা জানিতে না ?

সৈন্তগণ। রজনীতে কোন একটা দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা জানিতাম না।

জয়সিংহ। ভাল, কোন সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে ?

সৈন্তগণ। অমুহুর্তে দেড় প্রহর রজনীর সময়।

জয়সিংহ। উত্তম, এক প্রহর হইতে দেড় প্রহরমধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে ? কেহ অল্পপস্থিত ছিল না ? যদি হইয়া থাকে, প্রকাশ কর। একজনের দোষের জন্ত সহস্র জনের মানি অহুচিত। তোমরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রাজা শিবজীর অধীনে যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে, তাহাকেও আনিয়া দাও। যদি সে কল্যা রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে, তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের নাম কলুষিত হইতেছে ?

সৈন্তগণ তখন কলাকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল। পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, শিবজীর ক্রোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। সুস্থ হইয়া শিবজী বলিলেন, “মহারাজ ! অন্য যদি সেই কপট বোকাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।”

চন্দ্রাবত নামে একজন ক্ষুদ্রলোকের আগমন হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজন ! কল্যা এক প্রহর রজনীর সময় বধন আমরা

বুদ্ধব্রাহ্ম করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবিলদারকে অহুসঙ্কান করিয়া পাই নাই। বধন হুগতলে পৌছিলাম, তখন তিনি আমাদের সহিত বোগ দিলেন।”

শিবজী। সে কে, এখনও জীবিত আছে?

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ! শিবজীর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা বাইতেছে, সভাতলে একটি সূচিকা পড়িলে বোধ হয়, তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চম্ভরাও ধীরে ধীরে বলিলেন, “রঘুনাথজী হাবিলদার।”

সকলে নির্বাক, বিষমস্তব্ধ!

চম্ভরাও একজন প্রসিদ্ধ বোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চম্ভরাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈশ্বর ভ্রায় ভীষণ বলবতী প্রকৃতি আর নাই।

শিবজীর মূখমণ্ডল পুনরায় ক্লকবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্তস্থাপন করিয়া চম্ভরাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোবে বলিলেন, “রে কপটাচারিন! বুধা এ কপট অভিযোগ করিতে-ছিস! তোরা নিশ্চয় রঘুনাথের বশোরাণি লক্ষ্য করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি সচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু মিথ্যা নিন্দকের শাস্তি সৈন্তেরা দেখুক।”

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লোহবর্ণী উন্মোচন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “মহারাষ্ট্র! প্রভু চম্ভরাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার হুগতলে আমিহে বিলম্ব হইয়াছিল।”

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলে নির্বাক, বিষমস্তব্ধ!

শিবজী কখনকাল প্রভুর-প্রতিশ্রুতির ভায়

নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন, “আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি, রঘুনাথ, তুমি এই কার্য্য করিয়াছ? তুমি যে প্রাচীর-লঙ্ঘনের সময় একাকী দুর্জয়নীর ভেজে অগ্রসর হইয়াছিলে, তুমি যে দুই শত মাত্র সৈন্য লইয়া পাঁচশত আকগানকে হুগের নীচে পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলে,—তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে?”

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “প্রভু, আমি সে দোষে নির্দোষ।”

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ বোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিরুপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে এবং চারিদিকে অসংখ্য লোক রঘুনাথের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছে, রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত, তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্কীত হইতেছে। কল্যা যেরূপ অসংখ্য শক্রমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অত্যা তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট-বশ্যে বোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “তবে কি জন্ত আমার আত্মা লঙ্ঘন করিয়া এক গ্রহর রক্তনীর সময় অতুপস্থিত ছিলে?”

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্বেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নবহর পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বর বলিলেন, “কপটাচারিন! এই জন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া

ছিলে? কিন্তু কক্ষের শিবজীর নিকট
ছলনা-চেষ্টা করিয়াছিলে।”

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিতভাবে
বলিলেন, “রাক্ষ! ছলনা ও কপটচরণ
আমার বংশের রীতি নহে, বোধ হয়, প্রত্ন
চরিত্রও তাহা জানিতে পারেন।”

রঘুনাথের হিরণ্যব শিবজীর ক্রোধে
আততিশয়রূপ হইল। তিনি কৰ্কশভাবে বলি-
লেন, “পাপিষ্ঠ! পরিত্রাণ-চেষ্টা বৃথা; ক্ষুধার্ত
সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে
পার, কিন্তু শিবজীর জলন্ত ক্রোধ হইতে
পরিত্রাণ নাই।”

রঘুনাথ পূর্ববৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,
“আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা
করি না, মৃত্যুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি
না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জনা করুন।”

কিন্তু প্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া
বজ্রনাথে আদেশ করিলেন, “বিদ্রোহাচরণের
শাস্তি প্রাণদণ্ড।”

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে ভীকৃ বর্শা
দেখিলেন, তখনও সেই অবিচলিতভাবে
বলিলেন, “যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে,
বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।”

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না,
অবার্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে,
এরূপ সময়ে রাজা জরসিংহ তাঁহার হস্তধারণ
করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত
হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি
জরসিংহের প্রতিও সমুচিত সন্মান বিস্মৃত
হইয়া কৰ্কশভাবে কহিলেন, “হস্ত ত্যাগ
করুন, রাজপুত্রদিগের কি নিরয়, জানি না,
জানিতে চাহি না, মহারাত্রীদিগের সনাতন
নিরয়, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। শিবজী
সেই নিরয় শালন করিবে।”

জরসিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে
ধীরে বলিলেন, “কভিররাজ! অস্ত্র বাহা
করিবেন, কল্যা তাহা অস্ত্রথা করিতে পারি-
বেন না। এষ্ট যোদ্ধার অস্ত্র প্রাণদণ্ড করিলে
চিরকাল সেজন্য অনুতাপ করিবেন। যুদ্ধ-
ব্যবসারে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, আমার
মত গ্রহণ করুন, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নহে।
কিন্তু সে বিচার এক্ষণে আবশ্যক নাই,
আপনি আমার সুহৃদ, সুহৃদদের নিকট আমি
এই রাজপুত্র-যোদ্ধার প্রাণভিক্ষা করিতেছি,
আমাকে ভিক্ষা দান করুন।”

শিবজী জরসিংহের ভক্ততা দেখিয়া ঈষৎ
অপ্রতিভ হইলেন; কহিলেন, “তাত! আমার
পুরুষবাচ্য মৰ্জনা করুন, আপনার কথা
কখনও অবহেলা করিব না, কিন্তু শিবজী
বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে, তাহা কখনও মনে
ডাবে নাই। হাবিলদার! রাজা জরসিংহ
তোমার জীবনরক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার
সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখ
দর্শন করিতে চাহে না।”

রঘুনাথ সভাঙ্গল ত্যাগ করিবার উপক্রম
করিতেছেন, এমন সময় শিবজী পুনরায়
বলিলেন, “অপেক্ষা কর। দুই বৎসর হইলে,
তোমার ঐ কোষের অসি আমিই তোমাকে
দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির
অবমাননা হইবে না। প্রেরিগণ! অসি
কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে ছুগ হইতে
নিষ্ক্রান্ত করিয়া দাও।”

রঘুনাথের বখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া-
ছিল, রঘুনাথ সে সময় অবিচলিত ছিলেন;
কিন্তু প্রেরিগণ বখন অসি কাড়িয়া লইতে-
ছিলেন, তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইল,
নরনর আরম্ভ হইল। কিন্তু তিনি সে
উদ্বেগ সংযত করিলেন, শিবজীর দিকে
একবার চাহিয়া মুক্তিকার পদার্থ নির

নাহাইরা নিঃশব্দে হুর্ণ হইতে শ্রবণ করিলেন ।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে পাততর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পৰ্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরভিমুখে গমন করিলেন, প্রান্তর পার হইলেন, একাকী গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর একটি প্রান্তরে আসিলেন । অন্ধকার গভীরতর হইল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

—০—

চন্দ্রাও জুমলাদার ।

আমি চাইতে অস্ত যদি কেহ
অধিক পৌরব ধরে দহে বেশ দেহ ;
কদে জলে হলাহল । —

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চন্দ্রাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীৰ্য্য, অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তাঁহার বয়স্ রঘুনাথ অপেক্ষা ৫১৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে ৪০ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয় । প্রশস্ত লগাটে এই বয়সেই দুই একটি চিত্তার গভীর রেখা আঁত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটি শুষ্ক । নয়ন ক্ষুদ্র ও অতিশয় উজ্জ্বল । চন্দ্রাওকে বাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে, চন্দ্রাওয়ের তেজ ও সাহস বেকাপ দুর্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিত্তা এবং জীবন অনিবার্য্য বিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ । সমস্ত যুগ্মগুলে এই

হইটি তার বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত । বেহ খেম লৌহনির্মিত । বাঁহারা চন্দ্রাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় কোধ, গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সে অলম্ব্যাতী বিরপ্রতিজ্ঞ জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না । এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্রাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না । বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার জ্বর দিবারাত্র জলিত । অসাধারণ বুদ্ধিসকালনে তিনি আশ্চর্য্যকর পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গহস্তে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন । শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দোষী হউক, অপরাধী হউক, পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্রাও নিঃসন্দোহে পতনবৎ তাঁহাকে পদদলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন । অস্ত্র বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে পতনবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন । এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্নবৃত্তান্ত জানা আবশ্যক । সবে সবে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব ।

চন্দ্রাও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন না । রাজা বশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্রাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন । অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্রকন্ডাকে বস্ত্র করিত অথবা গজপতির সহিত যুদ্ধে যুদ্ধে বিরিত ।

যখন চন্দ্রাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, তখন গজপতি তাঁহার গভীর চিত্তা, দুর্দমনীয় তেজ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া

আনন্দিত হইলেন, নিজপুত্র রঘুনাতনের জ্ঞান চন্দ্ররাওকে ভালবাসিতেন ও এই কোমল বরসেই আপন অধীনে সৈনিককার্যে নিযুক্ত করেন।

সৈনিকের প্রত্যাশ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধ-গণও বিস্মিত হইল। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের পর রানীকৃত হইতেছে, যে স্থানে ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যে স্থানে বিজেতার হকারে ও আন্তের আর্জনাতে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে, তথায় অধেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের অন্নভাবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালককে তথায় পাইবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রাজনীতে গীত-বাণ্য করিতেছে, হাস্ত ও আমোদ করিতেছে, চন্দ্ররাও তথায় নাই। অন্নভাবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরে অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে অথবা কৃষিত-ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুত্র-শিশু নহেন। তাঁহার পদ-বুদ্ধি হইয়াছে, গজপতিসিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্যাদা-বুদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও পক্ষ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্ররাও গজপতিকে পরম বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। গজপতি যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন, “চন্দ্ররাও! অল্প তোমার সাহসেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে;

ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিৱে পারি?”

চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে রহিলেন।

গজপতি সম্মুখে বলিলেন, “মনে ভাবিয়া দেখ, যাগা ইচ্ছা হয়, প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্রমতা, পদবুদ্ধি, চন্দ্ররাও! তোমাকে কিছুই আদ্যের নাই।”

তখন চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন, “রাজপুত্র বীর কখনও অকীকার অন্তথা করেন না, জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।”

সভাস্থ সকলে নির্বাক, নিস্তব্ধ! গজপতির মাধ্যমে যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, ধোব হইতে অসি অর্ধেক নিক্ষেপিত হইল। কিন্তু সেই ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া গজপতি উচ্চহাস্ত করিয়া কহিলেন, “অকীকার-পালনে যৌকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম, রাজপুত্রত্বহিতাদিগের মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর সহিত পর্বতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অত্র লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ কর, জঙ্গল-কুটীরের পরিবর্তে দুর্গ প্রস্তুত কর, দস্যুর পরিবর্তে বোদ্ধার নাম গ্রহণ কর, তৎপরে রাজপুত্রত্বহিতার বিবাহ-কামনা জানাইও। এখন অল্প কোন যাক্সা আছে?”

চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন, “অল্প কোন যাক্সা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে, প্রভুকে জানাইব।”

সভাভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদ্যতচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরেই বিস্তৃত হইলেন, সেই দিনকার কথা বিস্তৃত হইলেন।

চন্দ্রাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেইদিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধ-
কার চন্দ্রাওয়ের স্বপ্ন ও লগাটে বিরাজ করিতেছিল।

দুই সপ্তকের পর চন্দ্রাও একটি দীপ জালিলেন, একখানি পুস্তকে সন্দেরে কি কি লিখিলেন; পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্ত মুখমণ্ডলে দেখা গেল। তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “চন্দ্র, কি লিখিতেছ?” চন্দ্রাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন, “কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি, তাহাই লিখিতেছি।”

বন্ধু চলিয়া গেল, চন্দ্রাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্রাও একটি স্বপ্নের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরং-জীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী-সন্ন্যাসিনে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতি-সিংহ হত হন, “মাধবীকঙ্কণ” নামক উপজ্ঞাসের পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গজপতির অনাধ বালক ও বালিকা মাড়ুওয়ার হইতে পুনরায় মেওয়ার প্রদেশে সূর্য্যমহল নামক ভূগর্গে ঘাইতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালক-বালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া বাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী,

রজনীবোণে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে কন্যাপতি কপূরক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্রাও।

ভীষ্মযুদ্ধ চন্দ্রাওয়ের মনোরথ কঙ্কণ পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে কিছু অর্থ আনিরাহিলেন, বিত্তীয় জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্র-দেশে একজন সমাদৃত সম্রাট হোক হইলেন। চন্দ্রাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুত্রবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিদ্বান করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত্র গজপতি-সিংহের একমাত্র ছহিৎকে বিবাহ করিয়া-ছেন, সকলে দেখিতে পাইল। তাঁহার সাহস ও বক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ ও জায়গীর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাদর করিলেন। দিনে দিনে চন্দ্রাওয়ের বশ বুদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন সময় কুক্ষণে বালক রঘুনাথ তাঁহার উন্নতির পথে আসিয়া পড়িল। জুমলাদার অচিরে পথ পার্শ্বকার করিয়া লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মাবাই।

দামী বনিতার পতি, দামী বনিতার পতি,
দামী বনিতার বে বিবাহ।
দামী বনিতার ধন, দামী বনিতা অকলন,
কেহ নহে সুখ-মোকদ্দাত।
বুদ্ধমহান চক্রবর্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যু-বেশী চন্দ্রাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাঁজহান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। একদিন রজনীবোণে তিনি পলায়ন করেন, পর্ততকল্পের, বনমধ্যে, প্রান্তরে বা গৃহস্থের

বাটীতে কয়েক দিন-লুপ্তারিত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই কৃত্তিক। মিতে পরাশ্রয় হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসারবন্ধন অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল। নানা দেশে পৰ্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করিল। পূৰ্ব-গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা বালকের মনে সৰ্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দ্বন্দ্ব কাহাকেও বলিত না। কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পৰ্ব্বতশৃঙ্গো-পরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকাৰ্য্যে বাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে বেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরশ্রাণ মন্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে কুলাইত, সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চারণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশ পথিকেরা পৰ্ব্বতগুহার সংগ্রাম-সিংহ বা প্রতাপের স্তীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স, তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজধানের দ্বায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট বাইরা একটি সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অবিভীত, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটি হাবিলদারী-পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাহার কয়েক দিবস পরেই ভোরণদুর্গে পাঠা লেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদিগে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পুত্র নাম রঘুনাথ সিংহ; কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে হাবিলদারী কার্য্য পাওয়া অবধি সকলে তাঁহাকে রঘুনাথজী হাবিলদার বলিয়া ডাকিত।

রঘুনাথ হাবিলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্রাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবিলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ চন্দ্রাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বালা-সুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, তাঁহাকে দস্তা বা গিনি পতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি মানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বাইলেন। চন্দ্রাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাবী জুমলাদারের ললাট অচা পুনরায় কৃক্কিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্রাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। চন্দ্রাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মহাণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অন্ত রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটচাঙ্গারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্রাও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী বাইলেন। পাঠক! চল, আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সন্ডরে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলে, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, অসংখ্য দাস-দাসী

সম্মুখে আসিল, অনেক প্রতিবেশী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররাজের আগমনবার্তা সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হইয়া। জুমলাদারের বাটীর অন্তঃপুরে ধুমধার পড়িয়া গেল, সেই ধুমধামের মধ্যে শান্তনয়না ক্ষীণাক্ষী লক্ষ্মীবাই নীরবে স্বামীর অভ্যর্থনায় আগ্রহ-জন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই বথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, পতিভ্রতা; বালাকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল-বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাবী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃদ্ধ হইতে উৎপাটিত কোমল-পুষ্পের জায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে-ছুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পূর্বকথা শ্রবণ করিত, পিতার কথা শ্রবণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা শ্রবণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোক পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের জ্ঞান ও মন সহিষ্ণু হয়। বালিকা ছুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবার রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি লজ্জন ও সদর হন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দয় ও বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? কিন্তু যদিও চন্দ্ররাজের জন্মে অভিমান, জিহাংসা ও উচ্চাভিলাষ বিরাজ করিত, তথাপি তিনি অসহায় নারীর প্রতি নির্দয় ছিলেন না। নন্দমূখী নরসুন্দরী লক্ষ্মীবাইয়ের পরিচর্য্যায় চন্দ্ররাজ তুষ্ট হইতেন; যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে পতিপরায়ণ

লক্ষ্মীবাইয়ের নিকটে আসিয়া শান্তিলাভ করিতেন; লক্ষ্মীবাইয়ের শিথ কথাতলি শুনিয়া তাঁহাকে সাদরে জুদয়ে ধারণ করিতেন। লক্ষ্মীবাই তখন জগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন, স্বামীর সামান্য বস্তুে তিনি পুলকিত হইতেন, স্বামীর একটি মিষ্টকথার তাঁহার হৃদয় প্রাবল্য হইত। যে পুষ্পচারাটিকে উদ্ভাটন হইতে আনিয়া গৃহমধ্যে অন্ধকারে রাখা যায়, সে চারাটি গৃহমধ্যস্থ একটি আলোকরেখার নিকটে রত পুষ্পকের সহিত ধায়।

এইরূপে সংসার-কার্য্য ও পতিসেবার এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অভি-বাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! লক্ষ্মী শূর্যের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বালাকালের স্মৃতি, বালাকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে ছুই এক বিন্দু অশ্রু সেই স্নানর রক্তশূন্য গওস্থল দিয়া গড়াইয়া বাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

অল্প চন্দ্ররাজ আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাক্ষর করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম একশে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। জ্রুবগল কি স্নানর ও সূচিকণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলি দ্বারা অঙ্কিত। শান্ত, কোমল কৃষ্ণ-অনন্য চুটিতে যেন চিন্তা আপ-নার আবাসস্থান করিয়াছে। গওস্থল স্নানর সূচিকণ, কিন্তু ঈষৎ পাতুবর্ণ, সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপকল্প

সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু বৌবনের
প্রকৃতি, উন্নততা কৈ? আহা! রাজস্থানের
এই অপূর্ণ পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সৌন্দর্য্য ও
সুশাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে
ঐবৎ শুষ্ক। লক্ষ্মীবাইয়ের চাক নয়ন,
স্বর্ষী কেশভার, কোমল বাহুদ্বয় ও কোমল
বেলতার মুক্তার লাবণ্য আছে, কিন্তু
হীরকের উজ্জ্বল কিরণ নাই।

একদিন চন্দ্রাণ্ড লক্ষ্মীকে জানাইয়া-
ছিলেন যে, তোমার ভ্রাতা আমার অধীনে
হাবিলদার হইয়াছে ও বশোলাভ করিয়াছে।
কথাটি সত্য হইলে চন্দ্রাণ্ডের ললাট
যেখাঙ্গ হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীর
মনে সন্দেহ হইয়াছিল।

আর একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্ট-
বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর
পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন, “দাসীর
একটি নিবেদন আছে, কিন্তু বলিতে ভয় করে।”

চন্দ্রাণ্ড শ্রবণ করিয়া তাখুল চৰ্কণ
করিতেছিলেন, নম্রমুখকে সম্মুখে চুপন
করিয়া বলিলেন, “কি বল না। তোমার
নিকট আমার আদেশ কি আছে?”

লক্ষ্মী বলিলেন, “আমার ভ্রাতা বালক,
অজ্ঞান।”

চন্দ্রাণ্ডের মুখ গভীর হইল।

লক্ষ্মী। সে আপনার ভৃত্য, আপনারই
অধীন।

চন্দ্রাণ্ড। না, সে আমা অপেক্ষাও
মাহসী বলিয়া পরিচিত।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বাক্যে পারিলেন, তিনি
বাহ্য ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।
চন্দ্রাণ্ড রঘুনাথের উপর গৎপেরোনাতি
কৃত। ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন,
“বালক যদিও দোষ করে, আপনি না মার্জন
করিলে কে করিবে?”

চন্দ্রাণ্ডের ললাটে আবার সেই
মেঘচ্ছায়া দেখা গেল। লক্ষ্মী স্বামীকে
জানিতেন, সে কথা আর উল্লেখ করিলেন
না।

তাহার পর চন্দ্রাণ্ড অল্প প্রথমে বাটী
আসিয়াছেন। রঘুনাথের বাহা খট্টিয়াছে,
লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাহার হৃদয়
চিন্তাভুল। তিনি মুখ ফুটিয়া কোন কথা
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী
নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার
সংবাদ লইবেন, মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাণ্ডের আহার সমাপ্ত হইল, তিনি
শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাখুল হস্তে
তথায় যাইলেন,—দেখিলেন, স্বামীর ললাট
চিন্তাযুক্ত। লক্ষ্মী তাখুল দিয়া ধীরে ধীরে
ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্রাণ্ড সতর্ক-
ভাবে দ্বার রুদ্ধ করিলেন?

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে
চন্দ্রাণ্ড একটি বাজ্ঞ বাহির করিলেন, সেটি
খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন,
দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর
পূর্বে গজপতি কর্তৃক যে দিন সভার জ-
মানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে
একটি ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই
পাতা খুলিলেন, স্মরণ স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ
দেদীপ্যমান রহিয়াছে;—

“মহাজন.....গজপতি,

ঋণ.....অবমাননা;

পরিশোধ.....তাহার শোণিতে,

তাহার বংশের অবমাননায়।”

একবার, দুইবার এই অক্ষরগুলি পড়ি-
লেন, ঐবৎ হস্ত সেই বিকট মুখমণ্ডলে
দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিত, “অন্ত
পরিশোধ হইল।” তারিখ দিয়া পুস্তক বদ্ধ
করিলেন।

মহারাত্রী জীবন প্রভাত ।

হার উদ্ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তিভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন। স্ত্রীরাও লক্ষ্মীর হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “অনেক দিনের একটি ঋণ অস্ত পরিশোধ করিয়াছি।”

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ঈশানী-মন্দিরে ।

হেরিলা অধূরে

রোবর, কুলে ভাঃ চতীর দেউল ।

মধুসূদন দত্ত ।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্রাওরের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতি-উচ্চ একটি পর্বতশৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটি পর্বত-তরঙ্গিণী কুল-কুল শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ-প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরা-কাল হইতে অসংখ্য বাত্রী ও উপাসক এই পুণ্যজলে স্নাত হইয়া সোপানারোহণ পূর্বক ঈশানীর পূজা দিত, অন্য পর্যন্তও মন্দিরের গৌরব বা ব্যক্তিগত্যা হাস প্রাপ্ত হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে পর্বতের পূর্বদেশে বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমস্ত ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিব্যভাগেও সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুমিষ্ট ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য-

ময় মন্দির দ্বার দেখিলেই কো-
তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাব,
উদ্বেগ হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুণ্য-
কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই
পুরাতন পাদপবন শ্রবণ করে নাই। বহু
বৃদ্ধ ও আহবে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও
বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসল-
মান কেহই এই ক্ষুদ্র প্রদেশ পর্বতমন্দির
বিগ্রহের রবে কলুষিত করে নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক
একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ
করিতেছিলেন। পথিকের ক্ষুদ্র উদ্বেগ-
পরিপূর্ণ, প্রশস্ত ললাট কৃষ্ণিত, মুখমণ্ডল
ব্রহ্মবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অশ্রুত্যাধিক
জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রোষে, জিহ্বা-
যায়, বিধাদে অন্য রঘুনাথের ক্ষুদ্র একেবারে
দগ্ধ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন,
শরীর একেবারে অবসর হইয়াছে, তথাপি
ক্ষুদ্রের উদ্বেগ নিবারণ হয় না। রঘুনাথ
উন্মত্তপ্রায়। এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম
না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত
বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক!
এই বিষম সংসারে শেলসম যে ছুঃখ ক্ষুদ্র
বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ
ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ
নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ
করিয়া তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই
কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র
হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা
করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না!

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি
ব্রাহ্মণ পুরাণপাঠ করিতেছিলেন। আহা!
সেই সমীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিমীথে
শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-

বিভূষিত নৈশ-দরশন-রঙলে ধীরে ধীরে উদ্ভিত হইতেছিল। সেই পুণ্যকথা শাস্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাশপক্ষেও যেন সচেতন করিতে লাগিল। শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতুহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিতান করিতে লাগিল, মানব-হৃদয় শান্তিরসে বিগলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। স্কন্দর বন্ধদেশে, তুবারপূর্ণ পর্বতবেষ্টিত কান্দোরে, বীরপ্রস্থ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র-ভূমিতে, সাগর-প্রাঙ্কলিত কর্ণাট ও ড্রাবিড়ে কত সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখনই বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, হস্তিনা, অযোধ্যা, মিথিলা, কান্দী, মগধ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ বীরবে ও যশে প্রাবিত করিয়াছিল। হুর্দ্দিনে এই গীত গাইয়া সমর-সিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ বর্ষরক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল এই পূর্বগীত মাত্র। যেন বিপদে, বিবাদে, দুর্বলতার আমরা পূর্বকথা বিস্মৃত না হই, যত দিন জাতীয় জীবন থাকে, যেন হৃদয়-বন্দ্য এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য পাঠক! ভূমি ইলিয়ড ও ইনিয়ড পাঠ করিয়াছ, দাস্তে ও সেক্সপীয়র, গেটে ও ইউগো পাঠ করিয়াছ, সানী ও ফরডুনী পাঠ করিয়াছ; কিন্তু হৃদয় অধোবণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন কথাগুলি সঙ্গমভাবপূর্ণ বোধ

হয়? হৃদয় কোন কথার অধিকতর আলো-
কিত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্যের অপূর্ণ বীরত্বকথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ণ পাতিব্রত-কথা, হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দু-জাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করি। যদি সেই কথা স্মরণ করাই। সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সকল হইতেছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে না।

শাস্তকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সম্রাট রঘুনাথের উত্তম ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শাস্তি সেচন করিতে লাগিল। হস্তভাগার উন্নততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎকথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিজা রঘুনাথকে অন্ধে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শাস্ত অবসর শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের সে মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন? দুর্গজয় করিতেছেন? যোদ্ধার কার্য করিতেছেন?

দুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও লুপ্ত হইয়াছে ।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশা-প্রদীপ নির্ঝাঁপ হইয়াছে এই লক্ষ্যকার রক্তনীরে প্রান্ত বন্ধুহীন সুবকের হেমিনের কথা পূর্বজীবনের স্মৃতির ভ্রার জাগরিত হইয়াছে । শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা ও সুখ আশাদের নিকট বিদায় লইলে বন্ধুহীন জনের যে কথা শ্রবণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত লম্বাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর সূর্য্য-মহলে ক্রীড়া করিতেন, হস্ত-ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিক্রিয়া করিতেন, সেই কথা শ্রবণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শাশু, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল । আহা ! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন ? আজি সে সোনার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল সুখের জগৎ কোথায়, সে হৃদয়ের সহোদরা কোথায় ? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিত গড়াইয়া পড়িল ।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন । কি দেখিলেন ? বোধ হইল যেন, লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশে আপন অঙ্গে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতলহস্ত ভ্রাতার উচ্চ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরা স্নেহপূর্ণ-নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন । আহা ! বোধ হইল যেন, শোকে বা চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি দীর্ঘ শুক হইয়াছে, নয়ন দুইটি

সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, মিষ্ট, কিন্তু চিন্তার আবাসস্থান ।

নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন,— “ভগবান, অনেক সখ করিয়াছি, কেন যুগা আশার হৃদয় বাধিত করিতেছ ? আমি যেন উন্নত না হই ।”

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল । রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন । এ স্বপ্ন নহে, তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্গে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন ।

রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল ; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার বাক্যস্মৃতি হইল না, নয়ন হইতে দ্রববিগলিত ধারা বহিতে লাগিল । অবশেষে আর সখ করিতে না পারিয়া সেই তরুণ যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, “লক্ষ্মি ! লক্ষ্মি ! তুমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম ? অজ্ঞ সুখ দূর হউক, অজ্ঞ আশা দূর হউক, লক্ষ্মি ! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না ।”

লক্ষ্মীও শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার ঞ্চণ ভরিয়া কাদিলেন । আহা ! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রহ্ন আছে, স্বর্ণে কি সুখ আছে, বাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে ?

পরম্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরম্পরে অনেকক্ষণ বাকশূন্ত হইয়া রহিলেন । বহুদিনের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে উথলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দ্রববিগলিত ধারার উভয়ের

হৃদয় ভাগিনা বাইতে লাগিল। ভগিনীর জ্ঞান
এ জগতে আর স্নেহময়ী কে আছে ? ভ্রাতৃ-
স্নেহের জ্ঞান আর পবিত্র স্নেহ কি আছে ?
আমরা সে ভ্রাতৃবান্ধব বর্নন করিতে অন্ত-
র্গত, কখন কর।

অনেককণ পরে দুই জনের হৃদয় নীতল
হইল। তখন লক্ষী আপন অঞ্চল দিয়া
ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন,
“ভ্রাতার ইচ্ছার কত অসুস্থত্বানের পর
আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম। আহা।
আমার কি পরম সুখ, ভগিনীর কপালে কি
এত সুখ ছিল ? ভাই, এ নীতল বাতাসে
আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল,
মন্দিরের ভিতর বাই, আমি আর অধিককণ
থাকিতে পারিব না।”

ভ্রাতা-ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসি-
লেন, লক্ষী একটি শুস্তের পাখে উপবেশন
করিলেন, ভ্রাতৃ রঘুনাথ পূর্ববৎ লক্ষীর অঙ্গে
মন্তকস্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, বৃদ্ধের
উত্তরে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্বকথা
কহিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত
বুলাইয়া লক্ষী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিলেন। রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে
লাগিলেন। দম্ভ-হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া
অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ
করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থার ছিলেন,
তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাজার
কৃপাক্রিয়ের সহিত চাব করিতেন, কখন
গো-বৎস বা মেঘপাল রক্ষা করিতেন, যেসব
সঙ্গে সাক্ষর পরিত্যক্ত, উপত্যকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর
ভ্রমণ করিতেন বা নির্জনে বসিয়া চারু-
দিগের গীত গাইতেন। কখন সাগরকালে
নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই
গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন

প্রত্যবে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পূর্বকথা
স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে-রোদন করিয়াছেন।
শরতসমুদয় কল্লণ-প্রদেশে কয়েক বৎসর
অবস্থিতি করিয়াছেন, অবশেষে একজন
মহারাজার সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়া-
ছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে বাইতেন। বরোবৃদ্ধির সহিত রঘু-
নাথের যুদ্ধব্যবসারে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়া-
ছিল, অবশেষে মহাত্মব শিবজীর নিকট
উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনিকের পদ
গ্রহণ করেন। আজি তিনি বৎসর হইল,
সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন,
তিনি কার্য্যে ক্রটি করেন নাই, কিন্তু প্রভু
শিবজীর অথবা সন্দেহে অপমানিত হইয়া
বেশে বেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতে-
ছেন। এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য নাই,
পিতার জ্ঞান যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া অসার
জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে
স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অব্যবহিত অশ্রু-
বর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি নিজের শোক
সহ করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একে-
বারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ
হইল, কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া আপ-
নার কি পরিচয় দিবেন, তাহা চিন্তা করিতে
লাগিলেন। চন্দ্রাণ্ডয়ের নাম করিলেন না,
ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন,
“মহারাজ্যদেশে আসিবার অনতিকাল পরেই
একজন সম্রাট মহারাজ্য জয়গীরদার
তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম
করে না, কি গগনের শশধরের নামই তাঁহার
স্বামীর নাম, গগনের শশধরের জ্ঞান তাঁহার
কমতা ও গৌরবজ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ
হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষী
সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অত্যাচার

করেন, সে অল্পগ্রহে দাসী সুখে
আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন
বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাইকে সুখে
থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক
হয়। রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে
পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য
কত দিন চেষ্টা করিতেছেন। অল্প সেই কাম-
নার মন্দিরে পূজা দিতে আদিরাছিলেন,
সহস্রা মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভাইকে
পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার
হৃদয়ের শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে বস
করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের
কথা জানিতেন; লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সাহুনা
করিতে জানিতেন। সংক্ষুব্ধ হইয়া নিজ
দুঃখ সজ্জ করা, সাহুনা দিয়া পরের দুঃখ দূর
করা, এই নারীর ধর্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাণী দিয়া লক্ষ্মী
ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন; বলি-
লেন, “আমাদিগের জীবনই এইরূপ,
সকল দিন সমান থাকে না! ভগবান
যে সুখ দেন, তাহা আমরা ভোগ করি, যদি
একদিন দুঃখ পাই, তাহা কি সজ্জ করিতে
বিমুখ হইব? মানবজন্মই দুঃখময়, যদি
আমরা দুঃখ সজ্জ না করিব, তবে কে
করিবে? সুদিন দুর্দিন সকলেরই আছে,
দুর্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম
করিয়া নিজ শোক বিমুক্ত হই। তিনিই
একদিন পিত্রাঙ্গরে আমাদের সুখ দিয়া-
ছিলেন, তিনিই অল্প কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই
পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন। ভাই! এ
শৈশব দূর কর, এরূপ অবস্থায় থাকিলে
শরীর কত দিন থাকিবে? আহা-নিদ্রা
ভাগ করিলে মনুষ্য জীবন কত দিন থাকে?”
রঘুনাথ! থাকিবার আবশ্যক কি? যে

দিন বিক্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক
পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না
কি জন্য?

লক্ষ্মী। তোমার ভগিনী লক্ষ্মীকে
চিরদুঃখিনী করিবে, এই কি ইচ্ছা? দেখ
ভাই, আমার আর এ জগতে কে আছে?
পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎ-সংসারে কেহ
নাই। তুমিও কি চাঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি
সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ
হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হই-
লেন?

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! তুমি আমাকে
ভালবাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট
দিব, সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ
হন। কিন্তু ভগিনী! এ জীবনে আর
আমার সুখ নাই, তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের
শোক বুঝিবে কিরূপে? জীবন অপেক্ষা
আমাদিগের স্মরণ্য প্রিয়, যত্ন অপেক্ষা
কলঙ্ক ও অপমান সহস্রগুণে কষ্টকর। সেই
কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী। তবে সেই কলঙ্ক দূর কারবার
চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মাংসভব শিব-
জীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে
তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন,
তোমার দোষ নাই বুঝিবেন।

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না কিন্তু তাঁহার
মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে
অশ্রুধারা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী
লক্ষ্মী বুঝিলেন, পিতার আভিমান, পিতার
দর্প পুত্রে বর্জমান। তিনি প্রাণ থাকিতে
এরূপ আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-
মতী লক্ষ্মী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া
পুনরায় বলিলেন, “মার্জনা কর, আমি
স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর
নিকটে বাইতে অসম্মত হও, কাব্য দ্বারা

কেন আপনি বল রক্ষা কর না? পিতা বলিলেন, “সেনার সাহস ও প্রকৃত্তিক কার্যে প্রকাশ হয়।” যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সম্বোধন করিয়া থাকে, অসি-হস্তে কেন সে সম্বোধন কর না?”

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন প্রজলিত হইল। তিনি স্বজ্ঞাসা করিলেন, “কিভাবে?”

লক্ষ্মী। শুনিয়াছি, শিবজী দিল্লী বাইতে-ছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, সূচপ্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্রীলোক, আমি কি জানি বল? তোমার পিতার স্ত্রায় সাংল, তাঁহারই স্ত্রায় বীর-প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সকল হইতে পারে?

রঘুনাথের যদি অস্ত চিন্তার সময় থাকিত, তবে বুধিবে, কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানবজন্ম-শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞা নহেন। যে ঔষধি আঁধি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোকসন্ধ্যাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্বরূপে উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেককণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন ও মুখমণ্ডল সহসা নব-গৌরব ধারণ করিল; অনেককণ পরে বলিলেন, “লক্ষ্মী! তুমি স্রীলোক, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে, অগবান্ সহায় হউন, রঘুনাথ বিদ্রোহী নহে, ভীক নহে, একথা এখনও প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বাণিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?”

লক্ষ্মী ইবৎ হাসিলেন; ভাবিলেন, “রোগ নির্বর করিয়ায় আমি, ঔষধ মিলান

আদি, তথাপি কিছু বুঝি না?” একান্তে বলিলেন, “ভাই, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিভাবে বুঝিবে? কিন্তু বাহাই হউক, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ব্বমনোরথ হও, অগদীষরের নিকট এই প্রার্থনা করিবে।”

রঘুনাথ। আর লক্ষ্মী! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার সেহ, তোমার ভালবাসা কখনও বিস্মৃত হইব না।

অনেককণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, “আমার আর একটি কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।”

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?

লক্ষ্মী। চম্পরাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয়, তোমার অপকার করিয়াছেন।

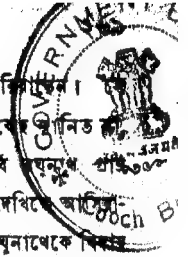
রঘুনাথের হস্ত দূর হইল, মুখ রক্তবর্ণ হইল; কিন্তু সে উবেগ দমন করিয়া রঘুনাথ কহিলেন, “চম্পরাও রাজার নিকটে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। তিনি আমার অস্ত কোন অপকার করিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না।”

লক্ষ্মী। তিনি বাহাই করিয়া থাকেন, ভাই, অস্বীকার কর, তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।

রঘুনাথ নিরস্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরায় বলিলেন, “জ্ঞাতার নিকট পূর্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই, একটি কথা বলিলাম, ভাই, আমাকে যদি ভালবাস, এ কথাটি রাখিও।”

সে অহরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া

বহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত।



শব্দ। তিনি ভগিনীর হাত দুইটি ধরিয়া
নিলেন, “লক্ষি, আমার মনে মনে সবেহ
র, চন্দ্রারাওই আমার সর্বনাশ করিয়া-
ছেন; কিন্তু তোমাকে অদের কিছুই নাই।
এই টেশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, চন্দ্র-
রাওয়ের কোন অনিষ্ট করিব না। আমি
তাহার দোষ মার্জনা করিলাম, জগদীশ্বর
তাহাকে মার্জনা করুন।”

লক্ষী স্বপ্নের সহিত বলিলেন, “জগদী-
শ্বর তাহাকে মার্জনা করুন।”

পূর্বদিকে প্রভাতের আলোকছটা দেখা
যাইল। লক্ষী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া
স্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন;
বলিলেন, “আমার সঙ্গে বাটার অস্ত্র লোক
মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত
আছে, এইক্ষণে আমি না যাইলে জানিতে
পারিবে; এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার
মনোরথ পূর্ণ করুন।”

“পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,” এই
বলিয়া স্নেহে লক্ষীর নিকট বিদায় লইয়া
রঘুনাথও মন্দির হইতে নিজ্জাত হইলেন।
লক্ষীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল,
আমরা হতভাগিনী সরযুর নিকট বিদায়
লইয়া আসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতাপতি গোস্বামী।

বাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,

বাও বশোবিস্তিত হইয়া অ'বার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রক্তমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের
বাইতে কি অস্ত্র বিলম্ব হইয়াছিল, পাঠক-

বহাণর অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন।

দিন যুদ্ধে কে রক্ষা পাইবে, বোধ পানিত হই-
যুদ্ধে গমন করিবার পূর্বে রঘুনাথ
ভরিয়া একবার সরযুকে দেখিতে আসি-
ছিলেন, সাক্ষনয়নে সরযু রঘুনাথকে বিদায়
দিয়াছিলেন।

একদিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল,
রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।
আশা প্রথমে কানে কানে বলিতে, লাগিল,
“রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ
রাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী রঘুনাথ
শীঘ্র উল্লাসিত-হৃদয়ে আবার আসিতেছেন,
পরম কুতূহলের সহিত পিতার নিকট যুদ্ধ-
কথা কহিবেন।” কিন্তু রঘুনাথ আর
আসিলেন না, সেদিনকার যুদ্ধকথা বর্ণনা
করিলেন না।

সতসা বজ্রের স্তার সংবাদ আসিল, রঘু-
নাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণে অস্ত্র অবমানিত
হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন। প্রথমমুহুর্তে
সরযু চকিতের স্তার রহিলেন, কথার অর্থ
তাহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে লগাট রক্ত-
বর্ণ চইয়া উঠিল, বক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রক্তিত
হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে
অশ্রুতরঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে
বলিলেন, “কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী?
রঘুনাথ মুসলমানগিগের সহিত যোগ দিয়া-
ছিলেন? কিন্তু তুই নির্বোধ, তোকে কি
বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ।”

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক
সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে
লাগিল, “রঘুনাথ বিদ্রোহী।” সরযুর সখা-
গণ সরযুকে এই কথা বলিলেন; বৃদ্ধ জনা-
র্ধনও সাক্ষ্যলোচনে বলিতে লাগিলেন, “কে
জানে, সেই সুন্দর উদারহৃদী বালকের মনে
একপাকুরতা ছিল? সরযু সমস্ত গুলিলেন,

কোন উত্তর করিলেন না। অগৎভক্ত লোকে
রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিতেছে, সরযু হ্রদ
কহিল, অগৎ মিথ্যাবাদী, রঘুনাথের চরিত্রে
যেই সন্দেহ নাই।

এইরূপে করেক দিন অভিযাহিত হইলে
সরযু, একদিন সন্ধ্যার সময় সরযু সরোবরতীরে
বসিলেন; দেখিলেন, সরোবরের কূলে সেই
নৈশ অন্ধকারে জটাজুটধারী দীর্ঘকায় এক-
জন গোস্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। সরযু ঈষৎ
বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, তত গোস্বামীর
দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার
ভোজ্যপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযুর হৃদয়ে
ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

গোস্বামী সরযুর দিকে চাহিলেন, কণেক
স্থিতিভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “ভদ্রে!
এ গোস্বামীর নিকট কি তোমার কোনও
প্রয়োজন আছে? কোনও বিশেষ অভীষ্টে
আমার নিকট আসিয়াছ? রমণি! তোমার
ললাটে দুঃখচিহ্ন দেখিতেছি কেন? চক্ষুতে
কল কেন?”

সরযু উত্তর করিতে পারিলেন না।
গোস্বামী পুনরায় বলিলেন, “বোধ হয়, আমি
তোমার উদ্দেশ্য অবগত আছি। বোধ হয়, কোন
বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ।”

সরযু তখন কল্পিতস্বরে বলিলেন,
“ভগবান্! আপনার শক্তি অসাধারণ, যদি
অমুগ্ধ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে
বাধিত হই। সেই বন্ধু বিপর হইয়াছেন,
তাঁহার কুশলবাঞ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে আসি-
য়াছি।”

গোস্বামী। অগতে সকলে তাঁহাকে
বিদ্রোহী বলিয়া জনে।

সরযু। প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই।

গোস্বামী। মহারাজ শিবজী তাঁহাকে
বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন।

সরযুর মুখ রক্তবর্ণ হইল, আরক্ত নয়নে
কহিলেন, “ভগবান্! প্রবন্ধনা বিশ্বাস করিব,
কিন্তু রঘুনাথ বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না।
গোস্বামিন, আমি বিদায় হই।”

গোস্বামীর নয়ন জলপূর্ণ হইল, তিনি
ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার আর কিছু
বক্তব্য আছে।”

সরযু। নিবেদন করুন।

গোস্বামী। মহাবাহুদয় অবগত হওরা
মহাবাগণনার অসাধ্য, রঘুনাথের হৃদয়ে কি
ছিল, জানিবার একমাত্র উপায় আছে। প্রাণ-
য়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ।
যদি রঘুনাথের বথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে,
তাঁহার নিকট গমন কর, তাঁহার হৃদয়ের
ভাব কি, জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার হৃদয়ের চিত্রা
মিথ্যাবাদিনী নহে।

সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,
“জগদীশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি
আমার হৃদয়ে এতকণে শান্তিদান করিলে।
সেই উন্নতচরিত্র বোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার
যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের
সত্যতার তাহার স্থিরবিশ্বাস বিচলিত হইবে
না।”

কণেক পর গোস্বামী আবার বলিলেন,
“ভদ্রে! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হই-
তেছে যে, তুমিই সেই বোদ্ধার প্রকৃত প্রাণ-
য়িনী। আমি দেশে দেশে পর্যটন করি,
সম্ভবতঃ রঘুনাথের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ
হইতে পারে, তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে?
আমার নিকট লজ্জার কারণ নাই, আমি
সংসারের বহির্ভূত।”

সরযু ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ধীরে ধীরে
বলিলেন, “প্রভুর সহিত তাঁহার সস্ত্রান্তি
সাক্ষাৎ হইয়াছিল?”

গোস্বামী। কল্য রজনীতে ঈশানী-

মান্নের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সরযু। তিনি আপাততঃ কি করিবার তজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি বলিয়াছেন ?

গোস্বামী। নিজ বাহুবলে, নিজ কার্য-ক্ষেত্রে, অস্ত্রের অপব্যবহার তিরোহিত করিবেন অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।

সরযু। যত বীর প্রতিজ্ঞা! যদি তাঁহার সহিত পুনরায় আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন, সরযু রাজপুত-বালা, জীবন আপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান। বলিবেন, সরযু যত দিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কপূত্র বীর বলিয়া তাঁহার যশোগীত গাইবে। ভগবান্ অবশ্যই রঘুনাথের যশ সঞ্চল করিবেন।

গোস্বামী। ভগবান্ তাহাই করুন, কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্বদা জয় হয় না। বিশেষতঃ রঘুনাথ যে দুঃস্থ উদ্ভয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় আছে।

সরযু। রাজপুতের সেই ধর্ম। আপনি তাঁহাকে জানাইবেন, যদি কর্তব্যসাধনে তাঁহার প্রাণবিরোগ হয়, সরযুবালা তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিবে।

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন, “রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন ?”

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ তাঁহাকে স্থগা করিবে, আপনি কি তাঁহাকে ক্ষম্যে স্থান দিবেন? জনক বাহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন? স্থপিত,

অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে কি সরযুবালা যনে রাখিবেন ?”

সরযু বলিলেন, “প্রভু! তাঁহাকে জানাই যেন, সরযু রাজপুতবালা, অবিখ্যাসিনী নহে।”

গোস্বামী। জগদীশ্বর! তবে আর তাঁহার ক্ষম্যে কষ্ট নাই। লোকে যদি মন্দ বলে, তিনি জানিবেন, একজন একজনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে। এক্ষণে বিদায় দিন, আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের ক্ষম্যে শান্তিসেচন হইবে।

সজলনয়নে সরযু বলিলেন, “তাঁহাকে আরও বলিবেন, তিনি অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আধিপত্য, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন।”

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযু বলিলেন, “প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?”

গোস্বামী বলিলেন, “সীতাপতি গোস্বামী।”

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী বারগড়-ভূগাতিমুখে গমন করিতেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড়-ভূগ।

বিক সেব, বৃগাপ্ত, অকৃত কবর,
এত দিন আর এই অশ্রুতমপুরে,
বেবধ, বীরধ, বীর্ষা, সর্ব ভেরাপিয়া,
দাসদের কলহেতে ললাট উজ্জ্বলি ?

হেবচল বন্দোপাধ্যায়।

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিল পর, শিব-জীর তদানীন্তন রাজধানী বারগড়ে রজনী

শিবজীর সময় একটি সভা সরিবেশিত হই-
রাছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি,
মন্ত্রী, কর্মচারী, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ
সভার উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত বোদ্ধা,
ধীশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণভু, শুক্লকেশ, বহুদর্শী
কায়শাস্ত্রী সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন।
বুদ্ধবাবসারে বুদ্ধিসংকলনে বা বিজ্ঞাবলে
ইহারাই শিবজীর চিরসহায়তা করিয়াছেন;
শিবজীর তার ইহাদেরও জয় স্বদেশোত্তরোগে
পূর্ণ। কিন্তু অস্ত সভাস্থল নীরব, শিবজী
নীরব, মহারাজ্যীয় বীরগণ অস্ত মহারাজ্যীয়-
গৌরব-লক্ষ্যের নিকট বিদায় লইবার অস্ত
সমবেত হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেখরকে সম্বো-
ধন করিয়া বলিলেন, “পেশওয়ারাজী! আপনি
তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধী-
নতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়-
স্বরদার হইয়া থাকিব?”

মুরেখর। মনুষ্যের বাহা সাধা, আপনি
তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্বন্ধকে লঙ্ঘন
করিতে পারে?

শিবজী। স্বর্গদেব! যখন আপনি
আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রাজগড়-
দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজ্যের
রাজধানীস্বরূপ নির্মাণ করেন, না জায়-
স্বরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্মাণ
করেন?

আবাজী স্বর্গদেব ক্ষুরধরে উত্তর করি-
লেন, “কবিরায়াজ! ভবানীর আদেশে
একদিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন,
ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত
হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধের।
ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত বুদ্ধ
নিবেদ্য করিয়াছেন।”

অরজী দত্তও কহিলেন, “বাহা অনিবার্য,

তাহা হইয়াছে, অথবা আপনার দিগ্বিদগমনের
কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করুন।”

শিবজী। অরজী! আপনার কথা
সত্য, কিন্তু যে আশা, যে চেষ্টা জয়
বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে
উৎপাটিত হয় না। এই যে উন্নত পরিত
শ্রেণী চক্ষুরালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্যকালে
এ পরিতপ্ত আয়োজন করিতে করিতে
বা উপত্যকার ভ্রমণ করিতে করিতে
জয় কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত। পুন-
রায় মহারাজ্যেশ্বর স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ
স্বাধীন হইবে, পুনরায় হিন্দুসেনা হিমালয়
হইতে সাগরতল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন
করিবেন। ঈশানী! যদি এ আশা
অলৌকিক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্নে কেন
বালকের জয় চকল করিয়াছিলে?

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরব,
সভার শব্দবাহু নাই। সেই নিশ্চলতার
মধ্যে ঘরের একপ্রান্তে ঈশ্বর অন্ধকার
স্থান হইতে একটি গভীর স্বর স্রুত হইল,—
“ঈশানী প্রবন্ধনা করেন না। মনুষ্যের
যদি অধ্যবসায় ও বীরত্ব থাকে, ঈশানী
সহায়তাদানে কুণীত হইবেন না।”

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন,
নবীন গোষাঘাষী সীতাপতি।

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে
লাগিল, বলিলেন, “গোঁসাইজি! তুমি
আমার জয়কে বাল্য উৎসাহের পুনরুজ্জ্বল
করিতেছ, বাল্যকথা পুনরায় স্মরণ করাই-
তেছ, তাত, দাখাজী কানাইদেব যত্ন-
শয্যার শায়িত হইয়া আমাকে এইরূপ
বলিয়াছিলেন, ‘বৎস! তুমি যে চেষ্টা
করিতেছ, তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা আর
নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর,
দেশের স্বাধীনতা-সাধন কর, ব্রাহ্মণ,

গোবৎসাহি ও কৃষিগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কল্মষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ইশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর ।’ বিংশতি বৎসর পরে অজ্ঞ দাদাজীরা গভীরস্বর আমার কর্ণকূহরে শব্দিত হইতেছে। দাদাজী কি প্রবঞ্চনাট্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন ?”

পুনরায় সেই গোস্থামী সেই গভীরস্বরে বলিলেন, “কানাইদেব প্রবঞ্চনাট্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে। পথিমধ্যে যদি আমরা ভয়েৎসাহ হইয়া নিরন্ত হই, সে কি দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীকৃত্য ?”

“ভীকৃত্য” শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্ঝন্ শব্দ করিল।

গোস্থামী পুনরায় গভীরস্বরে বলিলেন, “রাজন্! গোস্থামীর বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অজ্ঞায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি, ক্ষমা করুন। কিন্তু মদীর উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ, আপন বীররূপকে জিজ্ঞাসা করুন। যিনি জায়গীদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পরীতে, উপত্যকার, গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন? সে স্বাধীনতার জলাঞ্জলি দিবেন? বালস্বর্ঘ্যের জ্ঞায় যে হিন্দু-রাজ্যের জ্যোতিঃ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিস্তৃত হইতেছে, সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত হইবে? রাজন্! হিন্দু গৌরব লক্ষী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসারী মাত্র, আমার পরামর্শ

দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।”

সভাস্থ সকলে নীরব, শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া অলিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে শিবজী গোস্থামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “গোস্থামিন্! আপনায় সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে, আপনি দেব কি মনুষ্য, জানি না, কিন্তু দৈব-বাণী হইতেও আপনার কথা জ্ঞদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণ-কৌশল, অসংখ্য রাজসেনা, তাহার সহিত যুদ্ধ করে, একপ সৈন্য আমাদের কোথায়?”

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীর্য্যগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণও দুর্কল হস্তে অসিধারণ করেন না। জয়দিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিব-জীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া, দৈবকে সংহার করিয়া, কার্য্যসাধন করুন, ভারতবর্ষে একপ হিন্দু নাই যে, আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এমন দেবতা নাই, যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন!

শিবজী। মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া কথির-স্রোতে দেশ প্রাণিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম?

সীতাপতি। সে পাণে কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্ত, স্বধর্ম্মের জন্ত যুদ্ধ করেন, তিনি, না যিনি মুসলমানদিগের অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি?

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় একদণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে? একদণ্ড কাল পর বীরে বীরে

বড়ক-উঠাইয়া গভীরস্থরে বলিলেন, “সীতাপতি! অস্ত্র আমিসংগ্রহ, মহারাষ্ট্রদেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই। এখনও পরাবীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধের দিনে আপনাকে অপেক্ষা বিচক্ষণ যত্ন বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরামর্শ আপনাকে করিতেছি না, বৃথা-নাশ আপনাকে করিতেছি না, অস্ত্র একটি কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

বে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা সাধনার্থ অনেক বড় যন্ত্র, অনেক গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি। রক্তচক্ষু আমার সহিত সন্ধিবাক্য রাখে নাই, আমিও তাহাদিগের সহিত সন্ধি রাখি নাই।

অস্ত্র হিন্দুধর্মের অবলম্বনরূপ, হিন্দু-প্রতাপের প্রতিমূর্তিরূপ, সত্যনিষ্ঠ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি, শিবজী সে সন্ধিলঙ্ঘন করিতে অপারগ। মহামুভব রাজপুত্রের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, শিবজী জীবন থাকিতে তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

ধর্মাত্মা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে।’ সে কথা অত্যাশি আমি বিশ্বস্ত হই নাই, সে কথা অস্ত্র বিশ্বরণ হইবে না।

সীতাপতি! চতুর আরঞ্জীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনায় পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দ্বর্জল হস্তে ধ্বংস করিবে না। কিন্তু সত্যপরাধ জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।”

সত্যসদৃশ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। কণেক পর অরজী বলিলেন, “মহারাজ!

আর একটি কথা আছে; আপনি কি দিল্লী বাগদাদ স্থির করিয়াছেন?”

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্য দান করিয়াছি।

অরজী। মহারাজ! আরঞ্জীবের চতুরতা জানেন, তাহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?

শিবজী। অরজী! জয়সিংহ অরজীব বাক্যদান করিয়াছেন যে, দিল্লীগঙ্গা আমার কোমরপ অনিষ্ট ঘটবে না।

অরজী। কপটাগারী আরঞ্জীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?

শিবজী। সন্ধিলঙ্ঘনের ফলে আরঞ্জীব অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরঞ্জীবের এত আচরণ করিলে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধাঙ্গ প্রজ্জলিত হইবে, সাগরের জলে তাহা নিমজিত হইবে না, আরঞ্জীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে। পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে।

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিবেদন করিলেন না। কণেক পর শিবজী বলিলেন, “পেশোয়ারী মুরেখর! আবাজী অর্ঘদেব! অরজী দত্ত! আপনাদিগের ভ্রাতৃ কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদেশে বিরল। আমার অবর্তমানে মহারাষ্ট্রদেশ আপনাদিগের তিন জনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের তুল্য সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।” মুরেখর, অর্ঘদেব ও অরজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মঙ্গলী তখন বলিলেন,

“কত্রিররাজ! আমার একটি আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সন্মত্যাগ করি নাই, অহুযতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।”

সজল-নয়নে শিবজী বলিলেন, “মানস্রী! তোমার নিকট আমার অবেদ্য কিছুই নাই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।”

নীতাপতি কণেক পর বলিলেন, “রাজন! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমাকে ব্রতসাধনার্থ বহু তীর্থে ঘাইতে হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।”

শিবজী। নবীন গোষ্ঠাসিন্! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন। যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত বহু আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্প বয়সেই এরূপ ভেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।

পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অক্ষুটস্বরে বলিলেন, “কেবল আর এক জনকে দেখিয়াছিলাম।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

চাঁদ করিব গীত ।

চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমুষ্টি ধরিয়া ।

অগ্নিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্রিতিপূর্থে আঁকিয়া ।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে বসন্তকালে পঞ্চশত
অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক লইয়া

শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন নগরের প্রায় ছয় কোশ দক্ষিণে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাসংঘ বিজ্ঞান করিতেছে, শিবজী চিন্তিত-মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই? এই-রূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মনঃস্থান আলোড়িত করিতেছে। বোদ্ধার মুখমণ্ডল ও ললাট চিন্তারেখার অঙ্কিত, বিপদকালে ও দুঃকালে কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিত্তাক্রান্ত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার ভেজাখী উগ্রপ্রভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছেন। রঘুনাথপুত্র জায়শাহী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

অনেককণের পর শিবজী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জায়শাহী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?”

জায়শাহী। বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।

শিবজী। দূরে ঐ বহুবিভীর্ণ প্রাচীরের জায় কি দেখা যাইতেছে, বলিতে পারেন? আপনি অনন্তমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্ত?

জায়শাহী। মহারাজ! দিল্লীর শেষ হিন্দু-রাজা পৃথুরারের দুর্গপ্রাচীর দেখা যাইতেছে।

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “এই সে পৃথুরারের দুর্গ? এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল? এই স্থানে দিল্লীর শেষ হিন্দু-

রাজা রাজ্যশাসন করিতেন ? ভায়শাত্রী, যন্ত্রের ভায় দে দিন গত হইয়াছে ! দিবসের আলোক গত হইয়াছে, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্তপত্র কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়। আমায় গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না ?”

ভায়শাত্রী। ভগবানের প্রসাদে সকলই হইতে পারে। ভগবান করুন, আপনার বাহুবলে বেন আমরা পুনরায় গৌরবলাভ করিতে পারি।

শিবজী। ভায়শাত্রী ! বাল্যকালে কল্প-প্রদেশের কথকদিগের যে কথা শুনিতাম, চাঁদ করিব যে গীত শুনিতাম, তাহা কি আপনার মনে পড়ে ? ঐ ভগ্ন ভূগ প্রাসাদপূর্ণ ও বহুজনা-কীর্ণ ছিল, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর ছিল। রাজ্য-ভার যোদ্ধা বর্গবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরে যত্নর দেখা যায়, পথে, খাটে, বাঁটোতে, প্রাচীরে ও নলীতীরে নাগ-স্নিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে। বহু বিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, উজানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরো-বর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া বাইতেছে, প্রাসাদ-সম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; বাতকর সানন্দে বাজ করিতেছে। প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে মহম্মদ ঘোরীর দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল। সে কথা কি আপনার মনে পড়ে ?

ভায়শাত্রী। রাজনু ! চাঁদ কবির কথা মনে আছে, কিন্তু আপনি আর একবার সে কথা বলুন। আপনার মুখে সে কথা বড় মিষ্ট লাগিতেছে।

শিবজী। মুসলমান-দূত পৃথুরারকে

বলিল, “মহারাজ ! মহম্মদ ঘোরী আপনার রাজ্যের অধীশ্বর্য্য লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন, তাহাতে আপনার কি মত ?”

মহম্মদ পৃথুরার উত্তর করিলেন, “যবে সূর্য্যদেব আকাশে অস্ত্র একটি সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরার সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অস্ত্র রাজ্যকে স্থান দিবেন।”

মুসলমান-দূত পুনরায় বলিল, “মহারাজ ! আপনার স্বপ্নের মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধি করিয়াছেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।”

পৃথুরার উত্তর করিলেন, “স্বপ্নের মহা-শয়কে প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বপ্ন বাইতেছি, অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবা।”

অবিলম্বে চোহান-সৈন্য ঐ প্রশস্ত ভূগ হইতে নিক্রান্ত হইল, তিরোহীর যুদ্ধে বন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরার সম্মুখে বাহু-তাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল, আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল !

রঘুনাথ ! সে দিন গিয়াছে, এক্ষণে চাঁদ করিব গীত কে গাইবে, কে শ্রবণ করিবে ? তথাপি এ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমা-দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে, যন্ত্রের ভায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্রে চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না, ভারতের গৌরবের দিন এখনও উদিত হইবে। জগদীশ্বর রূপকে আরোগ্যদান করেন, দুর্ব্বলকে বলবান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারত-সন্তানকে তিনি এখনও উন্নত করিতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—*—
রামসিংহ ।

বাগের সদৃশ বীর সমান সমান ।

কান্দীয়া দাব ।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমনত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, “মহারাজ ! রামসিংহের পুত্র রামসিংহ অস্ত্র একজন সৈনিকের সহিত সম্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।”

শিবজী । সাগরে লইয়া আইস ।

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, “পিতা ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরঞ্জীব কেবল দুই জন রাজ দূত পাঠাইয়াছেন ?”

শিবজী আরঞ্জীবকৃত এই অবমাননার মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। কণেক পরেই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্র যুবক পিতার স্তায় তেজস্বী ও বীর, পিতার স্তায় ধর্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরঞ্জীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী-প্রদেশে বিপদ আছে কি না, কথাক্ষলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্ঘ্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, সবিস্ময়-মনে মহারাত্রী-বীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপূরসর অভ্যর্থনা করিলেন।

কণেক পর রামসিংহ করিলেন, “মহারাজাকে পূর্বে আমি কখন দেখি নাই, কিন্তু

পিতার নিকট আপনার যশোবার্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অস্ত্র আপনার স্তায় যশোপ্রিয় ধর্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার মনন সার্থক হইল।”

শিবজী । আর্য্যও অস্ত্র পরম সৌভাগ্য ।

আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ ধর্মপরায়ণ সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল। দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহা মূলকণ সন্দেহ নাই।

রামসিংহ । রাজনু ! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছেন, কখন নগর-প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন ?

শিবজী । প্রবেশ-সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন ?

অকপটস্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন, “আমার বিবেচনার এইকণ্ঠেই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বাহু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।”

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী হাস্ত করিয়া বলিলেন, “শে কথ্য জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিস্তিত নাই। আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।”

উদারচেতা রামসিংহ শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া দ্বিগুণ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “কমা করুন, আমি আপনার উদ্বেগ পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অকৃৎসন হইলে চিরকাল পূর্ব্বতে বাস করিতাম, নিজের অমির উপর নির্ভর করিতাম, অমির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র, পিতা আপনাকে বখান দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন আপনি

“যদিও তুমিই জারাজ্ঞান। তিনি অবি-
তীয় পণ্ডিত, তাহার পরামর্শ কখন ব্যর্থ
হয় না।”

শিবজী বলিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে কত
করিবার অস্ত্র কোনও কল্পনা হয় নাই অথবা
যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন
না। তখন পুরস্কার বলিলেন, “হাঁ, আপ-
নার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ
দিয়াছেন, আমার আদিবার সময় তিনি
আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ
হয় অবগত আছেন।”

রামসিংহ। আহি, দিল্লী আগমনে
আপনার কোন বিপদ হইবে না, কোনও
অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপ-
নাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে
তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।

শিব। তাহাতে আপনার মত কি?

রামসিংহ। পিতার আদেশ অবশ্য পাল-
নীয়, রাজপুত্রেয়বাক্য লঙ্ঘন হয় না। পিতার
বাক্য বাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরা-
পদে স্বদেশে বাইতে পারেন, সে বিষয়ে
দাসের বড়ের কোনও সন্দেহ হইবে না।

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল, আর
সন্দেহ না করিয়া দৈব হাসিয়া বলিলেন,
“তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব।
বিলম্ব করিলে বাহু উত্তপ্ত হইবে। চলুন,
এইক্ষণেই দিল্লী প্রবেশ করি।”

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে
চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের
ভরাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা
দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরার পুরাতন দুর্গের
নিকট আপনারাঙ্গের রাজধানী নির্মাণ
করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাটদিগের
মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের ভরাবশিষ্ট

সেই স্থানে দৃষ্ট হয়, জগদ্বিখ্যাত কুতুবমিনার
এই স্থানে নির্মিত। কালক্রমে নতুন
নতুন সম্রাট, আরও উত্তরে নতুন নতুন
প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্মাণ করিতে
লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল।
শিবজী বাইতে বাইতে কত প্রাসাদ, কত
মসজিদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধিমন্দি-
রের ভরাবশেষ দেখিলেন, গণনা করিতে
পারিলেন না। রামসিংহ শিবজী সবে
সবে বাইতে লাগিলেন ও নানাস্থানের পরি-
চয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের
পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ
সৌহার্দু জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির
করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়,
একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পশ্চিমধ্যে লোদীবংশীর সম্রাটদিগের
প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির-সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক
রাজার কবরের উপর এক একটি গম্বুজ ও
অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। আকগানদিগের
গোরবস্থ্রী যখন অস্বস্তিত হয়, তখন এই
স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া
গিয়াছে।

তাহার পর হুমায়ূনের প্রকাণ্ড সমাধি
মন্দির। তাহার পরে “চৌবট্ থকা,”
অর্থাৎ খেত-প্রান্তর-বিনির্মিত চতুঃষষ্টিভুজ
প্রকাণ্ড হুকের অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে
অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরার দুর্গ হইতে
আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে
শিবজীর বোধ হইল যেন, সেই পথেই
ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত হইয়াছে।
একটি প্রাসাদ ও অট্টালিকা সেই ইতিহাসের
এক একটি পাতা, এক একটি গোরস্থান এক
একটি অক্ষর, কতকাল সেই ইতিহাস-
লেখক, নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন
লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন।
দিল্লীর প্রাচীরের নিকট আসিলে রামসিংহ
সগর্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,
“রাজন! এই যে মন্দির দেখিতেছেন, পিতা
জ্যোতিষগণনার্থ ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়া-
ছেন। বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে
আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।

শিবজী। আপনার পিতা বেকর বীর,
সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এইরূপ সৰ্ব্বজনসম্মত
লোক অতি বিরল। শুনিরাছি, পৃথ্বী কানী-
ধামেও তিনি ঐরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছেন।

দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিবার
সময় শিবজীর দ্বেষ জ্বলন্ত হইল, তিনি
অস্থির হইলেন; একবার পশ্চাদিকে
চাহিলেন, একবার মনে চিন্তার উদয় হইল
বে, এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী
হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ ধর্মপরায়ণ জয়-
সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন,
তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার
মুখমণ্ডল দেখিলেন, নিজ কোষে “ভবানী”
অসির দিকে দর্শন করিয়া দিল্লীস্থার প্রবেশ
করিলেন।

স্বাধীন মহারাজার বোকা সেই মুহূর্তে
বন্দী হইলেন।

মহারাজার জীবন প্রত্যাহার।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

দিল্লীনগরী।

যের যের থাকিবে রাজ্য,
নাটিকে নর্তকীকুল ঘাইবে হুজানে
গায়ক।

যার যারে কোলে মালা গাঁথা কলমুল;
গৃহাঙ্গে উড়িছে লম্বা, বাতায়বে বাতী।
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।

যত্নবশ নত।

দিল্লী অস্ত্র যনোহর শোভা ধারণ করি-
রাছে। আরাজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয়
ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য-সাধনার্থ সময়ে
সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে
জানিতেন। অস্ত্র শিবজী দরিদ্র মহারাজ-
দেশ হইতে বিপুল অর্থশালী যোগল-রাজ-
ধানীতে আসিয়াছেন; যোগলদিগের ক্ষমতা,
সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য দেখিলে শিবজী
আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, যোগল-
দিগের সহিত বুদ্ধের অসমতা বুঝিতে
পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরাজীব অস্ত্র প্রচুর
জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের
আদেশে দিল্লীনগরী-উৎসবের দিনে কুল-
ললনার ভায় অপূর্ববেশ ধারণ করিয়াছে।

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ
অভিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া
অসংখ্য অস্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন
করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে।
বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্য-
দ্রব্য রাখি করিয়া রাখিয়াছে, উৎকৃষ্ট বস্ত্র,
বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার, অপূর্ব
খাদ্যদ্রব্য ও অপরিখ্যাত গৃহস্থকরণদ্রব্য
দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতি-

বাহন করিতে আসিলেন। কোথাও বৃহৎ উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছন্ন গৃহস্থেরা বারান্দার বসিয়া বহিরাছে, কোথাও বা গবাদি দিয়া কলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-বোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব, রাজা, মন্ত্রদ্বার, সেনা, আর্মীর ও ওমরাহগণ সর্বদা গমনাগমন করিতেছে। অঝোরোহিণী তীব্রবেগে বেন নগর কাঁপাইয়া বাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুভ নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া বাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ হুহুকার শব্দে বেন আরোহীর পদমর্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া বাইতেছে। শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা দ্বারগড়।

বাইতে বাইতে রামসিংহ দুই তিনটি খেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন, “এ দেখুন, জুম্মা মসজিদ। শত্রুপাট শাজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া এই উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ওরূপ মসজিদ জগতে আর নাই।”

শিবজী বিশ্ময়োৎফুর-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত মসজিদের প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর খেতপ্রস্তর-বিনির্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার বেন গমন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপূর্ণ মসজিদের সম্মুখেই রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে বমুনা নদী, সম্মুখে বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ভ্রাম্য সমারোহপূর্ণ আর একটি স্থানও ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না, সন্দেহ।

দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বাহুপথে উড়িতেছে, বেন অগতে যোগল-সভ্যদের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মন্ত্রদ্বারের প্রশস্ত শিবির, মন্ত্রদ্বার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান বহিরাছে, বম্বুকের কীরীচল্লী সূর্যালোকে ঝকঝক করিতেছে, প্রত্যেক কীরীচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমাগে উড়িতেছে। দুর্গসম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গ-প্রাচীর হইতে মসজিদ-প্রাচীর পর্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ। অঝোরোহী, গজারোহী ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিযুক্ত পুরুষগণ, বহুলোকে সমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্বদাই দুর্গদ্বারের ভিতর বাইতেছেন বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছন্ন-শোভার নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ বহু কম্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ অসংখ্য অর্থী জগতের অধিপতির ক্ষমতাবর্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে। বিশ্ময়োৎফুরলোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী বাহা দেখিলেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ “কারখানার” অসংখ্য শিল্প-করাগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; অপূর্ণ সুবর্ণ ও রৌপ্য-খচিত বস্ত্র, মলমল, মসজিন বা ছিট;

বহুলা গালিচা, চত্ৰাতিপ, তাহু বা পর্দা ; সুন্দর পরিধের উকীষ, শাল বা গাজাবরণ ; অপক্লপ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধের অলঙ্কার ; সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য, সুন্দর বেত-প্রস্তরের গৃহাঙ্করণ জ্রবা, রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিবর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা-জ্রবা, —কত বর্ণনা করিব ! ভারতবর্ষে বত অপূর্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহার হাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন হুর্গে কার্য করিতে আসিত। সম্রাট রাজ-কার্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসপ্রিয়া বেগমগণ বস্তুরূপ অপূর্ব জ্রবা আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাসীদিগের বত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রাপ্ত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া “দেওয়ান আম” নামক উন্নত প্রশস্ত রক্ত-বর্ণ-প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট সচরাচর এই স্থানে সভা অধিবেশন করিতেন, কিন্তু অল্প যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গোরব দেখাইবার জন্যই সুন্দর বেত-প্রস্তরনির্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং জগতে অতুল্য “দেওয়ান খাস” নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের ভিতর রক্ত-মাণিক্য-বিনির্মিত স্তূপারম্ভি-প্রতিষ্ঠাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন। সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্যবিনির্মিত রেল, রেলের বাহিরে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মল্লবার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশেষে দণ্ডায়মান

রহিয়াছেন। রামসিং শিবজীর পরিচয়-দান করিয়া রাজ-সভনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অহা দিল্লীনগরীর অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিবর আরও স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর যুদ্ধ করিয়া আপনাব ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্রাট সম্রাটের স্বাধীনতা-স্বীকার করিয়া মুখে বর্ধেই সহায়তা করিয়াছিলেন, যিনি মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট তাঁহাকে কিরূপ আহ্বান করিলেন ? শিবজী অহা একজন সামান্য কর্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান। শিবজীর ধমনীতে উচ্চ শোণিত বহিতে লাগিল, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরুপায়, সামান্য রাজকর্মচারীর ন্যায় সম্রাটকে “তসলীম” করিয়া রীতিমত “নজর” দান করিলেন। আরংজীবের দূর-উদ্দেশ্য-সাধন হইল। জগৎ-সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, স্বীপের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্থতা !

এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ আরংজীব “নজর” গ্রহণ করিয়া, কোনও বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে “পাঁচহাজারী” অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র দেনার সেনাপতিগণের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিয়া অস্পষ্টভাবে বলিলেন, “শিবজী পাঁচহাজারী ? সম্রাট যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন, শিবজীর অধীনে কত জন পাঁচ-

হাস্যারী আছে। দেখিও, তাহার দূরত্ব হতে অসিদ্ধায়ণ করুন।”

আবজ্ঞার কার্য-সম্পাদন হইলে সত্য-ভব হইল। সম্রাট গোত্রোপাধি করিয়া পার্বতী উক্ত শ্রেষ্ঠ-প্রভু-বিনির্দিষ্ট বেগমবহলে বাইলেন। তখন শ্রীর শ্রোতের ন্যায় ভূগ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। যে বাহার আবাসস্থানে বাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দিল্লীনগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটি বাটী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। রোবে, অভিমানে সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে, অতঃ সম্রাটের সম্মুখে শিবজী রুট হইয়া যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট তাহা শুনিয়াছেন। সম্রাট শিবজীকে নগ্ন দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুকিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে! ব্যাধ বেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্ত জাল পাতে, কুকুর ছুটবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্ত মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন। শিবজী মনে মনে ভাবিলেন, “এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব? হা সীতাপতি গোশ্বামিন্দ! চির-যুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে। আরংজীব! সাবধান! শিবজী এ পর্যন্ত তোমার নিকট সত্যপালন করিয়াছে, তাহার সহিত চতুরতা করিও না, কেন না, শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন।

যদি কর, তবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সময়সীমা প্রচালিত করিব, তাহাতে এই যুদ্ধ দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান-সাম্রাজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

নিশীথে আগন্তুক ।

কে তুমি—

বিহ্বলিত-হৃদিত অন্ন ।

বধূবদন নভ ।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রের আত্ম কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সম্রাটের এই কপটচরণে যৎপরোনাস্তি রুট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিধ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনান্দপঙ্ক জায়শাস্ত্রী সর্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। অনেক বৃত্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথমে দেশপ্রত্যাগমনের জন্ত সম্রাটের নিকট অমুমতি প্রার্থনা করা বিবেক, অমুমতি না দিলে অস্ত্র উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

জায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর ও বাকপটুতার অগ্রগণ্য। তিনি শিবজীর আবেদন রাজসদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত

হইল! শিবজী যোগল-সৈন্তের সহায়তা করিয়া যে যে কার্যসাধন করিয়াছিলেন, আরজীব যে যে বিষয় অস্বীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, “আমি যে কার্য সাধন করিতে অস্বীকার করিয়াছি, তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলতক্ষ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে বতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ করেন, অহুমতি দিলে আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যা-বর্তন করি, কেন না, হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে, আমার সঙ্গিগণ ও আমার সৈন্তগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি অসহ্যকর, এ দেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।”

রঘুনাথ জায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাট-সদনে উপস্থিত করিলেন। সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন, সে উত্তরে নানা কথা লিখিত আছে; কিন্তু শিবজীর প্রত্যাগমনের অহুমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন, তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক-দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিত-ভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। হৃদয় অন্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অঙ্গকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবি-রত বহিয়া বাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে। কখন কখন দুই একজন খেতাব-যোগল সদর্পে চলিয়া বাইতেছে, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান লোকদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং

দুই একজন কৃষ্ণবর্ণ কাকীও কখন কখন দেখা বাইতেছে। পারস্ত, আরব, তাতার ও তুরক দেশ হইতে বণিক বা মসাকের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মল্ল-বার বহলোক সম্বিষ্ট হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া বাইতেছে। সৈনিক পুরুষগণ হস্ত-কোতুক করিতে করিতে লব্ধ অতিবাহন করিতেছে, বিক্রেতাগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মন্তকে লইয়া চীৎকার করিয়া বাইতেছে। এতদ্বির অস্ফুট সহস্র লোক সহস্র কার্যে জলের জায় বাতায়িত করিতেছে।

ক্রমে জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত-কলরব ক্রমে ক্রমে ধামিয়া গেল, দুই একটি বাতীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা বাইতে লাগিল, দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটি তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমালুটা আর নাই। শিবজী পূর্বদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, শাস্ত্র বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনানদী সায়ংকালে নিম্নত-তায় অনন্ত সাগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছে।

সেই নিম্নততার মধ্যে জুড়া মসজীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উথিত হইল, যেন গম্ভীরশব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উথিত হইতে লাগিল। শিবজী মুহূর্তের জন্ত তরু হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধ-কারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুয়া মস-জীদেব স্বৈত-প্রস্তর-বিনির্দিষ্ট গম্বুজগুলি

মুনীল আকাশগটে অল্পটো মেঘা বাইতেছে, কেবল প্রাণীদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর দূরে পৰ্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্বিধ সমস্ত নগরী অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিশ্চলতার স্তব্ধ।

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তা-মুগ্ধ এখনও ছিন্ন হইল না, কেন না, অল্প পূৰ্ব্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বালাকালের সুস্থবর্ণ, বালাকালের আশা, ভরসা, উত্তম, সাহসী ও উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বালাসুন্দর দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী ! সেই বীরমাতা শিশু শিবজীকে মহারাত্রের জয়ের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা বালক শিবজীকে বীরকার্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা শিবজীকে বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন।

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, উন্নত কার্যাপরম্পরা, দুৰ্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূৰ্ব জয়লাভ, দোৰ্গও প্রতাপ, দুৰ্দমনীয় উজ্জাভিলাষ ! শিবজী বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, প্রতিবৎসরই অপূৰ্ব বিজয়ে বা অসমসাহসী কার্যে অঙ্কিত ও সমৃদ্ধ !

সে কার্যাপরম্পরা কি বার্থ ? সে আশা কি মায়াবিনী ? না, এখনও ভবিষ্যৎ আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারত-বর্ষে মুনলমান-রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দু রাজতন্ত্রবর্তীর মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্নত হইবে ?

শিবজী এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, একরূপ সময় এক প্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাণীদের নাগরাধানা হইতে সে শব্দ উখিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর পরিব্যাপ্ত

হইল, নৈশ নিশ্চলতার গভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত স্রুত হইল। আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, একরূপ সময়ে শিবজী উন্নীলিত গবাক্ষদ্বারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্তি দেখিতে পাইলেন। ক্লকবর্ণ অন্ধকার আকাশ-গটে যেন একটি দীর্ঘ নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই প্রতিকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ফ্লাট ও জয়গলের উপর নৈশ শিশির যোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণনয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাভূট, শরীরে বিভূতি, হস্তে বা কোবে অসি বা ছুরিকা, কোন প্রকার অস্ত্র নাই। তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সন্ধ্যাট প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে ?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতর শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন, “মহারাজের জয় হউক !”

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল। বিপদের সময় একরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সন্তোষে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটি দীপ আলিলেন, পরে ঔৎসুক্য সহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধুপ্রবর ! রায়গড়ের সংবাদ কি ? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন ? এত দূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন ? অল্প নিবীধে গবাক্ষদ্বার দিয়া আমার নিকট আসিবারই বা অর্থ কি ?

সীতাপতি । মহারাজ ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল । আপনি যে সচিব-প্রবরের হস্তে রাজ্যভার স্তম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেন না, আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না । পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পৰ্য্যটন করিতে হয়, সেই প্রয়োজনেই যথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান-দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি । প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি, তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাট কি, নিশাই কি ?

শিবজী । তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া নিশীথে আসিতেন না । কি কারণ, প্রকাশ করিয়া বলুন ।

সীতাপতি । নিবেদন করিতেছি, কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন ?

শিবজী । শারীরিক কুশলে আছি, শত্রু-মধ্যে মনের কুশল কোথায় ?

সীতাপতি । প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধি আছে, আপনাদিগের শত্রু কোথায় ?

শিবজী । সপের সহিত ভেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? সীতাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না । যদি রায়গড়ে আপনাদিগের পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কদেশের পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে অত্যাগি স্বাধীন থাকিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া দিল্লীদগরীতে বন্দী হইতাম না ।

সীতাপতি । প্রভু, আশ্চর্য্যভরিতার করিবেন না, মহুয্যামাজেই দ্রাবিড় অধীন, এ জগৎ ত্রয়-পরিপূর্ণ । বিশেষ এ বিষয়ে আপনাদিগের

দোষমাজ নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, সম্রাটের প্রদর্শন করিয়া এ স্থানে আসিয়াছেন, বিনি অসম্রাটের ও কপটাচরণে সোঁতী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহাকেই দণ্ড দিবেন । প্রভু ! খলতার জন্ম নাই, অল্প আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন । মহারাজ ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিশ্বাস হয় নাই ; আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে ।

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন, “সীতাপতি ! সে ভরসা এখনও লোপ পায় নাই । এখনও আরংজীব দেখিবেন, মহারাষ্ট্র জীবন লোপ পায় নাই ! কিন্তু হায় ! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্তেরা মোগলদিগের সহিত, তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর-দিল্লীদগরে নিশ্চেষ্ট বন্দীশ্রমণ থাকিব ?”

সীতাপতি । যবে গগনসঙ্করাবিষাযুকে আরংজীব জালমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে দিল্লীর প্রাচীরমধ্যে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্বে নহে ।

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “তবে বোধ করি, আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এতক্ষণ গুপ্তভাবে অচল রত্ননীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন ।”

সীতাপতি । প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এতক্ষণ সম্ভাবনা নাই ।

শিবজী । সে উপায় কি ?

সীতাপতি । অল্পকাল রজনীতে প্রভু অনার্যাসে হৃদয়কোষে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্বদিকে এক স্থানে সেই প্রাচীরে লোহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তৎকালী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাজ্যীয় বাহির অসাধ্য নহে; অপরপার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আটজন মারা আছে, নিমেষমধ্যে মথুরায় পৌছিবেন। অথবা প্রভুর অনেক বন্ধু আছেন, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাচ্ছাদিত পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনার্যাসে স্বদেশে বাইতে পারিবেন।

শিবজী । আমি আপনার উদ্ভোগে তুষ্ট হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু, তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম; কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে পলায়ন দুঃসাধ্য, আরং-জীবের হস্তে মৃত্যু নিশ্চয়।

সীতাপতি । প্রাচীরের যে স্থানে লোহ-শলাকা দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশ জন তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

শিবজী । ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ-প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?

সীতাপতি । অষ্টজন ছদ্মবেশী নৌকা-বাহক আপনারই অষ্টজন বোদ্ধা। তাহা-দিগের শরীর বক্ষাচ্ছাদিত, তুণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

শিবজী । মথুরা পৌছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?

সীতাপতি । আপনার পেশওয়ার

তগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত, তাহা আপনি জানেন। আমি অত্র তাহার নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাহার পত্র পাঠ করুন।

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সীতাপতি, শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্ত করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, “আপনি পাঠ করিয়া শুনান।”

সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাহার তখন স্মরণ হইল যে, শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও পাপড়া শিখেন নাই।

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনিয়া শুনিল। বাহা বাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কৃপায় সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তারিত লেখা আছে।

শিবজী বলিলেন, “গোস্থামিন্! আপ-নার সমস্ত জীবন বাগ্যযজ্ঞে অতি-বিত্ত হইয়াছে, কখনই বোধ হয় না। শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা অল্প উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি জাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্থ ও প্রিয়হৃদয় তন্নজী মালতী কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত সৈন্তগণই বা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিজ্ঞান পাইবে?”

সীতাপতি । আপনার পুত্র, প্রিয়হৃদয় ও মন্ত্রিবর আপনার সহিত অত্র রজনীতেই বাইতে পারে। আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই, আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।

শিবজী । সীতাপতি! আপনি আরং-জীবকে জানেন না; তিনি ব্রাহ্মদিগকে

এক করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন ।

সীতাপতি । যদি আপনার সেনাপতির উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাত্রী-সেনা আপনার নিরাপদ-বার্তা প্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণবিসর্জন না করিবে ?

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে মহামুগ্ধ বীরে বীরে বলিলেন, “গোদামিন্ ! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্বেগের জন্য আপনার নিকট চির-বাধিত রহিলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, এরূপ ভীকৃতার কার্য্য কখনও করিবে না । সীতাপতি ! অস্ত্র উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন ।”

সীতাপতি । অস্ত্র উপায় নাই ।

শিবজী । তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে শিবজী কখনও পরাভূত হয় নাই ।

সীতাপতি । সময় নাই । অস্ত্র রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন, নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ ।

শিবজী । আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন, জানি না, কিন্তু আপনার কথা যদি যথার্থই হয়, তথাপি শিবজীর অস্ত্র উত্তর নাই । শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিজ্ঞাপ করিবে না । গোদামিন্ ! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ।

সীতাপতি । প্রভু ! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরাজীবকে শাস্তিদান করুন । সেই দূর-মহারাত্রীদেশে প্রত্যাবর্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের স্রাব সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন । অচিরে

আরাজীবের অধঃপতন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতুল জলে মগ্ন হইবে ।

শিবজী । সীতাপতি ! বিনি জ্ঞাতোত্তর রাজা, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই । শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না ।

সীতাপতি । প্রভু ! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না, কল্য আপনি বন্দী ।

শিবজী । তাহাই হউক । শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর এ প্রতিজ্ঞা অবিচলিত ।

সীতাপতি নীরব হইয়া রহিলেন । শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাহার নয়নে জল-বিন্দু । তখন সন্মুখে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন, “গোদামিন্ ! মোর গ্রহণ করিবেন না । আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে তুলিব না । রায়গড়ে আপনার বীরপরামর্শ ও দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থে আপনার এতদূর উদ্বেগ চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে । আপনি আমার সহিত অবস্থান করুন, আপনার পরামর্শে শীঘ্র সঙ্কলেরই উদ্ধারসাধন করিব ।”

সীতাপতি । প্রভু ! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পূরিত হইলাম, জগদীশ্বর জানেন, আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অস্ত্র অভিলাষ নাই । কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানা স্থানে নানা কার্য্যে বাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব ।

শিবজী । এ কি অসাধারণ ব্রত, জানি না, সীতাপতি ! এ কি কঠোর ব্রতধারণা করছেন ?

সীতাপতি। সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, নিবন্ধে ভাজদর্শন নিবন্ধ।

শিবজী। ভাল, এত্রেত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?

কণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন, “আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখিত আছে, আমার ইষ্টদেবতা, বাহাকে আমি বালাকাল হইতে পূজা করিয়াছি, বাহার নাম জপ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছি, বিধির নির্বন্ধে তিনি আমার উপর বিমুখ। সেই অমঙ্গলখণ্ডনার্হ ব্রত-ধারণ করিয়াছি।”

শিবজী। এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেই বা আপনাকে অমঙ্গলখণ্ডনার্হ এ বিষয় ব্রত ধারণ করিতে বলিল?

সীতাপতি। কার্যবশতঃ আমি স্বয়ংই এটি জানিতে পারিলাম, কেশানী-মন্দিরে একজন আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, সমস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিব, যদি অকৃতার্থ হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। বাহার পূজার্হ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি বিমুখ হইলে এ জীবনে আবশ্যক কি?

শিবজী। সীতাপতি। বাহা বলিলেন, বধার্হ। বাহার অস্ত্র প্রাপণ করি, বাহার অস্ত্র আত্মসমর্পণ করি, তাহার অসন্তোষ অপেক্ষা অগতে মর্ষভেদী দুঃখ আর নাই।

সীতাপতি। প্রভু! আপনি কি এ বাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন?

শিবজী। অগ্নীশ্বর আমাকে মার্ক্ণনা করুন, আমি একজন নির্দোষী বীরপুরুষকে এই বাতনা দিয়াছি। সে বালকের কথা

মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।

সীতাপতি। সে হতভাগার নাম কি?

শিবজী বলিলেন, “রঘুনাথজী হাবিলদার।”

যরের দীপ সহসা নির্বাণ হইল। শিবজী, প্রদীপ জালিবার উদ্বেগ করিতেছিলেন, এমন সময় সীতাপতি বলিলেন, “দীপ অনাবশ্যক, বলুন, শ্রবণ করিতেছি।”

শিবজী। আর কি বলিব! তিন বৎসর অতীত হইরাছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি। আপনারই স্ত্রীর তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প, আপনার স্ত্রীর তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার স্ত্রীরই হৃদয়মনীয় বীরত্ব ও সাহস সর্বদা বিরাজ করিত। আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ বখন দেখি, আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর বখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম বখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম, সে দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্বদা আমার ছায়ার স্তায় আমার নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় হৃদয়মনীয় তেজে লক্ষ্য-রেণা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয়, তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃককেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি।

সীতাপতি । তাহার পর ?

শিবজী । সেই বালক এক যুদ্ধে আমার
জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অস্ত্র এক যুদ্ধে
তাহারই বিক্রমে হৃৎক্লম্ব হইয়াছিল, অনেক
যুদ্ধে সে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ
করিয়াছিল ।

সীতাপতি । তাহার পর ?

শিবজী । আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্ত ?
আমি একদিন ব্রহ্মে পতিত হইয়া সেই চির-
বিধ্বাসী অল্পচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য
হইতে দূর করিয়া দিলাম । শেষ পর্য্যন্তও
রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে
নাই, বাইবার সময়ও আমার দিকে মন্তক
শ্রুত করিয়া চলিয়া গেল ।

শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু
বহিয়া পড়িতে লাগিল । অনেকক্ষণ কেহ
কথা কহিতে পারিলেন না । অনেকক্ষণ
পরে সীতাপতি বলিলেন, “তাহাতে আক্ষে-
পের কারণ কি ? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম ।”

শিবজী । দোষী ? রঘুনাথের উন্নত
চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষে-
ত্রান্ত হইলাম, জানি না । রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে
আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে
বিজ্রোহী মনে করিলাম । মহাহতভব জরসিংহ
পরে এ বিষয় অল্পসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন
যে, তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘু-
নাথ যুদ্ধপূর্বে আশীর্বাদ লইতে গিয়াছিল,
সেই জন্তই বিলম্ব হইয়াছিল । নির্দোষীকে
আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি,
সেই অবমাননার রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করি-
রাছে । যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়া-
ছিল, আমি তাহার প্রাণবিনাশ
করিয়াছি ।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইল, তাঁহার বাক-
শক্তি রুদ্ধ হইল, তিনি অনেকক্ষণ নীরব

হইয়া রহিলেন । অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন,

“সীতাপতি !”

কোনও উত্তর পাইলেন না । কিঞ্চিৎ
বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জালিলেন ; দেখিলেন,
সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ।

আরংজীব ।

সর্ব্বশত্রু পড়ি বেটা হলি হতবুর্খ ।

বল্লর কথা বুঝিস্ নাই এই বড় হুংখ ॥

কতিবাস ওখা

পরদিন প্রায় এক প্রহর বেলায় সময়
শিবজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল । তিনি জাগরিত
হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনি-
লেন ; উঠিয়া গবাক্ দিয়া নিরাসিকে
চাহিলেন, বাহা দেখিলেন, তাহাতে চকিত
ও স্তম্ভিত হইলেন ।

দেখিলেন, বাটীর পক্ষাতে, দুই পাশে-
সম্মুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান
রহিয়াছে । বিশেষ পরিচয় না পাইলে প্রহরি
গণ বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে
দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে বাইতে
দিতেছে না । দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ
হইল—কল্যাণ শিবজী পলাইতে পারিতেন,
অন্ত তিনি আরংজীবের বন্দী !

তখন শিবজী বিশেষ অহুসন্ধান করিতে
লাগিলেন ; জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের
নিকট স্বদেশে বাইবার প্রার্থনা করিয়া
অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উল্লেখ
হইয়াছিল এবং সেই সন্দেহ প্রযুক্ত সতাই
নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়া-
ছিলেন যে, শিবজীর বাটীর চতুর্দিকে দিবা-
রাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে

কোথাও বাইলে সেই লোক সন্দেশে
বাইবে, সন্দেশে সন্দেশে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী
তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাপতি
গোম্বারী আরংজীবের এই আদেশের কথা
জানিতে পারিয়া পূর্বেই শিবজীর পলায়নের
সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন এবং রজনী
দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছেন।
শিবজী মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্য-
বাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটচারিতা এতদিনে
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। সম্রাট প্রথমে শিব-
জীকে বহু সমাদর পূর্বক পত্র লিখিয়া
দিল্লীতে আহ্বান করিলেন, শিবজী আসিলে
তাঁহাকে রাজসভার অবমাননা করিলেন,
পরে রাজসভার বাইতে নিবেদন করিলেন,
তৎপরে দেশে প্রত্যাগমন করি নিবেদন
করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন।
কোন কোন সর্প গোমহিষাদি ভক্ষণ করি-
বার পূর্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষার
চতুর্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ-
রূপে বশীভূত করে, পরে ক্রমে চুষিতে চুষিতে
ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ক্রুর আরংজীবও
সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে
সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে ধীরে ধীরে
বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।
মানসচক্ষে অতীত ও বর্তমান সমুদায়
ঘটনা যুহুর্মধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর
নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া
রোষে গজিয়া উঠিলেন। ক্ষতপদবিক্ষেপে
সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার
অধরোষ্ঠের উপর দস্ত স্থাপিত রহিয়াছে,
নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে।
অনেকক্ষণ পর অর্ধক্ষুণ্ট-স্থরে বলিলেন,
“আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না,
চতুরতার আপনাকে অধিকার মনে

কর, কিন্তু শিবজীও সে বিচার বালক নহে
এই ঋণ এক দিন পরিশোধ করিব, সে দিন
দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত সমরায়ি
প্রজলিত হইবে।”

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবজী বিবস্ত
যন্ত্রী রঘুনাথপন্থকে ডাকাইলেন। প্রাচীন
জায়গার উপস্থিত হইলেন, নিঃশব্দে সম্মুখে
উপবেশন করিলেন। শিবজী বলিলেন,
“পণ্ডিতপ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা
দেখিতেছেন, এই খেলা আমাদেরও খেলিতে
হইবে, আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলার
অপরিপক্ব নহে। অদ্য আমরা বন্দী হইব,
আমি কল্যাণরাজ্যে ইহার সংবাদ পাইয়া-
ছিলাম; কিন্তু অহুচরবর্গকে পূর্বে পরিজ্ঞান
না করিয়া আমার আত্মপরিজ্ঞানের ইচ্ছা
নাই, সেই বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?”

জায়গারী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলি-
লেন, “আপনার অহুচরদিগের স্বদেশগমনের
জন্ত সম্রাটের নিকট অহুমতি প্রার্থনা
করুন। এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন,
আপনার অহুচরসংখ্যা বত হ্রাস হয়, তাহাতে
সম্রাট আহলাদিত ভিন্ন ছাখিত হইবে না।
আমি বিবেচনা করি, অহুমতি চাহিলেই
পাইবেন।”

শিবজী। মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই
শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয়, ধৃত আরংজীব এ
বিষয়ে আপত্তি করিবে না।

সেই মর্মে একখানি আবেদন-পত্র
প্রস্তুত হইল। শিবজী বাহা মনে করিয়া-
ছিলেন, তাহাই ঘটিল, শিবজীর অহুচরসকল
দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট
আহলাদিত হইয়া তাহাদিগের বাইবার জন্ত
এক একখানি অহুমতিপত্র দান করিলেন।
শিবজী করেকদিনমধ্যে সেই সমস্ত অহুমতি-
পত্র প্রাপ্ত হইলেন; মনে মনে বলিলেন

“মুখ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অহুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অহুমতিপত্র লইয়া দিল্লীত্যাগ করিলে কি করিতে পার? বাহা হউক, অহু-চরবর্ণ এখন নিরাপদে যাউক, শিবজী আপ-নার জন্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম।”

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধি-কৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বুদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া, দিল্লীর ময়রসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কান্দীর হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত আর্ঘ্যা-বস্ত্রের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্য-দেশ জয় পূর্বক সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অসা-ম্যন্ত চতুরতা দ্বারা মহাবীর শূচতুর শিবজী-কেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল, একবার সেই কপটীচাচারী, অদূরদর্শী আরংজীবের প্রাসা-দাতাস্বরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ কর।

রাজকাৰ্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব “গোসলখানা” নামক একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটি মন্ত্রীদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অত্য় আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কখন তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা বাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণাসফলতা-জনিত সন্তোষে তাঁহার গুষ্ঠ-প্রান্ত হস্তরেণার অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট্ কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দুধর্মের আরও অব-মাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করি-তেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে

উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না, সম্রাট্ কি চিন্তা, তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও মন্ত্রীকে সন্দেহমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধিপ্রার্থ্যে সকলকে পুত্তলিকার স্থায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাহুকি বেক্ষণ নিজের মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্বাস চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহি-তেছেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন এরূপ সময় একজন সৈনিক তসলীম করিয়া বলিল, “সম্রাটের জয় হউক! জীচাপনা! দানেশ-মন্দ্ নামক আপনার সভাসদ আপনার সাক্ষাৎ-অভিলাষী, দ্বারদেশে, দণ্ডায়মান আছেন।” সম্রাট্, দানেশমন্দ্কে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তা-রেখাগুলি ললাট হইতে অপমৃত করিলেন, মুখে সুন্দর হাস্য ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ্ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকাৰ্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না, তবে তিনি পারস্ত ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট্ তাঁহাকে অতিশয় সন্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ্ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন, এমন কি, আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারী যখন বন্দী হন, দানেশমন্দ্ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শ দিয়া-ছিলেন। এবং বিধি পরামর্শ কুটিল আরং-জীবের মনোগত হইত না, আরংজীব তাঁহাকে

অরুণাচল ও অরুণাচলীয়া মনে করিতেন, তথাপি তাহার বিজ্ঞা, ধর্ম ও পদমর্যাদার জন্ত সত্যক আদর করিতেন। সরলস্বভাব বুদ্ধ দানেশমন্দ্ৰ সন্মাত্রকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

দানেশমন্দ্ৰ। এ সময়ে জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা, কেন না, এ সময় সন্মাত্র, রাজকার্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অগ্রগ্রহ করেন এই নিমিত্ত। পারস্ত-কবি সুলতান লিখিয়াছেন, সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা ক্রিগদানে বিরত হন?

সন্মাত্র সহাস্রবদনে বলিলেন, “দানেশমন্দ্ৰ! অস্ত্রের সন্ধকে বাহাই হউক, আপনি সর্ব্বসময়েই সমাদরের পাত্র।”

ক্ষণেক এইরূপ যিষ্টালাপ হইলে পর দানেশমন্দ্ৰ অস্ত্র কথা আনিলেন, বলিলেন, জাঁহাপনা! আলমগীর নাম সার্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।”

ঈষৎ হাস্ত করিয়া আরঞ্জীব বলিলেন, “কেন, সে বিষয়ে আমার কি উত্তোগ দেখিলেন?”

দানেশমন্দ্ৰ। দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।

আরঞ্জীব। শিবজীর কথা বলিতেছেন? হাঁ, ইন্দুর কলে পড়িয়াছে।

তৎক্ষণাৎ আপনি যত্নপূর্ণ গোপনার্থে বলিলেন, “দানেশমন্দ্ৰ! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী গুৰ্জ ও বিজোহী হউক, যোদ্ধা বটে,

তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম, রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে একরূপ দুৰ্ঘবে, রাজসভার অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অস্ত্র শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আনীতে নিবেদন করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি যে, দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সম্মানী ও বিজোহীর সহিত পরামর্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্তই কোতোয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি, কয়েকদিন পর সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিব।”

দানেশমন্দ্ৰ। সন্মাত্রের এ আদেশ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

আরঞ্জীব। কেন?

উদারচেতা দানেশমন্দ্ৰ বলিলেন, “সন্মাত্রকে পরামর্শ দিই, আমার কি সাধ্য, কিন্তু জাঁহাপনা! যদি শিবজীর প্রতি দয়াশূ আচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্ত বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অধ্যাত্তি করিত, বলিত যে, শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্ধ করা অসম্ভব নয়।”

আরঞ্জীব ঈষৎ কোপ সঙ্কোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন, “দানেশমন্দ্ৰ! মন্দলোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্ত তাহাকে সতর্ক করিয়া দিব, পরে দয়া প্রকাশে তাহাকে সম্মান বিদায় দিচ্ছি।”

দানেশমন্দ্ৰ। একরূপ সদাচারণেই জাঁহাপনার প্রণীতামহ আকবরশাহ দেশ-শাসন করিয়াছিলেন, একরূপ সদাচরণে আপনারও ধ্যাত্তি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

আরাজীব। সে কিরণ ?

দানেশমন্। সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। সেখান, আকবর শাহ বখশ মিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুগণ ছিল; রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, সর্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, মিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুগণ ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্বি-
রোধ হইয়াছিল, বাহারা পূর্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতরাই বাদশাহের অধী-
নতা-স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত দিল্লীধরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে।
জয়সাধন কিরণে হইয়াছিল ? কেবল বাহ-
বলে ? কেবল সাহসে ? তৈমুরের বংশে
কাহারও সাহব বা বাহবলের অভাব নাই,
তবে আর কেহ একরূপ জয়সাধন করিতে
পারেন নাই কি জন্ত ? না, জাঁহাপনা !
কেবল সদাচরণেই একরূপ জয়লাভ হইয়াছিল।
তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন,
অধীন হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দু-
রাও এংবিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার
চেষ্টা করিত। মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল
প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-
স্বরূপ হইয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তিকেও
অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়,
অধম কাকেরের প্রতিও সদাচরণ ও বিশ্বাস
করিলে তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়,
মানবের এই প্রকৃতি, শাস্ত্রের এই লিখন।
আমাদের দক্ষিণদেশের বুদ্ধে শিবজী অনেক
সহায়তা করিয়াছেন, জাঁহাপনা ! তাঁহাকে
সম্মান করিলে তিনি যত দিন জীবিত থাকি-
বেন, দক্ষিণদেশে মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ-
স্বরূপ থাকিবেন।

দানেশমন্। কি জন্ত সম্রাটের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ

হয় এক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীধর শিবজীকে
আহ্বান করিয়া বন্দী করার জ্ঞানী ও সমা-
চারী মুসলমান সভাসম্বাদ্যই লক্ষিত হইয়া-
ছিলেন। দানেশমন্কে সম্রাট সমাদর
করিতেন, তিনি কোমলরূপে কথাগুলো সম্রা-
টের কুপ্রভৃতি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে বেথা-
ইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিব-
জীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট, তাঁহাকে
স্বদেশে বাইতে দেন, দানেশমন্ এই উদ্দেশ্যে
আসিয়াছিলেন। দানেশমন্ জানিতেন না
যে, হস্ত দ্বারা একাও ভূধরকে বিচালিত করা
সম্ভব, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরাজীবের মৃত-
প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচালিত
করা অসম্ভব।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথাগুলি
কুটিল আরাজীবের নিকট অতিশয় নিকো-
ষের কথা হইয়া বোধ হইল। তিনি ঈর্ষ-
হাস্ত করিয়া বলিলেন, “হাঁ, দানেশমন্
যে রূপ শাস্ত্রবিদ্যার, মানবজন্মের সেই রূপ
পাঠ করিয়াছেন দেখিতেছি। দক্ষিণদেশে
শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবে, রাজস্থানে ত
বিদ্রোহিগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্বেই করিয়াছে।
কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গ
দেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্বক
আহ্বান করিব। এই চতুঃস্তম্ভের উপর
মোগলসাম্রাজ্য স্থান্য ও হৃদয়রূপে স্থাপিত
হইবে।”

দানেশমন্দের মৃদুগল রক্তবর্ণ হইল,
তিনি বীরে বলিলেন, “সম্রাটের পিতা
দানকে অহুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও যথেষ্ট
অহুগ্রহ করেন, সেই জন্ত কখন কখন মনের
কথা বলি, নচেৎ জাঁহাপনাকে পরামর্শ দিই,
একরূপ বিভ্রান্তি নাই।”

আরাজীব দানেশমন্কে নিকোঁষ সরল
ব্যক্তি জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্য

তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাকে কষ্ট দিয়া ছেন দেখিয়া বলিলেন, “দানেশমন্ড ! আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিও না। অকি-বরশাহ বৃদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু কাকের ও মূল্যমান সমানতক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্মসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন ? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের সামাজ্য দৈনিক কার্য-সম্পাদনকালে দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যশাসনকার্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয়টুকু ? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কি অল্প যুগিত কাকেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব ? আরংজীব বাংলাকালাবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিকার করিয়াছে ও নিজ অসি দ্বারা দেশশাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।”

দানেশমন্ড ! জাহাঙ্গীর ! স্বহস্তে দৈনিক কার্য নির্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য-শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয় ? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব-সময়ে আপনি বর্তমান থাকিতে পারেন ? অল্প কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য ক্রমে সম্পাদিত হইবে ?

আরংজীব। অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাঁহারা চিরকাল ভৃত্যের ভায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে। অন্য আমি নাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্যাণে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে, অন্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্যাণে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে !

এ অবস্থার ক্ষমতা ও বিশ্বাস অক্সেপ্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্ড, তুমি যখন অধঃ আরোহণ কর, অধঃ বঙ্গ ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যে দিকে কিরাও, সেই দিকে বাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটের সেইরূপ শাসন করা উচিত। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না। সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্মচারী ও সেবাদিগকে সর্বস্বরূপে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কার্য গ্রহণ করিবে।

দানেশমন্ড ! প্রভু ! মহাযত্ন অর্থ নহে, তাঁহাদিগের মহত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে।

আরংজীব। মহাযত্ন অর্থ নহে, তাঁহা জানি, সেই জন্তই অধঃ বঙ্গ দ্বারা চালাই। মহা-বাক্যে উন্নতির আশা ও শান্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উন্নয়ন কার্য করিবে, তাঁহাকে পুরস্কার দিব। যে অধঃ কার্য করিবে, তাঁহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকল কার্য করিবে ; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা আরংজীব নিজহস্তে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে।

দানেশমন্ড ! প্রভু ! পুরস্কার আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মহাযত্ন-স্বদে ত অন্য ভাবও আছে। মহাযত্নের মহত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মানজ্ঞান আছে। যে শাস্তিভয়ে কার্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে ; কিন্তু বাহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্যে নিজের ধন, মান, গ্রাণ পর্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।

আরংজীব। দানেশমন্। আমি তোহার
স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতার বাহা লিখে,
তাহা বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার
শাস্ত্র। মানবের মহত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি।
শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক
দেখিয়াছি, সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি
নিজহস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি। সেই
জন্ত কাকেরদিগের উপর জিজিরা কর হ্রাসন
করিব, বিজোহানুখ রাজপুতদিগের উপর
কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিশ্চয়
করিব, বিজয়পুর ও গলধন্দ জয় করিব,
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একাকী শাসন
করিব। কাহারও সহায়তা লইব না, আলম-
গীর নিজের নাম সার্থক করিবে।

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া-
ছিল। তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন
কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না,
অন্ত কথার কথার অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ
করিয়া ফেলিয়াছেন। এতদ্বির তিনি দানেশ-
মন্দের উদারচরিত্র জানিতেন, তাহার নিকট
চুই একটি কথা কহিলে কোনও হানি নাই,
জানিতেন।

কণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরং-
জীব বলিলেন, “সরলস্বভাব বহু! অত
আমার অভীষ্ট ও মঙ্গল কিছু কিছু বুঝিতে
পারিলে?”

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর
মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল
দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন,
তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান-সাম্রাজ্য
বোধ হয়, এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না।

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন,
এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ
দিয়া, “রামসিংহ জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ
অভিলাষী, দারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।”

সম্রাট, আদেশ করিলেন, “আসিতে
দাও।”

কণেক পর রাজা জরসিংহের পুত্র রাজ-
সমনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহ। সম্রাটকে এক্ষণ সময়ে সাক্ষাৎ
করামাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু
পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ
আসিয়াছে, প্রত্যেকে জানাইতে আসিলাম।

আরংজীব। আপনার পিতার নিকট
হইতে আমরাও অল্প পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত
সংবাদ অবগত আছি।

রামসিংহ। তবে সম্রাট, অবগত আছেন
বে, পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া শত্রু-
দেশ বিদূর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর
আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্তের
অল্পতাবশতঃ সে নগর এ পর্য্যন্ত হস্তগত
করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ গলধন্দের
মুলতান বিজয়পুরের সাহায্যার্থ নেকনাম
খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্য
সমেত প্রেরণ করিয়াছেন।

আরংজীব। সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রামসিংহ। চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া
পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতে-
ছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রত্যুর নিকট
আর অল্পসংখ্যক সৈন্তের দ্রুত প্রার্থনা
করিয়াছেন।

আরংজীব। আপনার পিতা বীক্সগ্রগণ্য,
তিনি নিজে সৈন্তে বিজয়পুর হস্তগত
করিতে পারিলেন না।

রামসিংহ। মহারাজার বাহা সাধ্য, পিতা
তাহা করিবেন। শিবজী পূর্বে পরাস্ত হন
নাই, পিতা তাহাকে পরাস্ত করিয়াছেন।
বিজয়পুর পক্ষে আক্রমণ হয় নাই, পিতা
সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন; এখন
আপনার নিকট অল্পমাত্র সৈন্ত-সহায়তা

প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য শেষ হয়, দক্ষিণবেশে যোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।

এরূপ অবস্থার অন্ত কোন সম্রাট্ সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশবিজয়-কার্য সাধন করিতেন। আরঞ্জীর আপনাকে বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না; বলিলেন, “রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদ-প্রবর, তাহার বিপদের কথা শুনিয়া বৎপবোনান্ধি শোকাবল হইলাম। তাহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধন করিবেন, সম্রাট্ দিবা-নিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু এখন দিল্লীকে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।”

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, “জাহা-পনা! পিতা দিল্লীখরের পুরাতন দাস, আপ-নার কালে, আপনার পিতার কালে অসং-খ্যক যুদ্ধ যুঝিয়াছেন, অনেক কার্যসাধন করিয়াছেন, দিল্লীখরের কার্যসাধন ভিন্ন তাহার জীবনের অন্ত উদ্দেশ্য নাই। এই যৌর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান না করিলে তিনি বোধ হয়, সসৈন্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।”

বালক জানিত না যে, তাহার কাতর-স্বরে ও অশ্রুজলে আরঞ্জীবের গভীর উদ্বেগ, গৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না। সে উদ্বেগ, সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়-সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপাধিত সেনাপতি, তাহার অসংখ্য সৈন্ত, বিস্তীর্ণ বশ, অনন্ত প্রতাপ। আজীবন তিনি নিরঙ্কলে দিল্লীখরের কার্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোনও সেনাপতির বিধের নহে; সম্রাট্ জয়সিংহকে এতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে জয়-

সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারি- যদি অবমানিত হন, তবে সে প্রতাপ ও বশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্ত বিজয়পুর-সম্মুখে নষ্ট হন, দিল্লীখরের স্বপ্নের একটি কণ্টক-উদ্ধার হইবে। উর্গ-নাভের জালের দ্বারা আরঞ্জীবের উদ্বেগ-গুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অন্ত জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লী-কার্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে জ্ঞাত কি যুদ্ধ মন্ত্রজাল অন্ত ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচিত্ত পুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জগৎ কি দূরদর্শী সম্রাট্ উদ্বেগ ত্যাগ করিবেন?

দয়া দ্বারা প্রভৃতি সুহৃদ্য মনোবৃত্তি-সমূহে আরঞ্জীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়ে ত স্থান দিতেন না। আত্মপথ-পরিহারার্থ অন্ত একটি পতক সরাইয়া ফেলিলেন, কল্যাণ একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য একইরূপ দীর নির-বেগ হৃদয়ে করিতেন। একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, আজীব্যবর্ণ সেই উন্নতি-পথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মারাবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে জ্যেষ্ঠবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ডবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্বেগ-সাধনে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্বেগসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। জ্ঞান, তাহাকে সরাইয়া সম্রাট্ আলমগীরের পথ পরিহার করিয়া দাঙ।

মন্ত্রণাসাধনের অস্ত্র অস্ত্র আবশ্যক যে, জরসিংহ সৈন্যে হত হইবেন । তিনি ভাল কি মন্দ, বিখ্যাসী কি বিজ্ঞোহী, অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সৈন্যে মরিবেন । এই পরিচ্ছেদবিবৃত সময়ের পর করেক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জরসিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । তখনকার ইতিহাস-লেখক কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছে, সম্রাটের আদেশে বিষপ্রয়োগে জরসিংহের মৃত্যু হয় ।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন, “প্রভু ! আমার একটি বাজা আছে ।”

আরংজীব । নিবেদন করুন ।

রামসিংহ । শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে, দিল্লীতে শিবজীর কোনও আপদ ঘটবে না ।

আরংজীব । আগনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন ।

রামসিংহ । রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয় । পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে, শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, প্রভু ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন ।

আরংজীব ক্রোধ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “সম্রাটের বাহা উচিত কার্য্য, সম্রাট তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না ।”

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটি কীট সম্রাটের সেই বিতর্ক মন্ত্রণাআলে পতিত হইয়াছেন, দানেশমন্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না ।

জরসিংহের যে দোষ, শিবজীরও সেই

দোষ । শিবজীও সন্ধিহাপনাবধি প্রাণ-পথে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা । আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা প্রদত্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না ।

বাহাদিগকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহার ক্রমে অবিশ্বাসের ষোণ্য হয় । আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্র-ঘেরা ও রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিল, যোগল-সম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পীড়া ।

দূরে গেল জটাজুট ।

বহুদূর দত্ত ।

শিবজীর অতিশয় সফটজনক এক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরীতে এ সংবাদ প্রচারিত হইল । দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন । এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহহীন, অস্ত্র বেরূপ রোগযুদ্ধি হইয়াছে, কল্যাণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকি অসম্ভব । কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে, শিবজী আর নাই । রাজপথ দিয়া বহু-সংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অনুনির্দিষ্ট করিত । অবারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ কণেক অশ্ব ধামাইয়া গ্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন । শিবিকারোহী

রাজা বা মল্লনার শিবজীর গৃহের সমুখে আসিয়া একবার উদ্ভিগ্না সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্যাণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল, তাহা পূর্যমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয়ে অক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিশ্চয় না হইয়াই অন্যরাসে কটকোদ্ধার হইবে।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সন্তান মুসলমান হাকিম শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল, “কি উদ্দেশ্যে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন?” হাকিম উত্তর করিলেন, “সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।” সম্মুখে প্রহরিগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার ভৃত্য সংবাদ দিল যে, সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিবপ্ররোগের ভয় সম্রাট এ কাণ্ড করিতেছেন। তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, “হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও, হিন্দু-কবিরাতে আমার চিকিৎসা করিতেছে; আমি হিন্দু, অতরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অগ্রহের ভয় আমার কোটি কোটি ধনধান জানাইবে।”

ভৃত্য এই আদেশ লইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইবার পূর্বেই হাকিম অনাহুত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিবজীর হৃদয়ে জ্ঞোষসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সন্ধান করিয়া তিনি অতি ক্রীণ মুহুর্তে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে হাকিমের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বরস অনেক হইয়াছে, অতি গুরু শ্রম লব্ধ হইয়া উরঃস্থ আবৃত করিয়াছে, মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উকীষ, হাকিমের ঘর ধীর ও গম্ভীর।

হাকিম বলিলেন, “মহারাজ! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াছি, আপনি আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না। তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম, আমি স্বধর্মসাধন করিব।”

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হামি। আপনাদ পীড়া কি?

কাতরস্বরে শিবজী বলিলেন, “জানি না, এ কি ভীষণ পীড়া! শরীর সর্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্বদানে বেদনা!”

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসার শরীর অধিক জলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশ-সম্ভাবিত। আপনাদ কি সেই পীড়া?”

বিরিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপ-রূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন। বুৎ সেইরূপ গম্ভীর, কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। শিবজী নিকম্বর হইয়া রহিলেন।

হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন। শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশপূৰ্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন, “আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ী সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূৰ্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এ সমস্ত কি প্রবন্ধনামাত্র ?”

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূৰ্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোন কপট ভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধসংবরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অত্যন্ত চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন। এ মহৎ পীড়া বাহুলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবননাশ করিতেছে।”

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আলফ্ লায়লা ও লায়লুন” নামক আমাদের চিকিৎসাসাশ্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিবরণ নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহুলক্ষণশূন্য পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে। একটির চিকিৎসা ‘বক্সতনে আসিরী ইশারাৎ কর্দ’।’ করেদিগণ কাজ না করিবার জন্য যে পীড়া ভাণ করে, তাহার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আর একটি পীড়ার নাম ‘দিগরান দোজখ্’ অর্থ-‘রায় কুনন্দ’।’ যুবকগণ এই পীড়ার ভাণ করিয়া নরক-পথগামী হয়, তাহার ঔষধি পাড়কা প্রহার। তৃতীয় এক প্রকার বাহুলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, তাহার নাম ‘আরে-বহা বরণেরেক্তা জেরেবগল’।’ প্রবন্ধকগণ

নিজ প্রবন্ধনা খোপনার্থ এই পীড়া ভাণ করে। তাহারও ঔষধ নির্দেশ আছে, আমি সেই ঔষধ আপনাকে দিতেছি।”

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর; শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতি-কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে ঔষধ কি ?”

হাকিম উত্তর করিলেন, “সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট বিষও বটে। ‘রকুল আলমিনার’ নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ বর্ধাৎ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোণা হইবে, যদি প্রতারণা হয়, অব্যর্থ বিবে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।”

শিবজীর দৃষ্টিশক্তি হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল। ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, শিবজী বলিলেন, “মুসলমানের স্পষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।”

শিবজী সাজোরে হস্ত-সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না, ধীরে ধীরে বলিলেন, “এরূপ সজোরে হস্তসঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।”

শিবজী অনেকক্ষণ অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, সহসা উঠিয়া বসিলেন, “রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি” এই বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের গুরুশ্রদ্ধা সজোরে আকর্ষণ করিলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই বিখ্যাত শাস্ত্র সমস্ত খসিয়া আসিল।

চপেটাঘাতে ভীতীশ ঘুরে নিকিল হইল,
তাহার বালাবুহু তরলী মালতী বিলু বিলু
করিয়া হস্ত করিয়া উঠিলেন ।

তরলী অনেকক্ষণ পরে হস্ত সংবরণ
করিয়া ধরের দ্বার ক্রুদ্ধ করিলেন । পরে
শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া
বলিলেন, "প্রভু কি সৰ্দ্ধাই চিকিৎসককে
এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন ? তাহা
হইলে রোগীর হৃদয় পূর্বে দেশের চিকিৎ-
সক নিঃশেষিত হইবে । বজ্রসম চপেটাঘাতে
এখনও মস্তক বিবৃণিত হইতেছে ।"

শিবজী সহাস্তে বলিলেন, "বন্ধু, ব্যাঘ্রের
সহিত খেলা করিলে, কখন কখন আহত
হইতে হয় । বাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া
কতদূর আত্মমিত হইলাম, বলিতে পারি
না, এ কর্দমই তোমাকে প্রত্যাশা করিতে-
ছিলাম । এখন সংবাদ কি বল ।"

তরলী । প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত
করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি ।
সম্রাট্ যে অমৃতপত্র দিয়াছিলেন, তদ্বারা
আপনার অমৃতচরবর্ণ সকলেই নিরাপদে
দিলী হইতে নিষ্কান্ত হইয়াছে ।

শিবজী । সে অমৃত ভগদীশ্বরকে ধন্যবাদ
প্রদান করি । এখন আমার মন শান্ত হইল,
আমি আপনার পলারনের জন্ত তত ভাবি
না । গগনবিহারী পক্ষী সামান্ত পিজরে
বদ্ধ হইয়া থাকে না ।

তরলী । সেই সমস্ত অমৃতের দিলী হইতে
নিষ্কান্ত হইয়া গোবামীর বেশ ধরিয়া মথুরা
ও বৃন্দাবনে অবস্থিত করিতেছে, মথুরার
অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রভাহ
আপনাকে প্রীতীক্য করিতেছে । আমি দিলী
হইতে মথুরার পথ বিতম্বরূপে ছুটি করিয়া,
যে যে স্থানে লোক সন্নিবেশিত করিবার
আবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও করিয়াছি ।

শিবজী । চিরবন্ধ ! তুমি বেল্লপ কাব্য-
বন্ধ, অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে
বাইতে পারিব ।

তরলী । দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে
আপনি বেল্লপ একটি ভীষণগতি অবস্থাতে
বলিয়াছিলেন, তাহাও গাথায্য । যে দিন
স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত
থাকিবে ।

শিবজী । ভাল ।

তরলী । রাজা জয়সিংহের পুত্র রাম-
সিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাহার পিতা
আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন,
তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম । রামসিংহ
পিতার স্তায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনি-
য়াছি, স্বয়ং সম্রাটের নিকট বাইয়া আপনার
জন্ত সাধনরয়ে আবেদন করিয়াছিলেন ।

শিবজী । সম্রাট্ কি বলিলেন ?

তরলী । বলিলেন, সম্রাটের বাহা
কর্তব্য, তাহা করিবেন ।

শিবজী । বিশ্বাসঘাতক ! কপটচারী ! এখন
নও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে ।

তরলী । রামসিংহ সে বিষয়ে নিফল-
প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু হৃৎ সেরোবে
আমার নিকট বলিলেন যে, রাজপুত্রের
বাক্য অস্তথা হয় না । অৰ্ধ দ্বারা, সৈন্ত দ্বারা
বেল্পে পাবেন, তিনি আপনার সহায়তা
করিবেন, তাহাতে যদি তাহার প্রাণ যায়,
তাহাতে স্বীকৃত আছেন ।

শিবজী । পিতার উপযুক্ত পুত্র । কিন্তু
আমি তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহি না ।
আমি পলারনের যে উপায় উদ্ভাবন করি-
য়াছি, তাহা তুমি তাহাকে জানাইয়াছ ?

তরলী । জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনার সম্পূর্ণ
সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।

শিবজী। ভাল।

তরুণী। এঃরির দানেশমন্ প্রভৃতি
গবতীর আরংজীবের সহচরকে মিষ্ট কথা
বা অর্থ দ্বারা আপনার পক্ষবর্তী করিয়াছি।
দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান, একপ বড়লোক
কেহ নাই, বিনি আপনার পক্ষবর্তী নহেন।
কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ
করেন না।

শিবজী। তবে সমস্ত প্রস্তুত। আমি
আরোগ্যলাভ করিতে পারি?

সহাস্ত্রে তরুণী বলিলেন, “আমার ভায়
বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার
চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি
ধাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের
জন্ত মিষ্ট সুন্দর সরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম,
সমস্তটা নষ্ট করিলেন?”

শিবজী আর একপাত্র প্রস্তুত করিতে
বলিলেন। তরুণী সেই পাত্র লইয়া পুনরায়
সরবৎ প্রস্তুত করিলেন, শিবজী তাহা পান
করিয়া সহাস্ত্রে বলিলেন, “চিকিৎসক! আপ-
নার ঔষধ যেরূপ মিষ্ট, সেইরূপ ফলদায়ী।
আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে।”

শিবজীকে সম্বোধে আলিঙ্গন করিয়া
পুনরায় উকীষ ও আশ্রয় ধারণ করিয়া তরুণী
গৃহ হইতে নিস্ত্রান্ত হইলেন।

হারদেবে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,
“পীড়া কিরূপ দেখিলেন?”

হাকিম উত্তর করিলেন, “পীড়া অতিশয়
সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে
অনেক উপশম হইয়াছে। বোধ করি, অল্প-
দিনের মধ্যেই শিবজী এ রোগ হইতে সম্পূর্ণ
আরোগ্যলাভ করিবেন।”

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন।
একজন প্রহরী অন্ধকে বলিল, “হাকিম বড়
ভাল, এত বৈজ্ঞেবে পীড়া আরাম করিতে

পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম
করিলেন কিরূপে?”

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, “হবে না
কেম, এ বে রাজবাতির হাকিম।”

অফ্রাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—২:১—

আরোগ্য ।

এত দিন উত্তর কণেক শুভ হয়ে।

কহিতে পারিল পুনঃ প্রথম করিয়ে।

হে বীর, কবলচকে কর পরিহার।

অজ্ঞানের অপরাধ কবিবা শাসন।

কানীয়াস দান।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর
নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর
পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুন-
রায় ধুমধাম পড়িয়া গেল, সকলেই সেই কথা
কহিতে লাগিল। হিন্দুযাজেই এ কথা
শুনিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিল,
মহাশয় মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া
সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে,
মসজিদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল,
আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল। শিবজী
ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে
লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগি-
লেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট
করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না,
শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর
সমস্ত বড়লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগি-
লেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট
ভেট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি

সন্ধ্যাবে ও ককিরপণের সের্বার্থ প্রচুর পরি-
মাণে মিষ্টার পাঠাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যাটের
বনে বাহাই বাহুক, অস্ত্র সকলেই শিবজীর
এই বান্ধবতা শুধু সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া
তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। “দিল্লীর
লাজু” হুড়াহুড়ি চাইতে লাগিল, তাহাতে
আর কেহ পশ্চিমাছিলেন কি না, বলিতে
পারি না, কিন্তু আরওজীব অতি শীঘ্রই
পশ্চিমাছিলেন।

শিবজী কেবল মিষ্টার প্রেরণ করিয়া
সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টার ক্রম করাইয়া
নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড
প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নিৰ্মাণ করাইয়া অসং-
খ্যাত মিষ্টার লাজুইয়া প্রেরণ করিতেন। সে
আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ
হইত, আট কি দশ জন লোক বহিয়া লইয়া
বাইত। করে কদিন এইরূপে মিষ্টার বিতরিত
হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি
প্রকাণ্ড মিষ্টারের আধার শিবজীর গৃহ হইতে
বাহির হইল। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,
“এ কাহার বাচীতে বাইবে?” বাহকেরা
উত্তর করিল, “রাজা জয়সিংহসদনে।”

প্রহরিগণ। তোমাদের প্রভু আর কত
দিন মিষ্টার পাঠাইবেন?

বাহকেরা। অদ্যই শেষ।

মিষ্টারের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া
গেল।

কতক পথ বাইয়া বাহকেরা একটি অতি
সমোপন স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুই
আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে
চাচিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার
বায়ু রহিয়া রহিয়া বাইতেছে। বাহকেরা
একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হইতে
শিবজী, অপরটি হইতে শজুজী বাহির

হইলেন। উভয়ে অগদীশ্বরকে ধন্যবাদ
দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে হৃদবেশে দিল্লীর
প্রাচীরান্তিমুখে বাইলেন। সন্ধ্যার সময়
লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে দুই এক
জন লোক বন্ধন নিকট দিয়া বায়, শজুজীর
দ্বন্দ্ব ভরে ও উৎসেগে কলিত হইয়া উঠে।
শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদপূর্ণ, তাহার
পক্ষে এ বিপদ কিছু নূতন নহে, তথাপি
তাহার হৃদয় উৎসেগশূন্য ছিল না।

উভয়ে কলিত হইয়া প্রাচীর পার হইলেন।
একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, “কে বায়?”

শিবজী উত্তর করিলেন, “গোদাম্বী।
হরেনরায় হরেনরায় হরেনরায় কেবলম্।”

প্রহরী। কোথায় বাইতেছে?

শিবজী। মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ
নাভোব নাভোব নাভোব গণিগণ।

উভয়ে প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক মাঠ ও
উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে
সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শজুজী
অসংখ্য পথ অভিযাত্রা করিতে লাগিলেন।

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বদ্ধ
রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেই
দিকে বাইলেন, দেখিলেন, তরজী-বর্ণিত
অশ্বই বটে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই অশ্ব-
রক্ষক! তোমার নাম কি?”

রক্ষক। জানকীনাথ।

শিবজী। কোথায় বাইবে?

রক্ষক। মথুরা।

শিবজী বলিলেন, “হাঁ, এই অশ্ববটে।”

শিবজী অশ্বের আরোহণ করিলেন,
পশ্চাতে শজুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার
দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ
পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে পল্লী বা গ্রামের দিগ্না
নিকীক হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন।
আকাশে নীলকণ্ঠালি মিট মিট করিতেছে,
অন্ন অন্ন মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত
করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণকলেশবরা বমন।
প্রবলবেগে বহিরা যাইতেছে, পথ-ঘাট কর্দ্দম
বা জলপূর্ণ। শিবজী উবেগপূর্ণ-হৃদয়ে পলায়ন
করিতেছেন।

দূর হইতে অবেশের পদশব্দ শ্রুত হইল।
শিবজী কাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে
স্থানে বৃক বা কুটার নাই, অগত্যা পূর্ববৎ
গমন করিতে লাগিলেন।

তিন জন অসারোহী বেগে দিল্লী-অভি-
মুখে আসিতেছেন, তাঁহাদের কোষে
আসি। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে
পাইয়া তাঁহারা সেই দিকে অশ্ব প্রধাবিত
করিলেন। শিবজীর হৃদয় উবেগে ছরু
ছরু করিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া
একজন অসারোহী অজ্ঞান করিলেন,
“কে বাস?”

শিবজী। গোস্বামী।

অসারোহী। কোথা হইতে আসিতেছ?

শিবজী। দিল্লীনগরী হইতে।

অসারোহী। আমরা দিল্লীনগরীতে
বাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদের সঙ্গে
আসিয়া পথ দেখাইয়া দেও, পরে তুমি মথুরায়
বাইও।

শিবজীর মস্তকে বেন বজ্রাঘাত হইল।
দিল্লী বাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা
বলপ্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা
শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে, কেন না,
দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে, শিবজীকে
ঘেঁষে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে
সহস্র বিপদ! ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা
করিতে লাগিলেন।

একজন অসারোহী সমুখে আসিয়া
শিবজীর সহিত কথা করিয়াছিল, অপর দুই
জন অস্পষ্টভাবে পরামর্শ করিতেছিল। কি
পরামর্শ?

একজন বলিল, “এ বর আমি জানি,
আমি দক্ষিণদেশে সারোহী বাঁর অধীনে
অনেক দিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয়
বলিতেছি, পথিক গোস্বামী নহে।”

অপরজন বলিল, “তবে কে?”

প্রথম। আমি সন্দেহ করি, এ বর
শিবজী। দুই জন মহাবীর কণ্ঠস্থ গ্রিক এক-
রূপ হয় না।

দ্বিতীয়। দূর মুখ! শিবজী দিল্লীতে
বন্দী হইয়াছে।

প্রথম। সেইরূপ আমরাও মনে করিয়া-
ছিলাম যে, শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে,
সহসা একদিন রজনীযোগে পূনা ধ্বংস
করিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয়। ভাল, যুদ্ধের বর তুলিয়া
দেখিলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে।

সহসা একজন অসারোহী আসিয়া শিব-
জীর উকীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, শিবজী
তাঁহাকে চিনিলেন, তিনি সারোহী খাঁর
অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী।

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী
একাকী তিন জনকে হত করিবার চেষ্টা
করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মৃষ্টি-
আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময়
আর দুই জন অসিহস্তে নিকটে আসিয়া
শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন,
আবার বন্দী হইলেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া
আরজীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা
করিতেছিলেন। শত্রুজীর দিকে নয়ন পড়িল,
চক্ষু জলে আর্দ্র হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল। শিবজী দেখিলেন, একজন অস্বাভাবিক তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিন জন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিন জনই গত-জীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীনাথকে নিকটে ডাকিয়া জীবন-রক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

তখন সহস্রবার গোস্বামীর নিকট কমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?”

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জাহ্ন গাড়িয়া করবোড়ে বলিলেন, “রাজন! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবিলদার! জান হইয়া অবধি আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবন-কাল আপনার সেবা করিব, ইহা ভিন্ন অস্ত্র কামনা নাই, অস্ত্র পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।”

শিবজী চকিত হইয়া সেই বালক রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না; সজল-নরনে

রঘুনাথকে বন্ধে ধারণ করিয়া বলিলেন, “রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে বঞ্চিত নও দিরাছ। তোমাকে সনেহ করিয়াছিলাম, তোমার অবমাননা করিয়াছিলাম, অরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী বত দিন জীবিত থাকিবে, তোমার গুণ বিস্তৃত হইবে না, প্রণয় ও বক্তে যদি সে মহৎ গুণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে।”

শাস্ত্র নিস্তক রজনীতে উভয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনমুখে বিযুক্ত হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল, বালকের ক্রায় উভয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

উনত্রিশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

কি দারুণ বৃষ্টির ব্যথা।
সে দেশে বাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতের কথা।
সই। কে বলে পিরীত ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল।
ফুলবতী হইয়া ফুলে পাড়িয়া
বেধনী পিরীত করে।
তুংবের অদল যেন সাঝাইয়া
এবতি পুড়িয়া মরে।
হায় বিদোদিনি, এ দুঃখে দুঃখিনী,
প্রাণে ছল ছল অঁধি।
চতিদাস কহে, সে পতি হইয়া,
পরায় সংসার দেখি।
চতিদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরহু দেখিলেন,

হৃদয় শূন্য ! যে বদেষ্ট্র বোদ্ধাকে প্রথম দর্শন করিয়াই সরযু চকিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, বাঁহাকে কয়েক মাস অবধি সরযু হৃদয়ের বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, বাঁহাকে রত্ন জনার্দন বিবাহের বাক্যদান করিয়াছিলেন, সে রঘুনাতনের আদর্শে আজি সরযুর হৃদয় শূন্য !

সে দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযু হৃদয়ের ধন আর কিরিয়া পাইলেন না। অঙ্ককার নিম্নীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক্স-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর চইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। দিবসে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে সেই গবাক্স দিয়া পথ-পানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া রঘুনাতন আর আসিলেন না !

কখন বা অপরাহ্নে এককী সরযু আশ্রয়-কাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত ! তোরণ-দুর্গের কথা, কণ্ঠমালার কথা, রায়গড়ে আগমনের কথা, বিদায়ের কথা। নীরবে সরযুর গণ্ডস্থল দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু বহিত, কখন কখন রজনীতে সহসা হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হইত, ভাদ্রসাসের নদীর স্রাব শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণ ভরে কাঁদিতেন, আশ্রয় মন্দিরের দ্বারের স্রাব নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিল। রজনী-প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমাক্ষটী পূর্নদিকে দেখা দিত। বালিকা তখনও স্নোকে বিবশা হইয়া নুর্গত থাকিত !

প্রাতঃকালে পুষ্পচরন করিতে উঠানে বাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চরল করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি

চিন্তা করিতেন, কে বলিবে ? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন, পুষ্পমলগত প্রাতঃশিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু যিশাইয়া যাইত। সারংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন, আলা ! সে শোকের গীত শুনিয়া শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। এক্ষণ চিন্তায় ক্রমে সরযুর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাযেষ্টিত হইল। সরলস্বভাব জনার্দন এখনও সরযুর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া ব্যঙ্গপরোয়াস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অমূলসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযু অনেক যত্নে শোক সন্ধ্যাপন করিলেও তাঁহার সখী ও লাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু অজ্ঞান করিয়াছিল। তাহারা কথাম্বলে রত্ন জনার্দনকে বলিল, “সরযুর বয়স হইয়াছে, বিবাহ স্থির করুন।” সরযুর কানে এ কথা উঠিল। সরযু বলিয়া পাঠাইলেন, “পিতাকে বলিও, আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।”

জনার্দন সে কথা মানিলেন না, বিবাহের পাজ স্থির করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রো-হিত দ্বারা পালিত ভদ্র ক্ষত্রিয়কুলার পাত্রের অভাব ছিল না, অবশেষে রাজা জয়সিংহের একজন প্রধান সেনাপতির সহিত বিবাহ স্থির হইল। সরযুর কানে এ কথা উঠিল, সরযু শিহরিয়া উঠিলেন। লজ্জার মাথা খাইয়া পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “পিতাকে বলিও, তিনি অল্প একজন সেনা-নীকে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তিনিই

আমার বান্ধব পতি। অত কাগজও সহিত
বিবাহ হইলে ব্যক্তিগত-দোষ বাটবে।”

জনার্দন এ কথা শুনিয়া রুট হইলেন,
সরযুকে কতক তিরস্কার করিলেন, আবার
নিজের স্বপ্নে গিয়া মনের ভাষে কাদিলেন।
অবশেষে কস্তার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া
বিবাহের দিন স্থির করিলেন, জয়সিংহকে
জানাইলেন। সরযু তানে এ কথা উঠিল।
সরযু তখন নিজে পিতার পদে দৃষ্টিত হইয়া
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন, “পিতা,
কমা করুন, এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন, নচেৎ
আপনার চিরপালিতা এই অভাগিনী
কস্তাকে জন্মের মত হারাইবেন।” জনার্দন
কস্তাকে বুকে করিয়া কাদিতে লাগিলেন।

কিন্তু কস্তার কথা কে গ্রাহ্য করে, পাঁচ
জন ভদ্রলোকে যেরূপ পরামর্শ দেন, সমাজে
থাকিলে সেইরূপ কাজ করিতে হয়। বিবা-
হের দিন নিকটে আসিতে লাগিল, জনার্দন
অনেক বুঝাইলেন, অনেক কাদিলেন, অনেক
তিরস্কার করিলেন। অবশেষে আর সহ্য
করিতে না পারিয়া বিবাহের পূর্বদিন সর-
যুকে বলিলেন, “পাপীয়াসি, তোমার জন্ত কি
আমি এই বৃদ্ধবয়সে অবমানিত হইব? তুই
তোর পিতার নিকলক কুলে কলক দিবি?”

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ-নমনে সরযু উত্তর
করিলেন, “পিতঃ! আমি অবোধ, যদি
আপনার নিকট দোষ করিয়া থাকি,
মার্জনা করুন। কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায়
হউন, আমি হইতে আপনার অবমাননা
হইবে না।”

এ কথার অর্থ তখন জনার্দন বুঝিলেন
না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ
বুঝিতে পারিলেন। বিবাহের দিন কন্যাকে
কেহ দেখিতে পাইল না।

দ্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কুটারে।

হুগে হুগে বুলনা শব্দকাল ভাবে।
আধিনে আদিবেন এত দেবীর উৎসবে।
কার্তিক মাসেতে হইল হিমের একাধ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ ক'র বনবাস।

হুগুনারাম চক্রবর্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীর আলোকে
বেগবতী নীরানদী বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্য-
কিরণে জলের হিল্লোল হাস্ত করিতে করিতে
যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উত্তর পার্শ্বে
সুন্দর শতক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহি-
রাছে, কৃষকের পূজার যেন সমুদ্র হইয়া
যেদিন সে হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্ত করি-
তেছে। উত্তর ও পূর্বদিকে সেইরূপ শ্রামবর্ণ
ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হই-
তেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্বতরাশির পর
পর্বতরাশি বাল-সূর্য্যকিরণে অপক্লপ শোভা
ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্রামলক্ষেত্রবেষ্টিত এনটি
সুন্দর গ্রাম সন্নিবোধিত ছিল। গ্রামের এক
প্রান্তে একটি কৃষকের কুটারের নিকটে একটি
বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে
একজন দাসী দণ্ডারমান রহিয়াছে। কৃষক-
পত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই
বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটি গোলাঘর
রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটি গরু বাধা
রহিয়াছে, বাটার ভিতর তিন চারিখানি ঘর,
বাহিরে এনখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ
হয়, গৃহবাসী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে
একজন মাতঙ্গর লোক, ব্যবসা ও মহাজনী-
কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সন্তুষ্টবদীয়া ও ভ্রাম্যবর্ণা, চকল, প্রফুল্ল ও উজ্জলনয়না । একবার নদীকূলে সৌভাগ্যবশত করিতেছে, একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছে, তথায় ঘোড়াইয়া বাইতেছে, এক একবার দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে ।

বালিকা বলিল, “দিদি, আর না, কাপড়ের মত ঘাটে বাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরবে ।”

দাসী । হুঁ না দিদি, মা বারণ করেছেন, ঘাটে যেও না ।

বালিকা । মা টের পাবে না ।

দাসী । না, ছি । মা বা বারণ করেন, তা কর্ত্তে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে ?

বালিকা । আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয় ?

দাসী । হয় বৈ কি ।

বালিকা । না, সত্য ক’রে বল ।

দাসী । সত্যই মা হয় ।

বালিকা । না দিদি, তুই যে রাজপুত্রের মেয়ে, আমার ত রাজপুত্র নাই ।

দাসী বালিকাকে চুম্বন করিল ; বলিল, “তবে জিজ্ঞাসা কর কেন ?”

বালিকা । জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস্ কেন ?

দাসী । বিনি আমাকে খেতে পর্ত্তে দিতেছেন, যিনি আমাকে ধাক্কার স্থান দিচ্ছেন, বিনি আমাকে ঘেয়ের মত লালন-পালন করেন, তাঁকে মা বলব না ত কি বলব ? এ জগতে আমার অন্ত স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন ।

বালিকা । ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি ?

দাসী । না দিদি, কাঁদব কেন ?

বালিকা । তোর চাক জল দেখলে আমার চক্ষে জল আসে ।

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল, “তুমি যে আমাকে ভালবাস ।”

বালিকা । আর তুই আমাকে ভালবাসিস্ ?

দাসী । বাসি বৈ কি ।

বালিকা । বরাবর ভালবাসিব, কখনও আমাকে তুল্‌বিনি ?

দাসী । না । তুমি, দিদি, তুমি আমাকে ভালবাসবে, কখনও তুল্‌বে না ?

বালিকা । না ।

দাসী । হাঁ, তুমি আমাকে একদিন তুল্‌বে ।

বালিকা । কবে ?

দাসী । হবে তোমার বর আসবে ।

বালিকা । সে কবে ?

দাসী । আর তুই এক বৎসরের মধ্যেই ।

বালিকা । না দিদি, কখনও তোকে তুল্‌ব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভালবাসিব । আর তুই দিদি, তোর বর বর আসবে, তখন আমাকে তুল্‌বিনি ?

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, সে বলিল, “না, কখনও তুল্‌ব না ।”

বালিকা । বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাসিব ?

দাসী । হাত্ত করিয়া বলিল, “সমান সমান ।”

বালিকা । তোর বর কবে আসবে, দিদি ?

দাসী । ভগবান জানেন । ছাড়, রাত্রার বেলা হয়েচে, আমি বাই ।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাধিনী সরস্বালা জগতে আর স্থান না পাইয়া এক-জন কৃষকের বাগীতে দাসীস্বস্তি স্বীকার

করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, বহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহমূলক, নিরালস্য রাজপুতকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরালস্য ভদ্র রাজপুতকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার স্তায় লালন-পালন করিতেন, সরস্ব ও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, স্তত্রাং কৃষক ও কৃষকপুত্রের কার্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরস্বর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্তমানে যদি সরস্বর কোথাও স্নেহের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরলা গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরস্ব পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিরবিন্দ পরি-শ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটা ত্যাগ করিয়াছে। শেষে বে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ভালবাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্যে বা অস্ত্র কার্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরস্ব গৃহের সমস্ত কার্য নিৰ্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, “বাছা, তুমি ভদ্র-লোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।” সরস্ব স্নেহে উত্তর করিতেন, “মা, তুমি আমাকে যে বড় কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা

করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।” স্নেহবাক্যে সরল-স্বভাব বুদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন, “সরস্ব! বাছা, তোমার মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিই।” পুত্র অনেক দিন গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে কথা শ্রবণ করিয়া প্রাচীনা কণেক রোদন করিলেন।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহীর নিকট বসিয়া আছেন, একপুত্র সরস্ব বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন, “গৃহিণি, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।” গৃহিণী। আহা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পেয়েছ?”

গোকর্ণ। শীঘ্রই পাব। পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল, অস্ত্র শুনিলাম, শিবজী দুই বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন। আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবে।

গৃহিণী। আহা, ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় এক বৎসর হইল, বাছাকে না দেখিয়া যেমন কি অবস্থায় আছে, তা ভগবান্ই জানেন।

গোকর্ণ। ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবিলদারের অধীনে কাৰ্য্য করিত, রঘুনাথজীরও সংবাদ পাইয়াছি।

সরস্বর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উৎসেগে হাস রক্ত করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন, “বে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন, সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল, মনে আছে?”

সুখী । আমি বেরেমান্ব, আমার কি
অন্ত মনে থাকে ?

গোকর্ণ । পুত্র বলিয়াছিল, “সিতা,
আমি হাবিলদারকে চিনি, তাঁহার ভ্রাতৃ বীর
শিবজীর সৈন্তে আর নাই । কি প্রমে পতিত
হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,
পশ্চাৎ জানিবেন, তখন তিনি রঘুনাথের
গুণ জানিতে পারিবেন ।” পুত্রের কথা এত
দিনে সত্য হইল ।

সরযুর জ্বর উঠাসে, উষ্মেগে দ্রুত দ্রুত
করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক হইতে শ্বেদ-
বিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল ।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন, “রঘু-
নাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী
গিয়াছিলেন, আপন বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে
উদ্ধার করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আপন নিছো-
বিভা প্রমাণ করিয়াছেন । তুমি নিশ্চয়
শিবজী রঘুনাথের নিকট আপন মোবের
ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে জ্ঞাতা বলিয়া
আলিঙ্গন করিয়াছেন ; হাবিলদারের পদ
হইতে একেবারে পাঁচহাজারী করিয়া দিয়া-
ছেন । সহরে অস্ত্র কথা নাই, হাটে বাজারে
অস্ত্র কথা নাই, গ্রামে অস্ত্র কথা নাই, কেবল
রঘুনাথের বীরত্ব কথা শুনিয়া সকলে জয়
জয় নাদে ধনুর্বাদ দিতেছে ।”

আনন্দে, উল্লাসে, সরযু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন
করিয়া ঈষ্মুখিত হইয়া ঈষ্মুখিতে পতিত
হইলেন ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

—৪—

স্বপ্নদর্শন ।

বঁহু কি আর বলিব আমি ।

সরণে জীবনে জননে, জননে আপনাব হও ভূমি ।
ভোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিলাম প্রেবের কঁসী ।
সব সর্বাঙ্গী, একমন হইয়া, নিশ্চর হইলাম দাসী ।
ভাবিয়া দেখিলাম, এতিনতুথসে, আর কেহ মোর আছে ।
রাখা বলি কেহ সুখাইতে নাই ঈড়িয়া কাহার কাছে ।
একলে শুকলে গোহুতে দুহলে আপনার বলিবার কাহে ।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি কবল-পায় ।

চতুর্দশ ।

সেই দিন অবধি সরযুর আকৃতি কিরিল ।
বহুদিন পর আশা, আনন্দ ও উল্লাস আবার
সেই জ্বরে স্থান পাইল । নয়ন দুইটি আবার
হাসিল, গুঠ দুইটি আবার প্রস্ফুটিত পুষ্পের
ভ্রাতৃ পরিমল ধারণ করিল, ললাট ও হৃদয়
গণ্ডস্থলে আবার লবণা জুটিল, রেশম-বিনি-
মিত কেশগুলি আবার সেই সুন্দর, মধুর,
লাবণ্যময় মুখখানিকে লইয়া খেলা করিতে
লাগিল । প্রাতঃকালের স্নান সমাপনের
সহিত দ্রুতগত হইতে কোকিল-রব আসিলে
সরযু উদ্ভাসিত-জ্বরে সেই রব শুনিতে
অপরোহে গৃহকার্য সমাপন করিয়া নদীকূলে
দণ্ডায়মান হইয়া নয়ন দুইটি সূর্য্য-উত্থাপ
হইতে হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়া নদীর অপার
পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিতেন ।
আবার সন্ধ্যার সময় ঘুরে বংশীধ্বনি হইলে
চকিত যুগের ভ্রাতৃ সহসা চমকিয়া উঠিতেন ।

গোকর্ণের কথা পর্য্যন্ত সরযুর এই পরি-
বর্তন দেখিতে পাইল । একদিন সন্ধ্যার সময়
নদীর ঘাটে বাইবার সময় কস্তা দিচ্চা
করিল, “মিদি, দিন দিন তোমার রূপ কেমন
হুটে বেরুচ্ছে ।”

সরযু । কে বলে ?

বালিকা। বলবে কে? আমি বুঝি দেখতে পাই না?

সরসু। না, ও তোমার দেখবার ভুল।

বালিকা। হাঁ, ভুল বৈ কি? আর আগে বাথার কিছু থাকত না, এখন মধ্যে মধ্যে চুলের ভিতর ভুল বৌজা হয়, তা বুঝি দেখতে পাই না?

সরসু। দূর।

বালিকা। আর লুকিয়ে লুকিয়ে গলার একটি কর্ণমালা পরা হয়, তাতে ছুটা ক'রে মুক্তা, একটি ক'রে পলা, তা বুঝি আমি দেখতে পাই না?

সরসু। দূর।

বালিকা। আর নদীর তীরে অনেকক্ষণ ধরে স্নানর মুখখানি জলে দেখা হয়, তা বুঝি আমি দেখি না?

সরসু। মিথ্যাকথা বলো না।

বালিকা। আর গাছতলার নুকিরে মধ্যে মধ্যে কুহু করে গান করা হয়, তা বুঝি আমি শুনি না?

সরসু। এবার আসিয়া বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিল।

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমি এ সব কথা থাকে বলে দিব।”

সরসু। না দিদি, তোমার পারে পড়ি, বলো না।

বালিকা। তবে একটা কথা লিজাসা করি, বলিবে?

সরসু। বল্‌ব।

বালিকা। এর অর্থ কি? এ পুষ্প, এ কর্ণমালা, এ গীত কার জন্ত? তোর চক্ষু ছুটা যে সম্রাট হাসছে, তোর গুট ছুটা যে রক্তে কেটে পড়ছে, তোর সমস্ত শরীর যে লাষণে ঢল ঢল করছে, এ কার জন্ত?

সরসু। তোমার যা তোমার বৌশা বেঁধে দেন, পহনা পরিচর্যে দেন, সে কার জন্ত?

বালিকা এবার একটু লজ্জিত হইল; বলিল, “যা বলেছেন, অসম্মান বৎসর আমার বিবাহ হবে, আমার বর আসিবে।”

সরসু। আমারও বর আসিবে।

বালিকা। সত্য?

সরসুর সহিত বালিকার কথা হইতেছিল, একপ সমর একজন দীর্ঘায়র সন্ন্যাসী “হর হর মহাদেও” শব্দ উচ্চারণ করিয়া মদীতীরে উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসীর স্মিত আলোকে তাঁহার বিভূতি-ভূষিত দীর্ঘ শরীর বড় সুন্দর দেখাইল। বালিকা ভয়ে পলায়ন করিল। সরসু তাঁহুদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী সীতাপতি গোস্বামী।

সরসুর স্বপ্নর সহসা কল্পিত হইল, মনের আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সরসু সে আবেগ সংযম করিয়া লজ্জা বা ভয় তাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া স্থিরভাবে বলিলেন, “প্রভু, আপনি যে অভাগিনীকে এক দিন জনার্দ্রনের প্রদর্শনে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে অত্র এই কটীবে দাসীকার্যে নিযুক্ত দেখিতেছেন। পিতা কলঙ্কিনী বলিয়া আমাকে দূরীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান জানেন, আমি বাগ্‌দত্ত পতির অশুচারিণী, ইহা ভিন্ন আমার অত্র দোষ নাই।”

সন্ন্যাসীর নয়ন জলে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন, “রঘুনাথের জন্ত এত কষ্ট সহ করিয়াছ?”

সরসু। নারী বৎ দিন পতির নাম জপিতে পারে, তত দিন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না।

সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থল ক্ষীত হইতে লাগিল।

সরযু আবার বলিলেন, “প্রভুর সহিত কি সেই দেবপুত্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?”

গোস্বামী । হইয়াছিল ।

সরযু । প্রভু তাঁহাকে বাসীর কথা জানাইয়াছিলেন ?

গোস্বামী । জানাইয়াছিলাম ।

সরযু । কি জানাইয়াছিলেন ?

গোস্বামী । আপনার একটি বাক্য, একটি অক্ষরও বিস্মৃত হই নাই । আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, “সরযু রাজপুত্রবাণী, জীবন অপেক্ষা বশ অধিক জ্ঞান করে । সরযু যত দিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই বশোগীত গাইবে ।”

সরযু । ভাল ।

গোস্বামী । আমি তাঁহাকে আরও জানাইয়াছিলাম, যদি কর্তব্য-সাধনে তাঁহার প্রাণবিরোগ হয়, সরযু তাঁহার বশোগীত গাহিতে গাহিতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিবে ।

সরযু । ভাল ।

গোস্বামী । আমি আরও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, সরযু তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্যে প্রার্থনাকরিবে না । রঘুনাথ অসিহস্তে বশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন ।

উবেগ-গদগদস্বরে সরযু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন ?”

অলস-স্বরে গোস্বামী উত্তর করিলেন, “রঘুনাথ উত্তর দান করেন নাই, কেবল আপনার কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অসাধাসাধন করিয়াছেন, অসিহস্তে বশের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন ।”

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গোস্বামীর নরন-ধক ধক করিয়া জলিতেছিল, সেই নদীতীরে

ও বৃক্ষমধ্যে গোস্বামীর অলস বাক্যগুলি বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ।

“যিনি জগতের আদিপুরুষ, তাঁহাকে প্রণাম করি এই বলিয়া সরযুবালা আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া ষোড়শকোণে প্রণাম করিলেন । গোস্বামীও জগতের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন ।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিমন্ত হইয়া রহিলেন, সন্ধ্যার সুশীতল সমীরণে উভয়ের শরীর শীতল হইল, নগনের জল শুকাইয়া গেল ।

অনেকক্ষণ পর গোস্বামী কহিলেন, “দেবতার প্রসাদে কার্য্যসিদ্ধি করিবার পর রঘুনাথ একটি কথা আমার দ্বারা আপনার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন ।”

সরযু উৎকর্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি ?”

গোস্বামী । তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতদিন সরযু তাঁহার দাসকে মনে রাখিবেন ? আমি বাইলে সরযু আমাকে চিনিতে পারিবেন ?

সরযু । এ জীবনে কি আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি ?

গোস্বামী । আপনার ভালবাসা তিনি জানেন, তথাপি নারীর মন সর্বদাই চপল, কি জানি, বার ভুলিয়া গিয়া থাকেন ।

গোস্বামীর চপল ও দ্বৈব হস্ত দেখিয়া সরযু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, “নারীর মন চপল, তাহা আমি জানিতাম না ।”

গোস্বামী । আমিও জানিতাম না, কিন্তু অদ্য দেখিতেছি ।

সরযু । কিসে দেখিলেন ?

গোস্বামী । যিনি আমার বাস্তুতা বধু, তিনি আমাকে অস্ত ভুলিয়াছেন, দেখিয়াও আমাকে চিনিতে পারেন নাই ।

সরযু। সে কোন্ হস্তভাগিনী ?

গোপাধ্যায়ী। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহাকে তোরণভূগর্ভে জনার্কনের গৃহের ছায়ে প্রথম দর্শন করিয়া আমি মন-প্রাণ হারাইয়া-ছিলাম। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার কণ্ঠে একদিন মুক্তমালা পরাইয়া দিয়া আমি জীবন চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যিনি তোরণভূগর্ভে জয়সিংহের শিবিরে, যুদ্ধের সময় ও সন্ধির সময়, সর্বদাই আমার নয়নের মণির স্তায় ছিলেন। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার দর্শন আমার নয়নে সুখ্যালোক, যাহার শব্দ আমার কর্ণে সংগীত, যাহার স্পর্শ আমার শরীরে চন্দন-প্রলেপ, যাহার প্রীতি আমার জীবনের জীবন ! তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাহার নাম স্মরণ করিয়া, যাহার জলন্ত উৎসাহবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আমি দিল্লীযাত্রা করিয়া-ছিলাম, যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছি, জলন্ত বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। বহদিন পর, বহু বিপদ পার হইয়া, অল্প সেই ভাগ্যবতীর চরণোপাঙ্গে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কি আজ আমাকে চিনিতে পারিবেন ?

সেই কোকিল-বিনিম্বিত স্বর সরযুর হৃদয় মহন করিল, তারকালোকে ছন্নবেশ-ধারী সেই দীর্ঘকায় পুরুষশ্রেষ্ঠকে সরযু চিনিতে পারিলেন। সরযু হৃদয়ের আবেগ আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘুরিতেছিল, নয়ন মুদিত হইয়াছিল। “রঘুনাথ ! ক্ষমা কর।”—এইমাত্র কহিয়া সরযু রঘুনাথের দিকে হস্তপ্রসারণ করিলেন। পতনোন্মুখ প্রিয় দেহ রঘুনাথ নিজ অঙ্গে ধারণ করিলেন, সেই উষ্মগর্ভ হৃদয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিলেন।

কণেক পর চৈতন্ত-লাভ করিয়া সরযু নয়ন উদ্বীলিত করিলেন। কি দেখিলেন ?

হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া-ছেন, চির-প্রার্থিত পতি আজ সরযুবালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন।

বহদিন পর আজ সরযুর তপ্ত হৃদয় রঘুনাথের প্রশান্ত হৃদয়-স্পর্শে শীতল হইল ; সরযুর ঘনশ্বাস রঘুনাথের নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, সরযুর কম্পিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় জীবনের মধ্যে প্রথমবার রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

সে সংস্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। সেই প্রিয় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে, সেই বারংবার ঘন চুষনে বালিকা কাঁপিতে লাগিল।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন ?

বায়ুতাড়িত পত্রের স্তায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন, “জগদী-শ্বর ! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন হৃথনিদ্রা হইতে কখনও না জাগ্রিত হই।”

— — —

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

— — —

জীবন-নির্ব্বাণ ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুভহ রাজন ।

যথা ধর্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন ।

ধর্ম অহুসারে জয় ইশ্বর-বচন ।

কাশীনাথ দাস ।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল। শিবজী প্রত্যাভর্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরঞ্জীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, রেজিদিগকে বেষ্টন হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

একদা রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের

নিকট মহারাজার জন্ত যে আবেদন করেছিলেন, তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার সৈন্তসমেন্ত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের জন্ত কোনও উপায় নাই। তখন তিনি বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আরংজীবের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অমুচরের দ্বারা কার্য্য করিলেন; আরংজীব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহম্মদের জন্তও সম্রাটের কার্য্যে উদ্যত প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে ভাগ্য করিয়া বাইতে হইবে, তখন পর্য্যন্ত বড় দূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতার কার্য্য চেষ্টা করিলেন। লৌহগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তত্ত্বির যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন, যেন আর শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে একরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই। জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব বৎসরোনাশি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্ত তাঁহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতি হইতে অপমৃত করিয়া দিল্লীতে তলব করিলেন; যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, শেষদশায় এ অবমাননার তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পূর্বেই মৃত্যুশয্যা শায়িত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত, বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যা শায়িত রহিয়াছেন, একরূপ সময় একজন বৃত্ত সংবাদ দিলেন, “মহারাজ, একজন মহারাষ্ট্র-সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী, তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া একদিন

উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একবার উপদেশ পাইবার জন্ত আসিয়াছেন।”

রাজা উত্তর করিলেন, “সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইন। যে মহাপুরুষ আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি। তিনি আমুন, আমি তাঁহাকে নির্ভর মিটেছি।”

কণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, “মুহম্মদ শিবজী, মৃত্যুর পূর্বে আর একবার আপনার সন্ধিত দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উত্তীর্ণ অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না।”

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, “পিতঃ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইরাছিলাম, তখন আপনাকে এত শীঘ্র একরূপ অবস্থার দেখিব, কখনও মনে করি নাই।”

জয়সিংহ। রাজনু! মুহম্মদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিষয় কি? শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলেন, এখন কি দেখিতেছেন?

শিবজী। মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থার দেখিতেছি, তখন মোগলসাম্রাজ্যের আর আশা নাই।

জয়সিংহ। বৎস! তাহা নহে। রাজ-স্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে সন্ত জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের দ্বার শত বোদ্ধা এখনও বর্ডমান আছেন। মাদুশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

শিবজী। আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের আর অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?

জয়সিংহ। শিবজী! একজন বোদ্ধা

বাইলে অল্প বোঝা হয়, কিন্তু পাণ বে
করনাথন করে, তাহার পুনঃসংস্কার হয় না।
আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, তথায় পাণ ও
কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও বৃত্ত্য।
একণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।

শিবজী। নিবেদন করুন।

জয়সিংহ। যখন আপনাকে আমি দিল্লী
পাঠাইয়াছিলাম, তখন আপনার ক্রম ও
দিল্লীখরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, আপ-
নার স্থির-সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীখর বস্ত দিন আপ-
নাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন
বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার
প্রতি সন্মোচন করিলে, সম্রাটের দক্ষিণদেশে
একজন পরাক্রান্ত বহু থাকিত, কপটাচরণ-
বশতঃ সেই স্থানে একজন দুর্ব্বলীয় শত্রু
হইয়াছে।

শিবজী। মহারাজ! আপনার বুদ্ধি
অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, অগতে সকলে বখা-
বাই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।

জয়সিংহ। আমি আরাজীবের পিতার
সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি।
বিপদে, যুদ্ধসময়ে, বতহর সাধ্য, দিল্লীখরের
উপকার করিয়াছি। স্বজাতি বিজ্ঞাতি
বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা
করি নাই, বাহার কার্য্যে ত্রুটি হইয়াছি,
জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করি-
য়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট্ আমায় প্রতি
প্রথমে অসন্মোচন করিলেন, পরে অবমাননা
করিলেন। তথাপি ঈশ্বরের আশায়
কার্য্যে বৈলক্ষ্য্য ঘটে নাই, আমি যে সমস্ত
সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া বাইলাম,
শিবজী, তাহারা বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ
হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে
আরাজীব স্বয়ং কতিপয় হইলেন। অপর-
াখের দিল্লীখরের চিরবিষম অস্থির ও সহায়,

অধরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু
হইবে।

শিবজী। আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়া-
ছেন। আরাজীব আপন অনবচিত্রণে
অধর ও মহারাষ্ট্র এই দুইটি দেশকে তাঁহার
শত্রু করিয়াছেন।

জয়সিংহ। দুইটি উদাহরণ দিলাম,
মহারাষ্ট্রদেশ ও অধরদেশ। সমস্ত ভারত-
বর্ষ এইরূপ। শিবজী। আরাজীব সমস্ত
ভারতবর্ষের বিধিত অস্থিরের অবমাননা
করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন।
বারাণসী-মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মসজিদ
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে হিন্দুদিগের
অবমাননা করিতেছেন, সমস্ত দেশ হিন্দু-
দিগের উপর জিজিয়া স্থাপন
করিতেছেন।

কণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া জয়-
সিংহ অতি গভীরভাবে পুনরায় কহিতে
লাগিলেন, যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিবা
চক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ
দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,
“শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই
কপটাচারিতার চারিদিকে যুদ্ধানল প্রজলিত
হইল, রাজস্থানে অনল জলিল, মহারাষ্ট্রদেশে
অনল জলিল, পূর্বাধিকে অনল জলিল।
আরাজীব বিংশতি বৎসর বৃত্ত করিয়া সে
অনল নির্মাণ করিতে পারিলেন না।
তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল,
তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধ-
বয়সে পশ্চাত্তাপ করিয়া দিল্লীখর প্রাণত্যাগ
করিলেন। অনল আরও প্রবলবেগে জলি-
তেছে, চারিদিক হইতে ধূ ধূ শব্দে আগ্রসর
হইতেছে, সেই অনলে যোগল-সাম্রাজ্য দগ্ধ
হইয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর,
মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্র-র

৭। অগ্রসর হও, দিল্লীর শূত্র সিংহাসনে
উপবেশন কর ।”

রাজার বচনরোধ হইল। চিকিৎসা-
করা পার্বে ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ
সন্দেহ করিতে লাগিলেন, গোপনে অস্ত্র-
ধরে রোগের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে
লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর যুদ্ধের জরসিংহ বলি-
লেন, “কপটাচারী আপনাকেই শান্তিদান
করে, সত্যমেব জয়তি ।”

ধার্মরোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ বহি-
র্গত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ।

ধর্ম্মের আছে বড়, রাজ শীত্র করি
চতুরকে রণরঙ্গে ভুলিব এ আলা—
এ বিবদ আলা যদি পারি রে ভুলিতে ।

বধুস্বদন দত্ত ।

রজনী এক প্রহর যাত্র আছে, এরূপ
সময়ে শিবজী রাজপুত্র-শিবির ত্যাগ করি-
লেন। প্রাতঃকালের পূর্বেই প্রধান প্রধান
সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন,
কণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের
বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্ত
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ! প্রায় এক
বৎসর হইল, আমরা আরঞ্জীবেব সহিত
সন্ধিস্থাপন করিতেছিলাম, আরঞ্জীবেব
নিজের দোষে ও কপটাচারিতার সে সন্ধি-
খণ্ডন হইয়াছে। অতঃপর আমরা সে কপট
আচরণের প্রতিশোধ দিব, মুসলমানদিগের
সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

যিনি আরঞ্জীবেব প্রধান সেনাপতি
ছিলেন, ঈশানীদেবী বাহার সহিত যুদ্ধ-
নিবেধ করিয়াছিলেন, বাহার নিকট শিবজী
বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কল্যা
নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জরসিংহ আর-
ঞ্জীবেব অসদাচরণে প্রাণবিসর্জন করিয়া-
ছেন। সৈন্তগণ! দিল্লীতে আমার কারা-
রোধ, হিন্দুপ্রবর জরসিংহের যত্ন, এ সমস্ত
একণে আমরা পরিশোধ করিব।

যুদ্ধাশ্রয় রাজা জরসিংহের দিবাচকু
উন্নীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন,
যোগলদিগের ভাগ্যানকজ অবনতিশীল,
মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যানকজ উন্নতিশীল,
দিল্লীর সিংহাসন দরার শূত্র। বন্ধুগণ!
অগ্রসর হও, পৃথ্বীর সিংহাসন আমরা
অধিকার করিব।

“পূর্বদিকে রক্তমাছটা দেখতে পাই-
তেছ, ও প্রভাতের রক্তমাছটা। কিন্তু
উঃ! আমাদের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে—
মহারাষ্ট্রগণ! অতঃপর আমাদের জীবন-
প্রভাত।”

সমস্ত সেনানী ও সৈন্তগণ এই মহৎ বাক্য
শুনিয়া গজিয়া উঠিল, “অতঃপর আমাদের
জীবন-প্রভাত।”

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ :

বিচার ।

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত ।

কাশীনাথ দাস ।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী
নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন। আপ-

নার পদোন্নতি, সন্তান সহিত পুনর্জন্ম, মূলমানবিশেষের সন্তান পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দু-বিশ্বের ভাবী স্বাধীনতা, এরূপ নতুন নতুন বিষয়ের চিন্তার তাঁহার হৃদয় উৎক্ল হইতেছিল। সহসা পক্ষাৎ হইতে একজন ডাকিলেন, “রঘুনাথ।”

রঘুনাথ পক্ষাদিকে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রাও জুলাদার। রোবে তাঁহার শরীর কাপিতেছিল, কিন্তু ঈশানী-মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিশ্বস্ত হন নাই।

চন্দ্রাও বলিলেন, “রঘুনাথ। এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই। একজন মরিব।”

রঘুনাথ রোব সংবরণ করিয়া ধীরস্থরে বলিলেন, “চন্দ্রাও। কপটাচারী মিত্র-হস্তা চন্দ্রাও। তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরচ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে কমা করিলেন, জগদীশ্বরের নিকট কমা প্রার্থনা কর।”

চন্দ্রাও। বালকের কমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন। জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাতে আমি বিশ্ব-চক্রে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশভাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অপমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি। চন্দ্রাওয়ের জীবন জিহাংলা তাহাতে কিয়ৎ-পরিমাণে শাস্ত হইয়াছিল। তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত-পদ লাভ করিয়া দৈন্ত-মধ্যে আসিয়াছ। চন্দ্রাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা

জীবনে কখন নিফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অস্ত উপায় ভাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব, ক্লমের শোণিতপান করিয়া এ জীবন পিপাসা নির্দ্রাণ করিব। ভীক! অস্ত আমার হস্তে রক্ষা নাই।

রোবে রঘুনাথের নয়ন অস্বাভাবিক জলিতে-ছিল, কণ্ঠস্থবরে বলিলেন, “পামর! সমুদ্র হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্ত হইব, তোর পাণের দণ্ড দিব।”

চন্দ্রাও। ভীক! এখনও যুদ্ধে পরাধুত? তবে আরও শোন। উজ্জয়িনী যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় আঘাত হইয়াছিল, সে শত্রুনিষ্কিপ্ত নহে, চন্দ্রাও তোর গির্জা-হস্তা।

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোবে অসি নিক্ষেপিত করিয়া চন্দ্রাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রাও ক্ষীণহস্তে অসিধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের-চাল ক্ষত হইল, শরীরও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার স্থায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত-বহিতে লাগিল। চন্দ্রাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি চন্দ্রাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে জাহ্নবীপন করিলেন, পরে বলিলেন, “পামর! অস্ত তোর পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হইল, পিতার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।”

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্রাও নিষ্ঠুর, তিনি বিকট হাস্ত হাসিয়া বলিলেন, “আর তোর ভগিনী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া স্মৃতে প্রাণবিসর্জন করিব।”

বিদ্যাতের স্তার সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল। এই অল্প লক্ষী বামীর নাম করে নাই, এ অল্প চন্দ্রাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতৃ-হত্যা রক্তপিণ্ড চন্দ্রাও বলপূর্ব্বক প্রাপের লক্ষ্যকে বিবাহ করিয়াছে। রোবে রঘুনাথের নরন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার উন্নত অসি চন্দ্রাওয়ের ক্রমে স্থাপিত হইল না। তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উভয় যোদ্ধা পরস্পরের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া রোবে প্রজ্জ্বলিত হত্যাসনের স্তার দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চন্দ্রাও অসিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধূলি ও কর্দমে ধূসরিত হইয়া বিকট অনুরের স্তার আরক্ত-নরনে রঘুনাথের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুনাথ পিতার হত্যা-কথা ও ভগিনীর অবমাননা-কথা শ্রবণ করিয়া রোবে, অভিমান ও জিহ্বাসার বিদগ্ধচেতা, অথচ শান্তিদানে অপারগ হইয়া চিত্তাৰ্পিত বৃদ্ধহস্তার স্তার দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সহসা একজন যোদ্ধা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উভয়ে সভয়ে দেখিলেন—শিবজী!

শিবজী কোন কথা কহিলেন না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, আপনার সহচর চারিজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই চারিজন সৈনিক নিম্নে চন্দ্রাওয়ের নিকট আসিয়া তাহার হস্ত হইতে অসি ও চৰ্ম্ম কাড়িয়া লইয়া, তাহার হস্তের পশ্চাতে বদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল। শিবজী অদ্ভুত হইলেন, রঘুনাথ চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

পরদিন প্রাতে চন্দ্রাওয়ের বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে

কলা আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে। রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণের পূর্বে শত্রু রহমৎ খাঁকে চন্দ্রাওই সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অন্য তাহারই বিচার।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আকপান সেনাপতি রহমৎ খাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎ খাঁ বাবীমতা-প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের মুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ বখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন, তখন রহমৎ খাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপনার শিবিরে আনাইয়া অনেক বহু ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আশ্রয় হইল না, তাহাতেই রহমৎ খাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎ খাঁকে বলিলেন, “খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরামাশ্রয় নাই, আমার সমস্ত বৃত্ত ও চিকিৎসা বুধা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।”

রহমৎ খাঁ বলিলেন, “আমার মরণের জন্ত আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি বৈরূপ সদাচরণ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন, আপনার নিকট আমার অবজ্ঞা কিছুই নাই।”

জয়সিংহ। রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল। সে কে, আমরা জানি না, আমার বোধ হয়, একজন অস্তায়রূপে দণ্ডিত হইয়াছে।

রহস্য। আমি জীবিত থাকিতে সে নাথ প্রকাশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজপুত্র! আপনার উদ্ভাটনগে আমি অতিশয় সন্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।

জরসিংহ। যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোন নিদর্শন থাকে, তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহস্য। প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করিবেন না?

জরসিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন রহস্য ঐ তাহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন। রহস্যের মৃত্যুর পরে রাজা জরসিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্রাও।

চন্দ্রাও রহস্য ঐকে সহস্রলিখিত, পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সময়ে সত্যতঃ যে যে কাগজ ছিল, তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্রাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাঠাইয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত রাজা জরসিংহ দেখিলেন। জরসিংহের মৃত্যুর দিনে তাহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারকার্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিষমস্ত্র মন্ত্রী রঘুনাথ নারশাহী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন পাঠ সমাধা হইল, তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রাও বিদ্রোহী, অসং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী নিকলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাঠাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন, “পাণাচারী বিদ্রোহী; তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে?”

মৃত্যুসময়েও চন্দ্রাও নির্ভীক, তাহার দুর্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ববৎ। বলিলেন, “আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার-কমতা প্রশংসা। একদিন এ দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর একজনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন, চন্দ্রাও এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ জাল।”

এই বিজ্ঞপ্তি শিবজী স্তব্ধ জুড় হইয়া আদেশ করিলেন,—“জ্ঞাদ, চন্দ্রাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর, তাহা হইলে আর ঘৃণা লইতে পারিবে না। তাহার পর তত্ত্ব লৌহ দ্বারা ললাটে ‘বিশ্বাসঘাতক’ অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।”

জ্ঞাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে বাইতেছিল, এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডারমান হইয়া কহিলেন,—“মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।”

শিবজী। রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমার অবশ্য শুনিব; কেন না, এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য। আমি এই প্রতিহিংসা যাক্ষা করি যে, চন্দ্রাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে,—অনুগ্রহ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্তি দিন।

সত্যতঃ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ।

শিবজী ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, “তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল,

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতি ।

তোমার অহুরোধে এই চক্রাণ্ডকে কমা করিলাম । রাজবিজ্ঞোহাচরণের শান্তি দিবার অধিকারী রাজা । সে শান্তির আদেশ করি-
রাছি, অন্নাদ, আপন কার্য্য কর ।”

রঘুনাথ । মহারাষ্ট্রের বিচার অনিশ্চয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চক্রাণ্ডকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন ।

শিবজী । এ ভিক্ষাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ, তোমাকে এবার কমা করিলাম, অত্ৰকে এতদূর কমা করিতাম না । শিবজীর আদেশের উপর কথা কহিও না ।

রঘুনাথ । প্রভু, দুই একটি মুহুর্তে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন । অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চক্রাণ্ডকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন ।

গোবে শিবজীর নয়ন হইতে অশ্রুপা-
বাহির হইতেছিল ; গর্জন করিয়া বলিলেন,
“রঘুনাথ ! রঘুনাথ ! কখন কখন আমাদের
উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আশা-
দিগের বিচার অত্থা করিতে চাহ ? রাজ-
আদেশ অত্থা হয় না ; তুমিও আপনার
বীরত্বের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও ।”

এ তিরস্কার-বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত
হইয়া উঠিল । তিনি ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে
উত্তর করিলেন, “প্রভু ! পুরস্কার চাহা
দাসের অভ্যাস নাই । অদ্য জীবনের যথো
প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি । প্রভু যদি এ
পুরস্কারদানে অসম্মত হইবেন, এ দাস দ্বিতী-
বার চাহিবে না । দাসের কেবল এইমাত্র
ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায়
দিন । রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে,
পুনরায় গোস্থানী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা
করিতে থাকিবে ।”

শিবজী কণেক নিমন্ত্রণ ও নিষ্পদ হইয়া

রহিলেন । তখন একজন অসহায় নিকটে
আনিয়া কানে কানে জানাইল, চক্রাণ্ড রঘু-
নাথের ভগিনীপতি, সেই ভ্রত রঘুনাথ
ভগিনীপতির প্রাণতিকা করিতেছেন ।

তখন বিষয়পূর্ণ হইয়া শিবজী চক্রাণ্ডকে
খালাস দিবার আদেশ করিলেন । শেষে
বজ্রনাথে বলিলেন, “যাও চক্রাণ্ড, শিব-
জীর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হও । অত্থ দেশে
যাও, অত্থ আজীবন-কষ্টকে বধ কর, অত্থ
মিত্রের সর্বনাশ-সাধন কর, শত্রুর নিকটে
উৎকোচ গ্রহণ, বড়বর ও বিজ্ঞোহাচরণ
করিতে করিতে পাণজীবনের অবশিষ্ট ভাগ
সমাপ্ত কর ।”

চক্রাণ্ড ভীক নহেন । ধীরে ধীরে
ক্রোধ-জর্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট
হাইয়া বলিলেন,—“বালক ! তোর দয়া
আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি
তুচ্ছ করি ।” পরক্ষণেই আপন ছুরিকা নিজ
বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমাত্রী জীবন-
প্রতিজ্ঞা চক্রাণ্ড জুহুলাদার আপনার চির-
নিষ্কৃতি-সাধন করিলেন । জীবনশূন্ত দেহ
সভাস্থলে পতিত হইল ।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভ্রাতা ভগিনী ।

হৃত পরিবার,
কেবা বল কার,
যেমন বৃক্ষের ছায়া ।
জলবিধ-প্রায়,
সকল মিছাময়,
কেবল ভবের মায়া ।

কুতিবাস ভবা ।

আমাদের আধ্যাত্মিক । শেষ হইয়াছে ;
একধে উপস্থান-লিখিত ব্যক্তিদগের বিবরণ
দুই একটি কথা বলিয়া বিদায় লইব ।

বুড় জনাৰ্ধন পানিত-কন্ডাকে হারাইয়া বাতুলের স্থায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সর-
যুকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগি-
লেন। তিনি পুনরিত-জনমের রঘুনাথকে
আহ্বান করিলেন, সানন্দজনমের শুভদিনে
কঙ্কাদান করিলেন, সরযুর স্নেহ কে বর্ণনা
করিবে? চারি বৎসর বে দেবকান্তির লপ
করিয়াছিলেন, সেই পুত্রবদেব যখন সরযুকে
কোমল জনমের ধারণ করিলেন, সরযুর ওঠে
উঠ ওঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযু উন্মা-
দিনী হইলেন।

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে
বস্তু দেখিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইল। সেই
প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযুর জনমের দোলা-
ইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিমিত দেহ জনমের
ধারণ করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণ নয়নের
দিকে চাহিয়া চাহিয়া অগৎ-বিস্তৃত হইলেন।

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া “দিদি”কে
বিস্তৃত হইলেন না। রঘুনাথের অল্পরোধে
শিবজী গোক্ষণকে একটি জারগীর দান করি-
লেন ও গোক্ষণের পুত্র ভীমজীকে উন্নীত
করিয়া হাবিলদার-পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদির সর্বদাই আপন গৃহে
রাখিতেন ও বরের সহিত “সমান সমান”
ভাণ্ডাবাসিতেন, এবং কয়েক বৎসর পরে
একটি সঙ্গীতের সূত্রের পাঞ্জ দেখিয়া দিদির
বিবাহ দিলেন। বিবাহদিবসে সরযু ও রঘু-
নাথ খয়ং উপস্থিত রহিলেন। সরযু কন্ডার
কানে কানে বলিলেন,—“দেখিও দিদি।
বাহা বলিয়াছিলে, সে কথা যবে রাখিত,
বরের চেয়ে আমাকে ভালবাসিত।”

রঘুনাথ আধ্যাতিকাবিসৃত সময়ের পর
জন্মোৎসব পর্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের
সহিত শিবজীর অধীনে কাৰ্য্য করিতে লাগি-
লেন। রমেশচন্দ্র সিংহ যখন জানিতে পারি-

লেন যে, রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অল্পচর গজ-
পতি সিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে বদলে
আহ্বান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে
দেশে বাইতে দিলেন না, বত দিন জীবিত
ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে
যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দের চৈত্র মাসে শিবজীর
মৃত্যু হইল, তখন শিবজীর অযোগ্য পুত্র শত্ৰুজী
পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে
অপমানিত বা কারকরূপ করিতে লাগিলেন।
রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার
নাই দেখিয়া সরযু ও জনাৰ্ধনের সতি স্বদেশে
প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বদেশে পুরাতন
দুর্গে তিলকসিংহের প্রপৌত্র প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! ইচ্ছা, এই স্থানেই আপনার
নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর একজনের কথা
বলিতে বাকী আছে, শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মী-
কৃপাগী লক্ষ্মীর কথা বলিতে বাকী আছে।

যে দিন চন্দ্রগাও আশ্রয়ত্যা করিয়া-
ছিলেন, রঘুনাথ সেই দিনই ভগিনীর সহিত
সাক্ষাৎ করিতে বাইলেন। বাঁহা দেখিলেন,
তাহাতে তাঁহার জনম শুভিত হইল। দেখি-
লেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আনুলায়িতকেশে
গড়াগড়ি দিতেছেন, বন বন হোহ বাইতে
ছেন, সময়ে সময়ে জনমবিদায়ক আৰ্ত্তনাদে
ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুধর্মের
পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ ব্যতনা হয়, সে
বর্ণন করিতে পারে? অল্প লক্ষ্মীর মৃত্যু
আলোক নির্মল হইয়াছে, জনমের
হাছে, অগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে।
বিবাহে, নৈবাত্তে, বর-বৈধবায়
ব্যতনার বিধবা বন বন
করিতেছে।

রঘুনাথ সাধনা করিবার চেষ্টা করিয়া
সাহসী হুয়ে থাকুক, লক্ষ্মী প্রাণের প্রাণকে
তিনিতেও পারিলেন না। বর বর ক

অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিভ্রাভ হইলেন ।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষীর ভাবপরিবর্তন দেখিয়া কিছু বিম্মিত হইলেন । দেখিলেন, লক্ষীর নরনে জল নাই, ধীরে ধীরে বায়ীর মৃতদেহ স্নান করিয়া পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন । বালিকা বেকরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুতলি সাজায়, লক্ষী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন ।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে, লক্ষী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদু-পদ-বিক্ষেপে আসিলেন যে, শব্দ হইলে স্বামীর নিভ্রাভ হইবে ! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, “ভাই রঘুনাথ ! তোমার সঙ্গে যে আর এক-বার দেখা হইল, আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোন কষ্ট থাকিল না ।”

সাক্ষনয়নে রঘুনাথ বলিলেন, “প্রাণের ভগিনী লক্ষি, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি ?”

লক্ষী অকল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন, “সত্য ভাই, তোমার দরার শরীর, তুমি হৃদযন্ত্রের অঙ্গ রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে, তিনি রাহি । আমার ভাগ্যে বাহা ছিল, তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন ।”

রঘুনাথ বলিল, “তুমি বুদ্ধিমতী, আমি ভিন্নকালই যদি এই অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সফল করিয়া দেখিয়া ছুটি হইলাম । মহাবীর শিবের দেহের, তোমার কপালে বাধা ছিল, লক্ষীর দেহে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর । আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার জলবাগা, ভ্রাতার ঘরে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষি, আমি কষ্ট করিব না ।

লক্ষী একটু হাসিলেন । সে হাত দেথিয়া

রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল । ইহৎ হাসিয়া লক্ষী বলিলেন, “ভাই, তোমার দরার শরীর, কিন্তু লক্ষীকে জগদীশ্বরই সর্ব শাস্ত্রী করিয়াছেন, শাস্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি জীবদশার দাসীকে অতিশয় ভাল-বাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, যরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে ।”

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল । তখন তিনি লক্ষীর ভাব-পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষীর শান্তভাবে হেতু বুঝিতে পারিলেন । লক্ষী সহমরণে স্থির-সংকল্প হইয়াছেন ।

তখন রঘুনাথ অনেককণ অবধি লক্ষীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্যন্ত লক্ষীর সহিত তর্ক করিলেন । ধীর শাস্ত লক্ষীর একই উত্তর,—“হৃদযন্ত্র আমার আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না ।”

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন, “লক্ষি ! একদিন আমার জীবন নৈরাশ্রে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনভ্যাগের সত্ত্ব করিয়াছিলাম । ভগিনী, তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথার সে সত্ত্ব ছাড়িলাম, পুনরায় কার্যজগতে প্রবেশ করিলাম । লক্ষি, তুমি কি ভ্রাতার কথা রাখিবে না ? তুমি কি ভ্রাতাকে ভালবাস না ?”

লক্ষী পূর্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন, “ভাই, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষীকে ভালবাস, লক্ষীর কথা তিনি রাহি ছিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই । কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষের অনেক আশা, অনেক উত্তম, অনেক অবলম্বন, একটি বাইলে অসংখ্য থাকে, একটি চোখা নিফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয় । ভাই, তুমি সে দিন ভবিষ্যত

কথাটি রাখিয়াছিলে, অতঃ তোমার কলঙ্ক দূরীকৃত হইয়াছে, ক্ষমতা-বৃদ্ধি হইয়াছে, সুবশ দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অতঃ আমি যে নরনের বণিটী হারাইয়াছি, তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অঙ্গগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বালাকাল চাইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অতঃ সদয় হও। লক্ষ্মীর এক-মাত্র সুখের পথে কটক চাইও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন, তাঁহার সহিত যাইতে দাও।”

রঘুনাথ নিরন্ত হইলেন, স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বাগকের স্তায় স্বল্প অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা-ভগিনীর অথওনীর প্রণয়ের স্তায় পবিত্র স্নিগ্ধ প্রণয় আর কি কাছে? স্নেহময়ী ভগিনীর স্তায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় বাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল। চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল। হস্তাবদান লক্ষ্মী স্বন্দর পটবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নরনের জল মোচন করিয়া মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন। সকলের নরনের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে লক্ষ্মী রঘুনাথের নিকট আসিলেন,

বলিলেন, “ভাই! বালাকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে বড় ভালবাসিতে, অতঃ লক্ষ্মী ভাগ্য-বতী, অতঃ চিরসুখিনী হইবে, এববার ভাল-বাসার কাঞ্চ কর, স্নেহে কনিষ্ঠ ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।”

রঘুনাথ আর সঙ্ক করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটি হাত ধরিয়া বাগকের স্তায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

স্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন, “ছি ভাই, শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্ত? পিতার স্তায় তোমার সাহস, পিতার স্তায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন, জগৎ তোমার বশে পূর্ণ হইবে। লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্ত স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।”

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন, “লক্ষ্মি, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মি! তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে কিরূপে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?”— আর্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক বয়স করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চন্দ্রের জল মুছিয়া দিলেন : অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, “ভাই, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, পুরুষের বাহা ধর্ম্ম, তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না। ঐ দেখ, পুরুষকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।”

মহারাজু জীবন প্রভাত ।

গদগদস্বরে রত্ননাথ বলিলেন, “লক্ষ্মি, প্রাণের লক্ষ্মি, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম; ঐ আকাশে, ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব; সে পর্য্যন্ত জীবন্ত হইয়া রহিলাম।”

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপাশে যাইলেন, স্বামীর পদযয়ে মন্তকস্থাপন করিয়া বলিলেন, “হৃদয়েখর! জীবনে তুমি বড় ভালবাসিতে, এখন অতৃপ্ত হই কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই, জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পারি।”

ধীরে ধীরে লক্ষ্মী চিতা আরোহণ করিলেন; স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদযয়ে ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া গইলেন। নরন মুদিত করিলেন। বোধ হইল যেন, সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জলিল; অতিশয় দ্রুত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূম শব্দে জলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিকিহ্না লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সত্যকে চারিদিক বেঠেন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না।

উপহার ।

স্বদেশপ্রিয়, আনন্দিক, উদারচরিত্র,

জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত ।

প্রিয় ভ্রাতঃ !

এই সংসার-স্বরূপ ভীষণ কার্যক্ষেত্রে তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, আমার জীবনের শাস্তিস্বরূপ হইয়াছে। শৈশবে ঐ স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি শিশু ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্ক্ষায় বধন ক্রান্ত হই, বহুদূরে প্রবাসে জীবনের অনন্ত চেষ্টা-পরম্পরায় বধন শ্রান্ত হই, প্রণয়ের অলীকতায় বা সংসারের বাহাড়ম্বরে বধন বিরক্ত হই, তখন ঐ আদর্শরূপ নির্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম আনন্দিক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তি লাভ করি।

জগৎ এ সমস্ত কথা জানে না, এ কথা কাহাকে বলিব, কে বুঝিবে? জগতে নানা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিতে পাই, ধন, মান, খ্যাতি, ক্ষমতার জন্য অনন্ত চেষ্টা ও উত্তম দেখিতে পাই, এই চেষ্টার ভ্রাতাকে ভ্রাতা ঠেলিয়া বাইতেছে, পিতাকে পুত্র ঠেলিয়া বাইতেছে। এ ভীষণ কার্যক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ঋণিতুল্য আনন্দিক লোক অলঙ্কিত, অপরিচিত, অনাদৃত !

শৈশব ও বাল্যকালের একমাত্র সহচর! জীবনের প্রথম প্রিয়তম বন্ধু! ত্রিশ বৎসর যে তোমার অতুল স্নেহে প্রফুল্লতা ও শান্তি লাভ করিয়াছে, অল্প সে তোমাকে এই সামান্য উপহার দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জান করিল।

ত্রিপুরা,

১২৮৫ বঙ্গাব্দ ।

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত ।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আহেরিয়া ।

ভুবঃ কাম্পবিন অনয়তা চরণশব্দেন, কণ্ঠকষ্টজ্যানাঞ্চ
বনকলভুর-কাবিন-কণ্ঠকৃদ্ধিতকন্ডেন
শরমিকরবর্ণিণাং ধমুবাং সিনাদেন ॥ ১ ॥
প্রচলিতমিব তদরণ্যমভবৎ ।

কামধরী ।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দের কান্তনমাসের প্রথম
দিবসে মেওয়ার-প্রদেশের অভ্যন্তরে সূর্য্য-
মহল নামক পর্বত-দুর্গে মহাকোলাহল ঐশ্বর্য
হইল । একটি উন্নত পর্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ
নির্মিত, দুর্গের চারিদিকে কেবল পাদপূর্ণ
পর্বতশ্রেণী বা বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর
পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে । প্রাতঃকালের বাল-
সূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্বত ও উপত্যকাকে
সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে এবং প্রাতঃ-
কালের মল্ল মল্ল বায়ুচিল্লোনে সেই অনন্ত
পাদপশ্রেণী হইতে স্মর্য মর্যরশব্দ নিঃসৃত
হইতেছে । পরে পরে শিশিরবিন্দু মুক্তা-
লৌল্য অধিকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষি-
গণ ডালে ডালে গান করিতেছে এবং সেই
প্রাচীর হইতে বতদূর দেখা যায়, পর্বত ও
উপত্যকা সূর্য্যকিরণে নবন্যত হইয়া শোভা
পাইতেছে । রক্তবর্ণা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্ঘা-
টিত হইল, শত অঝোরোহী বর্ণা লইয়া দুর্গ

হইতে বহির্গত হইলেন । ধীরে ধীরে সেই
অঝোরোহিণী সেই দুর্গের পর্বত অধিরোহণ
করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের শাপিত বর্ণা-
কলক সূর্য্যকিরণে স্বকৃৎ করিতে লাগিল,
অধঃস্রাবিত শিলাখণ্ড হইতে অগ্নিকণা বহি-
র্গত হইতে লাগিল । অচিরে অঝোরোহিণী
পর্বতভালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটি
বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

অন্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্ত-প্রারম্ভে
বাৎসরিক যুগযাত্রা দিন । অন্ত্যকার যুগযাত্রা
কলাকল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরি-
গণিত হইবে, সুতরাং সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর
দুর্জয়সিংহ শত অঝোরোহী সমভিব্যাহারে
যুগযাত্রা বহির্গত হইয়াছেন । মেওয়ারপ্রদেশে
চন্দাওয়ারকুল আহবে ও বিপদে অগ্রগামী,
সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জয়সিংহ অপেক্ষা
দুর্দমনীয় যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী
কেহ ছিল না । দেখিলে বরষ জিৎসং বৎসর
বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ নয়নদ্বয় অলস্ত
অগ্নির স্তায় উজ্জল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ ।
যোদ্ধা দক্ষিণ-হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া
রহিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্কীত ও
বেন দৌহনির্মিত । দুর্জয়সিংহের সহচরগণও
সেই চন্দাওয়ার-বংশোদ্ভূত এবং দুর্জয়সিংহের
অযোগ্য সহচর নহে ।

দুর্গ হইতে অধিরোহণ করিয়া অঝো-
রোহিণী একটি নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া

পস্থিত হইলেন। কয়েকজন পাইককে পশুর সন্ধানে এই স্থানে পাঠান হইরাছিল। পাইকগণ একে একে আসিয়া বনচর পশুর কোন অঙ্গসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু বোদ্ধগণ তাহাতে ভয়োৎসাহ না হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বন-পুষ্প বা দূর্য্যর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, কোথায় বা বন-একরূপ নিবিড় যে, দিবাভাগেই অন্ধকারের স্তায় বোধ হইতেছে। কখন পর্বত বা শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, কখন সুন্দর জলধার পার্শ্ব দিয়া, কখন ঝোপের নিকট দিয়া বোদ্ধগণ নিঃশেষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্বত ও উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। বোদ্ধগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া বাহির হইয়াছেন। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্জিত, সকলই জীবনময়। যুগয়ার স্তায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসার রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার স্তায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া বোদ্ধগণ একটি প্রান্তরে পড়িলেন, সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটি পর্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষ-রত রহিয়াছে। দুর্জয়সিংহ অমাত্যকে সোধান করিয়া বলিলেন, “এ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?”

অমাত্য বলিলেন, “হাঁ, এরূপ দুর্গ যদি নিকট ভূমিয়ারিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত বোদ্ধদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।”

দুর্জয়। ভূমিয়ার গণশিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আপন দুর্গ ও

আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।

অমাত্য। সত্য, কিন্তু বর্শাচালন অপেক্ষা লাঙ্গলচালনে অধিক তৎপর।

সকলেই উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন। আর একজন বোদ্ধা কহিলেন, “ভূমিয়ার দুর্গ-রক্ষা হইতে ভূমিরক্ষার অধিক তৎপর। বোদ্ধা কখন কখন আপন দুর্গচ্যুত হন, কিন্তু ভূমিয়ার ভূমি পুরুষাত্মকমে তাহার সন্তান-সন্ততি ভোগ করে; শত্রুতেও লইতে পারে না, রাণাও লইতে পারেন না।”

অমাত্য। ইন্দুর মুক্তিকায় একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে বাহির করা দুঃসাধ্য।

পুনরায় সকলে হাস্ত করিয়া উঠিলেন।

বোদ্ধদল অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। জঙ্গল, ঝোপ, পর্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন; যে যে স্থানে পূর্ববৎসরে বরাহ দেখা গিয়াছিল, সমস্ত দৃষ্টি করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় বন, সুন্দর পর্বত-তরঙ্গিণী-তীর। শান্ত শব্দশূন্য প্রান্তর, সমস্ত বিচরণ করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু কোন বনচর পশুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাইকগণ নিবিড় জঙ্গলের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কেহই একটিও পশু দেখিতে পায় নাই। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বোদ্ধগণ লগাটের স্বেদমোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। অস্ত্র বন কি বরাহশূন্য? একটি যুগও দেখিতে পাইলাম না! এ বৎসর কি সূর্য্যমহলের অমতলের জন্ত? এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। কণেক চিন্তা করিয়া দুর্জয়সিংহ কহিলেন, “বুদ্ধগণ! আমাদের অর্থ শান্ত হইয়াছে, আমরাও শান্ত হইরাছি, এক্ষণে আর বুধা অন্বেষণে আবশ্যক নাই, চল,

অধঃগণকে বিজ্ঞান দিই, আমরাও বিজ্ঞান করি। পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটি বরাহ লুতারিত থাকে, দুর্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্ষা ধারণ করিবে না।" সকলেই সেই কথার সম্মতি প্রকাশ করিয়া একটি নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থলটি অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী একরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জ আবৃত রহিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি যেন একটি স্তব্ধরেখার স্ত্রাচ ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। ভূমি পরিকৃত হইয়াছে, নবদুর্কাদল সেই স্ত্রামল স্তম্ভি ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই নিবিড় বনে শব্দমাত্র নাই, দ্বিপ্রহর দিবার সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। একরূপ নিস্তব্ধ যে, বৃক্ষ হইতে দুই একটি শুষ্কপত্র পতিত হইলে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটি বনবিচক্ষিনীর দ্বিপ্রহরের স্তিমিত রব শুনা যাইতেছে এবং অদূরে একটি নিরুঝিরী সূন্দর সঙ্গীত ধীরে ধীরে কর্ণে পতিত হইতেছে। স্ত্রাম যোদ্ধ-গণ কণেক নিস্তব্ধ হইয়া সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল যেন, কোন বনদেবীর পূজার স্তব্ধ প্রকৃতি অনন্ত স্তব্ধসার-স্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিষ্মৎ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নিরুঝিরী স্বয়ং বীণাবাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধগণ অথ হইতে অবরোহণ করিয়া সেই স্ত্রামল দুর্কাদলের উপর উপবেশন করিলেন। কণেক শ্রমদূর করিয়া নিরুঝির জলে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিছু কলমুলের আয়োজন করা হইয়াছিল, দুর্গেশ্বর ও তাহার যোদ্ধগণ আনন্দে তাহা

আহার করিতে বসিলেন। পুরাতন রীতি অনুসারে দুর্গেশ্বর সহসা বোদ্ধাধিককে "লোনা" অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইলেন, তাহারাই এই সম্মানচিহ্ন সাবধে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হান্ত-ধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল; পূর্ব্বদেবার, পূর্ব্বযুদ্ধের কথা হইতে লাগিল। কিরূপে উপস্থিত যোদ্ধগণ দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রুকে হনন করিয়াছিলেন, সানুস্রাপতির প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, স্বয়ং রাণার সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা হইতে লাগিল। এবার মেওয়ার-প্রদেশের বহু শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতে-ছেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর ও বৃন্দির রাজগণ স্বেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওয়ার আক্রমণে আসিতেছেন। কিন্তু রাণার অবশ্য জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাও-রংকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণদান করিবে, চন্দাওরংকুল পলায়ন জানে না। দুর্জয়সিংহ এ কথা বলিতে না বলিতে বোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

দুর্জয়সিংহ বলিলেন, "আট বৎসর পূর্বে যখন এই আক্বের শাহ চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সানুস্রাপতি সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই, চন্দাওরংকুলেশ্বর সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই। চারগদেব! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধগণকে শুনাও, চন্দাওরংকুল কিরূপে বৃদ্ধ করে, একবার শ্রবণ করি।"

আচেরয়ার দিনে চারগদেব অল্পপণ্ডিত থাকেন না। দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চারগদেব সাহীদাসের বারত-গীত আরম্ভ করিলেন। চিতোর-স্বয়ংসের সময় দুর্জয়সিংহ ও তাহার যোদ্ধগণ সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, চারগদেবের গীত শুনিতে শুনিতে

সেনিনকার কথা তাঁহাদের ক্ষমতায় জাগরিত হইতে লাগিল।

গীত।

“যোদ্ধাগণ! আপনারা সেনিনকার যুদ্ধ দেখিয়াছেন, দুর্জয়সিংহ সালুমত্রাপতির দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন, তিনি সাহীদাসের বীরত্ব দেখিয়াছেন। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওরংকুলের রণস্থল, সেই সূর্য্যদ্বার সাহীদাস সে দিন ত্যাগ করেন নাই, সেই সূর্য্যদ্বার চন্দাওরংকুল ত্যাগ করেন নাই।

বায়ু-তাড়িত হইয়া উদয়সাগরের ক্ষিপ্র তরঙ্গ যখন কূলে আঘাত করে, তাহা দেখি রাছি। তুর্কাদিগের অগণ্য সৈন্য সেইরূপ সূর্য্যদ্বারে বার বার আঘাত করিতে লাগিল, ভীষণরবে সেই সৈন্যতরঙ্গ দুর্গের দিকে ধাবমান হইল, কিন্তু চন্দাওরংকুলের আহত হইয়া বার বার প্রতিহত হইল। চিতোরের সূর্য্যদ্বারই চন্দাওরংকুলের রণস্থল, চন্দাওরং সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুমত্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

বনে অগ্নি লাগিলে কিরূপে গেলিহমান অগ্নিভিষ্মা আকাশপথে আরোহণ করে, তাহা দেখিরাছি। তুর্কাদিগের সৈন্য সেইরূপে দুর্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সৈন্যরূপ বার বার দুর্গোপরি ধাবমান হইতে লাগিল। চন্দাওরং অগ্ন্যধিক, কিন্তু চন্দাওরং হীনবল নহে, বার বার ভীষণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিহত করল সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করিল না। সূর্য্যদ্বারই চন্দাওরংকুলের রণস্থল, চন্দাওরং সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুমত্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।

বর্ষাকালের মেঘরাশি অপেক্ষা তুর্কাদিগের সৈন্য অধিক। রাশি রাশি হত হইল, পুনরায় রাশি রাশি সেই দ্বার বন্ধ-

নামে আক্রমণ করিল। চন্দাওরংকুল অমরবীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া সেই পর্ব্বতচূড়ার চিরনিজায় শায়িত হইল, কিন্তু চন্দাওরংকুল প্রতিহত হইল না। সাহীদাস তখনও একাকী শত্রুর সহিত যুদ্ধিতে ছিলেন, সাহীদাস চিতোরের জন্ত যুদ্ধের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়া ছিন্নতরু ন্যায় পতিত হইলেন। দুর্জয়সিংহ সাহীদিগের রক্ষার্থ যুদ্ধিতেছিলেন, আহত ও অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। যোদ্ধাগণ! দুর্জয়সিংহের ললাটে তুর্কায় খড়্গ-অস্ত্র এখনও দেখিতে পাইতেছি, চন্দাওরংকুল সমস্ত হত বা আহত হইল, কিন্তু দুর্জয়সিংহ সেই সূর্য্যদ্বার ত্যাগ করেন নাই। চিতোরের সূর্য্যদ্বার চন্দাওরংকুলের রণস্থল, চন্দাওরংকুল সে দ্বার ত্যাগ করে নাই, সালুমত্রাপতি সে দ্বার ত্যাগ করেন নাই।”

এই গীত হইতে হইতে চন্দাওরং যোদ্ধাদিগের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহির্গত হইতেছিল। গীত শেষ হইলে সকলে হৃৎকারনাদে বন পরিপূরিত করিলেন। তন্মধ্যে দুর্জয়সিংহ ভাষণনাদে কহিলেন, “যোদ্ধাগণ! অগ্ন্য আমাদের চারিদিকে বিপদাশ, কিন্তু চন্দাওরংকুল বিপদে অপরিচিত নহে। অগ্ন্য আমাদের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশেখর ও পর্ব্বতগহ্বর শিশোদীয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা উদয়সিংহ পশ্চ হইরাছেন, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্জয়সিংহের অধিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদীয়ার জাতির জয় হউক, চন্দাওরংকুলের জয় হউক।”

ভাষণনাদে শত বোদ্ধা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, সে শব্দ বন অতিক্রম করিয়া মেওয়ারের অনন্ত পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত

ইল ! দুর্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন, “চারণ-
ব ! আমরা এক্ষণে পুনরায় যুগ্মরায় বাইব,
কটি আহেরিয়ার গীত শুনাও, যেন অস্ত্র
চামাদিগের আহেরিয়া নিখল না হয়।”
চারণদেব পুনরায় বীণা লইলেন, উর্দ্ধদিকে
দাঁড়িয়া কণেক চিন্তা করিলেন, পরে গীত
স্বরভুক্ত করিলেন ।

গীত ।

“যোদ্ধা গণ ! আট বৎসর হইল, দিল্লীখর
চিতোর লইয়াছেন, কিন্তু দিল্লী ও শিশো-
দীয়ার এই প্রথম বিবাহ নহে । প্রায় তিন
শত বৎসর পূর্বে আর একজন দিল্লীখর
আলা-উদ্দীন আর একবার চিতোর লইয়া-
ছিলেন, কিন্তু চিতোর শিশোদীয়ার কর্তৃক
চিতোর তুর্কী-হস্তে কত দিন থাকে ? সেবার
হামির এই কর্তৃত্ব তুর্কীদিগের হস্ত হইতে
কাড়িয়া লইয়াছেন ; এবার প্রতাপসিংহ
লইবেন । হামিরের জয়কথা শ্রবণ
আহেরিয়ার একটি গীত শ্রবণ কর ।

সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র উরুসিংহ ।

উরুসিংহ দুর্গরক্ষার জন্ত প্রাণদান

তাহা শিশোদীয়ার মধ্যে কে

জানে ? চিতোর-আক্রমণে

সর পূর্বে এট উরুসিংহ এর

বহির্গত হইয়াছিলেন, শ

সঙ্গে সঙ্গে যুগ্মরায় বহি

আহেরিয়ার তুল্য রা

অনন্দ আছে ?

“আলাওরা-কানন

নাগে প্রতিধ্বনিত হই

হের পাশ্চাত্যবান ক

ও নিরক্ষর উত্তর

হইল, মহানাগে যো

আহেরিয়ার তুল্য

অনন্দ আছে ?

“অনেকক্ষণ পর সেই বরাহ এক শত
কেতের ভিতর লুকাইল, শত দ্বাদশ হস্ত
উচ্চ, বরা আর দেখা গেল না । একজন
বাজ দরিদ্রমণী একটি মকে দণ্ডায়মান
হইয়া শত্রুর করিতেছিলেন । রমণী বীর-
দিগের নৈরাশ্র দৃষ্টিয়া বলিলেন, ‘সংবরণ
করুন, আমি বা শতকেত হইতে বাহির
করিয়া দিতেছি ।’

“এ কি বাজ না নগ্ন
যদি নো ? নারী-বাহি
নারী-হৃদয়ে কি এ
একটি বুক উৎ
স্রুতির
বর্ষ

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

৩৩২

পারিলেন; কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, হৃৎ
যন্ত্রক হইতে না নামাইয়া, কোল একটি
মহিষীকে অশ্বের শরীরের উপর ঠেলিয়া
দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব অখারোহী
জুমিয়াৎ হইল।

“উরুসিংহ অশ্বসন্ধানে নিলেন যে, সে
কুমারী চোহানজাতির কন্যাবংশের এক
দরিদ্রলোকের কন্যা। উরুসিংহ সেই
সাহ করি, সেই কন্যার পুত্র

আলা-উদদীন যখন
করেন, তখন সুবরাজ

করেন, পরে

সিংহ প্রাণ-

মির

দিকে ধাবমান হইলেন। অবশ্য যেন সেই
ভূখণ্ড পদতরে কাঁপাইয়া ছুটিল, পথের মধ্যে
উন্নত শিলাখণ্ড বা পর্বততরঙ্গিণী লক্ষ দিয়া
অতিক্রম করিল, কষ্টকমর ঝোপ বা বৃক্ষ
অগ্রাহ্য করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া ছুটিল।
অখারোহীদিগের অলস্তু নয়ন সেই বরাহের
দিকে স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের উন্নত
দক্ষিণ-হস্ত শূন্যে বর্শা ধারণা করিয়া রহিয়াছে,
তাঁহাদিগের হৃদয় উল্লাসে, উৎসাহে উৎক্লিষ্ট
রহিয়াছে।

বরাহ ক্ষণেক দৌড়াইয়া দেখিল, অখা-
রোহিগণ নিকটে আসিতেছে। একবার
স্থির হইয়া যেন তাহাদিগকে আক্রমণ করি-
বার চিন্তা করিল, কিন্তু শত যোদ্ধার হস্তে
শত বর্শার শাপিত ফলা দেখিয়া সম্মুখ-
রণচিন্তা ত্যাগ করিল, লক্ষ দিয়া একটি
বিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ
করিল। নিমেষমধ্যে শত অখারোহী সেই

৭ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন; উচ্চ
চরিত্রা বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির

প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু বরাহ প্রাণ-

গছে, বাহির হইবে না। কেহ

নিক্ষেপ করিলেন, কেহ বা

পেপের কোন অংশে পত্রের

মান করিয়া বর্শা নিক্ষেপ

ক্ষণ সময় নষ্ট হইল,

হইল, বরাহ ঝোপ হইতে

হ বলিলেন, “বন্ধুগণ,

যামে আবশ্যক কি?

সিদ্ধাচ্ছেন, আর অধিক

যে সকলে পদব্রজে

হও। বরাহ এই

আমরা চারিদিক

হইলে বরাহ অবশ্য

একদিক্ হইতে পালাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই মরিবে।”

যোদ্ধগণ ইহা ভিন্ন উপায় দেখিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; তীক্ষ্ণহস্তে বর্শা ধারণ করিয়া রহিলেন, তীক্ষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এবার বরাহ অবশ্যই বাহির হইবে, সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, এ জন্ত সকলে সতর্কভাবে সম্মুখে ও চারিদিকে দেখিতে দেখিতে ঝোপের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয়, অশ্বারোহীদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লক্ষ্য দিয়া একদিক্ হইতে বাহির হইল; বিদ্যুৎবেগে নিকটস্থ যোদ্ধার পদ বিদীর্ণ করিল, নিমেষমধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন যোদ্ধা আহতের সেবার জন্ত রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে অশ্বারোহণ করিয়া পুনরায় বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পুনরায় ভূমি ও শিলাখণ্ড কম্পিত করিতে লাগিলেন, বায়ুবেগে কণ্টক ও তরঙ্গিণী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, মহা-নাড়ে বন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। দুর্জয়সিংহ উন্নতের জায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

পুনরায় বরাহ লুকাইল, পুনরায় বাহির হইয়া পলাইল, আবার লুকাইল। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল, অশ্বারোহিণী প্রৌণ্ডজ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেহ নিকটে, কেহ দূরে, কেহ প্রান্তরে, কেহ নিবিড় বনে বরাহ অন্বেষণ করিতেছেন।

দুর্জয়সিংহ একাকী একটি বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অশ্বের শরীর

ফেনময়, তাঁহার ললাট হইতে স্বর্ণ পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, শত বোদ্ধা-মধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারে বরাহ সকলের পক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হয় নাই। তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তথায় বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহ কষ্ট হইল। অশ্ব এক-প্রহর কাল জঁকল হইতে জঁকলে, গহ্বর হইতে গহ্বরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা অব্যর্থ-নয়নে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্ত দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের জ্বাশ গতিতে বরাহ দুর্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুর্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া লম্বমান কেশ সরাইলেন, তীব্রদৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পমান বর্শা ছাড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অশ্বকার বশতঃ সে বর্শা ব্যর্থ হইল। একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডে লাগিয়া সে শিলাখণ্ড চূর্ণ করিল, বরাহ নিমেষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লক্ষ্য দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ মৃত অশ্বকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত বোদ্ধা অকম্পিত-নয়নে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যু আসিল না।

অমৃষ্ট-হস্ত-নিষ্কপ্ত একটি বর্শা আসিল, বরাহের মূখের উপর লাগাতে দস্ত চূর্ণ

হইয়া রক্তধারা বাহির হইল, সে আঘাতে বরাহ মরিগ না, কিন্তু দুর্জয়সিংহকে তাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল, রক্তনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রক্তনীর অন্ধকারে দুর্জয়সিংহ দেখিলেন, পক্ষিত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজসিংহ।

তদারভাং কিমাতকৃতসংসর্গে বহুহুল্লুংসজা
† + অসিন্ কাননে দুরীকৃতকলঙ্কে বসামি।

দশকুমারচরিত্।

আধেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল, দুর্জয়সিংহের হস্ত-নিকিপ্ত বর্শা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে অস্ত্র দুর্জয়সিংহের জীবন-রক্ষা হইল, এইরূপ শত চিন্তা দুর্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। দুর্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন, জীবৎ কর্তৃশস্যের কহিলেন, “আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি, আপনি আমার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন।”

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন, “মহাযোগ্যেই মহাবীর জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করে। দুর্জয়সিংহের জীবনরক্ষা করা রাজপুত্রের বিশেষ কর্তব্য, কেন না, তিনি বোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদকালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।”

সামান্য-পরিচ্ছদধারী অপরিচিত লোকের নিম্নোক্ত এইরূপ ভাষা শুনিয়া দুর্জয়সিংহ উৎসাহ

বিস্তৃত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?”

যুবক বলিলেন, “পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইরাছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।”

দীর্ঘকাল বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে বাইতে লাগিলেন, দুর্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া দুই জন বোদ্ধা নিম্নলিখিত বাইতে লাগিলেন।

দুর্জয়সিংহ দুর্জয় পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু অপরিচিতের দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীরগম্বীর পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মৃত হইলেন। একপ উন্নতকার পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা আট বৎসর পূর্বে কেবল এক জনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবা সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “এক্ষণে আমার একটি অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার উকীল দিয়া আপনার নয়ন পরীক্ষিত করুন, পরে আমি আপনার বৃত্তধারণ করিয়া লইয়া বাইব। যদি অস্বীকৃত হন, এই স্থানে বিদায় হইলাম।”

দুর্জয়সিংহ আরও বিস্মৃত হইলেন কিন্তু যুবকের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উকীল ধূলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন, নিঃশব্দে যুবক দুর্জয়সিংহের নয়ন বন্ধন করিলেন।

ভাঙার পর যুবক দুর্জয়সিংহের হস্ত

ধরিয়া প্রায় এককোশ পথ লইয়া বাইলেন, এই পথের মধ্যে ছুইজননের একটি কথাও হইল না। দুর্জয়সিংহ কোন দিকে বাইতে-ছেন, কিছুই জানিলেন না, কেবল বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে লাগিলেন এবং একটি পর্ব্বত আরোহণ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন, শেষে 'যুবক সাংসে' দণ্ডায়মান হইলেন, দুর্জয়সিংহও দাঁড়াইলেন। যুবক তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলেন, দুর্জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগর্হেরে অপরিচিত লোক দ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন। গর্হেরে একটিমাত্র দীপ জলিতেছে, সেই দীপালোকে দুর্জয়সিংহ আপনার চতুর্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীর লোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গর্হেরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরকণ্ঠেই বাহিরে বাইতেছে, তাহার কারণও জানিতে পারিলেন না। তিনি রাজপুত-ভাষায় কথা কহিলেন, পার্শ্বস্থ যুবক ভিন্ন কেহ সে কথা বুঝিতে পারিল না। যুবক তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়া-ছেন, যুবক তাঁহাকে বিশ্রামের জন্ত এই গুহার আনিয়াছেন, যুবক এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্বানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি দুর্জয়সিংহ সেই যুবকের দিকে চাহিতে সম্বচিত হইতেছেন কি জন্ত? দুর্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলবোদ্ধা, সেই অল্পভাবী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটি বরণা হইতে জল

আনিয়া দিল, দুর্জয়সিংহ তাহাতে হস্তপদ-প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কন্তক ওলি কলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জয়সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিল। দুর্জয়সিংহের সন্দেহ দূরীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন, সে যুবক নাই। ঈষৎ ক্ষুদ্র হইয়া বলিলেন, "আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি হইয়াছি, অতিথির সম্মুখে খরং আহারপাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। বিবেচনা করি, ভোলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।"

এ কর্কশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল, "প্রভু রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই; কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দাওয়ারুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ, এই জন্ত এইকণ আসিতে পারেন নাই।"

দুর্জয়সিংহের সন্দেহ দূরীভূত হইল। অস্পষ্ট আহার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন। কণেক পর সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, "আতিথের ধর্ম্ম অশক্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, বিশ্রাম করুন; আপনার বিশ্রামের জন্ত শয্যা রচনা করা হইয়াছে।"

দুর্জয়সিংহ চারিদিকে চাহিলেন। একে একে বহুসংখ্যক ভীলবোদ্ধা একবার গুহার প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে। সকলের হস্তে ধনুর্ধ্বাণ, সকলে নিশতক, সকলে অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া ব্রহ্মিয়াছে, যেন রাজপুত একটি আজ্ঞা দিলে, একটি ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুর্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত! রাজপুত সে ইঙ্গিত করিলেন না।

দুর্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদকালে তাঁহার অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না, কিন্তু এই অপূর্ণস্থানে অসংখ্য অসভ্য বোদ্ধা-দিগের মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার ভঙিত হইল। তিনি এই পরীতগুহার মধ্যে একাকী ও নিরস্ত, তাঁহার চারিদিকে শত বোদ্ধা বেটন করিয়া আছে; সকলে ভীতনয়নে অপরিচিত রাজপুত্রের দিকে চাহিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ। দুর্জয়সিংহ সেই অপরিচিত রাজপুত্রের দিকে পুনরায় চাহিলেন, তাঁহার গম্ভীর মুখ-মণ্ডল ও হিরনয়ন দেখিয়া তাঁহার উদ্বেগ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যুবক পুনরায় বলিলেন, “শব্দা রচনা হইয়াছে।”

যুবক দুর্জয়সিংহের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হন, তবে অত্ৰ বিপদের সময় দুর্জয়সিংহের প্রাণ বাচাইলেন কেন, আশ্রিত্র সময় আপন আবাসস্থলে আশ্রয় করিলেন কেন, কলমুল ও আহারীয় দান করিলেন কেন, এই বহুসংখ্য ধনুর্ধর ভীল হইতে এখনও তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন কেন? দুর্জয়সিংহ কি জন্ত মিথ্যা সন্দেহ করিতেছেন? অবশ্যই যুবক কোন বিপদগ্রস্ত উন্নতবংশীয় রাজপুত্র হইবেন, স্বস্থানচ্যুত হইয়া ভীলদিগের আশ্রয় লইয়াছেন, অত্ৰ রাজপুত্রধর্ম অনুসারে দুর্জয়সিংহের বধেষ্ঠ উপকার করিয়াছেন, দুর্জয়সিংহ কেন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন?

দুর্জয়সিংহ জানেন না; কিন্তু যখন সেই উন্নত-কলেবর, সেই হিরনয়ন, সেই অন্নভাবী বোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। আহব-ক্ষেত্রে শত শত্রুমধ্যে বাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, অত্ৰ এই যুবককে দেখিয়া কি

জন্ত সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুগ্রাহিণী ও স্বয়ং মহারাণার নহনের দিকে যে বোদ্ধা হিরনয়নে চাহিয়াছিলেন, অত্ৰ একজন বস্ত্র যুবকের দিকে কি জন্ত তিনি চাহিতে অক্ষম?

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া, দুর্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবার সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন,—বলিলেন, “যুবক! এ পর্য্যন্ত আমি এই অপরূপ গুহা ও আপনার অপরূপ সঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্ত একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি।”

যুবক। ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।

দুর্জয়। তথাপি এ অর্ণ কিরূপে পরি-শোধ করিতে পারি?

যুবক। আপনাকে অত্ৰ বেদ্রণ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীন নারীর প্রতি বা কোন পিতাহীন বালকের প্রতি যদি কখন অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের আশ্রয় এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার নিজের কোন বাচ্চা নাই।

দুর্জয়সিংহ চকিত হইলেন। যুবক কি পূর্বকথা জানেন? অত্ৰ কি শত ভীল বোদ্ধার দ্বারা পূর্ব-অত্যাচারের প্রতিকল লইবেন? সভয়ে সেই ভীলবোদ্ধাদিগের দিকে দেখিলেন, সকলের হস্তে ধনুর্ধর প্রস্তুত। সভয়ে যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক সেইরূপ গম্ভীর, নিশ্চেষ্ট। দুর্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অত্ৰ প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল, এ যুবক কে?

যুবক পুনরায় বলিলেন, “শয্যা রচনা হইয়াছে ।”

দুর্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন, “অন্তই স্বর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্তের আবাসে বাস করা দুর্জয়সিংহের অভ্যাস নাই ।”

যুবক । যেরূপ কচি হয়, সেইরূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্তের আবাসস্থলে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে ।

দুর্জয় । আপনি কে জানি না, ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য বোদ্ধা দ্বারা দুর্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সফল করিবে না । রাঠোর তিলকসিংহের সহিত আমার বংশাভ্যুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্তী হইয়া আমি সম্মুখসমরে তাঁহার স্বর্য্যমহল-দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছি, এ ক্ষত্রধর্ম্মমাত্র ।

যুবক । সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন । আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

একেবারে শত বৃশ্চিকদশনের জ্ঞান এই কথায় দুর্জয়সিংহকে ক্রিপ্ত করিয়া তুলিল, রোবে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নিফুল্লিক বাহির হইতে লাগিল, মৃত্যু হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল । অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া, দেশকাল বিস্মৃত হইয়া, লক্ষ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন ।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলবোদ্ধা ধমুকে ভীর সংযোজন করিল । অপরিচিত যুবক বায়-হস্তে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, দক্ষিণ-

হস্তে ধীরে ধীরে দুর্জয়সিংহকে শূন্তে উঠাইয়া অস্ত্রবীর্ঘ্যের সহিত দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন ।

দুর্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক অবিচলিত ও নিঃশব্দ । যুবকের কোবে অগ্নি বহিয়াছে, যুবক তাহা স্পর্শ করেন নাই । পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিত স্বরে কহিলেন, “শয্যা রচনা হইয়াছে ।”

দুর্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন, “অন্তই স্বর্য্যমহলে বাটব ।”

তখন যুবক দুর্জয়সিংহের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উচ্চৈষ দিয়া নয়নবধর আবৃত করিলেন ও স্বয়ং অতিথির হস্তধারণ করিয়া গুচা হইতে বাহির হইলেন । এক ক্রোশ দুই জনে পর্ব্বত নামিতে লাগিলেন, একটি কথামাত্র নাই । নৈশ বায়ুতে বৃক্ষপত্র মর্ম্মরশব্দ করিতেছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে দূরস্থ শৃগাল বা বস্ত্রপত্বর শব্দ পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সে নৈশ বায়ুতে দুর্জয়সিংহের জলন্ত ললাট শীতল হইল না, সে নিশ্চক্ৰতার তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ স্তব্ধ হইল না ।

এক ক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জয়সিংহের নয়নের বস্র খুলিয়া দিলেন, দুর্জয়সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান । যুবক এই স্থানে দুর্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে তাঁহার মুখ পুনরায় আরক্ত হইল । কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ না করিয়া সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া একাকী দুর্গাভিমুখে চলিলেন ।

প্রাতঃকালের রক্তমাছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, একপ সমর দুর্জয়সিংহ স্বর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন । তিনি এতকণ

আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে সকলেই উৎকর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দোড়াইয়া আসিল, দুর্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গী ও রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। দুর্জয়সিংহকে তাহার চিনিত।

দুর্জয়সিংহ একাকী একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বাইয়া প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। শনি যুদ্ধে দুর্জয়সিংহের স্ত্রীর সাহসী, মন্ত্রণার অভুল্য। দুর্জয়সিংহ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া অর্ধশূটস্থরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে ?

প্রধান। সে কেবল আট বৎসরের কথা। অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল ?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্থ হ্রদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে।

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র ?

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র।

প্রধান। বালক তেজসিংহ ?

দুর্জয়। তেজসিংহ : কিন্তু সে অস্ত্র বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ব্রাহ্ম হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মৃত্যু বাঁচেনা, বালকের কথা কি ?

দুর্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সন্ধান হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন ? বাহ্যকে দম্ভ বৎসরের বালক অবস্থায় এক-

বার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চেনা-হুঃসাধ্য।

দুর্জয়। তাহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই, তাহার কথার চিনিয়াছি, আরও একটি উপায়ে চিনিয়াছি।

প্রধান। সে কি ?

দুর্জয়। তিলকের সহিত আমি একবার বাহ্যযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার অনুরবীর্ষ্য মেওয়ারের আর কেহ ধারণ করিত না। তাহার একটি বিশেষ যুদ্ধকৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অনুরবীর্ষ্য ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।

দুই জনে ক্ষণেক নিমন্তু রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। বিবেচনা করিলেন, রজনীতে অন্য কাহারও অনুরবীর্ষ্য দেখিয়া দুর্জয়সিংহের ভ্রম হইয়াছে। দুর্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন, “আরও একটি কথা আছে !”

প্রধান। কি ?

দুর্জয়। তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছে।

ঘরের দ্বার উন্মোচিত হইল। দুর্জয়সিংহ একাকী ছাদে পদচারণ করিতেছেন, অন্য তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিলে তাঁহার যোদ্ধা গণও চমকিত হইত।

রাজপুত জীবন সন্ধ্যা। অর্থ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবেশ করিল,
নিমন্তর।

বনের অ সালুমত্ৰা।

পুলশোক।

ভীতেষণি প্রভাঃ ঐতিঃ পরেষণি ধোষণে
বিনীতেষণি উক্ততাঃ দয়া পরেষণি নির্দয়াঃ দ্রোষণি
শূরাঃ ভূতোষণ কুরাঃ দীনেষণ দাক্ষণাঃ।

কাদম্বরী।

প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্যমহলের সৈন্ত-
সামন্ত সমজ্ঞ হইতে লাগিল। পূর্বদিক্
হইতে নবভাত সূর্য্যমুখি সৈন্তদিগের বর্ষা
খণ্ড ও ধ্বংসের উপর প্রতিকলিত হই-
লাগিল, সৈন্তগণ উৎসাহ ও আনন্দে না ?
করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রিত হইল।
দুর্জয়সিংহ সৈন্তদিগের আনন্দে ত করিয়া
ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া করিলেন।
সজ্জা করিলেন ও অচিরে হইতে সৈন্তগণ
করিয়া সৈন্তগণের মধ্যে অ
সৈন্তের জয়নাদে সেই প
বুদ্ধ গাজোখান
হইল।

আনন্দময় বসন্তের চারণ করিল না, ধীরে
পর্বত, উপত্যকা ও দিকে চাহিল, পরে ধীরে
গমন করিতে লাগি অত্যাচারী দুর্জয়সিংহের
এখনও গান করি
শিখিরবিন্দু এবং পরে গোকুলদাস কহিল,
বাইতেছে, 'তোকে ধনুর্বাদ দিতেছি।
পতাকা লইয়া বিশ্বরণ হইয়াছিলাম, সে কথা
উপর পর্বত রণ করিয়া দিলি—একদিন
রীর ভার সে দিব।'

বোদ্ধগণ এ

লাগিলেন,

সমরবাদ্য

বৃহত্তর জন

সায় দৃষ্ট

হইতে অব

রোহীদিগে
বনের ভি
সমিবেশমপদ্ম।

বাসবদত্তা।

তেছে
অন্ত সালুমত্ৰার পর্বত-দুর্গ কি যেনোহর
শ বারণ করিয়াছে! পর্বতশৃঙ্গ হইতে
চন্দ্রাওয়ারকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে
উজ্জীম হইয়াছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য
পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্মিত
ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাওয়ারকুলের বত
সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুমত্ৰার উপনীত
হইয়াছেন; কেহ দিশত, কেহ পক্ষত, কেহ
সহস্র সৈন্ত লইয়া চন্দ্রাওয়ারকুলাধিপতি রাও-
রং কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানী-
গণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতে-
ছেন, সৈন্তগণ পর্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে
অসংখ্য শিবির সমিবেশিত করিয়াছে। শিবি-
রের উপর হইতে চন্দ্রাওয়ার-পতাকা উড়ি-
তেছে, শিবিরের চারিদিক্ হইতে চন্দ্রাওয়ার-
কুলের বিজয়বাত বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে
যোদ্ধাঙ্গিরের হস্তধ্বনি ও উল্লাসরব শ্রুত হই-
তেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যমুখি সেই শিবি-
রের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের
নীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দ্রাওয়ার-পতাকা
লইয়া খেলা করিতেছে, অথবা চন্দ্রাওয়ার-রণ-
বাত চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকার
বা পর্বতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দ্রাওয়ার-
কুলের রণবাত ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্বেই
অনেকবার শ্রুত হইয়াছে, অনেক পর্বতে,
অনেক উপত্যকার, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-
দ্রুতর তত্ত্বিত করিয়াছে।

আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে রমেশচন্দ্রের প্রহাবলী।

হইয়াছিল। তাঁহার আদিগকে রক্ষা পথের দল্য কি দুর্গের অবীথর? এই দল্যর দৌড়াইয়া আসিল, দুর্জয়সিংহ দ্বারা “বলী” বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি আমাদের “স্বাধীন-ও রক্ষিমাংগ দেখিয়া সকলে ত। পূর্ববং ধর্মের” কোন ক্ষতি আছে? আমাদের গেল। দুর্জয়সিংহকে তাহার। ত, কিন্তু ‘বাগতা’ (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষর

দুর্জয়সিংহ একাকী একটি তাহার। স্বত্ব) আমরা ত দুর্জয়সিংহের নিকট বিক্রয় প্রকোটে বাইয়া প্রধান অর্থাৎ করিয়া করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধিকারী ডাকাইলেন। তিনি যুদ্ধে দুর্জয়সিংহ আশ্রয়, আমরা তাঁহার বলী, অন্য কাহারও

ইচ্ছিত দ্বারা তাঁহাকে বসিতে আদেশ গ্রামের লোকের মধ্যে এইরূপ ভাব করিয়া অর্দ্ধক্ষুণ্টকের কথোপকথন করিতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জুজ দুর্জয়সিংহ

দুর্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে প্রাচীরের এই বিরোধভাব দেখিয়া আরও কথোপকথন হইলেন, প্রজাদিগকে উচিত

প্রধান। সে কেবল আট বৎসরের দুইদবার জন্ত প্রধান প্রধান কয়েক কথোপকথন আছে। প্রকোটে দুর্গে ধরিয়া আনাহিলেন।

দুর্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে মনে মনে বিচার করিয়া সমস্ত প্রজার-বধ-পুত্রের কি হইয়াছিল? বিবেচনা এবং সদ্ধার গোষ্ঠীদ্বারের অনুবোধী দ্বারা বিরোধিতা-পাবে প্রাণ

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্ত্র হুদে রাখে। দুর্জয়, “আরও একটি কাণ্ডের পর অত দুর্জয়-পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অন্তাবধি প্রধান। কি এই গ্রামের ভিতর জীবিত আছে। দুর্জয়। তেজসিংহ বাইতে বাইতে

প্রধান। তিলকসিংহের পুত্র? রক্ষা করিয়াছে। একজন দীর্ঘকাল যত্নের দ্বারা উদ্বাটন। গোষ্ঠীদ্বারকে

দুর্জয়। তিলকসিংহের পুত্র। একাকী ছাদে পদচারণা আসা করিলেন, একটা করিতে

প্রধান। বালক তেজসিংহ? তাহার যুগের ভদ্রী দেখিলে। গণও চমকিত হইত।

দুর্জয়। তেজসিংহ; কিন্তু সে অত বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ভ্রাতৃ হইয়াছেন, এ দুর্গ যুগে দণ্ডায়-হইতে হুদে পতিত হইলে মৃত্যু বাঁচেনা, রূপ তিরস্কৃত

দুর্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু যন্ত্র বরুদ্ধে দাস

দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ একে প্রণাম

সঙ্গার হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন? র পূর্বোক্ত

বাহ্যকে দর্শন বৎসরের বালক অবস্থার এক-হের কথার

শ্রিত হইল,

তথাপি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কেবলমাত্র বলিল,
“ঐহু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস
নহে।”

দুর্জয়। তবে ভীক শূণ্যলোর বংশে কুম-
ন্ত্রণা অভ্যাস কত দিন হইয়াছে? বকী দাস-
বংশ-সাধু আচরণ কত দিন শিখিয়াছে?

গোকুলদাস। ঐহু, আমাদিগের হুত্যাগ্য-
বশতঃ আমরা বকী বটে, কিন্তু দাসব্দের
সহিত এখনও ভীকতা অভ্যাস করি নাই,
আমরা রাজপুত্র।

অন্তান্ত অধারোহিগণ দেখিলেন, নির্ঝোখ
গোকুলদাস আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাই-
তেছে। দুর্জয়সিংহ ক্রুদ্ধবরে কহিলেন, “রে
বৃদ্ধ, পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তথাপি এখ-
নও রাজার প্রতি আচরণ শিখিলি না?
দুর্জয়সিংহ এইরূপে দাসকে আচরণ শিখায়।”
এই বলিয়া ক্রুদ্ধ দুর্জয়সিংহ পদাঘাত করিয়া
বৃদ্ধ গোকুলদাসকে ভূতলশায়ী করিলেন।
নির্ঝাক হইয়া সে স্থান হইতে সৈন্তগণ
চলিয়া গেল।

খেতঅশ্রু দীর্ঘাকার বৃদ্ধ গাজোখান
করিল। রাজপুত্রের পক্ষে এই অসহ্য অব-
মাননার একটি শব্দ উচ্চারণ করিল না, ধীরে
ধীরে নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল, পরে ধীরে
ধীরে সেই বিষম অত্যাচারী দুর্জয়সিংহের
দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ পরে গোকুলদাস কহিল,
“দুর্জয়সিংহ, তোকে ধন্যবাদ দিতেছি।
পুত্রশাকে প্রায় বিশ্বরণ হইয়াছিলাম, সে কথা
তুই আজ স্মরণ করিয়া দিলি—একদিন
ইহার প্রতিফল দিব।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সালুম্ভা।

অরুণবাহুদয়গুহ্যবাহুদয় বাসায়ানবিক্রান্তপুত্রহঃ
* * * সেনাসমিবেশবপ্তম্ভ।

বাসবদত্তা।

অন্ত সালুম্ভার পক্ষত-দুর্গ কি মনোহর
রূপ ধারণ করিয়াছে! পক্ষতশৃঙ্গ হইতে
চন্দাওরংকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে
উজ্জ্বল হইয়াছে, দুর্গের স্থানে স্থানে অসংখ্য
পতাকা উড়িতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্মিত
ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দাওরংকুলের বস্ত
সেনানী আছেন, তাঁহার সালুম্ভার উপনীত
হইয়াছেন; কেহ দিশত, কেহ পঞ্চশত, কেহ
সহস্র সৈন্ত লইয়া চন্দাওরংকলাধিপতি রাও-
রং কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে আসিয়াছেন। সেনানী-
গণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতে-
ছেন, সৈন্তগণ পক্ষতের নীচে সৈমতল ক্ষেত্রে
অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। শিবি-
রের উপর হইতে চন্দাওরং-পতাকা উড়ি-
তেছে, শিবিরের চারিদিক হইতে চন্দাওরং-
কুলের বিজয়বাণ্য বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে
যোদ্ধাদিগের হস্তধ্বনি ও উল্লাসব শব্দ হই-
তেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবি-
রের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের
শীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাওরং-পতাকা
লইয়া খেলা করিতেছে, অথবা চন্দাওরং-রণ-
বাণ্য চারিদিকে ক্ষেত্রে, গৃহে, উপত্যকার
বা পক্ষতশৃঙ্গে বিস্তার করিতেছে। চন্দাওরং-
কুলের রণবাণ্য ভারতক্ষেত্রে ইহার পূর্বেই
অনেকবার শব্দিত হইয়াছে, অনেক পক্ষতে,
অনেক উপত্যকার, অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে শব্দ-
ভর্য ভবিত করিয়াছে।

রথবাড়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র বাণ্ড ও ঐত হইতেছে। কাস্তনমাস বোলায় মাস; পথে, ঘাটে, গৃহঘারে নাগরিকগণ দলে দলে গীত গাহিতেছে, একে অস্ত্রের দিকে আবার নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্নবিপদ বিস্মৃত হইতেছে। উৎসব-দিনের প্রভাবে অস্ত্র নানারূপ অস্ত্রাস্ত্র গীতও হইতেছে, নানারূপ অশ্রাব্য কুৎসিত কোতুকে নাগরিকগণ বিমোহিত হইতেছে। সে কোতুক, সে আবার-নিক্ষেপ হইতে অস্ত্র কাহারও পরিজ্ঞান নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলই সমান, সালুয়ার প্রধান সেনানী বা প্রধান মন্ত্রীও পথ অতিবাহন-কালে নাগরিকদিগের আবারে রঞ্জিত ও বাতিবাস্ত হইলেন; নাগরিকদিগের কোতুকে বিরক্ত হইলেন না। অস্ত্র কাহারও পরিজ্ঞান নাই। অন্নবয়স্ক বালকগণ বুদ্ধের খেতখান রক্তবর্ণ করিতেছিল, বুদ্ধ প্রহার করিতে আসিলে বালকগণ তাহার নয়নে আবার দিয়া কঁরতালি দ্বারা অন্ধকে উপহাস করিতে লাগিল। অস্ত্র কাহারও পরিজ্ঞান নাই। কৃষ্ণসিংহের প্রাসাদ হইতে দরিরের কুটার পর্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল, দলে দলে বালক ও বৃদ্ধগণ পথে পদচারণ করিতে লাগিল, দলে-দলে ললনাগণ পথে, ঘাটে, গৃহঘারে কাম্বোজের কমনীর গীত উচ্চারণ করিতে লাগিল।

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওরং কৃষ্ণসিংহ দরীশালার অর্থাৎ সভাগৃহে আসিলেন, কৃষ্ণসিংহের সম্মুখে গারক চন্দাওরং-কুলের গৌরবগান গাইতে গাইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাগৃহে দুর্জয়সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ বোদ্ধগণ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া “মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন” বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণসিংহ মন্তক

নত করিয়া মঙ্গলচ্ছ বোদ্ধাঙ্গিরের সন্ধান করিলেন।

রাওরং কৃষ্ণসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাহার দক্ষিণে ও বাম-দিকে বোদ্ধগণ দণ্ডায়মান রমিয়াছেন, সকলেরই হস্তে খড়্গ ও ঢাল। বীরদিগের উপর সানন্দে নয়নক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসিংহ তাঁহাদিগকে বসিবার আদেশ করিলেন, বোদ্ধগণ নিজ নিজ স্থানে বসিলেন, ঢালের সহিত ঢালের সজ্জবর্ণ-শব্দ সেই প্রশস্ত সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল।

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গভীরস্বরে বলিলেন, “বীরগণ! অস্ত্র সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের হস্তে, মেওয়ারের উর্কর ক্ষেত্রচর ও সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কীদিগের হস্তে; কেবল পর্বত ও জঙ্গল-পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী নুতানিত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে স্বেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

উক্তরে কমলমার হইতে দক্ষিণে রক্তনাথ পর্যন্ত পর্বতপ্রদেশমাত্র মহারাজার অধীন, অবশিষ্ট সমস্ত প্রশস্ত ভূমি মোগলের করকবলিত। কিন্তু এই প্রশস্ত ভূমি হইতে মোগলের কোন লাভ নাই। মহারাজার আদেশে এ মোগল-করকবলিত প্রদেশ জনশূন্য অরণ্য। এ স্থানে এক্ষণে কুবক চাব করে না, গোরক্ষক গোরক্ষ করে না, মদ্রম্বা বাস করে না; মহারাজার আদেশে এ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী পর্বতপ্রদেশের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে, বুনাগ ও রবানদীর তীরে উর্কর ক্ষেত্রচর এক্ষণে জঙ্গলময় ও হিংস্রক পশুর আবাসস্থল হইয়াছে, আরাবলীপর্বতের পূর্বদিকস্থ সমস্ত মেওয়ার-প্রদেশ প্রদীপশূন্য।

মহারাণার আদেশ কে লঙ্ঘন করিতে পারে ? মহারাণা স্বয়ং সতত এই প্রদেশ দর্শন করিতে বান, সালুম্ভ্রা সতত মহরাজের সঙ্গে গিয়াছে। সমস্ত প্রদেশে অরণ্যের নিষ্কল-নতা দর্শন করিয়াছি, অরণ্যের নিস্তরতা অবগত করিয়াছি, শস্তের স্থানে উচ্চ তৃণক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি, গমনাগমনের পথে কটক-ময় বাবুল-বৃক্ষ ও নিবিড় জঙ্গল দেখিয়াছি, মানবগৃহে হিংস্রক পশুকে বাস করিতে দেখিয়াছি। একজন ছাগরক্ষক বুনাঙ্গ-নদী-তীরে নিভূতে ছাগরক্ষা করিতেছিল, তাহার মৃতদেহ এখনও বৃক্ষে লম্বমান রহিয়াছে। অল্প কের মহারাজের আত্মা লঙ্ঘন করে নাই।

মোগলগণ বুঝিবে, মেওয়ারের উদ্ভান-ধও এক্ষণে অরণ্য ও অফলপ্রদ। তাহারা জানিবে, মহারাণার সাহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এক্ষণে অরণ্য পার হইতে হইবে, তথায় মনুষ্য নাই, সৈন্তের খাদ্য নাই, আবাস-স্থল নাই। তাহারা আরও জানিবে, সুরাট প্রভৃতি পশ্চিম-মাগরের বন্দরের সহিত দিল্লীর যে বাণিজ্য ছিল, তাহা এক্ষণে নিষিদ্ধ। এক্ষণে অরণ্যের ভিতর দিয়া তথায় যাইতে হইবে, গমনের সময় আমরা সুস্থ থাকিব না।

বীরগণ ! এইরূপে আমরা মেওয়ারের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়াছি। পর্বতপ্রদেশের ভিতরে প্রতি দুর্গে, প্রতি উপত্যকার সৈন্ত আছে। চন্দাওরংকুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে, অস্ত্রাস্ত্র বোদ্ধকুল চারিদিক হইতে আসিতেছে, সমুদ্র-ধর্মের জন্ত মহারাণার সৈন্তের অপ্রতুলতা হইবে না। কুমিমাগণ যুদ্ধ জানে না, তাহারা নিজ নিজ উপত্যকা ও নিজ নিজ আবাসপর্বত রক্ষা করিবে। বহুজাতিগণও বহুক্ষণহস্তে

যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাঞ্চল তুর্কীদিগকে সশস্ত্র উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ দিল্লীস্থরের পুত্রের সহিত বড় ধুমধামে আসিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

বীরগণ ! এক্ষণে হোলীর সময়, নাগ-রিকগণ চাইতে আপনাদিগেরও পরিজ্ঞান নাই, আমরাও পরিজ্ঞান নাই। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবার দেখিতেছি, দুই নাগরিকগণ আমাদের শুক্লকেশ ও ধেমশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটার, পথ, ঘাট সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে বোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন। বোদ্ধার মস্তক ও বক্ষ অস্ত্র প্রকারে রঞ্জিত হইবে, এই পর্বত-সঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্য-শোণিতে রঞ্জিত হইবে। এই নাগরিক-দিগের গীত ও বাজ্য শুনিতেছ, সেদিন মেওয়ারে অস্বরূপ বাজ্য হইবে, অস্বরূপ গীত গগনে উথিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্ত আমরা বোদ্ধগণ প্রস্তুত হও।”

সালুম্ভ্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে বোদ্ধগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, কনখনাশে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল। সে শব্দ, সে হুঙ্কার সভ্যাম্বারে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্ভ্রার পর্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উথিত হইল। এই উল্লাসরব ধামিতে ধামিতেই সেই প্রশস্ত সভ্যগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্ভ্রার বুদ্ধ চারদিকের পূর্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

গীত।

“বোদ্ধগণ ! আপনারা যুবক, আপন-

দিগের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে আপনাদিগের আশা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। রক্তের দৃষ্টি অতীত। সেই অতীতকাল রক্তবর্ণ মেঘমালায় স্নায় আমার মানসচক্ৰ আচ্ছাদন করিতেছে, আমি বহিঃগং দেখিতেছি না। সেই মেঘমালায় মধ্যে অন্য একটি জগৎ দেখিতেছি, অন্য বীর আকৃতি দেখিতেছি, জীবন করুন।

অন্য আমাদের মহারাণা চিতোরে নাই, মহারাণা পর্তত-কন্দরে বাস করেন, মহারাণা বৃক্ষতলে শিশুদিগকে লালন-পালন করেন, শব্দশূন্য নিবিড় জঙ্গল মহারাণার শুদ্ধান্তঃপুর। বালাকালে আমি আর একজনকে এইরূপ দেখিয়াছিলাম, তিনিও পর্ততগহ্বরে বাস করিতেন, পর্ততশিখর তাঁহার উন্নত প্রাসাদ ছিল। সুদূর-শ্রুত সঙ্গীতের স্তায় পূর্বকথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, হৃদয় আলোড়িত করিতেছে, সে কথা শ্রবণ করুন।

সেই বালক একদিন স্রাতার সহিত চারগীদেবীর পর্ততে গিয়াছিলেন; নির্ভীক বালক অল্প আসন ত্যাগ করিয়া সিংহচর্খের উপর বসিলেন। চারগীদেবী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘যিনি সিংহচর্খের উপর বসিলেন, একদিন তিনি সিংহাসনে বসিবেন।’ রোবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালককে আক্রমণ করিল, কেন না, উভয়েই রাজপুত্র। বালক আঘাতে জর্জরিত-কলেবর হইয়া এক চক্ৰ অঙ্ক হইয়া পলাইল। কোথায় পলাইল?

ছাগরক্ষকদিগের নিকট অন্বেষণ কর। তাহাদিগের ঐ মলিন-বেশধারী অশ্চ-ভেজঃপূর্ণ ভূতাতিকে? ছাগরক্ষকগণ জানে না, জানিলে কি ছাগরক্ষকে

অপটু বলিয়া বালককে অবমাননা করিয়া দূর করিয়া দিত? অবমানিত, দূরীকৃত বালক কোথায় বাইল?

জঙ্গলের ভিতর অন্বেষণ কর। শ্রীনগরে বীর করিমটাদের একজন সামান্য সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া কি স্থানে নিজা বাইতেছে। বটবৃক্ষই তাঁহার চক্রা-তল, ভূগই তাঁহার শয্যা, খড়গই তাঁহার উপাধান। বৈকালিক সূর্য্যকিরণ সেই পত্ররাশি ভেদ করিয়া বালকের সূত্রের উপর পড়িয়াছে, একটি বৃহৎ সর্প চক্র বিস্তার করিয়া সেই রৌদ্র নিবারণ করিতেছে। করিমটাদের সামান্য সেনার জন্ত কি সর্প চক্র বিস্তার করিয়াছে? এ সামান্য সেনা নহে, এ বালক গুপ্তবেশে রাজপুত্র, সর্প বালকের রাজচ্ছত্রধারী।

দিন গেল, মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, সেই বালক সিংহাসনে বসিলেন, রাজচ্ছত্রধারী তাঁহার উপর ছত্র ধরিল। ঐ শুন বজ্রনাদ, ঐ দেখ, সংগ্রামসিংহের অগ্নীতি সহস্র শাখা-রোহী যেদিনী কম্পিত করিতেছে, ঐ দেখ, তাঁহার অসংখ্যক জ্যোতীকায় আকাশ রক্তবর্ণ হইতেছে; ঐ দেখ, শতজ হইতে বিচ্ছাদল পর্য্যন্ত ও সিদ্ধ হইতে বসুনা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, অষ্টাদশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি এ রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। পুনরায় কি পৃথীরাজের স্তায় আখ্যাবর্ত একচ্ছত্র করিবেন? কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম-দিকে মেঘরাশি জড় হইতেছে, সে ঝটিকা ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল, নূতন আগন্তক বাবরের মোগল-সৈন্য ভারত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল! সিংহবল প্রকাশ করিয়াও সংগ্রামসিংহ বাবরের নিকট

পর্যন্ত হইলেন। কিন্তু বীরের বীর-প্রতিজ্ঞা প্রবণ কর—বড় দিন বাবরকে পরাস্ত না করিব, তত দিন চিতোর-প্রবেশ করিব না; মরুভূমি আমার শয্যা, আকাশ আমার চম্ভাতপ। সংগ্রামসিংহ প্রতিজ্ঞা-সম্মত করে না। পুথুরাজের সিংহাসনে কি আবার হিন্দুরাজ্য উপবেশন করিবেন? আমি বুদ্ধ হইয়াছি, আর দেখিতে পাই না, সংগ্রামসিংহ কোথায় গেলেন? তাহার অধীনস্থ বোদ্ধপ রাজা ও শতাধিক রাওর ও রাওরল কোথায় গেলেন? পঞ্চশত হস্তী, অশ্বীতি সহস্র অশ্বরোহী কোথায় গেল? সে আলোক নির্ভাণ হইয়াছে! সে মহাতেজ চিরকালের অস্ত লীন হইয়াছে!

লীন হয় নাই! বোদ্ধগণ, সবল হস্তে খড়্গ ধারণ কর, তীক্ষ্ণ বর্শা মস্তকের উপর উত্তোলন কর, হুকার-রবে যুদ্ধে ধাবমান হও, বায়ু-ভাঙিত তৃণবৎ তুকাঁ-দিগকে দূরে তাড়াইয়া দাও, চিতোরনগর জয় জয় নামে পরিপূরিত কর। বৃদ্ধের পূর্বা-স্মৃতি কেবল স্বপ্ন নহে, মেওয়ারের পূর্কদিন আসিবে। পূর্কত-কন্দর ও নিবিড় বন ভাগ করিয়া সংগ্রামসিংহের স্ত্রায় প্রতাপ-সিংহও সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সংগ্রামসিংহের স্ত্রায় প্রতাপসিংহের নামও দ্বিতীয় দ্বার পর্য্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত, হিমাচলের তুষারাবৃত উন্নত শেখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।”

বুদ্ধ নীরব হইল। কণমাত্র সভাস্থল নীরব, সহস্রা শত বোদ্ধার বজ্রনাভ ও হুকার-শব্দে সানুসৃত্যার পূর্কত কম্পিত হইল। পূর্কতের নীচে সৈন্তগণ সে শব্দ শুনি, শতশত উচ্চরবে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত করিল।

চারপদেব নিজ স্থানে উপবেশন করিলে পর সানুসৃত্যধিপতি বোদ্ধাধিপতির দিকে চাহিয়া গভীর-স্বরে বলিলেন, “বীরগণ, বৃদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধসময়ে সানুসৃত্য সর্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্তসংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চম্ভাওরংকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সৈন্তে উপস্থিত হইরাছেন, চল, কল্যাই আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলময়ীরাতিমুখে বাজা করি। বীরগণ, আমাদের সভাতল হইল। বহুগণ, অস্ত্র হোলীর দিন, চল, একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই। আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?”

প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত ছাদে বোদ্ধাগণ অশ্বরোহণে হোলী দেখিতে লাগিলেন, অশ্চালনে ও আবারনিক্ষেপে নিপুণতা দেখাইতে লাগিলেন। পরস্পরের কুহুনে পরস্পরের মস্তক, দেহ ও অশ্বদেহ রঞ্জিত হইল, অশ্বের পদশব্দ ও বোদ্ধা-দিগের আনন্দরব চারিদিকে স্রুত হইল, অশ্বগণ কখন তীব্রগতিতে যাইতেছে, কখন সহসা দণ্ডায়মান হইতেছে, কখন লক্ষ দিয়া গলাইতেছে, যেন তাহার। এই ক্রীড়ার উন্নত। অশ্বরোহিগণ অসাধারণ নিপুণতার সহিত অশ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও অপরের উপর আবার নিক্ষেপ করিতেছেন। নীচে সৈন্তগণ, নগরে নাগরিকগণ এই ক্রীড়ার লিপ্ত হইল, সাংবৎসরিক আনন্দ-রয়ে সানুসৃত্য-পূর্কত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেনানী ও সৈন্তগণের মধ্যে কয়জন পরবৎসরে পুনরায় এই ক্রীড়া করিবে? আর কত সহস্র জন তাহার পূর্কে হলদীবাটার ভীষণ পূর্কততলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

প্রতাপসিংহ ।

হাজো বা আগুয়াসি বন্দ

দিয়া বা জোকারে বন্দ ।

ভগবৎসিদ্ধা ।

কয়েক দিবসমধ্যে চন্দাওরংকুলেশ্বর সালুয়াধিপতি সমস্ত চন্দাওরংকুলের সৈন্ত লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন । অস্ত্রাস্ত্র কুলের বোদ্ধাগণ দলে দলে আসিতে লাগিল । দেবগড় হইতে চন্দাওরংকুলেশ্বর বিসহস্র সৈন্ত লইয়া আসিলেন, তাহারও চন্দাওরংকুলের এক শাখামাত্র । বেদনোরের মৈত্রীকুলেশ্বরগণ বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া আসিলেন, তাহার রাঠোরবংশীয়, যেওয়ারে তাহারিগের অপেক্ষা সাহসী বোদ্ধা ছিল না । এই বংশের জয়মল্লই আক্বের কর্তৃক চিত্তোর আক্রমণকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আক্বের-হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা এখনও সে কথা বিশ্বাস হন নাই, পিতার বীরত্ব অমূল্য করিতে করিতেই মহারাণার নিকট আসিয়াছেন । কৈলওরা হইতে জগাওরংকুল বহুসংখ্যক সৈন্ত লইয়া কমলমীরে আসিলেন, তাঁহারও চন্দাওরংকুলের শাখা মাত্র । এই জগাওরংকুলোদ্ভব পত্তনামক বীরশ্রেষ্ঠ চিত্তোরধ্বংসকালে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । সালুয়াধিপতির মৃত্যুর পর ষোড়শবর্ষীয় পত্তন চিত্তোরধার রক্ষা করেন, অকম্পিত-হৃদয়ে সমুখবৃদ্ধে নিজ মাতা ও বনিতার মৃত্যু দেখেন, অকম্পিত-হৃদয়ে সেই দারদ্রোশে সমুখবৃদ্ধে প্রাণদান করেন । তাঁহারই জাতি-বন্ধু এক্ষণে জগাওরংকুলেশ্বর, জগাওরংকুলের নাম রাখিতে

কৈলওরা হইতে আসিয়া এক্ষণে মহারাণার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছেন । কৈলওরা হইতে ঝালাকুল, বৈদুলা ও কোটারি হইতে চোহানকুল, বিজলী হইতে প্রমারকুল, অস্ত্রাস্ত্র হান হইতে অস্ত্রাস্ত্র কুলের বোদ্ধাগণ মেঘ-রাশির ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দিকে জড় হইতে লাগিল । অচিরে বাবিশ্ব সহস্র সৈন্ত কমলমীরে উপস্থিত হইল, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ বাবিশ্ব সহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশাভরাণী বোদ্ধা আর ছিল না ।

অতঃকালীনমাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবের শেষ দিন, স্মৃতরাং রজনী দ্বিপ্রহরে সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে । পর্ত-শিখরে, উপত্যকার, নগরের পথে, গৃহস্থের বাটীতে, অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা বাইতেছে ; রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্তরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে । সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে, হোলীকে মঞ্চ করিতেছে, গীতরবে ও হাস্যধ্বনিত নৈশ নিস্তব্ধতা বিদূষিত করিতেছে । পর্তশিখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা বত দূর দেখা যায়, বুদ্ধরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে । কল্ কল্ রবে পর্ত-নদী সেই উপত্যকার মধ্যে দিয়া বহিয়া বাইতেছে, আপন স্বচ্ছবক্ষে এই অসংখ্য অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে । বসন্ত-গীতের মধ্যে মধ্যে চারণ-দিগের যুদ্ধবর্ণনা স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে, যেওয়ারের পূর্বগৌরব, যেওয়ারের বিপদ-রাশি, যেওয়ারের আশ্রয়বিষয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যগণলীকে প্রোৎসাহিত করিতেছে, আনন্দ-গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গীত নৈশ গগনে উথিত হইতেছে ।

সমস্ত উৎসবব্যাপার হইতে বহুদূরে

একটি অন্ধকারময় পর্কতহুলী উপর একজন বোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতে-
ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান
হইরাছিলেন, কিন্তু উৎসবের গীত শুনিবার
অন্ত নাই। মধ্যে মধ্যে সেই উপত্যকার
মধ্যে বতদূর দেখা যায়, দৃষ্টিমিথ্যেপ করিতে-
ছিলেন, কিন্তু উৎসবের অধিভূক্ত দেখি-
বার অস্ত্র নহে। কখন কখন কমলমীরের
অপূর্ণ শৈল-ভূগের উপর নয়ননিষ্কপ
করিতেছিলেন, কখন অসংখ্য সৈন্যের দিকে
চাহিতেছিলেন, কখন বা আপন হৃদয়ে হস্ত
স্থাপন করিয়া সেই নক্ষত্রবিভূষিত অন্ধকার-
ময় নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে-
ছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান
রহিয়াছে, নিকটে বৃক্ষতলে তৃণশয্যা রচিত
হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া
বোদ্ধা অস্ত্রশয্যা শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা
করিয়াছিলেন। সেই ব্রত যত দিন না সিদ্ধ
হয়, তত দিন সুবর্ণ-রৌপ্য স্পর্শ করিবেন না।
জটা-শ্রাঙ্গ বিমোচন করিবেন না; বৃক্ষপত্র
ভিন্ন অস্ত্র পাत्रে ভোজন করিবেন না; বেশ-
ভূষা সামান্ত দ্রব্য ভিন্ন অস্ত্র কিছু স্পর্শ
করিবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণও
ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত
ধারণ করেন নাই, জগতের বীরাগ্রগণ্য-
গণও অভীষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা
জীবনব্যাপী উত্তম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য, বীরত্ব, বুদ্ধি-
বল, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে
একত্রিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে রাজস্থানের
অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর,
বুলী প্রভৃতি প্রদেশের বুদ্ধবল একত্রিত হই-
য়াছে। ঐ নির্জন পর্কতহুলীতে বে বোদ্ধা
অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথবা বেশে ও দাবীন-
তার জন্য শেষ রণস্থলে, মেওয়ারের শেষ
উপত্যকার বা পর্কত-কঙ্করে হৃদয়ের শোণিত-
দিবেন হিরসম্বল করিয়াছেন।

রজনী যিপ্রহরের পর মহারাণায় কয়েক-
জন প্রধান সেনানী সেই স্থানে উপস্থিত হই-
লেন। মহারাণা তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা
করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে আনিতে
দেখিরা রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি
সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্কতহুলীতে সকলে উপবেশন
করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন, “বীরগণ!
আপনাদিগের সাহস, আপনাদিগের উৎসাহ
দেখিরা আমি আনন্দিত হইয়াছি, এই শিখর
হইতে এই অসংখ্য সৈন্য দেখিরা আমি
উল্লাসিত হইয়াছি, সেইজন্য আপনাদিগকে
ধন্যবাদ দিতে এই নির্জন স্থানে আহ্বান
করিয়াছি।”

সালুস্‌ত্রাধিপতি রাওয়ৎ কুঙ্কসিংহ রাণার
দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,
“মহারাণা! যুদ্ধের সময়, বিপদের সময় কবে
মেওয়ারের বোদ্ধাগণ মেওয়ারের মহারাণার
পাখ্য তাগ করে? ঐ বে অসংখ্য সৈন্য
দেখিতেছেন, উহাদের হৃদয়ের শোণিত,
আমাদের হৃদয়ের শোণিত মহারাণার।
আজ্ঞা করুন, সে শোণিত বহিবে।”

প্রতাপ। কুঙ্কসিংহ, আপনার কণ আমি
কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যে
দিন পিতার মৃত্যু হয়, যে দিন ভ্রাতা বোগমন্ড
সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সে দিন সভার
মধ্যে আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,
“মহারাণা! আপনার ভ্রম হইয়াছে, ঐ
স্থান আপনার ভ্রাতার।” সেই দিন
আপনিই আমার কোষে এই অসি বুলাইয়া

দিয়াছিলেন; বতকণ আসি আমার হস্তে থাকিবে, ততকণ সালুস্ত্রাধিপতি আমার দক্ষিণে থাকিবেন।

কৃষ্ণসিংহ। সালুস্ত্রা ইহা ভিন্ন অন্য পুরুষার চাহে না। স্বামিধর্মই সালুস্ত্রার পুরুষাঙ্গত ধর্ম, স্বামিধর্মই সালুস্ত্রার পুরুষাঙ্গত পুণ্যকার।

পরে রাঠোরবংশীয় জয়মল্ল ও জগাওরংবংশীয় পন্তের সন্ততি ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিয়া মহারাণা বলিলেন, “চিতোর-ধ্বংসের সময় জয়মল্ল ও পন্ত জীবনদান করিয়া যে বশ ক্রয় করিয়াছেন, পুনরায় চিতোর অধিকার করিয়া আপনারাও কি সেই বশ ক্রয় করিতে অভিলাষ করেন?”

তাহারা উত্তর করিলেন, “সাধন জগদীশ্বরের হস্তে, চেষ্টার বোদ্ধাগণের ক্রটি হইবে না।”

পরে কোটারির চোহানকুলেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা কহিলেন, “পিতা বখন হত্যাকারক রণবীরের করকবল হইতে গোপনে আনীত হইয়া এই কমলমীরে গোপনে বাস করিতেছিলেন, যখন পিতাকে সকলে সন্দেহ করিয়াছিলেন, চোহানকুলেশ্বরই তাহার সহিত আহার করিয়া সন্দেহভঞ্জন করেন। চোহানকুল সে স্বামিধর্ম এখনও বিস্মৃত হন নাই।”

চোহান। চোহানকুল স্বামিধর্ম কখনও বিস্মৃত হয় না।

প্রতাপ। বিজলীপতি! আপনার পিতাই পিতার সেই দুরবস্থার ঠাহাকে কস্তাদান করিয়াছেন। মাতুল! আপনি প্রতাপের প্রতি যত ভুলিবেন না, এই আসন্ন যুদ্ধে প্রতাপের নাম ও প্রতাপের গৌরবরক্ষা করিবেন।

উল্লাসে বিজলীপতি বলিলেন, “সে

গৌরবরক্ষার্থ প্রমত্তকুল সানন্দে জীবনদান করিবে।”

পরে দৈলওয়ারার অধীশ্বরের দিকে চাহিয়া মহারাণা কহিলেন, “কালাকুল মেওয়ারের তত্ত্বস্বরূপ, আসন্ন বিপদে তাহারাই আমাদিগের প্রহরিস্বরূপ।”

দৈলওয়ারাপতি উত্তর করিলেন, “কাল স্বামিধর্ম জানে, যুদ্ধকালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।”

এইরূপে সকল বোদ্ধার সহিত ক্রমে কথোপকথন হইলে পর মহারাণা কহিলেন, “বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনাদিগের নিকটে অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রে সৈন্তবল মেঘরাশির স্তায় একত্রিত হইতেছে, বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে; শত্রুগণ আমাদিগকেও স্রুযুপ দেখিবে না। তাহার মেওয়ারের উর্ধ্বাংশে জঙ্গলময় দেখিবে; মেওয়ারের পর্বত-বেষ্টিত প্রদেশে তাহাদিগের প্রবেশ নাই।

বাল্মীকীর বংশ কি বিদেশীয়দিগের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে? তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদায়কুল একবারে বিলুপ্ত হউক, সুন্দর মেওয়ার-দেশের পর্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

প্রতাপসিংহ মাতুলের উচ্ছল করিবে, প্রতাপসিংহ তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধিবে, পুরুষদিগের বাহবল এ বাহুতে আছে কি না, দেখিবে। বোদ্ধাগণ! আমরা কন্দরে ও পর্বতগুহার বাস করিব, বাল্মীকীর কুল স্বাধীন রাখিব, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না, কখনও জানিবে না।

উৎসবের দিন অল্প শেষ হইল, আমা-
দিগের কার্যের দিবস উদয় হইতেছে ।
বোদ্ধাগণ! সে কার্যে ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে
অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আকবর
শাহ দেখিবেন, মেওয়ারের রাজপুত্র-গৌরব
বিনশ্ত হইয়া নাহি ।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—০—

মানসিংহ ।

যেনাত্ত্বাদিতেন চন্দ্রমিতকান্তিঃ রবেী তন্তু তে ।

যুজ্যতে প্রতিকর্ষ্মেব ন পুনন্তৃত্বৈব পাদগ্রহঃ ॥

কাব্যপ্রকাশ ।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস
অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস
প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি
যে পর্তত-বেষ্টিত প্রদেপথও রক্ষা করিবার
মানস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রত্যেক
দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ততকন্দের
বার বার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয়
করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্তগণকে ও
সমস্ত মেওয়ারবাসিগণকে উৎসাহিত করি-
লেন। দুর্গেধরগণ সৈন্তে রাণার সহিত
যোগ দিলেন। ভূমিরাগণ সমুদ্র-রণ জানে
না, কিন্তু নিজ নিজ ভূমিরক্ষার্থ প্রাণ দিতে
প্রস্তুত হইল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও
মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল;
দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্বে মৌরগণ, পশ্চিমে মীনা-
গণ বহুদূরগন্তে আসিয়া রাজপুত্র বোদ্ধা-
দিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ
রণরঙ্গে উন্নত হইল।

সর্বদাই মহারাণা অল্পসংখ্যক সৈন্ত
লইয়া পর্ততপ্রবেশ হইতে নির্গত হইতেন।

দেখিতেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে মেও-
রারের সমভূমি ও উদ্যানস্থল এক্ষণে জনশূন্য
ও অরণ্যময়। লোকালয়ে হিংস্রক জীব বাস
করিতেছে, শস্ত্রক্ষেত্র অরণ্য হইয়াছে, বুনাস
ও রবীনদীর উপকূলে মহাযাকৃতি বৃষ্ট হইয়া
মহাধারব প্রত হইয়া না। প্রতাপের সৈন্ত
দেখিয়া অরণ্যবিচারী পক্ষী কুলার ছাড়িয়া
উচ্চশব্দে আকাশের দিকে উড়িয়া হইল,
অরণ্যবাসী ভক্তগণ ধূরে নিবিড় অরণ্যের
মধ্যে পলাইল। যতদূর দৃষ্টি হয়, যেন দৈব-
সম্পাতে এই মহাব্যোম আবাসস্থল নির্জন
হইয়া গিয়াছে। কটকর্ময় বাবুলবৃক্ষে ও
জঙ্গলে এই বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত হই-
য়াছে। নিঃশব্দে এই বনবিচরণ করিয়া
প্রতাপসিংহ প্রত্যাবর্তন করিতেন; বলিতেন,
“সমগ্র মেওয়ারদেশ এইরূপ নির্জন অরণ্য-
ভূমি হউক, কিন্তু সে পবিত্রভূমি তুর্কাপদ-
বিক্ষেপে যেন কলঙ্কিত না হয়।”

রাণা সমস্ত দিন যুদ্ধের আয়োজনে অতি-
বাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্তত-
কন্দের প্রত্যাবর্তন করিতেন। দেখিতেন,
পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জালিয়া রন্ধন করি-
তেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীনপরিচ্ছদে
ক্রীড়া করিতেছে। রাণা রণ-পরিচ্ছদ ত্যাগ
করিতে করিতে স্নেহে কহিতেন, “জগদী-
শ্বর! যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের মাতা
চিরকাল এই পর্ততকন্দের বাস করে, কিন্তু
তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।”

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত
হইল। অবশেষে সম্রাট আকবরের পুত্র যুং-
রাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্ত
লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন।
নাগরতরঙ্গের দ্বার অসংখ্য সেনা মেওয়ারের
বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ
কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে

মোগলসৈন্য সুসজ্জিত পর্বতপ্রদেশের নিকট আসিল; দেখিল, সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশস্থল—হলুদীবাড়ি। দাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী। মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সমগ্র মোগলসৈন্য যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত হইল।

পাঠক। যুদ্ধের প্রাকালে চল, আমরা একবার মোগল-শিবিরে প্রবেশ করি। বে মহাবীর অবরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়-পতাকা বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করি। হায়! হায়! জাতিবিরোধের ভার আর বিরোধ নাই। জাতিবিরোধের জন্ত অস্ত্র রাজপুতকুলভিলক মানসিংহ রাজপুতকুলভিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু।

রজনীতে বহুসংখ্যক মোগলশিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের আলোকে সেই অন্ধকারময় পর্বতপ্রদেশ উদ্ভীষ্ট হইয়াছে, স্থানে স্থানে সৈন্তগণ একত্র হইয়া কলরব করিতেছে। মেওয়ারীদিগের বেক্রপ প্রতিজ্ঞা, অবশ্যই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধ হইতে করজন পুনরায় দূর-দিল্লীপ্রদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে?

এই শিবিরশ্রেণীর মধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য নীপ ও পতাকা-বিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। প্রস্তুত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রফুল্লচিত্তে গীত শুনিতেছেন। সমুখে সুরাপাত্র, নিকটে কলকঙ্কী প্রৌঢ়-মৌবনা করেকজন গারিকা। যুবরাজের অব-রব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট প্রশস্ত ও সূক্ষ্ম। কল্য যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অস্ত্র সেই প্রশস্ত ললাট

চিন্তাপূনা, সেই সূক্ষ্মর আনন-নিরঞ্জন ও হস্তরঞ্জিত।

শিবির হইতে এখনও আনন্দের শব্দ উচ্চিত হইতেছে, একপ সময়ে একজন তৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, “জাহাপনা, রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।”

যুবরাজ বুঝিলেন, রাজা যুদ্ধ-পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। গীত কান্ত হইল, যুব-রাজ সকলকে বিদায় দিলেন। কণেক পর বীরশ্রেষ্ঠ অবরাধিপতি মানসিংহ শিবির-প্রবেশ করিয়া যুবরাজকে তসলীম করিলেন। সহাস্ত্রবন্দনে সলীম তাঁহাকে আহ্বান পূর্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছই জনে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী বোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট-পুল, সূতরাং সুখপ্রিয় ও বিলাসী, তাঁহার ন্যায় বিলাসী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব সরল ও উদার, যৌব-নেই কার্যপ্রিয়তা অপেক্ষা সুখপ্রিয়তা প্রবল হইয়াছিল। পরে এই সুখপ্রিয়তা একরূপ প্রবল হয় যে, মুজাহিদান ঐ রাজ্য শাসন করেন, দিল্লীর জাহাজীর বন্ধু ও অমাত্য, রমণী ও যদিরা লইয়া কালব্যাপন করিতেন। মান-সিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থির-প্রতিজ্ঞ ও কার্যপটু, অসাধারণ বোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহ সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মান-সিংহের উপরেই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন, “রাজন! শত্রুদিগের রণসজ্জা আপনি দেখিয়াছেন। কবে যুদ্ধ প্রায়ঃ বিবেচনা করেন?”

মানসিংহ। এ দাস কল্যই যুদ্ধসাজ

উচ্চিৎ বিবেচনা করে। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, বত ঈষৎ দিল্লীখরের কার্য সমাধা হয়, ততই ভাল।

সলীম। আমারও সেই মত। দিল্লীখরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত যেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যাণ পারিবে না।

মানসিংহ। তাহার সম্বন্ধ নাই। তথাপি আজ্ঞা দিলে ইহাও নিবেদন করিবে, কল্যাণ প্রকৃত যুদ্ধ হইবে। এত দিন আমরা যে ভ্রম সহ্য করিয়াছি, কল্যাণকার কার্যের সহিত ভুলনা করিলে যে কেবল বালাজীড়া মাত্র।

সলীম। প্রকৃত যুদ্ধ তৈয়্যরলক্ষ্যসীম-দিগের রক্তক্ষয়, কিন্তু কতক্ষণ সে যুদ্ধ স্থায়ী? যুগ ও ব্যাঘ্রে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভবে? পিতার সেনার সম্মুখে ভীকু প্রতাপ দূরে পলাইবে।

মানসিংহ। আপনার পিতার সেনার সম্মুখে ঠাঁড়াইতে পারে, এরূপ সেনা ভারত-ক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পলাইবে না, এ দাস তাহাকে জানে—

সলীম। মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা ধামিলেন কেন? এই প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনিয়াছি। তাহা ভিন্ন আর কি অবগত আছেন?

মানসিংহ। প্রতাপসিংহের সহিত পূর্বে একবার এ দাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই ভ্রমই বিশেষ করিয়া তাহাকে জানি।

সলীম। কি জানেন?

মানসিংহ। প্রতাপ যোর বিজোহী, দিল্লীখরের বিরুদ্ধাচারী, কল্যাণ ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল।

সলীম। সে কথা আমিও অবগত আছি,

আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার নিকট হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। আপনার উপর সকল কার্যের নির্ভর করিয়াছি, আপনার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি, আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?

মানসিংহ। প্রভুর নিকট কোন পরামর্শ এ দাস গোপন করে নাই; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটা ঋণ আছে, সেই কথা স্মরণ হওয়ার আমার সহসা ব্যক্ত-রোধ হইয়াছিল।

সলীম। প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি দুহস্ত-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হন, দূরে থাকিবেন, সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে, প্রতাপ বাহতে কত বল ধারণ করে।

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজলিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, “প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে, তাহা তাহার হস্তের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্বের অবমাননাকথাও গোপন করিব না। আপনার পিতার নিকট কহিয়াছি, আপনাকেও কহিব, শ্রবণ করুন।

যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, আমি মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ অভিলাষে যেওয়ারে আসিয়াছিলাম। যেওয়ারের রাণা সূর্য্যবন্দীর এবং রাজপুতকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য, সুতরাং রাজস্থানের সকল রাজ্যের পূজনীয়। প্রতাপসিংহ সম্ভ্রান্তি রাণা হইয়াছেন, এই ভ্রম আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

চিতোরক্ষেত্রের পর উদয়সিংহ উদয়পুরে

রাজধানী করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ পিতার প্রাসাদ জ্যাগ করিয়া কমলমীরের পর্বতভূর্গে থাকেন। আমার আগমনবাস্তা শুনিয়া আমাকে অহ্বান করিবার জন্য তিনি কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

উদয়সাগরের কূলে বহাসমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার পিতার শিরে বেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচিহ্ন পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীধরের সহিত হুটুখিতা করিয়াছি বলিয়া গর্ষিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয় করিতে অস্বীকার করিলেন।” মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

সলীম। তাহার পর ?

মানসিংহ ক্রুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন, “আমি অমরকে বলিলাম, ‘রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি, বাহা হইয়াছে, তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; সেজন্য মহারাণা যদি আমার সম্মুখে পাত্র না দেন, কেঁ দিবেন?’

প্রতাপসিংহ আমার সে ভদ্র অভ্যর্থনার যে অভদ্র উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ জীবনে ভুলিবে না; অথবা কল্যা রণস্থলে ভুলিবে।

প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, ‘তুর্কীকে যিনি রাজপুত-ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন,

সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত বাহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।’

এই উত্তর পাইয়া আমি অম্পূর্ণ অন্ন রাখিয়া উঠিলাম; কেবল কয়েকটি দানা অন্নদেবের নাম করিয়া উকীষে রাখিলাম। সেই দিন পণ করিলাম, যদি সেই গর্ষিতের গর্ভ নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-স্বপ্ন কল্যা প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ করিব।”

মানসিংহের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, নয়ন হইতে যেন জলন্ত অগ্নি বহির্ভূত হইতেছিল। সলীমও অবচলিত ছিলেন না, সরোষে বলিলেন, “বীরপ্রবর! আপনার যে অবমাননা করিয়াছে, সে আমাদের তদধিক অবমাননা করিয়াছে, সলীম তাহার প্রতিশোধ দিতে সক্ষম। আমাদের একই অবমাননা, একই পরিশোধ। কল্যা একত্রে সেই অবমাননার পরিশোধ দিব, অজ্ঞ ব্যস্ত হইবেন না।”

সলীমের এই প্রতিজ্ঞার মানসিংহের হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। চক্ষুতে এক বিন্দু জল আসিল, সলীমকে নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

সে রজনীতে যুবরাজের শিবিরে আর গীত বা বাতধ্বনি বা আনন্দরব শুনা গেল না। প্রভাত হইতে না হইতেই অল্প বায়ু প্রত হইল, অল্প রবে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

হলদীঘাটের যুদ্ধ ।

সংখ্যঃ * *

লক্ষ পৃথিবীকৈব তুমুলো হুসনাধরন ।

ভগবদঙ্গীতা ।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । একদিকে অসহ অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা, অপরদিকে শিশৌদীয়কুলের চিরবাধীনতা-রক্ষার স্থির-প্রতিজ্ঞা । একদিকে মোগল ও অখ-রের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব ।

হলদীঘাটের উপত্যকার ও উভয়-পার্শ্বের পর্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজ-পুত সজ্জিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধাগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূৰ্ণ রণ দিতেছে ; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইচ্ছিতে বর্ষা-কালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দমনীয় তেজে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে ।

পর্বত-শিখরের উপর অসভ্য-জাতিগণ ধনুর্ধারণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর পড়াইয়া দিতেছে ।

অতঃ তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরামুখ হইল না । চোহান ও রাঠোর, খানা, চন্দাওর ও গাওর, লকল কুলের বোদ্ধাগণ ভীষণভাবে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল । একদল হত হয়, অল্প দল অগ্র-সর হয় ; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল ।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে ? দিল্লীর ভীষণ কামান-শ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বর্চিগত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবনদান করিল ।

এই বিধৌর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না । যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অধরাধিপতির দিকে তিনি দ্বাবিমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্য ডেজ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না ।

তৎপরে প্রতাপসিংহ সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অর্থ দ্বাবিমান করিলেন । এবার ভীষণভাবে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল । স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্বততরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন, বর্ষা ও অগ্নির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন । সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন ।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন । অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জরনাদ ও আর্গুনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না । রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও मित्रের বিভিন্নতা রহিল না । দুই পক্ষের পতাকাই চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল ।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল । তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লোহে সেই বর্শা প্রতিবন্ধ হওয়ার সলীম সে দিন জীবনরক্ষা পাইলেন না ।

রোবে তর্কন করিয়া প্রতাপ অথ বাবমান
করাইলেন, অধবর চৈতক ও প্রতাপের বোণ্য
লক্ষ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সমুখ-পদ
স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে
হস্তীর মাহত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর
বিপদ্ম জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন
করিল। তুমুল শব্দে দুর্দমনীর প্রতাপসিংহ
ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ভাবন করিলেন।
মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে
প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে
অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জুনের
কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহুর্তের
জন্ত মনে মনে প্রণীদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ম দেখিয়া
ক্লিষ্টপ্রায় হইল। মুসলমান-বোকাগণ ভীক
নহে, পঞ্চশতবৎসর ভারতবর্ষ শাসন করি-
রাছে, অত্ হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার
করিবে না। একবার "আল্লাহ আক্ববর"
শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া
প্রতাপকে চারিদিকে বেঠেন করিল। রাজ-
পুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে
হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে
আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ্ম জানেন না,
তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত-বোকা
মহারাজার বিপদ্ম দেখিলেন এবং হস্তাশ্ব
করিয়া শিশোদীরের পাতাকা লইয়া অগ্রসর
হইলেন। পাতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর
হইল, প্রতাপ যে স্থানে বৃদ্ধ করিতেছিলেন,
তথায় বাহীরা উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে
সেই নিশ্চরমৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল।
সে উভয়ে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ বৃদ্ধমদে সংজ্ঞা
হারাইয়া বোণ্যলগ্নের ভিতর প্রবেশ করি-
লেন। পুনরায় তাঁহার রাজহুজ শত্রুবেষ্টিত

দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর
হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চর-মৃত্যুর কবল
হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অত্ ক্লিষ্ট—উন্মত্ত।
জানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্য-
রেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার
মোগলগণ ক্লিষ্টপ্রায় হইল, রোবে হস্তার
করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেঠেন
করিল, প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল
না। এবার মোগলগণ এই কাকের বীরকে
হত করিয়া দিল্লীধরের জয়দেবের কণ্টকোদ্ধার
করিবে, মানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ
দিবে।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাজার বিপদ্ম
দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা
করিল। কিন্তু মোগল-সৈন্য অসংখ্য, রাজ-
পুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে,
রাজপুতগণ হীববল হইয়াছে, এবার প্রভুর
উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর
উদ্ধার-চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য
শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল,
মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না,
এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই
ব্যাপার দেখিলেন। মুহুর্তের জন্য ইষ্টদেবতা
স্মরণ করিলেন, পরে আপনার কাশাবংশীয়
বোকা লইয়া সমুখে ধাবমান হইলেন।
মেওয়ারের কেতন সুবর্ণহর্য্য একজন সৈনি-
কের হস্ত হইতে আপনি লইলেন এবং মহা-
কোলাহলে সেই কেতন লইয়া কালাকুলের
সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে
পারিল না, বীর দৈলওয়ারাপতি শত্রুরেখা
বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালাকুল,

বধায় প্রতাপ উন্নত রণকৃষ্ণের স্তায় যুদ্ধ করিতেছিলেন। তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ও সেই উদ্ভবে সমুৎকরণে আপনায় প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল মেহের দিকে চাহিয়া মহামুভব প্রতাপ বলিলেন, “দৈলওয়ারা! অত আপনায় জীবন দিয়া আমার জীবনরক্ষা করি-
রাছ।” দৈলওয়ারা ক্রীণবরে উত্তর করিলেন,
“ঝালা স্বামীধর্ম জানে; বিপদকালে মহা-
রাণার পার্শ্বভাগ করে না।”

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাস্তন-
মাসের শেবদিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি
এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারা-
পতির জীবনশ্রুত দেহ ভূতলে পড়িল।

ষাণ্মাসে সহস্র রাজপুত-যোদ্ধার মধ্যে
চতুর্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশারী হইল, অব-
শিষ্ট আট সহস্রমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করিল।
প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে
ত্যাগ করিলেন। যোগলগণ জয়লাভ করিল;
কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু
বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে
প্রাচীন যোগলযোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের
নিকট হলদীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর
গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

অচ্যুত পরিচ্ছেদ ।

ভ্রাতৃত্ব ।

দৈনন্দিককল্যাণ চন্দ্রভেদে। সন্তানসমূহে পরিচালিত।

ভূমিদানকল্যাণভেদে। সন্তানসমূহে পরিচালিত।

চিন্তাধর্মঃ ।

উত্তরচরিত্রঃ ।

যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে প্রতাপ পলায়ন করি-
লেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদশাস্তি হয়

নাই; দুইজন যোগল, একজন খোয়াসানী,
অপরজন মুলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ভাবন
করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক
লক্ষ দিয়া একটি পূর্বতনদী পার হইয়া গেল,
যোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব
হইল। কিন্তু চৈতক আহত, প্রতাপও
আহত। পশ্চাদ্ভাবক সন্নিকটে আসিতেছে,
তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পূর্বত-
নশাস্তিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ স্তব্ধ
পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু
বীরের স্তায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন, “হো
নৌ! ঘোড়ারা আসোয়ার!” পশ্চাতে
চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্ব-
রোহী। সেই অশ্বরোহী তাঁহার বিবম শত্রু
ও সহোদর ভ্রাতা শত্রু!”

রোবে প্রতাপসিংহ কহিলেন, “সংগ্রাম-
সিংহের পৌত্র হইয়া যোগলদের দাস হইয়াছ,
ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই; এক্ষণে
ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ভাবন করিয়াছ?
কুলকলঙ্ক! প্রতাপসিংহ অত সংগ্রামসিংহের
বংশ নিম্নলব্ধ করিবে।” শত্রু প্রতাপের
কথায় ভীত হইলেন না, ক্রোধ হইলেন না,
ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া
বলিলেন, “ভ্রাতঃ! একদিন তোমার প্রাণ-
নাশে ইচ্ছক হইয়াছিলাম, কিন্তু অত্ন সে
ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। অত্ন তোমার
বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পূর্বদোষ
ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গনদান কর।”

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শত্রুর নরনে
জল। বহুদিনের বৈরভাব ঘূরে গেল, ভ্রাতৃ-
স্নেহে উভয়ের হৃদয় উৎখলিল, উভয়ে উভয়কে
সঙ্গেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ব ও প্রতাপের বীরত্ব
দেখিয়া অন্য শত্রুর বৈরভাব তিরোহিত

হইয়াছে, বহু বৎসরের প্রাত্তনবিরোধ তিরো-
হিত হইয়াছে। জাতীয় নিকট জাতীয় কমা
বাঁকা করিতেছে, প্রতাপ কিসেই স্নেহমানে
বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্বদোষ বিন্ধিত
হইলেন, সাক্ষরনে হৃদয়ের জাতাকে হৃদয়ে
ধারণ করিলেন।

যে দুই জন যোগল প্রতাপের পশ্চা-
দ্বান করিয়াছিল, তাঁগরা কোথায়? শক্ত
দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন,
জাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অব্যর্থ
বর্ষায় সে যোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়া-
ছেন।

সজ্জার চায়া সেই নির্জন উপত্যকার
অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্বতের উপর
আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত
করিতে লাগিল। সেই নির্জন নিঃশব্দ উপ-
ত্যকার দুই প্রান্ত অনেক দিনের অপছত
প্রাত্তনপাইলেন, অনেক দিনের হারাধন
পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে
গুহ হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অস্ত্র বীর-
হৃদয়ের হৃদয়কে প্রাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন,
“ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন
নহে, আজি বিজয়ের দিন; আজি যে অপসৃত
ধন কিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধের পরাজয় তাহার
নিকট কি তুচ্ছ! ভাই! যেন আমরা পূর্বের
বিষেয় চিরকাল বিন্ধিত হই, যেন আমাদের
চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে
ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্নেহে রক্ষা করিব,
বিশেষায় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীর
হানসিংহকে ভয় করিব না।”

নবম পরিচ্ছেদ।

নাহারী যগুরো।

অজস্র ব্যতরণে বৃদ্ধবচনাৎ সংপীড়া শিতীকৃতো,
বন্যপ্রাণিতশস্যাবৎ পরিদহন্যন্ত্রাস্তিরং বঃ দ্বিতঃ।
কুর্ধ্যাত্তেব স এষ সস্ত্রিষ্টি যব স্তজ্জারভয়দ্বিতঃ,
কল্পাণায়মন্তঃপ্রকীর্ণয়সঃ সিংহারিবোর্কানলঃ ॥

বীরচরিতত্ব।

যে দিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জয়
সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহবরে
আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে
সেই দিনের কথা পুনরুত্থান করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জয়সিংহের নিকট
বিদায় লইয়া তেজসিংহ গহবরাভিমুখে যাই-
লেন না; অন্ধকার নিম্নে কেবল তারকা-
লোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্বতপথ
একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে কখন কখন গভীরবনের
ভিতরে আসিয়া পড়িতেন। একে অন্ধকার-
ময় রজনী, তাহাতে পাদপঞ্জেরী অতিশয়
নিবিড়, স্তম্ভরাং সে অন্ধকারে আপন হস্ত
দেখা যায় না। কিন্তু সে পর্বতপ্রদেশে
কোন স্থান, কোন গহবর, কোন উপ-
ত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না। অস্ত্র
আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের
সহিত পর্বতে বিচরণ করিতেন, গহবরে শয়ন
করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন। সেই
আলোকশূন্য, শব্দশূন্য, নৈশকানন একাকী
অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কানন হইতে নিস্তব্ধ হইয়া সন্মুখে উন্নত
পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন। পর্বত-পথ
অতিশয় ছত্তর, কিন্তু পার্বত্য বরাহ-
শাখী লও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্বত অতিক্রমে
সক্ষম নহে। তেজসিংহের দক্ষিণহস্তে সেই

দীর্ঘ বর্ষা ; সেই বর্ষাধারী দীর্ঘ উন্নত অব-
স্থ দেখিলে ভীষণ বস্ত্রজঙ্ঘ ও ধীরে ধীরে পথ
হইতে সরিয়া বাইত ।

প্রায় একগ্রহরকাল এইরূপে ভ্রমণ
করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটি পর্বত-
তলে উপস্থিত হইলেন । তখন মুহূর্তের জন্ত
দণ্ডায়মান হইলেন । ললাট হইতে দীর্ঘকেশ
পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে
আকাশের দিকে ক্রণেক নিরীক্ষণ করিলেন,
কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত
হইলেন, পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই
পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন ।

প্রায় একদণ্ডের মধ্যে সেই পর্বতচূড়ায়
আরোহণ করিলেন, চূড়ার অনতিদূরে একটি
গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া
তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন,
স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্রণেক
নিরীক্ষণ করিলেন, পরে নিম্নে সেই আলোক-
শূন্য, শব্দশূন্য, স্রুশূন্য জগতের দিকে চাহিয়া
রহিলেন । তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার
উদ্বেগ হইতেছিল, কে বলিতে পারে ?
কতক্ষণ পরে চিন্তা সংবরণ করিয়া নিঃশব্দে
সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন ।

গহ্বরে কবাট । তেজসিংহ সবলে সেই
কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমাহুতিক
বলে কবাট বন্ধন শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু
ভিতর হইতে কোন উত্তর পাইলেন না ।

পুনরায় শব্দ করিলেন, পুনরায়
প্রতিধ্বনি হইল ; কিন্তু কোন উত্তর নাই,
পুনরায় গহ্বরনিঃশব্দ !

সেই নিঃশব্দ রজনীতে সেই ভয়াত্মক
পর্বতগহ্বরে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া
তেজসিংহ নির্ভয়ে তৃতীয়বার কবাটে শব্দ
করিলেন । সে বাহুর আঘাতে এবার কবাট
ও সমস্ত গহ্বরশব্দ কম্পিত হইল ।

এবার ভিতর হইতে একটি গভীর শব্দ
আসিল, “নিশীথে নাহারা যগ রোতে কে ?”

যুবক উত্তর করিলেন, “তিলকসিংহের
পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ ।” আর উন্মাদিত
হইল ।

অন্ধকারে গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজ-
সিংহ ক্রণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন ।
গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই,
কেবল বোধ হইতেছে যেন, পর্বতগর্ভে
একটি জল-প্রপাতের স্তমিত শব্দ স্রুত হই-
তেছে । তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান
থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন ।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটি
দীপ দেখা বাইল ; ক্রমে আলোক নিকটে
আসিল । দীর্ঘকায়, শুক্লকেশী, চারুদেবী
তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও
অঙ্গুলীনির্দেশপূর্বক তেজসিংহকে একটি
ব্যাঙ্গচর্চের উপরঃবসিতে আদেশ করিলেন ।
তেজসিংহ উপবেশন করিলেন ও সেই লীর্ণ
দীর্ঘ অবয়বের দিকে সবিম্বরে চাহিয়া
রহিলেন ।

চারুদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও
অধিক হইবে । শরীর লীর্ণ, দীর্ঘ ও
তেজঃপূর্ণ, মস্তকের সমস্ত কেশ শুষ্ক, ললাট
চিন্তারেখার আকৃত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টি-
হীন । সময়ে সময়ে সেই স্থিরনয়নে উর্দ্ধদিকে
চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত । তখন
বোধ হইত, যেন চারুদেবী এ জগতে থাকি-
তেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকটে অন্ধ-
কারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ
জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নবর
মানবজাতিসমূহকে বিধির লিখন পাঠ করিতে
পারিত ! সবিম্বরে তেজসিংহ সেই দীর্ঘকায়
চারুদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

কতক্ষণ পরে চারুদেবী আদেশ করি-

লেন, “রাঠোরপ্রবর তিলকসিংহের নাম যেওয়ারে অবিলম্বে নাই, তাঁহার পুত্র কি বাসনার চারগীর সাক্ষাৎ আকাজকী?”

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চির-স্মরণীয়, কেন না, চিতোর-রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওরৎ-কুলের দুর্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলক-সিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।

চারগী। চন্দাওরৎ ও রাঠোরকুলের বহু-কাল-প্রচলিত “বৈরী” চারগীর অবিলম্বে নাই। সূর্য্যমহল পূর্বে চন্দাওরৎদিগের ছিল, বালক! তোমার পূর্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে অসিহন্তে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি দুই কুলে সে বিরোধ চলিতেছে, যত দিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে, ততদিন সে “বৈরী” নিক্ষেপ হইবে না। চন্দাওরৎগণ দুর্জয়সিংহে অসিধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ভাগ করিবে না।

তেজসিংহ। দেবি! রাঠোরগণও দুর্জয়সিংহে অসিধারণ করে না। অল্পমতি দিন, একবার চন্দাওরৎ দুর্জয়সিংহের সহিত যুঝিব, যদি পরাস্ত হই, তবে সূর্য্যমহল আর চাহিব না, পুনরায় মাড়ওয়ারে প্রত্যাগমন করিব, অথবা চিরকাল বন্ধ ভীলদিগের সহিত বাস করিব।

চারগী। যেওয়ার শিশোদীরবংশের আদিম স্থান, চন্দাওরৎকুল শিশোদীরের শাখা; যেওয়ার সে কুলের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র! তোমরা রাঠোর; মাড়ওয়ারে তোমাদিগের আদিম স্থান। কি অধিকারে অস্ত চন্দাওরতের শোণিতপাত করিতে চাহ, চন্দাওরতের দুর্গ অধিকার করিতে বাহা কর?

তেজসিংহ। বে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, যেওয়ারে শিশোদীরগণ বাস করে, রাঠোর-বংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্বপুরুষগণ অসিহন্তে যেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরি-কার করিয়াছে, পরে পুরুষাত্মকমে যেওয়ার-রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে যেওয়ার-ভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওরৎদিগের প্রবল-তর অধিকার আছে? যেওয়ার-রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওরৎ বীর অধিক বীৰ্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন? আকুবর কর্তৃক চিতোরধ্বংসকালে রাঠোর জয়মল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? তাহারা সেঈ আহবে প্রাণ দিয়াছেন, তাহাদিগের শোণিতে যেওয়ারে রাঠোর-অধিকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাঠোরবংশ অস্ত অধিকার জানে না, রাজ-স্থানে অনারূপ অধিকার বিদিত নাই।

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নত রব এখনও কম্পিত হইতেছে। এমন সময় পূর্ববৎ ধীরেগভীরবরে চারগীদেবী উত্তর করলেন, “বালক! ভীলদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও কল্পিতার্থ তোমার নিকট অবিলম্বে নাই; যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না। বীৰ্য্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীৰ্য্যই তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাওরৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি কষ্ট কেন?”

তেজসিংহ। বীৰ্য্যবলে যদি দুর্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে কমা করিত। কিন্তু নরায়ণ রাজবর্ষ জানে না, পিতার মৃত্যুর পর

অনাথ বিধবার নিকট হইতে দুর্গ লইয়াছে, যাতার সহিতও হুড়ে অকস হইয়া তক্তের দ্বার দ্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তক্তর যাতার প্রাণবধ করিয়াছে, সে জীবণ পাতকের বহি শান্তি থাকে, দেবি। অচ্যুত দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।

চারণী। তিলকসিংহের বালক। তোমার রোবের কারণ আমার নিকট অবিস্ত নাই, রাঠোরের বীর্য আমার নিকট অবিস্ত নাই, কিন্তু তুমি বালক, এইজন্য তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম, এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অবোগ্য নহে, রাঠোরবংশের অবোগ্য নহে। তোমার বাক্যে আমি রুষ্ট হই নাই, তোমার পিতাকে জানিতাম, তাঁহার পুত্রকে তাঁহার উপযুক্ত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা, নিবেদন কর, তিলকসিংহের পুত্রকে চারণীর কিছুই অদেয় নাই।

তেজসিংহ। দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, আপনার কিছুই অবিস্ত নাহি। বিধির নিরুদ্ধ নম্বর মানবের নিকট লুকাইত, কিন্তু দেবীর দূরবিচারিণী দৃষ্টি হইতে বিধির লিখন লুকাইত নহে। একদিন বালক সংগ্রামসিংহ এই নাহারা মগরোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছিলেন; অস্ত তিলকসিংহের পুত্র,—দুর্গচাত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ সেই নাহারা মগরোতে আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে, যাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে। যদি আজ হয়, তবে সেই কথা বলিয়া এ তাপিত হৃদয়ে শান্তি দান করুন।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! ভবিষ্যৎ

• নাহারা মগরো অর্থাৎ ব্যাভগর্ভত।

ভের ববনিকা উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর। নবম মানব-জীবন ক্রেশপরিপূর্ণ, চিত্তাণরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি দুর্কহনীর নহে। কেন না, মিষ্টভাসিনী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐক্সকালিক দীপ জালিয়া লম্বুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে। ক্রেশের শক্তি, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া দমর শান্ত রাখে। তেজসিংহ! ভবিষ্যৎ ববনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে যারাবিনী আশার দীপ নির্ঝাঁপ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নম্বর এই দুঃখেজ্জের জীবন বহন করিতে চাহিত? বালক! এখনও কাল হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, বাচঞা থাকে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। দেবি! এই নাহারা মগরোর চারণীদেবী সংগ্রামসিংহের ভবিষ্যৎ কহিয়া ছিলেন, সেই সংগ্রামসিংহ দেবীর আদেশে অবশেষে সিন্ধু নদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দেবী আদেশ করিলে তিলকসিংহের পুত্রের বন্ধুও কি সফল হইতে পারে না?

চারণী। সংগ্রামসিংহের রাজ্যবিস্তার ললাটের লিখন, দেবীর আদেশের ফল নহে। দেবীর নিকট ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভ্রাতাকর্ষক আহত ও একচক্ৰ অস্ত্র হইলেন, গৃহ হইতে নিজস্ব হইলেন, বহুদিন অবধি সামান্য মেঘপালদিগের সহিত বাস করিয়া অসহ্য ক্রেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বালক! সংগ্রামসিংহের কথা শ্রবণ করিয়া ললাটের লিখন জানিবার উদ্ভম হইতে নিরস্ত হও। তিলকসিংহের পুত্রের অস্ত্র চারণী আর কি করিতে পারে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। অস্ত্রার সময়ে বাহার মাতা হত হইরাছেন, তবুও বাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলদিগের দ্বারা বাহার জীবন-রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিকার যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসুখ ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! নিবেদন করিবেন না, প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অস্ত্র আশা নাই, অস্ত্র সুখ নাই, ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে? দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিলম্বিত নাই, তথাপি যদি অহুমতি করেন, একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি। সমস্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?

চারণী। জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল হইতে চারণী অপমৃত হইয়াছে, সে গণ্ডগোলের কথা শুনিলে এক্ষণে স্বপ্নের দ্বায় বোধ হয়। তথাপি তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহে, চারণী তাহা শুনিবে।

তেজসিংহ। দেবীর অহুমতি দ্বারা চিরবাধিত হইলাম; শ্রবণ করুন।

তেজসিংহ পূর্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বকথা শ্রবণে তেজসিংহের হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে বিবাদে ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তেজসিংহ কম্পিতস্বরে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, সেই স্বর সেই পর্বতগুহার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবার আদেশ।

অংসেত বদন্তঃ সদাঃ পরিতুষ্টঃ যে গঠৈঃ।

বদান্বর্ণপ্রতীকারভূজালবং ন লভয়েৎ।

কিরাতাধ্বীরঃ।

“দেবি! আমি চিরকাল একুপ হিলাম না, তেজসিংহের চিরদিন একুপে বার নাই! দিবস-রাত্ৰি জিঘাংসা-চিন্তা ছিল না, যশের চিন্তা, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভীলদিগের ভিকারভোজী হিলাম না, রাজপুত্রদিগের মধ্যে রাজপুত্র হিলাম।

রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? স্বর্ধ্যমহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে? রাঠোরকুলেশ্বর জয়মল স্বয়ং তিলকসিংহের দক্ষিণহস্তে স্থান দিতেন, স্বয়ং স্বর্ধ্যমহলে আসিয়া তিলকসিংহের বীরত্বের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। দেবি! আমি তখন অনাথ পর্বতবাসী হিলাম না, আমি তখন তিলকসিংহের পুত্র, স্বর্ধ্যমহলের যুবরাজ হিলাম।

চন্দাওরংকুলের দুর্জয়সিংহের পুত্রপুত্র-দিগের সহিত রাঠোর তিলকসিংহের পুত্র-পুত্রদিগের চিরকাল বিরোধ। বংশানুক্রমে বৈরি চলিয়া আসিতেছে, বংশানুক্রমে তুমুল সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। যত দিন চন্দ্র-স্বর্ধ্য থাকিবে, তত দিন সে বিরোধ, সে ক্রোধান্বিত জীবিত থাকিবে। এই নির্কাসিতের শরীরে বংশানুগত রোষ দিবারাজ জলিতেছে, দুর্জয়সিংহের হৃদয়-শোণিতে সে অগ্নি নির্কাসিত হইবে।

রাঠোরদিগের নিবাসস্থল মাদোয়ার, সেই স্থান হইতে তিলকসিংহের পুরুষগণ আসি-হস্তে আসিয়া চন্দাওরংদিগের নিকট হইতে

সূর্যমহল কাঠিরা লইয়াছে, বংশাঙ্করে তথার বাস করিতেছে, তাহা দেবীর অবিত নাহি। পুনরায় অসিহস্তে রাঠোরকুল সেই দুর্গ লইবে, চন্দাওরংগকে হুঁরে তাড়াইয়া দিবে।

শিতা বত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন দুর্জয়সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, সিংহের আবাশে শৃগল কবে স্থান পাইয়াছে? বতবার সে পামর সূর্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার শিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

অন্ত আট বৎসর হইল, তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মলের সহিত চিতোররক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না, কিন্তু দেবি! জয়মল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আব্রর শাহের নিকট অবিত নাহি। কল্পে দানুস্রাপতির মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কল্পে স্বয়ং দিল্লীখের সহিত সমুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ সে গীত এখনও দেশে দেশে গাইতেছে। সে গীত শুনিয়া সূর্যমহলে আমার বিধবা মাতার হৃদয় কণ্ঠিত হইল, এ বাগকের হৃদয় কণ্ঠিত হইল। উল্লাসে মাতা কহিলেন, ‘হৃদয়ের সশরীরে স্বর্ণধামে গিয়াছেন, দাসীগণ! চিতা প্রস্তুত কর, তিনি দাসীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, কেন না, জীবনে এ দাসী তাঁহার বড় সোহাগিনী ছিল।’

সহসা তেজসিংহের স্বর রুদ্ধ হইল; নয়ন হইতে একবিন্দু জল সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ‘দেবি! কমা করুন, তেজসিংহ ক্রন্দন অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে, অস্ত্র স্নেহময়ী মাতার কথা শ্রবণ করিয়া সংবরণ করিতে পারিল না। এখন চিতারোহণে হিরসকর

হইলেন, তখন বাতীর সকলে আসিয়া নিবেশ করিল। আমাকে প্রতিপালন করিবে, সকলে এইরূপ বৃদ্ধি দেখাইতে লাগিলেন। মাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি ঘাবীর অঙ্গ-বৃত্তা হইবার জন্ত হিরসকর হইয়াছিলেন।

শেষে আমি আসিয়া বলিলাম, ‘মাতা, এখনও আমার হস্ত দুর্বল, ছুঁমি বাইলে সূর্যমহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে?’ এবার তিনি হিরসকর ভুলিলেন বলিলেন দাসীগণ। আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি;—চিতোর-রক্ষার্থ পস্তের মাতা ও বনিতা না কি বহুতর যুদ্ধ করিয়াছিল। আর একজন রাজপুত-রমণী বহুতর যুদ্ধিবে, সূর্যমহল রক্ষা করিবে।’

শিতার অঙ্গাগার আবেশণ করিলেন; তাঁহার বাবহৃত একটি ছুরিকা পাইলেন, সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

দুর্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিয়া, নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ত্রীক তীত হইল। অর্ধবলে দুর্গের দ্বার উল্লাটিত হইল, তক্ষরের দ্বার রজনীযোগে দুর্জয়সিংহ দুর্গে প্রবেশ করিল।

তথাপি বোদ্ধগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তক্ষরেরা বুদ্ধিগ, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ভরে না, শত শতকৃত্য করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

হৃদের উপর যে গবাক্ষ আছে, মাতা তথার দণ্ডারমান ছিলেন, বাবহুতর আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণহস্তে সেই ছুরিকা।

ক্রমে আমাদিগের বোদ্ধগণ হত হইল, ক্রমে যুদ্ধতরল ও যুদ্ধদান সে দিগে আসিতে লাগিল; শেষে সেই গৃহের কণা ভর হইল। চন্দাওরংগণ সেই গৃহে মহ

কোলাহলে প্রবেশ করিল; সন্ধ্যায় রক্তা-
শুভ দুর্জয়সিংহ।

সেই কথিত কলেবর দেখিয়া মাতা
কম্পিত হইলেন না, সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ
ভনিয়া মাতা মনন হ্রিত করেন নাই।
স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া মাতা ভীক
ছুরিকা উত্তোলন করিলেন; জলন্তনরনে
সেই মরাধমের দিকে চাহিলেন। মারীর
ভীতদৃষ্টির সম্মুখে ভীকর গতি সহসা রোধ
হইল, তব্বর সেই ছুরিকার অগ্রে স্তব্ধ হইয়া-
ছিল। মাতা সেই ছুরিকাহতে দুর্জয়-
সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন।
সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজ-
পুতুলক অস্তিত্ব হইত, কিন্তু তাহার
একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর
প্রাণ বাঁচাইল, মাতার ছুরিকা সৈনিকের
হৃদয়ের শোণিত পান করিল। তৎক্ষণাৎ
দশ জন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা
করিল।”

তেজসিংহ ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন।
ভাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বহিগত হইতে-
ছিল। ক্ষণেক আত্মসংবরণ করিয়া
কহিতে লাগিলেন, “আমি তখন দশ বর্ষের
বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই
ছুরিকা লইয়া দুর্জয়সিংহকে আক্রমণ করি-
বার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে
ভীক সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে
পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ
ভাঙ্গিয়া লক্ষ দিয়া হুদে পড়িলাম। সেই
ভীককে আর একদিন দেখিতে পাইব,
মাতার হত্যার পরিপোষ লইব, বংশের
কলঙ্ক অপনয়ন করিব, কেবল এই আশায়
সেই অবধি আটবৎসর জন্মে ও গহ্বরে
জীবনধারণ করিয়াছি।

দেবি! তাহার পর কিমন বনে ও

পশুতকন্দরে বাস করিয়াছি, রাঠোর হইয়া
ভীলদিগের পরগণিত হইয়াছি, হৃদয়ের
দুঃস্বপ্ন জালায় জীবনধারণ করিয়াছি, কেবল
আর একদিন দুর্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ
হইবে, এইজন্ত। অল্পমতি দিন, আর এক-
বার দুর্জয়সিংহের সহিত যুঝিব—এবার
যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর
কিছু প্রার্থনা করিবে না।”

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজ-
সিংহের গভীর স্বর বার বার সেই গহ্বরে
প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল, অনেক-
ক্ষণ সেই গহ্বর নিস্তব্ধ।

পরে চারগিদেবী শান্ত-ধীরস্বরে কহি-
লেন, “বংশাভ্যুগত শত্রুতা ও বৈরী রাজ-
পুত্ৰত্ব। তিলকসিংহ ও দুর্জয়সিংহের
বংশের মধ্যে ‘বৈরী’ নির্মাণ হইবে
না। এই ক্রোধানলে তিলকসিংহের
পুত্রের হৃদয় জলিবে, তাহাতে বিষয় নাই,
কিন্তু বিদেশীয় বোদ্ধার বর্তমান মেওয়ারে
গৃহ-কলহ ক্রান্ত হয়, মেওয়ারের এই চির-
প্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা
পালন করুন।”

তেজসিংহ। বিদেশীয় যুদ্ধসংকেত কি
পায়র দুর্জয়সিংহ তব্বরের জ্ঞায় সূর্য্যমহল
হস্তগত করে নাই?

চারগী। আকবর কর্তৃক চিতোরধ্বংসের
পর রাণা উদয়সিংহের সহিত তাহার যুদ্ধ
কান্ত হইয়াছিল; উদয়পুরে নূতন রাজ-
ধানী স্থাপন করিয়া রাণা নির্ঝিলে ছিলেন,
সেই সময়ে দুর্জয়সিংহ সূর্য্যমহল হস্তগত
করিয়াছিলেন।

তেজসিংহ। এখনও কি যুদ্ধ কান্ত
হয় নাই? মানসিংহ রোবে দিল্লিতে গিয়া-
ছেন বটে, মহারাণা যুদ্ধের আরোজন
করিতেছেন বটে, কিন্তু শত্রু কাথার?

চারণী। বর্ষা প্রায়তে বালকে সেইরূপ
জিজ্ঞাসা করে, মের কোথায়? বালক।
বর্ষার মের অপেক্ষা অধিক সমারোহে লক্ষ
আসিতেছে। যে বড়ো দ্বারা দুর্জয়সিংহের
প্রাণবধ করিতে চাহ, সেই বড়ো-হস্তে হল্লী-
ঘাটার বাইর। উপস্থিত হও। চারণীর কথা
গ্রাহ্য কর, হল্লীঘাটার অচিরে অনেক বড়ো
ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জয়-
সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে, বিদে-
শীর যুদ্ধ বর্তমানে গৃহ-কলহ রাজস্থানের
প্রথম মুগত নহে।

তেজসিংহ। দেবি! যেওয়ার-রক্ষার্থ
যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয়, বাঠোর সে যুদ্ধে
অনুপস্থিত থাকিবে না। কিন্তু সে পর্যন্ত
যে পামর রাজপুত্র বিস্মৃত হইয়াছে, তত-
ত্বের জায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, অসহায়
বিধবাকে হত্যা করিয়াছে, পিতার কুল
কলঙ্কিত করিতেছে, সে রাজপুতকলঙ্ক
জীবিত থাকিবে?

চারণী। বিদেশীর যুদ্ধ বর্তমানে গৃহকলহ
নিষিদ্ধ।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিমন্তর রহিলেন;
অনেকক্ষণ চিন্তার পর উর্দ্ধনেত্রা চারণী অতি-
শয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “বালক, অজ্ঞ তুমি
সেই দুর্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ।

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন,
“দেবীর নিকট কিছুই অবিস্মৃত নাই।
স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এই
জন্ত বরাহের আক্রমণ হইতে তাহাকে
রক্ষা করিয়াছি।”

চারণী। পরে দুর্জয়সিংহকে আপন
আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে,
তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।

তেজসিংহ। পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজ-
পুত্র নহে; বিশেষ পৈতৃক দুর্গে তাহাকে

আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব,
আবার এই পন। অদ্যবর্তি দিন, সূর্য্যমহল
আক্রমণ করিব, তত্বের হস্ত হইতে পৈতৃক
দুর্গ কাড়িয়া লইব, সম্মুখ-আহবে সেই
তত্বর দুর্জয়সিংহকে উচিত শাস্তি দিব।

চারণী। শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা
করিয়া রাজপুতধর্ম পালন করিয়াছ; পরি-
শ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজপুতধর্ম
পালন করিয়াছ। বাও, তেজসিংহ!
বিদেশীর যুদ্ধের সময় গৃহকলহ বিস্মরণ
করিয়া রাজপুতধর্ম পালন কর। তিলক-
সিংহের পুত্র। তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার
মেহে অক্ষিত রহিয়াছে, বিজয়ের টাকা
তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে, তিলক-
সিংহের জায় রাজপুত-ধর্ম পালন কর।
দশ বৎসর মধ্যে বিদেশীর যুদ্ধ ক্ষান্ত
হইবে, পরে সূর্য্যমহলে বাঠোর-দুর্গ
পুনরায় উদ্ধার হইবে।

সহসা গম্ভীরে দীপ নির্ধারণ হইল;
অন্ধকারময় গম্ভীরে চারণীর শেষ আদেশ
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গম্ভীর হইতে তেজসিংহ
নিম্নপ্রান্ত হইলেন; পরদিন মহারাণা প্রতাপ-
সিংহের সৈন্তের সহিত যোগ দিলেন;
পরে হল্লীঘাটার যুদ্ধের দিনে বাঠোর-দুর্গ
নিশ্চেষ্ট ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলপ্রদেশ।

অবোধোৎসবসময় প্রাণিত্য, সাধুজন-বিশিষ্ট-
ভক্ত ভক্তি, তথাপি পুরুষগণিতোপহারে ধর্মবুদ্ধি,
অজ্ঞান: সাধুজন-বিশিষ্টো মনুষ্যসংসার, অমো
বুগা, নান্য শিবাক্ত, উপলব্ধি: কৌশল্য:।

কাদম্বরী।

কলীঘাটার বৃক্ষ হইয়া গিয়াছে, একদিন
অপরাজে তেজসিংহ একাকী ভীলপ্রদেশের
পথ দিয়া পথ অভিযান করিতেছিলেন।

তেজসিংহ যদি নিজচিত্তার অভিত্ত না
ধাকিতেন, তবে সেই নির্জন ভীলপ্রদেশের
শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন।
পথের উত্তরপার্শ্বে নিবিড় ক্রকবর্ণ সছল হস্ত
উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পর্বতরাশি উদ্ভিত
হইয়া যেন সেই নির্জন পথকে গোপনে রক্ষা
করিতেছে। পর্বতচূড়ায় ও পার্শ্বদেশে
অসংখ্য পর্বত-বৃক্ষ ও লতাগুপ্ত বাগুহিরোলে
জীড়া করিতেছে ও অপরাজের স্তিমিত
স্বৰ্ণালোকে হাস্ত করিতেছে। সে স্বৰ্ণা-
লোক বহুদূর নীচস্থ পর্বতহলের পথ পর্যন্ত
পৌঁছিতেছে না। তেজসিংহ যে পথ দিয়া
যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাজেই প্রায়
অন্ধকারময়। কোন কোন স্থলে উন্নত
পর্বতশিখর হইতে স্বৰ্ণালোক প্রতিফলিত
হইয়া সেই পথের উপর জৈব আলোক
বিতরণ করিতেছিল; অস্ত্র স্থলে সেই বৃক্ষ-
চ্ছাদিত পথ একেবারে অন্ধকারময়। সেই
নির্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বত-
নদী কল কল শব্দে শিলাশস্যার উপর দিয়া
ক্রান্তবেগে গমন করিতেছে, যেন পার্শ্বস্থ
প্রহরী স্বল্প উন্নত ও কঠোর পর্বতরাশিকে
উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়াপটু বালিকা

হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া বাইতেছে। স্থানে
স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর
জল চক্ষুক করিতেছে, অস্ত্র স্থানে সে নদীর
গতি কেবল শব্দমাত্রে অধুমের। সেই উন্নত
পর্বতের কঠোর বৃক্ষ হইতে কোন কোন
স্থানে শুষ্ক শুষ্ক দ্রোণাত্মের দ্বারা-নির্মিত রীতি
বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল
কল শব্দে মিশিয়া যাইতেছে। ভীলপ্রদে-
শের বিশ্বরূপ সৌন্দর্যের দ্বারা সৌন্দর্য
জগতের অন্তরালেই দেখিতে পাওয়া যায়।
একজন আধুনিক কলসী ভ্রমণকারী মুক্ত-
কণ্ঠে বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের সমস্ত
মনোহর স্থল অপেক্ষাও রাজস্থানের ভীল-
প্রদেশ সুন্দর ও বিশ্বরূপ।

তেজসিংহ এইরূপ নির্জন একাকী
অভিযান করিতেছিলেন। পর্বতচূড়ার
উপর স্থানে স্থানে ভীলগণ “পাল”
অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতে নীচের পথ
হইতে দেখিলে বোধ হয় যে, মনুষ্যের
আবাস নহে, যেন জগল পক্ষ নিজ কঠোর
শাবকগুলিকে লালন-পালন করিবার জন্য
পর্বতচূড়ার কুলায় নির্মাণ করিয়াছে।
প্রত্যেক পালের চতুর্দিকে বা নীচে অল্পমাত্র
ভূমি কবিত, সেই ভূমির উপর ভীল-
দিগের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন
বংশানুগত দ্রব্যতা। স্থানে স্থানে সেই
পর্বতচূড়ার উপর, সায়ংকালীন গগনে
বিস্তৃত ভ্রমণক প্রকৃতির দ্বারা এক এক
জন ক্রকবর্ণ শীর্ণকার কৌশীনধারী ভীল
ধর্মরূপহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার
এই নির্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের প্রহরী।
তেজসিংহের বীর্যবৃত্তি যদি প্রত্যেক ভীলের
পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই
প্রত্যেক বৃক্ষ শব্দ সংযোজিত হইত।

সেই উপত্যকা অভিক্রম করিয়া কতক-

দূর আসিতে আসিতে তেজসিংহ একটি রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ববর্ষিত পর্বত-নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দিকে বহুদূর মন্থরানয়নে দৃষ্ট হয়, কেবল পর্বতরাশির পর পর্বতরাশি পর্বত-বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সারংকালীন গগনে বিষয়-কর চিত্রের স্থায় বিস্তৃত রহিয়াছে। হ্রদের কূলে ঘাইয়া তেজসিংহ একবার সমুখে অবলোকন করিলেন এবং সেই মনোহর প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নিজের চিন্তা এক-বার ভুলিলেন।

সারংকালে লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর পতিত হইয়া কি অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে! জলের নিম্নতর বন্ধের উপর চারিদিকে উন্নত পর্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত হইয়াছে! এখানে শব্দ নাই, যত্নবোধ গমনাগমন নাই, জীব-আবাসের চিহ্নমাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ রচয়িতার পুকার কল্প এই উন্নত পর্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জন, নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটা শিলাখণ্ডে উপ-বেশন করিলেন।

আমরা এই অবসরে সেই অপূর্ণ দেশ-বাসী ভীলদিগের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব।

ভারতবর্ষের যে সুন্দর প্রদেশে রাজপুত-গণ আসিয়া অসিহস্তে আপনাদিগের আবাস-স্থান পরিষ্কার করিয়া পরাক্রান্ত রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, রাজপুতদিগের আগমনের পূর্বে সেই রাজস্থান ভীলদিগের আবাস-স্থান ছিল। যখন রাজপুতগণ আসিয়া

উক্করাক্ষেত্র ও রম্য উপত্যকাভূমি কাড়িয়া লইল, তখন স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ বিজা-চল ও আরাবলী পর্বতে বাইরা আপনা-দিগের স্থান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। বোধ হয়, যুগের কয়েক কিছু পরেই এই সমস্ত ব্যাপার সমাপ্ত হইয়া-ছিল।

সেই অবধি ভীল ও রাজপুতদিগের মধ্যে এক অপূর্ণ মিত্রতা রহিল। ভীলগণ নামমাত্র রাজপুত-রাজাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু কলে আপন আপন পর্বতস্থিত "শাল"-সমূহে বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল এবং অব-সরযতে কি রাজপুত, কি মুসলমান, সকল-কেই লুণ্ঠন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তথাপি রাজপুত-রাণাদিগের সিংহা-সন আরোহণের সময় একজন ভীলসদস্য রাজনিদর্শনগুলি রাণাকে অর্পণ করিত এবং রাজপুতদিগের যুদ্ধ ও বিপদের সময় ভীল-যোদ্ধাগণ যথাসাধ্য রাজপুতদিগের সহায়তা করিত।

ভারতবর্ষের সমস্ত বর্ষরাজ্যটিই হিন্দু-দিগের দুই একটি দেবকে আপন দেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং হিন্দু-দেব হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত করিয়াছে। ভীলগণ কহে, "আমরা মহাদেবের ভক্ত, মহাদেব-উরসে আমাদের জন্ম। মহাদেব একটি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বস্ত্র বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সেই বালিকার গর্ভজাত একটি কৃষ্ণবর্ণ সন্তান কোন এক দিন মহাদেবের ব্যবহৃত্য করে এবং সেই অবধি শাপগ্রস্ত হইয়া ভীলনামে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা ভীলগণ তাহারই সন্তান।"

পর্বতের শিকরে ভীলদিগের “পাল” বা গ্রাম নির্মিত হয়, পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পালের মধ্যে প্রত্যেক ভীলের গৃহ, এক একটি চুর্ণের দ্বারা চারিদিকে কটক ও বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। এই পালসমূহ হইতে হিংস্রক পক্ষীর দ্বারা সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য-বাবসারী সভ্য-জাতি-দিগকে দূর্জন করিয়া ভীলগণ বহুশতাব্দী অবধি জীবনধারণ করিয়াছে। শত্রুরা যদি কখন এই পাল আক্রমণ করে, তবে ভীল-নারী ও শিশুগণ গোমহিষাদি লইয়া নিকটস্থ নিমিড়, হুর্ভেড পর্বত ও জঙ্গলে বাইয়া লুকাইয়া থাকে, পুরুষগণ ধনুর্ধারণে বা প্রতর-নিষ্ক্ষেপ দ্বারা নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করে।

ভীলদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল আছে, প্রত্যেক দল নিজ দলপতি বা সর্দারের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। এই দলের মধ্যে সর্দারই বিরোধ ও বিবাদ হয়; কিন্তু আবার যুদ্ধ বা বিবাদকালে সকল দল একত্রিত হয়। তখন তাহাদিগের যুদ্ধরব প্রতি উপত্যকার শবিত হয়, পাল হইতে অস্ত্রপালে সংবাদ প্রেরিত হয়। নিশাকালে বায়ু-শৃগাল অথবা পক্ষীর রব অগ্রকরণ করিয়া ভীলগণ সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে এবং অল্পসময়ের মধ্যে শত শত যোদ্ধা দলবদ্ধ হইয়া একাভাবে শত্রুবিনাশের চেষ্টা করে। রাজস্থানে অন্ত্যাপি প্রায় বিশ লক্ষ ভীল বাস করে।

ভীলদিগের মধ্যে আতিভেদ নাই। তাহারা দুই একটি হিন্দু-দেবকে ও নানারূপ গীড়াকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মৌর্য-বুদ্ধকে বিশেষ সম্মান করে এবং ঐ বুদ্ধ হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া সেবন করে। পুরুষগণ স্বাধীকৃতি, কুকায় এবং কার্য্য-

ক্ষেপে অসাধারণ শারীরিক বল ও ক্রমতা লাভ করে। স্ত্রীলোকগণ পুরুষ অপেক্ষা ক্রমৎ গৌরবর্ণ ও হস্তী এবং বস্ত্র দ্বারা কক্ষ ও একটি শুভ আচ্ছাদন করে এবং হস্তপদে লাক্ষানির্মিত বলয় প্রভৃতি ধারণ করে। বিবাহের রীতি বড় সহজ। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের সমস্ত যুবক ও কস্তা একত্রিত হয়, পরে যুবকেরা আপন আপন মনোনীত এক একটি কস্তাকে বাছিয়া লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন তথায় কালহারণ করে। পরে জীপুরুষ গ্রামে ফিরিয়া আইসে।

বর্ষের ভীলদিগের দুইটি অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাহাদের উপকার করিলে তাহারা কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না এবং তাহারা বাক্যদান করিলে কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

হুদতটে ভীল-বালিকা।

কাউপথতা ইথিআ জাইনিয়া পরিমাগমণা
অভ্যাহণং বিপোদেদি।
বিক্রমোর্বশী।

যে পর্বতের নীচে তেজসিংহ হুদতটে এই নিম্নক সাংকালে এখনও বসিয়া আছেন, সেই পর্বতের চূড়ার ভীমচাঁদ নামক এক ভীল-সর্দারের পাল ছিল। সেই পালের নিকটে একটি পর্বতগহ্বর ছিল, পাঠক দুর্জয়সিংহের সহিত সেই গহ্বর একদিন দৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হুদের তটে একটি তুঙ্গ প্রস্তররাশির উপরে তেজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন।

সহসা একটি ভীলবালিকা করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল এবং বায়োচিত্র চপলতার সহিত হ্রদের জল লইয়া তেজসিংহের গায়ে ছিটাইয়া দিল। তেজসিংহ সে বালিকাকে চিনিতেন। বালিকার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন এবং অল্পমনক্ হইয়া বালিকার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

ভীলকন্ডা ভীলদিগের ছায়াই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়নদুটি উজ্জ্বল, মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীলবালিকা পর্ত্ত-আরোহণে বক্ত-বিড়াল অপেক্ষাও পটু, আজয় অস্ত্রান্ত ভীলদিগের ছায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটি শব্দ, একটি ছায়া, একটি স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। যত্নকে ক্রমকেশ সর্দসাই ছুলিতেছে, নয়ন দুইটি সর্দসাই চঞ্চল। বালিকা সর্দসাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু, কখন উপলব্ধ লইয়া খেলা করিত, কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্দাদ ডিজাইয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিত্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন ছুই তিন দণ্ড পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। বালিকার কখন ধীর চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। সকলেই বলিত, “যেয়েটি দেখিতে বলিকা, কিন্তু মনটি বালিকার মন নহে।”

তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন? বর্ধাগমে শত্রুগণ মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তেজসিংহ বুদ্ধচিন্তা করিতেছিলেন না। বিদেশীয় শত্রু থাকিতে গৃহকলহ নির্বিক, সুতরাং তিনি পুণ্যমহলের চিন্তা

করিতেছিলেন না। তেজসিংহ কি চিন্তা করিতেছিলেন?

ভীলবালিকা অনেককণ নিশ্চেষ্ট হইয়া হ্রদের জলে আপন হস্ত নিক্ষেপ করিতেছিল ও তেজসিংহের উদ্দেশে মন্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেককণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা মুহুর্ত্তে একটি গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপ্ন কখন কখন স্বপ্নের জাগ্রিত হয়, বাল্যকালের দৃষ্ট মুকুটবি কখন কখন নয়ন-পথে আবিষ্কৃত হয়, বাল্যকালের প্রেম নিহিত অগ্নির স্তার কখন কখন জ্বলিয়া উঠে, এই যন্ত্রের একটি সরল গীত বালিকা গাইতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন। তিনি বাল্যকালের একটি স্বপ্ন চিত্তা করিতেছিলেন, ভীলবালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? বালিকার নাম বরিয়া ডাকিলেন।

বালিকা জগৎখোলা ছাড়িয়া তেজসিংহের দিকে চাহিল। ঠৈ, বালিকার মুখে ত কোন চিন্তার লক্ষণ নাই! তেজসিংহ বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন, “বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? যে গীত জানে, আপনি মনে তাহাই গাইতেছে।”

বালিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তেজসিংহ সন্দেহমনা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?”

হাসিয়া ভীলবালা বলিল, “এই ভূমি বলিলে, না হইলে আমি কিল্পে জানিব, ভূমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুণ্ডের?”

এবার তেজসিংহের মুখ গভীর হইল, ক

কৃত হইল, গভীরভাবে ভিজ্ঞাপা করিলেন,
“আমি পুন্সের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে
কে বলিল ?”

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত
সত্রে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর
করিল, “তাহা আমি কি প্রকারে জানিব ?
তবে বাল্যকালে লোকে কল-কুলের কথা
কত বোঝে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে ?”

তেজসিংহ বালিকার সরল বুৎখানি
দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “আমি মিথ্যা
সন্দেহ করিয়াছিলাম।” বলিলেন, “আমি
বাল্যকালে সত্য সত্যই পুন্সের স্বপ্ন দেখি-
তাম, তাহাই ভাবিয়াছিলাম ; তুই বর্ষাই
সন্দেহ করিয়াছিলি।”

ভীলবালিকা। ভীল অনেক বিষয়
দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়।
তুমি যদি ভীল হইতে।

তেজসিংহ। তাহা হইলে কি হইত ?

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল,
বালিকা নিঃশব্দে তাহা দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় ভিজ্ঞাপা করিলেন,
“তাহা হইলে কি হইত ?”

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীলবালা
কহিল, “তুমি কি অন্ধ ? বিভিন্নতা দেখিতে
পাও না ? তাহা হইলে তোমার হাত কি
শেত হইত, না আমার স্তার কৃষ্ণবর্ণ হইত ?”

ভীলবালা বর্ষার্থই বালিকা, গভীরভাবে
বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতেছিল।

তেজসিংহ পুনরায় সন্দেহে কহিলেন,
“বালিকা, পিত্র বাঢ়ী বা ; এইক্ষণেই বুট
হইবে।”

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন ?

বালিকা। আমি যে দেখিতে ভাল-
বাসি।

তেজসিংহ। কেন ?

বালিকা। যেমন সাদা বিদ্যাতের সঙ্গে
কাল যে একত্রে খেলা করে।

তেজসিংহ পুনরায় বালিকার দিকে
চাহিলেন, দেখিলেন, সারল্যের সহিত
বালিকা সাদা বিদ্যা ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে
চাহিয়া রহিয়াছে।

অপ্পষ্টভাবে তেজসিংহ বলিলেন,
“বালিকা, তুই কি সরলা বালিকা, না চিত্তা-
শীলা নারী ? আমি তোকে কখনই ভাল
করিয়া চিনিতে পারিলাম না।”

পরক্ষণে তেজসিংহ চাহিয়া দেখিলেন,
বালিকা নাই, পর্শত ও শিলারশির মধ্যে
চকলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া
গিয়াছে। দূর হইতে খিল্ খিল্ হাস্তধ্বনি
শ্রুত হইল, বালিকা সত্যই বালিকা !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

ভীলদিগের পালে ।

অংশাবতারবির কৃতান্তর সহোদয়বির পাপক সার-
ধিমিব কলিকালজ, ভাষণমণি গভীরবির উপলক্ষ্য-
মাণ্য অনতিভবনীয়াকৃতিং ॥ শবরসেনাপতিমপশ্যত্ব ।
কাদম্বরী ।

তখন তেজসিংহ সে ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া
পর্তুত আরোহণ করিয়া বালিকার পিতার
কুটীরে যাইলেন। ভীলসঙ্ঘের ভীমচাঁদই
দশমবর্ষীর বালক তেজসিংহকে আপন
পালের নিকটস্থ গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার
প্রাণরক্ষা করিয়াছিল ; ভীমচাঁদের দয়া ও
প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয়
যৌদ্ধ হইয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় সেই পালের প্রতি কুটীরে জীলনারীগণ আপন আপন গৃহকার্যে রত রহিয়াছে । সকলেরই শরীর বলিষ্ঠ ও উপরি-ভাগ অনাবৃত অথবা অর্ধাবৃত । কেহ কেহ গোবৎসকে আহার দিতেছে, কেহ বা শিশুকে স্তন দিতেছে, কেহ বা আহার প্রস্তুত করিতেছে, আবার কেহ বা এই বৃদ্ধের সময় পালের কটকবেটনে আরও কটক রোপণ করিতেছে । পালের প্রত্যেক কুটীরে রন্ধনের অগ্নি জলিতেছে, অগ্নির চতুর্দিকের বা গৃহের বাহিরে উলঙ্গ বর্ষর শিশুগণ খেলা করিতেছে । মল্লব্যোর বাসস্থান হইতে বহুদূরে শিবরে, পর্বতের দুর্ভেদ্য জঙ্গল-আবৃত ও কটকবেষ্টিত এই তত্ত্বের উপনিবেশ কি বিস্ময়কর । সভা মল্লব্য তাহাদিগকে যুগা করে, সভা মল্লব্য তাহাদিগের উর্বরা ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে, জীলগণ তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে । হিংস্রক পক্ষীর জ্ঞায় এই পূর্ণভবাসী জীলগণ শতবার লোকালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে, সভা মল্লব্যের লুণ্ঠিতধনে জীলনারী ও জীলশিশু পালিত হইয়াছে । ভীমচাঁদের কুটীরে অস্ত্র সেই পালের সমস্ত বোদ্ধা আসিয়া জড় হইয়াছে এবং কুটীরের অগ্নিতে সেই জীলদিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অব-রব অধিকতর বিকৃত বোধ হইতেছে ।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বাহ ও পদব্বর অনাবৃত ও সুবন্ধ পেণী-বিজড়িত । বৃথমূল দেখিলে ভয় হয়, নয়নব্বর উজ্জ্বল, শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের স্নানুমান কোমল প্রকৃতি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, সে পর্বত অপেক্ষাও ভীমচাঁদের হৃদয় কঠিন । তথাপি সেই কঠিন হৃদয়েও দুই একটি গুণের পরিচয় পাওয়া বাইত । বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ

সাহসী, সেইরূপ উপায়-উদ্ভাবনে তৎপর, তাহার তীক্ষ্ণ নয়ন বহুদূর হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত । ভীমচাঁদ স্বাধী-ধর্ম জানিত, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিত । একমাত্র হুহিতার ভক্ত সে কঠিন হৃদয়েও নরমতা ছিল ।

ভীমচাঁদের উত্তর পার্শ্বে অস্ত্রাঙ্গ বে জীল-গণ বসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর অনাবৃত, কেবল একখানি কোপীন ভিন্ন অস্ত্র বস্ত্র ছিল না ।

সেই জীলপালে অস্ত্র দুই জন আশঙ্কক উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়জী ভূমিয়া ও চঞ্জ-পুরের গোহুলদাস আজি ভীমচাঁদ ও তেজ-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া-ছিলেন । পাহাড়জী জাতিতে ভূমিয়া, ভূমি-কর্ম করা তাঁহার ব্যবসায় । নয়নে ও ললাটে বোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়বদ্ধ । ভূমিয়াগণ সন্তুগবৃদ্ধ জানে না, কিন্তু যুদ্ধকালে নিজ নিজ দুর্গ, নিজ নিজ ভূমি প্রাণপণে রক্ষা করিত, দেশের ভিতর শত্রুর গতিরোধ করিত । ফলতঃ মেওয়ারের ভূমিয়া রাজপুতগণ “মিলিশীয়া” বিশেষ ও অস্ত্রাঙ্গ রাজপুতের ন্যায় বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার যৎপরোনাস্তি তৎপর থাকিত । গোহুলদাস একজন “বলী,” পাঠক পূর্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । অনেক বরসে অনেক ক্রমে শরীর শীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উদ্ভম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই । তাহার পুত্র হত হই-য়াছে ; হত্যাকারীকেও দণ্ড দিবে, কেবল এই আশার বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়াছে ।

জীলকুটীরে অগ্নির আলোকের চতুর্দিকে এই সকল লোকপুংসিয়া আছেন, এরূপ সময় প্রায় ৪৮ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই

কুটীরে প্রবেশ করিলেন । সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল ।

পরস্পরে অনেক কথাবার্তা হইতে লাগিল । মহারাণা প্রতাপসিংহের কথা হইল, চল্লীষাটার যুদ্ধের কথা হঠল, দুর্জয়-সিংহ ও সূর্য্যমহলের কথা হইল । পরে তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল । পাহাড়জী নিজ ভূমিরা-নৈস্তুসহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোবিন্দদাস বন্দীদিগের সহিত তেজসিংহের সহায়তা করিবেন, তেজসিংহকে পিতার রাজগদীতে বসাইবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন ।

তেজসিংহ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ভীমচাঁদের বিশেষ স্তুত্যাতি করিয়া কহিলেন, “লোকালয় ত্যাগ করিয়া দশম বৎসর অবধি তিলকসিংহের পুত্র পর্যন্তগহনবে বাস করিতেছে । সর্দার ভীমচাঁদের অমুগ্রহে সে দুর্জয়সিংহের বিজাতীয় ক্রোধ হইতে লুপ্ত-মিষ্ট রহিয়াছে, সর্দার ভীমচাঁদের অমুগ্রহে সে এই আট বৎসর নিরাশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে । ভীমচাঁদের পিতা আমাদের মহারাণার পিতা রাণা উদয়সিংহকে বিপদের সময় রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন ; ভীমচাঁদ এক্ষণে আমাদিগের উপর সেই অমুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । ভীলগণ, শত যুদ্ধে শত বিপদে, রাজপুতদিগের সহযোগী ও প্রকৃত বন্ধু ।”

ভীমচাঁদ কহিল, “আমি তিলকসিংহকে জানিতাম, সেজন্য রাজপুত আর দেখিব না । তিলকসিংহের পুত্রের জন্ম ভীমচাঁদের যাহা সাধ্য, তাহা করিবে, ভীমচাঁদের ভীলগণ ধর্ম্মসিংহ-হস্তে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবে । রাজপুত ভীলদিগের প্রভু, রাজপুতদিগের সহায়তা করা ভীলদিগের প্রধান ধর্ম্ম ।

গৃহাপত্তিগকে আশ্রয়দান করা ভীলদিগের জাতিধর্ম্ম ।”

পাহাড়জী কহিল, “আমিও তিলকসিংহকে বিশেষ জানিতাম ।”

পরে বৃদ্ধ গোবিন্দদাস কহিল, “দুর্জয়সিংহের অত্যাচারে যখন পাহাড়জী ভূমিরা এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তখন ক্ষুদ্র বন্দীগণ কতদূর উৎপীড়িত হইবে, আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন । চন্দ্রপুরে এরূপ বৎসর নাই, এরূপ মাস নাই, এরূপ সপ্তাহ নাই যে, দুর্জয়সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ উৎপীড়িত না হইতেছে । ‘বাহারা বন্দী, তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কি করিবে ? কেবল অগায় তিলকসিংহের কথা শ্রবণ করে, তাহার পুত্র জীবিত আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করে । পূর্বে আপনার জীবিত থাকার কথা তাহারা জানিত না, সম্প্রতি না কি দুর্জয়সিংহের সহিত আহেরীয়ার দিন আপনার দেখা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিতে পায় । মনে মনে তাহারা দিন গণে, মাস গণে, কালে পিতার গদীতে আপনি বসিবেন, সর্দার সেই প্রার্থনা করে । তিলকসিংহের পুত্র ! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি জায়গার আবাল-বৃদ্ধ দুর্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিবে । বৃদ্ধ আর কি বলিবে ? তাহার নিজের উপর এ বৃদ্ধবয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, অগদীষর তাহার বিচার করুন ; কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন ।”

বৃদ্ধের পুত্রহত্যার কথা সকলেই জানিতেন, সকলেই বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন । তেজসিংহ কহিলেন, “পিতার পুরাতন ভৃত্য ! তোমার দুঃখ কেবল অগদীষরই সাধনা করিতে পারেন, কিন্তু আমি অজীকার করিলাম, পুনরায় পিতার গদী

পাইলৈ চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বন্দীদিগকে আমি মুখী করিব ।”

এইরূপ অনেক কথাবার্তার পর তেজসিংহ কহিলেন, “আর একটি কথা আছে, আমি আহেরীর দিন নাহারা মগরোতে গিয়াছিলাম ।”

সে ভয়ানক স্থলের নাম শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন, চারগীদেবীর নিকট হইতে তেজসিংহ কি জানিরাইয়া, জানিবার জন্ত সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ।

তেজসিংহ কহিলেন, “চারগীদেবীর আদেশ, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্রান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা । তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন ।”

অনেকক্ষণ পর যুদ্ধ গোহুলদাস বলিল, “ভগবান্ জানেন, জিঘাংসার এ বৃদ্ধের শরীর দৃঢ় হইতেছে, পুঞ্জশোক অপেক্ষা বিষম শোক এ সংসারে নাই ! তথাপি বৃদ্ধের মতে চারগী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, বত দিন দিল্লীখবরের সহিত মহারাণার যুদ্ধ হয়, তত দিন গৃহকলহ ক্রান্ত হউক !”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

রাঠোর-দুর্গ ।

সহ কলভেন যুগপতেরহকতব্ ।

বালবিকারিবিব্রব্ ।

রজনী এক গ্রহর হইয়াছে ; তেজসিংহ ভীল-হুদীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর-যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড়-দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

তিলকসিংহের বাবতীর যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিখ্যাত অহুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না । বহুকাল পূর্বে যখন তিলকসিংহের পূর্বপুরুষ স্বর্ধ্য-মহল প্রথম হস্তগত করিয়াছিলেন, দেবীসিংহের পূর্বপুরুষ তাঁহার দক্ষিণহস্তের স্থান সকল বিগড়ে সহায়তা করিয়াছিলেন । স্বর্ধ্য-মহলের বিজেতা সন্তুষ্ট হইয়া নিকটস্থ একটি পর্বতে ভীমগড় নামক দুর্গ নির্মাণ করাইয়া অহুচরকে সেই দুর্গে প্রদান করিলেন ।

সেই অবধি পুরুষাবৃত্তে ভীমগড়ের যোদ্ধাগণ স্বর্ধ্যমহলের অধীশ্বরদিগের অধীনে যুদ্ধ করিত, শত আহবে আপনাদিগের শোণিতদান করিয়া “স্বামীধর্ম” প্রদর্শন করিয়াছিল ।

দুর্জয়সিংহ কর্তৃক স্বর্ধ্যমহল অধিকার-সময়ে সেই নৈশ যুদ্ধে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল, কিন্তু সকলে হত হয় নাই । যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গে ত্যাগ করিয়া বহুদিন অবধি জল ও পর্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল, অবশেষে ভীমগড়ে দেবীসিংহের অধীনে কণ্ঠ করিতে লাগিল । তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সম্ভরণ দ্বারা হৃদ পায় হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল । অনেক বৎসর যুধা অহুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল ; সানন্দে সেই দরিদ্র ভীল-ভিকাহারীকে প্রভু বলিয়া অভিবাধন করিল ।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দিকে জড় হইতে লাগিল

ও বালককে পিতার হার বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ তিলকসিংহের সমস্ত অচর-দিগের মধ্যে রাস্তা হইল। তাহার সকলে বালককে পুনরায় পাইয়া একবাক্যে কহিল, “আমরা তিলকসিংহের লবণ আশ্রয় করিয়াছি, আমাদের খড়গ, আমাদের জীবন তিলকসিংহের পুত্রের। আদেশ করুন, পুনরায় সূর্য্যমহল অধিকার করিয়া আপনাকে পিতার গদীতে উপবেশন করাই।”

প্রাচীন বোদ্ধা দেবীসিংহ সানন্দে প্রভু-পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অহরোধ করিলেন। কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন, “হৃদ্ধিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, আমি বস্ত্র দিন সূর্য্যমহল জয় না করি, তত দিন ভীলকূটরেই থাকিব।”

অন্ত রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটি প্রশস্ত স্থানে উপবেশন করিয়া-ছিল। নিকটে বৃক্ষ বা ঘর নাই, পরি-কার অন্ধকার নীল আকাশ চন্দ্রাতপের স্তার সেই বীরমণ্ডলীর উপর লম্বিত রহিয়াছিল। পরিহার আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাই-তেছে, নীচে স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, এক এক অগ্নির চতুর্দিকে দুই চারি জন রাঠোর উপবেশন করিয়া অগ্নিসেবন করি-তেছে। বোদ্ধাদিগের কথাবার্তা বা হস্ত-ক্ষণি বা গীতরব সেই শিশার নিম্নকতার বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে। স্থানে স্থানে দুই একজন বোদ্ধা অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, স্থানে স্থানে কোন চারপকে মধ্যবর্তী করিয়া চারিদিকে রাঠোরগণ চার-পের গীত, রাঠোরের পূর্ব্বসৌরবগীত শুনি-তেছে। তিলকসিংহের পুত্রকে সংসা দ্র-

হইতে দেখিয়া সকলে গাভোখান করিল ও একেবারে পঞ্চম রাঠোর উল্লাসে গজ্জন করিয়া উঠিল। সে উৎসাহ দেখিয়া তেজ-সিংহ আনন্দিত হইলেন।

অগ্নির আলোক সেই প্রাচীন বোদ্ধা-দিগের লগাট ও মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়াছে। বালাবস্থা হইতে যুদ্ধবাবসারে তাহাদিগের শরীর দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, কাহা-রও লগাটে, কাহারও বদনমণ্ডলে, কাহারও বক্ষস্থলে বা বাহুতে খড়্গচিহ্ন-অঙ্কিত রহি-য়াছে। কেশপাশ কাহারও শুষ্ক, কাহারও ঈষৎ শুষ্ক, নয়ন সকলেরই উজ্জ্বল। সকলেই রাঠোরশ্রেষ্ঠ তিলকসিংহের অধীনে শতবার যুদ্ধ করিয়াছে, আকবর কর্তৃক চিতোরধ্বংস স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে তেজসিংহকে সেনাপতি করিয়া প্রথমে সূর্য্যমহল, তৎপরে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্ত জীবন দিতে প্রস্তুত। তেজসিংহ স্বধন পিতার প্রাচীন সেনাদিগকে আপনায় চতুর্দিকে দেখিলেন, তাহাদিগের উল্লাসরব ও আনন্দধ্বনি শুনি-লেন, যখন সেই প্রাচীন রাঠোরদিগের যুদ্ধা-ঙ্কিত বদনে ও উজ্জ্বল নয়নে কেবল স্বামী-ধর্ম ও উৎসাহের লক্ষণ পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় উৎসাহে প্রাবিত হইল, তিনি সজলনয়নে পিতার বোদ্ধাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন। তিলকসিংহের পুত্রের এই সৌজন্ত দেখিয়া পুরাতন রাঠোরগণ পুনরায় উল্লাসে গজ্জন করিয়া উঠিল।

তেজসিংহ বলিলেন, “বীরগণ! তোম-রাই যথার্থ স্বামীধর্ম প্রদর্শন করিলে, রাঠোর-কুল তোমাদের স্বামীধর্মে গৌরবান্বিত হইবে, তেজসিংহ তোমাদের স্বামীধর্ম বিস্মৃত হইবে না।”

রাঠোরগণ উত্তর করিল, “আমরা স্বর্গীয় তিলকসিংহের প্রতিপালিত, আমা-

দিগের জীবন, আমাদের দিগের বক্তা তেজ-
সিংহের ।”

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন, (তবু
কেশে তাঁহার প্রশস্ত ললাট আবরণ করি-
রাছে, কিন্তু নরনের দীপ্তি আবৃত করিতে
পারে নাই) — “এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্য-
মহলের গদীতে আরোহণ করিতে দেখি-
রাছে, যুদ্ধের পূর্বে তেজসিংহকে সেই
গদীতে বসাইবার বাসনা করে। যুদ্ধের
জীবনে অস্ত্র আঁকাঝা নাই ।”

তেজসিংহ । দেবীসিংহ ! পিতার
রাঠোরদিগের মধ্যে তোমার ভ্রাতা প্রাচীন
কেহই নাই, অথচ হল্লীঘাটার যুদ্ধে
রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা বীর
কেহ ছিল না। তথাপি তোমার মনস্কামনা
পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে ।

দেবীসিংহ । প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য,
কিন্তু প্রভু কি বিষয়ে সন্দেহ করেন ? শুনি
রাছি, চন্দাওয়ার দুর্জয়সিংহের একসহস্র সেনা
আছে ; পঞ্চশত রাঠোর কি একসহস্র
চন্দাওয়ারদিগের সহিত যুদ্ধদানে অসমর্থ ?

তেজসিংহ । রাঠোরের বীরত্বে আমি
সন্দেহ করি না, বিশেষ পিতার অস্ত্রাভ
বন্ধু ও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছেন। পাহাড়জী ভূমিয়ার প্রায় এক
সহস্র ভূমিয়া আছে, ভীমটানের প্রায় দ্বিশত
ধর্ম্মর ভীল বোদ্ধা আছে, চন্দ্রপুরে প্রায়
দ্বিশত বন্দী প্রজা আছে, তাহারা সকলেই
তিলকসিংহের পুত্রের জন্ত জীবনদানে
প্রস্তুত ।

দেবীসিংহ । তবে যুদ্ধে বিলম্ব কি ?

তেজসিংহ । সূর্য্যমহল আক্রমণ করিলে
বিজয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার
বোদ্ধগণ ! তোমাদিগের অধিকাংশকে
হারা হইবে

দেবীসিংহ । প্রভুর জন্ত জীবনদান
ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে ?
রাঠোর কি যুদ্ধে ডরে ?

তেজসিংহ । রাঠোর যুদ্ধে ডরে না—
পিতা চিতোর-রক্ষার্থে প্রাণ দিরাছিলেন ।
কিন্তু সূর্য্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে
পুনরায় হল্লীঘাটার কে যুঝিবে ? বীরগণ !
মাতার হত্যা ও কুলের অবমাননার কথা
তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধর্ম্মনীতি বত দিন
শোণিত থাকিবে, তত দিন বিস্মৃত হইবে না,
কিন্তু বিদেশীয় যুদ্ধ বর্তমান “বৈরি” নিবিদ্ধ ।
রাজপুতগণ ! রাজপুতধর্ম্ম পালন কর ।

প্রাচীন রাঠোর বোদ্ধগণ সকলে নন্দ-
শির হইল । অনেককণ পর দেবীসিংহ
গন্তীরথরে কহিলেন, “তিলকসিংহের পুত্র
বাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোর-
মাজের শিরোধার্য্য, বিদেশীয় শত্রু বর্তমানে
রাঠোর চন্দাওয়ারের ভ্রাতা, চন্দাওয়ার
রাঠোরের ভ্রাতা, যেক্ষে ভিন্ন রাজপুতের
আর শত্রু নাই। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম
পর্য্যন্ত যদি দেবীসিংহ জীবিত থাকে, চন্দা-
ওয়ার দুর্জয়সিংহ, সাবধান !”

সকল রাঠোর গর্জিয়া—উঠিল—“চন্দা-
ওয়ার দুর্জয়সিংহ, সাবধান !”

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে স্রুত
হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দশ
বর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজ-
সিংহের সম্মুখে আগ্রসর হইল । বালকের
সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য
করিতেছে, কখনকখনে বালকের চপলতা
বিরাজ করিতেছে। বালকের মুখমণ্ডল
কোমল, ওষ্ঠ দুটি ; রক্তবর্ণ কিন্তু অবরব দীর্ঘ,
শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ । বালক
ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া
নভশির হইল ।

বালককে দেখিয়া তেজসিংহের পূর্ব-
কথা একবার স্মরণ হইল। একবিন্দু অজ-
বোচন করিয়া কহিলেন, “চন্দন! বালা-
কালে সূর্য্যমহলে তুমি আমার ক্রীড়ার সঙ্গী
ছিলে, তোমার কি মনে পড়ে? আমার
দেখাদেখি ছয়বৎসর কালের সময় তুমি
জীর্ণ ও বর্ণা নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে,
তাহা কি মনে পড়ে? পিতা একদিন
তোমার ললাট দেখিয়া কহিয়াছিলেন,
‘চন্দন দেবীসিংহের স্তার বীর হইবে,’ তাহা
কি মনে পড়ে?”

সকলজন্মের চন্দন কহিলেন, “প্রভুই
আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার
জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্তার ছিলেন, তাহা কি
বিশ্বস্ত হইতে পারি? প্রভুই আমাকে
প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কী-
সিংহের সহিত যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধবাজায়
অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।”

তেজসিংহ চন্দন! তোমার বরস
অল্প, এক্ষণে দুর্গে রণশিক্ষা কর, যথা-
সময়ে তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধে লইয়া
বাইবেন।

চন্দনসিংহ। চতুর্দশবর্ষীয় রাঠোর কি
তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধিতে সক্ষম নহে?

হাস্ত করিয়া তেজসিংহ কহিলেন,
“সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ
করে; দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের
অস্ত্র ব্যস্ত হইবে? চন্দনসিংহ, অচিরেই
জীবণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের
সকলেরই যুদ্ধ-সাধ মিটিবে। তোমার
পিতা সর্বদা মহারাণার সহিত থাকিবেন,
তুমি এ স্থানে থাকিলে ভীমগড় কে
রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্পবয়সেই
তুমি বীর; এই অল্পবয়সেই তোমাকে
আমি ভীমগড়-দুর্গরক্ষার নিযুক্ত করিলাম।

তোমার হস্তে রাঠোর-অগ্নির অবমাননা
হইবে না।”

বীরে বীরে চন্দনসিংহ কোব হইতে
অগ্নি বাহির করিল, সেই অগ্নি স্পর্শ করিয়া
বীরে বীরে আকাশের দিকে চাহিয়া অল্প-
বয়স্ক বীর কহিল, “তাহাই হউক! চন্দন-
সিংহ প্রভুর আদেশে ভীমগড় অস্ত্র হইতে
রক্ষা করিবে; ভগবান সহায় হউন, বত-
ক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, বতক্ষণ
দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, বত-
ক্ষণ এ দুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।”

বালকের এই পণ শুনিয়া রাঠোরমণ্ডলী
সাদুবাদ করিতে লাগিল, প্রাচীন দেবী-
সিংহের নরন হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে
লাগিল। কিন্তু রাঠোরগণ জানে না, প্রাচীন
দেবীসিংহ জানে না, কিরূপ ভরানক শোণিত-
শ্রোত ও অঘ্রিরাশির মধ্যে এই বিবম পণ-
রক্ষা হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দাওয়ৎ-দুর্গ।

অখাজিনাবাচরণঃ প্রগল্ভবাক্.
অলরিব ব্রহ্মবয়েন তেজসা।
বিশেষ কচ্ছিত্তিলম্ভগোবনঃ,
সরীরবতঃ প্রথমাজনো যথা ॥

কুবারসম্ভবম্।

পাঠক! চল, আমরা ভীমগড় ত্যাগ
করিয়া একবার সূর্য্যমহলে গমন করি,
তথায় সূর্য্যমহলেবর দুর্জয়সিংহের সহিত
লাঞ্চার করি।

হলদীবাটার যুদ্ধান্তে দুর্জয়সিংহ সূর্য্য
মহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃ-

কালে স্ব্যামহল-পৰ্বতচূড়া হইতে চন্দাও-
রৎ-পতাকা উড়ান হইতেছে ও চন্দাওরৎ-
রণবাস্ত চারিদিকে শবিত হইতেছে। “দরী-
শালার” অর্থাৎ সভাগৃহে দুর্জয়সিংহ উপ-
বেশন করিয়াছেন, উত্তর পার্শ্বে তাঁহার
সহোদাগণ ঢাল ও ধলহস্তে উপবেশন
করিয়াছেন। চতুর্দিকে হুর্জয়সিংহ হুর্গে-
ষরকে দেখিতে আসিয়াছে, নাগরিকগণ
পরম্পরে হলদীঘাটার ও তুর্কীগিরের বিবর
কথোপকথন করিতেছে; পুরনারীগণ সুহে-
লীয়া অর্থাৎ মঙ্গলগীত গাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাবৃত্ত
চন্দাওরৎ-বীরদিগকে আহ্বান করিতেছে।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জয়সিংহের উত্তর
পার্শ্বে তাঁহার বোদ্ধগণ বসিয়াছিলেন।
কয়েকমাস পূর্বে এই সভাস্থলে যে সমস্ত
বীর উপবেশন করিয়াছেন, হার। তাঁহা-
দিগের মধ্যে অনেকে অস্ত্র আর এ জগতে
নাই! তাঁহাদিগের বীরত্ব ও অকালমৃত্যু
স্মরণ করিয়া সকলেই শত ধন্যবাদ করিতে
লাগিলেন; বীরগণ সেইরূপ সম্মুখযুদ্ধে স্বদে-
শের জন্ত প্রাণ দিতে পারেন, এই আকাঙ্ক্ষা
করিতে লাগিলেন। অস্ত্র তাঁহারা সভায়
বর্তমান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে
শরীরে যুদ্ধাক বহন করিতেছিলেন, কাহা-
রপ লগাট, কাহারও দীর্ঘ জাম্ব, কাহারও
বিশাল বক্ষঃস্থল, ধড় বা বর্শা বা গুলীর
অনপনের অঙ্কে অঙ্কিত হইরাছে।

সভাগৃহের একপ্রান্তে দুর্জয়সিংহের
“গোলা” অর্থাৎ দাসগণ দণ্ডায়মান হইয়া-
ছিল। ইহারা যুদ্ধকালে প্রভুর পার্শ্ব কখনও
পরিভ্রাণ করে না। হলদীঘাটার যুদ্ধে দুর্জ-
য়ের সহিত প্রায় এক শত “গোলা” গমন
করিয়াছিল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশ জনও
কিরিয়া আইসে নাই। গোলাগণ চিরদাস,
তাঁহাদিগের “গোলা” ভিন্ন অস্ত্র কাহারও

সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদিগের পুত্রকন্যাত
দাস-বানী। গোলাদিগের জীবন-মরণ প্রভুর
হস্তে, তাহারা প্রকৃতভি ভিন্ন অন্য ধর্ম
জানিত না। যুদ্ধপ্রান্তে দুর্জয়ের ত্রিশং কি
চত্বাংশিং “গোলা” বিনীতভাবে দণ্ডায়মান
রহিয়াছে, তাহাদিগের দক্ষিণ-পদে গোপা-
নির্ধিত বলর শোভা পাইতেছে।

দুর্জয়সিংহ যুদ্ধের কথা কহিলেন।
বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি
পুনরায় আসিবেন? রাজা মানসিংহ কি
বদেশবাসীদিগের শোণিতপাতে এখনও ভূই
হন নাই? যদি না হইরা থাকেন, মেও-
য়ারের শিশোদীরগণ আরও শোণিতদানে
সম্মত আছেন, তুর্কীগণ পুনরায় আসিলে
শিশোদীরগণও পুনরায় রণরঙ্গে তাহাদিগকে
আহ্বান করিবেন। যত দিন শিশোদী-
রের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যত
দিন চন্দাওরৎ-ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত
হইবে, তত দিন মেওয়ারভূমি পরাধীনতার
কলঙ্করেখা লগাটে ধারণ করিবেন না।

এইরূপ কথা হইতে হইতে চারণদেব
তথ্য উপস্থিত হইলেন। দুর্জয়সিংহের অস্থ-
মতিক্রমে চারণদেব হলদীঘাটার একটি গীত
আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধ চারণ স্বয়ং সেই যুদ্ধ
অবলোলন করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের
দুর্জয়নীর সাহস অবলোকন করিয়াছিলেন,
চন্দাওরৎকুলের অপ্রতিহত বীর্য অবলোকন
করিয়াছিলেন, তাহাই গাইলেন। বাক্যসাগর
মহন করিয়া গর্জিতভাবায় গর্জিতস্বরে হলদী-
ঘাটার গর্জিত গীত গাইলেন। সভা নিভর ও
শব্দশূন্য, চারণের উচ্চগীত সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত
হইতে লাগিল। শেষ বধন চারণদেব চন্দা-
ওরৎদিগের বীরত্ব-কথা বলিতে লাগিলেন,
বধন বর্শাধারী রক্তাপ্রত দুর্জয়সিংহের ভীম-
মূর্ত্তি ও দুর্জয়নীর বীরত্ব বর্ণনা করি। গীত

সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ
যোদ্ধাদিগের উল্লাসেরে পরিপূর্ণিত হইল ।

বৃদ্ধ চারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি বুঝা
চারণ সভাগৃহে আসিয়াছিল, সেও একটি
গীত গাইবার অহুমতি চাহিল ।

দুর্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে
কহিল, “চন্দাওরবীর ! রাজচারণ যে গীত
গাইলেন, আমি সেইরূপ গাইব, এরূপ সাধ্য
নাই, তথাপি সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন
হন, তবে আকবর কর্তৃক চিতোরদুর্গ অণ-
হরণের একটি গীত গাইব । আকাশের যে
বৃষ্টিতে শাল, তমাল, অশ্বথ প্রভৃতি বৃহৎ
বৃক্ষ পুষ্ট হয়, তদুৎসর্গ্য কি তাহাতে পুষ্ট
হয় না ? সাধুদিগের অহুমতি হইলে ক্ষুদ্র
কবিও একটি কবিতা রচনা করিতে সক্ষম ।
সাধুগণ কি সে অহুমতি দান করিবেন ?”

দুর্জয়সিংহ । চারণদেব ! তোমার বিনীত
ভাব দেখিয়া তুষ্ট হইলাম । তুমি আমাদের
অপরিচিত, কিন্তু বীর ও কবিদিগের গুণই
পরিচয় । গীত আরম্ভ কর ।

তীব্রভাবে কবি গীত আরম্ভ করিলেন,
সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে শ্রুতিতে লাগিলেন ।
গীত ।

“সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

বাহারা বংশাভ্যুত্থে বক্ষা করিয়াছে,
তাহাদিগের ? অথবা বাহারা তন্ময়ের জ্ঞান
অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের ?

তন্ময়ের অবমাননা হইবে । তন্ময়ের
জয়শোণিতে রাজপুত-বংশ রঞ্জিত হইবে ।

সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যে নারী দুর্গরক্ষার্থ বৃদ্ধ দান করে,
তাহার ? অথবা যে নারী-হত্যা করিয়া *
দুর্গ অধিকার করে, তাহার ?

*চিতোর-দুর্গ-বিজয়ের সময় পত্নের হাতা ও বিনীত
বহু বোপদগিরের সহিত বুদ্ধদান করিয়া হত হন ।

নারী-হত্যাকারী অবমানিত হইবে,
নারীহত্যাকারীর জয়শোণিতে রাজপুত
বংশ রঞ্জিত হইবে ।

সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে,
তাহার ? অথবা যে বীরবালক * অন্ন
পর্কতকন্ডরে বাস করিতেছে, তাহার ?

বালক এখন বঞ্চনধারণ করিয়াছে,
হলদীবাটার যুদ্ধে যুদ্ধভাত হইয়াছে ! তন্ময়ের
জয়শোণিতে তাহার বংশ রঞ্জিত
হইবে !

সে উন্নত দুর্গ কাহার ?

দুর্গরক্ষার্থ যে বীরগণ হত হইয়াছে,
দুর্গচ্যুত হইয়া বাহারা পর্কতে বাস করি-
তেছে, দুর্গ তাহাদিগের ।

পুনরায় রাজপুত দুর্গ আক্রমণ
করিবে, শত্রুরক্তে রঞ্জিত করিয়া দুর্গ
অধিকার করিবে ।”

গীত ক্ষান্ত হইল ; যুবকের জগন্ত নরন
দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল । সকলে উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিয়া উঠিল, “তুর্কীরক্তে অসি রঞ্জিত
করিয়া রাজপুতগণ চিতোর-দুর্গ অধিকার
করিবে !”

দুর্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য মিলেন না,
দুর্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না, অকুটিপূর্বক
ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন ! ক্ষণেক পর
পুনরায় চারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,
চারণ সভাস্থলে নাই !

*চিতোর-বিজয়ের সময় প্রতাপসিংহের পিতা
আবিত ছিলেন, হতহা প্রতাপ যুবরাজ ছিলেন না ।
হলদীবাটার যুদ্ধের সময় প্রতাপ পর্কতে ও কন্ডরে
সপরিবারে বাস করিতেন ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

গায়ক কে ?

অলঙ্কারাগত জহীমুটিলং যুব ।

নিরীক্ষ্য করিতুবনে বন বো ন পতো ভব ।

বিরহপুরাণ ।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার মস্তক একজন গৌলীর অঙ্গে স্থাপিত, অস্ত্র একজন গৌলী তাঁহার পদসেবা করিতেছে । উভয়ে প্রৌঢ়োবনসম্পন্ন ও রূপবতী, কিন্তু তাহাদের সেবার অস্ত্র দুর্জয়সিংহের চিন্তা দূর হইতেছে না । *

দুর্জয়সিংহ অনেককণ চিন্তাকুল হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন, অবশেষে প্রধানকে ডাকাইবার আদেশ দিলেন । উঠিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন, গৌলীগণ গৃহভ্যন্তরে চলিয়া গেল ।

কণেক পর প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দুর্জয়সিংহ কহিলেন, “আমি বুদ্ধবাজ্রাকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে ?”

প্রধান । সেইকণেই আমি নানা দিকে চর পাঠাইয়াছি । কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি ।

* পাঠক জানেন, রাজস্থানের রাজ্যভগ্ন অনেক অংশে ইউরোপের কিউডল সাম্রাজ্যের সূচ । বহা-
রাণার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কুলাধিপতি বোঝা
ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে নিরস্ত্রের বোঝা
ছিলেন, প্রত্যেকের স্ব স্ব দুর্গ, ভূমি-সম্পত্তি ও
প্রজাতি, আবার সকলেই জৈনীকনে বহারাণার
অধীন । রাজস্থানের হইলকার দাস—“বদা” ও
“গোলা” । “কিউডল”সময়ের “Colioni” এবং “Slaves”
বিধের সূচ । ভূমিরাগণ এক কবিলী “Militia”
সম্রাট ।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তিলকসিংহের পুত্রের
কোন সন্ধান করিতে পারে নাই ।

দুর্জয়সিংহ । বস্ত্র ভীষণগের মধ্যে,
পূরিত ও অঙ্গলের মধ্যে বিশেষ অঙ্গসন্ধান
করিতে বলিয়াছিলেন ?

প্রধান । তাহাদিগের মধ্যেই বিশেষ
অঙ্গসন্ধান করিতেছে ।

দুর্জয়সিংহ অধোবদনে চিন্তা করিতে
লাগিলেন ।

প্রধান । প্রভু, এরূপ চিন্তিত হইবেন
না । যদি সেই তেজসিংহ এখন জীবিত
থাকে, তাহা হইলে সে প্রভুর কি করিতে
পারে ?

দুর্জয়সিংহ । যদি ? তেজসিংহের জীবিত
থাকার বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ?

প্রধান । প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে
কেবল একদিনমাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে
শ্রম কি অসম্ভব নহে ? সে জীবিত থাকিলে
আমাদের চর তাহাকে পায় না কি জন্ত ?
সেই বা এতদিন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেই কি জন্ত ?
প্রভু, মিথ্যা চিন্তা করিবেন না, ঐ হৃদগর্ভে
তেজসিংহ বহুদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছে !

দুর্জয়সিংহ । প্রধান । সেই একদিন
নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থান ছিল
বটে, কিন্তু সেই বালককে ছুইবার, বোধ
করি, তিনবার দেখিয়াছি ।

প্রধান । কবে ?

দুর্জয়সিংহ । ভীষণ বা ভূমিরাগণ কবে
বর্ষা নিক্ষেপ করিতে জানে ? হল্লীমাটার
হৃদয়ের দিন এক দল ভীল ও ভূমিরাবন্দী
বর্ষা ও অসি-হস্তে মানসিংহের সেনাকে
আক্রমণ করিয়াছিল ।

প্রধান । এ বথার্থ বিষয়ের কথা ।

দুর্জয়সিংহ । বিষয় কিছুমাত্র নাই,
তাহারা ভীল নহে । কয়েকজন রাঠোর-

যোদ্ধা ভীলবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সঙ্গারকে আমি চিনিরাছিলাম ; সে সেই যুবক ! চিতোরধ্বংসের সময় জয়মলের পার্শ্বে তিলকসিংহকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, অন্তর্যবলে চিতোরের দ্বার রক্ষা করিতে দেখিয়াছি, তিলকসিংহের বালক পিতার অপেক্ষা যুদ্ধে নান নহে।

মন্ত্রী মুখমন্তল গম্ভীর হইলেন। দুর্জয়সিংহ আরও বলিতে লাগিলেন, “সেই হৃদয়-ঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্শা কম্পিত হইয়াছিল, দুর্জয়সিংহের বর্শা মিথ্যা হয় না, এক আঘাতে জগৎ হইতে দুর্জয়সিংহের চির-শত্রুকে দূর করিবার অভিলাষ হইয়াছিল ! কিন্তু আহেরীয়ার দিন অরণ হইল, বর্শা আমার হস্তেই রহিল।”

প্রধান। আহেরীয়ার দিন বালক আপনার জীবনরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে অবধ্য ?

দুর্জয়সিংহ। তাহা নহে; কিন্তু বিদেশীর শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরীয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল, বিদেশীর শত্রু বর্তমান থাকিতে দুর্জয়সিংহ গৃহকলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।

প্রধান। তবে অঘেঘণ কি জন্ত ?

দুর্জয়সিংহ। যে দিন সিল্লীর সহিত যুদ্ধশেষ হইবে, সেই দিন দুর্জয়সিংহ হৃদয়ের কটকোদ্ধার করিবে। সেই জন্ত পূর্বে হইতে তাহার আবাস জানা আবশ্যক।

প্রধান। অঘেঘণ আমার ক্রটি নাই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উদ্দেশ্য পাই নাই। প্রভু তৃতীয়বার তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন ?

দুর্জয়সিংহ অনেককাল পর্য্যন্ত এ প্রশ্নে উত্তর দিলেন না, তাহার মুখ ক্রমে ক্রমশঃ

ধারণ করিতে লাগিল। অনেককাল পর দুর্জয়সিংহ ক্রোধকম্পিতভাবে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অথ বে চারণের গীত শুনিলেন, তাহার অর্থ কি ?”

মন্ত্রী। চারণ চিতোর পুনরুদ্ধারের গীত গাইয়াছিল।

সরোবে দুর্জয়সিংহ উত্তর করিলেন, “যুধা মন্ত্রীস্বার্থ্য গ্রহণ করিয়াছেন। উঃ, সেই অবধি আমার মন সন্দেহ-পূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সন্দেহের আর কারণ নাই। নয়নের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জিহ্বাংসাপূর্ণ হৃদয় ভ্রান্ত হয় না। সেই চারণকে দেখিয়া অবধি প্রজ্জ্বলিত হতাশনের স্তায় আমার জিহ্বাংসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রিবর, সেই তীব্র গীত চিতোর-ধ্বংসবিবয়ক নহে, সে দুর্জয়সিংহ কর্তৃক স্বর্য্যমহল-ধ্বংসবিবয়ক ! অটোজ্জ্বলিত সেই জ্বলন্ত নয়নধারী চারণ নহে, সেই তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ভানের পুষ্প।

অন্যাত্তং পুষ্পং কিমলয় বলুন করকুই-
রনাবিক্তং রত্নং বহু নবনাবাদিতম্।
অধত্তং পুষ্পাধাং কলমিব টুট তত্ৰঙ্গমনমং
নজনে ভোক্তারং রমিহ সুপুস্পাত্ততি বিধিঃ।
অভিজ্ঞানপুস্তকম্।

পাঠক ! চল, দুর্জয়সিংহের প্রাসাদ হইতে অনতিদূরে সেই পর্ব্বতের উপর অত্র একটী স্থানে আমরা গমন করি। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, বাইতে কষ্ট হইবে না। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, সুন্দর পুষ্পোদ্ভানে কণেক বিশ্রাম করিব।

রজনী বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু এই নিঃশব্দ রজনীতে এখনও স্বৰ্ণমহল-পর্কতের উপর একটি পুষ্পোত্থানে একজন রাজপুত্র-বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন। উত্থানে জীব-মাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে পদচারণ করিতেছেন। কখন স্থির উজ্জ্বল-নয়নে সেই নীলনভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন ছুই একটি শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কখন বা চিন্তাকুল হইয়া ছুই একটি গীতের অংশ-মাত্র মুদ্রবরে গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তন্দ্রাকীকে চন্দ্রকরে একাকিনী দেখিলে মানবী বলিয়া বোধ হয় না, চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্ভানবিচারিণী অপরা বলিয়া ভ্রম হয়। বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দশবর্ষ হইবে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর, ললাট পরিষ্কার, নয়ন দুটি উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল ও শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল, বালিকার নাম পুষ্পকুমারী। মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্পবয়সেই কোন চিন্তা সেই সুন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে। নয়ন দুটি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, কোন অচিন্তনীয় শোক সেই সুন্দর নয়নে আশ্রয় লইয়াছে।

চন্দ্রলোক বৃক্ষপত্র ও পুষ্পের উপর রোপ্যের ত্রায় পতিত হইয়াছে। নিশীথ-পুষ্প-গণ যেন নিজ বক্ষে আবরণ ত্যাগ করিয়া নীতল বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে। পুষ্প রজনীতে শিশিরাক্ত পুষ্প চয়ন করিতে বড় ভাল-বাসিতেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল উত্থানে নীরবে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিলেন।

সেই ললিত বাহর উপর, সেই অনাবৃত স্বর্গের উপর, সেই পরিষ্কার ললাটের উপর নীতল চন্দ্রকর পতিত হইয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের মধ্যে চন্দ্রকর যেন নীরবে প্রবেশ

করিতেছে, যেন নীরবে সেই প্রাপ্ত উজ্জল নয়নদ্বয় চূষন করিতেছে।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন? এই চন্দ্রদেশ হইতে কি চন্দ্রসত্ত্ববা কোন অপরা জগতের পুষ্প-চয়ন করিতে আসিয়াছেন? কল্পনাশক্তি কি অপূর্ণ সুন্দর নিশীথে একটি অপরাপ মায়াবৃত্তি গঠন করিয়াছে? না জগতের কোন মানবীর এই ললিত বাহুগুণ, এই সুগোল ললাট ও গণ্ডস্থল, এই সুন্দর রক্তবর্ণ ও চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত স্নেহগর্ভ নয়নদ্বয়। নিশীথের নীতল বায়ু ধীরে ধীরে গণ্ডস্থলের উপর ছুই একটি কেশ লইয়া ক্রৌড়া করিতেছে, নিশীথের চন্দ্রকর নীরবে সেই বিছোঠের পরিমল পান করিতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে দূর হইতে একটি বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুহুর্তের জন্ত জগৎ মোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হইল।

সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিনিশ্চিত্ত্বরে যেন একটি নাম উচ্চারিত হইল—“পুষ্প”!

নিস্তব্ধ রজনীতে এই মধুর শব্দ পুষ্পের কর্ণে আঘাত করিল, চকিতের ত্রায় পুষ্প ফিরিয়া দেখিলেন। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত নয়ন ফিরাইয়া পুষ্প চাহিয়া দেখিলেন, গ্রীবা ঈষৎ বক্র, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ ভিন্ন, যেন সেই শব্দটি পুনরায় প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—“পুষ্প”!

যে দিক হইতে শব্দ আসিতোছিল, পুষ্প সে দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটি নির্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চারণ বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিতেছে। পুষ্প চারণদিগের গীত বড় ভালবাসিতেন, ধীরে ধীরে চারণের নিকটে

আসিয়া একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত।

“রাজপুত কামিনীপণ, পুরাকালের একটি গীত শুন, সত্যপালনের একটি গীত শুন। সম্ভববর্ষা একটি বালিকা ও দশমবর্ষের একটি বালকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বালক-বালিকা পরস্পরকে বরণ করিল। বালিকা সত্য করিলেন, সেই বালক ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না। রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

বিপদ-মেঘরাশির ভ্রায় গগন আচ্ছন্ন করিল। সে বালক কোথায় গেল? বৃক্ষে হত হইল বা জলে মগ্ন হইল, কে বলিবে, বালক কোথায় যাইল? জগৎ সে বালককে বিস্মৃত হইল, বালিকাও কি তাহাকে বিস্মৃত হইলেন? রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

চন্দাওরংকুলের পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণিগ্রহণে অভিলାষী হইলেন, সে বীরের ঐশ্বর্য অতুল, পরাক্রম অসীম, বশে দেশ পরিপূরিত হইয়াছে। বালিকা কি সে ঐশ্বর্য দেখিয়া সত্যকথা ভুলিলেন? রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

চন্দাওরং লোভ প্রদর্শন করিলেন। বালিকা কহিলেন, “আমি রাঠোরকে সত্য দান করিয়াছি।” চন্দাওরং ভয়-প্রদর্শন করিলেন, বালিকা কহিলেন, “আমি রাঠোরকে ঠুসত্যদান করিয়াছি।” চন্দাওরং বল পূর্বক বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, বালিকা বলিলেন, “চন্দাওরং-বীর অপেক্ষা মৃত্যু বলবান্।” রাজপুত-বালিকা সত্যভঙ্গ করে না।

রাঠোর কোথায়? পূর্বতগন্ধারে বাস করিতেছে, তিকাল-ক অন্ন ভোজন

করিতেছে, মহারাণার বৃক্ষ বৃক্ষিতেছে। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হন, রাজপুতবীর অবশ্য জরী হইবেন। রাজপুতনারী যদি সত্যবতী হন, রাঠোর সত্য ভঙ্গ করিবেন না। রাজপুত-বালিকা কখনও সত্যভঙ্গ করে না।”

পুষ্প এই গীত শ্রবণ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বতকণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্ট লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সে গীতে যেন বালিকার ক্রন্দনবাহী বাজিয়া উঠিল, জনয়ের গৃহ ভাব-সমূহের উদ্বেগ হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

চারণদেব সেই লাবণ্যময়ীর দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন, পুনরায় ভূমির দিকে নরন ফিরাইয়া কহিলেন, “এ নিশ্চয় রজনীতে কি আমার অকিঞ্চিৎকর গীতে কুমারী পুষ্পকে বিরক্ত করিলাম? কানন-বাসী চারণের প্রোতা কেহ নাই, কুমারীও যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, আদেশ করিলে চারণ পুনরায় কাননে ফিরিয়া যাইয়া নিরুজ্জ্বল বসিয়া আপনার গীত গাইবে।”

আহা! সঙ্গীত হইতেও চারণের এই নম্র কথাগুলি মিষ্ট! বলিতে বলিতে চারণ ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার অবয়ব দেখিয়া পুষ্প আরও বিস্মৃত হইলেন। যৌবনের তেজঃপূর্ণ কান্তিতে সে উন্নত বপুঃ পূর্ণ রহিয়াছে, দীর্ঘ বাহতে বীণা লবিত রহিয়াছে, উন্নত ললাটে ও উজ্জল নয়নদ্বয়ে চম্ভকর পতিত হইয়াছে। তঁহাণি সেই ললাট ও নয়ন সেই পরিপ্রমে বা শোক ঈষৎ দান, ঈষৎ চিত্তাঙ্গীল। চারণ পুনরায় সেইরূপ ভূমির দিকে নরন ফিরাইয়া কহিলেন, “কুমারী আদেশ করিলে চারণ আপন

নির্জন কাননে প্রত্যািবর্জন করিবে! কুমারীর প্রবণের উপযুক্ত গীত সে কোথায় পাইবে?”

পুষ্প আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, অবগুষ্ঠনের ভিতর হইতে অক্ষুটস্বরে কহিলেন, “চারণদেব, এ গীত কোথায় শিখিলেন?”

পূর্ববৎ ধীরে ধীরে চারণদেব কহিলেন, “গহ্বরে ও কাননে কাহার বাস, গহ্বরে ও কাননে তাঁহার নিকট শিখিয়াছি।”

পুষ্প। গহ্বরে ও কাননে কাহার নিবাস?

চারণ। যিনি পৈতৃক ভূগ্ন হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

পুষ্প আর উদ্বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, এবার উচ্চতরস্বরে কহিলেন, “চারণদেব! একজন অভাগিনী রাজপুতবালার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন, সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?”

চারণ। হলদীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়া দৃষ্ট হইয়াছিল; পুনরায় স্নেহগণ আসিলে পুনরায় রাঠোর-খণ্ড দৃষ্ট হইবে।

সাক্ষনরনে পুষ্পকুমারী কহিলেন, “জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন!”

চারণদেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবি! যদি চারণের ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, সে রাঠোরকে কি কখনও আপনি দেখিয়াছেন? বাহাকে জগৎ বিন্ধিত হইয়াছে, বাহাকে বহু-বান্ধব বিন্ধিত হইয়াছে, যে ভীল বা ভূমিরাদিগের ভিকাহারী, নিবিড় কানন বা পর্বতকল্লরবাসী, এ জগতে কি একজনও তাহার চিন্তা করে?”

চারণের স্বর ক্লান্ত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি কষ্টে শেষে কহিলেন, “আমিও গহ্বরবাসী, সেই রাঠোরের সন্ততি

পুনরায় সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, কেবল এই জন্ত জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার নিকট কি কিছু বলিবার আছে?”

পুষ্প। কেবল একমাত্র বলিবার আছে, রাজপুতরমণী সত্যপালন করিতে জানে, রাজপুতবালা সত্যপালন করিবে।

চারণ। তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্বপরিচিতি?

এবার পুষ্প লজ্জিতা হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন, “সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।”

অনেকক্ষণ উভয়ে নিমগ্ন রহিলেন, অনেকক্ষণ পর চারণ পুনরায় কহিলেন, “দেবি! যে দিন আমাকে তেজসিংহ এই-গীত শিখাইয়াছিলেন, সেই দিন এই স্বর্ণ অঙ্গুরীয়টি আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ‘গীতোজিথিতা বীরনারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শন-স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে দিও।’ অতঃপর দেবীকে দেখিতে পাইলাম, যদি আদেশ করেন, যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, ঐ অঙ্গুরীতে অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দি।”

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেবনির্মিত তরুণ-বয়স্কার চারণের দিকে চাহিলেন, দ্রব্য ক্লান্ত হইয়া হস্ত প্রদারণ করিলেন। তাঁহার দেহ-লতা কাঁপিতেছিল—কি জ্ঞান?

চারণদেব ধীরে ধীরে সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনির্মিত কোমল হস্ত অনেকক্ষণ আপনার হস্তে ধারণ করিয়া রাখিলেন। পুষ্প নরন স্মৃতি করিয়াছিলেন, পুষ্পের বোধ হইল যেন, চারণের দীর্ঘনিবাস তাঁহার হস্তের উপর পড়িতেছে, যেন চারণের তপ্ত ওষ্ঠে সে একবার স্পর্শ করিল।

প্রকৃতই কি চারণদেব এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেন?—না, এ কেবল পুষ্পকুমারীর

কল্পনামাত্র? পুষ্প চাহিলেন, পুনরায় সেই দেবনিস্মিত বসু ও উবার মৃণমণ্ডল দেখিলেন, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল বিশাল নবন দেখিলেন, ঈষৎ তেঁট হারা হস্ত ছাড়াইরা লইলেন। মুহূর্ত্তের অন্ত পুষ্পের ললাট ও লম্বত বদনমণ্ডল রক্তোজ্জ্বলে রঞ্জিত হইল।

চিন্তাসংঘেয় করিয়া পুষ্প পূর্ববৎ অকম্পিত-ধরে কহিলেন, “চারণদেব! সে বীরপুরুষকে প্রতিদান করিতে পারি, এরূপ অলঙ্কার আমার নাই। কিন্তু যদি তাঁহার সহিত আপনায় সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনীর নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পটি তাঁহাকে দান করিবেন।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্যপুষ্প।

পাচোকঠাং গুরু দিবসেহ গচ্ছৎহ বালায়।
জাতাং মনো শিশিরবধিতাং পরিণীং বাহুভ্রুগাম্।
বেষদূতব্।

রজনী শেষপ্রায়, এরূপ সময়ে তেজসিংহ সূর্য্যামল-পর্যন্ত হইতে অবতরণ করিয়া, চারপের বেশভ্যাগ করিয়া, ভীমচাঁদের পালের নিকট হইতে সেই পূর্ব্বদ্রুদে প্রাতঃ-স্নান করিতে গমন করিলেন। নিকটে আসিয়াছেন, এরূপ সময়ে হৃদভট হইতে ভীল ভাষায় একটি গীত শুনিতে পাইলেন। এই নিমিত্ত রজনীতে কে গীত গাইতেছে? উৎসুক হইয়া তিনি হৃদপার্শ্বস্থ একটি কোপের ভিতর বাইলেন,—দেখিলেন, একটি জুড় প্রস্তররাশির উপর সেই চন্দ্রালোকে একটি বালিকা বস্ত্র-ফুল চয়ন করিতেছে ও যথো

যথো গীত গাইতেছে। বিস্মিত হইয়া তিনি লেন, সে ভীমচাঁদের কন্যা।

তেজসিংহ কণেক বাড়াইয়া থাকিয়া ডাকিলেন, “বালিকা!”

বালিকা তাঁহার নিকে দেখিয়া হস্ত করিয়া বলিল, “আমি তোমার জন্ত বনের ফুল তুলিতেছি।”

তেজসিংহ। এ কি বালিকা! এ রাজ্যে একাকী এ স্থানে ফুল তুলিতেছিস কেন? আমার সঙ্গে ঘরে আর।

বালিকা। এই তুমি ‘পুষ্প’ ভালবাস, তোমার জন্ত পুষ্প তুলিতেছি।

বালিকা হাসিয়া উঠিল। তেজসিংহ অকুটি করিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন ন।

বালিকা পুনরায় হস্ত করিয়া কহিল, “আমার এ মালা লইবে না?”

তেজসিংহ। লইব বৈ কি, দে না।

বালিকা। আমি পরাইয়া দিব।

তেজসিংহ। দে, পরে বাড়ী আর।

বালিকা। ও কি, তোমার বুকে কি?

তেজসিংহ। একটি ফুল।

বালিকা। ফেলিয়া দাও।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। ও বে বাগানের ফুল।

তেজসিংহ। তা হ’লই বা, আমি কেলিব না।

বালিকা। তবে আমি এ মালা পরাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। মালা পরাইলে ‘পুষ্প’ রাগ করিবে।

চকিতভাবে তেজসিংহ বিজ্ঞাসা করিলেন, “কি?”

বালিকা। বাগানের ফুল বড় লোক, বনের ফুল ছোট লোক, বস্ত্র-ফুলের মালা

গলায় বেধিলে তোমার ঐ বাগানের ফুলটি
রাগ করিবে।

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না; জিজ্ঞাসা
করিলেন, “ফুল কি আবার রাগ করে?”

বালিকা। করে না? তবে তুমি ফুল
ফেলিয়া দিতে ভয় করিতেছ কেন?

তেজসিংহ নিস্তব্ধ হইলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “এত
রাজে একাকী কোথায় গিরেছিলে?”

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। পথে ভয় আছে।

তেজসিংহ। কিসের ভয়?

বালিকা। চোরের।

তেজসিংহ। কৈ, আমি তাহা জানি না।

বালিকা। তোমার কিছু চুরি করে নাই?

তেজসিংহ। না।

বালিকা তেজসিংহের আপাদমস্তক
দেখিয়া বলিল, “তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টি
তবে কোথায় গেল?”

এবার তেজসিংহ বথার্থই বিস্মিত হইলেন।
“এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত
দেখিয়াছে? বালিকা কি সন্দেশে লুকাইয়া
গিয়াছিল? অঙ্গুরীয়-দান কি লুকাইয়া দেখি-
য়াছে? না, তাহাও সম্ভব নহে, এইমাত্র
ত সে একটি প্রস্তররাশির উপর বসিয়া ফুল
ভুলিতেছিল।”

তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা
খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, “কেমন,
একটি জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?”

তেজসিংহ। না, চুরি হয় নাই, কোথাও
রাখিয়া আসিয়া থাকিব।

বালিকা। আমি খুঁজিয়া দেখিব?

তেজসিংহ। দেখি।

বালিকা। যদি পাই, তবে আবার?

তেজসিংহ। হাঁ।

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া
উঠিল; শেষে বলিল, “আমার এ মালা
লইবে না?”

তেজসিংহ। না, লইব না, তুমি বাড়ী
আয়।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন?

বালিকা। এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে
ইচ্ছা হইতেছে।

হৃদে আন সমাপন করিয়া তেজসিংহ
চলিয়া গেলেন, পশ্চাতে সেই বালিকাকর্তৃ-
নিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিলেন। এবার সে
ধ্বনি পরিষ্কার ও সপ্তস্বরমিলিত, বোধ হইল
যেন, সেই অনন্ত পরমতরানিকে আকুল
করিয়া সে খেদনিঃসৃত গীত ধীরে ধীরে নৈশ
গগনে উথিত হইতে লাগিল। ভীলবালার
হৃদয়ের এই সরল গীতটি কিরূপে আমরা বঙ্গ-
ভাষায় অনুবাদ করিব?

গীত।

বস্ত্র-ফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায়।

ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমিতে লুটায়!
উদ্ভানে শৃঙ্খল ফুল, দেখে ধায় অলিফুল,
গন্ধপুস্ত ফুল বস্ত্র ভূমিতে লুটায়!

গন্ধ-পুষ্প মনোমোহা, হৃদয়নয়নশোভা,
কিবা গন্ধ, কিবা আভা হৃদে স্থান পায়!
নীরবেতে বার বার, বস্ত্রফুল চাহে সার,
জীবন বিহনে তার, জীবন শুকার!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে আলোকচ্ছটা।

ন পৃথগ্ জনবৎ ভূমৌ বশং
বসীদাত্তম গন্তবঃস।
ক্রমসাত্তমত্যাং কিনন্তরং
যদি যারৌ বিত্তরেনপি ভেৎচলা।

মধুবংশঃ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জীবনমাসের প্রারম্ভে হলদীঘাটার যুদ্ধে চতুর্দশ সহস্র রাজপুত স্বদেশের জন্য জীবন দান করিল। সে বৎসর বর্ষার কারণ মোগলেরা কিছু করিতে পারিল না, অগত্যা মেওয়ার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রতাপসিংহ কয়েক মাসের অস্ত্র বিশ্রাম পাইলেন।

মাঘমাসে শত্রুগণ পুনরায় সসৈন্তে দেখা দিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপও পুনরায় যুদ্ধদান করিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক মোগলের সহিত যুদ্ধ বুঝা চেষ্টা, পুনরায় পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগল-সেনানী শাহাবাজ খাঁ কমলমীর-দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। প্রতাপ উদয়-সিংহের প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া এই স্থলেই রাজধানী করিয়াছিলেন। মেওয়ার হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে মাড়োয়ারে ঘাইবার অস্ত্র যে পর্বত-উপত্যকা ছিল, সেই উপত্যকার উপরই এ পর্বতদুর্গ নির্মিত। দুই পার্শ্বে উন্নত পর্বতরাশি মধ্যে পর্বততরঙ্গ ও প্রান্তররাশির উপর দিয়া অতি সংকীর্ণ পথ ছিল। এক্ষণে মাড়োয়ারও শত্রুদলস্থ, সেই দিক হইতেই শত্রুগণ আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং সে ঘর রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতাপসিংহ কমলমীরে রাজধানী করিয়াছিলেন। যত দিন সাধ্য, তত দিন এই পর্বত-

দুর্গ রক্ষা করিলেন, অবশেষে পানীর জল মন্দ হইল, সেনার পীড়া হইতে লাগিল, প্রতাপসিংহ অগত্যা সে দুর্গ মাড়ুলহস্তে অর্পণ করিয়া অস্ত্র দুর্গ রক্ষা করিতে বাইলেন। প্রতাপসিংহের মাড়ুল বিজলীর প্রথমকুলাধিপতি, যুদ্ধপ্রারম্ভে মহারাণার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন, গৌরব-রক্ষার্থ প্রথমকুল সানন্দে জীবনদান করিলেন। কমলমীর শত্রু-হস্তে পতিত হইল।

কমলমীর হইতে আসিয়া প্রতাপসিংহ মেওয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিমের চাওয়ন্দ-প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এ প্রদেশ অতিশয় পর্বতময়, অতিশয় ছুরাক্রম্য, এক স্থানে কেবল পার্শ্বীয় ভীলগণ বাস করিত। এ বিপদের সময় ভীল রাজপুতদিগের পরম হিতকারী, প্রতাপ চাওয়ন্দদুর্গে ভীল ও রাজপুত সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শত্রুগণও নিরস্ত রহিল না। কমলমীর হস্তগত করিবার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিংহ ধর্ম্মেতা ও গুণ্ডন দুর্গ বেষ্টন করিলেন, মহাবৎ খাঁ উদয়পুর হস্তগত করিলেন, করিদ খাঁ প্রতাপের চাওয়ন্দ-দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপ চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রতাপসিংহ সাহস ও অধ্যবসায় হারাছিলেন না, যত দিন মেওয়ারদেশে একটি পর্বতদুর্গ বা উপত্যকা স্বাধীন থাকিবে, তত দিন সেই নির্ভীক বোদ্ধা পর্বতকন্দরে ভীলদিগের মধ্যে বাস করিয়া শিশৌদীরের নাম রাখিবেন, স্থির করিলেন। পর্বতে পর্বতে রাজপুতসেনা লুকায়িত থাকিত; উপত্যকা ও কন্দরে প্রতাপসিংহের অস্থচরণ প্রতাপসিংহের আদেশ

লইয়া বাইত। নিশীথে পৰ্বত চূড়ায় দীপা-
লোকে দেখিলে প্রতাপের সেনাগণ তাহার
অৰ্ঘ্য বৃত্তি। এইরূপ ইজিতে প্রতাপ নিজ
সৈন্য জড় করিতেন ও শত্রুদিগকে অজ্ঞাতে
সহসা আক্রমণ করিতেন। প্রতাপ দূরে
গলাইয়াছে বা লুকাইয়া আছে ভাবিয়া শত্রু-
গণ যখন নিশ্চিন্ত থাকিত, সহসা প্রতাপ
সম্মুখে দেখা দিতেন, শত্রুসেনা বিনাশ
করিতেন। চিতোর গিয়াছে, উদয়পুর
গিয়াছে, কমলমীর গিয়াছে, পৰ্বতভূগ
একে একে শত্রুহস্তগত হইতেছে, উপত্য-
কায় শত্রুসেনা রাশীকৃত হইতেছে, মান-
সিংহ, শাহবাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ, মহবৎ খাঁ
চারিদিক্ হইতে অসংখ্য সেনা লইয়া
আসিতেছে, কিন্তু মেওয়ারের যোদ্ধা স্থির-
প্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত। প্রতাপসিংহ শিশো-
দীর নাম রাখিবেন, দেশের স্বাধীনতা
রক্ষা করিবেন।

ফরিদ খাঁ সম্মুখে চাওরদুর্গ হস্তগত
করিতে আসিতেছিলেন। উন্নত পৰ্বত-
সম্মুখ প্রদেশ জয় করিয়া মুসলমান মহা
উল্লাসে প্রতাপকে বন্দী করিতে আসিতে-
ছিলেন, সহসা প্রতাপের আদেশ গোপনে
সেই পৰ্বতের চারিদিকে নীত হইল,
ইজিতে প্রতাপের সেনাগণ প্রতাপের
উদ্দেশ্য বুঝিল। অবিলম্বে ফরিদ খাঁ চারি-
দিকে অবিশ্রান্ত রাজপুতসৈন্য দেখিলেন,
সেই গভীর পৰ্বত-গুহা হইতে ফরিদ খাঁ বা
তাঁহার একজন সৈন্য আর স্বদেশপ্রত্যা-
বৰ্ত্তন করিলেন না।

চারিদিকে মেঘমালায় স্তায় বিপদ বত
রাশীকৃত হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ গগন বত
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, অৰ্ঘ,
সৈন্যসংখ্যা, দুর্গসংখ্যা বত হ্রাস পাইতে
লাগিল, নির্ভীক প্রতাপের সাহস ও অধ্য-

বসায় ততই দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল। সেই পৰ্বতসম্মুখ প্রদেশ তিনি
জগতের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধহস্তে রক্ষা
করিবেন, সেই পৰ্বতের প্রত্যেক শিলা-
খণ্ডে বীরস্বের নাম অঙ্কিত করিবেন।

ভবিষ্যৎগগন আরও মেঘাচ্ছন্ন হইতে
লাগিল, আরও অন্ধকারময় হইতে লাগিল।
সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপের সাহস
ও দৃঢ় অধ্যবসায় বিদ্যুৎস্রোতের স্তায়
উজ্জলতর চমকিত হইতে লাগিল। দিল্লীর
দার পর্য্যন্ত সে আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হইল,
জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে আলোক চম-
কিত হইল।

পুনরায় বর্ষা আসিল, মানসিংহ ও
মোগলগণ ব্যর্থহস্ত হইয়া সে বৎসরও মেও-
রার ত্যাগ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

অস্থায়ী জগতে স্থায়িত্ব।

শাস্ত্রের রত্ন যদযশস্বত্বং ন ততঃ শাস্ত্রভূতায় কিংবাতি।
রঘুবংশম্।

আবার বসন্তকাল আসিল। বসন্ত-
কালের সঙ্গে সঙ্গে পদপালের স্তায় শত্রু-
সৈন্য আসিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশো-
দীর নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদে-
শের স্বাধীনতা রাখিবেন।

পুনরায় পৰ্বত ও উপত্যকা শত্রুগণ
আচ্ছাদিত করিল, পুনরায় পৰ্বতভূগ একে
একে হস্তগত করিতে লাগিল, পুনরায় পৰ্বত-
কন্দর ও নির্জন গুহা হইতে অল্পসংখ্যক
নির্ভীক রাজপুতদিগকে তড়িত করিতে
লাগিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ শিশোদীর
নাম রাখিবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষা

করিবেন। সে বৎসর অতীত হইল, নূতন বৎসর আসিল, নূতন বৎসর অতিবাহিত হইল, পুনরায় আর এক বৎসর আসিল, অনন্ত যুদ্ধের অন্ত হইল না। মেওয়ার-বিজয় হইল না।

দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল, বৎসরে বৎসরে অধিকতর সৈন্য মেওয়ার আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সেনানী সুশিক্ষিত সৈন্যতরঙ্গের সহিত মেওয়ারের উপর প্রধাবিত হইল। নির্ভীক প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার-বিজয় হইল না।

প্রতাপ সিংহ অনেক সময়ে পর্বতকন্দরে ও নির্জন গহ্বরে বাস করিতেন, মেওয়ারের মহারাজা ও রাজপুত্র গহ্বরে হইতে গহ্বরান্তরে বাস করিতেন, শত্রুর আগমনে অনাহারে পর্বত হইতে পর্বতান্তরে পলায়ন করিতেন, কখন বজ্র ভীলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কখন বজ্র পত্তর গহ্বরে লুকাইতেন। রাজপরিবার তাপসের ক্লেশ তুচ্ছ করিতেন; শীতে গ্রীষ্মে, ঘোর বর্ষায় পর্বত ভিন্ন অস্ত্র আশ্রয় পাইতেন না। কখন কখন ক্ষেত্রের চূর্কা ভিন্ন অস্ত্র খাদ্য পাইতেন না। এ কষ্ট সহ করিয়া প্রতাপ রণে ভঙ্গ দিলেন না, মেওয়ার-বিজয় হইল না।

প্রতাপসিংহের এ বীরত্বকথা দিল্লীতে প্রচলিত হইল, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলে জয় জয় করিতে লাগিলেন, বাহারা প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারাও শত্রুর বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই।

মহাহতব আকবর এই ক্ষত্রিয়ের বীরত্বকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, সম্রাটের পারিষদবর্গ চমৎকৃত হইলেন। দিল্লীর

মণিমাণিকা-বিভূষিত উন্নত সিংহাসনে দরজ গহ্বরবাসী প্রতাপসিংহের সাধুবাদ হইতে লাগিল, সমগ্র ভারতবর্ষে জয় জয় শব্দ হইল।

প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহা-ভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সমুদ্রবীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই, সমুদ্রকোটি লোকের অধীশ্বর আকবর-শাহের সহিত যুদ্ধিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়া ছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন-দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই।

প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপভাস অপেক্ষা বিন্ময়কর, কিন্তু উপভাস নহে। বিশ্বাস না হয়, নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ কর। উহা আমাদের অসার লেখনী-নিঃসৃত নহে, প্রতাপসিংহের পরম শত্রু আকবরশাহের রাজসভার প্রধান সভাসদ খানখানান্দেই দরজ হিন্দুদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া উহা লিখিয়াছেন।

খানখানানের কবিতা।

“জগতে সমস্তই কণস্থায়ী,

“ভূমি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে,

“কেবল মহৎ নামের গৌরব নষ্ট হয় না।

“প্রতাপ ভূমি-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছেন,

“প্রতাপ মৃত্যু ভয় করেন নাই,

“ভারতবর্ষের রাজাদিগের মধ্যে তিনিই একাকী স্বজাতির নাম রাখিয়াছেন।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

অপরিচিতা ।

কা বিদ্যবত্তনবতী !

অভিজ্ঞানশত্ৰুজয় !

দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল । মেওয়ারের আকাশ যেষ্ট্রার আরও আবৃত হইতে লাগিল । শত্রুগণ পক্ষপালের জায় নগর, গ্রাম ও পর্বত-উপত্যকা আচ্ছাদিত করিল, সমুদ্র দুর্গ একে একে হস্তগত করিল । কিন্তু কন্দরবাসী প্রতাপসিংহ রণে ডুর্ভ দিলেন না, মেওয়ার-বিজয় হইল না ।

একদা সমস্ত দিন সংগ্রাম হইল । অসংখ্য যোগলসৈন্ত প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়াছে, প্রতাপসিংহ এখন আনার-বেষ্টিত সিংহের জায় যুদ্ধ দান করিতেছেন, কখন বা পর্বত হইতে পর্বতান্তরে সরিয়া বাইতেছেন, পুনরায় নির্মল আকাশ হইতে বজ্রের জায় সহসা অজ্ঞপিত হইতে শত্রুকে আক্রমণ করিতেছেন । সমস্ত দিবস এইরূপ যুদ্ধ হইল; রজনীর আগমনেও সে বিষম যুদ্ধ ক্রান্ত হইল না ।

রজনী বিশ্রামের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটি কাঠাখার লইয়া পর্বতে আরোহণ করিতেছিল । রজনীর অন্ধকারে মনুষ্য মনুষ্যকে দেখিতে পায় না, সেই দুর্ভেদ অন্ধকারে ভীমচাঁদের ভীলগণ ঝোপের ভিতর দিয়া সেই আধার ভীম-চাঁদের পালে আনিতেছিল । আকাশে তারা নাই, অগতে আলোক নাই, ভীল ভিন্ন আর কেহ সে অন্ধকার রজনীতে সে অকলাচ্ছাদিত পর্বত-

পথ দিয়া আলিতে পারিত না । ভীলদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে না, নিঃশব্দে সেই আধার পালের ভিতর প্রবেশ করিল । সেই পালের ভিতর একটি পর্বত-গহ্বর ছিল, পাঠক তাহা পূর্বেই দর্শন করিয়াছেন । আধার সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল, ভীলগণ তথায় আধার রাখিয়া অদৃশ্য হইল ।

সেই অন্ধকারময় নিম্নে সেই ভীল-বাহিত আধারে পাঠকের পূর্বপরিচিতা পুণ্ড্রমারী গহ্বরে আনীতা হইলেন । এ অনন্ত যুদ্ধে সূর্য্যমহলে রাণীদিগেরও স্থান নাই, সুতরাং দুর্জয়সিংহের পরিবার পূর্বেই অস্ত্র দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন । অস্ত্র কোন অপরিচিত বোদ্ধার আদেশে পুণ্ড্র সূর্য্যমহল হইতে এই গহ্বরে আনীতা হইলেন ।

গহ্বরের ভিতরে একটি দীপ জলিতে-ছিল । সেই দীপালোকে পুণ্ড্র বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তথায় আর একজন গরী-রসী রাজপুত্রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন । রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটি হারকণ্ঠ জলিতেছে, নয়ন হইতে নির্মল উজ্জল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটি মুক্তাহার লব্ধি রহিয়াছে । উন্নত অবয়ব ও জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখিলে রমণীকে উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি পরিভ্রম বা ক্লেশ বা চিন্তায় সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাযেষ্টিত, সে সূন্দর ললাট আজি জীবৎ রেখায় অঙ্কিত । গরীরসী বামার বয়স্ক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে, তিনি পাঠকের অপরিচিতা, কিন্তু মেওয়ারে তিনি অপরিচিতা ছিলেন না ।

সূর্য্যমহল ত্যাগ করিয়া অবধি পুণ্ড্র অস্ত্র নারীর মুখ দেখেন নাই, অস্ত্র নারীর সহিত কথাবার্তা করেন নাই । ভীলদিগের আধারে

আসিয়া পুষ্প চকিত হইয়াছিলেন, ভীল-দিগের গহ্বরে আসিয়া ভীত হইয়াছিলেন। ক্রমে সেই গহ্বরে ত্রিমিত দীপালোকে যখন আর একজন রাজপুত্ররমণীকে দেখিতে পাইলেন, যখন তাঁহার উজ্জল রূপলাবণ্য এবং মুখের কমলীয়তা ও যুগ্মতা দেখিতে পাইলেন, তখন পুষ্পের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পুষ্প বীরের বীরে অপরিচিতা রমণীর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ দুইটি ধরিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, “দেবি! আমি কোথায় আসিয়াছি, জানি না, কাটাকে আমার সম্মুখে দেখিতেছি, জানি না। বোধ হয়, আপনি কোন উন্নতবংশীর রমণী হইবেন। বোধ হয়, এই যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া এই গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন। বোধ হয়, আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকেও এই নিরাপদ স্থানে আনাইয়াছেন। আপনি বিনিই হউন, আমি আপনায় শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে আশ্রয় দান করুন; পুষ্প-কুমারী আশ্রয়হীনা ও অভাগিনী।”

পুষ্পকুমারীর করুণম্বর ও নয়নজল দেখিয়া অপরিচিতা রমণী বাৎস্যল্যের সহিত তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনেক আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “মা পুষ্প, অত্ন তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। এ গহ্বরে ভীলদিগের, ভীলগণ বিপদের সময় আমাদের আশ্রয়দান করিয়াছে। একজন রাজপুত্র যোদ্ধাও এই স্থানে বাস করেন, তিনিও আমাদের গহ্বরে রক্ষার বস্ত্রবান্ হইয়াছেন। তিনিই আমাকে শত্রু-হস্ত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য কয়েক দিন হইল, এই স্থানে আনিয়াছেন, তিনিই তোমাকেও নিরাপদে রাখিবার জন্য অত্ন এই স্থানে আনাইয়াছেন। যদি ইচ্ছা কর, তুমি আমারই নিকটে থাকিও, আমার

পুত্র-কন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।”

এ বাৎস্যল্যপূর্ণ স্নেহের কথাগুলি কাহার? পুষ্প অনেক দিন হইতে এরূপ স্নেহের কথা শুনে নাই, বহুদিন পর স্নেহ-বাক্য শুনিয়া পুষ্পের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; নিঃশব্দে দরবিগলিত-ধারায় পুষ্প রোদন করিতে লাগিল, দরবিগলিত-ধারায় অপরিচিতার পদযুগল সিক্ত করিয়া তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করিল।

অপরিচিতা অধিকতর অমুকম্পার সহিত পুষ্পকে আশ্বাস দান করিলেন ও কহিলেন, “শান্ত হও, আমার স্বামী যেওয়ারের অপরিচিত নহেন, এই ভীষণ যুদ্ধের অন্তে বোধ হয়, তিনি তোমাকে সহায়তা করিতে পারি বেন।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্বিংশ-বাহী।

ধৃত্য ধারিত্রী তব বিক্রমণ
জ্যাগ্ৰাংস্ত বীর্ধ্যাত্মবৈকিণিকঃ।
অতঃ প্রকর্ষায় বিধির্কোষেরঃ
প্রকর্ষতত্র। হি রণে অরশীঃ ॥

কিরাতাজ্জীবিনঃ ॥

অপরিচিতা রমণী পুষ্পের সহিত কথা কহিতেছেন, এরূপ সময় নানারা মগরোর বৃদ্ধা চারণী দেবী সহসা সেই ভীল-গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

চারণী দেবী অগ্রসর হইয়া আপন বীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন, “দেবি! অত্ন জানিলাম, এই অন্ধকারময় ভীমচাঁদের গহ্বরে পবিত্র ও আলোক-পূর্ণ,

সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম। অবগুষ্ঠন াগ করুন, মহারাজি! চারলী নিকট অবগুষ্ঠন অনাবশ্যক।”

তখন মহারাজী প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুষ্ঠন ত্যাগ করিলেন, গরীয়সী বামার উজ্জ্বল মুখকান্তিতে সে পর্বতগহ্বর আলোকপূর্ণ হইল। সেই উন্নত ললাটে একটি হীরকখণ্ড বক্‌মক্‌ করিতেছে, সেই উন্নত বক্ষঃস্থলে এক ছড়া মুক্তাহার দোহুলায়মান রহিয়াছে। প্রতাপসিংহের মহারাজী তখন চারলীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, শুদ্ধ হইয়া পুন্স সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

রাজী। চারলী মাতা, আজি তোমাকে দেখিয়া নিকঙ্কণ হইলাম, বিপদের দিনে ভূমি চিরকালই আমাদের সহায়। বিপদ ও সম্বট মহারাণার অপরিচিত নহে, আমার নিকটও অবদিত নহে, তথাপি এরূপ ঘোর বিপদ্রাশি পূর্বেও কখন বোধ হয়, মেওয়ার-প্রদেশে দেখা দেয় নাই। বহুদিন হইতে মহারাণার সাক্ষাৎলাভ করি নাই, অনন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবারও অবকাশ পান নাই। পুত্র-কন্তা লইয়া আমি ভূর্গ হইতে ভূর্গান্তরে আশ্রয় লইয়াছি। অবশেষে কয়েক দিন হইতে এই ভীলদিগের গহ্বরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। এখানেও আমরা নিরাপদ নহি, ভূর্কীগণ বোধ হয়, আমাদের কোন সম্ভান পাইয়া এই দিকে আসিতেছে। ঐ দূর-উপত্যকার অজ মহারাণার সহিত ভূর্কীদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে, সে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, ভূর্কীদিগের যুদ্ধনাম এখনও শুনা যাইতেছে। আমার কন্য চিন্তাকুল হইয়াছে, চারলী মাতা, মহারাণার কুশল-সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর কর।

চারলী। মহারাজি! শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। স্বয়ং দেশানী আপনায় স্বায়ীক রক্ষা করিতেছেন, তিনি কুশলে আছেন।

রাজী। মাতা, তোমার কথায় আমি আশু হইলাম, তোমার মুখে পুন্স-চন্দন পড়ুক। মেওয়ারের মহারাজী নিজের বিপদে ডরে না, সে বিপদ তুচ্ছ করিয়া, শত্রু-গণকে উপহাস করিয়া, শিশোনীর-বর্ষাহুসারে জীবনত্যাগ করিয়া আপন মানরক্ষা করিতে জানেন কিন্তু রাজা ও রাজ-শিশুগণের ক্ষতই আমার চিন্তা। মেওয়ার-প্রদেশে রাজ-শিশুগণের মৃত্যু রাধিবার স্থান নাই, মেওয়ারের রাজশিশুগণ কি তুকাহন্তে পতিত হইবে? মেওয়ারের ইতিহাস কি অজ্ঞই শেষ হইল?

শিশুদিগের বিপদ স্বরণে সেই বীর-হৃদয় একবারে দ্রবীভূত হইল, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয় একেবারে জলে পূর্ণ হইল। পুন্স নিজের দুঃখ ও বিপদ ভুলিয়া গেলেন, সেই দেবীতুল্যা মহারাজীর দিকে তিনি ভক্তিতাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, মহারাজীর নয়নে জল দেখিয়া পুন্সের নয়নও শুক ছিল না।

চারলী। শিশোনীরকূলে ষত দিন বীরত্ব আছে, মেওয়ারের ইতিহাস তত দিন লুপ্ত হইবে না। মহারাজি, শান্ত হউন, রাজশিশুদিগের এখনও নিরাপদ স্থান আছে। ভীলগণ শিশোনীরের চিরবিধ্বাসী, মহারাণা উদরসিংহকে এই ভীল-সর্দার ভীমচাঁদের পিতা এই গহ্বরে স্থান দিয়া ছিল, মহারাণা প্রতাপসিংহের পরিবারকে ভীমচাঁদ স্থান দিবে। মহারাজি! শান্ত হউন, এই গহ্বরের অনতিদূরে জাউরার ঘনি আছে, জাউরার ঘনির ভিতর স্বয়ং-

রাখি প্রবেশ করে না, আহবের শব্দ প্রবেশ করে না, মহারাজার পরিবার ভবান্ন নিরাপদে থাকিবেন। এ কাল-সময় সীতাই অবসান হইবে।

রাজী। চারপা, তোমার বচনে আমি আশঙ্ক হইলাম। যুদ্ধে, বিপদে রাজপুত্রের জ্বর বিচলিত হয় না, কিন্তু বৎসবিগের কথা শ্রবণ করিয়া একবার নারীর মন ব্যাকুল হইয়াছিল। যদি শিশুগণ নিরাপদে থাকে, তবে এ যুদ্ধ যুগান্তরব্যাপী হউক, যেওয়ারের মহারাণা তাহাতে কাতর নহেন, যেওয়ারের রাজমহিষী তাহাতে কাতর নহে। এই ভীল-গহ্বর আমার প্রাসাদ-স্বরূপ হইবে।

চারপা। এ স্থানে রাজপরিবার কোন রূপ পাইবেন না, কেন না, এ গহ্বর এক্ষণে একজন প্রধান রাজপুত্র বোদ্ধার আশ্রয়-স্থান।

মহারাজী। তাহাও শুনিয়াছি। সেই রাঠোর-বোদ্ধাই আমাদিগকে ভীমগড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিরাপদে রাখিবার জন্ত এই ভীলদিগের গহ্বরে আনাইরাছেন। বোদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে, কি জন্ত সেই বীরাগ্রগণ্য আশৈশব লোকালয় ত্যাগ করিয়া ভীল-দিগের সঙ্গে এই গহ্বরে বাস করিতেছেন, কি মহাব্রত-সাধনার পূর্বত ও অরণ্যবাসী হইরাছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমাদের এই সঙ্কট ও বিপদের মধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাই নাই, পরিচয় দান করিতেও তিনি বড় ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু এই বিপদ্রাশি হইতে যদি উত্তীর্ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগের দুর্ভিক্ষ-নের বন্ধুকে আমি বিশ্বস্ত হইব না, মহারাণাও বিশ্বস্ত হইবেন না।

উদ্বেগে পুষ্পের শরীর রোমাঙ্কিত হইল, তাঁহার নিখাস প্রায় রুদ্ধ হইল। মহারাজী কি সেই রাঠোর-বোদ্ধার কথা কহিতেছেন? সেই রাঠোর-বোদ্ধা পিতৃহর্গ-চ্যুত হইয়া অবধি কি এই ভীষণ গহ্বরে বাস করিতেছেন?

চারপা। দেবি! সে বোদ্ধার দীর্ঘ ইতিহাস অল্প একদিন কহিব, অল্প কমা করুন। অল্প কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে, ভীলপালিত তেজসিংহ অপেক্ষা দুর্ভিক্ষনীয় বোদ্ধা এবং বিশ্বাসী অন্তরে মহারাণার আর কেহ নাই। তেজসিংহের হস্তে বত দিন খড়গ আছে, তেজসিংহের ধমনীতে বত দিন শোণিত আছে, আপনাদিগের তত দিন বিপদ নাই।

পুষ্পের শরীর কণ্টকিত হইল, জ্বর আনন্দে ও উরাসে নৃত্য করিয়া উঠিল।

রাজী। আকাশের দেবগণ তেজসিংহের সহায়তা করুন। দেবি! আমি তাঁহার স্বামীভক্তির কি পুরস্কার দিতে পারি?

পুষ্পের জ্বর পুনরায় উদ্বেগ হইল, তিনি বাস রুদ্ধ করিয়া চারপার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারপা। মহারাজী! সেই তেজসিংহের নিরাজ্রয়া বাগদত্তা পত্নী আপনার চরণ-তলে। বালিকা পুষ্পহুমারীকে আশ্রয়দান করুন, পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বাসিনী সহচরী আপনি পাইবেন না। পুষ্প! অবগুষ্ঠন ত্যাগ কর, চারপার নিকট সন্ধ্যাপনচেষ্টা বৃথা। যিনি শিশোদীর-জাতির একমাত্র পূজ্য, যিনি যেওয়ার-প্রদেশের আশ্রয়ভূতা, অত্ন সেই মহারাজীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিশ্বর ও লজ্জা, আনন্দ ও উৎকর্ষ, বিহ্বলা হইয়া পুষ্পহুমারী সাক্ষররনে মহা

রাজার চরণ ধরিতা ভূমিতে স্থিতি হইলেন, তাঁহার বাক্যকৃষ্টি হইল না। মহারাজী অনেক আশ্বাসবাণী দিয়া পুষ্পকে উঠাইলেন, অবশেষে বলিলেন, “পুষ্প, তোমাকে পূর্বেই আমি বাক্যান্বিত করিয়াছি, তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার মাতা; আমার অন্ত সন্তান যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে। মেওয়ারের রাজী অত ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্বাস দিতে পারে না।”

অত্যন্ত অনেক কথার পর মহারাজী চারণী দেবীকে পুনরায় যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চারণীদেবী উত্তর করিলেন, “মহারাজি, চিন্তা করিবেন না, মেওয়ারের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের জয় অনিবার্য্য।”

রাজী। কিরূপে সে বিজয়সাধন হইবে, তাহা কি জানিতে পারি?

চারণী। রাজার বল—অস্ত্রে ও মন্ত্রণায়। অস্ত্রে বাহা সাধ্য, মহারাণা তাহা করিয়াছেন, এক্ষণে মন্ত্রী ভামাশাহ সহায়তা করুন। ভামাশাহের স্বাধীপদে মেওয়ারের বিজয়।

রাজী। দেবি! তোমার বাক্য আমার চিন্তিত-দ্রব্বে শান্তি দান করিল, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

চারণী। মহারাজী বাহা আদেশ করিবেন, চারণী তাহা সানন্দে পালন করিবে।

রাজী। চারণী দেবি! তোমাদিগের মুখে শুনিতে পাই, দিল্লীর সিংহাসন ও সমস্ত হিন্দুস্থান পূর্বে রাজপুতদিগের ছিল। রাণা পৃথীরার না কি পূর্বে দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, ৫০ বৎসর হইল, রাণা সংগ্রামসিংহ না কি দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধা-

ছিলেন। পুনরায় কি আমরা কখনও দিল্লী অধিকার করিব? হিন্দুস্থানের দূর-ভবি-
ষ্যতে কি আছে? তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীর বিজয়?

চারণী দেবী অনেককণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, ত্র হৃকিত হইল, দৃষ্টিহীন হিরনয়ন অনেককণ উদ্-
মিকে চাহিয়া রহিল; পরে পতীরবরে কহিলেন, “মহারাজি! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্লীণ, ভবিষ্যৎ আকাশে আমি বহুদূর দেখিতে পাই না। অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার। রাজপুত বহাদুর তুর্কীর সহিত যুদ্ধিতেছে; তৎপরে রাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুদ্ধিতেছে; তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে যেত তরঙ্গের উপর যেত তরঙ্গ আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ প্রাণিত করিতেছে। বৃদ্ধার নয়ন ক্লীণ। সে আর কিছু দেখিতে পায় না।”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমহল-ধ্বংস।

বাহাধুরঃ সমস্তবৎ তত্র তত্র সহস্রশঃ।

অত্যন্তাঃ চিন্ম্যতাং শত্রুহানিতো লোহিতে সতি ॥

বহাতারতম্।

কি ভয় ও কি অবস্থার রাজ-পরিবার ভীল-গল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক।

যোগলগিগের সহিত যুদ্ধেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও গর্জতগুহার বাস করিতেন। মেওয়ারের মহারাজী স্বাধীর ভার স্বদেশপ্রিয়া ছিলেন, রেশ-বাতরা তুচ্ছ করিয়া প্রকৃতির উপর

রজনীর পরে গমন করিতেন, বহুতে রজনীদি
করিয়া শিতকে খাওয়াইতেন, বিপদের
সময়ে পরিত হইতে অস্ত্র পরিত, কন্দর
হইতে অস্ত্র কন্দরে পলাইতেন, তথাপি
সন্ধিপ্রার্থনার জন্য দ্বারীকে অহরোহ করি-
তেন না। হিতৈষী কন্দর আবাসস্থানে
বহাওয়াজী আশ্রয়গ্রহণ করিতেন, শীত-
কালে পাহাড়ের উপর অগ্নি জালিয়া
সন্ধানদিগের শীতনিবারণ করিতেন, বর্ষা-
কালে কখন কখন পরিতকন্দর ভাসিয়া
ধাইলে শিতবস্ত্রে সমস্ত রজনী শিতকোড়ে
দণ্ডায়মান থাকিতেন, তথাপি মোগলের
নিকট সন্ধিপ্রার্থনা করিতেন না। ক্ষেত্রের
দুর্য্যাক্ত কটী প্রভৃত করিয়া শিতদিগকে
খাওয়াইতেন, কখন প্রভৃত কটী ভাগ
করিয়া দুর্য্যাক্ত শিতদিগকে লইয়া শত্রুভয়ে
এক স্থান হইতে অস্ত্র স্থানে, তথা হইতে
পুনরায় আর এক স্থানে পলায়ন করিতেন,
তথাপি মোগলের নিকট সন্ধিপ্রার্থনা
করিতেন না।

এইরূপ অসঙ্গ কষ্ট সহ করিয়াও মহা-
রাণা মোগলদিগের সহিত প্রতি বৎসর
যুদ্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত
দুর্গ, সমস্ত পরিত, সমস্ত উপত্যকা
শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল
মেওয়ার-রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থানও
পাইলেন না। অবশেষে তিনি চন্দাওয়ার
দুর্জয়সিংহের সুর্য্যমহলে আপন পরিবার
রাখিলেন, বরং আপন অন্নসংখ্যক সৈন্য
লইয়া শত্রুদিগকে নানাদিক্ হইতে দ্বার দ্বার
গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জয়সিংহ সম্মানে রাজপরিবারকে
আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। অসংখ্য
মোগল শত্রু আসিয়া সুর্য্যমহল বেটন
করিল। মেওয়ারের প্রধান বৌদ্ধগণ কেহ

প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ না
সুর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সুর্য্যমহলে রহিলেন : বিপ-
দের সময় রাজপুত্র রাজপুত্রের ভ্রাতা।
দুর্জয়সিংহ নিঃসঙ্কোচে তেজসিংহ ও তাঁহার
রাঠোরগণকে সুর্য্যমহলে প্রবেশ করিতে
দিলেন, কেন না, তেজসিংহ রাজপুত্র, বিশাল-
বাতকতা জানেন না, রাজকার্য্য-সাধনাৎ
দুর্গে প্রবেশ পাইয়া আপন অভীষ্ট
সিদ্ধ করিবেন না। তেজসিংহ নিঃসঙ্কোচে
শত্রুদুর্গে শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপন অন্ন সৈন্য
লইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কেন না,
দুর্জয়সিংহ রাজপুত্র, বিদেশীয় যুদ্ধের সময়
তেজসিংহের উপর কদাচ হস্তক্ষেপ করি-
বেন না।

তেজসিংহ ও দুর্জয়সিংহ উভয়েই
অসাধারণ সাহসী, কিন্তু এক্ষণে পরস্পরে
বর্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে
লাগিলেন। যে স্থানে অতিশয় বিপদ্
হইত, যে স্থানে শত্রুগণ অসংখ্যবলে আক্র-
মণ করিত, তেজসিংহ ও দুর্জয়সিংহ উভয়েই
সেই স্থানে প্রথমে যাইবার উদ্যম করিতেন।
কেন না, রাঠোর চন্দাওয়ার অপেক্ষা হীন
নহে, চন্দাওয়ার রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে।
একদিন নিশার যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গের
একটি দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিল ও সেই
পথ দিয়া মোগলগণ দুর্গে প্রবেশ করিবার
উপক্রম করিল। দুর্গবাসী এই বিপদ্ দেখিয়া
যেন চকিতের ভ্রাস রহিল, মহা তেজসিংহ
বজ্রনাগে কতিপয় রাজ রাঠোর সঙ্গে লইয়া
শত্রুমধ্যে পড়িলেন, অসুস্থবলে তাহাদি-
গের গতিরোধ করিলেন। অমাহুতিক
বেগে শত্রুসেনা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দুর্গদ্বার
অতিক্রম করিলেন, পরে পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ
হইলে লক্ষ দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া

১২/১০/১৯০৮

শোণিতান্ন তদেবে দুর্গে প্রবেশ করিলেন । এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া সমস্ত দুর্গবাসী জয়নাদে দুর্গ পরিপূর্ণ করিল । দুর্জয়সিংহ সে বীরত্ব দেখিলেন, সে জয়নাদ শুনিলেন, রজনী-প্রভাত হইলে দুর্গদ্বার উন্মোচিত করিবার আদেশ দিলেন । বিশতমাত্র চন্দাওয়ার লইয়া দুর্জয়নীর তেজে সহস্রা পক্ষপত মোগলকে আক্রমণ করিলেন । সহস্রা আক্রান্ত মোগল-গণ সে সরোষ আক্রমণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলাইল । অসমসাহসী চন্দাওয়ার পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, চন্দাওয়ারতের বীরত্ব-যশে দুর্গ পরিপূর্ণিত হইল ।

এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের বীরত্বে যেন জ্বলন্ত হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । রজনীতে শয্যা ত্যাগ করিয়া চন্দ্রালোকে মশালের আলোকে উভয়ে প্রাচীরের উপর পদচারণ করিতে, শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতে, শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে, আপন আপন সৈন্তগণকে সাহস দান করিতে, শত্রুগণকে অসতর্ক দেখিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শত্রুসেনা ছারখার করিতে, ভ্রাতার স্ত্রীর একের পার্শ্বে অস্ত্র যুদ্ধ করিতে, উভয়েই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে, কেহই অস্ত্র অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না । শত্রুসেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ার ও রাঠোর একত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতে, পরি-জ্ঞাত তেজসিংহ ও দুর্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য কটী ও অপরিষ্কার জলে স্বেপিপাসা নিবৃত্তি করিতে, পরে যখন পূর্বদিক্ রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃত্বের স্ত্রীর দুই জন পরম শত্রু নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা বাইতেন ।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শের পর্যন্ত পাঠ কর, কপটচোরিতার পরিচয় নাই, সভা-ভবনের পরিচয় নাই, পরম শত্রুর সহিতও অস্ত্র-সম্মেলনের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই । সম্রাটের বাক্যলঙ্ঘন হইয়াছে, নক্ষি-পত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের সত্যলঙ্ঘন হয় নাই ।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল । অবশেষে সূর্য্যমহলে খাণ্ড ও পানীয়ারবোর অভাব হইতে লাগিল, তখন রাজপরিবারকে আর এ দুর্গে রাখা বিধের বোধ হইল না । অতিশয় যত্নে রাজ-পরিবারকে ভীমগড়-দুর্গে প্রেরণ করা হইল, দুর্জয়সিংহ ও অস্ত্রাভ্র যোদ্ধৃগণ অর্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তখনও দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন ।

মহুঘোর বাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিল । আর একমাস দুর্গরক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মহুঘোর সাধ্য নহে । সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উন্মোচিত হইল, মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল, দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতের মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম, বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই । রাজপুত-গণ যত্ন নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার অস্ত্র কিরূপ যুদ্ধ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পক্ষে তাহা বর্ণিত আছে । মহুঘোর বাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল, কিন্তু দেশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না, রাজপুত হীনসংখ্য হইয়া ক্রমে হাটিতে লাগিল ।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, বন্ধুকের ধুম ও মহুঘোর কোলাহলে সূর্য্যমহল প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্ন-ভিন্ন

ও শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অসুস্থবাবো প্রাণাদ রক্ষা করিতেছে।

প্রাণবিরেণ শেখ কুটীরে দুর্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল, উভয়েই বড়ল-হস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত। তেজসিংহে ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “দুর্জয়সিংহ! চন্দাওরৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছে, রাঠোর চন্দাওরতের বীরত্ব দেখিয়াছে, আর দুই নিফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিফল। কিন্তু অস্ত্র আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অস্ত্র কার্য সাধন করিতে পারিব।”

দুর্জয়সিংহ। মহারাণার কার্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্তব্য, কিন্তু অস্ত্র পরিজ্ঞান পাওয়ার কি পথ আছে?

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটি গবাকের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, “তুনি-রাছি, ঐ গবাক দিয়া একজন রাঠোরবালক লক্ষ দিয়া হুদে পড়িয়াছিল, পরে সম্ভরণ দ্বারা জীবনরক্ষা করিয়াছিল। রাঠোর-বালক ঘাঘা করিয়াছিল, চন্দাওরৎ বোকা বোধ হয়, তাহা করিতে পারেন।”

লক্ষ্যার রোবে পূরুকথা স্বরণে দুর্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অঙ্গি কাপিতে লাগিল, রোবে পদাঘাত করিয়া সে গবাক বিদীর্ণ করিয়া লক্ষ দিয়া হুদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক দিয়া হুদে পড়িলেন, উভয়ে সম্ভরণ দ্বারা হুদ পার হইলেন। সূর্য্যমহল শত্রুহস্তগত হইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমগড়-দুর্গ।

কথাতঃ পৃথিবীপালাঃ সৈন্তবলবাহনঃ।

প্রমাণনাক্ষিতী বেবাং ভূমিরদ্যাশি তিষ্ঠতি।

মহাভারতম্।

উপরি-উক্ত ঘটনার পর প্রায় একমাস কাল কোন যুদ্ধ হইল না। ভীমগড়নিবাসী রাজপুতগণ মনে করিল, যুদ্ধ বোধ হয়, এ বৎসরের জন্ত কান্ত হইল, কিন্তু সে আশায় তাহারা অচিরে নিরাশ হইল।

মহারাণা প্রায়ই দুর্গে গমন না। অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়া ও উপত্যকায় বাস করিতেন। স্থানে স্থানে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিতেন, সুযোগ পাইলেই অন্ধকার নিশীথে সমস্ত নৈমন্ত লইয়া নিশ্চিন্ত যোগলদীকে সহসা আক্রমণ করিতেন, পুনরায় বহুসংখ্যক যোগলসৈন্ত জড় হইবার পূর্বে যেন ভুগুণ্ডে বা পূর্বতগছরে লীন হইয়া যাইতেন। দিবসে, যামিনীতে, শীতে, বর্ষায়, গ্রীষ্মে, অবিভ্রান্ত প্রতাপসিংহ এইরূপে মেওয়ার রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মেওয়ার-বিজয় হইল না।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্তসমেত ভীমগড়-দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন, এ সংবাদ কোনরূপে তাহারা জানিাছিল। রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্ত অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অস্ত্র সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড়-দুর্গ আক্রমণ করিল।

রাজপুতগণ নিশাবোগে এই সহসা

আক্রমণের ক্ষত প্রস্তুত ছিল না, প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও কয়েক শত রাঠোর লইয়া মহারাণীর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতে পূর্বতে ক্রিড়িতেছিলেন, কেবল বালক চন্দন-সিংহ পাঁচশত মাত্র রাঠোর লইয়া দুর্গে ছিল, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন। তিনি রাজ-পরিবাররক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গভীর হইল। তিনি কণেক নিম্নরূপ হইয়া রহিলেন। দুর্গপ্রাচীর হইতে চারিদিকে পিপীলিকাশ্রেণীর স্তায় মুসলমানদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কণেক পর বালক চন্দনকে সঙ্ঘোষন করিয়া কহিলেন, “চন্দন! অস্ত দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়, রাজ-পরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিজস্ব হইয়া বাইবার স্তম্ভ জঙ্গলের ভিতর দিয়া এটিক গোপনীয় পথ আছে, তাহা কেবল আমি ও আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ জানে। কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র, নিরাপন্ন স্থানে পৌছিতে সমস্ত রজনী অতি-বাহিত হইবে। বালক! পঞ্চশত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গরক্ষা করা অস্ত তোমার কার্য্য।”

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন, “প্রভু পূর্বেই দুর্গরক্ষার ভার আমার উপর স্তম্ভ করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণীর, মহারাণীর স্তম্ভ এ দাস অস্ত যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার-রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন, ভীমগড় সুর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।”

বালকের এ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন; কহিলেন, “চন্দনসিংহ! তুমি যখন এ কার্য্যের ভার লইয়াছ, আমার

আর চিন্তা নাই।” পরে দীর্ঘনিশ্বাস কেনিয়া অস্পষ্টভাবে কহিলেন, “কিন্তু যখন দেবীসিংহ প্রত্যাঘর্ষন করিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তেজসিংহ তাঁহাকে কি বুঝাইবে?”

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরি-বার-রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীমবেশে সমস্ত পথ বাইলেন, কোন স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া বাইলেন, পাঠক পূর্বেই তাহা অবগত আছেন।

এ দিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ-প্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল মুহূর্ত্তমধ্যে তিন শত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিজস্ব হইয়া স্থানে স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; যে স্থানে পূর্বত অতিশয় উচ্চ, আরোহণ অতি-শয় কষ্টসাধ্য, রাজপুতগণ সেই স্থানে শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজপুতদিগের সংখ্যা অতিশয় অল্প, কিন্তু সাহস অনাধারণ এবং সেই গর্ব্বিতরাশি অপেক্ষা তাঁহাদিগের জ্বর হ্রি ও অকম্পিত। বালক চন্দনসিংহ অস্ত দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ, নিঃশঙ্ক-জ্বরে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দুই শত বোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরলতেজে মুসলমান আসিয়া পড়িল, যুদ্ধনাশে আকাশ ও ঘেরনী কম্পিত করিল। সে ঘোর রজনীর ভরস্বর বৃদ্ধ বর্ণনা করা যায় না। অস্ত দুর্গ হস্তগত হইবে, অস্ত মহারাণীর পরিবার বন্দী হইবেন, এই আশার ঘোর উল্লাসে মুসলমানগণ রাজ-পুতশ্রেণীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মুসলমানের অসংখ্য সেনা, কিন্তু সে পূর্বত আরোহণ করিবার একমাত্র পথ, স্তম্ভরাজ-পুতসেনারা সেই অল্পসংখ্যক রাজপুতসেনাকে চারিদিকে বেষ্টিত করিতে পারিল না। সমু-

দ্রের তরঙ্গের স্তায় বার বার মহাগর্জনে মুসলমান সেই রাজপুত্রের খার উপর পড়িতে লাগিল, কিন্তু জলধিসীমাহ পর্বতপ্রাচীরের স্তায় রাজপুত্রের খার বার বার সে তরঙ্গকে প্রতিহত করিতে লাগিল।

মহারাজার সন্ধান, আমাদিগের জীবন, আমাদিগের মাতা, বনিতা, ভগিনী, কুটুম্বিনীর জাতি-ধর্ম সমস্তই আমাদিগের অসির উপর নির্ভর করে, প্রত্যেক রাঠোর নিঃশঙ্কে এই চিন্তা করিল, নিঃশঙ্কে অসংখ্য শত্রুকে যুদ্ধদান করিল। এ চিন্তায় যত দিন স্বাধীন যোদ্ধার ধমনীতে রক্ত বহিতে থাকে, তত দিন জগতে সে যোদ্ধার পরাজয় নাই। মোগলদিগের সেনা অধিক, কিন্তু রাজপুত্রগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রত্যেক রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশঙ্কে অসিগলনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রক্তনী যুদ্ধ হইল। রাজপুত্রযোদ্ধা গণ প্রায় সমস্তই সমুদ্রতীরে হত হইল। পূর্বদিকে রক্তমাখা দেখা দিল, অসংখ্য মুসলমানগণ ভরস্কর যুদ্ধদান করিয়া অবশিষ্ট কতিপয় রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল, উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গের স্তায় যেন উপরে আসিয়া পড়িল।

তখন রক্তাপ্তকলেবরে বালক চন্দনসিংহ পলাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পক্ষাশ্রম যাত্রা রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আরক্ত নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন, ব্রহ্মবলে অসুয়যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গ আরোহণ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু কনকনাশকে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল। কবাটের

পশ্চাতে অবশিষ্ট নির্ভীক রাঠোরবীরগণ শেখ পর্যাস্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুত্রবীৰ্য্য দেখাইবে।

৩য় মুসলমানগণ তিফিং হত্যাস হইল। সমস্ত রক্তনী যুদ্ধ করিয়া প্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিল, দুর্গদ্বার রুদ্ধ, বোধ হয়, পুনরায় সমস্ত দিবস যুদ্ধ না করিলে দুর্গবিজয় হইবে না। সেনাপতি সেনাদিগকে অবসর ও প্রান্ত লক্ষ্য করিলেন; আদেশ দিলেন, “অতাই ডায়গড লাইব, অতাই প্রতাপসিংহের পরিবার বন্দী হইবে, সৈন্যগণ, কণেক বিশ্রাম কর।”

মুসলমানদিগের উত্তমভঙ্গ দেখিয়া চন্দনসিংহ প্রাচীরের উপর উঠিলেন। দেখিলেন, প্রায় এক সহস্র মুসলমান দ্বারের বাহিরে বিশ্রাম করিতেছে বুঝিলেন, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, কণেক নিবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। দুর্গের ভিতরে চাহিলেন; দেখিলেন, কেবল দুই শত জন রাঠোর। যুবকের আ কুঞ্চিত হলে, ললাট চিন্তাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণমাত্র চিন্তার পরই যেন প্রতিজ্ঞা স্থির হইল, তখন ঈষৎ হাসিয়া প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

যোদ্ধাগণকে চারিদিকে ডাকিয়া কহিলেন, “বন্ধুগণ, মহাযোর বাহা সাধা, রাজপুত্রের বাহা সাধা, তাহা করিয়াছি। আমার পণ রক্ষা করিয়াছি, সূর্য্যদেব আকাশে উদ্ভিত হইয়াছেন। এক্ষণে দুর্গবাহিরে সহস্র যবন, ভিতরে কেবলমাত্র আমরা জীবিত আছি। এক্ষণে তোমাদিগের কি পরামর্শ?”

একজন রাঠোর উত্তর করিলেন, “রাঠোর সমুদ্রতীরে প্রাণত্যাগ ভিন্ন অন্য পরামর্শ জানে না।”

চন্দনসিংহ। তাহার পর আমাদিগের মাতা, ভগিনী, বনিতা, যবনের গোলা হইবে! রাজপুত্র-রমণী দিল্লীতে বিলাসের দ্রব্য হইবে!

ଜାମିନ-ପୁରୁଷ ତୁମି ଦୁର୍ଗ ହାରାହିରାହ, ବାହା,

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দিকে ছই তিন শত
রাঠোর-বীর দণ্ডায়মান ছিলেন। নিঃশব্দে
তাঁহারা অগ্নিশিখা উদ্ভিত হইতে দেখিলেন;
মাতা, বনিতা ভগিনী ও দুহিতাকে চিতার
প্রাণবিসর্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদের
জীবনের আর মায়া রহিল না, জগতে আর
আশা রহিল না। তাঁহারা প্রাতঃকালে পবিত্র
জলে স্নান করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা
শেষ করিলেন, পরে নিঃশব্দে শরীরে বস্ত্র
ধারণ করিলেন, তহুণরি রক্তবস্ত্র পরিধান
করিলেন, শিরে উজ্জল মুকুটের উপর তুলসী
পত্র স্থাপন করিলেন, গলদেশে পদ্মমালা
ধারণ করিলেন। শেষবার

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

৩৯৮

আলিঙ্গন করিলেন। তা ব্রাত্যকে, সন্তান হইয়াছে, এরূপ পিতাকে নিঃশব্দে আনি। দুই তিন দণ্ড বেলায় সমস্ত অন্তর্যামীকে ছুঁড়িবার মুহূর্ত্তে মুসলমানেরা দেখিলেন, সেই বারই তরকবেগে অগ্ন্যশ্বত রাজপুত বীর সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সে রাজপুতসংখ্যা দীর্ঘ নিঃশেষিত হইল, দুর্গ যোগল-চতুর্গত হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিভ্রাণ পাইল, তাহারা সেই দুই শত যোদ্ধার দ্রুতগতি বিন্দু হইল না।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পরও দিল্লীর কোন কোন বৃদ্ধ যোগল নিজ পুত্র বা পৌত্রকে ভীমগড়-দুর্গ-বিজয়ের কথা গল্প করিত, রাঠোরদিগের বৃদ্ধকথা গল্প করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

বীরের কাতরতা।

পুত্রঃসহায় বামবতঃ যশোবতঃ।

সুদঃসহস্রাণা নিত্যমীদৃশং।

অবাধ্যশক্তেবিরুদ্ধে রতিং।

সত্যপ্রিয়ঃ হস্ত হস্তা বনবিভাঃ।

কিরাতার্মনীরং।

যে দিন ভীলদিগের গল্পের মহারাজীর হিত পুষ্পের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে দিন প্রতাপসিংহ সহস্রা যোগলসৈন্ত আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যোগলসৈন্ত অসংখ্য, সমস্ত দিন ও রাত্রে রজনী বুঝা চেষ্টা করিয়া প্রতাপসিংহ

লইলেন। যোগলসৈন্ত ক্রমে ভীমচাঁক ভীলের আবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাজী আর তথায় থাকি উচিত বিবেচনা না করিয়া, সন্তান ও পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ জাউরার ধনিতে বাইরা আশ্রয় লইলেন। ভীমচাঁকের আবাসে প্রতাপসিংহের পরিবারকে না পাইয়া যোগলসৈন্ত তথা হইতে চলিয়া গেল, মহারাজী তখন জাউরার ধনিতে বাহির হইয়া চাওরনদীতে বাহীর লইব, আসিলেন।

হইবে, মুসলমান, চণ্ডীকর করাও চণ্ডীকর হইয়া উঠিল।

নিকট প্রাচীরের দিকে হইয়া আসিতেছে, যুদ্ধ-চাওরনদীতে সহস্রা আসিতেছে, চারিদিকে

সৈন্তের শব্দ শুনিতেছে, যোগলসৈন্তের শিবির দেখা

গণ হীনবল হইতে হইয়াছে, যুদ্ধের সময় প্রতাপ-

যেখানকার স্থায় দেখিলেন, যুদ্ধ দুই দিকের সমস্ত

বাইতেছে। একদিনের জু হইলেন।

সিংহ পরামর্শ করিবার জন্য কলপতিগণ

প্রধান যোদ্ধাদিগকে ডাকিল, তখন য সমস্ত প্রাচীর

প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রাচীরে বৈঠক করিয়া-

বসিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধ প্রাচীরের দিকের

যোদ্ধা কমলমীরে রজনী রহিয়াছে, আমার ইচ্ছা

ছিল, তাহার দ্বারা প্রাচীরের দিকের

দৈলওয়ারার বাল, চণ্ডীকর প্রাচীরের দিকের

বিজলীর প্রথমক, চণ্ডীকর প্রাচীরের দিকের

অস্ত্র প্রাচীর কল, চণ্ডীকর প্রাচীরের দিকের

প্রতাপ আপনাদের চারিদিকের দিকের

লেন, তাঁহার পুরাতন দিকের দিকের

নাই। নবনব বাল, চণ্ডীকর প্রাচীরের দিকের

হইয়াছেন, পিতার দিকের দিকের

করিতেছেন, তাঁহার দিকের দিকের

মিতে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা পিতার দিকের

দেখিলেন, পুত্র পিতার দিকের দিকের

বসিয়া আছেন, পিতার দিকের দিকের

ও উপত্যকার দিকের দিকের

হইয়াছেন, পিতার দিকের দিকের

করিতেছেন, তাঁহার দিকের দিকের

মিতে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা পিতার দিকের

দেখিলেন, পুত্র পিতার দিকের দিকের

বসিয়া আছেন, পিতার দিকের দিকের

ও উপত্যকার দিকের দিকের

অনেকক্ষণ পর পরাবর্ষ শেষ হইল, কৃত্তাগণ খাড়া আনিল। বৃক্ষপত্র-বিনির্মিত পাত্রে সামান্য আহার লইয়া সকলে আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু মেওয়ারের গৌরবের দিনে রাজসভার যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

সভার মধ্যে সাহসী ও সম্মানিত যোদ্ধা মহারাণার পাত্র হইতে কল বা আহারের দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে “ছনা” কহিত। প্রতাপসিংহ অল্প কাহাকে “ছনা” দিবেন, স্থির করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

তাহার পার্শ্বে পুত্র অমরসিংহ বসিয়াছেন, অল্পবয়সেই শত বুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতাপ তাহাকে সোধোদন করিয়া বলিলেন, “অমরসিংহ! এই ঘোর বিপদকালে তুমি বীরের শিক্ষা শিখিতেছ, বীরের কার্য সাধন করিতেছ। কিন্তু অল্প অল্প এক যোদ্ধা আমার ষাণ্ডের ভাগগ্রাহী।”

কিছু দূরে দুর্জয়সিংহ ও তেজসিংহকে দেখিয়া বলিলেন, “চন্দাওয় ও রাঠোর! ধন্য তোমাদের বীরত্ব, ধন্য তোমাদের আমির্ষ্য। তোমরা উভয়েই আমার জন্ত জীবন পণ করিয়াছ, উভয়েই বিপদের সময় রাজপরিবারকে স্থান দিয়াছ, উভয়েই ভ্রাতৃত্বের স্রাব পরম্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বহু শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছ। তোমরা উভয়েই অতুল্য বীর, কিন্তু অল্প অল্প এক যোদ্ধা আমার ষাণ্ডের ভাগগ্রাহী।”

সম্মুখে প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ বসিয়াছিলেন, তাহাকে সোধোদন করিয়া মহারাণা কহিলেন, “দেবীসিংহ! এ কালসময়ে তুমি আমার জন্ত সর্বস্ব হারাষ্ট্রাছ, তোমার বীরত্ব, তোমার স্বামীধর্মের পুরস্কার কি দিব? এ কাল-যুদ্ধে তুমি দুর্গ হারাইয়াছ, বীর পুত্র

হারাইয়াছ, পরিবার-কুটম্ব সমস্ত হারাইয়াছ, তথাপি ষড়্গু হতে পর্তুতে পর্তুতে আমার সখী হইয়া কিরিতেছ। প্রতাপসিংহ অনেক রোশ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তোমার স্রাব স্বামী-ধর্মরত যোদ্ধার এই অবস্থা দেখিলে প্রতাপসিংহের পাবাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। বীরকুল-চুড়ামণি! তোমার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া মহাযাসাধ্য আছে। অল্প আমার আহারের ভাগগ্রাহী হইয়া আমাকে অল্পগৃহীত কর।”

মহারাণার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যোদ্ধা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বৃদ্ধের নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। অশ্রু-মোচন করিয়া ঈষৎ কম্পিতভাবে কহিলেন, “মহারাণা! কাতরতা-চিহ্ন কমা করুন, বৃদ্ধের এক বিন্দু অশ্রু কমা করুন। আশা ছিল, এই বৃদ্ধ-বয়সে বৎস চন্দনকে দুর্গ-ভার অর্পণ করিব, বৎস চন্দনকে আমার পৈতৃক খণ্ডা দিয়া শান্তি লাভ করিব, কিন্তু ভগবান্ অল্পরূপ ঘটাইলেন।” ভগবান্কে নমস্কার করি, পুত্র বীর-নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাণার কার্যে বীরনাম কলঙ্কিত করিবে না।”

আর কোন কথাবার্তা হইল না, যোদ্ধা-দিগের নয়ন সিক্ত হইল, থাকাস্মৃতি হইল না। নীরবে ভোজন শেষ হইল, মহারাণা মহিষী ও পুত্রদিগের নিকট বাইলেন।

অন্ধকার নিম্নাঞ্চে একটি পর্তুতগহবরের নিকট অগ্নি জলিতেছে, রাজশিশুগণ সেই অগ্নির চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন, অথবা বিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর মুখে নিজা বাইতেছেন। রাজমহিষী ও পুত্র ক্রীড়া প্রস্তুত করিতেছিলেন, পুত্র-কস্তাগণ উঠিলে ষাইবে। প্রতাপসিংহ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কণেক নীরবে এই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয় আজি চিন্তাপূর্ণ।

দুর্গসকল একে একে শত্রুহস্তগত হইয়াছে, সৈন্যসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে । প্রতাপ-সিংহের আর অর্থ নাই, সশস্ত্র নাই, রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সেই প্রস্তর ভিন্ন মস্তক রাখিবার স্থান নাই, ক্ষমার কলত্রপুত্রদিগকে রাখিবার স্থান নাই । কিন্তু এ সমস্ত ক্লেশ প্রতাপসিংহ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-ক্লমর কাতর হয় নাই ।

কখন কখন রাজমহিষী কোন পর্ত্তগহ্বরে খাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছেন, সহসা শত্রুর আগমনে সেই প্রস্তুত খাণ্ড ভাগ করিয়া দূরে পলাইয়াছেন । পুনরায় তথায় খাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছেন, পুনরায় তাহা ভাগ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোরুদ্রমান সন্তান লইয়া পলাইয়াছেন । অবশেষে সেই মেওয়ারে থাকিবার স্থান পান নাই, ভীলদিগের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া ভূগর্ভে ও খনিতে লুকাইয়াছিলেন, তথায় ভীলগণ তাঁহাকে রক্ষা করিত, ভীলগণ তাঁহাকে আহার বোগাইত । কিন্তু এ সমস্ত বিপদ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-ক্লমর কাতর হয় নাই ।

কখন কখন রজনীতে স্বামীপার্শ্বে রাজমহিষী শয়ন করিয়া আছেন, সহসা রাজ্রিযোগে ঘুমলধারায় বৃষ্টি আসিল, সেই অনাবৃত স্থল ভাসাইয়া লইয়া গেল, সমস্ত রাজ্রি সিক্তদেহে রাজমহিষী বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডারমাস থাকিতেন, কিন্তু সে ক্লেশ প্রতাপ তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-ক্লমর কাতর হয় নাই ।

কখন কখন রাজপরিবার সমস্ত দিবস অনাহারে জজলে জজলে পলাইয়াছেন, সন্ধ্যার সময় কোন পর্ত্ত-কন্ডারে আশ্রয় লইয়া খাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছেন । খাণ্ড সহসা মিলে না, ক্ষেত্রের “মল” নামক দুর্গের আটা প্রস্তুত করিয়া মহারাজী বহুদূর তাহারই রুটী প্রস্তুত

করিয়া শিশুসন্তানকে দিয়াছেন । একদিন কন্ডরবাসী একটি বন্যবিড়াল আসিয়া শিশুর গ্রাস হইতে সেই রুটী লইয়া পলাইল, শিশু অনাহারে রাজ্রি কাটাইল, ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃবক্ষে সুষ্প হইয়া পড়িল । প্রতাপসিংহ এরূপ ক্লেশও তুচ্ছ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বীর-ক্লমর কাতর হয় নাই ।

কিন্তু অস্ত্র মহারাণার বীর-ক্লমর কাতর, তাঁহার প্রশস্ত ললাট চিন্তারেখাঙ্কিত ।

মহারাণাকে দূর হইতে দেখিয়া মহারাজী পুত্রের হস্তে রুটী রাখিয়া সব্বের স্বামীকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন । দেখিলেন, স্বামীর চক্ষুজলপূর্ণ । বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “এ কি ? অস্ত্র মহারাণা কাতর কেন ? তুর্কীরা বলিবে, এত দিনে মহারাণা যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, বিপদে কাতর হইয়াছেন ।”

প্রতাপসিংহ । জগদীশ্বর জানেন, যুদ্ধে প্রতাপ পরিশ্রান্ত নহে, বিপদে কাতর নহে ।

রাজী । তবে কি পুত্র-কন্ডার এই ছুর-বস্ত্র দেখিয়া কাতর হইয়াছেন ? মহারাণা যদি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে কি এই কষ্ট অসম্ভব হইল ?

প্রতাপসিংহ । জগদীশ্বর আমার পুত্র-কন্ডাকে সুখে রাখিয়াছেন, তোমাকেও সুখে রাখিয়াছেন । রাজ্রি ! এই কালসময়ে অনেক বোদ্ধা শিশুদিগকে হারাইয়াছেন, বৎস অমর-সিংহের স্থায় বীর পুত্র হারাইয়াছে, বীর-প্রসবিনী কলত্র হারাইয়াছে, জাতি-কুটুম্ব সমস্ত হারাইয়াছে । রাজ্রি ! এ কাল-যুদ্ধে অনেক বোদ্ধার সংসার যক্ষুন্মি হইয়াছে, জীবন শূন্য হইয়াছে ।

রাজী । ঈশানী তাঁহাদিগকে শান্তিদান করুন, এরূপ শোক মহাব্যয় অসম্ভব ।

প্রতাপসিংহ । রাজ্রি ! দেবীসিংহ নামক একজন রাঠোর-বোদ্ধা আমাদের যুদ্ধকাব্যে

কেশ শুন্ন করিয়াছেন, বাঠোরদিগের মধ্যেও তাঁহার অপেক্ষা বীর কেহ নাই। অধুনা ভূকীর্ণ তাঁহার দুর্গ লইয়াছে। তাঁহার দ্বীপরিবার চিত্তাহরণ করিয়াছে, তাঁহার একমাত্র বীর পুত্র তুর্কী-হস্তে হত হইয়াছে। বৃদ্ধ দেবীসিংহ স্বামিধর্ম্য পালন করিয়া কবে নিজ জীবন দান করিবেন, এই আশার অত্যাধি জীবিত আছেন।

রাজীর নয়ন দিয়া অরুণ করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিলে, দেবীসিংহের পরিবার সমস্ত গিয়াছে? দেবীসিংহ একমাত্র বীর পুত্র হারাইয়াছে? হা বিধাতঃ! পুত্রশোক অপেক্ষা বিষম বজ্র সজ্জন করিতে তুমিও অক্ষম!”

প্রতাপসিংহ। বীর পুত্র গিয়াছে, পরিবার গিয়াছে, তুর্গ গিয়াছে, বংশ-বিনাশ হইয়াছে। সেই বৃদ্ধ আজি আমাকে কহিলেন, “ভগবানকে নমস্কার করি, পুত্র বীর-নাম কলঙ্কিত করে নাই, এ বৃদ্ধও মহারাজার কার্যে বীর-নাম কলঙ্কিত করিবে না। এক্ষণ স্বামিধর্ম্যের কি এই পুরস্কার? বীর অস্ত্রচরগণকে উৎসন্ন করিয়া মেওয়ার-রক্ষার কি কল?”

অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রাজী সন্তানদিগকে খাওয়াইতে বসিলেন, প্রতাপসিংহ চিন্তাতে শাস্তি পাইলেন না, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “যদি রাজালোভের এই দুঃসহ বস্ত্রপাই ফল হয়, প্রতাপসিংহ সে রাজা চাহে না, রাজ-নামে জলাঞ্জলি দিবে!” পরদিন মহারাজা আকবর শাহের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধি-প্রার্থনা করিলেন।

ষড়্-বিংশ পরিচ্ছেদ ।

অপবিত্রে পবিত্রতা ।

কিমণেক্য কলং পরোবদান,
মনন্তঃ প্রার্ষভতে যুগাধিপঃ ।
প্রকৃতিঃ বলু সা। মহারসঃ,
সহতে সাত্তসমুদিতং বধা ।

কিরাতাঋণীয়ম্ ।

একদিন সন্ধ্যার সময় প্রতাপসিংহ পুনরায় বোজাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; বাঠোর ও চোতানকুল, প্রয়ল ও কালাকুল, চম্পাও-রং, সকাওরং, জগাও-প্রভৃতি শিশোনীম-কুলের অধিপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার বালাবধি যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা পাইয়াছেন, শত যুদ্ধে আপন আপন বীরত্ব ও আপন আপন কুলের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অস্ত্র সভাস্থলে সকলে নীরব!

প্রতাপসিংহ আকবরকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বোজাদিগের নিকট কহিলেন। আকবর অবজ্ঞাই সন্ধিদান করিবেন, কিন্তু শিশোনীমগণ কি অধীনতা-স্বীকার করিয়া সন্ধিগ্রহণ করিবে? প্রতাপসিংহ এই কথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই রাজপুতমণ্ডলীর মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এক্ষণ কেহ নাই। সভাস্থলে সকলে নীরব।

যত দিন যুদ্ধ সাধা, তত দিন যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে মেওয়ার-দেশের একটি উপত্যকা বা পর্বতদুর্গ আর রক্ষা করা যথুযোর দুঃসাধ্য। শত্রুগণ নূতন সৈন্ত লইয়া মেওয়ারের প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রত্যেক দুর্গ হস্তগত করিয়াছে, চারিদিক্ বেটন করিয়াছে, অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। বৃদ্ধ?—প্রতাপসিংহ আর কি লইয়া যুদ্ধ করিবেন? মেওয়ারের আর সৈন্ত নাই, সৈন্তদিগকে বাইতে দিবার

অর্থ নাই, রক্ষা করেন, এরূপ হুগ্গ নাই, থাকিবার স্থান নাই। চাওরসমূহেরে থাকিয়া অচিরে শত্রুহস্তে বন্দী হইবেন, বীরগণ কি এই পরামর্শ দান করিবেন? অথবা অথর ও মাড়োয়ারের রাজাদিগের স্ত্রায় তুর্কীর অধীনতা-স্বীকার করিবার পরামর্শ দেন? অধীনতা-স্বীকার করিয়া সন্ধিহাপন করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

বে স্বাধীনতার জন্ত এতদিন পর্তুতে ও উপত্যকার যুদ্ধ করিয়াছেন, রাজপুতশোণিতে মেওয়ার-দেশ প্রাণিত করিয়াছেন, গৃহ ও প্রাণাদ ত্যাগ করিয়া কন্দরে ও গহবরে বাস করিয়াছেন, দিবসে ও রজনীতে ক্রেশ ও বিপদ সহ্য করিয়াছেন, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিবেন? রাজস্থানের সকল রাজাদিগের উপর স্বেচ্ছা পদস্থাপন করিয়াছে, এক্ষণে কি মহারাজার বংশ সেই পদতলে উন্নত মস্তক অবনত করিবেন? বাগ্মারীওয়ার বংশ, নির্মল শিশোদীর-বংশ কি এতদিনে তুর্কীর দাস হইবে?

রাজপুত বীরগণানিভর। ইহার মধ্যে কোনটি কর্ণব্য? ইহা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? সভাস্থলে সকলে নীরব।

অন্ত দাসত্ব-স্বীকার করিলে কল্যাণ পুনরায় স্বাধীন হওয়া সম্ভব। আকবর মহাবল-পরাক্রান্ত ও অতিশয় বুদ্ধিমান, কিন্তু আকবরের মরণের পর দিল্লীখর সেরূপ ক্ষমতাপন্ন না হইতে পারেন। তখন মেওয়ার পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে শিশোদীরবংশ একবার বিনষ্ট হইলে জগতে তাহার নাম থাকিবে না। এইরূপ তর্ক কাহারও কাহারও জুদয়ে আগরিত হইতে লাগিল।

এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময়ে একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া

আসিল। প্রতাপ সিংহলেন, বিকানীর-রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। এ পত্র নহে, কয়েকটি কবিতা; পৃথ্বীরাজের স্ত্রায় সুকবি সে সময়ে রাজস্থানে আর কেহ ছিলেন না।

বিকানীর দিল্লীর অন্নগত, পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে থাকিতেন, তথাপি প্রতাপের বীরত্ব শুনিয়া আনন্দিত হইতেন, মেওয়ারের স্বাধীনতা স্মরণ করিয়া অপমান অমপান বিন্ধিত হইতেন, মনে মনে প্রতাপসিংহকে পূজা করিতেন। সে সময়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কে না মনে মনে মেওয়াররাজকে পূজা করিতেন?

আকবর যখন প্রতাপসিংহের সন্ধি-প্রার্থনাপত্র পাইলেন, তখন উল্লাসে পূর্ণ হইলেন। প্রতাপের স্ত্রায় মহৎ শত্রু ভারত-বর্ষে আর ছিল না, সেই প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থনা করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই চিন্তায় আনন্দিত হইলেন, দিল্লীতে আনন্দ-সূচক বাজ ও ধুমধাম হইতে লাগিল। পৃথ্বী-রাজ যোষে গজিয়া উঠিলেন, দিল্লীখরকে কহিলেন, “এ পত্র জাল মাত্র, প্রতাপের কোন শত্রু প্রতাপের গৌরবনাশের জন্ত এই পত্র সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীখর! আমি প্রতাপসিংহকে জানি, আপনার রাজমুন্টের জন্ত প্রতাপসিংহ অধীনতা-স্বীকার করিবেন না।”

পরে পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে কবিতাগর্ভে একখানি পত্র লিখিলেন; অন্ত রজনীতে রাজসভায় প্রতাপসিংহ সেই পত্র পাইলেন। প্রতাপসিংহ পাঠ করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের কবিতা।

“হিন্দুর আশাভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করে।

তথাপি রাণা তাহাদিগকে ভ্যাগ করি-
তেছেন ।

প্রতাপ না থাকিলে সমস্ত মরুভূমি হইত ।

কারণ, আমাদিগের বোদ্ধাগণ সাহস
হারাইয়াছেন, রমণীগণ ধর্ম হারাইয়াছেন ।
আকবর আমাদিগের জাতিস্বরূপ বাজারের
ব্যাপারী ।

উদয়ের পুত্র ভিন্ন সমস্ত ক্রয় করিয়াছে—
তিনি অমূল্য ।

নরোজার জন্ত কোন্ প্রকৃত রাজপুত
সম্মত বিক্রয় করিবে ?

তৎপ্রতি কত জনে বিক্রয় করিয়াছে ।

সকলেই কল্লিরের প্রধান ধর্ম বিক্রয়
করিয়াছেন :

চিতোরও কি এই বাজারে আসিবেন ?

প্রতাপ সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াছেন ।

কিন্তু রত্নটি রক্ষা করিয়াছেন ।

নৈরাশে অনেকে এই স্থানে আসিয়া
নিজের অবমাননা দেখিতেছেন ।

হামিরবংশজ কেবল এই অপবন হইতে
রক্ষা পাইয়াছেন ।

জগতে জিজ্ঞাসা করে, প্রতাপ গোপনে
কোথা হইতে সহায়তা পায় ?

তাহার বীরত্ব এবং তাহার ধৃষ্টি হইতে ।

তদ্বারা কাল ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন ।

ব্যাপারী চিরজীবী নহে, একদিন
ঠকিবেন ।

তখন আমাদিগের শত্রু ক্ষেত্র বপন-
করণার্থ প্রতাপের নিকট রাজপুত বীজ
লইতে আসিবে ।

তিনিই রাজপুত-বীজ রাখিবেন সকলে
এরূপ আশা করে !

যেন তাহার পবিত্রতা পুনরায় উজ্জ্বল হয় ।”

প্রতাপসিংহ একবার, দুইবার, তিনবার
এই পত্র পাঠ করিলেন । অবশেষে গর্জন

করিয়া কহিলেন, “বীরগণ ! চারিদিকে
অপবিত্রতার মধ্যে প্রতাপসিংহ রাজপুতকুল
পবিত্র রাখিবে । মেওয়ারে যদি স্থান না হয়,
আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইব, অন্তর্দেশে
বাইব, কিন্তু শিশাদীরবংশ কলুষিত
করিব না ।”

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—৩—

মেওয়ারের যুদ্ধ ।

দমিতারিঃ প্রাচ্যোদয়পুরিতদিগ্‌বুৎ ।

জবান রুখিতো রুট্যাস্তিতত্ত্ব গ্ৰন্যতান্ ।

তেষাং নিগম্যমানাঃ স্তবুটৈঃ কণ্ঠোদগিতাঃ ।

অভূতামিহ জ্ঞানবান্ধবান্ধবদিশ্‌ জগৎ ॥

ভট্টিকাবাহ ।

প্রতাপসিংহ দেশত্যাগ করিয়াছেন ।

মেওয়ারে শিশাদীর-কুলের স্থান নাই ।

শিশাদীরকুল সিদ্ধনদীতীরে যাইয়া নতুন
রাজ্য স্থাপন করিবে, তথাপি তুর্কার অধী-
নতা-স্বীকার করিবে না ।

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান
বোদ্ধাগণ সশস্ত্রে ও সপরিবারে মেওয়ার
ত্যাগ করিয়াছেন, আরাবলীপর্বত অতিক্রম
করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পৌছিয়া
বিশ্রাম করিতেছেন । সম্মুখে, পশ্চিমদিকে
মরুভূমি সন্ধ্যার আলোকে ধূ ধূ করিতেছে ;
পশ্চাতে আরাবলী-পর্বত ও মেওয়ারদেশ ।
সেই পর্বতরাশি এখনও দেখা যাইতেছে,
যোদ্ধগণ সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলে
চিন্তাকুল । স্বর্গদেব অস্ত গিয়াছেন, পুনরায়
বধন উদয় হইবেন, স্বদেশ নয়ন হইতে বহি-
ত হইবে, এই অনন্ত পর্বতমালা আর
দেখা যাইবে না । যে প্রদেশে শিশাদীর-
বংশ বহু শতাব্দী বাস করিয়াছে, যে দেশে

সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি প্রাতঃসর-
ণীর ভূপতিগণ রাজ্য করিয়াছেন, সে দেশ
চিরদিনের জন্য নরনবহিত হইবে।
মেওয়ারের প্রত্যেক পুরুষ হুগ ও উপত্যকা
বোদ্ধাদিগের মনে উদয় হইতেছে, যে যে
উপত্যকার পুরুষগণ যুদ্ধ করিয়াছেন, যে
যে পর্বতে প্রতাপ অনন্ত যুদ্ধে শোণিতপাত
করিয়াছেন, সে সমস্ত মানসচক্ষে চিত্রের
জায় উদয় হইতেছে। বোদ্ধগণ নীরব ও
শোকাবল, নীরবে অনন্ত বশঃপূর্ণ আরাবলী-
পর্বতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেক
শিবিরে রাজপুতনারীগণ শিশুগণকে ক্রোড়ে
লইয়া সজল-নয়নে আরাবলী-পর্বত দেখাই-
তেছেন।

“শিশোদীয়-বংশ নির্বাসিত হইবে।
যুদ্ধের মেওয়ারে শিশোদীয়-বংশের আর স্থান
নাই”—প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া
সভায় এই কথা কহিলেন। সভায় সকলে
নিবৃত্ত। তদাধ্যে একটি স্বর শুনা গেল—
“এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে,
এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।” বিস্মিত হইয়া
সকলে সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বুদ্ধ
রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশান্ত্রক্ৰমে ইহারা
মেওয়ারে মন্ত্রীস্বকার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ কয়েক মাস অবধি প্রতাপ-
সিংহের নিকট ছিলেন না। প্রতাপ বধন
যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভামাশাহ যুদ্ধার্থ অর্থ
সংগ্রহ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনি-
লেন, প্রতাপসিংহ ও সমস্ত শিশোদীয়কুল
দেশত্যাগী হইতেছেন, বোদ্ধগণ আরাবলী-
পর্বত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ
মন্ত্রী তখন ক্রতগতিতে পন্ডাতে পন্ডাতে
বাইলেন, অতঃ তিনি প্রতাপসিংহের শিবিরে
উপস্থিত হইরাছেন, অদ্য সভামধ্যে কল্পিত-
স্বরে বুদ্ধ বলিলেন, “এখনও মেওয়ারে

শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের
উপায় আছে।”

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও
নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,
“মন্ত্রিবর! আপনার কথা বার্য্য হয় না, কিন্তু
আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ
দেখিতেছে না, আপনি নির্দেশ করুন।”

বুদ্ধ করণোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই
হির-গস্তীরস্বরে কহিলেন, “দাস বহুদিন
মন্ত্রীয় করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতামহ,
প্রপিতামহ, বহুপুরুষ পর্য্যন্ত মেওয়ারের
মন্ত্রীয় করিয়াছেন, সে কাৰ্য্যে বংশক্রমে
যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা এখনও
অস্পৃষ্ট। সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র
সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণ-পোষণ হইতে
পারে, অমুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভু-
পদে উপস্থিত করে।”

পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্বামীধর্ম্ম ও
প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রতাপসিংহের নয়ন জল
পূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া
কহিলেন, “মন্ত্রিবর! আপনার এই ভক্তিতে
আমি পরিতুষ্ট হইলাম; কিন্তু রাজপ্রদ-
ান কিরূপে পুনরায় লইব? প্রতাপসিংহ
অদ্য দরিদ্র, তথাপি তাহার অধীনদিগের
ধন হরণ করিতে অক্ষম।”

ভামাশাহ। মহারাণা! এ দাস প্রভুকে
ধন দিতেছে না, মেওয়ার-রক্ষার্থ মেওয়ারকে
দিতেছে, মেওয়ারের অন্ত্রযুক্ত স্ত্রী মাতার
জন্ত আর কি উপকার করিতে পারে?
শিশোদীয়ের ধন-প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের,
তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের
জন্ত আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি
তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! আপনার যুক্তি
অখণ্ডনীয়, আপনার উদার বদেহভক্তি

বেদতুল্য! আপনার দায় শিরোধার্য করিলাম। আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্ধার করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না দেখিব।

প্রতাপ সসৈন্তে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্ধার করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে, দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজ খাঁ সসৈন্তে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিত করিতেছেন, প্রতাপ দেশভাগ করিয়া পলাইতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সচসা ঝটিকার স্তায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজ খাঁ সসৈন্তে হত হইলেন।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। আমাইত-পর্বতভূগ হস্তগত হইল, তখাকার মুসলমান ভূগরক্ষক হত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলখীর-ভূগ হস্তগত হইল, তখাকার ভূগরক্ষক আবছুরা সসৈন্তে হত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, একবৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশ পর্বতভূগ হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল। উন্নত দিল্লীতে বাইরা আকবর শাহকে জানাইল যে, ক্রমাগত দশ বৎসর বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবর শাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের এক-বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মেওয়ার অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অধর-প্রবেশ আক্রমণ করিলেন। দেশ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিলেন, বলপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

ইতিহাসের কথা আর এখানে লিখিবার আবশ্যক নাই। উপস্তাসে আমরা উপস্তাস-বর্ণিত ভূগের কথাই লিখিব। সূর্য্য-মহলভূগ পুনরায় রাজপুতগণ আক্রমণ করিল। সে ভূগ আক্রমণকালে তেজসিংহ ও ভূজসিংহ প্রাতঃযের স্তায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিক উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, ভূজসিংহের বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দীর হিতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও ভূজসিংহ অন্যদিকে বাইরা পড়িলেন, কিন্তু উভয়েই ভূগে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া বাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহই প্রথম প্রবেশ করিলেন, ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ৎগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া ভূগদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “ভূগসামিন্! আপনার অহমতি বিনা আপনার ভূগে পূর্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন, কেবল মহারাণার কার্যসাধনার্থ এরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার ভূগ আপনি অধিকার করুন, অহমতি দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।”

এ কথায় অজ্ঞবিত-কলেবর হইয়া ভূজসিংহ

সিংহ কহিলেন, “রাঠোর, ষটমাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিরাছ। তাহাই হউক, আপনার রাঠোর লইয়া দুর্গরক্ষা কর, আমি কোষার নিকট তিকা চাহি না। আমি সন্দেশে দুর্গ হইতে নিষ্কান্ত হইতেছি, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ কর, পরে যদি চন্দাওয়ং আসিতে বল থাকে, সে আক্রমণ করিয়া দুর্গ কাড়িয়া লইবে।”

ধীরে ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন, “আমি রাজকাৰ্য্যসাধনার্থ আপনার দুর্গে আসিরাছি, এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিবাসবাতকতা হইবে, রাঠোর বিবাসবাতকতা জানে না। চন্দাওয়ং! লই। নও বিদেশীয় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, আমা-
তেরে গর মধ্যে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। যখন বিদেশীয় যুদ্ধ হইবে, তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে সন্দের না। সতে বিলম্ব করিবে না।”

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর-সৈন্য লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। দুর্জয়সিংহ আরক্তনয়নে সেই রাঠোর-বীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার কয়েক দিন পর ভাগদ-দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন বোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিত্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এ জগতে তাঁহার বাহা কিছু প্রিয়স্বা ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিত্তার বিলুপ্ত হইয়াছে!

দেবীসিংহ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী অনেক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, নবজাত সূর্য্য-রশ্মি দেবীসিংহের মুখমণ্ডলে জোড়া করিতেছে, নবজাত প্রভাতের বায়ু সেই শুক্লকেশ লইয়া জোড়া করিতেছে। এ শোকপূর্ণ অসার জগতে পুস্ত্রশোক অপেক্ষা আর দারুণ ব্যথা কি আছে, দেবীসিংহ বোদ্ধা, কিন্তু দেবীসিংহ মহত্যা।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিরা কহিলেন, “পিতার চিরস্বপ্ন! আপনাকে আমি কি সাধনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্ত সখ্য-যুদ্ধে রাজপুত-বালক প্রাণ দিয়াছেন, সে জন্ত কি রাজপুত-পিতা কাতর?”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন, “রাজপুতের ধন, মান, পরিবার সমস্ত মহারাণার, মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্ত খেদ নাই। এ কাল-সময় বুদ্ধকে বাধিয়া শিশুকে লইল কি জন্ত, কেবল এই চিন্তা করিতেছি। শিশুচন্দন! পিতাকে কেন সজে লইলি না?”

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মূহুর্তের জন্ত কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল, বুদ্ধের নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যাধার ব্যাধিত হন নাই, তিনি সে ব্যাধাও ভাব্য জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, “পিতা! আপনি একটি পুস্ত্র হারায়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছে। তেজসিংহ পিতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে, পুস্ত্রকে আশীর্বাদ করুন।”

দেবীসিংহ। জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, পিতৃদর্শনে পুনরায় স্থাপন করুন।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে, পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব? রাঠোর-বীর! আপনি পিতাকে পদোত্তে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুস্ত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন, কাতরতা বিমূর্ত হইলেন, সবল হস্তে অসিধারণ করিয়া কহিলেন,

“দেবীসিংহের জীবনের এখনও আর একটি উদ্দেশ্য আছে, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্ত হই নাই।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—৪—

প্রথম আকাশে মেঘরাশি ।

অসার সংসারঃ পরিভ্রমিতরঃ

নিরাশোকঃ লোকঃ যরণঃ শরণঃ বাজবজনঃ ।

অদর্পঃ কন্দর্পঃ জননরনর্শ্রাপকলঃ

অগজোদারগাং কথবসি বিভাভূং ব্যবসিতঃ ॥

মালতীমাধবঃ ।

একদিন সন্ধ্যার সময় তেজসিংহ ভীল-সদ্বার ভীষট্টাদকে দেখিতে বাইতেছিলেন, এমন সময় পর্বততলে হ্রদতটে সেই ভীল-বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। বালিকা এখনও দেখিতে সেইরূপ, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গীত গাইতে গাইতে নিকটে আসিল। বালিকা গাইল—

“প্রভাতে বাগানে গিয়া দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।”

তেজসিংহ। আজ কি দেখেছিলি? কি শুনেছিলি?

বালিকা। এই শুন না।

“ফুটেছে মালতী ফুল, গন্ধেতে করি আকুল,
ধরে এল অলিকুল, দেখে এলেম সই।”

তেজসিংহ। এই দেখেছিলি, আর কিছু না?

বালিকা। এই শুন না।

“অলি এসে গান গায়, ফুল শুনে মুগ্ধ হয়,
‘তুমি নাথ’ ফুল কর, শুনে এলেম সই।”

তেজসিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,
“তুই আভাশর চুপা, তোর গান সুন্দর।
এ ফুলের নাম কি বল দেখি?”

বালিকা। “ফুলের আবার নাম কি?

ফুলের নাম পুশ।” পুনরায় গাইতে লাগিল।

“অলিরা ক ঘেরে বায়, বায় ফুলের যু বায়,
ফুলে কবে সত্য কর দেখিতে পাই কই?
প্রভাতে বাগানে গিরে দেখে এলেম সই,
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই।”

তেজসিংহের মুখ পড়ীর হইল। রোবে বালিকার হাত ধরিয়া কহিলেন, “বালিকা, তুই যদি পুশ্ব হইতিস, তোর চপলতার শাস্তি দিতাম।”

বালিকা। আমি কি করিয়াছি?
আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমি গীত গাইব না। গীত গাইলে তুমি রাগ করিবে, তাহা কি আমি জানিতাম?

তেজসিংহ। পাগীরিস! তুই কি ভক্ত এ গীত গাইলি? পুশের যদি মিথ্যা নিন্দা করিস, অজ আমার হস্তে তোর নিস্তার নাই।

বালিকা। আমি পুশের কি জানি, পুশ কে? আমি দরিদ্র ভীলকন্যা, আমি ফুল তুলি, ফুলের গান করি, আমি পরের কথা কি জানিব? আমাকে ছাড়িয়া দাও।

বালিকা কি সত্যই বালিকা? বর্থাৎই কি কেবল ফুলের গীত গাইতেছিল? তেজসিংহ কখনও বালিকাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ ঘোচন করিয়া ভাবিলেন, “আমি অনর্থক রাগ করিয়াছি।”

ধীরে ধীরে বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, “না, আমি রাগ করিব না, তুই আর একটি গীত গা।”

বালিকা এবার হাসিয়া করতালি দিয়া গাইল—

“আর শুনেছ আর শুনেছ নতন কথা কই,
পুশের হইবে বিয়ে কিন্তে বাই গো থই।”

তেজসিংহ। কাহার সহিত বিবাহ হইবে?

বালিকা। কুলের আবার কার সঙ্গে বিবাহ হয়? অগ্নির সঙ্গে, আর কার সঙ্গে?

তেজসিংহ। ভীলবালা। তোর হাড়ে হাড়ে যুঁজি। পুষ্পকুমারীর সহিত কাহার বিবাহ হইবে, তাহা কিছু শুনিয়াছিস?

বালিকা। তাহা কি জানি? তুমি কি শুনিয়াছ?

তেজসিংহ। পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জয়-সিংহের এষবার সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কত তাহাতে সন্মত হন নাই, সে বিবাহ অপেক্ষা যত্ন পণ করিয়াছিলেন।

বালিকা। তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। কি, শুমিস্ নাই?

বালিকা। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা শুনি নাই।

তেজসিংহ। তবে কি শুনিয়াছিস?

বালিকা। শুনিয়াছি, দুর্জয়সিংহের সহিত শোন একটি মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সূর্যামহল অধিকার করিল, আর—

তেজসিংহ। আর কি?

বালিকা। কিছু নয়।

তেজসিংহ। আর কি বল, না হইলে প্রহার করিব।

বালিকা। আর সেই কত্কা সেই দুর্গ হইতে পলাইবার আগে নাকি বরকে অনু-রীর দাম করিয়াছিল।

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির জ্বালা অগ্নির উঠিল। কিন্তু তিনি রাগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, “তুই বন্য অস্ত্রা ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব? সম্মুখ হইতে ছুর হ।” সজোরে বালিকাকে চেলিয়া হুদের বলে ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া স্তব্ধ করিয়া হুদ পার হইল। অপর পার্শ্বে সিন্ধু-কেশে সিন্ধু-বসনে একটি তুঙ্গ শিলা-খণ্ডে দাঁড়াইয়া সেই নৈশ-আকাশ অনিত করিয়া গীত গাইতে লাগিল।

“আর শুনেছ আর শুনেছ নতন কথা কই,

পুষ্পের হইবে বিয়ে আনতে যাই বই।

যেহে এল বায়ুদাম, গায়ে পরিমল সাজ,
অগ্নির মাথায় গড়ে বাজ, শুনে কি না সই।”

তেজসিংহ উঠিলেন। দুই বালিকার অলীক কথায় তেজসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জয়-সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, সে প্রবাদ ভীল-বালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্যে সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোন কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। কিন্তু অচ্য ভীল-কস্তার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল, সে সন্দেহ ক্রমে হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল।

অন্ধকারে সেই পর্বত-পথ দিগময়ন করিতে লাগিলেন। ভীল-বালার গীত এখনও তাহার কর্ণে শাক্ত হইতেছিল, তাহার মন অস্থির ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কি সত্য?

তবে কি পুষ্প বর্থাই দুর্জয়সিংহের অনুরক্তা হইয়াছেন, দুর্জয়সিংহকে অনুরীর দান করিয়াছেন, তেজসিংহকে ভুলিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

আবার তিনি পুষ্পের পুষ্পবিনিমিত্ত মুখ-খানি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই যান নয়ন, ঈষত্তর শুভ্র, শাদ ললাট ও সরল কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। পুষ্প

কখন, কখন, কখনও সভ্যলজ্জন করিবে না, তেজসিংহ, কেন আশঙ্কা করিতেছ ?

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিবর মনে জাগরিত হইতে লাগিল, হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল, সন্দেশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, হৃদয় উত্তর ও বিপর্য্যত হইতে লাগিল ।

পর্কতের সুস্বাদুতা যেমন ধীরে ধীরে উদ্ভিত হইতে থাকে, ত্রয়ে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্কতকে আবৃত করে, গগনের সূর্য্যও প্রকৃতির প্রাসন্ন মুখচ্ছবি আবৃত করে, অবশেষে দীর্ঘবিলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর অন্ধকারময় করে, সেইরূপ সন্দেশ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত তেজসিংহের প্রাসন্ন উন্নত হৃদয়কে আবৃত করিল ; হৃদয়ের সে অন্ধকার দূর্ভেদ, স্তম্ভের পরিষ্কার দীপ্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া পেল ।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

সত্যপালন ।

শা সম্রাট্যভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী ।

শবোৎসঙ্গে নিহিতিসকলং বহুং যেন প্রাণম্ ।
যেবদন্তম্ ।

মিগ্রহর রজনীতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পুষ্পো-
জ্জানে পাঠক পুশ্পকুমারীকে একবার দেখিয়া-
ছেন, কিন্তু সেদিন চারণদেব তথার উপ-
স্থিত ছিলেন, সুতরাং পুশ্পকুমারী পরিচয়
দান করেন নাই । যদি পরিচয় জানিবার
অন্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, চন্দ্র, অস্ত নিরা-
লয়ে বাইয়া সে লাভ্যময়ীর হিত আলাপ
করিব । অস্ত তিনি মহারাজার সহচরীরূপে
রাজপরিবারের সহিত বাস করিতেছেন ।

পুশ্পকুমারী রাজপুত-বালিকা । পুষ্পের
পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রায়

ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহে নিজ পুত্রের
সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে বীড়িত হইয়া
ছিলেন । দশমবর্ষীয় বালক ও সপ্তমবর্ষীয়া
বালিকার একদিন সাক্ষাৎ হইল ; সেই দিন
একে অস্তকে মনে মনে বরণ করিলেন ।
বিবাহের বাক্যদান হইল, সৎক স্থির হইল,
সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, শুভকাৰ্য্যের
দিনস্থির হইল, এরূপ সময়ে দিল্লীর আকবর
আগিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন ।
সে নগর-রক্ষার্থ পুষ্পের পিতা ও তিলকসিংহ
উভয়েই হত হইলেন । কিছু দিন পরে তেজ-
সিংহ শৈশুক দুর্গ হইতে দুরীকৃত হইয়া
ভীলদিগের সहाয়তা গ্রহণ করিলেন ।

সপ্তমবর্ষের বালিকা ও দশমবর্ষের বালক
প্রণয়ের কি জানিবে ? কিন্তু রাজপুতগণ
বাল্যকাল হইতে সত্যপালন করিতে শিখিত,
রাজপুতবালিকা সত্য বিশ্বস্ত হইলেন না ।
একদিনদুই সেই বালকের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা
কয়েক দিনের মধ্যে বিশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু
সপ্তমবর্ষে বে সত্য করিয়াছিলেন, জীবনে
তাহা বিশ্বস্ত হইলেন না ।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অব-
মাননা করিবার জন্য দুর্জয়সিংহ তেজসিংহের
বাগদস্তা বধুকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার
মানস করিলেন । পিতার মৃত্যুর পর পুশ্প-
কুমারীর রক্ষক কেহ ছিল না, অথবা বাহারা
ছিলেন, তাঁহারা দুর্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও
অর্থভুক । তাঁহারাও দুর্জয়সিংহকে বিবাহ
করিবার জন্য বালিকাকে অত্যাচার করিতে
লাগিলেন । বালিকা উত্তর পাঠাইলেন,
“আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা,
পুরুষের অস্পর্শনীয়া ।” সেই দিন হইতে
বালিকা সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন ।
তখন পুষ্পের বয়স্ক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র ।

তদবধৌ শারীরিক কিছু কিছু পরি-

প্রথম ও চোঁটার আবাদিগের শরীর সবল হয়, দৃঢ়বদ্ধ হয়। তৎকালপর্যন্তে কিছু ক্রেশ, চিন্তা ও শৌকে আবাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রস্তুতি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক শৈলীগুলি যেন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্রেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ত আর নাই, মানসিক দুর্বলতার নিপুণতর চিকিৎসক নাই। চিন্তা লৌহকরকারের তায় বার বার নির্দয় ও সবল আঘাত করিয়া হৃদয়কে গঠিত করে, সে আঘাতে আমরা কাতর হই, আত্মনাদ করি, কিন্তু কর্তব্যকার নির্দয়, আপন কার্য্য বিষ্মত হয় না। পরিশেষে আমাদের মন গঠিত হয়, হৃদয় গঠিত হয়, প্রবৃত্তিগুলি স্থিরীকৃত হয়, প্রতিজ্ঞা লৌহবৎ দৃঢ় হয়। যিনি বাল্যকাল হইতে অন্তের চোঁটার পালিত, অন্তের হস্তধারা নীত, বাহ্যকে কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই, ক্রেশ অল্পভব করিতে হয় নাই, তাঁহার মন এখনও গঠিত হয় নাই, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয় নাই; তাঁহার সুখ ও অজ্ঞানতা আমি হিংসা করি না।

বাল্যকালে ক্রেশ পড়িয়া কোমল রাজপুতবালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীরের ভৎসনা ও ভয়-প্রদর্শনে, পরিচারিকাদিগের অত্যাচারে, দুর্জয়সিংহের দূতাদিগের প্রলোভনে বালিকার হৃদয় বিচলিত হইল না, বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। লোকে যত দুর্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার অতুলন করিতে লাগিল, বালিকা ততই অধিকতর ভক্তিতাবে সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত, বীর পুরুষের নামমাত্র পূজা করিতে লাগিলেন। আত্মীরের ক্রকুটি ও বন্ধুজনের ভৎসনা নীরবে সহ করিতে শিখিলেন, নিরানন্দ গৃহে ভাল করার ক্রেশ সহ করিতে

শিখিলেন, আপন প্রতিজ্ঞা আপন হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন। বহু পরিজন-মধ্যে বালিকা একাকিনী বিচরণ করিতেন, একাকিনী চিন্তা করিতেন, একাকিনী পুশ্চরন করিতেন ও হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতেন। অভ্যাগে আবাদিগের কোন্ ক্রেশ না সহ হয়? পুশ্চুমারী পরের স্নেহ আর চাহিতেন না, পরের মিষ্টকথা চাহিতেন না, পরের ক্রকুটি বা মর্মেভেরী রহস্তে তাঁহার লৌহবৎ হৃদয়ে আর ক্রেশ হইত না, বিধবাবেশধারিণী নবীনা রাজপুতবালা এইরূপে বাল্যকালের সত্যপালন করিতেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত একুটিত ও প্রজ্বলিত হয়; সকলে ভৎসনা ও বিদ্বেষের মধ্যে পিতৃ-মাতৃ-হীনা ও বন্ধুহীনা রাজপুত-বালিকার হির অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

দুর্জয়সিংহ অনেক প্রলোভন দেখাইয়া পুনরায় পুশ্চুমারীর হস্ত প্রার্থনা করিলেন। দ্বিতী শতবর্ষে দুর্জয়সিংহের বশ, পরাক্রম ও বিপুল অর্থের কথা বর্ণনা করিল। পুশ্চুমারী সমস্ত শুনিলেন, হিরষ্যের উত্তর করিলেন, “আমি বিধবা, পুরুষের অঙ্গস্পর্শ নীয়া।”

পুশ্চের আত্মীরগণ এ কথা শুনিয়া অতিশয় রাগাধিত হইলেন, পুশ্চকে অত্যাচারে ও ভয় প্রদর্শন করিলেন, বালিকা অধিকদিন অবিবাহিত থাকিলে নিফলক ফুলে কলঙ্ক হইবে বুঝাইলেন। পুশ্চুমারী সমস্ত শুনিলেন, হিরষ্যের উত্তর করিলেন, “আমি বিধবা, পুরুষের অঙ্গস্পর্শ নীয়া।”

অবশেষে পুশ্চের আত্মীরদিগের সহিত বড় বন্দ করিয়া দুর্জয়সিংহ পুশ্চকে স্বর্গ্যমহলে আনাইলেন। পুশ্চুমারী দুর্জয়সিংহের অভ্যর্থনা বুঝিয়া বদমাশ পাঠাইলেন, “চন্দা-

ওয়েংরাক ! তুমিরাহি, আগনি অতিশয়
বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন ; কিন্তু
পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্বে আত্ম-
বাতিনী হইবে, তাহাও কি নিবারণ করিতে
পারিবেন ? তুমিরাহি, ভিলকসিংহের বিধ-
বাকে হত্যা করিয়াছেন, আর একজন নারী-
হত্যার পাতকে পাতকী হইবেন ?”

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

মেঘগজ্জ্বলন ।

হিন্দুক কিং একং বেপসি ।

অভিজ্ঞানহুতম্ ।

কয়েক বৎসর অবধি পুষ্প এইরূপে
একাকিনী চিন্তা করিতেন । সহসা একদিন
নিশীথে স্বপ্নের স্তায় একজন চারণদেব সাক্ষাৎ
দিয়া পুষ্পকে বলিলেন, “সে অজ্ঞাত, অপরি-
চিত, বালাদৃষ্ট রাঠোর-বীর জীবিত আছেন ।
তিনি দেশের যুদ্ধ ঘূষিতেছেন, তিনি বালা-
সত্যপালন করিতেছেন ।”

স্বপ্নের স্তায় সে চারণদেব ও চারণের
গীত শ্রবণ হইয়া গেল, কিন্তু সে বার্তা পুষ্পের
হৃদয় হইতে লয় হইল না । বিধবার হৃদয়ে
নব উল্লাস জাগরিত হইল, শুষ্ক লালসার
উদ্বেক হইল । প্রাতঃকালের প্রথম আলোক-
চ্ছটার বেরূপ সেই উদ্ভানের পুষ্পগুলি বিক-
সিত হইত, সেইরূপ চারণবার্তার বিধবার
হৃদয়-নিহিত আশা, নিহিত ভাব, নিহিত
লালসা সহসা প্রস্ফুটিত হইল ।

যে অজ্ঞাত বালাস্বামীর নাম জপিয়া
এতদিন সত্যপালন করিয়াছেন, তিনি জীবিত
আছেন । তিনি নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছেন,
বালাসত্য তুলেন নাই । পুষ্পকুমারী সেই
বালাকালের কথা শ্রবণ করিবার চেষ্টা করি-

তেন, সেই বালাস্বামীর মুখমণ্ডল শ্রবণ
করিবার চেষ্টা করিতেন, এখন যিনি বলিষ্ট
হইয়া দেশের যুদ্ধ ঘূষিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ
অবয়ব ও মুখকান্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা
করিতেন । বালাদৃষ্ট মুখমণ্ডল শ্রবণপথে
আসিত না অথবা অনেককণ চিন্তা করিলে
কিছু কিছু মনে পড়িত । একখানি উত্তর
মুখমণ্ডল, প্রশস্ত লগাট, উন্নত দেবকান্তি
শরীর শ্রবণে আসিত । কল্পনা হইত, যেন
চন্দ্রালোকে সেই বীর গণ্ডায়মান হইয়া
পুষ্পের হস্তধারণ করিয়াছেন, যেন বীরের
উচ্চ নিশ্বাস, বীরের তপ্ত ওষ্ঠ সেই হৃৎস্পর্শ
করিল । এ যে সেই চারণদেবের মূর্তি !

পুষ্প বিশ্বাসবাতিনী নহেন, মনের নিহিত
কল্পনায় সেই অজ্ঞাত স্বামী ভিন্ন আর কাহা-
রও চিন্তা ছিল না । তথাপি কল্পনা অতিশয়
মায়াবিনী ; যে স্থানের কথা বার বার শুনি,
সে স্থান না দেখিলেও কল্পনাবলে হারসন্ধ্যা
যেন সৃষ্ট হয়, অদৃষ্ট পুরুষের কৃপা ধ্যান
করি, কল্পনাবলে তাহার একটি চিত্র মনে
সৃষ্ট হয় । সেই পুরুষের কল্পিত একখানি
আকৃতি মনের সমুখে থাকে, অপরিচিতের
মানসিক যে সমস্ত গুণ আমরা জানি, তদু-
দারী একখানি মুখচ্ছবি গঠন করিয়া লই-
পুষ্প যখন অজ্ঞাত ও বালাস্বামীর কথা মনে
করিতেন, চারণের দেবতুল্য মুখকান্তি হৃদয়ে
জাগরিত হইত । তেজসিংহের অসাধারণ
বীরত্বের কথা যখন শুনিতেন, চারণের উন্নত
দীর্ঘ অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল ও দীর্ঘ বাহু
শ্রবণ হইত ! তেজসিংহের কর্তব্যের যখন
কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই চার-
ণের সঙ্গীত-বিনিমিত রজনীকান্ত মিষ্টভাষা
কর্ণকুহরে শব্দিত হইতে থাকিত । পুষ্প
অবিবাহিনী নহেন, সত্যপালনের জন্ত জগৎ
ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়াবিনী কল্পনা-

শক্তি অজ্ঞাত স্বপ্নের স্বপ্নের আকর্ষণ সহিত
বদনং দৃষ্ট চারণকালের সহিত ততই বিক-
সিত করিত। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও কি
সেই দৃষ্টির দিকে প্রেমান্বিত হইত? পুন্-
শুমারী জানেন না, আমরাও জানি না।

চাতক্য বরূপ মেঘের দিকে চাহিয়া
প্রহিয়া বিভ্রান্ত হয় না, পুন্শুমারী সেইরূপ
পূর্বতপ চাহিয়া রহিলেন, পুনরায় স্বপ্নদৃষ্ট
সেই নবীন চারণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগি-
লেন। পুন্শু চন্দ্রালোকে পমচারণ করিতেন,
নিভর রজনীতে একাকী জাগরিতা থাকি-
তেন। দিবা গেল, মাস গেল, রোপাবিনি-
মিত চন্দ্রালোকে সে নবীনমূর্তি আর দৃষ্ট
হইল না, রজনীর নিভরুতার সে স্বর্গীয়
সঙ্গীত আর শ্রুত হইল না।

আকাশে বরূপ কৃষ্ণমেঘের সহিত বিদ্যা-
প্রতা জীড়া করে, পুন্শের স্বপ্নে নৈরাশের
সহিত আশা সেইরূপ খেলা করিত। কিন্তু
কখন সে আশা বা চিন্তার কোন পরিচয়
পায় নাই, বিধবা বালায় নির্মল জ্ঞান মুখ-
বওলে কোন ভাব লক্ষিত হইত না।

সহসা সুন্দরানোর স্বর্ধ্যমল আক্রমণ
করিল, নিন্দে অপরিচিত ভীলবোদ্ধার দ্বারা
পুন্শুমারী অন্তহানে নীত হইলেন। তাহার
পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে পুন্শু কিরিতে
লাগিলেন। ভীমচাঁদের পাল হইতে জাউ-
রায় খনিতে, তাহার পর কখন কন্দরে, কখন
রহবরে, কখন উপত্যকার, কখন চাওরন্দ-দুর্গে
বাস করিতে লাগিলেন। এখন বৃদ্ধ কান্ড
হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রাসাদ
তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতেন,
চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া, এখনও
তাপসের ক্রেশ সত করিয়া, প্রাসাদ তুচ্ছ
করিয়া, কুটীরে বাস করিতেন, রাজরাজী ও
রাজবধু সেই কুটীরে থাকিতেন, রাতশিওগণ

সেই কুটীরের চারিদিকে জীড়া করিত। বস-
তিন চিতোর উদ্ধার না হয়, তত দিন
প্রতাপসিংহ অন্ত আবাসে বাস করিবেন না।
প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার
হইল না; ইতিহাসে লিখিত আছে, প্রতাপ
সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন।

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী
বহিয়া বাইত, পুন্শুমারী তথায় সর্বদা জল
আনিতে বাইতেন। অল্প রজনীতে সেই
স্থানে জল আনিতে বাইলেন ও কলস
রাখিয়া নীলমেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে
নিরীক্ষণ করিলেন। অনেককণ একাকী সেই
দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার স্বপ্নের
চিন্তা আমরা কিরূপে অদ্ভুত করিব?

মেঘ গর্জন করিল। সহসা পুন্শুমারীর
স্বপ্নে কাঁপিয়া উঠিল কেন?—কে বলিবে,
কি জন্ত?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

হৃদয় হৃদয় অদৃশ্য অদৃশ্য।
অভিজ্ঞানসুপ্তিক।

সহসা শুভ্র হইতে পুন্শু একটি সঙ্গীত-
ধ্বনি শুনিলেন। সে সঙ্গীতে পুন্শের স্বপ্ন
আলোড়িত করিল, পূর্বস্মৃতি জাগরিত
করিল। আশার পুন্শুমারীর স্বপ্ন বিকসিত
হইল, আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে স্বপ্ন
ভাসিল, শুভপ্রায় লতিকা ঘন আর একবার
মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

গীত।

“বর্ষাকালে আকাশে শ্রবণ ইন্দ্রধনু
দৃষ্ট হয়, তাহার কি কখনীর কান্দি, কি
অনির্বচনীয় রূপ! সে কণহারা ইন্দ্রধনু

স্বামীকে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না !

“বজ্রগতি কালসর্প কি স্তম্ভের উজ্জল চূড়া ধারণ করে । সে খল সর্পের সরল-তার বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা সুবেশ-বারিগী নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না !

“জগতে অস্বামী দ্রব্যের স্বামীকে প্রত্যাহার কর ; চপলা বিদ্যারতার করিও প্রত্যাহার কর, তবে অস্তিত্ব রেখার স্বামীকে বিশ্বাস কর ; উদ্ধার স্বামীকে বিশ্বাস কর ; কিন্তু নারীর সত্যে প্রত্যাহার করিও না !

“জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মারাবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীভূত কর, তাহার উপর নাম লিখ, ‘নারীর সত্যপালন’ ।”

চারণের উগ্রস্বর শুনিয়া পুষ্প স্তম্ভিত হইলেন । ধীর ধীরে চারণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ গীত দেবার মনোনীত হইয়াছে ?”

পুষ্প চকিতের স্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন । অনেকক্ষণ পর বলিলেন, “চারণদেব, এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না, পূর্বদিনে আপনি এরূপ গীত গান নাই ।”

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চারণের হৃদয় হইল না । তিনি কহিলেন, “গীত আমার নহে, আমি বেকুপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই ।”

পুষ্প । বিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন ?

চারণ । কুশলে নাই, তিনি কৃষ্ণপ্রে অতিশয় প্রসীড়িত হইয়াছেন । আপনাকে যে নিদর্শনটি দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন ।

পুষ্প এবার স্বার্থাভীতা হইলেন । তিনি চারণদত্ত অঙ্গুরীয়টি হৃদয়ে রাখিতেন ; সর্বদা

দেখিতেন, সর্বদা পরিভেন, পুনরায় হৃদয়ে রাখিতেন । কিন্তু যে দিন তিনি ভীষ্মচৌর ভীলের গহ্বরে নীতা হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টি তিনি বঁ ছিরা পান নাই ।

চারণ কল্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে অঙ্গুরীয়টি কোথায় ?”

পুষ্প তব ও নিকটবর্তী ।

অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে অঙ্গুরীয়টি কোথায় ?”

অক্ষুটস্বরে পুষ্প কহিলেন, “চারণদেব, অনবধানতা মার্জনা করুন, বীরপুরুষকে জানাইবেন—”

চারণ গর্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটি করিলেন, “সে অঙ্গুরীয়টি কোথায় ?”

পুষ্প । আমি অভাগিনী, সে অঙ্গুরীয়টি হারাইয়াছি ।

চারণ । অভাগিনী ! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেজসিংহের প্রাণও এ জীবনের মত হারাইয়াছে ।

বিদ্যৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নর-নের অদৃশ্য হইলেন ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

পৈতৃকদুর্গে প্রবেশ ।

ততো ভেরীমদম্ভাঃ পূর্ণবানাক্ সিংহম্ ।

শম্ভবেনিখনো যঃ সৎবত্বাচ্ছতোপমঃ ॥”

রাবারণম্ ।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় তেজসিংহ ভীমগড়-দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন । মনে মনে কহিলেন, “চপলা নারীর জন্য বহুদিন ব্যর্থ কাটাইয়াছি, অভ্যর্থনা প্রস্তুত হইব ।”

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্ত সজ্জিত হইল। এ নিম্নক নিম্নে অন্তর্যামী হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে বাইরা কহিলেন, “বহুগণ, বৈরনির্ব্যাতনের সময় উপস্থিত, আমার সহিত অগ্রসর হও।”

বাহারা তেজসিংহের সে গর্জন শুনি, সে নিম্নে তাহার লগাটে জুড়ি দেখিল, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা শ্রবণ হইল। নিঃশব্দে সকলে সূর্য্যমহল-দুর্গের দিকে চলিল।

পর্কত ও উপত্যকার মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে নিঃশব্দে সৈন্তগণ চলিতে লাগিল। কখন জলনের ভিতর দিয়া, কখন হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, কখন অন্ধকারময় উপত্যকার নীচে দিয়া, কখন পর্কতের উপর দিয়া তেজসিংহের সৈন্ত চলিল। বতকণ সৈন্ত চলিতেছিল, তেজসিংহের মুখে কেহ একটি কথা শ্রবণ করে নাই। সকলে বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্রের হৃদয়ে রোমানল জাগরিত হইয়াছে, অষ্ট দুর্জয়সিংহের রক্ষা নাই।

অনেক পর্কত ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের জায় দুর্গকে দারণ করিয়াছে, সেই পর্কত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে চিত্রের জায় লক্ষিত হইতেছে। চারিদিকে কেবল পর্কতমালা ও অনন্ত পাদপঞ্জেরী দেখা বাইতেছে, নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহল-দুর্গ নিস্তর, জগৎ নিস্তর। কণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন, “পিতা! অমৃত্যু দিন, অষ্টাব্দ বর্ষ নির্কাসনের পর আপপার পুত্র অস্ত দুর্গে প্রবেশ করিবে।”

নিঃশব্দে সৈন্তগণ সূর্য্যমহলতলে উপ-

পর্কতে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন। তেজসিংহ জুড়ি করিয়া কহিলেন, “পিতার দুর্গে পুত্র তরুরবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত, রাজপুত যুগ পুত্রের সহিত বৃদ্ধ করে না।”

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন, ভেরীর শব্দ সে পর্কত ও উপত্যকার বার বার শ্রবিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল। পরে তেজসিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “অস্ত তিলকসিংহের পুত্র পিতার দুর্গে প্রবেশ করিবেন, বাহার সাধ্য পথ রোধ কর।”

বাহারা সে ভেরীশব্দ, সে গর্জিত কথা শুনি, তাহারা বুঝিল, অস্ত তেজসিংহের গতিরোধ করা মাছুষের সাধ্যাতীত। দুর্গ-প্রহরিগণ নীচের শব্দ শুনিতে পাইল, লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিপীলিকাসারের জায় সৈন্ত-শ্রেণী দুর্গে আরোহণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ তাহারা দুর্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গ-প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, যুদ্ধ-ধ্বজের মধ্যে বুঝিলেন, প্রাচীরের অন্নদ্বি পূর্বে যে সত্য করিয়াছিলেন, অস্ত তাহার পালন করিতে আসিয়াছেন। রোষে মনে মনে বলিলেন, “তিলকসিংহের পুত্র! বহুকাল হইতে এই দিন আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আজ হৃদয় শান্ত হইবে, তুমি কি আমি অস্ত জীবন ত্যাগ করিব। এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।”

দুর্জয়সিংহের আদেশে বিশত বোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইল। অবশিষ্ট প্রাচীরের ভিতর রহিল। প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জলিল, দুর্গশিখরের এই আলোক বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, নৈশ গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, রিয়া যুদ্ধে আর আরোহণ সম্ভব নহে। তখন বজ্রনাথে যুদ্ধের আদেশ দিলেন, স্বয়ং সমস্ত সৈন্তের অগ্রযাত্রী হইয়া বর্ণা ও অসিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সে স্থানে উপরের সৈন্ত নীচস্থ বহু সৈন্তের গতিরোধ করিতে পারিত; কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। তাঁহার রাঠোর-সেনাগণ যেক্রম দুর্জয়নীর ও অপ্রতি-হতভেদে দুর্জয়সিংহের সেনাকে আক্রমণ করিল, তাহা দেখিয়া উপরিস্থ দুর্গবাসিগণ বিস্মিত হইল। যুদ্ধের মধ্যে প্রচণ্ডনাদ গগনে উখিত হইল, অল্পক্ষণমধ্যে দ্বিশত চন্দাওরং সৈন্ত বায়ুত্যাগিত পত্রের স্তায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে হত হইল, অনেকে পরিত হইতে উপলথণ্ডের দ্বার নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অবশিষ্ট দুর্গ-প্রাচীরাদিমুখে পলায়ন করিল। শবরাশির উপর দিয়া তেজসিংহের দুর্জয়নীর রাঠোর-সেনা হুকার-শব্দে অগ্রসর হইল।

দুর্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন, নীরবে সটসঙ্গে দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার দম্পপাতি গুপ্তের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। তিনি কহিলেন, “তিলকসিংহের পুত্র পিতার দ্বার যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জয়-সিংহও দুর্বল হস্তে অসিধারণ করে না। আইস, বীরপুত্র, আজি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইব।”

যুদ্ধের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচী-রের নিকট আসিল। তখন প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাঠোরগণ লক্ষ দিয়া প্রাচীর উল্ল-ঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইল, চন্দাওরংগণ বর্শাচালন দ্বারা তাহাদিগের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তেজসিংহের কতক সৈন্ত

প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জয়সিংহের কতক সৈন্ত উৎসাহে প্রাচীর হইতে লক্ষ দিয়া নীচের আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রু যিহা বিমিশ্রিত হইয়া গেল, কথির-স্রোত বহিতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেনাগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড যুদ্ধনায়ে আহতদিগের আর্ন্তনাদ শ্রুত হইল। বেন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দাওরং-দিগের ক্ষুরে আগ্রিত হইল, বেন সেই বৈর-ভাবে ও জিহাংসার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চন্দা-ওরং ও রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পরিত্যক্ত করিল। সালুয়া ও দুর্জয়সিংহের নাম বার বার ভীষণ হুকারে উচ্চারিত হইতে লাগিল, সে হুকার ডুবাইয়া রাঠোরগণ জয়-মন্ত্র ও তিলকসিংহের নাম করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে লাগিল। নিশাকালে সে যুদ্ধরবে চারিদিকে পরিত্যক্ত উপত্যকাবাসি-গণ চমকিত হইল; বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অত্যন্ত পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

প্রাচীরপার্শ্বে এইরূপ সময়-তরঙ্গ উথ-লিতে লাগিল, যুদ্ধের নাদ গগনে উখিত হইতে লাগিল। তেজসিংহ সে যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে অন্তরবলে প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ বৃক্ষের কাঠে নির্মিত, কিন্তু অত্যন্ত রক্ষা নাই। তেজসিংহের ঘন ঘন কুঠার-আঘাতে সে দ্বার কম্পিত হইতেছিল। অচিরে প্রচণ্ড শব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, মহাকোলাহলে রাঠোর-সৈন্তগণ গর্জন করিয়া উঠিল।

সেই যুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দুর্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গরক্ষা হইবে না; সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্ন-দ্বারের নিকট আসিয়া

শত্রুর পথরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন।
এতদূরদৃষ্টিকে ভুগ্নের সমস্ত সাহসী ও বল-
বান্ চন্দাওরং-বোদ্ধা অড় হইল। তেজসিংহও
ভগ্নদ্বারের উপর দণ্ডারমান হইয়া পথ পরি-
ভারের চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সহযোগী
রাঠোরগণও সে চেষ্টার কান্ত ছিল না।

মুহুর্তের মধ্যে বোধ হইল যেন, দুই দিক
হইতে সমুদ্রের দুইটি উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া
পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে
আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উখিত হইল।
কণেক উভয় পক্ষ পরস্পরের বেগে যেন তরু
হইয়া রহিল, কেহ অগ্রসর হইতে পারে না,
কেহ পশ্চাতে হাইবে না। অসংখ্য শব্দ সেই
দ্বারের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল, শব্দের
উপর দণ্ডারমান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওরং-
গণ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ভুজঙ্গসিংহ সেই দিন যথার্থ বোদ্ধা নাম
রাখিলেন। তাঁহার শরীর রক্তাশ্রুত, নয়ন-
ধর অলস্ত। তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞার সে ধার-
রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রুদিগকে
প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জনে আপন
সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন।
কিন্তু তেজসিংহ অস্ত্র যেন দৈববলে বলিষ্ঠ,
তাঁহার গতি অশ্রু রোধ করা মহাবীর অসাধ্য।
অমানুষিক বলে সেই শত্রুরাশি প্রতিহত করিয়া
প্রচণ্ডনাদে সেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন।
তাঁহার চালের সম্মুখে যেন কোন মস্তবলে
মহুবাঘল হঠিয়া গেল। বীরের নয়নধর অলি-
ভেছে, উকীষ ও শরীর রুধিরাক্ত, দক্ষিণহস্তে
শালবৃক্ষের স্তায় দীর্ঘবর্শা কাঁপাইয়া তিলক-
সিংহের পুত্র গৈতুক ভুগ্নে প্রবেশ করিলেন।

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ
কম্পিত হইল, রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ
পরে সূর্য্যমুখলে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—

পুত্রশোক-বিমোচন।

সদাশং বুঝলানাক পরিচানাক নিঃশব্দে:

পরশাং নজবাতিত কুতিভা: সন্তানগণা:

রাধারপা

যখন ভুগ্নদ্বার ভঙ্গ হইল, যখন রাঠোরগণ
মহাকোলাহলে ভুগ্নে প্রবেশ করিল, তখন
ভুজঙ্গসিংহ এক মুহুর্ত চিন্তা করিলেন। বীরে
বীরে ললাটের ঘেদ ও রক্ত অগ্নি- কান-
লেন, রাঠোর ও চন্দাওরং-র যুদ্ধ
মুহুর্তের জন্ত নিরীক্ষণ করিলেন।

কণেক দৃষ্টি করিয়া স্থির হইয়া তেজ-
সিংহকে কহিলেন, “রাঠোরবীর! তোহার
যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমা পিতার
স্মার ঐ বাহতে অসাধারণ শক্তি ধা কর।
কিন্তু এবার সাবধান! চন্দা- গণ!
আমাদের ভুগ্ন গিয়াছে, কিন্তু মা বার
নাই; রাজপুতমান রক্ষা কর, চন্দাওরং-কুলের
মান তোমাদের হস্তে।”

এই কথা শুনিয়া চন্দাওরংগণ ভীষণ-
গর্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল।
সকলে বৃষিল, এখনও রাঠোরদিগের
বিজয়-সংলগ্ন, চন্দাওরং প্রাণ দিবে, কিন্তু
অস্ত্র যুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার করিবে না।

নৈরাশ-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন ভগ্নসেতু
জলতরঙ্গের স্তায় এবার চন্দাওরংগণ রাঠো-
রের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর
হইতে পারিল না, সমুদ্রতরঙ্গসম চন্দাওরং-
তরঙ্গের সম্মুখে ক্রমে হঠিতে লাগিল।

অস্ত্রবর্ষা তেজসিংহ গোবে গর্জন
করিয়া আপন দীর্ঘবর্শা চালনা করিতে
লাগিলেন। সে গর্জনে বার বার পরিত-ভুগ্ন

কল্পিত হইল, কিন্তু মরণে কৃতসংকল্প চন্দাওরং-বীরগণ কল্পিত হইল না। ক্রমে রাঠোরগণ হটিতে লাগিল।

রাঠোরগণ প্রভুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের ভায় ঘূষিতে লাগিল, বার বার চন্দাওরংমণ্ডলীকে বেগে আক্রমণ করিল, বার বার চন্দাওরং-বেগ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। সে বুধা চেষ্টা; সেই অঙ্গসংখ্যক কৃতসংকল্প চন্দাওরংমণ্ডলী যেন সহসা দৈববলে বলিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদিগের গতিরোধ করা মাহুকের অসাধ্য। সে গতি-রোধ হইল না, রাঠোর-সৈন্য হটিতে লাগিল।

“তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবে, সৈন্যগণ! পশ্চাদ্ধিকে কোথায় বাইতেছ?”—এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লক্ষ রিয়া চন্দাওরংমণ্ডলীর উপর পড়িলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট অঙ্গসংখ্যক চন্দাওরং তখন হারথার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল, রণ সাফ হইল।

শোণিতাজ-কলেবর প্রাচীন দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “তেজসিংহ! আমাব সঙ্কল্পসাধন হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় বশবী হও, বুদ্ধের অন্য আশীর্বাদ নাই।”

দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল! দুর্জয়সিংহের অব্যর্থ বর্শার তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

বুদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওরং প্রায় সকলে হত হইয়াছে, কেবল দুর্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় বোদ্ধা জীবিত আছেন। দুর্জয়সিংহের খড়্গ ভগ্ন, লগাট কধিরাজ, নয়ন হইতে অগ্নিকুলির বহির্গত হইতেছে;

চন্দাওরংবীর তখনও ঘূষিতে প্রবৃত্ত, দুর্গ-শিগাঙ্গা তখনও নিবাসিত হয় নাই, জীবিত থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে, তেজসিংহের পুর্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিহাংসার কিছুপ্রায় দেখিয়া তেজসিংহ পুনরায় উচ্চনাদে কহিলেন, “দুর্জয়সিংহের শরীরে যিনি অন্ত্রবর্ষণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।”

রাঠোরগণ কান্ড হইল। সেই নিমিত্ত-তার মধ্যে কেবল একটি খর শুনা গেল,— “প্রভুর আদেশ শিরোধার্য; কিন্তু জলন্ত অগ্নির ন্যায় পুঞ্জশোক এখনও হৃদয়ে অজিতোছে, ঐ আমার পুত্রহত্যা।”

নিমেষমধ্যে জিহাংসা-তাক্তিত বুদ্ধ গোহুলদাস লক্ষ দিয়া দুর্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল, আহত দুর্জয়সিংহও ভগ্ন খড়্গ দ্বারা গোহুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, দুইটি মৃত্যুমেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। এত দিনে গোহুলদাসের পুঞ্জশোক-বমোচন হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গুরীয় ও রত্ন।

অদ্য প্রভাত্যবনভাঙ্গি। ভবান্নি দাসঃ।
হুয়ারসম্ভবম্।

পাঠক! চল, এ যুদ্ধের ভীষণ গণগোল হইতে আমরা মহারাজার কুঠীতে বাই, তথায় অভাগিনী পুন্নের সহিত দেখা হইবে।

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন। সে

সর্বসহ নারীর লগাট শুধুমাত্র পূর্ববৎ পরি-
 কার, নয়নস্বয় পূর্ববৎ স্থির। বিষয় বাস্তবায়
 কেহ পুষ্পকে একবিন্দু অক্লান্ত করিতে
 দেখেন নাই, কাছারও নিকট মেহ বাচনা
 করিতে দেখেন নাই। একাকিনী যে বনে
 একদিন মুখস্বয় দেখিয়াছেন, এখন সে স্বপ্ন
 লীন হইয়াছে, জীবনের আশা লুপ্ত হইয়াছে,
 জগতের সমস্ত মুখ নির্বাণ হইয়াছে, এখনও
 একাকিনী জগতের নৈরাশ্র বহন করিতে-
 ছেন। কাহারও মেহ চাহেন না, কাহারও
 সহায়ত্ব চাহেন না।

বালিকার মুখস্বয় সেইরূপ পরিহার—
 পরিহার, কিন্তু ঐশ্বর্য পাণ্ডুর। নয়ন সেই-
 রূপ স্থির, কিন্তু ঐশ্বর্য কালিমাবেষ্টিত।
 মেহের চক্ষু বায়া কেহ সে মুখখানি দেখিলে
 বুঝিতে পারিত, কোন গভীর অব্যক্ত চিন্তা
 রমণীর পরিহার মুখস্বয়লের উপর ছায়া স্তম্ভ
 করিয়াছে। কিন্তু বাল্যকাল অবধি মেহ-
 ভূষ্টিতে সে মুখখানি কেহ দেখে নাই।

পুষ্প সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে নদীকূলে
 আসিতেছেন, কণ্ঠে গমন করিয়া দেখি-
 লেন, পশ্চাতে ভীলকণ্ঠ। পুষ্প কহিলেন,
 “বালিকা, তোমার পিতা মহারাজীর বিপ-
 দেয় সময় আমাদিগকে স্থান দিয়াছিল, তাহা
 মহারাণা কখনও ভুলিবেন না। তুমি কি
 রাজ্যকে দেখিতে আসিয়াছ?”

বালিকা। না দেবি, এই নদীকূলে
 একটি চাপাফুল লইতে আসিয়াছি, আমাকে
 একটি ফুল দিবে?

পুষ্প। হাঁ, লইয়া যাও।

বালিকা। দেবি। তোমার মুখখানি
 শালা কেন?

পুষ্প। কৈ, না।

বালিকা। আমি জানি।

পুষ্প। কি জান?

বালিকা। তোমার মুখখানি শালা
 কেন, জানি।

পুষ্প। কেন?

বালিকা। কোন দ্রব্য হারা হইয়াছে।

পুষ্প। কি দ্রব্য?

বালিকা। এই সোনার কোন গহনা,
 হার কি বালা, কি আংটি।

পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে
 বলিলেন, “হাঁ বালিকা, আংটি আংটি
 হারা হইয়াছি, তার সঙ্গে সঙ্গে একটি রত্নও
 হারা হইয়াছি।”

বালিকা। তাহার জন্ম তুঃখ কেন?
 একটি আংটি গিয়াছে, অল্প একটি হইবে।

পুষ্প। অঙ্গুরীর গেলে অঙ্গুরীর হয়,
 কিন্তু যে রত্নটি হারা হইয়াছে, তাহা এ জীবনে
 আর পাইব না।

বালিকা। কি রত্ন পুষ্প? মুক্তাহার?
 বুকে পরিবার জিনিস?

পুষ্প। হাঁ বালিকা, সে বুকে পরিবার
 জিনিস; কিন্তু মুক্তা অপেক্ষা উজ্জ্বল, মুক্তা
 অপেক্ষা দুঃখী।

বালিকা। তবে কি হবে?

পুষ্প। এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ
 করিতে শিখিয়াছে, এ কতিপয় সহ্য ক'রবে।

বালিকা তীক্ষ্ণনয়নে পুষ্পের মুখের দিকে
 চাহিতেছিল, পুষ্পের চক্ষু দিয়া ধীরে ধীরে
 একবিন্দু জল বহিয়া পড়িল। বালিকা
 উদ্ধদিকে চাহিল, যেন একটি চাপাফুলের
 দিকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে
 সেও চক্ষু মুছিল।

অনেকক্ষণ সেই উদ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া
 বালিকা কহিল, “দেবি। আমাকে ঐ
 চাপাফুলটি পাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি
 তোমার রত্নটি খুঁজিয়া দিব। আমি বন-
 জন্মে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।”

ভীলকন্টার সরলতা দেখিয়া পুষ্প কোম উত্তর করিলেন না, বীরে বীরে সেই চাপা-কুলটি পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন । বালা-চলতা ত্যাগ করিয়া গভীরস্বরে ভীলকন্টা বলিল, “কলা পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন ।”

পরদিন উষার রক্তিমচ্ছটা পূর্বদিক রঞ্জিত করিয়াছে, ‘এরূপ সময়ে পুষ্পকুমারী রত্নটি ফিরিয়া পাইলেন । সূর্য্যামহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনরনে কমা প্রার্থনা করিতেছেন । পুষ্পের কীর্ণ হস্ত ছুটি সরনজলে সিন্ধু করিয়া কমা প্রার্থনা করিতেছেন ।

সবিস্ময়ে পুষ্পকুমারী দেখিলেন, সূর্য্য-মহল-দুর্গের সেই দেবকান্তি দীর্ঘকায় চারণদেব । উল্লাস ও উৎসেগে পুষ্প সংজ্ঞাহীন হইলেন, তেজসিংহ পুষ্পের নিশ্চেষ্টে কম্পিত কলেবর আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করিলেন ।

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হটল, স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-সভার উপস্থিত হইলেন, ‘স্বয়ং মহারাজী পুষ্পকুমারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গলদেশে আপনার মুক্তাহার দোলাইয়া দিলেন ।

সে স্নিগ্ধের রজনী কে বর্ণনা করিতে পারে ? সে তুষিত হৃদয়ের প্রথম স্নেহের উচ্ছ্বাস কে বর্ণিতে পারে ? তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিমিত্ত দেহ নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই সূক্ষ্ম ওষ্ঠ ঘন ঘন চুষন করিয়া কহিলেন, “পুষ্প ! পুষ্প ! একদিন তোমাকে অন্টার সন্বেহ করিয়া রেশ দিয়াছিলাম, তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ ?”

পুষ্পকুমারী সজলনরনে কহিলেন, “দেব ! তোমার দোষ যে দিন গ্রহণ করিব, সে

দিন যেন পুষ্প জীকিত না থাকে । বাড়না আমার নিষেধ দোষের উপযুক্ত শাস্তি, তোমার দত্ত প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিভাবে হারাইলাম ?”

তেজসিংহ সেই পুষ্পবিনিমিত্ত ওষ্ঠে পুন-রায় চুষন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “পুষ্প, কোভ করিও না, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই ।”

পুষ্প । আমি হারাই নাই, তবে কে হারাইল ? আহা ! এবার যদি পাই, চিরকাল এই হৃদয়ে ধারণ করি, আমার জীবনে আর কোভ থাকে না ।

তেজসিংহ । ঈশানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন ।

এই বলিয়া বীরে বীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীট বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন ; পুষ্প চকিত হইলেন, বাশ্পোৎফুল্ল-লোচনে বার বার সেই অঙ্গুরীটি চুষন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন । ‘পরে বাশ্পোৎফুল্ল-লোচনে স্বামীর নিকে চাহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না ।

তেজসিংহ পুনরায় সেই সিন্ধু ওষ্ঠ চুষন করিয়া আপন হস্ত দ্বারা পুষ্পের অঙ্গয়োচন করিয়া দিলেন । বীরে বীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে দিলেন । পুষ্প-কুমারী পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্টার প্রেরিত । সে পত্র এই,—

“তেজসিংহ ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিলে, মনে পড়ে ? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজি পায়, অঙ্গুরীয় তাহার । পুষ্পকে ও মহা-রাজ্যকে তুমি একদিন আমাদের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলে, মনে পড়ে ? সেই দি বালিকা পুষ্পের বক্ষঃস্থল রইতে সেই অঙ্গুরী লইয়াছিল । পুষ্প তখন নিদ্রিত ছিল ।

“বালিকা মনে করিল, পুষ্পের হাতে পাঁচটি অঙ্গুলী, বালিকার হাতে পাঁচটি অঙ্গুলী, পুষ্প যদি অঙ্গুরীর পরিতে পারে, বালিকা তাহার অধিকারিণী নহে কেন? যে ভীল ও রাজপুতকে গড়িয়াছে, সে ত এক প্রকারি গড়িয়াছে; তবে পুষ্প বাহার অধিকারিণী, ভীলবালা তাহার অধিকারিণী নহে কেন?”

“কিন্তু আমি বালিকা, আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। তেজসিংহ বাগানের ফুল ভালবাসেন, বনফুল ভালবাসেন না। সে দিন রাজ্যে বাগানের ফুলগুলি লইয়া বুকি ভূমি পুষ্পকে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলে? আমার বনের ফুল, এই জন্ত বুকি আমাকে কিছু দাও নাই? আমি বালিকা, সকল কথা বুঝিতে পারি না।

“রাজ সন্ধ্যার সময় পুষ্পকে দেখিতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, তার কাছে দুটি বাগানের ফুল চাহিয়া লইব। সে বলিল, তুমি তাহাকে অঙ্গুরীয়টা দিয়াছিলে, তাহার সঙ্গে একটি রত্ন দিয়াছিলে। আমি অঙ্গুরীয়টি পাইয়াছি, কে, রত্নটি ত পাই নাই।

“পুষ্প বলিল, অঙ্গুরীর অপেক্ষা রত্নটি উজ্জ্বল। তবে আমার এই অঙ্গুরীর রাখিয়া কি হইবে? এই পত্র বাহা দ্বারা পাঠাইতেছি, তাহা দ্বারা অঙ্গুরীয়টিও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে কিরাইয়া দিও।

“পুষ্পকে রত্নটি কিরাইয়া দিব বলিয়া-ছিলাম, কিন্তু সেটি অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই, আমার ভাগ্যে ভুটে নাই। যদি তুমি পুষ্পের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া থাক, পুষ্পকে কিরাইয়া দিও।”

একবার, দুইবার, তিনবার পুষ্প এই চিঠি পাঠ করিলেন; শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “নির্বোধ বালিকা, অঙ্গুরীয়টি

স্বন্দর দেখিয়াছিল, সেই জন্ত চুরি করিয়া-ছিল।”

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু গৃহের কার্য করিতে শিখিল না। সর্বদা পরীতে ও উপত্যকার বেড়াইত, আর একাকী সেই হ্রদতটে বসিয়া গান করিত। পালের অশ্রাজ্জ ভীল-নারীগণ তাহাকে গালি দিত, তাহার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চম্পনপ্রদেশে অনেক দিন অবধি নির্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্নাবে পথিকগণ কখন কখন সেই পরীতহৃদের তীরে একটি রমণীর পাণ্ডুমুখ ও উজ্জল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত, কোন বিজ্ঞানমুগ্ধা উদ্ভিগ্না প্রেতকন্তা হইবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা।

এতিকূলভাষণগতে হি বিধৌ বিকলদেবেতি বহুশাশনভা।
অবলম্বনায় দিনভট্টরত্নং ন পিণ্ডব্যতঃ করসংস্রবণি।
শিশুপালবধব।

১৫২৭ খৃঃাব্দে প্রতাপের মৃত্যু হয়।*
তাহার পর সত্ৰাট আকবর প্রায় আট

* যে ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উপস্তান ‘রচিত হইল, সেই ইতিহাস হইতে এতাদৃশিংহে সন্দেহ হই একটি মৃত্যু এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

“Portap Succeeded to the titles and renown of an illustrious house, but without a capital, without resources, his kindred and clans dispirited by reverses yet possessed of the noble spirit of his race, he

বসন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তিনি জীবিত থাকিতে যেওয়ার-বিজয়ের আর কোন উদ্ভব হয় নাই ।

স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যেওয়ার-বিজয়ের উদ্ভব করিতে সক্ষম হইলেন । প্রতাপের সপ্তদশ সন্তানের মধ্যে

meditated the recovery of Cheetore, the vindication of the honour of his house, and the restoration of its power. Elevated with his design, he hurried into conflict with his powerful antagonist nor stooped to calculate the means which were opposed to him. Accustomed to read in his country's annals the splendid deeds of his forefathers, and that Cheetore had more than once been the poison of their foes, he trusted that the revolution of fortune might co-operate with his own efforts to overturn the unstable throne of Delhi. The reasoning was as just as it was but whilst he gave a loose rein to those lofty aspirations which meditated liberly to Mewar, his crafty opponent was counteracting his views by a scheme of policy which when disclosed filled his heart with anguish. The wily Mogul arraved against Pertap his kindred in faith as well as blood. The princes of Marwar, Amber, Bikaner and even Boondi late his firm ally, took part with Akbar and upheld despotism. Nay, even his own brother, Sagariji deserted him and received as the price of his treachery, the ancient capital of his race, and the title which that possession conferred.

But the magnitude of the peril confirmed the fortitude of Pertap who vowed, in the words of the bard to make his mother's milk resplendent ; and he amply redeemed his pledge. Single-handed, for a quarter of a century, did he withstand the combined efforts of the empire ; at one time carrying destruction into the plains, at another flying from rock to rock, feeding his family from the fruits of his native hills, and rearing the nursing hero Umra amidst savage beasts and scarce less savage men, a fit heir his prowess and revenge. The bare idea that the son of Bappa Rawul should bow the head to mortal man, was insupportable ; and he spurned every over-

ture which had submission for its basis, or the degradation of uniting his family by marriage with the Tatar, though lord of countless multitudes.

"The brilliant acts he achieved during that period live in every valley ; they are enshrined in the heart of every true Rajput, and many are recorded in the annals of the conquerors. To recount them all or relate the hardships he sustained, would be to pen what they would pronounce who had not traversed the country where tradition is yet eloquent with his exploits, or conversed with the descendants of his chiefs, who cherish a recollection of the deeds of their forefathers, and melt, as they recite them in to many tears.

"It is worthy the attention of those who in finance the destinies of states in more favoured climes to estimate the intensity of feeling which could arm this prince to oppose the resources of a small principality against the then most powerful Empire of the world whose armies were more numerous and far more efficient than any ever led by the Persian against the liberties of Greece. Had Mewar possessed her. Thuoydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of the "Ten Thousand" would have yielded more diversified incidents for the historic muse than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Merwar. Undaunted heroism, inflexible fortitude that which keeps honour bright, perseverance—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition, commanding talents, unlimited means, and the favour of religious zeal, all however insufficient to contend with one unconquerable mind. There is not a pass in the Alpine Araxai that is not sanctified by some deed of Partap, some brilliant victory, oftener more made glorious of defeat. Huldighat is the Thermopylae of Mewar ! the field of

ভ্যেচ অমরসিংহ প্রতাপের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপ যুত্য়কালে অমরসিংহকে চিত্রকাল বিহার সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া বান, অমরসিংহ ও সুবু পিতার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের বতদ্বর সাধ্য, পিতার এই আদেশ পালন করিলেন, জাহাঙ্গীরের অনন্ত সৈন্তের সহিত অমরসিংহ বোড়শ বৎসর যুদ্ধে যুঝিলেন, মোগল-সৈন্ত পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা সাগরজীকে রাণপনে অভিষিক্ত করিয়া চিতোরে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মপুত্র অমরসিংহ দেশের অস্ত্র যুদ্ধ করিতেছেন, আর তিনি স্বয়ং বোগলের অধীন হইয়া চিতোর-দুর্গ রক্ষা করিতেছেন, এ চিত্তা সাগরজী সহ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মপুত্রকে চিতোর-দুর্গ দিয়া জাহাঙ্গীরের নিকট হাইয়া রোবে অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন।

এত দিনে চিতোর উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু মোগলদিগের সহিত আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। প্রতি যুদ্ধে অমরসিংহের সৈন্ত ও অর্থনাশ হইতে লাগিল, তিনি বিজয়লাভ করিয়াও যে কতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন, তাহা পূরণ করা হু:সাধ্য। মন্তব্যের বতদ্বর সাধ্য, অমরসিংহ ততদ্বর চেষ্টা করিলেন; অবশেষে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সম্রাটের পুত্র শুলতান কুর্খের নিকট তিনি অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে নিজ পুত্র করুণকে শুলতানের সহিত অজমীরে জাহাঙ্গীরের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

শুলতান কুর্খ (যিনি পরে শাহজিহান নামে ভারতবর্ষের সিংহাসনে আরোহণ

Dewair her Moeathon "Tod's Anuals and Antiquities of Rerjasthan."

করেন) যুবরাজ করুণকে লইয়া অজমীরে বাইলেন। এতদিন পর মেওয়ার-বিজয় হওয়াতে জাহাঙ্গীর অতিশয় আত্মানন্দিত হইলেন ও যুবরাজ করুণকে সাগরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজকে আপন আসনের দক্ষিণদিকে অঙ্গন দিলেন, অনেক খিল্ল ও বহুশূল্য উপহার দান করিলেন এবং সজ্জা করিয়া রাজী মুজ্জিহানের নিকট লইয়া গেলেন। মুজ্জিহান নাম অগধিখ্যাত, তিনি বেক্রপ অন্ধরী ছিলেন, সেইরূপ চক্ষুশক্তি ছিলেন। আমীকে তাঁহার প্রাণচিন্তার রূপলাবণ্য ও চতুরতার বিমোহিত করিয়া রাখিতেন, অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন নীরাহ করিতেন।

মুজ্জিহান যুবরাজ করুণকে আররের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং খিল্ল, হস্তী, ঘোটক, অসি প্রভৃতি নানাদ্রব্য দান করিয়া যুবরাজের মনস্তৃষ্টি করিলেন। সম্রাট ও রাজী উভয়ের বতদ্বর সাধ্য, যুবরাজের সম্মান করিলেন, কিন্তু প্রত পসিংহের পৌত্রের ললাট পরিষ্কার হইল না। প্রাতঃস্বরণীয় প্রতাপসিংহ স্বদেশের রাজা ছিলেন; অমরসিংহ ও করুণ এক্ষণে স্বদেশের জাঙ্গীরদার। অজমীরের মহা ধুমধামের মধ্যে, ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীর সমাদর ও সম্মানের মধ্যে করুণের জয়গল কুঞ্চিত, করুণের ললাট মেঘাচ্ছন্ন।

এইরূপ বহু সম্মান ও উপহার দিয়া সম্রাট করুণকে বিদায় দিলেন। সম্রাট স্বয়ং শিখিয়াছেন যে, তিনি করুণকে এই সাক্ষাতে সর্বশুদ্ধ দ্বাদশ লক্ষ টাকার উপহার ও একশত দশটি অশ্ব ও পাঁচটি হস্তী দিয়াছিলেন; ইহা ভিন্ন শুলতান কুর্খ অস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন।

করুণ বিদায় পাইয়া স্বদেশাভিমুখে

চলিয়া গেলেন। দিনের যুযুধান শেষ হইল।
রাজপুতের কাহাবীর হুজিহানের নিকট
বাইরা হাত করিয়া কহিলেন, “করণ
কখনও সন্ধ্যার সভা দেখে নাই, সেই জন্য
লজ্জাগ্রস্ত ও সর্বদা নতশির।”

লাবণ্যময়ী হুজিহান তাঁহার একটি
সুখার হাসি হাসিয়া পতির নিকট আরক্ত-
নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “সন্ধ্যা, তাহা
নহে, আবার সৈন্তবলে মেওয়ার অধীন
হইয়াছে, কিন্তু চিরস্থায়ী নিশাদীরদিগের
এখনও অধীনতা অভ্যাস হয় নাই।”

হুজিহানের কথা বর্ধাৎ। অমরসিংহ
প্রতাপসিংহের পুত্র, অধীনতা সহ্য করিতে
পারিলেন না। সুলতান কর্ণ যখন দিল্লী-
খরের কর্ণ দিতে আসিলেন, অমরসিংহ
তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুলতান
কর্ণ মানসিংহের ভাগিনের, রাজপুত-মাতার
পুত্র, তিনি রাজপুতের উচিত সম্মান জানি-
তেন। তিনি অমরসিংহকে বলিয়া পাঠাই-
লেন, “আমি কেবল মহারাণার বন্ধু চাহি,
আর কিছু চাহি না। মহারাণা, আপনি
রাজধানী হইতে বাহিরে আসিয়া কেবল
দিল্লীখরের কর্ণ গ্রহণ করুন, আমি মেওয়ার-
প্রদেশ হইতে মুসলমান-সৈন্ত সমস্ত বাহিরে
নইয়া বাইব।”

বিজিত রাজাকে কেহ এরূপ সম্মান করে
না, তথাপি মহারাণা বিজিত, এক্ষণে দিল্লী-
খরের কর্ণাবলে দেশ শাসন করিতে হইবে,
এ কথা অমরসিংহ যেন স্থান দিতে পারি-
লেন না। তিনি পিতার নিকট যে সভা
করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেন, কর্ণ
গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অমরসিংহ আপনার বোদ্ধাঙ্গিকে
রাজসভায় আক্লান করিলেন। চোহান ও
রাঠোর, বালা, প্রমর ও নিশাদীর সকলে
রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তেজসিংহ
উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বয়স্ক এক্ষণে
পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীর পূর্ববৎ
দীর্ঘ, বলু ও বলিষ্ঠ। তাঁহার পাশেই তাঁহার
বালক গজপতি সিংহ * পিতার বর্ধাৎ
করণ করিতে শিখিতেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে
পিতামহের নাম রাখিতে শিখিতে-
ছিলেন।

দূত আসিয়া নিবেদন করিল, রাজধানীর
বারদেখে স্থলতান কর্ণ উপস্থিত আছেন,
মহারাণা গাইলে কর্ণ দান করিয়া দিল্লী
প্রত্যাবর্তন করিবেন। সভায় সকলে নিস্তব্ধ,
নির্ঝক। অনেককাল পর সমস্ত বোদ্ধার
সম্মুখে অমরসিংহ, পুত্র কর্ণের ললাটে
রাজসীকা দিলেন; কহিলেন, “প্রতাপসিংহের
পুত্র পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়া-
ছিলেন, তাহা বিশ্বস্ত হইবেন না। যুবরাজ
অস্ত্র হইতে রাজা হইলেন, আমি বুদ্ধ, বান-
প্রস্থ অবলম্বন করিলাম।”

সেই দিন (খ্রঃ ১৬১৬) অমরসিংহ রাজধানী
উদয়পুর ত্যাগ করিয়া নটোকা নামক স্থানে
বাইরা বাস করিলেন। তাহার পর তিনি
পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আর রাজ-
ধানীতে প্রবেশ করেন নাই, রাজসভাও গ্রহণ
করেন নাই।

* বাহারা গজপতিসিংহের কথা জানিতে চাহেন,
ডাঃ ডাঃ “মহাবীরাঙ্গণ” আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন।

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

উৎসর্গ-পত্র।

এই শতাব্দীতে বাঁহারা হিন্দুদিগের পথপ্রদর্শক-
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,
হিন্দুধর্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে বাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে
শিক্ষা দান করিয়াছেন,
সামাজিক উন্নতি ও জাতীয় ঐক্যসাধন-বিষয়ে
বাঁহারা আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন,
বঙ্গভাষায় গল্প সাহিত্য বাঁহারা স্বহস্তে
সৃষ্ট ও ভূষিত করিয়াছেন—
রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এই মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ
উৎসর্গ ক রলাম।

চৈত্র-সংক্রান্তি,

১২৮২ বঙ্গাব্দ

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the

the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the

the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the

the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the

the twenty-second is the fact that the
the twenty-third is the fact that the
the twenty-fourth is the fact that the

the twenty-fifth is the fact that the
the twenty-sixth is the fact that the
the twenty-seventh is the fact that the

the twenty-eighth is the fact that the
the twenty-ninth is the fact that the
the thirtieth is the fact that the

the thirty-first is the fact that the
the thirty-second is the fact that the
the thirty-third is the fact that the

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পরে তাহার একটি ভগিনী হইল। বড় মেয়েটি একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের বৎসর পরে মৃত্যু হইল; চকু দুটি কাল কাল ভ্রমরের ভায় সুলভ ও চকল, মাথার সুলভ কাল কাল চুল, লাল ঠোঁট দুটিতে সরাই সুধার হাসি। গরিবের এ অমূল্য ধনকে গরিব বাপ-মা চুষন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না, বয়স দুইটি মেয়ে হওয়াতে বাপ-মার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্ম একটু দুখ চাই; এমন সুলভ মেয়ের হাত দুখানি খালি রাখা যায় না, দুই একখানা গহনা হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়নীর বাড়ী লইয়া বাইবার সময় একখানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয়। কিন্তু এ সব ইচ্ছা পূরণ হয় কোথা থেকে? বাপ-মার মনে কত সাধ হয়, কিন্তু উপায় কৈ? গরির-চুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কত্তা দুটিকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যা দুটিকে ষাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুকুরে বাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। বিপ্রহরে আহার করিয়া কন্যা দুটিকে লইয়া সেই স্থানের বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকাল-বেলা পুনরায় রন্ধনাদি সংসারকার্য্য করিতেন। তথাপি এ সংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা করজন স্বামী? লক্ষ লক্ষ দরিদ্র

গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা সংসারে সহ্য কষ্ট থাকিলেও তিনি স বাবী পাইয়াছিলেন, স্বপ্নের মণির ভায় দুইটি কত্তা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তিভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ঘনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পরে হরিদাসের কাল হইল। হতভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র পল্লী কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান কেন এ দরিদ্রের একটি ধন কাড়িয়া লইলেন—কেন এ হতভাগিনীর একটি সুখ হরণ করিলেন—এ আঁধারের একটি দীপ নিকর করিলেন? বিধবার আন্তনাদ শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা-মজুরগণ সেই পথ দিয়া বাইবার সময় একটু একটু অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরিদাসের বে অমী ছিল, তাহা তারিগীবাবু এখন চাব করান, বৎসরের শেষে হাত তুলিয়া বাহা দেন, বিন্দুর মাতা তাহাই পান। তাহাতে উদরপূর্তি হয় না, মেয়ে দুটিকে মাল্যব করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটার বিক্রয় করিয়া ভাসুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাহাকেই করিতে হইত, তিনি বিন্দু ও সুধাকে কেলিয়া বাড়ীর ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন। তাহা

ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ
করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথার
উত্তর দিতেন না, ভিন্নকারে ক্ষর হইতেন না,
কখন কখন তাঁহার মুত বামীর নিন্দা করিলে
বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি
দীরবে শাকঘরে আসিয়া চকুর জল মুছি-
তেন;—তাবিতেন, “আহা! আমার বিন্দু ও
সুখা মাগুব হউক, হে বিধাতা, তুমি ওদের
কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয়,
আমি নিজের দুঃখ, নিজের অপমান গ্রাহ
করি না। আহা! যেন বিন্দু ও সুখাকে
বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি,
তাহা হইলেই আমার সুখ।”

* * * *

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল
কাঁকে লইয়া বলিলেন, “আর মা বিন্দু, ঘরে
আয়, সুখাকে কোলে নে। আহা, বাছার
নদীর শরীর, এইটুকু এসে ক্লান্ত হইরাছে।
আহা, বাছা যে ছেলেমাগুব, হাঁটুতে পার্শ্বে
কেন? ও কি, ঘুমিয়ে পড়েছে না কি?”

বিন্দু। হ্যাঁ মা, ঘুমিয়ে পড়েছে, এই
আমি কোলে ক’রে নিয়ে বাই।

মাতা। না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে,
আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল
ধ’রে পথ দে’খে দে’খে আয়, বড় অন্ধকার
হয়েছে, একটু একটু ঘেঁষ হয়েছ, রাত্রিতে
বোধ হয়, জল হবে।

বিন্দু। না মা, আমিই কোলে নি,
সে দিন ঘোষেদের বাড়ী থেকে রাত্রিতে
সুখাকে কোলে ক’রে এনেছিলাম, আর আজ
এই ঘাট থেকে ঘরে নে যেতে পারবো না?
ঐ ত রাস্তাঘরের আলো দেখা যায়।

মাতা। তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস
মা, সাবধানে আনিস, বড় অন্ধকার, যেন
পড়ে বাস্‌সি। ঐ সে দিন ভোর আটাই-

য়ার মেয়ে উমাতারা স্নানিবেলা মেলা থেকে
আসছিল, পথে পড়ে গিয়েছিল, আহা,
বাছার কপালটা এতখানি কেটে গিয়েছে।

বিন্দু। মা, উমাতারা কোন মেলায়
গিয়েছিল? কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল
এনেছিল, একটা কাঠের ঘোড়া এনেছিল,
আর একটা মাসীর মিঃ এনেছিল, আর
একটা কেমন বল এনেছিল, সেটা ঘোরে।
সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা?

মাতা। তা জানিস্‌নি? ঐ ওরা যে
অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়েছিল, সেখানে বছর
বছর ভারী মেলা হয়, কত হাজার হাজার
লোক যায়, কত বৈষ্ণব ঋগুরান হয়, কত
গান-বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে
যায়।

বিন্দু। মা, তুমি কখনও সেখানে
গিয়েছিলে?

মাতা। গিয়েছিলাম বাছা, যখন আমি
ছোট ছিলাম, একবার আমার বাপ-মা
গিয়েছিলেন, আমার বাড়ী শুদ্ধ গিয়েছিলাম,
সেখানে তিন চারিদিন ছিলাম, একটা গাছ-
তলায় বাসা ক’রেছিলাম।

বিন্দু। কেন, ঘর ছিল না? গাছতলায়
বাসা করেছিলে কেন মা?

মাতা। সেখানে কত হাজার হাজার
লোক যায়, ঘর কোথায়? সকলেই গাছ-
তলায় বাসা করে। একটা ভারী আঁববাগান
আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত স্নান্যের
দোকানী পসারী আসে, কত দেশের জিনিস
বিক্রী হয়।

বিন্দু। মা, আমি একবার যাব, আমার
বড় দেখতে ইচ্ছা হয়।

মাতা। আমার কি তেমন কপাল
আছে মা যে, তোকে নিয়ে যাব? কত টাকা
খরচ হয়।

বিন্দু। না মা, আমি আর বৎসর বাব
উমাতারান্না দেখেছে, আমি কেন বাব না ?

যাতা। ছি মা, তুমি সেরান্না মেয়ে,
অমন করে কি বারনা করে ? তোমার
জোঠাইয়া বড়মানুষ, তাঁহার মেয়ে বেখানে
ইচ্ছা বেড়াইতে যায়। তোরা যা গরিবের
ঘরের মেয়ে, তোদের কি বাচ্চা বারনা
কবুলে শাজে ? আহা, ভগবান যদি তোদের
কপালে স্নেহ লিখিত, তাহা হইলে কি আর
অন্ন-বস্ত্রের জন্ত তোদের এমন লালারিত
হইতে হয় ? তাহা হইলে কি আমার
সোনার পুতুলেরা যেন পথের কাঙ্গালীর
মত ঘারে ঘারে করে ? হা ভগবান !
তোমারই ইচ্ছা।

চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে,
পশ্চিমদিকে কাল মেঘ উঠিয়াছে, আকাশ
হইতে এক একবার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে,
অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্য দিয়া শব্দ
করিতা নিশার বায়ু বহিয়া বাইতেছে।
গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল এক
একবার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ
শুনা যাইতেছে, অথবা দূর হইতে শৃগালের
রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার,
কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটি
হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম
হইতে দুই একটি প্রদীপ বা চুলার আগুন
দেখা যাইতেছে, আর এক একবার অল্প
অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে
সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার
আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে বাইতেছিল, যদি
সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত,
তবে সে দেখিত, যাতাও চক্ষু হইতে ধীরে
ধীরে দুই একটি অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল
দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কান্দ,

হুই ভগিনী।

তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিবার
কুজ কুটির দেখা বাইতেছে। বেলা দ্বি-
প্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারিদিকে মাঠ গ্রীষ্ম-
কালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে।
বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্রে
চাষ দিয়াছে, গরু ও লাখল লইয়া একে
একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, হুই এক
জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রে মধ্যে বৃক্ষ-
তলে শয়ন করিয়াছে। তাহারিগের গৃহিণী
বা কজা বা ভগিনী বা যাতা তাহাদের জন্ত
বাড়ী হইতে ভাত লইয়া বাইতেছে। চারি-
দিকে রোজতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর
গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত ঈতল।
চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং
তাঁহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর
নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁঠাল, তাল,
নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ সকলকে ছায়া
বিতরণ করিতেছে। কদলীবৃক্ষে কলা
হইয়াছে, আর মাদার, মনসা প্রভৃতি কাঁটা-
গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য-পথ পুরিয়া রহিয়াছে।
এক এক স্থানে বৃহৎ অথবা বাটগাছ ছায়া
বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা
প্রকাণ্ড আশ্রবৃক্ষের বাগান ২০। ৩০ বিঘা
ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাতাগে সেই স্থান
অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর
দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে
ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে
ডালে পক্ষিগণ কুলারে নীরব হইয়া রহি-
য়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর
মিষ্ট স্বর সেই আশ্রকাননে প্রতিধ্বনিত
হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

ভিন্ন আশ্রিত পুত্র প্রায়ে একটি স্থল
সন্নিহিত, দুই কুঠীর দেখা যাইতেছে। চারি-
দিকে বাঁশবাড় ও আম-কাঁঠাল প্রভৃতি দুই
একটি কলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে।
বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেই ছায়া
নীতল এবং তাহার নিকটে ১০৬টি নারিকেল-
বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে
ভিতর-বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া
পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটি
মাচানের উপর লাউগাছ লাউ হইয়াছে,
অপরদিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি
বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক
স্থল ও পরিষ্কাররূপে লেগা। পার্শ্বে
একটি রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটি
গোয়ালঘরে একটি মাত্র গাভী রহিয়াছে।
বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া
গিয়াছে, উলুনে আশুন নিভিয়াছে, বেড়ার
দুই একখানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার
ঘরের রকে একটি তক্তাপোষ ও দুই একটা
চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটি ডোবার
কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি
শিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও
মাল্য হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটি
কুলগাছ, কয়েকটি কলাগাছ ও একটি
আঁবগাছ, আর অনেক কাঁটাগাছ ও
জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দিকে বৃক্ষ ও জঙ্গল।
এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটি ছায়াপূর্ণ
ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে
অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর গৃহিণী
নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাহার
একটি ভিন বৎসরের কন্যা ভূমিতে মাদুরের
উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটি ছয়
মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী
ধারে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক

একবার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক
একবার শুণ, শুণ, শব্দে ঘুম পাড়াইবার
ছড়া গাইতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে
ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর
ক্লীণ, মুখখানি প্রশান্ত, কিন্তু একটু শুকাইয়া
গিয়াছে, চক্ষু দুটি বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু
ধীর ও চিন্তানীল। অষ্টাদশ বৎসরের
রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপভাসে পাঠ
করি, তাহার কিছু ইহার নাই, সে প্রগলভতা,
সে উদ্বেগ, সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নাই।
উপভাস-বর্ণিত মুখ সকলের কপালে ঘটে
না, উপন্যাস-বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে
না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া
দেখ, দুই একজন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে
ছাড়িয়া নিরা সহস্র সহস্র দরিদ্র-গৃহস্থ তদ্র
লোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ,
আমাদের দরিদ্র ভগিনী বা কন্যা বা
আত্মীয়গণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে,
সহিষ্ণুতার সংসারযাত্রা করেন, চাহিয়া দেখ,
দেখিয়া বল, ছার উপন্যাসের কাল্পনিক
অলীক সুখ কল্পনের কপালে ঘটিয়াছে,
রূপার বিপুল ও গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া কয়-
জন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কণেক
বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল,
মাতা নিদ্রিত শিশুকে সমস্তে মেজেতে মাদু-
রের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া
কণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।
সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত
ঈষৎ চিন্তানীল ললাটের উপর পড়িয়াছে।
ছিন্ন, প্রশান্ত, অভিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুটি
সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে
মাতার স্নেহ, মাতার বন্ধ বিরাগ করিতেছে,
তাহার স্নেহ স্নেহ মাতার চিন্তা ও মাতার
অসীম সহিষ্ণুতা লালিত হইতেছে। শরীর-

ধানি কীথ, কিছু সুগঠিত। কীথ

বাহু দ্বারা নারী ধীরে ধীরে ***

করিতেছিলেন আর সেই

ঘরে বসিয়া তাঁহার কন্তু চি

ছিল। সংসারের চিন্তা,

জগতের চিন্তা আর কখন

চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে

উদয় হইতেছিল।

ছেলে ঘুমাইয়া

ধানি রাখিয়া আ

স্থাপন করিয়া

লেন, নয়ন হ

তিনি অচি

ষিপ্রহরের

ঘরটিও চি

পার্শ্বে

সংসারে

হইতে

হি

হই

রি

ভা

ত

হ

হাবলী ।

সুখার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয় ।

লিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে

জনেও জানে না ! নিদারুণ

'রে এই কচি ছেলের কপালে

লিখিলে—কেমন ক'রে এ

'ত্র গরল মিশাইলে ?”

ক যে, আমরা প্রথম পরি-

ণা বলিতেছিলাম, দ্বিতীয়

বৎসরের পরের কথা

গল্প এই সময় হইতে

ঘটনাগুলি কতক

'ছে, আর দুই

ীতে থাকিয়া

১ কত্নাকে

ার স্বামীর

১ কোন

র বড়

য়ের

ইষ্ট

ওখন

ওরাং

রতে

শীঘ্র

তা

১৫-

র

লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া বাইতে লাগিল। যেরের জ্যোতাইষা বকের উপর ছুট পা মেলাইয়া বলিয়া বৈকালে কেশ-বিন্ধাস করিতে করিতে সহান্তে বিন্দুর মাকে বলিলেন, (বিন্দুর মা চুলের দড়ী ধরিয়া ছিলেন) “তা ভাবনা কি বোন, আমাদের বাড়ীর মেরের বের জন্ত ভাবতে হয় না, আমাদের কুল,মান, বর্দ্ধমানে ভারী চাকরী, একে না জানে বল, কত তপিস্তে করলে তবে লোকে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা? এই রসো না, তিনি পূজার সময় বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সখক ক’রে দেব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করেছে, বে দিলেই এখনি মাথার ক’রে নিয়ে যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সখক করুব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেলা আছে, তোমার মেয়ে একটু কালো, আর তোমাদের বোন তেমন টাকা-কড়ি নেই। আমার দেওয় তেমন সেয়ানা ছিল না, কিছু রেখে যায় নি, তাই বল। তা ডেব না বোন, আমি যখন এ বিষয়ে হাত দিয়েছি, তখন আর কোন ভাবনা নেই।”

আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই স্নানর তাবিজ-বিভূষিত বাহর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু জ্যোতাইষার বাহ নাড়াতে বিন্দুর বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্ত পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আফ্লাদে আটখানা।

বাড়ীর ছেলেরের জন্ত কত পোষাক,কাপড়, জুতা, উমাতারার জন্ত ঢাকাই কাপড়, মাথার কুল ইত্যাদি। নাজীর মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন, গ্রামে ধুম পড়িয়া গেল, কত লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিল, কত খোশা-মোদ, কত সূখ্যাতি, কত আরাধনা। কাহারও পূজার সময় দুই পাঁচ টাকা কর্তব্য চাই, কাহারও বিপদে সংপ্রদান চাই, কাহারও ছেলের একটি চাকরী চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাততঃ চাই না, কেবল বড়লোকের খোশামোদটা অভ্যাসহীন, সেই অভ্যাসেই সূখ হয়। এত ধুমধামের মধ্যে বিন্দুর কথা কেই বা বলে, কেই বা শোনে। ১৫দিনের ছুটি ফুরাইয়া গেল, নাজীর মহাশয় আবার বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সখদের কিছুই স্থির হইল না।

পড়সীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধাদিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্ডার একটি সখক করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহার্যও আগ্রহহিন্তে বলিতেন, “তা দেব বৈ কি, তোমার দেব না তো কার দেব? তবে কি জান বাছা, আজ-কাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি কিছু দিতে খুতে পারবে না, বিন্দুর বাপ ত ত কিছু রেখে যায় নি, তেমন গোছান লোক হতো,ঐ তোমার ভাহরের মত টাকা করুতে পারত, তবে আর ভাবনা থাকত? সেই সময় আমি কত বলেছিলাম, তা তখন সে গা করত না, তোমরাও গা করুতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথা বাসি হলেই ভাল লাগে। তা দেব বৈ কি বাছা, তোমার মেরের সখক ক’রে দেব, এ বড় কথা?” অথবা অন্ত একজন বৃদ্ধা বলিলেন, “তার ভাবনা কি,বিন্দুর বের আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কি জান, বিন্দু দেখতে

ভনুতে একটু ভাল হতো, তবে এ কাজটা শীঘ্র শীঘ্র হতো। তা মেয়ের মুখের ছিঁরি আছে, ছিঁরি আছে, তবে রংটা বড় কালো, আর চোখ দুটো বড় ডেবডেবে, আর মাথার বড় চুল নাই। না, তা মেয়ের ছিঁরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড়গুলো যেন জির জির করছে, হাত-পাগুলো যেন লম্বা লম্বা, আর এর মধ্যে চেনা হয়ে উঠেছে। তা হোক, তুমি ভেব না, কালো মেয়ে কি আর বিকোর না? বে কি আটকে থাকে? তা থাকবে না, যখন আমরা আছি, তখন কিছু আটকাবে না।" এইরূপে বৃদ্ধাদিগের যথেষ্ট আশ্বাস-বাণী ও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দা সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশঙ্ক ও আশ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই একজন প্রাচীন লোক ছিলেন। তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে বাতাসায়াত করেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা করেক দিন তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাচাঁটা করিলেন। কোন দিন ছেলেদের জন্ত দুই চারি পয়সার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কখন বা কিছু মিল্লী বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনজুটি করিলেন, গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি-মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাসবাণী দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্তাকে বলিবেন, এইরূপ অনেক মধুর বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা ঘোমটা দিয়া সেই কর্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটি মনে রাখিবার জন্ত মিনতি করিলেন। তাঁহারাও বলিলেন, "তা একথা আমাদের এত দিন বলিনি? এ সব কাজ কি আমাদের না

বলিলে হয়? ঐ ও পাড়ার বোম্বেরের বাড়ীর কালীতারার বের জন্ত কত হাঁটা-চাঁটা করেছিল, শেষে বড়বৌ একদিন আমাদের ডেকে বললেন, অমনি কাজটা হয়ে গেল। কেমন বে দিগের দিগেছি, রায়ের বনিয়ারী ঘর, খাবার অভাব নেই, টাকার অভাব নেই, যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলেদের সঙ্গে বোম্বেরের মেয়ের বের সম্বন্ধ করে দিলাম। ছেলেটি মোক্ষবরে বটে, আর একটু কাহিল ও একটু বয়স না কি হয়েছে, তা এখনও চল্লিশের বড় বেশী হয়নি, আর কালীতারার আট বৎসর হলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রাম শুদ্ধ এ সম্বন্ধের সুখ্যাতি করছে। ছেলেটি বর্তমানে থাকে, লেখা-পড়া না জাহুক, তার মান কত, বশ কত, সাহেবদের খানা দেয়, মজলীস লোকে তরা, গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, বাবুয়ানা দেখলে লোকে বলে, হা জমীদারের ঘরের ছেলে বটে। তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সম্বন্ধ হয়? তুমি মা এত দিন কোথা হাঁটাচাঁটা করছিলে, আমাদের একবার জিজ্ঞাসাও কর না? এখন বে বার আপন আপন প্রভু হরছে, তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাদের মনে পড়েছে, তবু ভাল।" সজল-নয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন এবং এমন লোকের নিকট পূর্বে না আসা বড়ই নির্কৃদ্ধিতার কার্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুট হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন, "তা ভেব না মা, এখন আমাদের যখন বললে, তখন আর ভাবনা নেই, দুই চারি দিনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করে দিচ্ছি।" বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অনেক আশা করিয়া আশার-নিন্দা চাভিরা অপেক্ষা

করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সন্ধান হইল না, পরিবের মেয়ে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন, তালপুকুরের লোক অনেক সদৃশবিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে, প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌ-ঝি কি করিতেছে, তাহার বৈজ্ঞানিক অতুস্কান রাখেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্ত নিঃস্বার্থ যত্ন করেন, কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্বদোষের জন্ত বিশেষরূপে নীতিগত তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন এবং নিঃস্বার্থরূপে তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে, যত্ন ও বাক্যব্যয়ে ক্রটি করেন না; তবে কাজের সময় সহায়তা করা—সে স্বতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত কেহ হস্ত-প্রসারণ করিলেন না, তাঁহার যাচঞার কেহ একটি কপর্দক দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থে কেহ বামগদের কনিষ্ঠ জঙ্গুলী নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কখনও তালপুকুর হইতে বাহিরে বাইতেন, তবে দেখিতেন, এ সদৃশগুলি জগতের অন্তান্ত স্থানেও লক্ষিত হয়। তবে বিন্দুর মাতা নিরীক্ষা, এক একবার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইত যে, এ প্রচুর আশ্বাসবাক্য ও সংপরামর্শের পরিবর্তে তাঁহাকে এই সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্নতি হইত। সাংসারিক মুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুকুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হেমচন্দ্র নামক একটি পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল

না। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক বস্ত্রে লেখা-পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং হেমচন্দ্রও বহু সহকারে পাঠ করিয়া বর্ধমান প্রথম পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক মাসের পরই পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি পড়া-শুনা বন্ধ করিয়া তালপুকুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র বহু বিন্দুর মা ও বিন্দুকে বাল্যকাল অবধি জানিতেন। তাঁহার বিবরণ-বৃদ্ধি কিছু অল্প থাকি বশতই হউক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিন্দুরকর বিদ্যা কয়েক মালাবধি শিখিয়াই হউক, অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ যুগের ন্যায় কার্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিবেদন করিলেন। কিন্তু ছেলটি কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, (আমাদের লিখিতে লজ্জা করে) বিন্দুর শুদ্ধ মলিন মুখখানিও দুই একবার গোপনে দেখিলেন এবং তৎপরে বিন্দুর মাতাকে ও জ্যেষ্ঠাইমাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জ্যেষ্ঠাই-মা মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটি সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড়মাত্রায়ের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করে, তাহাতে যদি একটু বড়মাত্রাবী রকম দর্প থাকে, একটু বড় হুইয় করিবার ইচ্ছা থাকে,

দরিদ্রের সহিত যদি সহায়কৃত্তি একটু কম থাকে, তাহা মার্জনীয়। ছুই একটি দোষ অসহন করিয়া আমরা বেন নিদ্রাপরায়ণ না হই, আমাদের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটি দোষ নাই?

বিন্দুর সরলস্বভাব জ্যোতাইয়া বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই, কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু বিন্দুর একটি সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রকৃতই আত্মদানিত হইলেন। তিনি শুভদিন দেখিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন এবং পাড়া-পড়সী ঘরে যখন বাড়ীতে আসিল, তখন সেই তাবিজ-বিভূষিত বাহ সঞ্চালন করিয়া জ্যোতাই বলিলেন, “আহা, আমার উমাতারাও যে, বিন্দুও সে। আমি বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পরস্যা রেখে যায়নি, আমি না করিলে কে করে বল!” ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! পড়সীগণও “তুমি বলে কবুলে, নৈলে কি অন্তে এতটা করে?” এইরূপ অনেক বশোগানও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচবৎসর মাত্র, কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা, সুধারও বিবাহ দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাঙালা শিখাইয়া পরে ১৮১২ বৎসরের সময় নিজ ঘায়ে বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, “বাহা, সুধার বিয়ে না দিয়া যদি মরি, তবে আমার জীবনের সাধ মিটবে না।” হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে সামান্য অর্থদ্বার শিকিত একটি ঘূবার সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন; দুই বিবাহিতা কন্যাকে জোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণীবাবুর বাড়ীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরেই তিনি জীবনশীলা সংবরণ করিলেন।

আর একটি কথা আমাদের বলিবার আছে। পঞ্চম বৎসরের সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল। সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে, জানেন না, বিধবা কাহাকে বলে, তাহাও জানেন না। জ্যোতাই ভগিনীর বাড়ীতে আসিয়া সাতবৎসরের প্রফুল্ল বালিকা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া আমন্দে পুতুল-খেলা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের কথা।

গ্রাম বিগ্রহের রাত্রি হইয়াছে। চন্দ্রের নির্মল শীতল কিরণে সন্দের তালপুকুর গ্রাম সুশুভ রহিয়াছে। বড় বড় তালপুকুর আকাশপটে অন্ধকারময় ও বিষমকর ছবির দ্বায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে প্রচুর ও সূক্ষ্ম বাঁশ-ঝাড়ের সূচিকণ পত্রের উপর সুগন্ধ চন্দ্র-কিরণ রহিয়াছে, পুষ্করীশীত এবং কম্পমান জলের উপর চন্দ্রালোক সূক্ষ্ম খেলা করিতেছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরের ও ডুপাচ্ছাদিত ঘরের চালের উপর সেই সূক্ষ্ম আলোক বেন রূপার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। সমস্ত সুগন্ধ গ্রামের উপর চাঁদের আলোক বেন সুইকুলের দ্বায় স্তিরা রহিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকেই খাওয়া

দাওয়া করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কেবল কোথাও কোথাও কোন নিজাধীন বুদ্ধ বাহিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া এখনও ঘুমপান করিতেছেন, আর কোথাও বা অন্নবরজা গৃহস্থবধু এখনও বাটার পার্শ্বের পুকুরে বাসন মাঝিতেছেন, সংসারের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। নৈশবায়ু বীরে বীরে বহিয়া বাইতেছে, আর দূর হইতে কোন একজন্মনা কুবকের গান সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শুনা যাইতেছে।

বিন্দু সংসার-কার্য শেষ করিয়া, এখনও স্বামী আসেন নাই বলিয়া উন্নিয়-মনে সেই শুইবার ঘরের রকে বসিয়া রহিয়াছেন, নির্মল চক্ষুরিণ তাঁহার শুভ্রবসন ও শাস্ত নয়নের উপর পড়িয়াছে। সুখা আজ শুইতে যাইবে না, হেমচন্দ্রকে সন্ন্যাসী মাজাইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু বালিকা ভগিনীর পার্শ্বে সেই রকে একটু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কুসুমরঞ্জিত পাট তাহার আঁচলেই রহিল। নিজাতেও সে সুন্দর পরিপক বিষফলের ত্রায় ওষ্ঠ তুটি হান্সবিন্দুগঠিত, বোধ হয়, বালিকা এই সুন্দর সুশীতল রঞ্জনীতে কোন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্ষণেক পরে বাহিরের কবাটে শব্দ হইল, বিন্দু তাহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ গিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন। হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হেমচন্দ্রের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, লম্বাট উন্নত ও প্রশস্ত, মুখমণ্ডল ত্রায়বর্ণ, কিন্তু সুন্দর-নরন তুটি অতিশয় তেলোবাক্তক। অনেক পঞ্চ হাঁটরা আসিয়াছেন, স্ততরাং তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীরে ধূলি লাগিয়াছে, পা দুটি ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে।

বিন্দু সন্ন্যাসী হইবার একদিন মৌলী আসি

দিলেন এবং পা দুইবার জল ও গামছা আনিয়া দিলেন; হেম হাত-মুখ হুইলেন।

বিন্দু। তোমার আসতে এত রাত্রি হ'ল? এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি?

হেম। আমি সন্ধ্যার সময় আস্তেই, তবে কাটোয়ার একটা পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি বৈকালে আমাকে তাঁহার বাসায় নিয়ে গেলেন, উপরোধ করে কিছু জলখাবার খাওয়াইলেন, সেই জন্য এত দেরী হল। তা তোমরা খেয়েছ ত?

বিন্দু। সুখা খেয়ে ঘুমিয়াছে, আমি খাও এখন। তুমি ত বৈকালে জল খেয়েছ, আর কিছু খাওনি, তবে ভাত এনে দি?

হেম। আমার বিশেষ সুখা পারনি, তবে ভাত নিয়ে এস, আর রাত্রি করার আবশ্যক নাই।

বিন্দু সেই রকে একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে খালে করিয়া ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে, তাহাই ভাতা ও তরকারি। আর লেবু হইয়াছিল, বিন্দু তাহা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, গাছ হইতে দুইটি ডাব পাড়াইয়া তাহা শীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে গাভী ছিল, তাহার দুধ খন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আহারে বসিলেন, বিন্দু পার্শ্বে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন।

হেম। খোকর জন্য একটা ঠুংখ এনেছি, সেটা এখন খাওয়াইও না, রাত্রিতে যদি ঘুম ডালে, যদি কানে, তবে খাওয়াইও। আর যে চেষ্টার গিয়াছিলাম, তার বড় কিছু হ'ল না।

বিন্দু। কি হ'ল?

হেম। খাটোয়ার একজন

একটি উকিল আছেন, আমি তাঁর কাছে তোমার বাপের জমীর কথা বলবো এবং সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বলবো।

বিন্দু। তার পর?

হেম। তিনি বলেন, মোকদ্দমা ভিন্ন উপায় নেই।

বিন্দু। ছি! জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের সঙ্গে কি মোকদ্দমা করে? তিনি ছেলেবেলা আমাকে মানুষ করেছিলেন, আবাব বে দিয়েছেন, জ্যেষ্ঠাই-মা এখনও আমাদের জিনিস-টিনিস পাঠিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে কি মোকদ্দমা করা ভাল?

হেম। আমাদের বিবাহের জন্ত আমরা তোমার জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের নিকট বড় ঋণী নই; কিন্তু তুমি তখন ছেলেমানুষ ছিলে, সে সব কথা বড় জান না, জানবার আবশ্যকও নাই। তথাপি তোমার জ্যেষ্ঠা, এই জন্তই তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিতে ইচ্ছা নাই, কেবল অগত্যা করিতে হয়।

বিন্দু। ছি! সে কাজটা কি ভাল হয়? আর দেখ, আমরা গরিব লোক, আমাদের কি মোকদ্দমা পোষার? আমরা গরিবের মত যদি থাকতে পারি, হুবেলা হুপেট যদি খেতে পাই, ভগবানের ইচ্ছায় যদি ছেলে ছুটিকে মানুষ করিতে পারি, তা হলেই চের হ'ল। তোমার বে জমীজমা আছে, তাতেই আমাদের গরিবের সোনা কলে, তোমার পৈতৃক বাড়ীই আমার সাত রাজার ধন।

হেম। আমি বখন তোমাকে বিবাহ করেছিলাম, একপ কটে চিরকাল জীবন বাপন করব, তা মনে করিনি। তুমি সহিষ্ণু, লাক্ষী, পতিব্রতা, এত কষ্ট সহ করেও মুখ ফুটে একটি কথা কও না, সে তোমারই গুণ, আমি ত চক্ষে দেখিতে পারি না।

ভাবিলেন, “পথের কাঙ্গালীকে কোলে করিয়া লইয়া স্বর্গে স্থান দিরাছ, সেটা কি ভুলে গেলে?” একান্তে একটু হাসিয়া বলিলেন, “কেন, এমন ঘর-বাড়ী, এখানে রাজার উপাদের দ্রব্য পাওয়া যায়, এখানে আমাদের অভাব কিসের? একটি রাজার উপাদের জিনিস দেখবে?”

হেম একটু হাসিয়া বলিলেন, “কৈ, দেখি!”

বিন্দু উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। সেই দিন গাছের কচি কচি আঁব পাড়িয়া তাহার অঘল করিয়াছিলেন, স্বামীর সম্মুখে পাথর-বাটীটি রাখিয়া বলিলেন, “একবার খেয়ে দেখ দেখি।”

হেম হাসিয়া অঘল ভাতে মাখিলেন, খাইয়া সহাস্তে বলিলেন, “হী, এ রাজার উপাদের দ্রব্য বটে, কিন্তু সে আমাদের এ রাজ্যের গুণ নয়, রাজরাণীর হাতের গুণ!”

কণেক পরে আবার বলিলেন, “আমি সত্য বলছি, জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের সঙ্গে মোকদ্দমা করবার আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু তিনি তোমার পৈতৃক ধন কেড়ে নেবেন, আমাদের দরিদ্র ব'লে তুচ্ছ করবেন, তা আমি কখনই সহ্য করব না। আমি দরিদ্র, কিন্তু আমি অস্ত্রায় সহ্য করিতে পারি না।”

বিন্দু। তবে এক কাজ কর দেখি। ঐ ভাত কটি এই ঘন দুধ দিয়া খেয়ে নাও দেখি, তা হ'লে গায়ে জোর হবে, তার পর কোমর বেঁধে লড়াই করো।

হেমচন্দ্র সেই ঘুচ্ছের উত্তোগ করিলেন, আবার গাভীঘুচ্ছের অথবা রাজীর রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিলেন। তখন বিন্দু বলিলেন, “আচ্ছা, জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বিবাহ মিটিয়ে ফেটে ভাল হয় না? গ্রামেও

হেম। সে চেট্টাও করেছিলাম। তোমার জ্যেষ্ঠা মশাই বলেন যে, জমীতে তাঁরই স্বত্ব আছে, তিনি এখন দশ বৎসর অবধি জমীদারকে খাজানা দিচ্ছেন, তিনি অর্থব্যয় করে জমীর উন্নতি করেছেন এবং জমীদারের সেরেস্তার আপনার নাম লিখিয়েছেন, এখন তিনি এ জমী হাতছাড়া করবেন না। তবে তোমাকে ও স্ত্রীকে কিছু নগদ অর্থ দিতে সম্মত আছেন, তা জমীর প্রকৃত মূল্য নয়, অর্ধেক মূল্য অপেক্ষাও অল্প। কেবল আমরা দরিদ্র, এই জন্য তিনি এরূপ অঙ্গার করছেন।

বিন্দু। আমি মেয়েমানুষ, তুমি যতদূর এ সব বিষয় বুঝ, আমি ততদূর পারি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, তিনি যা দিতে চান, তাতেই স্বীকার হওয়া ভাল। তিনি আমাদের গুরু, এক সময়ে আমাদের পালন করেছেন, যদি কিছু অল্প মূল্যেই তাঁকে একটা জিনিস দিলেম, তাতেই বা ক্ষতি কি? আর দেখ, মোকদ্দমা করলে আমাদের বিস্তর খরচ, কর্ত্তব্য করতে হবে, তা কেমন করে পরিশোধ করব? যদি মোকদ্দমায় জমী পাই, তা হ'লে ঋণ পরিশোধ করতে সে জমী বিক্রী হইবে, আর জ্যেষ্ঠা মশাই চিরকাল আমাদের শত্রু থাকবেন। আর যদি মোকদ্দমায় হারি, তবে একূল ওকূল দুকূল গেল। তিনি যদি কিছু অল্প মূল্যই দেন, না হয়, আমরা কিছু অল্পই পেলেম, গোলমালটা এইখানেই শেষ হয়। আমি মেয়েমানুষ, ও সব গোলমাল বুঝি না, মোকদ্দমা বড় ভয় করি, সেই জন্যই এরূপ বল্লম, কিন্তু তুমি রাগ না করে বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, শেষে যেটা ভাল বোধ হয়, সেইটে কর।

হেমচন্দ্র আহার সমাপন করিলেন, এক ঘটা জল খাইলেন, অনেককণ

বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “তোমার যত মেয়েমানুষ যার বন্ধু, সে এ জগতে ভাগ্যবান। আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে যে উকীলের নিকট গিয়েছিলাম, সে আমার মুখতা। তোমার পরামর্শটি উৎকৃষ্ট। আমি এই পরামর্শই গ্রহণ করলেম, জ্যেষ্ঠা মশাই বাড়ী এসেছেন, কলাই আমি এ বিষয় নিশ্চিন্ত করব। আর পুনরায় যখন কোন পরামর্শের আবশ্যক হবে, এই ঘরের বৃহস্পতির সঙ্গে অগ্রে পরামর্শ করব।”

বিন্দু সহাস্তে বলিলেন, “তবে বৃহস্পতির আর একটি পরামর্শ গ্রহণ কর।”

হেম। কি বল, আমি কিছুই অস্বীকার করব না।”

বিন্দু। ঐ বাটীতে যে ছুটুক পড়ে আছে, সেটুকু চুমুক দিয়ে ঝাও দেখি।

হেমচন্দ্র অগত্যা বৃহস্পতির এই দ্বিতীয় পরামর্শটিও গ্রহণ করিলেন, পরে আসন ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেন।

বিন্দু তখন হেমচন্দ্রের জন্ত শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, তাতে একটি পান দিলেন এবং অনেককণ পর্যন্ত সেই শয্যায় স্বামীর পাশে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। অনেককণ কথাবার্তার পর হেমচন্দ্র সেই স্নেহময়ীকে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সম্মুখে চুপন করিয়া কহিলেন, “বাও, অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি ঝাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে।” জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বিন্দুবাসিনী তখন উঠিয়া পাকগৃহে আহারাদি করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাঁদবাসের কথা।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। উষা তরুণী
 গৃহীণীর কায় সংসার-কার্যের জন্ত জগতে
 সকলকে উঠাইলেন, সকলকে নিজ নিজ
 কার্যে প্রেরণ করিলেন। মাতা যেরূপ
 কষ্টকে সুন্দররূপে সাজাইয়া দেন, সেই-
 রূপ সুন্দর সাজ পরিধান করিয়া উষা
 আকাশে দর্শন দিগেন। হস্তমুখী তরুণীর
 প্রণয়াভিলাষে প্রণয়ী সূর্য্য অচিরেই উদিত
 হইলেন, উষার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন।
 তাঁহার উজ্জল কিরণরূপ সপ্ত অক্ষ রথে
 সম্বোজিত করিয়া সেই জলন্তকেশী সবিতা
 আকাশমার্গে ধাবমান হইলেন, আকাশ
 আলোকে পূর্ণ করিলেন, জগতে সংজ্ঞাশূন্যকে
 সংজ্ঞা দান করিলেন, রূপশূন্যকে রূপ দান
 করিলেন। উষা ও সূর্য্যোদয়ের শোভায়
 বিম্বিত হইয়া চারি সহস্র বৎসর পূর্বে
 আমাদের প্রাচীন ঋষেদের ঋষিগণ এই-
 রূপ সুন্দর কল্পনা দ্বারা সে শোভাটি বর্ণন
 করিয়া গিয়াছেন; সে রূপ সরল, সুন্দর এবং
 প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিতা
 তাহার পর আর রচিত হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোথান করি-
 লেন এবং বাটী হইতে বাহির হইলেন।
 গ্রামের বৃক্ষ, পত্র ও কুটীরগুলি সূর্য্যের
 লোহিত আলোকে শোভা পাইতেছিল,
 গ্রাম্য পুষ্পগুলি বৃক্ষে, ঘোপে বা জঙ্গলে
 ফুটিয়া রহিয়াছে এবং প্রাতঃকালের পাখী-
 গুলি নানাদিক হইতে রব করিতেছে।
 গৃহস্থের ঘেরের অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঘর,
 দ্বার ও প্রাক্ষণ খাঁট দিয়া পুকুর হইতে কলস
 করিয়া জল আনিতেছে অথবা রন্ধনাদি

আরম্ভ করিতেছে, বালকগণ পাঠশালায়
 বা খেলার বাইতেছে, কৃষকগণ লাঙ্গল ও
 গরু লইয়া মাঠের দিকে বাইতেছে। হেম-
 চন্দ্রও আজি নিজের জমীখানি দেখিতে
 বাইবেন মানস করিয়াছিলেন।

ছাত্রাপূর্ণ গ্রাম্য পথ দিয়া কতকদূর
 আসিয়া হেমচন্দ্র একজন কৃষকের বাড়ীর
 সম্মুখে পৌঁছিলেন; কৃষকের নাম সনাতন
 কৈবর্ত।

সনাতন কৈবর্তের একখানি উচ্চ ভিত্তি-
 ওয়ালা ঘর ছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি
 চৌকির ঘর ও একখানি গোমালঘর, তথায়
 ৪৫টি গরু ছিল। উঠানেই উষ্ম, পার্শ্বে
 একখানি চালা আছে, বৃষ্টি-বাদলের দিন
 সেই চালার ভিতর রাখা হয়, নচেৎ খোলা
 উঠানে। সম্মুখে কতকগুলো কাঁটাগাছ ও
 জঙ্গল, একস্থানে একটা বড় খানা আছে,
 তাহাতে বৎসরের গোবর সঞ্চিত হয়, চাষের
 সময় উপকারে লাগে। গোমালঘরের
 পার্শ্বে গাড়ীর দুখানা চাকা ও খান দুই
 লাঙ্গল পড়িয়া আছে এবং বাড়ীর পশ্চাতে
 একটা ডোবার ন্যায় ময়লা পুকুর আছে।
 আমাদের বলিতে লজ্জা করে যে, সনাতন
 নতন মিউনিসিপাল আইন ও নিম্ন শিক্ষা
 সঙ্কেত সনাতনের প্রণয়িনী এই ডোবাতাই
 যে কেবল বাসন ধুইতেন, এমন নহে, তাঁহার
 স্নান ও কাপড়কাচাও এইখানে হইত এবং
 তাঁহার হৃদয়েষ্বরের পানের জল ও সংসারের
 রান্নার জলও এই পুকুরের।

হেমচন্দ্র আসিয়া সনাতনকে ডাকিলেন।
 সনাতনের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তবে
 গাত্রোথানরূপ মহৎ কার্যের উদ্ভোগপর্কে
 রত ছিল, দুই একবার এ-পাশ ও-পাশ
 করিতেছিল, দুই একবার হস্ত বিস্তার করিয়া
 হাই তুলিতেছিল, আর এক একবার পা

শরানা সহধর্মিণীর সহিত “পোড়ারমুখী
এখনও উঠে গেলি, এখনও মাগীর ঘুম
ভাঙলো না বুঝি” ইত্যাদি মিষ্টালাপ
করিতেছিল, এই নৈতিক বক্তৃতার মধ্যে
সনাতন হেমচন্দ্রের ডাক শুনিল।

গলাটা মহাজনের গলার স্থায়, অতএব
বুদ্ধিমান সনাতন সহসা উঠিল না। আবার
ডাক, তৃতীয়বার ডাক, স্তব্ধ সনাতন
কি করে, একটা উপায় করিতে হইল।
বিপদ আপদে সনাতনের একমাত্র উপায়
তাহার গরীয়সী সহধর্মিণী, অতএব তাহা-
কেই একটু অহনয় করিয়া বলিল, “এই
সরজাটা খুলিয়া উঁকি মেয়ে দেখে তাকে
এসেছে? যদি হারাণ সিকদার মহাজন
হয়, তবে বলি বাড়ী নেই।” সনাতনের
প্রণয়িনী প্রিয় স্বামীর “পোড়ারমুখী”
প্রভৃতি মিষ্টালাপ শুনিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া
ছিলেন, এখন সময় পাইলেন। স্বামীর
কথাটি শুনিয়া আন্তে আন্তে পাশ ফিরিয়া
শুইলেন। একটা হাই তুলিয়া সনাতনের
দিকে পিছন করিয়া অসঙ্কচিত-চিন্তে অস
একবার নিদ্রা গেলেন।

সনাতন দেখিল খড় বিপদ, অথচ
আপনি সহসা বাস্তব হইতে পারে না,
কি করে? তুমি একবার প্রণয়িনীকে
ডাকিল, কোন উত্তর নাই, একবার টানিল,
সাড়া নাই, একবার ঠেলা দিল, তথাপি
চৈতন্ত হইল না। সকল যত্ন ব্যর্থ হইল,
সকল বাণ কাটা গেল, তখন বীর পুরুষ
একেবারে রোবে দণ্ডায়মান হইয়া রিজহস্তে
যুগ্মবার উত্তম করিল, —বলিল, “এত বেলা
হ’ল, এখনও মাগীর উঠা হ’ল না, এত
ডাকাডাকি করলেম, তবুও হারামজাদীর
সাড়া নাই, এইবার সাড়া করছি, দুটো
“শুভো! দিলেই ঠিক হবে।”

সনাতনশরী দেখিলেন, আর কোন-অন্ত
খাটে না, এখন অন্ত অস্ত না ধারণ করিলে
বড় বিপদ। অতএব তিনিও একেবারে
বিছানার উত্তিরা বসিলেন, —বলিলেন, “কি,
হয়েছে কি? সকাল থেকে উঠে বাণ-মা
তুলে গাল দিচ্ছ কেন? হাতাল হয়েছ না
কি? দেখ না, মিন্বেবের মরণ আর কি!”
বিধুমুখী এইরূপে স্বামীর দীর্ঘায় বাহা
করিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সে তীব্র স্বর শ্রবণে ও আরক্ত নয়ন
দর্শনে সনাতনের বীর হৃদয় বসিয়া গেল,
তথাপি সহসা কাপুরুষের স্থায় যুদ্ধ ত্যাগ
করিল না।

সনাতন। বলি আবার শুনি যে?

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। ঘরের কাজ-কর্ম করতে হবে না?

স্ত্রী। হবে না।

সনাতন। জল আন্বিনি?

স্ত্রী। আন্বো না।

সনাতন। রান্না চড়াবি নি?

স্ত্রী। চড়াব না।

সনাতন। তবে আবার শুনি যে?

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। তবে ঘরকর্ম করবে কেন?

স্ত্রী। তা আমি কি গ্রামে গিয়া-

পোড়ারমুখী, আমি কিরিয়া আসিতে-

গীতাকে দেখিয়া প্রণাম

বাণ হারামজাদ, আশীর্বাদ করিয়া কহি-

হারামজাদা, আশীর্বাদ করিয়া কহি-

হবে? আর এখানে মজুরের সঙ্গে

আন গে এস, ঘরে এস। তবে ভাল

সনাতন। মি প্রত্যহই মনে করি,

কবার ডেকে খাওয়াই, তবে

“রাগ হইয়া মান থেকে ছুটি নিরে এসে

আর একবার মনকার্যে বিব্রত, আর শরী-

একটি হাই আর ছেলেগুলোকে টিকটিক

করিতে লাগি

সনাতন পরাস্ত হইল; তখন বিধুমুখীর হাতে পারে ধরিয়া ষাট মানিয়া অনেক মিনতি করিয়া উঠাইল। সেই অব্যর্থ সাধনে বিধুমুখীর কোণের ক্রিষ্ণ উপশর হইল এবং তিনি গাত্রোখান করিলেন। মনে মনে হাসিতে হাসিতে মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলেন, “এখন কি করিতে হবে বল। এমন লোকেরও বর করিতে মাছুষ আসে? গালাগাল না দিলে রাজ্যপ্রভাত হয় না।”

সনাতন। না, গাল দিলেম কৈ, একটী বার আদর ক’রে পোড়ারমুখী বলেছি বই ত নয়, তা আর বলব না।

স্ত্রী। না, কিছু বলনি, আমার আদর-লোহাগে কাজ নেই, কি করিতে হবে বল।

সনাতন। বলি, ঐ দরজায় কে ডাকাডাকি করছে, একবার গিয়ে দেখ না, যদি হারাণ সিকদার হয়, তবে বলিস, আমি ঘরে নেই।

তখন বিধুমুখী গাত্রোখান করিলেন,

তাহার বিশাল শরীর তুলিলেন। মুখখানি বাড়ীর গরুর ছুৎ একটু খান।” এই বলিয়া একখানি মধ্যমাকৃতি কাল-পাথরের খালা সনাতন ছুৎ ছুইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর-জার, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জল বর্ণ। শাট আনিয়া।

শরীরখানি বেশ নাড়ুশ-মুড়ুশ, হুলাকার, গোলাকার--পৃথিবীর জায়! পা দুখানি তাহার পড়িলে পৃথিবী তাহার মূলের চিহ্ন

হেমচন্দ্র প্রাতঃকণ করিতে ভালবাসিতেন!

লেন এবং বাটী হইতে সনাতনের মনে ভয়-আমের বৃক্ষ, পত্র ও ফুলকান্ দিন এই রমণী-লোহিত আলোকে শোভা তাহার বাসরোধ গ্রাম্য পুষ্পগুলি বৃক্ষে, স্বোপে বর্ষে বর বড়, না কুটিয়া রহিয়াছে এবং প্রাতঃকালেক হইতে, পার্শ্বে গুলি নানাদিক হইতে রব করি

গৃহস্থের মেয়েরা অতি প্রত্নাবে উঠে খুলিয়া মধুর-বার ও প্রাণকণ আঁট দিয়া পুস্কর হই

করিয়া জল আনিতেছে অথবা সনাতন বাড়ী

মন্দিরকে দেখিয়া সনাতনের স্ত্রী তখন ব্যগ্র ও অজিত হইয়া, ডাড়াডড়ি বাহির হইয়া, তাহার একটু ঘোমটা টানিয়া, এক-খানি কপড়ের চৌকি লইয়া বাবুকে বসিতে দিল ও সনাতনকে ডাকিয়া দিল।

সনাতন তখন নির্ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া দিল, “ভাজে, আমরা ঘুমিয়েছিলুম, তা আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে”

“তা হোক, এখন চল, মাঠে যেতে হক্কোতখানা দেখতে হবে। কৈ, তোমার কৈ কৈ?”

সনাতন। আজ্ঞে, জন ঠিক করেছে, এই বাই। আপনি অনেকটা পথ চ’লে এসেছেন, একটু দুখ থাকবেন কি?

চেম। আবশ্যক নাই।

সনাতন। “না, একটু খান, আমাদের তাঁহার বিশাল শরীর তুলিলেন। মুখখানি বাড়ীর গরুর ছুৎ একটু খান।” এই বলিয়া একখানি মধ্যমাকৃতি কাল-পাথরের খালা সনাতন ছুৎ ছুইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর-জার, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জল বর্ণ। শাট আনিয়া।

দোয়া ল সনাতনের স্ত্রী একটু ঘোমটা দিয়া এ ছেলে কোলে করিয়া এক বাটি দুধ বাবুছে আনিয়া ধরিল। হেম আনন্দচিতে ক্রেশকের ভাস্কর্য্য দুধ পান করিলেন।

সনাতনও লোককোডাকি করিয়া হাজির করিয়া দুইখানি ও চারিটি বলদ লইয়া প্রস্তুত হইল। ল ক্ষেতের দিকে চলিল। পথে অস্ত্রাখা হইতে হইতে সনাতন বলিল, “তা এত কষ্ট ক’রে যাবেন কেন? আমাদের জমিন ছুটা চাষ দিয়েছি, আর ণব হলোই হয়, আজ সব হয়ে যাবে, তাই ফাল খান বুনে দেব। আপনি আর কোন কেন?”

হেম। না, আমি অনেক দিন অবধি আমার জমীটা দেখিনি, তোরা কি কচ্ছিস্ না কচ্ছিস্, একবার দেখা ভাল, তাই আজ সকালে মনে করলেম, একবার দেখে আসি।

সনাতন। তা দেখুন না, আপনার জিনিস দেখবেন না? জমীটা ভাল, ধান বেশ হয়, তবে আপনারা ভদ্রলোক, জন খাটিয়ে চাষ করাতে হয়, তাই বোধ হয়, আপনাদের তত লাভ হয় না।

হেম। সামান্যই লাভ হয়। তোমাদের জন-মজুরদের দিয়ে বেশী থাকে না। গেল বার ২০০২৫০ মণ ধান হয়েছিল, কিন্তু তোদের দিয়ে, বীজ-খরচ দিয়ে, জমীদারের খাজনা দিয়ে ১০০ টাকার বড় বেশী ঘরে উঠেনি।

সনাতন। তা বাবু, সেই যে একবার বলেছিলেন, জমীটা ভাগে দেবেন, তা কি এখন ইচ্ছে আছে? যদি দেন, তবে আমাকেই দেবেন, আমি আপনার বাড়ীর চাকর, আপনার বাপের আমল থেকে ঐ জমী করছি। আপনাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না, কিছু দেখতে হবে না, আমি নিজের খরচে চাষাবাদ করব, আমার হাল গরু সবই আছে, বছরের শেষে অর্ধেক ধান মেগে গাড়ী করে আপনার বাড়ী পৌঁছিয়ে দেব।

হেম। কেন বল দেখি, তোর ভাগ নেবার এত ইচ্ছে কেন?

সনাতন। আজ্ঞে, আপনি ত জানেন, আমার একখানি নিজের ছোট জমী আপনার জমীর পাশে আছে, কিন্তু ৮১০ কুডো, তাতে পেট ভরে না, আপনাদের কাছে নজুরি করে যা পাই, তাতেই আমার চলে। তবে যদি আপনার জমীটা ভাগে পাই, তবু লোকের কাছে বলতে পারব, এতটা জমী ভাগে করি। আর আপনাদের বড় খরচ হয়,

আমরা ছোট লোক, আমাদের চাষে তত খরচ হবে না, দুই পরশা পাব, ছেলেগুলো খেয়ে বাচবে।

হেম। তা আচ্ছা, দেখা যাক কি হয়। তুই এখন ত আমার জমীটা বুনে দে, তার পর যা হয় কর্বো এখন।

এইরূপ কথাবার্তা করিতে করিতে হেমচন্দ্র, সনাতন ও সনাতনের লোকজন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া যাঠে গিয়া পড়িলেন।

বৈশাখ মাসের দুই একটি বুড়ির পর সকল জমীই চাষ হইতেছে। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে কৃষকগণ আনন্দে গান করিতে করিতে অথবা গুরুক নানারূপ নিকট-গৃহ-বাচক কথা উত্তেজিত করিতে করিতে চাষ দিতেছে। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র, বঙ্গদেশে উর্বরা-ভূমির অস্ত নাই, তাহা বাঙ্গালী-দিগের প্রাণসর্বস্ব। জমীর পাখড় আইলের উপর দিয়া অনেক জমী পার হইয়া অনেক কৃষকের কৃষি-কার্য দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র নিজ জমীর দিকে বাইতে লাগিলেন; কিন্তু অজ্ঞও তাঁহার জমী দেখা হইল না, পথে তিনি সহসা তাঁহার স্বত্তরমহাশয় তারিণীবাবুকে দেখিতে পাইলেন। তারিণীবাবু পূর্বদিন কার্যবশতঃ অল্প গ্রামে গিয়াছিলেন। অল্প প্রত্যাবে বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া প্রশ্নাম করিলেন, তিনিও আলীকাদ করিয়া কহিলেন, “এ কি বাবা, এখানে মজুরের সঙ্গে কোথা যাচ্ছ? এস, ঘরে এস। তবে ভাল আছে? আমি প্রত্যাহই মনে করি, তোমাকে একবার ডেকে পাওয়াই, তবে কি জান, বর্তমান থেকে ছুটি নিরে এসে অবধি নানা বিষয়কার্যে বিভ্রত, আর শরীরও ভাল নেই, আর ছেলেগুলোকে টিকটিক

ক'রে বলি, তোমাকে একবার নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে, তা যদি তারা ঘর থেকে একবার বেরোয়। তা তুমি একদিন এস, খাওয়া দাওয়া করো।”

হেমচন্দ্র ঋগুরমহাশয়ের সঙ্গে ফিরিলেন; বলিলেন, “আজ্ঞে, তা বাব বৈ কি, আমিও মনে করেছিলাম, আজকালের মধ্যে একদিন দেখা ক'রব, কিছু আবশ্যক আছে। মহাশয়ের যদি অবকাশ থাকে, তবে আজই সন্ধ্যার সময় আসি।”

তারিণী। তা তুমি ঘরের ছেলে, আবার অবকাশ অনবকাশ কি, বখন আসবে, তখনই দেখা হবে। বাছা উমাতারা ঋগুরবাড়ী হ'তে এসেছে, সেও কতবার বলেছে, বাবা, একবার হেমবাবুকে নিমন্ত্রণ কর না, আর গিন্নীও জোমার কথা কত বলেন। তা আসবে বৈ কি, এস, আজ সন্ধ্যার সময় এস, কিছু জল-যোগ করো।

এইরূপ, কথাবার্তা করিতে করিতে উত্তরে একত্রে গ্রামে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড়মানুষের কথা।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র তারিণীবাবুর বাড়ীতে বাটিলেন। বাড়ীর বাহিরে গোয়াল-ঘর আছে, দু' তিনটি ধানের গোলা আছে, একটি পুতার চণ্ডীমণ্ডপ আছে ও তাহার সম্মুখে যাত্রার একখানি বড় আটচালা আছে। নাজীর-বাবুর বাড়ীতে বড় ধুমধামে দুর্গাপূজা হয়, নাচ-গাওনা-বাজনা হয়, প্রসিদ্ধ যাত্রার দল বৎসর বৎসর আইসে এবং গ্রামের লোকে সে বাটী সমাকীর্ণ হয়। প্রতিবারই নাজীর মহাশয় পূজার সময় বাড়ী

আসেন, এবার কোন আবশ্যকের জন্য বৈশাখ মাসে এক মাসের ছুটি লইয়া আসিয়াছেন।

আজ দুই বৎসর হইল, তারিণীবাবু আপনার বসিবার জন্য বাহিরে একটি পাকা ঘর করিয়াছেন এবং বাড়ীর পার্শ্বে কতকগুলি ইটের পাঁজা পোড়ান হইয়াছে, গৃহিণীর বড় ইচ্ছা যে, শুইবার ঘরটিও পাকা হয়। সেই পাকা বৈঠকখানা ঘরে একটি তেলের বাতী জলিতেছে, একটি বড় তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চ ও চাদর বিছান আছে, তাহার উপর তারিণীবাবু বসিয়া ধূম-সেবন করিতেছেন, পাড়ার ৪৫ জন লোক সম্মুখে বসিয়া নানারূপ আলাপ ও গল্পহস্ত করিতেছে।

হেমচন্দ্র আসিবামাত্র তারিণীবাবু তাঁহাকে বসিতে দিলেন এবং দুই চারিটি মিষ্টান্ন করিয়া একটি ছেলেকে বাড়ীর ভিতর লইয়া বাইতে বলিলেন।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সম্মুখে শুইবার ঘর, উচ্চ ভিটার উপর স্নানর বড় আটচালা, তাহার এ পাশে ও পাশে উচ্চ ভিটার উপর স্নানর স্নানর তিন চারিখানি চৌচালা বা পাঁচচালা ঘর। ঘরের ভিত্তিগুলি স্নানররূপে লেপা, উঠান ঝাঁট দেওয়া পরিষ্কার এবং তাহার এক পার্শ্বে রান্নাঘর। বাটীর পশ্চাতে একটি বড় রকম পুকুর; তাহার চারিদিকে বাগান; মারিকেল, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি নানারূপ ফলের গাছ আছে।

হেমচন্দ্র বাড়ীর ভিতর আসিয়াই বাড়ীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পার হইয়াছে, শরীরখানি গোরবর্ণ, স্থূল এবং কিছু বর্ষ হইলেও জন্মকাল। স্থূল বাহুর উপর মোটা মোটা তালি ও বাজু বাহুর সৌন্দর্য্য

সংসারের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। হাতে মোটা মোটা দুইগাছি বালা, পায়ে মোটা মোটা মল। তাঁহার সেই বহুমূল্য গহনা ও বৌবনের শরীরখানি দেখিলে, তাঁহার আন্তে আন্তে চলন ও ভারি ভারি পদবিক্ষেপ দেখিলে, তাঁহার অন্ন অন্ন হাসিমাথা একটু একটু গোরব ও দর্পমাথা কথাগুলি শুনিলে তাঁহাকে বড়মানুষের গৃহিণী বলিয়া বোধ হয়। তথাপি তারিণীবাবুর গৃহিণী মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটা সাদা, তাঁহার কথাগুলিতে একটু দর্প থাকিলেও হান্তপূর্ণ ও মিষ্ট, তিনি আপনার সুখ্যাতি বা ধন-গোরবের কথা শুনিতে ভালবাসিলেও পরের নিন্দা, পরের অনিষ্ট বা পরকে ক্রোধ দেওয়া ইচ্ছা করিতেন না।

শান্তডী। বলি, বাড়ীর পাশে বাড়ী, তবু কি একদিনও আসতে নেই? বুড়ী আছে কি নরেকে ব'লে আর খবর নাও না?

হেম। না, তা নয়, প্রত্যহই আপনাদের খবর পাই, তবে আমাদের অবস্থা সামান্য, সর্দাদাই কাজকর্মের রত থাকতে হয়।

শান্তডী। হাঁ, এখন তাই বল্বে বই কি? এই এত ক'রে বিন্ধকে হাতে ক'রে মানুষ করলুম, এত ক'রে বিয়ে-থা দিলুম, তা সেও কি একবার জিজ্ঞাসা করে না যে, জোঠাইমা কেমন আছে?

হেম। সে সর্দাদা আপনার তত্ত্ব নেয়, আর এই উমাতারা এসে অবধি একবার আস্বে আস্বে মনে করছে, কিন্তু সংসারের সকল কাজ তাকেই করতে হয়, আর ছেলেটিরও ব্যায়রাম, সেইজন্যই আস্বে আস্বে পারে না। তা উমাতারা যদি একদিন আমাদের বাড়ী যায়, তবে তার বোনের সঙ্গেও দেখা হয়, ছেলে-দুটিকেও দেখে আসতে পারে।

শান্তডী। না বাপু, উমার যে ঘরে বিয়ে

হয়েছে, তাদের এমন মত নয় যে উমা কারও বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। তারা ভারী বড়মানুষ, ধনপুত্রের বনিয়াদী বড়মানুষ, ঐ যে আগে ঘনেশ্বর ব'লে নবাবদের দেওয়ান ছিল না, তাদেরই ঝাড়, ভারী বড়লোক, সে অঞ্চলে তেমন ঘর নাই।

হেম। হাঁ, তা আমি জানি।

শান্তডী। হাঁ, জান্বে বৈ কি, তাদের ঘর কে না জানে? ক্রিয়া, কর্ম, দান, ধর্ম, সকল রকমে, বুঝলে কি না, তাদের যেমন টাকা, তেমনি যশ। এই এবার তাদের একটি মেয়ের বিয়ে হ'ল বর্দ্ধমানে, ঐ ইনি যেখানে কর্ম করেন, সেইখানে, তা বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করলে। তাদের কি আর টাকার গুণাগুণি আছে? বছর বছর পূজা হয়, তা দেশের যত বামুন আছে, বুঝলে কি না, এ ধনপুত্রের দক্ষিণা পায় না, এমন বামুনই নেই।

হেম। তা আমি জানি।

শান্তডী। তা উমাকে কি শীগগির পাঠায়, সেই পূজার সময় একবার ক'রে পাঠায়, আর পাঠায় না। এবার এই ইনি ছুটি নিয়ে এসেছেন, তাই কত লোং পাঠিয়ে ইটাইটি ক'রে তবে উমাকে পাঠিয়েছে। তাও ব'লে দিয়েছে, ১৪ দিনের বাড়ি যেন একদিনও না থাকে, তা এই ১৪ দিন হলেই পাঠাব। এই বর্দ্ধমানে আমাদের লোক গিয়েছে, কাপড়, সন্দেশ, আঁব, লিচু, এই সব আনুত দিয়েছি, মেয়ের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বড়ঘরে মেয়ে বিয়ে দিলে কিছু খরচ কর্তেই হয়।

হেম। তা করই ত, তা এর মধ্যেই আমার ব্রীকে ছেলেকের নিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন। সে উমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে।

শান্তডী। হাঁ, তা আস্বে বৈ কি; বিন্ধ আমার পেটের ছেলের মত, সে আস্বে না।

সে আসবে, আর তুমিও বাছা মধ্যে মধ্যে এসো, আমাদের বৌদ্ধ-খবর নিও।

হেম। হাঁ, তা আসবো বৈ কি। এখন উমা আর আছে ক'দিন?

বাণ্ডী। আর আছে কৈ? এই বর্জমান থেকে আঁব সন্দেশ এলেই উমাকে পাঠিয়ে দেব; মেয়ের সঙ্গে কিছু না দিলে ত ভাল দেখায় না, বড়মাত্র কটুম করেছি, কিছু না দিলে বুলে কি ভাল দেখায়? আবার লেখ, এই আসছে মাসে বক্সিবাটা, আবার তত্ত্ব করতে হবে। তাতেও বিস্তর খরচ আছে।

হেম। তা বটেই ত।

বাণ্ডী। কাজেই যেমন কটুম করেছি, তেমনই তত্ত্ব করতে হয়, লোকের কাছেও আমাদের একটু মানদণ্ড আছে, কুটুমেরাও জানে, আমরা বিধবা লোক, কাজেই কিছু দিয়ে ধুরে তত্ত্ব না করলে ভাল দেখায় না। তবে তোমার ছেলে দুটি ভাল আছে?

হেম। না, খোকার ৫।৭ দিন থেকে রাখে একটু গা গরম হয়, তা আমি কাল কাটোয়া থেকে ঔষধ এনে খাওয়াছি, আজ একটু ভাল আছে।

বাণ্ডী। বেশ করেছ, বাছা বিন্দুও ঐ রকম ছিল, কাহিল ছিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হ'ত। আহা, সেদিনকার ছেলে, বাছা এমন ধীর শান্ত ছিল যে, মুখটি খুলে কখনও কিছু চায় নি, আমি বতকণ না ডেকে তাকে ভাতখাও-রাতেম, ততকণ সে মুখটি তুলে একবার বলতো না যে, জোঠাইমা কিদে পেরেছে। জোঠাই-মা তার প্রাণ; তার বাপ ম'রে অবধি তাল্ল মার আর মনস্থির ছিল না, স্ত্রতরাং বিন্দুকে আর স্নানকে আমি বতকণে খাওয়াতেম, ততকণে খেত, বতকণে পরাতেম, ততকণে পড়ত। আমার উমাতারা যে, বিন্দুও সে, আহা, বেঁচে থাকুক, একবার আসতে বলো।

হেম। হাঁ, আসবে বৈ কি।

বাণ্ডী। এই পূজার সময় বিন্দু এল, আবার সেই দিনই চ'লে গেল; এবার পূজার সময় ত তা হবে না। ঘরের মেয়ে, পূজার সময় ঘরে ৫।৭ দিন থেকে কাজকর্ম করবে। আর কাজকর্ম ত এমন নয়, এই আমাদের ঠাকুর দর্শন করতে, বুঝতে কি না, এই তাঃ ক্রোশের মধ্যে বত গ্রাম আছে, সব গ্রামের কি ইতর, কি ভদ্র সবাই আসে। তোমরা বাছা বাইরে থেকে এস, বাইরে থেকে চ'লে যাও, ঘরের কাজ ত জান না। রাত তিনটের সময় হাঁড়ি চো

তিনটে পর্যন্ত উঠনের জাল নেবে না, তবুও কুলিয়ে উঠতে পারিনি! লোকই কত, খাওয়া-দাওয়াই কত, তার কি সাম্য-পরি-সাম্য আছে?

হেম। তা আর আমি দেখিনি? প্রতি বছরই দেখছি। আপনার বাড়ী পূজার ধুমধাম, এ সকলেই জানে।

বাণ্ডী। তা কি জ্ঞান বাপু, বংশাধুগত ক্রিয়াকর্মটা উনি না করলে নয়। তবে দি টাকা না থাকত, সে আলাদা কথা। এই গ্রামে কি সকলেই পূজা করে, এই তোমরা কি পূজা কর, তা ত নয়, তার জন্য লোকে ত কিছু বলে না, তবে আমাদের পুরুষাত্মকমে থেকে এটা আছে, মল্লিকদের বাড়ীর একটা নাম আছে, এ'র চাকরীও আছে, কাজেই আমাদের না করলে নয়, এই জন্য করা।

হেম। তা বটেই ত।

কতকণ পর্যন্ত হেমচন্দ্র এই মল্লিকবাড়ীর ইতিহাস, ধনের ইতিহাস, পূজার ইতিহাস, ধনপুয়ের ধনখরের বংশের গৌরব, মেয়ের গৌরব, তত্ত্বের গৌরব, এই সমুদয় হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সেই দিন সায়ং-কালে শুনিয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠিক

নি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, কখনও পর হেমচন্দ্রের (দৈনিক পরিভ্রমের জন্যই বোধ হয়) চক্ষু দুটি একটু একটু ম্লিত হইয়া আসিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তিনি কথার স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করিয়াই “তা বটেই ত,” “তা বৈ কি” ইত্যাদি খাত্তীর সজোব-জনক শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময় কুম্ কুম্ করিয়া শব্দ হইল; ধনপুরের ধনেবর-বংশের পুত্রবধু, বোড়ববর্ষীরা, হীরক-মুক্তা-বিভূষিতা, রূপাভিমানিনী উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

উমাতারা অতিশয় গৌরবর্ণা, মুখখানি কাঁচা সোনার মত এবং তাহার উপর সুবর্ণ ও হীরকের জ্যোতি বড় শোভা পাইতেছে। মাথায় স্নানর চিকণ কালো চুলের কি স্নানর চিকণ ধোঁপা, তার উপর কপালে জড়োয়া-সিঁতির কি বাহার হইয়াছে! ধোঁপায় সোনার ফুল, সোনার প্রজাপতি, আর একটি হীরার প্রজাপতি! হাতে পৈঁচা, যবদানা, মরদনা, আর জড়োয়া বালা; বাহতে জড়োয়া তাবিজ ও বাজুর কি শোভা! পিঠে পিঠকাঁপা ছলিতেছে, কণ্ঠদেশে চন্দ্রবিন্দু-ম্লিত চন্দ্রহার! গলায় চিক, বৃকে সখের-সাতনের যুক্তাহার! হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “ইস, আজ কি ভাগ্যি, না জানি, কার মখ দেখে উঠেছি!”

হেমচন্দ্র। আশার ভাগ্যি বল; ভাগ্যি না হইলে কি তোমার মত লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়?

উমা। হ্যা গো হ্যা, তা নৈলে আর এই দশদিন এখানে এসেছি, একবারও দেখা করুতে আস না? তা বা হোক, ভাল আছ ত? বিন্দু দিদি ভাল আছেন?

হেম। সে ভাল আছে তুমি ভাল আছ?

উমা। আছি, যেমন রেখেছ, তবু জিজ্ঞাসা করলে, এই ঢের! তা আজ এখানে আমা-দের দর্শন দিলে কি মনে করে? বিন্দুদিদি যে বড় ছেড়ে দিলে, এতক্ষণ এখানে আছ, রাগ করবেন না ত?

হেম। তোমার বিন্দুদিদি আগনি আসতে পারলে বাচে, সে আর ছেড়ে দেবে না? সে এই কত দিন থেকে তোমাকে দেখবার জন্য আসবে আসবে করছে। তা কাল-পরশুর মধ্যে একদিন আসবে।

উমা। তবে কালই পাঠিয়ে দিও। দেবে ত?

হেম। আচ্ছা, কালই আসবে। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করুতে অতিশয় উৎসুক, তুমি শশুরবাড়ী থাকলে সর্বদাই তোমার মার কাছে তোমার ঘর জেনে পাঠায়।

উমা। তা আমি জানি। বিন্দু দিদি আমাকে ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাসে, ছেলেবেলা আমরা দুজনে এক সঙ্গে খেলা করতাম, সে আমাকে এক দণ্ড না দেখে থাকতে পারত না। ছেলেবেলা মনে করু-তুম, বিন্দুদিদির সঙ্গে চিরকাল একসঙ্গে থাকব, প্রত্যহ দেখা হবে, কিন্তু ছেলেবেলার ইচ্ছাগুলি কি কখনও সম্পন্ন হয়? মনের ইচ্ছা মনেই থাকে। তা কাল তোমার ছেলেটিকেও পাঠিয়ে দেবে?

হেম। দেব বৈ কি, অবশ্য দেব।

উমাতারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উমার পিতার ধনলিপ্সার, মাতার ঘনগৌরবে, শশুরবাড়ীর বড়মামুয়ী চালে, উমার বাল্যহর্ষ, বাল্য ভালবাসা একেবারে বিনষ্ট করে নাই, সে এখনও বাল্যকালের সৌহৃদ্য কখন কখন

মনে করিত, বাণ্যকালের সুহৃদকে একটু স্নেহ করিত। ধনপুত্রের ধনেশ্বর-বংশের পুত্রবধূর অপূর্ণ রূপগরিমা ও বহুমূল্য হীরক-মুক্তাদি দেখিয়া আমরা প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিলাম—এগুলি দেখিলেই আমাদের একটু ভয়সঞ্চার হয়—এক্ষণে, বাহা হউক, তাঁহার হৃদয়ের সদগুণ দেখিয়া কথঞ্চিৎ আশস্ত হইলাম; আর এই সামান্য সদগুণটি জগৎসংসারে সচরাচর দেখিতে পাইলে সুখী হইব। অস্তান্ত কথাবার্তার পর উমা বলিলেন, “তবে এখন একবার উঠ, অল্পগ্রহ ক’রে বথন এসেছ, একটু জলটল খেয়ে যাও, জলখাবার তৈয়ের হয়েছে।”

উমা কন্ম কন্ম করিয়া আগে আগে গেলেন, হেমচন্দ্র বিনীতভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। খাবার ঘরে ঢুকিলেন, খাবার সম্বন্ধে চুটি সামান্য জলিতেছে, রূপার খালে খানকতক লুচি, আর নানারূপ মিষ্টান্ন, চারিদিকে রূপার বাটিতে নানা রকম বাজান ও দুগ্ধ-ক্ষীর, যেম পূর্ণচন্দ্রের চারিদিকে কত নক্সা বেটন করিয়া বহিয়াছে। হেমচন্দ্রের কপালে এরূপ আয়োজন, এরূপ খাবার-দাবার সহসা ঘটে না, এই রোপ্য-সামগ্রীর মূল্যে তাঁহার এক বৎসরের সাংসারিক খরচ চলিয়া যায়।

উমাতারা আবার বলিলেন, “তবে বেতে বসো, পরিবনের বথাসাধ্য কিছু করছি, ক্রটি হয়ে থাকলে কিছু মনে করো না।”

ভালীর সহিত অনেক মিষ্টালাপ করিতে করিতে হেমচন্দ্র আগার করিতে লাগিলেন। যে বৎসর বিন্দুর বিবাহ হইয়াছিল, তাহারই পর বৎসর উমার বিবাহ হয়। উমা জড়িলার দৌরবর্ণী ও সুন্দরী, হেমচন্দ্রের মতে উমার চেয়ে বিন্দুর নয়ন ছুটি সুন্দর ও সুখের অধিক, কিন্তু এ বিষয়ে হেমচন্দ্র নিরপেক্ষ

সাক্ষী নহেন, সুতরাং তাঁহার দৃষ্টি আমরা গ্রাস করিতে পারিলাম না। তবে সকলে বলিত, বিন্দু কালো মেয়ে, উমা সুন্দরী এবং সেই সৌন্দর্য্যগুণেই উমার বড় ঘরে বিবাহ হইল। ধনপুত্রের জমীদারের ছেলে সুন্দরী না হইলে বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়া ছিলেন, উমা সুন্দরী মেয়ে বলিয়া তাঁহার সেই স্থানে বিবাহ হইল।

তারিণীবাবু এত ধনবান্ সঞ্চয় করিয়া অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতেন, তারিণীবাবুর মহিষীও ধনপুত্রের দাসীর নিকট গল্পনা সহিতেন; কিন্তু বড়মানুষের কাছে লাঞ্ছনাটাও নয়, গরিবের একটি কথা নয় না।

তারিণীবাবু ধনী কুটুম্ব করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার মান-সম্মান বাড়িল; তিনি ক্রমে দেশের মধ্যে একজন বড়লোক হইতে চলিলেন। এরূপ লাভ হইলে গোপনে দুই একটি গল্পনা ও তিরস্কার ও কুটুম্বের ঘৃণা কোন্ বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকে হেলায় না বহন করেন?

উমাতারার টাকার সুখ হইল, অস্ত্র সুখ তত হইয়াছিল কি না, জানি না, যদি এই উপজ্ঞাসের মধ্যে ধনপুত্রের জমীদার-পুত্রের সহিত কখনও দেখা হয়, তবে সে কথার বিচার করিব। তবে শুনিয়াছি, বয়সের সহিত সেই জমীদার-পুত্রের রূপ-লালসা বাড়িতে লাগিল এবং নানা দিকে প্রবাহিত হইল। কিন্তু বড়মানুষের কথার আমাদের এখন কাজ নাই, আমরা গরিব গৃহস্থের ইতিহাস লিখিতেছি।

উমার স্বতরাবড়াতে অন্নকষ্টেরও অভাব ছিল না। গরিবের মেয়ে বলিয়া তাঁহাকে কখন কখন কথা সহিতে হইত, ননদদিগের লাঞ্ছনা, সময়ে সময়ে দাসীদিগেরও গল্পনা! কিন্তু পা-ময় গহনা পরিলে বোধ হয়, অনেক

ইকমু সর, তাহার ও জড়োয়া দেখিলে বোধ হয়, হৃদয়জাত অনেক ছুঃখের হ্রাস হয়। এ শাস্ত্রে আমরা বড় বিজ্ঞ নহি, সুবর্ণরৌপ্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, জড়োয়া চক্ষুতে বড় দেখি নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও জানি না। হীরকের জ্যোতিতে মনের মালিঙ্গ ও অন্ধকার কতদূর দূর হয়, বিজ্ঞবর পণ্ডিত ও পণ্ডিতাগণ নির্দ্ধারণ করুন। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অববি উমাতারার সহিত বাকালাপ করিতে করিতে এবং অনেকবার উমাতারার সেই সুবর্ণমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে একটু সন্নিহন হইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেম, সেই হীরকমণ্ডিত হৃদয় ললাটে এই বয়সেই এক একবার চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে, যেন সেই হাস্ত-বিস্ফারিত নয়নের প্রান্তে সময়ে সময়ে চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। এটি কি প্রকৃতই চিন্তার ছায়া, না সেই সামান্যের আলোক এক একবার বায়ুতে স্তিমিত হইতেছে, তাহার ছায়া? না ভবিষ্যৎ জীবন সেই বোনের ললাটে আপন ছায়া অঙ্কিত করিতেছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিষয়কর্ণের কথা ।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বাহির-বাটীতে আসিলেন, গাধিলেন, তারিণীবাবু তখন একাকী বসিয়া আছেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একখানি কাগজ পড়িতেছেন, সেখানি দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা

মাসিক পত্র নহে, সে একটি পুরাতন তমক-সূক। তারিণীবাবুর কপালে বয়সের দুই একটি রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, শরীর দুঃল, বর্ণ শ্রাম, চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কিন্তু উজ্জল, মস্তকে টাক পড়িতেছে, সম্মুখের কয়েক-গাছি চুল পাকিয়াছে। তারিণীবাবুর আকারে বা আচরণে কিছুমাত্র বাহ্যভবর বা অর্থের দর্প ছিল না, যাহারা বিষয় সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের সেগুলি থাকে না, যাহারা ভোগ করেন বা উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের সেগুলি ঘটয়া থাকে। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া তারিণী-বাবু কাগজখানি রাখিলেন, ধীরে ধীরে চসমাটি খুলিয়া রাখিলেন, পরে নম্র ও ধীরবচনে বলিলেন, “এসো বাবা, বসো।” হেমচন্দ্র উপবেশন করিলেন।

মিষ্টালাপ ও অন্তান্ত কথা পর হেমচন্দ্র বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন, তারিণী-বাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহা শুনিলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিলেন।

হেম। অনেক দিন পরে আপনি বাড়ী এসেছেন, আপনাকে দেখে ও কথাবার্তা শুনে বড় সুখী হলেম, যদি অল্পমতি করেন, তবে একটু বিষয়কর্ণের কথা বলতে ইচ্ছা করি।

তারিণী। ই, তা বল না, তার আবার অল্পমতি কি বাবা, যা বলতে হয় বল, আমি শুনি।

হেম। আমার স্বত্তর মহাশয় যে সামান্য একটু জমী চাষ করাতেন, তারই কথা বলছি।

তারিণী। বল।

হেম। সে জমীটুকু আমার স্বত্তর মহাশয় আজীবন দখল করতেন ও চাষ করাতেন। তাঁর পূর্বের তাঁর পিতা আজীবন চাষ করাতেন, তা অবশ্যই আপনি জানেন।

তারিণী। জানি বৈ কি। হরিদাসের পিতার পূর্বে তাঁর পিতা সেই জমী চাষ করাতেন, তিনি আমারও পিতামহ, হরিদাসেরও পিতামহ। তখন আমরা বালক ছিলাম, কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে। পিতামহের কাল হ'লে আমার পিতাই সমস্ত জমী চাষ করাতেন, হরিদাসের পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিষয়বুদ্ধি বড় ছিল না। এই জন্য আমার পিতাই সমস্ত সম্পত্তি একজমালিতে তত্ত্বাবধান করতেন পরে আমার জ্যেষ্ঠা, হরিদাসের পিতা, পৃথক্ হয়ে গেলে তাঁর জীবনযাপনের জন্য আমার পিতা তাঁকে কয়েক বিঘা জমী চাষ করিতে দিয়াছিলেন খাজ। হরিদাসও আজীবন সেই জমীটুকু চাষ ক'রে এসেছেন মাত্র, কিন্তু আমাদের এ সম্পত্তি একজমালি। এ সকল কথা বোঝ বয়, তুমি জান না, কেমন ক'রেই বা জানবে, তুমি সে ষ্টিদিনের ছেলে, আর সেলেবেলা ত গ্রামে বড় থাকতে না, বড়মানে ও কল্কেতার লেখাপড়া কর্তে।

হেমচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সম্পত্তি একজমালি, তাহা এই নূতন শুনিলেন। তারিণী-বাবুর এই নূতন সুন্দর তর্কটি শুনিয়া তাঁহার একটু হাসি পাইল, কিন্তু অত্যা তিনি তর্ক থণ্ডন করিতে আইসেন নাই, আপোস করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং হাসি সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “পূর্বের কথা আপনি আমাপেক্ষা অনেক জানেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই-মাত্র বলছিলাম যে, স্বত্তরমহাশয় যে জমী আজীবনকাল পৃথক্‌রূপে চাষ ক'রে এসেছেন, তা হ'তে তাঁর অনাথা কত্কা কিছু প্রত্যাশা কর্তে পারে কি?”

তারিণী। আহা! বাছা বিন্দু এই বয়সেই পিতা-মাতা-হারা হয়ে অনাথা

হয়েছে, তাহা ভাবলে বুক ফেটে যায়। আহা! আজ যদি হরিদাস মৃত, এমন সোনার চাঁদ মেয়েকে নিয়ে, এমন সচ্চরিত্র সোনার জামাইকে নিয়ে ঘর কর্তে পারত, তা হ'লে কি এত গণ্ডগোল হ'ত, এত খরচ ক'রে আমাকে তার কবিত জমীটুকু রক্ষা কর্তে হ'ত? তবে ভগবানের ইচ্ছা, হরিদাস গেছেন, আমাকে একলাই সমস্ত ভার বহন কর্তে হল; একজমালি জমীর যে অংশটুকু তিনি চাষ করাতেন, তা পুনরায় অন্ত্যস্ত জমীর সঙ্গে আমাকেই তত্ত্বাবধান কর্তে হচ্ছে। তাতে আমার লাভ বিশেষ নেই, সেই জমীটুকু রক্ষার জন্য তার মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় কর্তে হয়েছে। কিন্তু কি করি, পৈতৃক সম্পত্তি পরের হাতে যায়, জমীদার অন্তকে দেয়, তা আর চাখ দেখা যায় না।

হেম। তবে স্বত্তরমহাশয়ের জমী হ'তে কি তাঁর কত্কা কিছুই প্রত্যাশা কর্তে পারে না?

তারিণী। কত্কা প্রত্যাশা আবার কি বল আমরা বুড়ো ছাড়া? কত্কা লোক তোমরা কালেতে ছেলে, কত্কা লোক বয়সে বয়সে সব কথা একটু ভেদে বললে কি বুঝে? কত্কা উঠতে পারি? বিন্দু আম দেয় বারের মধ্যে কত্কা, আমার উমা যে, বিন্দু সে, স্বত্তর দিন জমীদার ঘরে এক কুনকে চা আছে, স্বত্তর দিন কত্কা বিন্দু ও উমা তার সম ভাগ ক'রে খাবে, তাতে আবার জমী অংশই কি, প্রত্যাশা কি?

হেমচন্দ্র বেশ মনে তারিণী-বাবুর সবিপেরে উঠা কথা শুনি, তারিণী-বাবুর সুন্দর ও তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না অনেকক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝা চো করিয়া, অনেকক্ষণ কত্কা প্রত্যাশা কহিয়া অবশেষে কহিলেন, “স্বত্তরমহাশয় যদি অল্পমতি

কেন, যদি রাগ না করেন, তবে আর একটি কথা বলি।’

তারিণী। বল বাবা, এতে রাগের কথা কি আছে? তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথার আবার রাগ?

হেম। আপনি বোধ হয় জানেন যে, শুর মহাশয় যে জমী আজীবনকাল পৃথক-রূপে চাষ করে আসছিলেন, তা যে এজমালি সম্পত্তি, তা আমরা স্বীকার করি না।

তারিণী। তোমরা স্বীকার করবে কেন? তোমরা কালেক্টর ছেলে, ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছ, তোমরা কি আর এজমালি স্বীকার করবে? এখন কালেক্টর ছেলেরা ভায়ে ভায়ে একত্র থাকতে পারে না, শুনেছি, মায়ে পোয়ে এজমালিতে থাকতে পারে না, তোমাদের কথা কি বল? আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, আমরা সে সব বুঝি না, আমরা এজমালিতে থাকতে ভালবাসি, বাপ-পিতামহ যা করে গেছেন, তাই করতে ভালবাসি। আশা, থাকতো আমার হরিদাস, সে জানত, এ জমী মল্লিকবংশের এজমালি সম্পত্তি কি না, তোমরা সেদিনকার ছেলে, তোমরা কি জানবে বল?

হেম। তা বাই হউক, আমরা এজমালি বলে স্বীকার করি না, তা আপনি জানেন। আর এজমালি হোক আর নাই হোক, সে সম্পত্তির একটি অংশ বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি আমার শুর-মহাশয় যে জমীটুকু চাষ করতেন, একপে আমার গ্রীষ্ম পক্ষে আমি যদি সেই জমীটুকু পৃথকরূপে চাষ করতে চাই, তাতে কি আপনি সম্মত আছেন?

তারিণী বাবু কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া একটি হাসিয়া বলিলেন, “হি বাবা, তুমি স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ,

এমন নির্কুড়ির কথা কেন? মল্লিক-বংশের বংশানুগত এজমালি জমী কি পৃথক করা যায়? তাই যদি পারতেন তবে সেই জমী-টুকুর মূল্যের দশগুণ খরচ করে আমার হাতেই রাখতেন কেন? সঙ্গত কথা বল, তবে শুনতে পারি; অসঙ্গত কথা শুনবে কেমন করে? ওরে হরে! আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা; রাত হয়েছে, আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে শুতে যাই, কা’ল রাত্রিতে গ্রীষ্ম, বড় ঘুম হয়নি, গাটা ঘুম ঘুম করছে।”

উগ্রস্বভাব হেমচন্দ্রের মনে একটু রাগের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তিনি বাস্তবিকই অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। যে জমী তারিণী-বাবুর স্বায়ত্ত্ববিধিবুদ্ধিসম্পন্ন লোক দশ বৎসর দখল করিয়া আসিয়াছেন, সেটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলা অসঙ্গত নহে ত কি? অণেক চিন্তা করিয়া হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “আপনার যদি শোবার সময় গরম থাকে, তবে আমি আর আপনাকে বসিয়ে রাখব না, তবে আর একটি কথা আছে, যদি আজ্ঞা করেন, নিবেদন করি।”

তারিণী। না না, তাড়াতাড়ি উঠো না। অনেক দিনের পর তোমাকে দেখলেম, চম্চু জুড়াল, তোমাকে কি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে? তবে বড় গ্রীষ্ম পড়েছে, তাই গাটা মাটি মাটি করে। তা এখনই আমি শুতে বাব না, বিলম্ব আছে, কি বলছিলে বল।

হেম। আপনি সে জমীটুকু ছেড়ে দিতে অস্বীকার করবেন, তা আমি পূর্বেই শুনেছিলাম, তবে সেই জমীর জন্ত আমরা কিছু কি প্রত্যাশা করতে পারি? এ বিষয়ে মোকদ্দমা করতে আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা, কোন মতে আপোসে এ বিষয়টা মীমাংসা

একটি পরসা দিতে পারি, আমার বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, “তারিণী-বাবু বাজার একরাজিতে একশত টাকা খরচ করেন, আমার দশ টাকা হইলে মাসের খরচা চলিয়া যায়।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “আজ্ঞা আচ্ছা, তাও দিতে আমি সক্ষম হইলম।”

তারিণী। তা হবে বৈ কি, তোমার মত সুবোধ চেলেকে কি আর এ সব কথা বলতে হয়?

আর অনেককণ কথা হইল। বিষয়ী তারিণী বাবু এক একটি করিয়া সমস্ত নিয়মগুলি আপনার সাপক্ষে স্থির করিয়া লইলেন, বিষয়বুদ্ধিহীন হেমচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন না। রাত্রি দেড় প্রহরের পর তারিণী-বাবু হেমচন্দ্রের অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাহাকে সহস্র বর্দ্ধমানে একটি চাকরী করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং তিনি কালে, একজন ধনী, জ্ঞানী, মানী, দেশের বড়লোক হইবেন আশ্বাস দিয়া হেমচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। হেমচন্দ্রও খণ্ডর মহাশয়ের উদ্ভাচরণের অনেক স্তুতিবাদ করিয়া বাড়ী আসিলেন।

আমাদিগের লিখিতে লজ্জা হয়, তারিণী-বাবুও হেমচন্দ্রের এই প্রচুর মিষ্টলাপ ও স্তুতিবাদ তাহাদের পরম্পরের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করে নাই। হেমচন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন, “শাইলক্কে পণের অল্প অংশ পরিত্যাগ করান যায়, কিন্তু ধনী, মানী, বিষয়ী, বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কর্মচারী তারিণী-বাবুর পণ বিচলিত হয় না।” তারিণী-বাবুও তাহার গৃহিণীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া গৃহিণীকে বলিতেছিলেন, “আজকাল কালের ছেলে-

গুলো কি হারামজাদা! আর এই হেমচন্দ্র বা কি পোঁরার, বলে কি না, জ্যেষ্ঠত্বের সঙ্গে যোক্তব্য করবে! বলতেও লজ্জা করে না। শীঘ্র অধঃপাতে যাবে।” গৃহিণী এ কথাগুলি বড় শুনিলেন না, তিনি বদবান্ধুটুখের কথা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

বাল্যকালের বন্ধু।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় হেমচন্দ্র বাটা আসিয়া দেখিলেন, বিন্দু তাহার জন্ত উৎসুক হইয়া পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হেমকে দেখিবারাজ সে শাস্ত মুখখানি ক্ষুণ্ণির্ণ হইল, নয়ন দুটিতে একটু হাসি দেখা দিল, হেমের মুখের দিকে সর্ব্বোচ্চ চাহিয়া বিন্দু বলিলেন, “কি ভাগ্যি, তুমি এতক্ষণে এলে; আমি মনে করলেম, বুঝি বাড়ীর পথ ভুলে গেছ বা উমাতারার কথা ঠেলতে পারুলে না, আজ জ্যেষ্ঠা মশাইয়ের বাড়ী থেকে বুঝি আসতে পারুলে না।”

হেম। কেন বল'দেখি, এত ঠাট্টা কেন? অধিক রাত্রি হয়েছে না কি?

বিন্দু আবার হাসিয়া বলিলেন, “না, এই কেবল ছুপুর রাত্রি! সন্ধ্যা থেকে তোমার একজ- বন্ধু অপেক্ষা করছেন।”

হেম। কে? কে? কে?

“এই দেখবে এস না,” এই বলিয়া বিন্দু আগে আগে গেলেন, হেম পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

বাড়ীর ভিতর বাইবামাজ একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ উঠিয়া তাহার দিকে অগ্র-

বিঃইলেন; হেমচন্দ্র কণেক তাঁহাকে
দিতে পারিলেন না, বিন্দু তাহা দেখিয়া
কণেক মুচকি হাসিতে লাগিলেন। কণেক
পর হেস বলিলেন, “এ কি শরৎ! তুমি
কলুকেতা হ’তে কবে এলে? উঃ, তুমি কি
বলিল গেছ! আমি তোমাকে তোমার
কালীতারার বিবাহের সময় দেখে-
ছিলাম, তখন তুমি বর্দ্ধমানে পড়তে, একবার
বাড়ী এসেছিলে : তখন তুমি সাত আট
বৎসরের বালক ছিলে মাত্র। এখন বলিষ্ঠ
দীর্ঘাকার যুবক হয়েছ, তোমার দাড়ী-পোপ
হয়েছে। তোমাকে কি সহসা চেনা বার?”

শরৎ। নয় বৎসরে অনেক পরিবর্তন হয়,
তার সন্দেহ কি? দিদির বিবাহের পরেই
বাবার মৃত্যু হ’ল, তার পর মাও গ্রাম হ’তে
বর্দ্ধমানে গিয়ে রইলেন, সেই জন্ত আর বাড়ী
আসা হয়নি। আমি এষ্টে স্ন পাশ করলে
পর বর্দ্ধমান হ’তে কলুকেতার গেলেম, মাও
বর্দ্ধমানের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পুনরায় গ্রামে
এসে রয়েছেন, তাই আমাদের গ্রীষ্মের
ছুটিতে বাড়ী এলেম। নয় বৎসরের পর
আপনি আমাতে পরিবর্তন দেখবেন, তাতে
বিস্ময় কি? আমিই তখন দেখেছি, আর
এখন কি দেখছি! বিন্দু দিদি আমার চেয়ে
দুই বৎসরের বড়, আমরা ছেলেবেলায়
সর্বদা একত্রে খেলা কর্তে, আমি মল্লিক-
দের বাড়ী যেতাম, অথবা বিন্দু দিদি সুধাকে
কোলে ক’রে আমাদের বাড়ী দেখতে আস-
তেন, পেরারা-তলার সুধাকে রেখে আঁকশি
দিয়ে পেরারা পেড়ে খেতেন; আজ কি না
বিন্দু দিদি সংসারে গৃহিণী, দুই ছেলের মা!

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তুমি
আর বলো না, তোমার দৌরাখ্যো ভাল-
পুত্রের আঁব-বাগানে আঁব থাকত না,
এখন কলুকেতার গিরে লেখা-পড়া শিখে

তুমি কালেকের ছেলের মতো না কি এক-
জন প্রধান ছাত্র হয়েছ। তখন গেছোদের
মধ্যে একজন প্রধান গেছো ছিলে।”

শরৎ। বিন্দু দিদি, সেও তোমাদের কন্ত।
তোমার আঁঠাই-মা কাঁচা আঁবগুলো খেতে
বারণ করতেন, আমি সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে
লুকিয়ে বেড়া গলিরে স্নায়াঘরে আঁব দিয়ে
আসতাম কি না, বল না?

হেম উচ্ছ্বাস করিয়া বলিলেন, “আর
পরস্পরের গুণ-ব্যাখ্যার আবশ্যক কি,
অনেক গুণ বেরিয়ে পড়েছে! আমিও
তোমাদের বাড়ী যেতাম, সুধাকে তথায়
কখন কখন দেখতে পেতাম, তখন সুধা
৪৫ বৎসরের ছোট মেয়েটি। সুধা! ঘোবে-
দের বাড়ী যেতে, মনে পড়ে? সেখানে
তোমার দিদি তোমাকে কোলে ক’রে নিয়ে
যেতেন, মনে পড়ে, শরৎকে মনে পড়ে?

সুধা। শরৎ-বাবুকে একটু একটু মনে
পড়ে। দিদি আপনি পেরারা পেড়ে খেত,
আমি পাড়তে পারতাম না, শরৎ-বাবু
আমাকে কোলে ক’রে পেরারা পেড়ে
খাওয়াতেন।

হেমচন্দ্র তখন বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, “তোমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া
হয়েছে? শরৎ খেয়েছে?”

শরৎ। হাঁ, বিন্দু দিদি আমাকে বেরূপ
কচি আঁবের অবল খাইয়েছেন, সেও কচি
আঁব কখন খাইনি!

বিন্দু। কেন, নয় বৎসর পূর্বে যখন
গাছে গাছে বেড়াতে, তখন?

শরৎ। হাঁ, তখন খেয়েছি বটে, কিন্তু
তখন ত এমন রেঁধে দেবার কেউ ছিল
না।

বিন্দু। থকবে না কেন? রেঁধে দেবার
তবু নইত না, তাই বল।

হেম। সুধার খাওয়া হয়েছে? তোমার খাওয়া হয়েছে?

বিনু। সুধা খেয়েছে, আমি এই বাই খাই গে। তুমি আর কিছু খাবে না?

হেম। না, তোমার জ্যেষ্ঠা মশায়ের বাড়ীতে যে খেয়ে এসেছি, আর কি খেতে পারি? বাও, তুমি বাও, খাওয়া খাওয়া কর মে, অনেক রাজি হয়েছে।

বিনু রাসা-ঘরে গেলেন। সুধা হেম-চন্দ্রের ভক্ত এতক্ষণ জাগিয়াছিল, এখন রকের উপর একটি মাদুর পাতিয়া শুইল, চিন্তামূল্য বালিকা শুইবামাত্র সেই শীতল নৈশ বায়তে ও শুভ্রবর্ণ চন্দ্রালোকে তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সমস্ত তালপুকুর গ্রাম এখন নিশুন্ম এবং সেই সুন্দর চন্দ্রকরে নিদ্রিত।

হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র সেই রকে উপবেশন করিয়া অনেককণ কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। তালপুকুরের ঘোবৎগ ও বসুবৎগের মধ্যে বিবাহ-সূত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন ও প্রীতি করিতেন। এক্ষণে কণেক কথাবার্তার পর হেমচন্দ্র উন্নতহৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীরপ্রকৃতি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরচ্চন্দ্রের অন্তঃকরণ বুদ্ধিতে পারিলেন; শরচ্চন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত তেজঃপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে পারিলেন। এ জগতে আশাশিগের অনেক পরিচিত লোক আছে, মনের একা অতি অল্প লোকেরই সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অহরূপ লোক দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র বতই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, ততই উভয়দিকের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রাতা দেখিতে লাগিলেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের ভ্রাতা ভক্তি

করিতে লাগিলেন। উভয়দিকের পরস্পর কথোপকথন হইতে হইতে বিনু আহারা সমাপন করিয়া তথায় আসিয়া বসিলেন সুধার মাথার বাঁশ ছিল না, সুতরাং তিনি মস্তকটি আপন ক্রোড়ে স্থাপন করি তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি লইয়া সন্মোখেলা করিতে লাগিলেন।

অনেককণ কথাবার্তার পর হেমো জিজ্ঞাসা করিলেন, “শরৎ, তুমি এবার এ এর, জন্ম পড়ছে, ছয় সাত মাস পরে তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষার অবশ্যই তু যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে এবং পানি পাবে, তার সন্দেহ নেই।” তার পর কি করবে স্থির করেছে?”

শরৎ। কিছুই স্থির নেই। আমার বি, এ, পর্যন্ত পড়তে হচ্ছে। কিন্তু মা গ্রামে থাকেন। এই পরীক্ষার পর গ্রামে থেকে তিনি আমাকে বিষয়টি দেখতে বলেন। তা দেখা থাক কি হয়, আমাদের বিষয়ও অতি সামান্য, বৎসরে সাত আট শত টাকার অধিক লাভ নেই, কোন উপযুক্ত চাকরী পেলে করুতে ইচ্ছা আছে। মা চাকরী-স্থানে আমার সঙ্গে থাকবেন, এখানে লোকজন বিষয় দেখবে।

হেম। তা বা হয়, তোমার পরীক্ষার পর হবে। এই কয়েকমাস কলকাতার থেকে মনোবোগ করে পড়া-শুনা কর, ‘এন্ট্রান্স’ পরীক্ষা যে রকম সম্বানের সহিত দিরাছ, এই পরীক্ষাটা সেইরূপ দাও।

শরৎ। সেইরূপ ইচ্ছা আছে। শীঘ্র কলকাতার গিয়ে পড়তে আরম্ভ করব। আমি মনে মনে এক একবার ভাবি, আপনারাও কেন একবার কলকাতার আসুন না; আপনারা কি চিরকালই এই গ্রামে বাস করবেন? আপনি নয় বৎসর পূর্বে একবার

কলকেতায় কয়েকমাস ছিলেন, কিন্তু নিদি
কখনও কলকেতা দেখেন নি, একবার
উভয়েই চলুন না কেন? এই চাষ দেওয়া,
ধান বুনা হয়ে গেলে আনুন, আমাদের
বাড়ীতে থকেবেন, আবার ইচ্ছা হ'লে পুনরায়
ভাদ্রমাসে ধান কাটিবার সময় আসবেন।

হেম। শরৎ, তুমি আমাদের স্নেহ কর,
তাই এ কথা বলছ। কিন্তু আমি কলকাতার
গিয়ে কি করব বল? তুমি লেখা পড়া করবে,
পরীক্ষা দেবে, সম্ভবতঃ চাকরী পাবে; আমি
গিয়ে কি করব বল।

শরৎ। কেন, আপনি কি কোন
প্রকার চেহারা দেখতে পারেন না? আপনি
এরূপ লেখা-পড়া শিখে কি চিরজীবন এই-
খানে কাটাবেন? শুনেছি, আপনি বা
ছেড়ে বিশ্বর বই পড়েছেন, ~~কিন্তু~~ ও বিশ্বর
শিক্ষা বলে, নিরাবধি হইয়া গেলেন।
আপনার মনও নিদ্রিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির
নির্দল চম্বালোক সুধার স্নানর প্রস্তুতি
পুষ্পের ভায় ওঠবারে, সুচিরূপ কেশপাশে ও
সুগোল বাহতে বিরাজ করিতেছিল।
বালিকা খেলার কথা বা বিভীষণ-বৎসের কথা
বা বাল্যকালে পেয়ারা খাইবার কথা স্বপ্ন
পেটিতেছিল।

প্রদেহের জাতি হইতে নির্গত হইয়া শরচ্ছত্র সেই
জন্তে লাজ আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া
যখন কলহ ভাঙিতে লাগিলেন, “আমি বর্ধ-
খাকুলেও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনা-
দেওয়া কলহের দেখিগাছি, কিন্তু অন্য এই
তিন চারি সামান্য গৃহে বেক্রপ সরলতা,
ব্যর্থবৃত্ত হইয়া অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম

শরৎ যেকোন কুজাপি দেখি নাই। জগ-
আপনারা চত্বরের পরিবার যেন সর্বদা নিরা-
ধাক্কে আ সর্বদা হুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ
একবার সন্ধ্যাকাল হইতে একাকী থাকিয়া

একবার উন্নতির চেষ্টা করে দেখা যাবে ;
আমার স্থির বিশ্বাস যে, বিশাল বহু-সমু-
দ্রেও আপনার মত শিক্ষা, গুণ, অধ্যবসার,
পরিশ্রম ও অসাধারণ সততা অচিরেই পরি-
চিত ও পুরস্কৃত হবে। আর যদি তা না হয়,
পুনরায় গ্রামে ফিরে আসবেন, তাতেই বা
ক্ষতি কি ?

হেচক্ষ কণেক চিত্তা করিলেন, বনিলেন, "শরৎ, তুমি আয়াদেব, শরৎ
হান দিতে চাইলে, এটি দাও।
দাও। কিন্তু আয়াদেব

কেতার বাই, তা
বাসা করে
করব অষ্টম পরিচ্ছেদ।

विष्णुश्च वसुगण ।

পরদিন প্রভাতে বিন্দু গাত্রোখান করিয়া
ঘর, দ্বার, প্রাক্কণ কাঁট দিলেন এবং গৃহের
পশ্চাত্তের পুকুরে বাসন রাখিতেছিলেন, এমন
সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল।
হেমচন্দ্র ও সুধা তখনও উঠেন নাই, অতএব
বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র আসিয়া কবাট
খুলিয়া দিলেন,— দেখিলেন, সনাতনের স্বামী।
বিন্দু বালাবহর্য তাহাকে কৈবর্ত-দিদি
বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন
নাই; বলিলেন, “কি কৈবর্ত-দিদি, এত
সকালে কি বলে ক’রে? তোরা হাতে ও
কি ও?”

সনাতনের পত্নী। না কিছু নয় দিদি, যনে
করু, আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই,
আর সুধা দিদি চিনি-পাতা দৈ বড় ভাল-
বাসে, তাই কাল রোতে দৈ পেতে রেখেছি,
সুধাদিদির অজ্ঞে এনেছি। সুধাদিদি উঠেছে?

বিন্দু। আবার অনেক সময় যখন পড়া-
শুনা করা উচিত, তখন বাড়ীর ভিতর এসে
ছেলে-বেলার পেয়ারা পাড়ার গল্প করা
হবে। তাতে খুব লেখা-পড়া হবে।

শরৎ। আর অনেক সময় যখন ডাত
খেতে অরুচি হবে, তখন কচি কচি আঁবের
অম্বল খাওয়া হবে, আমি দেখতে পাচ্ছি,
শরৎ ভাগটাই বেশী।

বিন্দু। হাঁ, তোমার এখন লাভেরই
চন্দ্রের জন্ম এতদ্ভিন্ন, অম্বল রাঁধুনী
রকের উপর একটি ম.
চিত্তাশূন্য বালিকা শুইবা
নৈশ বায়তে ও শুভ্রবর্ণ চন্দ্রাণী কি? ঐ
কর্ণাৎ নিখিল হইয়া পড়িল। সমস্ত কুল-
পুত্র গ্রাম এখন নিস্তব্ধ এবং সেই সুন্দর
চন্দ্রকে নিখিল।

হেমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র সেই রকে উপবেশন
করিয়। অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিতে লাগি-
লেন। ভালপুত্রের ঘোষণা ও বসুবংশের
মধ্যে বিবাহ-স্বত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ
বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন ও প্রীতি
করিতেন। এক্ষণে কয়েক কথাবার্তার পর
হেমচন্দ্র উন্নতহৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীরপ্রকৃতি,
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরৎচন্দ্রের অন্তঃকরণ বুঝিতে
পারিলেন; শরৎচন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত
তেজঃপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে পারিলেন। এ
জগতে আমাদের অনেক পরিচিত লোক
আছে, মনের একা অতি অল্প লোকেরই
সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অন্তরূপ লোক
দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট
হয়। হেমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র যতই কথাবার্তা
কহিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের হৃদয়
পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম
শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভায় দেখিতে লাগি-
লেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের ভায় ভক্তি

কাঁল একবার তোমাদের বাড়ী যাব, আবার
উমাতার সঙ্গেও দেখা করিতে যাব।

শরৎ। দিদি কাঁল উমার বাড়ী যাবে,
বিন্দুদিদি, তুমিও সেখানে গেলেই সকলের
সঙ্গে দেখা হবে।

বিন্দু। তবে সেই ভাল। আহা, কালীকে
দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করে। আমার
বিয়ে হবার আগে কালীর বিয়ে হয়েছে,
আহা! সেই অবধি সে যে কত কষ্ট পেয়েছে,
কে বলতে পারে? আচ্ছা শরৎ বাবু,
তোমার মা দেখে শুনে এমন ঘরে বিয়ে
দিলেন কেন? যের সময় বরকে দেখেছিলেন,
লোকে বলে, এখন তার বয়স ৪০ বছর ছিল।

শরৎ। দিদিদি, সে কথা আর জিজ্ঞেস
না। মার ও সখকে অধিক মত ছিল
এ, পর্যন্ত পড়বার কুল বড়, ভাল লোকে
থাকেন। এই পরীক্ষার উপ কুল পাওয়া
তিনি আমাকে বিষয়টি দেখতে যোগদান
দেখা যাক কি হয়, আমাদের বিষয়ও অতি
সামান্য, বৎসরে সাত আট শত টাকার
অধিক লাভ নেই, কোন উপযুক্ত চাকরী
পেলে করতে ইচ্ছা আছে। মাও চাকরী-
স্থানে আমার সঙ্গে থাকবেন, এখানে লোক
জন বিষয় দেখবে।

হেম। তা বা হয়, তোমার পরীক্ষা
পর হবে। এই কয়েকমাস ব্যস্ত কাজ-
থেকে মনোবোগ করে পড়ান, দিদি
'এক্ট্রা' পরীক্ষা যে রকম সম্ভব কোন
দিন্নাছ, এই পরীক্ষাটা সেইরূপ করে করে
শরৎ। সেইরূপ ইচ্ছা আছে পূর্বকালে
কেতার গিয়ে পড়তে আরম্ভ না কি না,
মনে মনে এক একবার ভাবি,
কেন একবার কলকাতায় গিয়া বিন্দু
আপনারা কি চিরকালই এল মোচল
করবেন? আপনি নয় বৎসর

অনেকক্ষণ পরে শরৎ বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তবে আজ আমি আসি, অনেক রাত্রি হয়েছে, আমার কা’ল দেখা হবে । বত দিন আমি গ্রামে আছি, তোমার কচি আঁবের অঞ্চল এক একবার চাক্তে আসব । আর যদি অল্পগ্রহ করে তোমরা কল্কেতার যাও, তবে ত আর আমার সুখের সীমা থাকবে না ।”

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, “তা আচ্ছা, এস । কল্কেতার যাওয়া না যাওয়া কা’ল স্থির করব, কিন্তু যাওয়া হোক আর নাই হোক, কচি আঁবের অঞ্চল রাখতে পারে, এমন একজন রাখুণীর বিয়র কা’ল তোমার দিদির সঙ্গে বিশেষ করে পরামর্শ ঠিক করব, সে বিষয় আর ভাবতে হবে না ।”

হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্দ্র হেম ও বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন । সুখা তখনও নিদ্রিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্মল চন্দ্রালোক সুখার সুন্দর প্রাক্কটিত পুষ্পের স্তার ওষ্ঠদ্বয়ে, সূচিকণ কেশপাশে ও সুগোল বাহুতে বিরাজ করিতেছিল । বালিকা খেলার কথা বা বিড়াল-বৎসের কথা বা বালাকালে পেরারা খাইবার কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল ।

বাটা হইতে নির্গত হইয়া শরচ্চন্দ্র সেই নির্মল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমি বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনাঢ্যের পরিবার দেখিয়াছি, কিন্তু অল্প এই পল্লীগ্রামের সামান্য গৃহে যেরূপ সরলতা, অমায়িকতা, অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম দেখিলাম, যেরূপ কৃত্রাপি দেখি নাই । জগদীশ্বর ! হেমচন্দ্রের পরিবার যেন সর্বদা নিরাপদে থাকে, সর্বদা সুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকে । বালাকাল হইতে একাকী থাকিয়া

ও কেবল পাঠে রত থাকিয়া আমার এই জীবন শুষ্কপ্রায় হইয়াছে আমা । হেমের সুখমার বৃত্তিগুলি তকাইয়া গিয়াছে । হেমচন্দ্রের প্রণয় ও বিন্দু দিদির তেজ অল্প আমার হৃদয় যেন, পুনরায় প্রাবৃত হইল ; জগদীশ্বর করুন, যেন এই পবিত্র স্নেহপূর্ণ পরিবারের নিকট থাকিয়া আমি পুনরায় মনুষ্যোচিত স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিতে পারি ।” এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শরৎ বাড়ী বাইলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বিন্দুর বন্ধুগণ ।

পরদিন প্রত্যবে বিন্দু গাত্রোথান করিয়া ঘর, দ্বার, প্রাঙ্গণ কাঁট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাত্তের পুকুরে বাসন মাঞ্জিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল । হেমচন্দ্র ও সুখা তখনও উঠেন নাই, অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া দ্রুত আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন,—দেখিলেন, সনাতনের স্ত্রী । বিন্দু বালাবস্থার তাহাকে কৈবর্ত-দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম তুলেন নাই ; বলিলেন, “কি কৈবর্ত-দিদি, এত সকালে কি মনে করে ? তোর হাতে ও কি ও ?”

সনাতনের পত্নী । না কিছু নয় দিদি, মনে করুহু, আজ সকালে তোমাদের দেখে বাই, আর সুখা দিদি তিনি-পাতা দৈ বড় ভালবাসে, তাই কা’ল রেতে দৈ পেতে রেখেছি, সুখাদিদির সঙ্গে এনেছি । সুখাদিদি উঠেছে ?

বিন্দু। না, এখনও উঠেনি। তা তোরা বোন করি। লোক, রোজ রোজ দুধ দৈ দিস কেন বড় খার। তোরা এত পাবি কোথা থেকে বোন।

স-প। না এ আর কি দিদি, বাড়ীর গরুর দুধ বৈ ত নয়, তা হু একদিন আনুই বা। পরশু তোমাদের, আমাদের ঘরদোরও তোমাদের, তোমাদের দুটো খেয়েই আমরা আছি, তা তোমাদের জিনিস তোমরা খাবে না ত কে খাবে?

বিন্দু। তা দে বোন, এখন শিকের তুলে রেখে দি, ভাত খাবার সময় ভাতের সঙ্গে খাব এখন। কৈবর্ত-দিদি, তুই বেশ দৈ পাতিস, সুধা তোর দৈ বড় ভালবাসে, ও কি লো? তোর চোখে জল কেন? তুই কাঁদ-ছিস না কি?

সত্য সত্যই সনাতনের পত্নী বর বর করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া উঁহঁ করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছিল। সনাতন অনেক কষ্ট করিয়া আপন প্রেয়সী গৃহিণীর শরীরের অসুস্থরূপ কাপড় যোগাইতেন, কিন্তু সেই কাপড়ে অতদূরী রূপসীর বিশাল অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া তাহার আঁচলে আবার চক্ষুর জল মুছিতে কুলার না! বাহা হউক, বটে চক্ষের জল অপনৌত হইল, কিন্তু সে কোয়ারা একবার ছুটিলে ধামে না, কৈবর্ত-রমণী আবার উচ্চতর স্বরে উঁহঁ করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

বিন্দু। বলি ও কি লো? কাঁদছিস কেন লো? সনাতন ভাল আছে ত?

স-প। আছে বৈ কি, সে মিন্‌বের আবার কবে কি হয়? উঁহঁ।

বিন্দু। তোর ছেলোট ভাল আছে ত?

স-প। তা তোমাদের আশীর্বাদে বাছা ভাল আছে।

বিন্দু। তবে শুধু শুধু সকালবেলা চখের জল ফেলছিস কেন? কি, হয়েছে কি?

স-প। এই সকালে ঘোষেদের বাড়ী গিয়েছিল গো, তা সেখানে—উঁহঁ।

বিন্দু। সেখানে কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে, কেউ গালি দিয়েছে?

স-প। না, গাল দেবে কে গা দিদি? কারই কিছু বাই, না কারই কিছু ধারি বে. গাল দেবে? তেমন ঘর করিনি গো দিদি বে. কেউ গাল দেবে। মিন্‌বে পোড়ারমুখো হোক, হতভাগা হোক, গতর খেটে খার, আমাকে খেতে পবুতে দিতে পারে, আমরা গরিব-গুরুবো লোক, কিন্তু আপনাদের মানে আছি। গাল আবার কে দেবে গা দিদি?

বিন্দু ক্রমকপত্বীর এই স্বামিভক্তিসূচক এবং দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া একটু মুচ্কে হাসিলেন,—বলিলেন, “তা. তাই ত বোন, জিজ্ঞাসা করছি, তবে তুই কাঁদছিস কেন? সনাতন কিছু বলেছে না কি?”

রমণীর বিশাল কৃষ্ণ কলেবর একবার কম্পিত হইল, নয়ন দুইটি সূর্ণিত হইল, ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বে কথাগুলি উচ্চারিত হইল, তাহার মধ্যে এইমাত্র বোধগম্য হইল—“ডেকরা, পোড়ারমুখো, হতভাগা, সে আবার বলবে? তার প্রাণের ভয় নেই? কোন্‌ মুখে বলবে? তার ঘর কবুছে কে? সংসার চাণিয়ে মিছে কে? আমি না থাকলে সে কোন্‌ চুলোর ঘেত? বলবে! প্রাণে ভয় নেই?” ইত্যাদি।

বিন্দু আর একবার হস্ত সংবরণ করিয়া একটু তীব্রস্বরে বলিলেন, “তবে তুই শুধু শুধু সকালবেলা চখের জল ফেলছিস কেন, বল জো? তোর হয়েছে কি?”

স-প। দিদি, কিছু নয়, কিছু হয়নি, তবে

বোবেদের বাড়ী আর সকালে শুধু,
উঁহঁহঁ।

বিন্দু। নে, তোর নেকাম করতে হয় কর
বানু, আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, আমার
বানন-কোসন সব মাজতে প'ড়ে রয়েছে,
উতুন ধরাতে হবে, এখনই ছেলে দুটি
উঠলেই দুধ চাইবে।

এইরূপে কথা হইতে হইতে অধা
প্রাতঃকালের প্রাকৃতিক পন্থের দ্বার জীবৎ
রজিত-বদনে, চক্ষু দুটি মুছিতে মুছিতে
শরনবর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু
বলিলেন, “এই যে অধা উঠেছে, এত
সকালে বে?”

অধা। দিদি, আজ খুব সকালেই ঘুম
ভেঙ্গে গেল। একটা বড় মজার স্বপ্ন
দেখলেম, সেজন্তে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিন্দু। কি স্বপ্ন?

অধা। বোধ হ'ল যেন, আমরা ছেলে-
বেলার মত আবার শরৎ-বাবুর বাড়ী
পেরারা খেতে গেছি। যেন তুমি পেড়ে
পেড়ে খাচ্ছ, আর শরৎ-বাবু আমাকে কোলে
ক'রে পেরারা পেড়ে দিচ্ছেন, এমন সময়
হঠাৎ পা ফস্কে প'ড়ে গেলেন, আমিও
প'ড়ে গেলেম। উঃ! এমনি লেগেছে।

বিন্দু। সে কি লো? স্বপ্নে প'ড়ে গেলে
কি লাগে?

অধা। হ্যাঁ দিদি, বোধ হ'ল যেন বড়
লেগেছে, শরৎ-বাবু যেন গাছতলার সেই
গর্ভচাঁতে পড়ে গেলেন!

বিন্দু হাসিয়া বাজলেন, “আহা! এমন
দুরবস্থা। আজ শরৎ বাবু এলে তাঁর পায়ে
বেধা হইবে কি না ভজেনা ওরুব এখন!
পা-ভা ভেঙ্গে যায় নি ত?”

অধা। না দিদি, ভেঙ্গে যায় নি।

বিন্দু। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

অধা। আবার বে তখনই উঠে আমাকে
নিরে পেরারা পাড়তে লাগলেন।

বিন্দু উচ্চ হস্ত সংবরণ করিতে পারি-
লেন না, বলিলেন, “সাবাস! ছেলে বাবু!
আজ তাঁকে তাঁর গুণের কথা বলব এখন।”

হস্ত সংবরণ করিয়া পরে বলিলেন,
“অধা, কৈবর্তদিদি তোর জন্তে আজ চিনি-
পাতা দৈ এনেছে, ভাতের সঙ্গে খাবে
এখন। দৈখানা শিকের তুলিয়ে রেখে এস ত
বানু। আমি উতুন ধরাই গে, এখনই
ছেলো উঠবে।”

বালিকা আবার কেশগুলি নাচাইতে
নাচাইতে দৈ লইয়া গেল, দৈ শিকের উপর
তুলিয়া রাখিয়া প্রকৃত-হৃদয়ে হস্ত বদনে
ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। বিন্দুও রান্না-
ঘরের দিকে আবার উদ্বেগ করিতেছেন,
এমন সময় কৈবর্তপত্নী আর একবার চক্ষু
জল অগনয়ন করিয়া, একবার গলা সাড়া
দিয়া, গলাটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, “বলি দিদিঠাকরুণ, কথাটা কি
সত্যি?”

বিন্দু। কি কথা লো?

স-প। ঐ বা শুনু?

বিন্দু। কি শুনি রে?

স-প। তবে বুঝি সত্যি? আহা, এত
দিন পরে এই কি কপালে ছিল! আহা,
অধাদিদির কচি মুখখানি একদিন না দেখলে
বুক ফেটে যায়!

এবার অব্যবহিত ক্রন্দনের রোল উঠিল,
কৈবর্ত-সুন্দরী সেই বিশাল কৃষ্ণ শরীরখানি,
বাহা সনাতন সভয়ে দৃষ্টি করিতেন ও
সশকতিতে পূজা করিতেন—সেই শরীরখানি
ক্রন্দন-বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে
হেমচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, তিনি জীবৎ
ভূমিকম্প বোধ করিলেন। ক্রি না

জানি না, কিন্তু কৈবর্ত-সুন্দরীর তারতর যখন তাঁহার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল, তখন নিদ্রা অসম্ভব। তিনি শীঘ্র গাত্ৰোত্থান করিয়া উঠেঃখরে কহিলেন, “বাড়ীতে কীদূত্রে কে গো?”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বিন্দুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকালবেলা বাড়ীতে কীদূত্রে কে গো?”

বিন্দু। ও কেউ নয়, কৈবর্তদিদি কি অমঙ্গলের কথা শুনে এসেছে, তাই মনের দুঃখে কীদূত্রে।

হেমচন্দ্র বলিলেন, “কে ও, সনাতনের স্ত্রী, কেন, কি হয়েছে গো? বাড়ীতে কোন অমঙ্গল হয়নি ত? কোন বারাম স্তারাম হয়নি ত?”

সনাতনের গৃহিণী বাবুকে দেখিয়া কণ্ঠ-স্বরক্ক করিয়া, অশ্রুজল সংবরণ করিয়া, কাপড়খানি টানিয়া, কণ্ঠে সৃষ্টে কোন রকমে সাধারণ একটু ঘোমটা দিয়া, চিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া আবার গারে কাপড়টা ভাল করিয়া দিয়া, আবার ঘোমটা একটু টানিয়া গলার সাড়া দিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া আবার চকুর জল মুছিয়া বৃহস্পরে বলিলেন, “না গো, অমঙ্গল নয়, তবে একটা কথা শুনু, তাই দিদি-ঠাক্করণকে জিজ্ঞেস করুতে এসেছি।”

বিন্দু। সেই কথাটা কি, আমি তখন থেকে বার করুতে পারলুম না! তুমি পার ত কর।

হেম। মেয়েমানুষের কথা মেয়েমানুষেই বুকে, আমরা তত বুঝি না। আমি শরতের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হেম বাড়ীর বাহিরে গেলেন।

স-প। ঐ গো ঐ! তবে ত আমি যা শুনেছি, তাই ঠিক।

বিন্দু বলিল, “তোকে আর কিছুতে পেয়েছে না কি? এমন কথাছিস কেন? কি শুনেছিস, বল না?”

স-প। ঐ যে শব্দ-বাবুদের বাড়ীতে আমি সকালে যা শুনু।

বিন্দু। কি শুনিলি?

স-প। তবে বলি দ্বিাদ-ঠাক্করণ, গরিবের কথার রাগ করো না। সত্যি মিথ্যা জানি না, ঐ ঘোবেদের বাড়ীর চাকর মিন্বে আমাকে বলে, মিন্বের মুখে আশুন, সেই অবধি আমার বুকটা যেন খড়াস খড়াস করছে, দিদিঠাক্করণ, একবার হাত দিয়ে দেখ।

বিন্দু। আমার দেখবার সময় নেই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে ফিরিলেন।

তখন কৈবর্ত-বধূ বিন্দুর আঁচল ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল, “না দিদি, রাগ করো না, তোমাদের জন্তে মনটা কেমন করে, তাই এম, না হলে কি জন্তের জন্তে আসতেম, তা নয়, আহা, সুধাদিদিকে একদিন না দেখলে আমার মনটা কেমন—(বিন্দু পুনরায় রান্নাঘরের দিকে পদক্ষেপ) না না, বলছি কি, বলি, ঐ ঘোবেদের বাড়ীর হতভাগা চাকর মিন্বে বলে কি, তার মুখে আশুন, তার বেটার মুখে আশুন, তার বোয়ের মুখে আশুন, তার বাড়ীতে খুঁচ চক্ক, (বিন্দুর রান্নাঘরের দিকে এক পদ অগ্রসর হওন—না না, বলছি কি, সেই মিন্বে বলে কি, উঃ, এমন কথা কি মুখে আনে গো? এও কি হয় গো? তোমাদের শরীরে মায়-দয়াও ত আছে—(বিন্দুর রান্না-

বরের ভিতর গমন, সনাতন-পত্নীর পশ্চাদগমন ও দ্বারদেশে উপবেশন) না না, বলছি কি, সেই হতভাগা চাকর যিন্বে বলে কি না, দিদিঠাকরুণ, তোমরা না কি সকলে আমাদের ছেড়ে কল্কেতার চলে বাছ ? আহা, দিদিঠাকরুণ, তোমাকে ছেলেবেলার মাহুব করেছি, তোমাকে আর দেখতে পাব না ? সুখাদিনী আমাকে এত ভালবাসে, সে সুখাদিনীকে কোথায় নিয়ে যাবে গো ? (রোদা)।

বিন্দু একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হান্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না ;—বলিলেন, “হ্যাঁলা কৈবর্ত দাদ, এই কথা বলতে এই এতক্ষণ থেকে মন করুছিলি ? তা কাঁদিস্ কেন বোন্, আমাদের যাওয়া কিছুই ঠিক হয়নি, কেবল শরৎ বাবু কথার কথার কাঁল বলোছিলেন না, তা আমাদের কি যাওয়া হইবে সেখানে বিস্তর খরচ।”

স-প। ছি দিদি, সেখানেও যায় ! শুনেছি, কল্কেতার গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত-বিচার নেই, হিঁহু মুচুনমানে বিচার নেই, সে দেশেও যায় ! তোমাদের সোনার সংসারে এখানে বসে রাজি কর। শরৎ-বাবু কি বল না, গুর মাগ নেই, ছেলে বেক, উনি কালেজে পড়েন। দিদিঠাকরুণ ! কালেজের ছেলে সব করতে পারে। শুনেছি না কি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেতে যায়। ও মা ! তারা ত কেস্ত মাহুবের গলার ছুরী দিতে পারে ! হেঁ দিদি, বিলেত কোথায়, সেই যে গঙ্গা-নাগরের গল্প শুনি, তারাও না কি পার বেতে ? শুনেছি নন্দার বেতে হয়।

বিন্দু। হেঁলো, কত সাগর পার হয়ে

তবে বিলেত যায়। শুনোছ, লকা পোরয়েও অনেকদূর যায়।

স-প। ও বাবা, সে গঙ্গানাগরে বে ডেউ শুনেছি, তাতে কি আর মাহুব বাচে ? তা নয়! থেকে কি আর মাহুব করে আসে, তারা বাকস হয়ে আসে শুনেছি, তারা কেস্ত মাহুবের গলার ছুরী দেয়। না বাবু, তোমাদের বিলেত গিয়েও কাজ নেই, কল্কেত গিয়েও কাজ নেই, তোমরা বরের নন্দী হয়ে থাক। তবে আমি এখন আসি দিদি।

বিন্দু ছুখ আল মিতে মিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এস বোন্।”

স-প। আর দৈ-খানি কেমন হয়েছ, খেয়ে বলো। আর সুখাদিনী কি বলে, বলো।

বিন্দু। বলব দিদি, বলব।

সনাতন-গৃহিণী কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আর দেখ দিদি, গরিবের কথাটা যেন মনে থাকে। কোথায় কল্কেতার বাবে ? বরের নন্দী বর আলো ক’রে থাক।”

বিন্দু। তা দেখা যাবে। আমাদের যাবার এখন কিছুই ঠিক নেই, যদি যাওয়া হয়, তবে অল্প দিনের জন্তে, আগার ধান কাটার সময় আসব। গ্রাম ছেড়ে আমরা কোথায় থাকব ?

কৈবর্ত বধু কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেলেন। সনাতন অল্প প্রাতঃকালে উঠিয়া বিস্তীর্ণ শয্যায় পার্শ্বশায়িনী নাই দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিরহবেদনায় বাধিত হইয়াছিল কি অল্প প্রাতঃকালেই মুখনাড়া খাইতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে তাগ্য-বান্ মনে করিতেছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু সেই দুঃখ বা সুখ জগতের

অধিকাংশ মুখ-চুপের ভায় কণকালহারী রাজ। প্রথম সূর্যালোকে গৃহিণীর বিশাল ছায়া প্রাঙ্গণে পতিত হইল, গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সনাতন শিহরিরা উঠিল।

সেই দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিন্দুর প্রতিবাসিনী হরিমতি নামে একটি বৃদ্ধা গোয়ালিনী ও তাহার বিধবা পুত্রবধু বিন্দুকে দেখিতে আসিল। হরিমতির পুত্র জীবিত থাকিতে তাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, কিছু জমা-জমী ছিল, বাড়ীতে অনেকগুলি গাভী ছিল, তাহার দুই বেচিরা স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহে হইত। পুত্রের মৃত্যুর পর হরিমতি শিশু পুত্রবধুকে লইয়া সে জমা-জমী দেখিতে পারিল না, অল্প কাহাকে কোয়কা জমা দিল, বাহা খাজনা পাইল, সে অতি সামান্য। গরুগুলি একে একে বিক্রয় হইল; এক্ষণে দুই একটি আছে মাত্র, তাহার দুই বিক্রয় করিয়া উন্নয়নপূর্তি হয় না। ষাণ্ডা ও পুত্রবধু সর্বদাই বিন্দুর বাড়ীতে আসিত ও বিন্দুর ছেলেদের ব্যায়রামের সময় যথাসাধ্য সংসারের কাজ করিয়া দিত। বিন্দুর এরূপ অবস্থা নহে যে, তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, তথাপি বৎসরের কসল পাইলে দরিদ্র প্রতিবাসিনীকে কিছু খাজ পাঠাইয়া দিতেন, শীতের সময় দুই একখানি কাপড় কিনিয়া দিতেন, বৃদ্ধার অসুখ করিলে কখন সাবু, কখন দুই একটি সামান্য ঔষধি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্বদা বৃদ্ধার তত্ত্ব লইতেন। দরিদ্রা এই সামান্য উপকারে এবং সকল বিপদে আপদেই বিন্দুর স্নেহের আশ্রয়লাভকে অতিশয় আপ্যায়িত হইত এবং বিন্দুকে বড়ই ভালবাসিত। বিন্দু গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া আজ আসিয়া অনেক কান্নাকাটি করিল। বিন্দু তাহাকে সাধনা করিয়া এবং তাহার

পুত্রবধুকে একখানি পুরাতন শাড়ী দিয়া বসে পাঠাইলেন।

হরিমতি গ্রহান করিলে তাঁতিদের একটি বৌ বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁতি-বৌ দেখিতে কালো এবং অতিশয় কাহিল, সে কাজকর্ম করিতে পারিত না, সে অল্প ষাণ্ডার নিকট সর্বদাই গাঙ্গি খাইত। তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসিত না। পত্নীত্বকালে তাহার পিঠে বেদনা হইয়াছিল, বাট থেকে জল আনিতে পারিত না, তজ্জন্ত তাহার ষাণ্ডা তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তাঁতি-বৌ কাহার কাছে যাবে? কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর কাছে আসিয়াছিল। বিন্দুর এমন অর্থ নাই যে, তাঁতি-বৌকে ঔষধ কিনিয়া দেন, তবে বাড়ীতে কেয়োদিন তৈল ছিল, প্রত্যহ তাঁতি-বৌকে রোজে বসাইয়া নিজে মালিস করিয়া দিতেন। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বেদনা আরাম হইয়া গেল, সেই অবধি তাঁতি-বৌ গৃহকার্যে অবসর পাইলেই বিন্দু যাকে দেখিতে আসিতে বড় ভালবাসিত।

আমাদের লিখিতে লজ্জা করিতেছে, তাঁতি-বৌ যাইতে না যাইতে বাউরীপাড়া হইতে হীরা বাউরীণী বিন্দুর নিকট আসিল। হীরার স্বামী পাঙ্গী বর, বেশ রোজ্জার করে, কিন্তু যথার্থকর্ম মদ খাইয়া উড়িয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ স্ত্রীকে প্রহার করে। বিন্দু একদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়া হীরার স্বামীকে ডাকাইয়া বিশেষ তিরস্কার করিয়া দিলেন। সেই অবধি হেমবাবুর ভয়ে এবং বিন্দুর জ্যোতীষহাশয়ের ভয়ে বাউরীর ঈর্ষানুচর কিছু কয়ল, হীরাও প্রাণে বাঁচিল। আজ হীরা আপন শিশুটিকে নৃতত একখানি কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া বিন্দুর কাছে

আনিয়া বলিল, “বাঠাকরুণ, এবার তোমার আশীর্বাদ হাতে ২৫ টাকা জমেছে, অনেক কাল ধরের চালেরুড় পড়েনি, এবার চাল নুতন ক’রে ছাইরেছি, আর বাহার জন্তে কাটোরা থেকে এই নুতন কাপড় কিনেছি।” বিন্দু শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন ।

তাহার পর গ্রামের শীঠাকরুণ, বামা সদগোপিনী, শ্রামা আশুরিণী, মহামায়া ধোপানী প্রভৃতি অনেকেই বিন্দুর কলিকাতার বাইবার কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে আসিল। আমরা তাহাদিগকে বিন্দুর নিকট রাখিয়া এক্ষণে বিদায় লই। আমাদের অনেকেই বিন্দু অপেক্ষা দুই পরসী অধিক আর আছে, ভরসা করি, আমরা যখন এক স্থান তহিতে স্থানান্তরে গমন করিব, আমাদের জন্তও কেহ কেহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু শোক অনুভব করিবে। ভরসা করি, যখন আমরা এ সংসার হইতে প্রস্থান করিব, তখন যেন দুই একটি পরোপকারের পরিচয় দিয়া বাইতে পারি, কেবল ছবি, পরলিন্দা এবং পরের সর্কনাশ দ্বারা “বড়লোক হইয়াছি,” এই আখ্যানটি রাখিয়া না বাই।

নবম পরিচ্ছেদ ।

বাল্যসহচরীগণ ।

সকালের সময় বিন্দু কোঠাইয়ার বাড়ীতে গেলেন এবং অনেক দিনের পর বাল্যসহচরী কালীতারা ও উমাতারাকে দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিন জন বাল্যসহচরী এখন তিন সংসারের গৃহিণী হইয়া-

ছেন; কিন্তু এখনও বাল্যকালের সৌন্দর্য একেবারে ভুলেন নাই, অনেক দিনের পর তাঁহাদিগের পরস্পরের দেখা হওয়ার তাঁহারা বাল্যকালের কথা, যশুরবাড়ীর কথা, সংসারের কথা, নিজ নিজ সুখ-দুঃখের অবস্থা কথা কহিয়া সন্ধ্যাকাল বাপন করিলেন।

কালীতারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বিন্দু অপেক্ষাও কালো ছিলেন, কিন্তু তথাপি এককালে তাঁহার মুখে লাবণ্য ছিল, এখনও সেই শাদ, শুদ্ধ বদনে ও নয়নধরে একটু কমলীয়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে মুখখানি বড় শুষ্ক, চক্ষু দুটি বসিয়া গিয়াছে, কণ্ঠার হাড় দেখা যাইতেছে, শীর্ণ হস্তে দুইপাছি কাঁপা বালা আছে, কণ্ঠে একটি মাছলী। তাঁহার বস্ত্রখানি সামান্ত, সমুখের চুল অনেক উঠিয়া গিয়াছে, মাথায় ছোট একটি খোঁপা। কালীতারা বাল্যকালে একটু হাবা মেয়ে ছিল, এখনও অতিশয় সরলা, যশুরবাড়ীর কাজকর্ম করেন, দুই বেলা দুই পেট খান, কেহ কিছু বলিলে, চুপ করিয়া থাকেন।

বিন্দু বলিলেন, “কালী, আজ কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ’ল, তোমাকে কি আর হঠাৎ চেনা যায়?”

কালী। বিন্দুদিদি, আমাদের দেখা হবে কোথা থেকে? বিয়ে হয়ে অবধি প্রায় আমি বর্জ্যমানে থাকি, বাপের বাড়ী কি আর আসতে পাই?

উমা। কেন কালীদিদি, তুমি মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী আস না কেন? এই আমিও প্রতিবার পূজার সময় আসি।

কালী। তা তোমাদের কি বল বোন, তোমাদের চের লোকজন আছে, কাজ-কর্মের স্বনুষ্ঠ নেই, পাঁচ ক’রে চ’লে এলেই হ’ল। আমাদের ত তা নয়, বৃহৎ সংসার, অনেক

কাজকর্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর, তাতে চাকর-দাসী রাখা প্রথা নেই। কাজেই আমরা কেউ এলে কাজ চলবে কেমন করে বল? এই এবার এসেছি, আমার এক বড় নন্দ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাজগুলি করতে বলে এসেছি। তা ছাড়া পাঁচ দিন সে করবে, বরাবর কি আর করে?

বিন্দু। তোমাদের জমীদারীর শুনেছি, অনেক আর, তোমার স্বামীর অনেক গাড়ী-বোড়া আছে, তা বাড়ীতে চাকর-দাসী রাখেন না কেন?

কালী। না দিদি, আর জেরালা নেই, খরচ শুনেছি, বিস্তর ঘর, ধারও কিছু হয়েচে শুনেছি; তা আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, ও সব কথা ঠিক জানি না। আমাদের এক-খানা বাগানবাড়ী আছে, বাবু সেইখানে থাকেন, তাঁর শরীরও অসুস্থ, বাড়ীতে প্রায় আসেন না, তা কাজকর্মের কি জানবেন? আমার খাণ্ডারীরাই কাজকর্ম দেখেন শুনে, ঝি রাখবেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকদের কি ছুঁতে আছে? কাজেই বোঁদের সব করতে হয়।

বিন্দু। তা তোমাদের ধার-টার হয়েচে ধোন, তা খরচ একটু কমাও না কেন? শুনেছি, তোমার স্বামী অনেক খরচ করে সাহেবদের খানা-টানা দেন, অনেক গাড়ী-বোড়া রাখেন,—তা এ সবগুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আর, তেমনি ব্যয় করতে বলতে পার না?

কালী। ও মা! তাঁকে কি আমি সে কথা বলতে পারি? তিনি বিবরকর্ম বুঝেন, আমি বোঁ-মাসুখ হয়ে কোন্ লজ্জার তাঁকে এ কথা বলবো? তবে কখন কখন যখন আমাদের

বাড়ীতে বেড়াতে আসেন, আমার খুড়-খাণ্ডারী তাঁকে এ রকম কথা হুই একবার বলে-ছিলেন শুনেছি।

বিন্দু। তা তিনি কি বলেন?

কালী। বলেন, আমাদের ভারী বংশ, দেশে কুলের যেমন মর্যাদা, সাহেবদের কাছে বনিয়াদী বড়মাসুখ-বংশ বলে তেমন মর্যাদা তা সাহেবদের খানা-টানা না দিলে কি হয়? শুনেছি, সাহেবেরাও তাঁকে বড় ভালবাসেন, এই যে কত “কমিটা” বলে না কি বলে, বড়-মানে বত আছে, বাবু সবতেই আছেন, আর এত রোগা শরীর, তবু গাড়ী করে প্রত্যহ সাহেবদের বাড়ী ছুবেলা যাওয়া আসা আছে, সাহেব-মহলে নাকি তাঁর জারী মান।

সরলস্বভাব কালীতারার এই স্বামি-গৌরবর্ণনা শুনিয়া বিন্দু একটু হাসিলেন, অভিমানিনী উমা একটু ঈর্ষায় ত্রুটি করিলেন।

বিন্দু। আজ্ঞা কালী, তোমাদের বাড়ীর মধ্যে এখন গিন্নী কে?

কালী। আমার খাণ্ডারী ত ভুঁই নেই, কাজেই আমার তিন জন খুড়-খাণ্ডারীই গিন্নী। বড় যে, সে ভালমাসুখ, কী কোন কথা থাকেন না, মেজোই কিছু বাস্তী, সকলেই তাকে ভয় করে, বোঁরা ত সব লে কাঁপে। আচ্ছা, সে দিন আমার খুঁসারদেটা ছোটজারান্নাঘর থেকে কড়া করে ছুঁয়া দেই পড়ে গিয়েছিল, গরম ছুঁবে তার পায়ের কচ-চামড়া পুড়ে গিয়েছে। তাতে তার বড় কষ্ট না হয়েছিল, খাণ্ডারীর ভরে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার মেজো খুড়-খাণ্ডারী হাট থেকে নেয়ে এসে বেই শুনেলে যে, ছুঁ অগ্ৰহ হয়েচে, এমন মুড়ো খেও যা নিয়ে ভেঙে এসেছিল, এমন বকুনি শুনলে, বাপ-মা তুলে এমনি গাল দিলে, আমার

ছোট জা চোকের জলে নাকের জলে হ'ল !
আহা, কচি মেয়ে, দশ বছর যাত্রা বরস, তবে
তিন দিন ভাল ক'রে ভাত খেতে পারে নি।

উমা। তা তোমাকেও অমনি ক'রে
বকে ?

কালী। তা বকবে না, দোষ করলেই
বকবে, তা না হ'লে কি সংসার চলে ?

উমা। তোমাকে যখন বকে, তুমি কি
কর ?

কালী। চুপ ক'রে কাঁদি, আর কি
করব বল ?

অভিমানিনী উমা একটু হাসিয়া বলি-
লেন, “আমি ত তা পারিনি বাবু, কথা
আমার গায়ে সহ্য হয় না।”

কালী। তা হাঁ। বিন্দুদিদি, যত্নবাজীতে
কেউ গাল দিলে আর কি করবো বল ?
একটি কথার জবাব দিলে, পাঁচটি কথা
শুনতে হয়। তা কাজ কি বাবু, খাণ্ডীই
হোক আর ননদই হোক, কেউ ছুটো কথা
বললে চুপ ক'রে থাকি, আবার তখনই ভুলে
যাই। কথা ত আর গায়ে ফোটে না, কি
বল বিন্দুদিদি ?

বিন্দু। তা বেশ কর বোন, কথা বর-
দাস্ত করতে পারলেই ভাল, তবে সকলের
কি আর বরদাস্ত হয় ?—তা নয়। আচ্ছা,
তোমার ছোট খুঁড়খুঁড়ীও শুনেছি না কি
রাগী ?

কালী। হাঁ, রাগী বটে, তা মেজোর সঙ্গে
ত আর পারে না, রাগ ক'রে ছ' একটা ক'ম
ব'লে আপনার ঘরের ভিতর খিলি ঘর
থাকে, মেজো এক কথায় পঁচিশ কথা শুনে ব'লে
দেয়। মেজোর কিছু টাকা আছে সন্ন্যাসী
সে ছেলেদের ভাল ভাল খাবার
আবার ছোটর ঘরে বাসে ছেলেদের ব্যবস্থা
শিখিয়ে দেয়। তারা ছোটর ঘরে বসে পড়েছে,

ছোটর ছেলেরা খেতে পার না, কেল-কেল
ক'রে চেয়ে থাকে। আবার ছোটর খাবার
ঘরের পাশেই এবার একটা নর্দমা তৈরি
করেছে, ছোট কত বগড়া করলে, আবার
ছোট দেওয়ার আপনি বাবু কাছ নাগিশ
করতে গেলেন, বাবুও নিজে একদিন বাড়ী
এলে তাঁর মেজো খুঁড়ীকে বুঝাতে গেলেন,
তা সে কথা কি শুনে ? মেজোর বহুনি
শুনে বাবু ফের গাড়ী ক'রে বাগানে
পালিয়ে গেলেন, মেজো আপনি দাঁড়িয়ে
মজুরদের দিয়ে সেই নর্দমাটি করালেন, তবে
সে দিন রাত্রে জলগ্রহণ করলেন।

উমা। সাবাস মেয়ে বা হোক ! ধবীতে
কালী। বলবো কি উমা,

বগড়া-কোন্দল হয়, তাতে, তুমি ছেলে-
পালায়। তবে আমাদের সনে ক'রে চক্কর
লাগে না। আর আমি কারো আবার স্নেহের
যে যা বলে, চুপ ক'রে থাকি তাব'বে, তবে
যাই, আমার কি বল ?

বিন্দু। কালী, তোমার কষ্ট কিছুই
সব বিখবা, তাদের আছে ব'লে আমি ভাখ

কালী। বরেন্দ্র জানি না, কেন এই
বরেন্দ্র আর কথার ব'লে কয়েক দিন হ'তে
এক, আশ্রিতক সমস্ত, অনেক রকম ভাবনা
বছনে হয়। ভবিষ্যতের কথা ভগবানুই
জেনেন। তা বিন্দুদিদি, তুমি কল্কেতার
যাচ্ছ, আর কালীদিদিও বহুমাশ্রিত আছেন,
শুনেছি, সেও কল্কেতা হ'তে তাঃ যত্না
পথ। আমরা ছেলেবেলা যেমন ভিনবোনের
মত ছিলেম, বেন চিরকাল সেইরকম থাকি,
আপন-বিগদের সময় বেন পরস্পরকে ভরী
মত জান ক'রে সেই রকম ব্যবস্থা
সহসা উমার মনের বিকৃত দ্বিধা দিয়ে
ও কালীর মনও এতে চাপিয়া সেই
তাঁহার আঁচল দিয়ে গাড়ীর ভিতর

কালী। হ্যা, থাকে বৈ কি, ছুই লিঙ্গ, বাগ্‌ড়ী, আর একজন মাসখাণ্ডী আছেন; তাঁরা তিন জনই বিধবা, তাঁদের ছেলে-মেয়ে, বৌ, মাতি, সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকে। আর একজন মামীখাণ্ডীও আছেন, তিনি লম্বা, তাঁর স্বামী পূর্বদেশে পদ্মাগারে চাকরী করুতে গিয়েছিল, সেখানে না কি আর একটা বিয়ে করেছে না কি করেছে, তের বছর বাড়ী আসে নি, বাড়ীতে টাকাও পাঠায় না, কাজেই মামী ছুই ছেলেকে নিয়ে ঐখানেই আছেন, এই বাড়ীতেই সে রাহুলদেবের বিয়ে হয়, আজ তিন চার বছর ক’

খরচ শুনোছি, সে ছেলে দুটি কেমন, লেখা-শুনছি; তা? সব কথা ঠিক ছোট ছোট ছেলেটি ভাল, ইন্ডুলে খানা বাগানবাগে, বড়টা লম্বাছাড়া হয়ে থাকেন, তাঁর মাহেবদেবীর বোলে তাকে কি আসেন না, ভেঁজেছিলেন, তা সে আবার আমার খাণ্ডীরাই নিয়ে পাল্লায়। সবাই কি রাধবেন কেমন ক’টাকে জেলে দেবে, বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাক ব’লে করে ঘর কি ছুঁতে আছে? কাজেই ব’ ছেলেটাকে করুতে হয়।

বিন্দু। তা তোমাদের ধার-টার হতে জন্মে বোন, তা খরচ একটু কমাও না কেন শুনেছি, তোমার স্বামী অনেক খরচ করে মাহেবদেবের খানা-টানা দেন, অনেক গাড়ী-বোড়া রাখেন,—তা এ সবগুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আর, তেমনি ব্যর করুতে বলতে পার না?

কালী। ও মা! তাঁকে কি আমি সে কথা বলতে পারি? তিনি বিষয়কর্ম বুঝেন, আমি বৌ-মামুষ হয়ে কোন্‌ মজার তাঁকে এ কথা বলবো? তবে কখন কখন যখন আমাদের

তোমার বেগর চুকন ত গ্রামেই আছেন, তোমার স্বামী না কলকৈতার গিরাছেন?

উমা। হ্যা, এক বৎসর হ’ল, তিনি কলকৈতার আছেন, আমাকেও কলকৈতার নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর মার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, তিনিও বলেছেন, এই জৈঠ কি আবার মাসে পাঠিয়ে দেবেন।

কালী। হ্যা, শরৎ বলছিল, তোমার স্বামী না কি কোন্‌ বড় রাস্তার উপর মত্ত বাড়ী নিয়েছেন, অনেক টাকা খরচ করে মজিয়েছেন; তাঁর না কি সুন্দর শাদা ঘোড়ার এক জুড়ি, আর কালো ঘোড়ার এক জুড়ি আছে, তেমন পাড়ী-বোড়া রাজা-রাজড়াদেরও নেই। আবার না কি কলকৈতার বাইরে বড় বাগান কেন্‌বার কথা চলছে, সেই বাগানও না কি ইঞ্জপুরী, তেমন কল, তেমন সুল, তেমন পুকুর, তেমন মার্কেলের মেজেওয়ারা ঘর কলকৈতার কম আছে। উমা, তুমি বড় সুখে থাকবে।

উমার বিষয়বিনিমিত্ত সুন্দর স্মৃতি ওঠে একটু হাস্যকণা দেখা গেল, উজ্জল নয়নদ্বয়ে ঘেন একটু স্নান ছায়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “কালীদিদি, যদি শাদা জুড়ি, কালো জুড়ি, আর মার্কেলের ঘর হ’লে সুখ হয়, তা হ’লে আমি সুখী হব, কিন্তু কপালের কথা কে বলতে পারে?” সুন্দরী বিন্দু দেখিলেন, উমা ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

চাম্‌ কণেক সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, না হ’ার পর উমা আবার বলিলেন, “বিন্দু-শুভকি! আমাদের ছেলেবেলা এই গ্রামে এক খাণ্ডী সন্ন্যাসী এসেছিল, মনে পড়ে? সে ঘর হাত রেখেছিল, মনে পড়ে? নিরুত্তর। কৈ, মনে পড়ে না। সে কি দিদি, তুমি আমার চেয়ে

বড় ভোয়ার মনে পড়ে না ? কালীদিদির বোধ হয় মনে পড়ে ।

কালী । কৈ, না, আবারও মনে নেই ।

উমা । তবে কুঁরি সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল, তাই আমার মনে আছে । ঠিক বারো বছর হ'ল, এই বৈশাখ মাসে একদিন এমনি সন্ধ্যার সময় এইখানে খেলা করছিলাম, একটু একটু অন্ধকার হয়েছিল, আর একটু একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছিল, এমন সময় একজন জটাধারী সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলের ভিতর হ'তে বেরিয়ে এল । আমরা ভয়ে কাঁপতে লাগলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীটা কাছে এসে বললে, "ভয় নেই, তোমরা পরসাদ নিয়ে এস, আমি তোমাদের হাত দেখাবো ।" আমি আর কাছে সেই দিন ৪টা পরসাদ পেয়েছিলাম, ভয়ে তা সন্ন্যাসীকে দিলাম । তখন সন্ন্যাসী খুসী হয়ে হাত দেখে বললে, "মা তুমি বড় ধনবানের পত্নী হবে গো, তুমি কিছু ভেব না ।" তখন কালীও হাত দেখাবার জন্তে বাড়ী থেকে একটা পরসাদ এনে দিলে, সন্ন্যাসী সেটি নিয়ে বললে, "তোমার ধন-টন হবে না, তুমি ভাল বংশের বউ হবে ।"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "আর জটাধারী মহাশয় আমার কি ব্যবস্থা করলেন ?"

উমা । তাই বলছি, তোমার মা ঘাটে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে পরসাদ-টরসাদ বড় থাকতো না, তুমি স্নান হাতে হাত দেখাতে এলে । সন্ন্যাসী বললে, "মা, তোমার ধনও নেই, বংশও নেই, পরিবার ঘরে ঘর নিকিয়ে পরিবার ভাঙা থাকবে ।" এই ব'লে সব পরসাদগুলি তোমার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেল ।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ ব্যবস্থা করেছিলেন তা । এখন আমার মনে পড়েছে,

প্রাণের লোকে সন্ন্যাসীটিকে রামপ্রসাদ সরষা বতী বলত ।

উমা । হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সরষা বতী ঠাকুর । তোমার মা পুত্র হ'তে জল এনে বিজ্ঞাসা করার আমি সব কথা বললাম । তখন তিনি আঁচল দিয়ে তোমার চক্ষের জল মুছিয়ে বললেন, "তা হোক, বাছা বেঁচে থাক, বেধা হোক, চির-এইসী হয়ে থাকিস, যেন পরিবার ঘরে ঘর নিকিয়েই সুখে থাকিস । বাছা, ধন-কুলে সুখ হয় না, ধন-কুলে ভোর কাজ নেই ।" বিন্দুদিদি, এই কথাটা আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হলেই যদি সুখী হ'ত, তবে পৃথিবীতে আর অভাব থাকত না ।

বিন্দু । ও কি, ও উমা, তুমি ছেলে-বেলাকার একটা কথা মনে ক'রে চক্ষের জল কেন্দ্র কেন ? তোমার আবার সুখের অভাব কিসে উমা ? তুমি যদি ভাববে, তবে আমরা কি করব ?

উমা । না দিদি, আমার কষ্ট কিছুই নেই, আমার কষ্ট আছে ব'লে আমি ক্রোধ করছি না । কিন্তু জানি না, কেন এই কল্কেতার বাব ব'লে কয়েক দিন হ'তে মনে অনেক সময়, অনেক রকম ভাবনা উদয় হয় । ভবিষ্যতের কথা ভগবানই জানেন । তা বিন্দুদিদি, তুমি কল্কেতার যাক, আর কালীদিদিও বর্ধমানে আছেন, শুনেছি, সেও কল্কেতা হ'তে ৩৪ বছর পথ । আমরা ছেলেবেলা যেমন তিনবোনের মত ছিলাম, যেন চিরকাল সেইরকম থাকি, আপস-বিপদের সময় যেন পরস্পরকে ভয়ানক মত জান ক'রে সেই রকম ব্যবস্থা করি ।

সহসা উমার মনের বিকট চিৎকার দিয়ে ও কালীর মনও ঐতে চাপিয়া সেই তাঁহার আঁচল দিয়ে । গাড়ীর ভিতর

মোচন করিলেন এবং অনেক সাধনা করিয়া
রাত্রি এক প্রহরের সময় বিদায় লইয়া
আপন আপন গৃহে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আগমন।

ইহার কয়েক দিন পরে হেমচন্দ্র সপরি-
বারে কলিকাতা বাজা করিলেন। যাত্রার
পূর্বদিন বিন্দু আপন পরিচিত গ্রামের সকল
আত্মীয়, কুটুম্বিনী ও বজুর সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া বিদায় লইয়া আসিলেন। তাল-
পুকুরে সে দিন অনেক অশ্রুজল বহিল।

যাইবার দিন অতি প্রত্যুষে বিন্দু আর
একবার জ্যোতাইয়ার নিকট বিদায় লইতে
গেলেন। বিন্দুর জ্যোতাইয়া বিন্দুকে সত্যই
রোহ করিতেন, বিন্দুর গমনে প্রকৃত দুঃখিত
হইয়াছিলেন। অনেক কাহ্নাকাটি করিলেন,
বলিলেন, ‘বাছা, তোরা আমার পেটের ছেলের
নত, আমার উমাও যে, বিন্দু-সুখাও সে। আহা,
তোদের হাতে ক’রে মানুষ করেছি, তোদের
ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠে।
তা বা, বাছা, যা, ভগবান করুন, হেমের
কলকাতায় একটি চাকরী হোক, তোরা
বেঁচে বসে সুখে থাক, শুনেও প্রাণটা জুড়বে।
বাছা উমা খসুরবাড়ী গেছে, তারেও না কি
কলকাতায় নিয়ে যাবে, এই জ্যোতামাসে নিয়ে
যাবে বলে আমার জামাই পীড়াপীড়ি
করছে। শুনলে, সে না কি কলকাতায়
নতুন বাড়ী কিনেছে, বাগান কিনেছে,
খোড়া কিনেছে, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর
কান্না বুলতে পারি? তেমন গাড়ী-খোড়া
বো-মানুষ হয়ে কো-অমন টাকা, অমন
বলবে? তবে কখন

বড়মানুষী চালচোল ও আর কোথাও নেই
ঐ ও মাসে আমি এতদিন বেনের বাড়ী
গিরেছিলেম, বুঝলে কি না, তা এই-নীচে থেকে
আর তেতাল্লা পর্যন্ত সব বেণ ওয়ারীর বাড়ী
টাগিরেছে। আর লোকজন, জিনিসপত্র,
সে আর কি বলব। সে দিন আর পকাশজন
মেয়ে বাইরেছিল, বুঝলে কিনা, তা সবাইকে
রূপোর খাল, রূপোর সেরকাবী, রূপোর গেলান,
রূপোর বাটি দিরেছিলেন। আর আমার
বেনের কথাবার্তাই বা কেমন। তারা ভারী
বড়মানুষ, তাদের রীতিই ভালো। এই আমার
জামাই শুনেছি, নতুন বাড়ী ক’রে খুব সাক্ষি
য়েছে, বাড়ী, লঠন, দেয়ালগিরি, গালচে, মক-
মলের চাদর, বুঝলে কি না, আর কত সোনা-
রূপো, শাদা পাথরের সানগ্রী তার গোণা গুণ্ডি
করা যায় না। তা তোমরা চোখে দেখবে
বাছা, আমি চোখে দেখিনি, তবে কলকাতা
থেকে একজন লোক এসেছিল, সেই বলে
যে, * * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক,
আমার উমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, দুটি
বোনের মত থেকে। আহা, বাছা, তোদের
নিয়েই আমার বরকরা, তোদের না থেকে
কেমন ক’রে থাকব? (রোদন) তা বাছা,
উমাও নীপুগিরি যাবে, তার সঙ্গে দেখা
করিস, না হয়, তাদের বাড়ীতে গিরেই দিন
কতক রইলি। তাদের ত এমন বাড়ী নয়,
শুনেছি, সে মস্ত বাড়ী, অনেক বর-বরকরা,
বুঝলে কি না * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া জ্যোতাই-
য়ার কাছে বিদায় লইয়া বিন্দু একবার
শরতের মাতার নিকট বিদায় লইতে
গেলেন। শরৎ কলিকাতায় বাওয়া অবধি
তাহার মাতা আর একাকী বাড়ীতে থাকি-
তেন, শরৎ অনেক বলিয়া কহিয়া একটি

কি রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটি বামনী রাধিবার কথা শরতের মাতা কোনপ্রকারে সম্মত হইলেন না। বাড়ীটি প্রশস্ত, বাহির-বাড়ীতে একটি পাকা ঘর ছিল, শরৎ কলিকাতা হইতে আসিলে সেইখানেই আপনার পুত্রকাদি রাখিতেন ও পড়াশুনা করিতেন। বাড়ীর ভিতর দুই তিনটি পাকা ঘর ছিল, আর একটি খোড়ো রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে একটি মধ্যমাকৃতি পুকুর, শরৎ তাহা প্রতিবৎসর পরিষ্কার করাইতেন।

শরতের মাতা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণ ছিলেন, বিশেষ স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর শরীরের যত্ন নইতেন না, স্ততরাং আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিতেন, একখানি নামাবলি ভিন্ন অস্ত্র উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন না। স্নান-সমাপনান্তর প্রত্যহ প্রায় এক প্রহর ধরিয়া আশ্রিত করিতেন, তাহার পর বহুস্তে রন্ধনাদি করিতেন। স্বামীর মৃত্যুতে ও কালীতারার কষ্টের চিন্তায় বিধবার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, মাথার চুল অনেকগুলি শুক হইয়াছিল, অকালে বার্ককোর দুর্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন দেব-আরাধনায় ও পারমার্থিক চিন্তায় অহিবাচিত করিতেন। কালে বাছা শরৎ একজন বিদ্বান ও মাননীয় লোক হইবেন, কেবল সেই আশায় তাঁহার জীবনের গ্রন্থি এখনও শিথিল হয় নাই।

হেমচন্দ্র, বিন্দু ও সুধাকে আশীর্বাদ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, “যাও বাছা, ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমরা মানুষ হও, বাছা শরৎ মানুষ হোক, এইটি চক্ষে দেখে যাই, আমার এ বয়সে আর কোন বাছা নেই। দেখি বাছা শরৎ, এদের যাওয়া-

মাওয়ার কোন কষ্ট না হয়, বিন্দুর ছুটি ছেলের যেন কোন কষ্ট না হয়, বাছা সুধা কচি মেয়ে, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।”

সুধার কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধার নয়ন হইতে কঁদ কঁদ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধা বৈধবা-বরণা জানিতেন, এই জানমূল অন্নধরকা বালিকাকে ভগবান কেন সে বরণা দিলেন?

অল্পকাল কথাবাদ্যের পর শরতের মাতা বিন্দু ও সুধাকে অনেক সঙ্গপদেশ দিলেন, হেমচন্দ্র কলিকাতার বাইরা সাবধানে থাকিতে বলিলেন, শরৎকে মনোযোগ পূর্বক লেখাপড়া করিতে বলিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা সকলকে পুনরায় আশীর্বাদ করিলেন, সকলে বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় হইলেন; শরৎও মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মা, তোমার কথাগুলি আমি মনে রাখিব, যত্নে পালন করিব, যে দিন তোমার কথার অবধ্য হইব, সে দিন যেন আমার জীবন শেষ হয়।”

সকলে চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা সজলনয়নে অনেকক্ষণ অবধি সেই পথে চাহিয়া রহিলেন, শেষে শূন্যহৃদয়ে সে পথপানে চাহিয়া চাহিয়া শূন্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। হেম বাটী আসিয়া দেখিলেন, সনাতন কৈবর্ত আসিয়াছে। বিন্দু গ্রাম হইতে বাইবার পূর্বে আগমন জমীখান তাহাকে ভাগে দিয়াছিলেন, ক্রতজ সনাতন সজলনয়নে বাবুকে আর একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সনাতনের সঙ্গে সনাতনের পত্নীও আসিয়াছিল, সে আর একখানি চিনিপাতা দৈ আনিয়াছিল। বিন্দু অনেক ব্যয় করিল, কিন্তু কৈবর্ত-পত্নী তাহা গুনিল না, বলিল, “গাড়ীতে যদি আরগা না হয়, আমি হাতে ক’রে বর্তমান টেসন পর্যন্ত দিয়ে আসিব।” স্ততরাং সুধা গাড়ীতে চাপিয়া সেই দৈ কোলে করিয়া গেল। গাড়ীর ভিতর

বিন্দু ও সুধা দুই ছেলেকে লইয়া উঠিলেন, শরৎ ও হেম হাঁটিয়া বাইতেই পছন্দ করিলেন। গোবর গাড়ী বড় আন্তে আন্তে যায়, প্রাতঃকালে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও বেলা দুই প্রহরের সময় বর্ধমানে পৌছিল।

ষ্টেশনের নিকট একটি দোকানে গিয়া সকলে উঠিলেন এবং তথায় রাঁধা-বাড়া করিয়া শীত শীত খাওয়া-দাওয়া করিয়া লইলেন। বর্ধমানের ষ্টেশনের কাছে বড়োমন্ডর থানা ও সীতাভোগ পাওয়া যায়, শরৎবাবু তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা দিয়া সুধা শেখবার তালপুকুরের চিনি-পাতা দৈ খাইয়া লইল।

বেলা দুইটার পর গাড়ী ছাড়ে, দুইটা না বাজিতে বাজিতে ষ্টেশন লোকপূর্ণ হইল। হেম অনেক দিন রেলওয়ে ষ্টেশনে আসেন নাই, অতিশয় ঔৎসুক্য সহিত সেই লোকের সমাগম দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রকার লোক ষ্টেশনে জড় হইতেছে, দেখিয়া হেমের মনে একটি অচিন্তনীয় ভাব উদয় হইল। ছুর-মাড়ওয়ার ও বিকানীর প্রদেশ হইতে বড় বড় গাঁঠরা লইয়া বন্দিগণ কলিকাতার বাণিজ্যার্থে আসিতেছে; ইহারাই ভারত-বর্ষের প্রকৃত বণিকসম্প্রদায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই অন্নব্যয়ী, বহকষ্টসহ, বহুপথগামী, কঠোরজীবী জাতির সমাগম ও বাণিজ্য আছে। আরা প্রভৃতি জেলা হইতে সবল-দরদর, বহুশ্রমী, কিন্তু দরিদ্র বিহারীগণ চাকরীর জন্ত কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছে। কানী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ হইতে বাঙ্গালী নারী, পুত্র ও বন্ধুদিগের সঙ্কীর্ণ বাড়ী কিরিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালী নারী সহজে দুর্বলা ও গৃহপ্রিয়, তীর্থ করাই তাঁহাদিগের দেশভ্রমণের একমাত্র উপায়, তীর্থ করিবার

জন্ত তাঁহারা কষ্ট ভুখ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন ও পুষ্কর তীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। বালকগণ ছুটির পর পুন্ডরায় কলিকাতার অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে, যুবকগণ নানা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য বা উচ্চাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহানগরীর দিকে আসিতেছেন। আশা তাঁহাদিগের সম্মুখে নানা চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, যুবকগণ সেই কুহকে ভুলিয়া উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ বিদেশ হইতে চাকরী করিয়া কিরিয়া আসিতেছেন, অনেক দিন পর পুত্রকলত্রের মুখ দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। কেহ বা প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত, কেহ বা আত্মীয়-বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্ত, কেহ ধন, মান, পদ বা যশো-লিপ্সায়, কেহ বা জীবনের সারাহে কেবল গল্পাভীরে বাস করিবার জন্ত, সকলেই নানা উদ্দেশ্যে এই বিস্তীর্ণ কার্যক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই রাজধানী কর্ণ-দেবীর একটি প্রধান মন্দির, হেমচন্দ্র সেই মন্দির-আগমন-পথে অসংখ্য বাড়ী দেখিতে লাগিলেন।

দুইটার পর গাড়ী ছাড়িল, পাঁচটার পর গাড়ী কলিকাতার আসিয়া পৌছিল। শরৎ একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া ভবানীপুর শরতের বাড়ী অভিমুখে বাইতে লাগিলেন।

হুগলীর পোলের উপর হইতে বিন্দু বিশাল গঙ্গাবকে গৃহভূলা অসংখ্য অর্ণবপোত ও তাহার মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অপরপার্শ্বে কলিকাতার ঘাট ও বর্ধ্যাদি দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গাড়ী বড়বাজার ও চান্দাবাজারের ভিতর দিয়া চলিল। তথায় শরতের কিছু কাপড়-চোপড়

কিনিতেছিল, তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল।
বিন্দু ও সুধা কখনও তালপুকুর হইতে
বাহিরে যান নাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এই
প্রধান জনাকীর্ণ স্থান দেখিয়া তাঁহারা অধিক-
তর বিস্মিত হইলেন। রাত্তার উত্তর পার্শ্বে
দোকান, কোন কোন স্থানে সরু সরু গলীর
উত্তর পার্শ্বে দ্বিতল বা ত্রিতল দোকানে পথ
প্রায় অন্ধকার করিয়াছে; কত দেশের কত
প্রকার বস্ত্রাদি রাশি রাশি হইয়া সজ্জিত
রহিয়াছে; বিলাতী ধান, দেশী কাপড়, বারা-
ণসী শাটী, বস্তুর কাপড়, মসলী পতনের ছিট,
ফ্রান্সের সাতীন বস্ত্রাদি, ইউরোপের নানা
স্থানের গালিচা, চাদর, ছিট, পরদা ও সহস্র
প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাপড়। মণিমুক্তার
দোকানে মণিমুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে,
খেলানার দোকানে রাশি রাশি খেলানা,
সারি সারি খাবারের দোকানে এখন মিষ্টান্ন
প্রস্তুত হইতেছে, পুস্তকের দোকানে পুস্তকশ্রেণী।
শিল, বাহা একখানি কিনিলে গৃহস্থের তিন-
পুরুষ যায়, তাহাই বিন্দু রাশি রাশি দেখি-
লেন, লোহার কড়া, বেড়ী, ঝাঁঝি প্রভৃতি
দ্রব্যোতে দোকান পরিপূর্ণ, পিত্তল ও কাঁসার
দ্রব্যো কোথাও চক্ষু ঝলসাইয়া বাইতেছে।
কাঁচের দোকানে কাঁড়, লঠন, পাত্র, গেলাস,
খেলানা, লেপ্স প্রভৃতি সুন্দররূপে সজ্জিত
রহিয়াছে, কাঠদ্রব্যের দোকানে ছুতারগণ
দ্রব্যাদি পালিস করিতেছে, ছবির দোকানে
কড়িকাঠ ও দেওয়াল ছবিপূর্ণ, বাস্তুর
দোকানে কাঠের বাস্ক, টিনের বাস্ক,
চামড়ার বাস্ক, লোহার বাস্ক, কত প্রকার
দোকানে বিন্দু ও সুধা কত প্রকার দ্রব্য
দেখিলেন, তাহা সংখ্যা করিতে পারিলেন
না। পথ জনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী
চলিতে পারে না, মহুবার ভিড়ে
মহুবা অগ্র-পশ্চাৎ দেখিতে পার

না, চারিদিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ,
খরিকারদিগের কথা, বিক্রেতাদিগের চীৎকার-
ধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,
“এ কি বিশাল মহুবা-সমুদ্র! এত লোক
কি করে, কোথা হইতে আইসে, এত দ্রব্য
কে ক্রয় করে, কোথায় চলিয়া যায়।” অল্প
তালপুকুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মহুবা-
সমুদ্রে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহা-
নগরীর কোন নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান
পাইবেন?

সন্ধ্যার সময় বিন্দুর গাড়ী চীনা বাজার
হইতে বাহির হইয়া লালদীঘির নিকট গিয়া
পড়িল, তথায় বাইবার সময় তিনি প্রাসাদ-
তুল্য ইংরাজী দোকান দেখিয়া বিস্মিত হই-
লেন। এই সকল দোকান কাপড়ওয়ালার
দোকান বা জুতাওয়ালার দোকান শুনিয়া
বিস্মিত হইলেন। জুতাওয়ালার ও কাপড়-
ওয়ালার একত্রে ভারত-সমাজের নিয়ন্তর,
জুতাওয়ালার ও কাপড়ওয়ালার ইংলণ্ডের
গৌরবস্বরূপ, ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের
প্রধান হেতু!

বিস্মিত-মনের সুধা ও বিন্দু লাট
সাহেবের বাড়ী দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে
বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া
গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইক্ষুপুরীতুল্য চৌর-
কীতে দীপালোক প্রজ্বলিত হইয়াছে, এখন
মর্ত্যে ঈশ্বারা দেবত্ব করিতেছেন, তাঁহারা
বেকশ, ফিটন বা লেওলেট করিয়া ইন্ডেন-
গার্ডেনে সমাগত হইতেছেন। ঐ প্রসিদ্ধ
উদ্যান হইতে অপূর্ণ বাস্তবধর্মী প্রকৃত হই-
তেছে এবং আকাশের বিদ্যুৎ মহুবার
বিজ্ঞানমততার অধীন হইয়া নরনারীর
রক্তনখ আলোক বিতরণ করিতেছে!
ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের
গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া

তালপুকুরনিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিম্বিত হইলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দিনের পরিশ্রম বশতঃ সুধা হেমের বকে মস্তক-স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, ছোট হস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও চক্ষু মুদিত করিয়া-ছিলেন। শরৎ-বাবু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া-ছিলেন, হেমচন্দ্র সুধার মস্তকটি ধারণ করিয়া নিম্নরে পথ ও হৃদয়াদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমের অন্তঃকরণে চিন্তা আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? ভবিষ্যতে কি আছে? শাস্ত্র নিম্নরূপ তালপুকুর ত্যাগ করিয়া তিনি অজ্ঞ এই মহানগরীতে আসিলেন, এই সম্রাটকল মহাশয়-সমুদ্রের কোন নিভৃত কন্দরে কি তাঁহার পাড়াইবার স্থান আছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা বড়বাজার।

বিন্দু। ও সুধা একবার এ দিকে এস ত বোন।

সুধা। কি দিদি, আমাকে ডাকছে?

বিন্দু। হ্যাঁ বোন, ঐ কাপড় একখানা কেচে রেখেছি, ছাদের উপর শুকুতে দাও। আমি ক্রোহে থেকে ছ কলসী জল তুলে শীত নেয়ে নি, রোদ উঠেছে। এখনি গরমালী দুধ আনবে, উত্তন ধরাতে হবে। কলকাতার ক্রোর জলে নাইতে সুখ হয় না, এর চেয়ে আমাদের পাড়ারগেয়ে পুকুর ভাল, বেশ নেবে

মান করা যায়। আর ক্রোর জলে কেমন একটা গন্ধ।

সুধা হাসিয়া বলিল, “তোমার বৃষ্টি কলকাতার সবই ধারাপ লাগে? কেন, কলকাতার কলের জল কেমন সুন্দর। ঝি ধাবার জন্তে এক কলসী ক’রে আনে, সে যেন কাকের চক্ষু, আর কেমন মিষ্টি।”

বিন্দু। নে বোন, তোর কলকাতার সুখ্যাতি আর শুনেতে পারি না।

সুধা। কেন দিদি, তুমি মনে কি দেখলে বল। কত বড় সহর, কত বাজার, দোকান, ঘর, গাড়ী, ঘোড়া লোকজন, এমন কি আমাদের তালপুকুরে আছে? এমন দোতারা বাড়ী কি আমাদের তালপুকুরে আছে?

বিন্দু। তা না থাকুক বোন, আমাদের তালপুকুরের সোনার বাড়ী। চারিদিকে নড়বার জায়গা আছে, একটু বাতাস আসে, একটু রোদ আসে, দুটো নাউ-গাছ আছে, দুটো আঁব-গাছ আছে, এখানে কি আছে, বল তো? গাড়ী-ঘোড়া যাদের আছে, তাদের আছে, আর দোতারা পাকা বাড়ী নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ঘরে বাতাস আসে না, ছোট অন্ধকার উঠানে রোদ আসে না, পাড়ায় লোকের বাড়ী দেখা করুতে বাবার ঘো নাই, পাকী না হ’লে বাড়ীর বাহিরে বাবার ঘো নেই, ও মা, এ কি গো! যেন পিল্লের ভিতর পাখী রেখেছে।

সুধা। কেন দিদি, সে দিন আমরা গাড়ী ক’রে কত বেড়িয়ে এলেম, চিড়িয়া-খানার বাঘ-সিংহ দেখে এলেম, গাড়ী ক’রে বেরুলেই কত কি দেখতে পাই।

বিন্দু। না বাবু, আমার গাড়ী ক’রে বেড়াতে ভাল লাগে না। আমাদের তালপুকুর সোনার তালপুকুর, সকাল বেলা

করের ঘাটে আস্তেম, সেই ভাল । আর সব লোককে চিন্তেম, সবাব বাড়ী যেতেম, সবাই কত আমাদের ভালবাস্ত । এখানে কে কাকে চেনে বল ।

সুধা । তা দিদি, এক দিনেই কি চিন্বে, থাকতে থাকতে সকলকে চিন্বে । ঐ সেদিন দেবীপ্রসন্ন বাবুদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল, আমাদের যেতে বলেছে । আর চন্দ্রনাথবাবু আমাদের কা'ল কত খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ।

বিন্দু । তা আলাপ হবে বৈ কি বোনু ; যত দিন থাকিব, লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হবে । তবে কি জান সুধা, তাঁরা হলেন বড়লোক, আমরা গরিব মাছ, তাঁদের সঙ্গে কি ততটা মেশা যায়, তা নয় ; তাঁরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কন, এই তাঁদের অনুরোধ । তা কল্কেতার যখন এসেছি, তখন দুজন চার জনের সঙ্গে কি চেনাশুনা হবে না, হবে বৈ কি ।

সুধা । আর শরৎ-বাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন, কত লোকের কত কথা কন, কত বইয়ের কথা বলেন, দিদি, সে গল্প শুনে আমার বড় ভাল লাগে ।

বিন্দু । আহা, শরতের মত কি ছেলে আজকাল আর দেখা যায় ? তাঁর একজামিনের অন্ত সমস্ত দিন পড়া-শুনা করতে হয়, তবু প্রত্যহ আমরা কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করতে আসেন, পাছে কল্কেতার এসে আমাদের মন কেমন করে, তাই রোজ সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন । যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলেন, তত দিন ত তাঁর পড়া-শুনা ঘুরে গিয়েছিল, কিসে আমরা ভাল থাকি, সেই চেষ্টায় কি বুতেন । তাঁর চাকার জাঁক নেই, লেখাপড়ার জাঁক নেই, আর শরীরে

কত মারা-দমা । তাঁর মত ছেলে কি আর আছে ?

সুধা । দিদি, ঐ বৃদ্ধি গয়লানী আসছে । বিন্দু । কি লো, আজ একটু ভাল দুধ এনেছিস্, না কাল্কেতার মত জলে দেওয়া দুধ এনেছিস্ ? তোদের কল্কেতার বাছা কলের জলের ত অভাব নেই, তোদের দুধেরও অভাব নেই, রংটা রাখতে পারলেই হ'ল ।

গোয়ালিনী । না মা, তোমাদের বাড়ীতে কি সে রকম দুধ দিলে চলে, এই দেখ না কেন ? খেলেই ত তোমরা ভাল মন্দ বুঝতে পারবে ।

বিন্দু । দেখছি বাছা দেখছি ; আহা, ভালপুত্রে আমরা তিন পো এক সের করে দুধ পেতেম, তাই ছেলেরা খেয়ে উঠতে পারত না । তুই বাছা পাঁচ পো করে দুধ দিস্, তা খেয়েও ছেলের পेट ভরে না ! আর কড়ার যখন দুধ ঢালি, সে দুধ ত নয়, যেন জল ঢালছি ।

গো । তা পাড়ারীয়ে যেমন দুধ পেতে মা, এখানে কি তেমন পাবে ? সেখানে গরু চরে খায়, থাকে ভাল, দুধ দেয় ভাল, আমাদের বাঁধা গরু ক'তেমন দুধ দেয় ?

বিন্দু । আর কা'ল একটু দৈ আনতে বলেছিলেম, তা এনেছিস্ ?

গো । হী, এই যে এনেছি ।

বিন্দু । ও মা ! ঐ চার পরসার দৈ ?

গো । তা, হী মা, চার পরসার দৈ আর কত হবে ? ঐ তোমার ঝিকে বল না, বাজার থেকে একখানা কিনে আনতে, যদি এর চেয়ে বড় আনে, তবে দাম দিও না । হ্যাঁ মা, গোয়ালের পিঠেলে আমরা আছি, তোমাদের কি আমি ঠকাব না ?

বিন্দু । ওলো সুখা, এই দেখ্‌ লো, তোর সোনার কল্‌কেতার চার পরসার দৈ দেখ্‌ । একটু জল মেখে খাস্‌ বোন, তা না হ'লে তাতে মাখতে ফলাবে না । কে ও কি এসেছিল্‌ ?

ঝি । কেন গা ?

বিন্দু । বাছা, আজ একটু সকাল সকাল বাজার বাস্‌ । আজ বাবু দশটার সময় বের-বেন বলেছেন, সকাল সকাল বাজার ক'রে আসিস্‌ । তুই কি মাছ নিয়ে আসিস্‌, তার ঠিক নেই । হাঁ লা, বড় বড় কৈ মাছ বাজারে পাওয়া যায় না ?

ঝি । তা পাওয়া বাবে না কেন মা ? তবে দে দর, সে ছোঁয়া যায় ? বড় বড় কৈ এক একটা দুশরসা, তিন পরসা, চার পরসা চায় ।

বিন্দু । বলিস্‌ কি রে ? কল্‌কেতার লোক কি খার দায় না, কেবল গাভী-বোড়া চ'ড়ে বেড়ায় ?

ঝি । তা খাবে না কেন মা ? বে যেমন খরচ করে, সে তেমন খায় । আমাদের দিন চার পরসার মাছ আসে, তাতে দুবেলা হয়, তাতে কি ভাল মাছ পাওয়া যায় ?

বিন্দু । আচ্ছা, মাগুর মাছ ?

ঝি । ও মা, মাগুর মাছের কথাটি কইও না, একটা বড় মাগুর মাছের দাম চার পরসা, ছ-পরসা, আট পরসা, বলবো কি মা, কল্‌কেতার বাজার যেন আগুন । আমরাও মা পাড়ারগারে ঘর কৈয়েছি, হাতে মাছ কিনে খেয়েছি, তা কল্‌কেতার কি তেমন পাই ? কল্‌কেতার কি আমাদের মত গরিব লোকের থাকবার জো আছে মা, এই তোমরা দুবেলা দুপেট খেতে দিচ্ছ, তাই তোমাদের হিজেতে আছি, নৈলে কল্‌কেতার কি আমরা থাকতে পারি ?

বিন্দু । তা নে বাছা, বা ভাল পাস্‌, নিয়ে

আসিস্‌, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দে'খে তনে ভাল দে'খে আসিস্‌ । আর এক পরসার ছোট ছোট মৌরলা মাছ আসিস্‌, একটু অমল রে'বে দেব । বাবুকে যে কি বিয়ে ভাত দি, তা ভেবে ঠিক পাইনি । আর দেখ্‌, শাগ যদি ভাল পাওয়া যায়, এক পরসার আনিস্‌ ত, নটে শাগ হয় ি পালম শাগ হয়, না হয় নাউ শাগ হয় ত আরও ভাল । আহা, তালপুকুরে আমাদের নাউ শাগের ভাবনা ছিল না, বাড়ীতে যে নাউ শাগ হ'ত, তা খেয়ে উঠতে পারতুম না । আলু-গুনো বড় মাগ'গি, আলু জেরাধা আনিসনি, বেগুন হয়, উচ্ছে কি বিকে হয়, কি আর কিছু ভাল তরকারী যা দেখ্‌বি, নিয়ে আসিস্‌ । আর খোড় পাস্‌ ত নিয়ে আসিস্‌, একটু ছে চ'ক'রে দেব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস্‌, একটু খট রে'বে দেব । হা কপাল ! খোড়, মোচা আবার পরসা দিচ্ছে কিন্তে হয় ।

মান সমাপন করিয়া, গয়লানীকে বিদায় করিয়া, যিকো পরসা দিয়া, বিন্দু রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন এবং উনান জালাইয়া হুধ জাল দিয়া উপরে লইয়া গেলেন । ছেলে দুটি উঠিয়াছে, তাদের হুধ খাওয়াইয়া বিছানা মাতুর তুলিলেন এবং স্বর পরিষ্কার করিলেন । একটু বেলা হইলে দাসী বাজার হইতে মাছ তরকারী আনিয়া, তখন বিন্দু স্বির নিকট ছেলে দুটিকে রাখিয়া পুনরায় রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন । বাটীতে একটি দাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না, রন্ধনকার্য্য দুই ভগিনীই নির্বাহ করিতেন । সুখা ন্তন বাড়ীতে আসিয়া ভা'ড়ারী হইরাছেন, বড় আফ্লাদের সহিত ভা'ড়ার হইতে হুধ, তেল, মসলা বাহির করিলেন, চাল ধুইয়া দিলেন, তরকারী

কুটিলেন, মাছ কুটিলেন এবং আবৃত্তকীর বাটনা বাটরা দিলেন। বিন্দু নীচ রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে, হেমচন্দ্র করেক দিন শরতের বাটিতে থাকিয়া ভবানীপুরে একটি ক্ষুদ্র ভিতল বাটী ভাড়া করিয়া ছিলেন। শরৎ এ অপব্যয়ের বিকল্পে অনেক তর্ক করিলেন, আপন বাটিতে হেমকে রাখিবার জন্য অনেক স্তুতি-মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে শরতের পড়ার হানি হইবে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় কোন প্রকারে রহিলেন না। শরৎ অগত্যা অহুস্কান করিয়া মাসে ১১ টাকা ভাড়ার একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

ভবানীপুরে শরৎ-বাবু অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ ছিল, হেমচন্দ্রও তাঁহাদিগের পরিচিত হইলেন। কেহ হাইকোর্টে ওকালতী করেন, কেহ বড় হোসের বড় বাবু, কাহারও বনিয়ারী বিষয় আছে, আরও বিষয়-সম্বন্ধে সন্দেহ; কিন্তু গ' ঘোড়ার আড়ম্বর আছে। কেহ নবাগত শিষ্টাচারী সম্বৎসরজাত হেমচন্দ্রের সহিত প্রকৃত সম্বাহার করিলেন, কেহ বা ঝাড়-লঠন-পরি-শোভিত জনাকীর্ণ বৈঠকখানার দরিত্রকে আসিতে দিয়া এবং দুই একটি সগর্ভ কথা কহিয়া ভদ্রাচরণ বজায় রাখিলেন এবং নিজ বড়মামুষী প্রকটিত করিলেন। কেহ হেমচন্দ্রের কথাবার্তা ও সদাচারে তুষ্ট হইয়া শরতের সহিত হেমকে দুই একদিন আহ্বারে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেহ বা নব্য সভ্যতার স্তম্ভের নিয়মামুসারে হেমচন্দ্রের “একোয়ে-তান্‌স করম” করিতে “ভেরি ছাপি” হইলেন। কোন বিষয়কর্মে ব্যস্ত বড়লোকের কার্পেটমণ্ডিত ঘরে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ

অপেক্ষা করিয়াও সাক্ষাতারত লাভ করিতে পারিলেন না, অল্প কোন বড় লোক, তিনিও বিষয়-কার্যে অতিশয় ব্যস্ত, ছুটী করিয়া বাহির হইবার সময় ক্রহেমের জানালার ভিতর হইতে সহস্র মুখচন্দ্র বাহির করিয়া সামুগ্রহ-বচনে জানাইলেন যে, হেম-বাবু কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে আছেন শুনিয়া তিনি (উপরি-উক্ত বড় লোক) বড় সুখী হইয়াছেন। অল্প তিনি (উপরি-উক্ত বড় লোক) বড় “বিজি,” কিন্তু তিনি “হোপ” করেন, নীচ একদিন বিশেষ আলাপ-মালাপ হইবে। আর যদি হেমবাবু তাঁহার (উপরি-উক্ত বড় লোকের) বাগান দেখিতে মানস করেন, তবে শনিবার অপ-রাহ্নে আসিতে পারেন, সেখানে বড় “পাটি” হইবে, তিনি (উপরি-উক্ত বড় লোক) হেম-বাবুকে “রিসিড” করিতে বড় “ছাপি” হইবেন! বর্ধর-শব্দে ক্রহেম বাহির হইয়া গেল, অশঙ্করোদগত অর্দ্ধম হেমচন্দ্রের বস্ত্রে দুই এক কোঁটা লাগিল, হেমবাবু সেই অমৃত হাস্য ও অমৃত-বচনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী গেলেন।

ভবানীপুরে ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বালাকালে তিনি মনে করিতেন, কলিকাতার বড়বাজারই সর্বোপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন, কলিকাতার বড়বাজার হইতেও একটি বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল স্তম্ভমজাত আছে, সেই অপূর্ণ মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতনের স্থায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বালাকালে তিনি শিশু-শিকার পড়িয়াছিলেন যে, গুণ থাকিলে

বা বিস্তা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যো-
চিত ভ্রম তাঁহার শীঘ্রই তিরোহিত হইল,
তিনি এখন দেখিলেন, সম্মানানুভূত সেরকরা,
যশস্বরা বাজারে বিক্রয় হইতেছে, কেহ
ভারী খানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেনপার্টি
দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহ বা পরের ধনে
হস্তপ্রসারণ করিয়া সেই অমৃত ক্রম
করিতেছেন ও বড় সুখে, নিম্নালিতাঙ্কে
সেই সুখা সেবন করিতেছেন। সুন্দর
সুশোভিত বৈঠকখানার ঝাড়-লঠন হইতে
সে অমৃতের স্বচ্ছবিন্দু করিয়া পড়িতেছে,
দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্মল অমৃত
প্রতিকলিত হইতেছে, সুবর্ণবর্ণ সুধার
সহিত যে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্তকীর
সুললিত কণ্ঠস্বরে সে অমৃত-প্রসারণের স্বর
শব্দিত হইতেছে! মন্থব্য-মক্ষিকাগণ ঝাঁকে
ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে। কখন
বুকের বাড়ী হইতে বর্ষর-শব্দে সেই অমৃত
নিঃসৃত হইতেছে, কখন অশ্লারের দোকান
হইতে সে সুখা প্রতিকলিত হইতেছে, জগৎ
তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে!
আর কখনও বা অব্যবহিত-বেগে কর্তৃগণ-
দিগের মহল হইতে সে অমৃতস্রোত প্রবাহিত
হইতেছে, বাবতীয় বড়লোকগণ, সমাজের
সমাজপতিগণ, ভারী ভারী দেশের মহামান্ত্র-
গণ, পরম সুখে তাহাতে অবগাহন করিতে-
ছেন, হাবুডুবু ধাইতেছেন, আপনাদিগের
জীবন সার্থক মনে করিতেছেন! আবার
কখনও বা বিলাত হইতে “পেক” করা
“চেম্পেটিমিনীসোল” করা বাস্কে বাস্কে সে
মাল আমদানী করা হইতেছে, ছইখানি
কাঁপা বা গিলটী করা দ্রব্যের সহিত রাশি
রাশি চাটুকানিতা বিমিশ্রিত করিয়া
বিলাতী মহাজনের মন ফুলাইয়া দেশীয়
বিজ্ঞগণ সে মাল আমদানী করিতেছেন।

এ বাজারে সে মালের দর কত। “আদত
বিলাতী সম্মানসূচক পদ।” “আদত বিলাতী
সম্মানসূচক পদবী।” এই গৌরব-ধ্বনিতে
বাজার গুলজার হইতেছে।

বিভীর্ণ বাজারের অমৃত কোথাও
“বেশহিঁতেবিভা,” “সমাজ-সংস্কার” প্রভৃতি
বিলাতী মাল বিলাতীদের বিক্রয় হইতেছে,
সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের
ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল,
তাহাতে কলিকাতার টাউনহল, কৌন্সিল-
হল, মিউনিসিপাল হল প্রভৃতি বড় বড়
অট্টালিকা বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র
দেখিলেন, রাজমিস্ত্রী অনবরত মেরামত
করিয়াও সে সব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে
না, দেয়াল ও ছাদ কাটিয়া গিয়া সে
কোলাহল গগনে উথিত হইতেছে, সমস্ত
ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার
সে হাটের ঠিক সম্মুখে অন্তরূপ মাল বিক্রয়
হইতেছে, বিক্রেতৃগণ বড় বড় জয়ঢাক
বাজাইয়া চীৎকার করিতেছে—“আমাদের
এ ষাঁটা দেশী মাল, ইহার নাম ‘সমাজ-
সংরক্ষণ,’ ইহাতে বিলাতী মালের ভেজাল
নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখা।” হেম-
চন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন,
মালটা বোল আনা বিলাতী, বিলাতী পাঞ্জ
বিক্রীত, বিলাতী মালমসলার প্রস্তুত, কেবল
একটু দেশী ঘিের ভাজিয়া লওয়া মাত্র।
হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু
সৌখীন, তাঁহার বোধ হইল, ঘিটাও ভাল
ষাঁটা দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা ও দুর্গন্ধ।
সেই ঘিের ভাজা গরম গরম এই “প্রস্তুত
দেশী মাল” বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি
খরিদার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে।
সের দরে, মণ দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালার
করিয়া, সেই মাল বিক্রয় হইতেছে। মুটরা

রাশি রাশি মাল বহিরা উঠিতে পারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আঘোদিত হইতেছে !

তাহার পর সাধুঘরের বাজার, বিজ্ঞতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার, হেমচন্দ্র কত দেখিবেন ? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ; এক শাস্ত্রে নহে, সর্বশাস্ত্রে ; এক ভাবের নহে, সকল ভাবের ; এক বিষয়ের নহে, সকল বিষয়ের ; কম বেশী নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান ; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে। সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটি জালা ফাঁসিয়া গেল, পথ-ঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দমময় হইল, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পলাইলেন।

তাহার পর ধর্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতার বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়লেন। কলিকাতার কি মহাত্মা ! এমন জিনিসই নাই, যাহা খরিদ-বিক্রয় হয় না। যাহাতে দুই পরস্পর লাভ আছে, তাহারই একথানা দোকান ধোলা হইয়াছে, মাল গুদামজাত হইয়াছে, মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একবারি জমকাল “সাইন্ বোর্ড” সম্মুখে লক্ষদ্বিগের নয়ন ঝলসিত করিতেছে ! বাল্যকালে তিনি বড়বাজারের বণিকদিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অল্প এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতার জিনিসের কাটতি, চতুরতার বিশেষ মুনকা, চতুরতার জগৎ-সংসার ধাঁধা লাগিয়া রহিয়াছে।

কলিকাতার অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁচী মালও দেখিতে পাইলেন। কখন কোন কুজ দোকানে বা অন্ধকার হুটীরে একটু খাঁচী দেশহিতৈষিতা, একটু খাঁচী পরোপকারিতা বা একটু খাঁচী পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে ? কলিকাতার গৌরবাধিত বড়বাজারে সে মালের আমদানী-রপ্তানী বড় অল্প, অসভ্য মহাসম্রাজ্ঞ ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প।

—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

—

ছেলে-মুখে বুড়ো কথা ।

আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তিনি কলিকাতার কোন কার্যের জন্য বিশেষ লালায়িত নহেন, কিছু না হয়, ছয় মাস পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন, পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, তথাপি যখন কলিকাতার কর্ণের চেষ্টায় আসিয়াছেন, তখন কর্ণ পাইবার জন্য যত্নের জটিল করিলেন না ; কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি কোন উপায় করিতে পারেন নাই। তাহার চারিদিকে কলিকাতার অনন্ত লোক-শ্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে, এই অনন্ত জনসমুদ্রের মধ্যে হেমচন্দ্র একাকী !

সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। শান্ত, সন্তোষ, বিন্দু স্বাধীর অন্ত ভাল খাবার প্রস্তুত করিয়া

রাখিতেন, কুখানি আঁক, দুটি পানকল, চারিটি মুগের ডাল, এক মেলাস মিছরী-পান্না সব্বের আনিয়া দিতেন, প্রহরটিতে মিষ্টবান্ধা খাওয়া হেমচন্দ্রের প্রীতি দূর করিতেন। পল্লীগ্রামে বেলপ, তবানীপুরেও সেইরূপ, বামীসেবাই বিন্দুর একমাত্র ধর্ম, ছেলে দুটিকে মাছ খরাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ; সেই কার্যে প্রত্যেককাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় শিশু দুটিকে লইয়া ছাদে গিয়া বসিতেন। কখন কখন দেশের চিন্তা করিতেন, কখন কখন ছাদের প্রাচীরের গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথের জনশ্রোত শোণিতেন, তাঁহার শরীর পূর্বাৎসব একটু ক্ষীণ, তাঁহার মন মুখগুল পূর্বাৎসব একটু অধিক ম্লান।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শরৎ হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিন্দু শয়ন-ঘরে প্রদীপ জালিয়া একটী মাছুর পাতিয়া দিতেন, সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্তা করিতেন। হেমচন্দ্র কলিকাতার বাহা বাহা দেখিতেন, তাহাই বলিতেন; শরৎ কলেজের কথা, পুস্তকের কথা, শিক্ষক বা ছাত্রদিগের কথা, কলিকাতার নানা গল্প, নানা কথা, সংসারের সুখ-দুঃখের কথা, জগতের ধন ও দারিদ্র্যের কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কহিতেন। তাঁহার নবীন বয়সের উৎসাহ ধর্মপরায়ণতা ও মৃদুপ্রতিজ্ঞা সেই কথার সঙ্গীপ্যমান হইত, জগতে প্রকৃত মরণ লোকের উৎসাহ, মহত্ব ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞার গল্প কহিতে কহিতে শরৎচন্দ্রের শরীর কটকিত হইত, জগতের প্রতারণা, মিথ্যাচরণ ও অত্যাচারের কথা কহিতে কহিতে সেই যুবকের নরনরম প্রজলিত হইত।

হেমচন্দ্র কোঠা ভ্রাতার মেহের সহিত

সেই উন্নতহৃদয় যুবকের কথা শুনিয়া অভিমান তুই ও প্রীত হইতেন, বিন্দু বাণ্যমুহুরের হৃদয়ের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা ও ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন এবং মনে মনে শরতের ক্রয়োভয়ঃ প্রশংসা করিতেন; বালিকা সুধা নিজা ভুলিয়া বাইত, একাগ্র-চিন্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃতভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।

হেমচন্দ্র কলিকাতার বাহা বাহা দেখিতেন, সে কথা সর্বদাই সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেন। একদিন কলিকাতার “বড়বাজারের” মাগাশ্যোর কথা বর্ণনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “শরৎ! দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সঙ্গুণগুলি মনুষ্য-হৃদয়ের প্রধান গুণ, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সঙ্গুণগুলির নামে ভোমাদের কলিকাতায় যে রাশি রাশি প্রতারণাকার্য্য হয়, তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের পল্লীগ্রামে প্রকৃত বদেশ-হিতৈষিতা বিরল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু বদেশহিতৈষিতার আড়ম্বরও বিরল!”

শরৎ। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, বড় বড় সহরেই বড় বড় প্রতারণা, কিন্তু আপনি কি প্রকৃত সঙ্গুণ কলিকাতায় পান নাই, প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, সত্য-চরণ, বিজ্ঞানস্বাগ, বশোলিপা প্রভৃতি যে সমস্ত সঙ্গুণ মনুষ্য-হৃদয়কে উন্নত করে, সেগুলি কি আপনি দেখেন নাই?

হেম। শরৎ, তাহা আমি বলি নাই, বরং কলিকাতায় সেরূপ অনেক সঙ্গুণ দেখিয়া আমি ভূপ্ত হইয়াছি। কলিকাতার

যে প্রকৃত বৈষ্ণবরাগ দেখিরাছি, যদ্যপি-
দিগের হিতসাধন অল্প বৈষ্ণব অনন্ত চেষ্টা,
উত্তম, জীবনব্যাপী উৎসাহ দেখিলাম, এরূপ
পল্লীগ্রামে কখনও দেখি নাই; পুস্তকে ভিন্ন
অন্ত স্থানে লক্ষিত করি নাই। বিচ্ছিন্নরাগও
সেইরূপ। কলিকাতার আসিবার পূর্বে আমি
প্রকৃত বিচ্ছিন্নরাগ কাহাকে বলে, জানিতাম
না, কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য, স্বদেশবাসি-
দিগের যথো জ্ঞান-বিতরণ জন্য, যৌবন
হইতে মধ্যবয়স পর্যন্ত, মধ্যবয়স হইতে
বার্দ্ধক্য পর্যন্ত অনন্ত অব্যাহত পরিশ্রম,
তাহা কলিকাতায় দেখিলাম। আর প্রকৃত
যশে অভিরুচি, জীবনপণ করিয়া সংকার্যের
দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিতে দুর্দমনীর আকাজ্ঞা
ও অধ্যবসায়, ইহা পল্লীগ্রামে কোথায়
দেখিব? ইহাও কলিকাতায় দেখিলাম।
শরৎ, আমি কলিকাতায় শত শত সঙ্গ
দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে একটি সঙ্গ
আছে, সেইখানে তাহার দশ প্রকার মিথ্যা
অনুসরণ আছে; যদি দশজন প্রকৃত দেশ-
হিতৈষী থাকেন, একশত জন দেশহিতৈষীর
নাম লইয়া চীৎকার ও ভণ্ডামী করিতেছেন,
দশজন প্রকৃত সমাজসংরক্ষণে যত্নশীল, শত-
জন সেই সঙ্গের নামে শত প্রকার প্রতা-
রণার দ্বারা পরস্পর রোজগার করিতেছে।
এইটি প্রকৃত দোষের কথা।

শরৎ। সে দোষ তাহাদের, না আমা-
দের? বিন্দু দিদি, তোমার এ মাহুরে ছার-
পোকা আছে?

বিন্দু। সে কি শরৎবাবু, কামড়াচ্ছে
না কি?

শরৎ। কামড়ায় নি, জিজ্ঞাসা করছি,
আছে কি না?

বিন্দু। না শরৎবাবু, আমার বাড়ীতে
অমন জিনিসটি নেই। আমি নিজের হাতে

প্রত্যহ বিছানা-মাহুর রোদে ব, জিনিস
পত্র বাড়-খোঁড় করি। নোংরা আমি
হু চক্ষে দেখতে পারি না।

শরৎ। সে দিন হেমবাবু আর আমি
দেবীপ্রসন্ন-বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম,
বাড়ীর ভিতর আমাদের খেতে নিয়ে গিয়ে-
ছিল; তা তাদের মাহুরে এমন ছারপোকা
যে বলা যায় না। তার কারণ কি বিন্দুদিদি

বিন্দু। কারণ আর কি, নোংরা, অপরি-
কার। জিনিসপত্র নোংরা রাখলেই এগুলো
জন্মায়।

শরৎ। বিন্দু দিদি, আমরাও সেইরূপ
সমাজ অপরিষ্কার রাখলেই তাতে প্রতা-
রণার কীটগুলো জন্মায়। আমরা যদি পর-
নিন্দা ইচ্ছা করি, পরনিন্দা বাজারে বিক্রয়
হইবে। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমাত্রীর
মূর্থতার মুগ্ধ হইয়া ই। করিয়া থাকি, সেই
মূর্থতাই বিচ্ছিন্নরূপে বিক্রয় হইবে। ওঠে
বিচ্ছিন্ন দেশহিতৈষিতার যদি আমরা পুল-
কিত হই, সেইরূপ দেশহিতৈষিতার ছড়া-
ছড়ি হইবে। চীনাবাজারে যখন ধ্বংস কাপড়
লোকের পছন্দ হয়, সেই সময় সেইরূপ
কাপড়ের মূল্য অধিক হয়, আমাদেরই অধিক
হয়। আমাদেরও যেরূপ সঙ্গপে পছন্দ ও
রুচি, সেইরূপ ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইতেছে।
এটি তাহাদের দোষ, না আমাদের দোষ?

বিন্দু। আচ্ছা, সে কথা বুঝলুম। কিন্তু
মাহুরে ছারপোকা হ'লে মাহুর রোদে দিতে
পারি, মশারি বা বিছানায় কীট থাকলে তা
ধোপার বাড়ী দিতে পারি। সমাজে এরূপ
কীট উৎপন্ন হ'লে তার কি উপায়? সমাজ
কি ধোপার বাড়ী পাঠান যায়, না রোদে
দেওয়া যায়?

শরৎ। বিন্দু দিদি, সমাজ পরিষ্কার
করিবারও উপায় আছে। স্বর্ঘ্যের

আলোকে বেরণ যাছরের ছারপোকাগুলি মুড় মুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর সামগ্রীগুলিও একে একে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয়। যদি শিক্ষার সে কল না ফলে, তাহা হইলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ওঠহ দেশহিতৈবিতার যদি আমরা মুগ্ধ না হই, তবে সেরূপ দ্রব্য কত দিন উৎপন্ন হয়? পাণ্ডিত্যভিযানী মূৰ্খতা দেখিলে যদি আমরা সহ্যন্তে তথা হইতে প্রেস্থান করি, তবে সে সামগ্রী কত দিন বিরাজ করে? এ সমস্ত মেকী সামগ্রী যে এখন এত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে আমাদের শিক্ষার দোষে, তাহাদের দোষে নহে।

হেম। শরৎ, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তথাপি শিক্ষা-গুণে সমাজ হইতে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা একেবারে লোপ হইবে, এরূপ আমার আশা নাই। শিক্ষিত দেশে যতদূর প্রতারণা আছে, আমাদের দেশে তত নাই, মল্লব্য-হৃদয়ে যত দিন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই থাকিবে, জগতে তত দিন ধর্মান্ধারণ ও প্রতারণা উভয়ই থাকিবে; তথাপি প্রকৃত শিক্ষাগুণে সমাজে কর্তব্যসাধনবাসনা ক্রমে বিস্তৃত হয়, তাহা আমাদেরও বোধ হয়।

বিশু। তা আজকাল তোমাদের কলেজে যে গেণ্ডা-পড়া হয়, তাতে কি এ শিক্ষা দেয় না?

শরৎ। বিশু দিদি, কলেজের শিক্ষাকে অনেকে অভিযন নিকা করে, আমি তাহা করি না। যে শিক্ষার আমরা মহৎ জাতি-নিগের, মহৎলোকনিগের জীবনচরিত ও কার্য-কলাপ অবগত হইতেছি ও প্রকৃতির বিশ্বকর নিয়মাবলী শিখিতেছি, তাহা কি

মন্দ শিক্ষা? যাহারা ইহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারেন না, সে তাহাদের হৃদয়ের দোষ, শিক্ষার দোষ নহে। হেমবাবু কলিকাতার যে প্রকৃত দেশহিতৈবিতা, প্রকৃত উন্নতি-ইচ্ছার কথা বলিলেন, তাহা পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, অত্ তাহা হইতে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা কেবল এই কলেজের শিক্ষাগুণে। আবার এই শিক্ষা-গুণে এই সঙ্গুণগুলি পঞ্চাশৎ বৎসর পর আরও অধিক লক্ষিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু শতাব্দীতেও আমরা ইউরোপীয় জাতিদিগের ঠিক সমকক্ষ হইতে পারিব কি না, সন্দেহ, কিন্তু তথাপি আমার ভরসা যে, জগদীশ্বরের রূপায় দিন দিন আমরা অগ্রসর হইতেছি। আত্মবিসর্জন ও কর্তব্যসাধনে অনন্ত উৎসাহ ও অনন্ত চেষ্টা, এই উন্নতির একমাত্র পথ, সেই আত্মবিসর্জন, সেই নিকাম কর্তব্যসাধন আমরা এখনও কতটুকু শিখিয়াছি, চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

কথার কথার রাত্রি অনেক হইয়া গেল, শরৎ বাইবার জন্ত উঠিলেন। হেম তাহার সঙ্গে দ্বার পর্যন্ত যাইলেন, দেখিলেন, পথে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং গ্রীষ্মকালে শীতল নৈশ বায়ু বহিয়া বাইতেছে। স্মরণ্য তিনি এক পা ছই পা করিয়া শরতের সঙ্গে অনেক দূর গেলেন। পথেও এইরূপ কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেবীপ্রসন্ন-বাবুও আজ সন্ধ্যার সময় হাওরা দ্বাইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি শরৎ ও হেমকে দেখিয়া শরতের বাটী পর্যন্ত তাহাদিগের সহিত গেলেন।

হেমচন্দ্র দেবীবাবুর সহিত কিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন, “আমি কলেজের অনেক ছেলে দেখিয়াছি, অনেকের সহিত কথা কহিয়াছি, কিন্তু শরতের ভায় প্রকৃত

লিঙ্কালান্ড করিয়াছেন, শরতের জ্বর উন্নত জ্বর, উন্নত চিত্ত, অনিন্দনীয় উচ্চম ও উৎসাহ আছে, এরূপ অন্নই দেখিয়াছি ।”

দেবীবাবু বলিলেন, “হাঁ, ছেলেটা ভাল, গুণবান্ বটে, বৈচে ধাক্ক, বাপের নাম রাখবে। আর লেখাপড়াও শিখবে বটে, কিন্তু ছেলেমানুষ হয়ে বুড়োর মত কথা কয় কেন? ছোঁড়াটা শেষে ফাজিল না হয়ে যায়, তাই ভাবি।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

দেবীপ্রসন্ন বাবু ।

ভবানীপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে দেবী-প্রসন্ন বাবুর ভারি নাম। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, তাঁহার শরীরখানি এখনও বলিষ্ঠ, স্থূল ও গৌরবর্ণ। তাঁহার প্রসন্ন মুখে হাস্য সর্বদাই বিরাজমান এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই আকৃষ্ট হইত। তাঁহাদের অবস্থা এককালে বড় মন্দ ছিল, দেবীপ্রসন্ন-বাবু বাল্যকালে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া সামান্ত বেতনে একটা “হোসে” কর্ম লইয়া ছিলেন। তথায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, অবশেষে হোসের সাহেবকে অনেক ধরিয়া পড়ায় সাহেব বিলাত বাইবার সময়ে হোসের পুরাতন ভৃত্যের পক্ষপত্তি করিয়া দেন। সৌভাগ্য বধন একবার উন্নয় হয়, তখন ক্রমেই তাহার জ্যোতি-বিস্তার হয়। সেই সময় তিন চারি বৎসর হোসের অনেক লাভ হওয়ার সাহেব-পক্ষ বড় তুষ্ট হইয়া শেষে দেবী বাবুকে

হোসের বড় বাবু করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তখন দেবী বাবুর বিলক্ষণ ছ পয়সা আয় হইল এবং তিনি ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়া সম্মুখে একটি সুন্দর বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইলেন এবং সুন্দররূপে সাজাইলেন। দেবী বাবু প্রত্যহ ৮টার সময় বৈঠকখানায় বসিতেন, প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ক্রমেই দেবী বাবুর নাম বিস্তার হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাড়ীতে বহু সমারোহে পূজা হইত এবং যাত্রা ও নাচ দেখিতে ভবানীপুরের যাবতীয় লোক আসিত। তন্নিম্ন বাড়ীতে একটি বিগ্রহ ছিল, প্রত্যহ তাঁহার সেবা হইত, এবং বাড়ীর মেয়েরা নানারূপ ব্রত উপলক্ষে অনেক দান-দ্বন্দ্ব করিত। চুই একজন করিয়া দেবী বাবুর দরিদ্রা জ্ঞাতি-স্বতৃষ্ণিনীগণ সেই বিস্তার বাড়ীতে আশ্রয় পাইল, পাড়ার মেয়েরাও সর্বদা তথায় আসিত, স্ততরাং বাহিরবাটী ও ভিতরবাটী সমান লোকসমাধার।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর অল্প-দিনের মধ্যেই দেবীপ্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ করিলেন এবং দেবীবাবুও সেই নবাগত ভদ্রলোককে যথোচিত সম্মান করিয়া আপন বৈঠকখানায় লইয়া যাইলেন। বৈঠকখানায় সুন্দর পরিভার বিছানা পাভা আছে, তিনটি মোটা মোটা গির্দে এবং একটি কুলুদিতে দুইটি সমাদান। ঘরের দেয়াল হইতে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি বস্ত্রে ঢাকা রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ছবি ঝুলিতেছে। কোথাও হিন্দু-দেবদেবীদিগের ছবি রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আবার অর্ধনি-দেশস্থ অতি অল্প-মূল্যের অপকৃষ্ট ছবিগুলি বিরাজ করিতেছে। সে

ছবিতে কোন রমণী চুল বাধিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শুইয়া রহিয়াছে; কাহারও শরীর আবৃত, কাহারও অর্ধাবৃত, কাহারও অনাবৃত। আবার তাহাদের মধ্যে করেজীওর একখানি “মেগ্‌ডেলীন,” টিনীয়নের “ভিনস্” ও লেওসিয়রের এক জোড়া হরিণও বিকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে ছাপা এত নিকট যে, ছবিগুলি চেনা ভার। বহুবারে বা নীলামে বাহা শব্দ পাওয়া গিয়াছে এবং বাহা দেবীবাবু বা দেবীবাবুর সরকারের রচিসম্মত হইয়াছে, তাহাই ছাপা হউক, ওলিওগ্রাফ হউক, সংগ্রহ পূরক বৈঠকখানার দেয়াল সাজান হইয়াছে।

হেমচন্দ্র সর্বদাই দেবীবাবুর সহিত আলাপ করিতে বাইতেন এবং কখন কখন সময় পাইলে আপনার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিয়া বলিতেন। দেবী-বাবু অনেক আশ্বাস দিতেন, বলিতেন, “হেম-বাবুর মত লোকের অবশ্যই একটি চাকরী হইবে, তিনি স্বয়ং সাহেবদের নিকট হেম-বাবুকে লইয়া যাইবেন, হেমবাবুর চার লোকের ভ্রাতা তিনি এইটুকু করিবেন না, তবে কাহার ভ্রাতা করিবেন?”—ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া হেমচন্দ্র একটুকু আশ্বস্ত হইতেন; দেবীপ্রসন্ন-বাবুর প্রধান গুণ এইটি যে, তাঁহার নিকট শত শত প্রার্থী আসিত, তিনি কাহাকেও আশ্বাসবাক্য দিতে ক্রটি করিতেন না।

কিন্তু কার্য-সম্মুখে বাহা হউক না কেন, ভ্রাতাচরণে দেবীবাবু ক্রটি করিলেন না। তিনি ছই তিন দিন হেম ও শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন এবং তাঁহার গৃহিণী হেমবাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পাঠাইলেন; বিন্দু কাজ-কর্ম করিয়া প্রায় অবসর পাইতেন না, কিন্তু

দেবীবাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা চেলিতে পারিলেন না, সুতরাং একদিন সকাল সকাল ভাত খাইয়া স্বথাকে এক ছুটি ছেলেকে লইয়া পাকী করিয়া দেবীবাবুর বাড়ী গেলেন। দেবীবাবু তখন আঁপসে গিয়াছেন, সুতরাং বহির্বাণী নিস্তক; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর ভিতর বাইয়া দেখিলেন যে, অন্দরমহল লোকা-কোণ। উঠানে দাসীরা কেহ কাঁট দিতেছে, কেহ ধর নিকাইতেছে, কেহ কাগড় শুকাইতে দিতেছে, কেহ এখন মাছ কুটিতেছে, কেহ সকল কার্যের বড় কার্য—কলহ করিতেছে। কলিকাতার দাসীগণের বড় পায়, বা-ঠাকুরগণের কথাই গারে সর না,—কোন আশ্রিতা আত্মীয়া বলিয়াছে, তাহা সহিবে কেন—দশ ও কনাইয়া দিতেছে, উদ্র-রমণী সে বাঙালহর রোধ করার উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্থানান্তর হইতেছেন। প্লাংকো-তলার বি-বোয়ের হাট, সকলে একেবারে নাইতে গিয়াছে, সুতরাং রূপের ছটা, গল্পের ছটা, হাস্তের ছটার শেষ নাই। ত বার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মরণীয় খায় অবস্ফুটান প্রিয়বন্ধুদিগের চরণে শ্রদ্ধা করিতেছিলেন। কেহ গুল দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, “হালা, ও বাড়ীর ন-বোয়ের জাঁক দেখেছিস? সেদিন যগ্নগিতে এসেছিল, তা গয়নার জাঁকে আর ভূঁরে পা পড়ে না, হাঁ পা, তা তার স্বামীর বড় চাকরী হয়েছে হট-ইটে, তা এত জাঁক কিসের লা?” কেহ চুল খুলিতে খুলিতে কহিলেন, “তা হোক বোন, তার জাঁক আছে জাঁকই আছে, তার বাতুড়ী কি হারামজারী! যা গো মা, অমন বো-কাটুকী বাতুড়ী ত দেখিনি, বোকে খাবা ভালবাসে বলে সে বুড়ী বোন হ’ চকে

সেই বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়, দাসী, বোঝা, সকলেই সে মেজাজের গুণপ্রত্যাহই সকাল-সন্ধ্যা অহুভব করিত। তুমিরা, দেবীবাবু স্বয়ং রজনীকালে তাহার কিছু কিছু আশ্বাদন পাইতেন। দেবীবাবু স্বয়ং বিষয় করিয়াছেন, তাঁহার আচরণটা পূর্ববৎ নয় ছিল, কিন্তু নূতন বড়মাছুবের মহিবীর ততটা নম্রতা অসম্ভব, নবাগত ধনদর্প দেবীবাবুর গৃহিণীতেই একমাত্র আশ্রয় পাইয়া দ্বিগুণভাবে উৎখলিয়া উঠিয়াছিল।

গিন্নী। কে গা তোমরা?

বিন্দু। আমরা তালপুকুরের বোসেদের বাড়ীর গো, এই কল্কেতায় এসেছি। আপনি আস্তে বলেছিলেন, কাজের গতিকে এত দিন আস্তে পারিনি, তা আজ মনে কবুলেম, একবার দেখা করে আসি।

গিন্নী। হাঁ হাঁ বুঝেছি, তা বসো বসো! তখনকার কালে নূতন লোক এলেই পাড়ার লোকদের সঙ্গে দেখা করার রীতি ছিল, তা এখন সে রীতি উঠে গেছে, এখন লোকের কোথাও বাবার বার হয় না। তা তবু ভাল, জেগেই এসেছে। তালপুকুর কোথায় গা? সেখানে ভদ্রলোকের বাস আছে?

বিন্দু। আছে বৈ কি, সেখানে তিরিশ চার্লশ ঘর ভদ্রলোক আছে, আর অনেক ইতরলোকের ঘর আছে। ঐ বর্ধমান জেলার নাম শুনেছেন, সেই জেলার কাটোরা থেকে ৮।১০ ক্রোশ পশ্চিমে তালপুকুর গ্রাম।

গিন্নী। হাঁ হাঁ, কাটোরা শুনেছি বৈ কি—ঐ আমাদের বিয়েরা সব সেইখান থেকে আসে।” অল্প হান্ত সেই ধনাঢ্যের গৃহিণীর ওঠে দেখা দিল। বিন্দু চুপ করিয়া রহিলেন। কণেক পর গৃহিণী বলিলেন—এটি

দেবীবাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা চেলিতে পারি, সুতরাং একদিন সকাল সকাল কইয়া নুখাকে ও ছুইটি ছেলেকে টাকা করিয়া দেবীবাবুর বাড়ী গিয়া করেন, বৃত্তখন আপিসে গিয়াছেন,

প্রথম-সম্ভব; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর খুলিয়া দিতেলেন যে, অন্তরবহন লোক লেন,—তা নয় সুসীরা কেহ কাঁট দিতেছে আমাদের বাবুর ছে, কেহ কাপড় শুকা-সংসার, তেমন কি সকলোই যাছ কুটিতেছে, তা নয়, ও য'কাখো, কপাখো, কার্য—কলহ

দ্বিতীয়-সংখ্যক আশ্রিতা ঈশ্বর বড় ক্রমাগত তেল মালিস করিতে করি—ইপাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহারও একটি কথা এই সময়ে বলিলে আশু মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। বলিলেন,—“কেবল টাকা কড়ি কেন বল বোন, যেমন মান তেমনি যশ, তেমন লেখা-পড়া, সাহেব মহলে কত সম্মান। ব.স্বী যেন ঐ ষাটের খুরোর ষাধা আছে।”

ঈবৎ হান্তের আলোক গিন্নীর রক্তবদনে লক্ষিত হইল, কথাটি তাঁহার মনের মত হইয়াছিল। একটু সদয় হইয়া সেই আশ্রিতাকে বলিলেন, “আহা! তুমি কতক্ষণ মালিস করবে গা? তুমি হাঁপাচ্ছ ঘে। আর সব লোক কোথা, কাজের সময় যদি একজন লোক দেখতে পাওয়া যায়, সব রান্নাঘরের দিকে মন পড়ে আছে, তা কাজ করবে কেমন করে?”

তীব্রস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল; দাসীতে দাসীতে এইকথা কাণাকাণি হইতে হইতে তারের খবরের দ্বার পাতকোতলার পৌছিল। সহসা তথায় সুবতীদিগের হস্ত-ধ্বনি ধামিয়া গেল, বোরে বোরে দ্বিগে বিগে কাণাকাণি হইতে হইতে সেই খবর রান্নাঘরে

বেধেতে পারে না। তের দেবে বাচি
মট খার বেধিনি।" কত সুন্দর পারে

সমাজ ।

৫৬৯

চালিতে চালিতে বসিলেন, "ও বড় সোঁকরিত, একথা জোঁকরিত
গো, সব সোঁমান—খাত্তরী খাত্তরী হাংক বেলে, সোঁক-
কালে বায়ের বত হয়, তু বেলা হুইবে? হুইলকে হুই
বেতে আমাদের প্রাণ বার।" হুইলকে হুইলকে হুইলকে
কর লো চুপ কর, এখন না হুইলকে হুইলকে হুইলকে
তোর কথা তন্ত পেটে এটি খেলানি, কখন বিটায়, কখন
গাংবে না। তবু বোম জাকাই কাপড় সংগ্রহ
হাজার গুণে ভাল, বিন্দু বলিলেন, "আহা, যেহেটি
খাত্তরী মগীর হুইলকে হুইলকে হুইলকে হুইলকে
বটকে হুইলকে হুইলকে হুইলকে হুইলকে হুইলকে
"তা।"

মল্লিকবাড়ী হইতে গোপবালার মার
নিকট ঘটকী আসিল। গোপীর মা গালি
মিলা বলিলেন, "বলিস্ কি গোড়ারমুখী,
আমার মেয়েকে জলে ভাসাইয়া দিব?
৫০বৎসরের বুড়োর সঙ্গে আমার কচিমেরের
বিয়ে দিব? টাকা নিয়ে কি মেয়ে ধুয়ে
থাবে, গয়না নিয়ে কি মেয়ে পেতে শোবে?
হলেম বা আমরা গরিব, আমরা গরিবই
থাকব, টাকা নিয়ে মেয়েকে বিক্রয় করুব
না। ও মা, ছি! ছি! ছি! ছি! বলি, বুড়ো যে
আমার গোপীর ঠাকুরদাদার বয়সী,—বাছা
উমার যদি ছেলে থাকত, সে যে আজ প্রায়
আমার গোপীর বয়সী হত, বিন্দুর মেয়ে যে
প্রায় আমার গোপীর বয়সী,—আর সেই
বিন্দুর জ্যোষ্ঠা, উমার বাপ, সে কি না আমার
গোপীকে বিয়ে করুতে চার? বলি, বম
কি বুড়োদের জুলে থাকে লা? আর
বুড়োগুলোই বা কি গা? নাতনী-বয়সী
কুটকুটে মেয়ে দেখেও মুখ দিয়ে নাল পড়ে?
ছি! ছি! অমন বুড়োর মুখে আগুন।
না গো না, অমন কথাটি মুখে এনো
না,—ঐ কালীর মা এক বুড়োর সঙ্গে
মেয়ের বিয়ে দিরেছিল, কি হ'ল দেখলে ত?
আবার সেই রকম কাজ করে? না গো না,

আবার ভিনকাল গিরে এককালে ঠেকেছে,
কিছু কণ, খার সংসার, তিনি আমাকে কাদিয়ে
জলে গিরেছেন,—আমিও গেলেই বাঁচি,
আর এ বয়সী সহ হয় না।" বিধবা স্বামীকে
স্বরণ করিয়া হোদন করিতে লাগিলেন।

ঘটকী কিরিয় গেল, বালিকা গোপ-
বালা বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া সকল কথা-
গুলি শুনিল; মনে মনে বলিল, "আমি বড়
ঘরের বোঁ হব, তাতে মা আপত্তি করুতে-
ছেন। মার আপত্তি খাটবে না।"

তারিণী-বাবু মতলব স্থির করিলে সহজে
হঠিবার লোক নহেন। পরদিন ঘটকী বিন্দুর
নিকট আসিল, একখানা চিঠি বিন্দুর হস্তে
দিল। চিঠিখানি বিন্দুর জ্যোষ্ঠাইমা লিখিয়া-
ছেন। তাহাতে এই লিখা আছে,—

"মা বিন্দু, তোমার জ্যোষ্ঠামহাশয়ের
সন্তানাদি না থাকায় আবার বিবাহ করিবেন
স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আমারও মত
আছে। মিজগোষ্ঠীর গোপবালা নামে একটি
মেয়ে আছে, তাহাকেই তোমার জ্যোষ্ঠামহা-
শয় পছন্দ করিয়াছেন, মেয়েটি শুনিয়াছি,
বড় নম্র। মেয়ের মা তোমারই আশ্রিত
লোক এবং তোমার কথা শুনেব। তাঁহার
সম্মতি বাহাতে হয়, সে বিষয়ে যত্ন করিয়া
তোমার জ্যোষ্ঠাইমার কথা রক্ষা কর।

পুনশ্চ—বাছা, উমা গিরে অবধি তুমিই
আমার মেয়ে,—আবশ্যক হইলে তোমার
ঘরে মাকে স্থান দিও।"

বুদ্ধিমতী বিন্দু পত্রের প্রথম ভাগ পড়িয়া
হাসিয়া পড়াইয়া পড়িলেন, শেষ ছত্রটি
পড়িয়া একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাঁহার
জ্যোষ্ঠাইমার এ বিবাহে কিরূপ মত আছে,
শেষ ছত্রে বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তর
লিখিলেন—

"জ্যোষ্ঠাইমা, জ্যোষ্ঠামহাশয় জান হারাইয়া,

বধাসরূপ উপায়, তাহা কি আমি জানি না? বর্ধমানের এ কথা কে না জানে? আপনাকে অবহেলা করিব? আপনার পাতুকা বহন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, আপনার কথা শুনিব না ত কাহার কথা শুনিব?

তারিণী বাবু। না, আর আমাদের কথা কই খাটে? যাও ভায়া, বাড়ী যাও, তোমার মা আমার বিরূপ অপমান করিয়াছেন, গিয়া শুন। কাঁটা মারিয়া আমার লোক বিদায় করিয়াছেন। মিজজা আমার সম্মান জানিতেন, এখন কি না, তাঁহার বিধবা—যাঁহাকে কষ্টের সময় অন্নবস্ত্র দিয়া পালন করিলাম, সে আমার এমন অপমান করে? আচ্ছা, দেখিব, দেখিব, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়?

গোকুল। বলেন কি? মা আমার পথের কাঙ্গালী, সে ভালপুত্রের ধনাঢ্য মল্লিক-বংশের অপমান করিবে? কথাটা কি, ভেঙ্গেই বসুন না।

তারিণী বাবু। আর ভেঙ্গে বলিয়া কি তোমার কাছে অপমানিত হইব? না হে ভায়া, তাহাকে কাজ নাই। এখন তোমরা বড় মাল্লব, তোমরা বড় ধর, আমরা ছোট লোক, এখন কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাহিবে, না আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিবে?

গোকুল। কি বলিলেন? কি বলিলেন? আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা? এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। এ দরিদ্র আপনাদের হাতের এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলে সম্মানিত হয়, আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করিব, এমন দিনও হবে?

মিষ্টকথার দেবতারাগে ভুট্ট হন, তারিণী-বাবুর মন একটু ভিকিল। আজ্ঞা করিলেন, "হরে, হরে! তামাক দে ত। ব'স ভায়া ব'স,

অনেক দূর থেকে আসিয়াছ, দেখাছ, এখনও বাড়ী যাওয়া হয় নি, একেবারে এইখানেই উঠেছ। তা ব'স ভায়া ব'স, তোমার মত বিনীত ছেলে একালে দেখলেও আনন্দ হয়।"

গোকুল। আজ্ঞা না, আমি দাঁড়ায়েই রহিলাম, বতরুণ আপনার আদেশ না পাইব, বতরুণ আপনার আদেশ তামিল না করিব, ততরুণ আসন গ্রহণ করিব না, জলগ্রহণও করিব না।

তারিণী-বাবুর মুখে এখন হাসি দেখা দিল, হৃদয়ে উন্নাসের সঞ্চার হইল। গোকুলের হাত ধরিয়া বসাইয়া, একবার কল্কেতে দু'দিয়া আগুনটা ধরাইয়া তাল করিয়া তামাক টানিয়া গলার সড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "না, বল্ছিলাম কি, তোমার পিতা মিজজার সহিত আমার বিরূপ প্রণয় ছিল, তাহা ত তুমি জানই।"

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, তাহা জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার বিপদ আপদের সময় সাহায্য দিতে গ্রামের মধ্যে বড় কেই ছিল না, তিনি আমার কাছেই আসতেন, তাহাও ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার মৃত্যুর পর, মাঠা কুরুণকে সাহায্য দেওয়া, তোমাকে বর্ধমান সাহেবদের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া, তোমার ছোট বোনটিকে কাপড়-চোপড় দেওয়া,—এ সব কথা ত তুমি জানই। নিজের গুণ নিজমুখে বলা সাজে না, কিন্তু মিজবংশের জন্ত কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহা ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী আবু। তা করিব না কেন বল ? তোমাদের মত ভাল, বেশ ভাল, আচরণ ভাল, তোমাদের জন্ত করিব না ত কি আমার নাস্তিক ভাষ্য-জামাইদের জন্ত করিব ? না আমার নিজের মাতাল জামাইদের জন্ত করিব ? না ভোঁতা, এ ঘোর কলিতেও ধর্ম আছে, এখনও দুর্ঘা পূর্বদিকে উদয় হয়, এখনও তোমাদের জ্ঞান সংশয়ের উন্নতি অবশ্যই হইবে।

গোকুল। সে আপনাদের অমুগ্রহ।

তারিণী আবু। তাই মনে করছিলাম, বিষয়-সম্পত্তি যৎ-বিক্রিৎ করেছি, তালুক, জমা, মহাজনি, তেজারতি, লরি, কারবার, বাড়ী, ঘর, গহনাপত্র সমস্তই আছে। এ আর কাহাকে দিয়া যাব ? কল্যা উমা ত অ'মাকে কাদিয়ে চ'লে গিয়েছে, গৃহিণীও সেই শোকে বার বার হয়েছেন। তা ভেবে চিন্তে দেখলেম, তালপুকুর গ্রামের মধ্যে কুলে, মানে, সন্ন্যাসের মিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ, তা যদি মিত্রবংশের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা স্থাপন করে যাই, তা হ'লে যা রেখে যাব, এ সমস্তই তোমাদের, তোমার ভগিনীরও যা, তোমারও তাই।

গোকুল বুদ্ধিমান্ ছেলে, কথার আভাষে তারিণী-বাবুর মতলবটা বুঝিল, মনে মনে বুদ্ধিমানের জ্ঞানই নিষ্পত্তি করিল। মেরে-ছেলের আবার পছন্দ অপছন্দ কি ? মেরে-গুলো হয়েছে পুরুষের সুখের জন্ত এবং বংশের উন্নতির জন্ত, তাহাদের আবার সুখই কি, উন্নতিই কি ? যদি ভগিনীটাকে মল্লিকবংশে ভাসিয়ে দিবে মিত্রবংশের (অর্থাৎ নিজের) কোন উন্নতি-সাধন হয়, তবে ত সে পরম যত্ন। প্রকান্তে বলিল, "মহাশয়, বাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এ ত

আপনাদের অমুগ্রহ মাত্র। ইহার বাড়ি কি সম্মান আর আমাদের আছে ? আমরা পথের কাশালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ !"

তারিণী আবু। আহা, তোমার মত বিনীত মিষ্টভাষী ছেলে কি আজকাল দেখা যায় ? আর দেখছি কি ভায়া, আমার যথা-সর্বস্ব তোমাদেরই। তোমার বংশের উন্নতি হউক, তোমার ভগিনী আমার গৃহের গৃহ-লক্ষ্মী হউক, তোমার মাতাঠাকুরাণী দীর্ঘজীবী হউন এবং তোমারও ত উপার্জন হতেছে, তুমিও একটি বিবাহ করিয়া তোমাদের পুরাতন ঘর বজায় রাখ।

গোকুল তখন অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া আশ্বস্তা আশ্বস্তা করিয়া শেষে মুখ ফুটিয়া বলিল, "আমরা ত আপনাদেরই দাস, যখন আজ্ঞা করিবেন, আমাদের ভগিনী আপনাদের পরিচারিকা হইবে। তবে আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করি, এরূপ আমাদের অবস্থা কৈ ? পৈতৃক ভাঙ্গা ঘরে আমরা বাস করি, তাহার ইটকাঠ নাই। তা আমাদের ঘর বজায় থাকে যে বলছেন, সে আপনারই অমুগ্রহের উপর নির্ভর। যখন এ দৌনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুটুম্বিতায় স্বীকার হইয়াছেন, তখন বাহাতে আমাদের ঘর বজায় থাকে, পুরাতন গৃহটির সংস্কার হয়, আপনাদের কুটুম্ব বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে পারি, এরূপ উপায় অবশ্যই আপনি করিয়া দিবেন।"

বুদ্ধিমান্ তারিণী-বাবু দেখিলেন, বালক গোকুলের এত দিন যথা বর্তমান নগরীতে কাজ করে নাই, সেও বিশ্ববুদ্ধিতে নিপুণ হইয়াছে, ভগিনীকে বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা আদায় করিবার উপায় করিতেছে টাকার কথা উত্থাপন হওয়ার নাজীর

মহাশয়ের বুকটা একবার হমিসা গেল, কিন্তু আবার সেই ফুটফুটে মেরেটির প্রকৃত ওঠ (হুই দিন পূর্বে বাহারি নধু আদান করিয়া-ছিলেন) তাঁহার মনে পড়িল, স্বপ্নের ঠোঁট দিয়া নাল পড়িতে লাগিল। হান্তগদগদ-বয়ে বলিলেন, “বল বল ভায়া, তোমার কি হতলব, তাহাই বল। আমার সমস্ত সম্পত্তি ত তোমাদেরই দিতে বসেছি, তা, এখনই দি, আর পরেই দি।”

গোকুল। যদি আজ্ঞা করেন ত বলি, আপনি সমস্তই জানেন। আমাদের বাহিরের ও ভিতরের ইষ্টকাবশিষ্ট ঘর—বাহা আপনার পদধূলিতে পবিত্র হইবে,—সেই ঘর পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। খিড়কীর পুকুরটি, বাহাতে আপনি পুণ্যশরীরে অব-গাহন করিবেন,—তাহাও সংস্কার করিতে হইবে। গৃহে কোন উপকরণাদি নাই, আপনি গেলে একটি আসন দিব, তাহারও উপায় নাই, চৌকি, তক্তপোষ, ষাট,বিছানা এ সমস্তই আবশ্যিক। ভদ্রির আপনার স্ত্রীর জামাতা পাইলে বাতা ঠাকুরাণী রূপার বাসন বা করিয়া কিরূপে ষাওয়াইবেন, আর মল্লিক-বংশের সহিত কুটুম্বিতা হইলে আমাদের একটু মান রাখিয়া চলিতে হইবে, ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে হইবে, লোকজন জাতি-কুটুম্ব সকলকে তুষ্ট করিতে হইবে, এ সমস্ত কথা কি আপনার স্ত্রীর বহদর্শী লোকের নিকট আমার স্ত্রীর বালকের বলা-সাজে ? তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি আর কি বলিব ? (পরে মাথা চুলকা-ইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে, পাঁচ হাজার টাকা আর কমে যে এ কার্য সম্পাদন হয়, এমন ত বোধ হয় না।

বৈজ্ঞানিক বলেন, পৃথিবীর উন্নয়ন দ্রব-পদার্থ সর্বদাই কলঙ্ক করিতেছে, যখন

অভিশর বাশের তেজ হয়, তখন আরে-গিরি দিয়া কুটিয়া বাহির হয়। টাকার কথা উত্থাপন হওয়াতেই আরিণী-বাবুর উদরস্থ রাগটা একটু কলঙ্ক করিতেছিল, কিন্তু স্থির করিয়াছিলেন, গরিবদের হাজারটা টাকা কি জোর পনের শত টাকা দিয়া কজা-রহুটি ক্রয় করিবেন। কিন্তু যখন গোকুল পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ করিল, তখন আরে-গিরি কোথায় লাগে ! উঠকবয়ে বলিলেন, “কি বললে মিজের পো ? পাঁচ হাজার টাকা ? বলি, বত বড় মুখ, তত বড় কথা ? বলি, আমি কি তোমাদের বংশ চিনি না ? তোমার ঠাকুরদাদা গ্রামের হাড় জালিরে গিয়েছে, তোমার বাপ হাড় জালিরে গিয়েছে, আবার ভূমি হাড় জালাতে এসেছে ? পাঁচ হাজার টাকা জলে ভেসে আসে, না পাঁচ হাজার টাকা কখন মিজ-বংশে দেখেছে ? বলি, এক রত্তি ছেলে, সে দিন হাতে ক’রে মাল্লব করেছে, আমাদের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে ভয় হয় না ? এমন বিশ্বাসীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে নরকভোগ কবতে হয় ! এমন কুলাদাদের মুখ দেখলেও পাগ হয়।” ইত্যাদি, ইত্যাদি। গোকুল কিছুমাত্র অপ্র-তিভ বা ক্রুদ্ধ না হইয়া নাজীর মহাশয়ের মেজাজ একটু গরম হইয়াছে দেখিয়া, একটি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, নাজীর মহাশয়ের গরম হওয়া যুগা, বুড়ো বয়সে বালিকা-বিবাহ লালস মনে উদয় হইলে সে রোগ আর ছাড়ে না। আবার তাহার উপর সেই বালিকাটিকেও মধ্যে মধ্যে পুকুরঘারে দেখিতে পাইতেন, উঃ, কি চোক ! কি ফুক ! কি ঠোঁট ! বিধাতা কি তুলী দিয়া লিখিয়াছেন ? টকটকে রং কি আলতা দিয়া আঁকিয়াছেন ? কি ললিত বাহুলতা !

কি হুই-হুই পরীর ভাব পরীর। একটি বীথনিবাণ ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃদ্ধ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, মনে মনে হির করিলেন, “টাকা আমার শরীরের রক্ত, কিন্তু শরীরের রক্তপাত করেও এ রক্তটি লাভ কব্ব। বংশটা বড় হারামজাদা, কিন্তু মেয়েটাকে একবার ঘরে আনুতে পাবুলে হয়, টাকা তব্ব আদার কব্ব, মিঞাদের ঘর-ভিটে যদি বিক্রয় করে না লই, তবে আমার নাম তারিগী মল্লিক নয়।”

আর কয়েক দিন ঘটকী হাঁটাইটি করিল, হুই হাজার টাকা,—আড়াই হাজার টাকা—ডিন হাজার টাকা, উ’হ! গোহুল প্রকাশে বলিল,—“আমরা নিতান্ত গরিব, তারিগীবাবু অল্পগ্রহ না করিলে কে করিবে?” মনে মনে বলিল, “বুড়ো বরসে ধেড়ে রোগ ধরিতাছে, টাকা দেবে না? নাহে দড়ী দিয়া টাকা আদার করিব।”

অবশেষে নাজীর বাবু ঘটকীকে চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত শীকার করিয়া বলিলেন, “ইহাতে যদি না হয়, তবে ঐ সনাতনবাঈ গ্রামে বসুদের বাড়ীতে যে মেয়েটি আছে, দেখতে শুভে ভাল, বরসও শুভেছি দশ বারো বৎসর হইরাছে, তাহাদের বাড়ী বাইও, এই মাসেই ক্রিয়া সমাপন হইবে, ঠিক করিয়া আসিও।”

গোহুল দেখিল, নাজীর মহাশয়ের মানরকার অস্ত্রও তাহার কথাটা কতক রাখা চাই। অতএব সেই চারি হাজার টাকাতাই সম্মত হইল, আর ভিকা বলিয়া দেখুশত টাকা, আর ঢেলীর কাগড় বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর খাওয়ান দাওয়ান বলিয়া একশত টাকা, আর তব্ব বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর সভাধরচ পঞ্চাশ টাকা, আর বিবাহের অস্ত্রাভরণ বলিয়া একশত টাকা আদার

করিয়া হইল। কলা বাহন্য বে, এই জিন্স ইত্যাদি পরচেই বৃহৎ হুণকার করা, পুতুর সংকার করা ও বিবাহের সমস্ত ব্যয়ের আয়োজন হইল, চারি হাজার টাকার গ্লোহুল-বাবুর কোম্পানীর কাগজ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের আয়োজন ।

তালপুকুরে হলহুল পড়িয়া গেল। ধন-শালী বিবরী বিজ মহাশয় নাজীর মহাশয়ের আবার দারপরিগ্রহ করিবেন, গ্রামের মধ্যে সুন্দরী মেয়ে বাছিয়া তাহাকে কদমেশ্বরী করিবেন, মিজবংশ সম্মানিত করিবেন, মল্লিকবংশ উজ্জল করিবেন, বিবাহে বড় ঘট হইবে, দেশের সমস্ত উজ্জলোক সমবেত হইবে, মুলুকের কাশালী ভিহারী বিদায় পাইবে,—এইরূপ কথা ঘরে, ঘারে, পথে, ঘাটে প্রতিশ্রুতি হইতে লাগিল। কৃষকেরা মল্লিক বাড়ীর নিকট দিশা বাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া ছুটা খোসগল তুলিয়া বাইত, রমণীগণ মিজ-বাড়ীর নিকট কলস নামাইয়া একবার মেয়েকে দেখিয়া বাইত।

তারিগী-বাবুর বৈঠকখানা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন-সময় পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকারণ্য; কত বন্ধু, কত পরামর্শ-দাতা, কত সমাজপতি ও দলপতি, কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিত, তাহার ঠিক নাই। দিব্যাত্মি সাধুবাঘ, ভতিবাঘ ও নাজীর মহাশয়ের বিজ্ঞতার প্রশংসা চলিত। দলপতি ও সমাজপতি বলিতেন, “এ ত তারিগী-বাবুরই উপযুক্ত কাজ। এরূপ যোগ্য লোক কি

আজকাল দেখিতে পাওরা বার? লক্ষ্মী-সরবতী ধারে বাঁধা। বিজ্ঞা-বুদ্ধি-বলে সাহেব-মহলে তারিণী-বাবুর কত মান, কত রাজ্য। রাইবাহাদুর হার মানিয়া যায়। আর বিবরের ত কথাই নাই, ভালপুকুরের মধ্যে দীন-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র যে যখন বিপদে আপদে পড়ে, তারিণী-বাবু ভিন্ন আর সহায় কে? তারিণী-বাবু দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের সমাজ বজায় রাখুন, আশু পুত্রমুখ দেখিয়া পরম সুখ ভোগ করুন" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণপাণ্ডুগণ তারদ্বারে কহিলেন, "তারিণী-বাবুর সদাই ধর্মে মতি, তিনি ধর্মনিষ্ঠ লোক, তাঁহার ত এ যোগ্য কাজই বটে। সংকল দেখিয়া, ভদ্রবংশ দেখিয়া স্নানকণা কত্মা স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রসম্মত কাজ করিয়া হিন্দু আচার বজায় রাখিয়াছেন। আজকাল যেরূপ সময়, নাস্তিকগুলো কি কি করে, তাহার ঠিক আছে? কেহ বয়স্ক কত্মা খোঁজে, কেহ বিধবা বিয়ে করিতে চায়, কেহ বা আবার জাতি ছেড়ে অন্য জাতিতে বিয়ে করে। হি! হি! সমাজ, তারিণী-বাবুকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর। পুত্রসন্তান-কামনায় সম্মেলনা, স্নানকণা, নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়া তারিণী-বাবু আজ স্বজাতির নাম উজ্জ্বল করিলেন, সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন।"

তারিণী-বাবুর বহুগণ বলিলেন, "তা নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিবেন না কেন? তারিণী-বাবুর বয়সই বা কি? এখনও চল্লিশ পার হয় নাই, এই ত বিবাহের উপযুক্ত কাল। আহা, মুখখানি যেন কাঠিকের মত, শরীরখানি যেন গণেশের মত, কত কাল তপস্বী করিয়া কত্মা এরূপ বরলাভ করে," ইত্যাদি।

এই সকল কথা শুনিয়া তারিণী-বাবুর

মুখে আর হাসি ধরিত না, লুকাইয়া দর্পণে ঘন ঘন আপনার মুখখানি দেখিতেন, চুলে ঘর ঘন কলপ দিতেন, কাহার সাধা একগাছি পাঁকা চুল বাহির করে? নাপিতের মাখি-রান্না দ্বিগুণ করিয়া প্রত্যাহ ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন, দাড়ী-গোপ এখনও উঠে নাই বলিলেও চলে।

স্বর্ণকার দিনে ছুই তিনবার করিয়া তারিণী-বাবুর বাড়ী ইটাইটি করিতেছে, পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের গহনা করিবার করমারেশ হইয়াছে, সেই নূতন গহনাতে প্রেমিক তারিণী-বাবু নব-বধুর অঙ্ক ভূষিত করিয়া দিবেন। কথাটা এক একবার মনে হইতেছে আর বৃদ্ধের বৃকটা নাচিয়া উঠিতেছে। বালিকার হৃদয় লগাটে সিঁতি পরাইয়া দিবেন, ললিত বাহুলতা হাতে ধরিয়া আদর করিয়া তাবিজ-বাঙ্গুর পরাইয়া দিবেন, কুসুমকলিবিবিন্দিত বক্ষের উপর সখের হার বুলাইয়া দিবেন, কটিতে রসের চন্দ্রহার দোলাইবেন! ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের শরীরটি রোমাঞ্চিত হইল,—বুড়ো বুঝি পাগল হয়!

তারিণী-বাবুর বাড়ী আজ লোকারণা এবং জাতিকুটুম্বে পরিপূর্ণ। দাসদাসী গোলাপী কাপড় পরিয়া ছুটাইটি করিতেছে, পুকুর হইতে বড় বড় মাছ, হাট হইতে চাকারী করিয়া শাক-সবজী, বর্দ্ধমান হইতে ঝাড়া, সীতাভোগ ও মিহিাদানা, কলিকাতা হইতে সন্দেশ ও রসগোল্লা সংগৃহীত হইয়া বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। বাড়ীতে যেন দিবা-রাত্রি উৎসব হইতেছে, বাহিরে দিবা-রাত্রি বাস্ত ও লোকের কোলাহল, সমস্ত গ্রামে হলহল পড়িয়া গিয়াছে।

দয়িত্র বিন্দু ও সুধা-গলা ধরাধরি করিয়া কামিল, একদিন সন্ধ্যার সময় লুকাইয়া

কোঠাইয়ার ঘরে গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিল। কিন্তু আজ আনন্দের দিন,— ছুঃখিনীদের কাদা কে শুনে, কে দেখে? সজোরে ঢাক বাজাও, রোসনচোকির শব্দে গ্রাম কম্পিত কর, ভেরীরবে সমস্ত গ্রামে প্রচার কর,—আজ গ্রামের আনন্দের দিন, আজ মহামাত্র নাজীর মহাশয়ের শুভ বিবাহ!

এদিকে কত্কার বাড়ীও আজ লোকারণ্য। মিজগণ এককালে গ্রামের বড়লোক ছিলেন, তালপুকুর ও নিকটস্থ গ্রামসমূহে তাঁহাদের জাতি-কুটুম্বের অভাব ছিল না, তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন পক্ষিকুল নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়া থাকে, মিজদিগের দরিদ্র ও ছুরবস্তার সময় সেইরূপ জাতি-কুটুম্বগণ নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়াছেন, কেহ সাড়াশব্দ করেন নাই, একবার তত্ত্বতল্লাস করেন নাই। আবার সূর্যের উদয়ে বেরূপ পক্ষিকুল মহা আনন্দে শব্দ করিয়া পুনরায় আকাশ আচ্ছন্ন করে, আজি মিজদিগের সৌভাগ্যবির উদয়ে দশ গ্রাম হইতে জাতি-কুটুম্ব আসিয়া গোপীর মার পুরাতন গৃহ আচ্ছন্ন করিল।

চারুর মা সম্পর্কে গোপবালার মাসী হয়। বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে, স্থল শরীর-খামি গহনা-ভরা, মুখে সদাই হাসি। এত দিন পরে বৌন্সিকে মনে পড়িল, পাকী করিয়া মিজদের বাড়ী আসিলেন। হেসে হেসে গরবিনী বলিলেন, “তা বোন, আমার চারুও যে, গোপীও সে—আহা! এত দিন বাছা গোপীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করি আসি আসি, তা আমাদের যে সঙ্গো, সহজে কি আসা হয়? বেঁচে থাকুক, শওরবাড়ীর গৃহলক্ষী হয়ে থাকুক, সোনার টাঁদের মত ছেলের মুখ দর্শন করুক। মল্লিকদের বাড়ী সর্বদাই বাতায়ত আছে, বাছা গোপীকে

সর্বদাই দেখে যাব। আমরা আসব না ত কে আসবে? কথায় বলে, মাও যে, মাসীও সে, মা-মাসী বাছাকে দেখবে না ত দেখবে কে?” ইত্যাদি।

হরির মা সম্পর্কে গোপীর শিসী হয়। সামান্য গৃহস্থঘরে বিবাহ হইয়াছে, শরীর ঈর্ষ, স্বভাবটি রুক্ষ। ভ্রাতার মরণের পর মিজ-বাড়ীতে পা দেন নাই, তবে গোপীর মা অল্প কষ্টে লালায়িত হইয়া অনেক অশুন-বিনয় করায় একবার পাঁচ টাকা ধার দিরাছিলেন, তাহাও ঘটা-বাটি বিক্রয় করাইয়া, সুদশত আদায় করিয়া লইয়াছেন। আজ পিসামার শরীর স্নেহে গলিয়া পড়িতেছে। গোপীর চুল বেঁধে দিতেছেন, গহনা পরাইয়া দিতেছেন, কত সেবা-শুশ্রূষা। বলিলেন, “তা আমরা কবুব না ত কবুবে কে গা বোন? থাকতেন আজ দাণা বেঁচে, আহা, এ আনন্দের দিনে কতই আনন্দ কবুতেন! আহা, দাদা যখন যে কাজটি কবুতেন, আমাকে না জিজ্ঞাসা ক’রে ত কবুতেন না, আমাকে না ডাকাইয়া কি বাড়ীতে জিয়াকর্ষ হবার বো ছিল? তা দাদা যেমন পুণ্যাত্মা ছিলেন, বাছা গোপীও সেই রকম গো। আহা, মেয়ের মুখে কথাটি নাই। তা এমন মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাক বাছা, গা ভ’রে গহনা পরবি, পাকী চড়বি, বারাণসী শাড়া প’রে বোগ্গিবাড়ী যাবি,—এর বাড়ী কি সুখ আছে? বাছা, তোদের সুখ দেখে মবুতে পাল্লই বাঁচি।” ইত্যাদি।

ভ্রাতার মা সম্পর্কে গোপীর খুড়ী হন। তাঁহার স্বামীর সহিত গোপীর বাপ বিবাহ লইয়া অনেক বিবাদ করিয়াছেন,—গোপীর বাপের মৃত্যুর পর ভ্রাতার মা বিধবা জার উপর সে কলহের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মোকদ্দমা করিয়া দরিদ্র জার

জমী-জমী বিক্রয় করিয়া তাঁহার ঘর-বাটি
বিক্রয় করিয়া গইলেন, সন্দেশ হাতে করিয়া
ছেলেদের পাঠাইয়া দিভেন, বলিয়া দিভেন,
“গোপীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবি।” গোপীর
মা গরিব ও ভালমাহু, সমস্ত সহ করিত ও
কামিত। তাঁকার কি মধ্যমী ক্রমতা! গোপীর
মার সৌভাগ্য-উদয়ে ভ্রামের বা সমস্ত বৈরি-
ভাব ভুলিলেন, প্রিয় জার প্রতি তাঁর কত
মায়, কক মমতা, কত বহু। বলিলেন, “আহা
বোন! পুরাতন কথা কি ভূলা যায়? সেই
তোমার আমার একই বৎসরে বিয়ে হয়,
আহা, আমার বোন বোনের মত ছিলেন গো।
এক মন, এক প্রাণ, কেবল শরীর ভিন্নবে ত
নয়। তোমার গোহুল যখন পেটে, তখন
বাছা ভ্রামলাল হয়, তা আমার ভ্রামলাল যে,
গোহুলও সেই। তা গোহুল বেঁচে থাকুক,
শুণবান বুদ্ধিমানু ছেলে হয়েছে, দু পরমা
রোজগার করছে, মিথ্রকুলের নাম রাখবে।
আর বাছা গোপীর বড় ঘরে বিয়ে হতেছে,
বড় মাহুঘের বৌ হবে, গা-ভরা গহনা
পর্বে, সুখে থাকবে! আহা, ওদের সুখ
দেখলে আমাদের চক্ষু জুড়ায়,”—ইত্যাদি।

এইরূপ আত্মীয়দিগের যত, শুক্রবা, আশী-
রুদ ও মঙ্গলকামনার গোপীর মা বড়ই
আপ্যারিত হইলেন। তাহাদের বাড়ী হইতে
বড় বড় তত্ত্ব আসিয়া মিথ্র-বাড়ী ভরিয়া গেল।
এ কয়েক বৎসর ইহার চতুর্থাংশ অল্পগ্রহ
পাইলে গোপীর মা অরবতের অস্ত্র বিন্দু ও
সুখার ঘারে গিয়া দাঁড়াইত না। গোপবালা
মার চেয়ে সেরানা মেয়ে, বাপের বুদ্ধি পাই-
রাছে। বুদ্ধাদিগের কাছে মেয়ের মুখে কথাটি
নাই, তাহাদের যমতা ও মেহধাক্যে মেয়ের
চক্ষু ছিল ছিল করিতেছে। চক্ষু মুছিয়া পুতুর-
ঘারে সমবরকাদিগের কাছে আসিয়া একবার
প্রাণবলিয়া হাসিল।

সমবরকারা বলিল, “কি লো, বড় ঘরে
বিয়ে হবে ব’লে বড় আত্মাধ বে,—সুখে
হাসি ধরে না বে।”

গোপী। না লো, তার অস্ত্র হাসি নয়।
বরভাগ্য। তবে কি অস্ত্র, মনের কথাটা
খুলে বল না।

গোপী। এই আমার মাসীমা, পিসীমা,
খুড়ীমাদের বহু দেখে হাসিছিলেম।

বরভাগ্য। ইস! হেসে বে গড়িয়ে
গেলি। মেয়ের রকম দেখ না। তা মাসীমা
বিয়ের সময় এসেছেন, তোদের ভালবাসেন
ব’লে বহু কছেন, তাতে আবার হাসি
কিসের লা?

গোপী বলিল, “না, না, তা নয়, তবে
মাসীমা পিসীমার বহু দেখে একটা রূপকথা
মনে পড়ল, তাই হাসিছিলেম। রূপকথাটি
বলি শুন।

দুই ভাই ছিল, বড় ভাইটি বড়লোক
আর ছোট ভাইটি গরিব। তা বড় ভায়ের স্বী-
বড়মাহুবা চাল, সে গরিব ছোট ভাইটিকে
একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না, দেখা
হ’লে কথাও কর না। গরিবরা দুঃখে থাকে,
কাদাকাটি করে, কিছু দিন পরে সে গ্রাম
থেকে উঠে গেল।

বিশেষ চাকরী-বাকরী ক’রে গরিবদের
শেবে অনেক টাকা হ’ল। তখন তারা গ্রামে
কিরে এসে পাকা বাড়ী করলে, নূতন পুতুর
কাটালে, জমিদারী কিনলে আর অনেক
চাকর-বাকর রেখে বড়মাহুবা চালে চলতে
লাগল।

বড়জা তখন ছোটজাকে অনেক আদর
ক’রে নিমন্ত্রণ ক’রে পাকা পাঠালে।
ছোট জা-থেকে এসে দেখে—রূপার
খালে ভাত বাড়, রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন
সাজান, রূপার রেকাবিতে সন্দেশ-মণ্ডা।

ছোট জা আসনে বসল । ভাতগুলি চার ভাগ করলে, ব্যঞ্জনগুলি চার ভাগ করলে, সন্দেশ-মণ্ডাগুলি চার ভাগ করলে । এই রকমে ভাগ করে আসন থেকে উঠে হাত ধুলে ।

বড় জা বললে, ‘এ কি বোন্, খেলে কৈ ?’
ছোট জা বললে, ‘বাদের জন্ত খাবার করেছি দিদি, তাদের জন্ত ভাগ করে দিলেম । এ ত আমার জন্ত খাবার করনি দিদি ।’

বড় জা বললে, ‘তোমার জন্ত নয় ত কার জন্ত বোন্ ?’ ছোট জা বললে, ‘এই এক ভাগ আমাদের পাকা বাড়ীর জন্ত, এই এক ভাগ আমাদের পুতুরের জন্ত, এই এক ভাগ আমাদের জমিদারীর জন্ত আর এই এক ভাগ আমাদের লোকজনের জন্ত । এই সব দে’খে রান্না-বারা করেছি দিদি, খাওয়া-দাওয়া এদের সমর্পণ কর । আমাকে যদি খাওয়াতে ইচ্ছা থাকত, তা হ’লে যখন গরিব অবস্থার স্নেহের জন্ত লালারিত ছিলাম, তখন একদিন ডেকে খাওয়াতে’ ।’

সন্ধ্যার সময় শাঁক বাজিয়া উঠিল । ঘরে ঘারে প্রদীপ বাতি জ্বলিল, বাহির-দরজার বাজ আরম্ভ হইল, বৃদ্ধাগণের ডাকাডাকি, তরুণীগণের খোসগল্প ও হাস্যধ্বনি, দাসীদিগের ছুটোছুটিতে বাড়ী পুরিয়া গেল । বাহির বাড়ীতে কত্ৰাকর্ত্তা গোব্বল-বাবু কোমরে চামর বাধিয়া ডাবা হাঁকা হাতে লইয়া, সভা প্রস্তুত করিতেছেন, বাতি জ্বলাইতেছেন, হাঁক-ডাক দিতেছেন, আশ্বালন করিতেছেন । ভিত্তর-বাড়ীতে সমস্ত প্রস্তুত, কত্ৰাকে সাজা-ইবার জন্ত ভাঁক হইল । মেয়ে সাজিতে বসিল । মুখখানি নক্স ও শান্ত, হৃদয়খানি আনন্দে নৃত্য করিতেছে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—০—

শুভ বিবাহ ।

জুবায়িত্ত বিশাল হিমালয় পর্বতের ভ্রায় টোপন-মণ্ডিত তারিণী-বাবুর বিশাল শরীর সভ্যত্বল অম্বকাইয়া রহিয়াছে । পাখুরে-কাল হুল শরীরের উপর রক্তবর্ণ চেলির কাগড় শোভা পাইতেছে । পকাশ বৎসরের গৌণ-কামান বরের মাথার বিরাট টোপন শোভা পাইতেছে । কোথায় গেলেন কবি কালিদাস, তিনি সে মনোহর-রূপ বর্ণনা করুন,—আমরা অক্ষম ।

বাড়ী লোকারণ্য, চারিদিকের গ্রামসবু-হের কারত্বকুলের কেহ নিয়রণে বাদ পড়ে নাই । বাড়ীর ভিতর একেবারে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কল্ কল্ শব্দ, তাহাদের হাস্যধ্বনি ও তাহাদের কথারহস্যে বাড়ী আনন্দপূর্ণ । কোন নবীনা উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া সবীকে ডাকিতেছে, “ওলো দেখ’বি আর লো দেখ’বি আর । ও মা, এ কি বিয়ের বয়, না মুশকো মিন্বে লো ?”

ষিভীয়া । দূর পোড়াকপালী, বিয়ের রাজি বরকে অমন কথা বলে ? কেন লো, বরের রূপ মন্দই বা কি ? রংটা একটু কাল বই ত নয়, মুখের ছিঁরি আছে ।

প্রথম । হাঁ, ছিঁরি আছে বৈ কি,—কেবল গাল দুটি বেন পাকা বেগুন তুলে রয়েছে ।

ষিভীয়া । দূর পোড়ারমুখী ! তখনো চড়ান গাল বুঝি ভাল ?

প্রথম । আর তেঁ’টি দুটি বেন বোল্‌তার কান্ধে দিচ্ছে ।

ষিভীয়া । দেখিসু,—দেখিসু, ঐ তেঁ’টি

পেরে গোপী বড়ে যাবে। স্বত্তরবাড়ী একবার গেলে হয়, এমন গোলগাল স্বামী পেরে আর এ-মুখে হবে না।

প্রথমা। আর বুকে কি চুল দিদি, ঠিক যেন আমাদের বাড়ীর আঁতাকুড়ের জল।

দ্বিতীয়া। দূর হতভাগী! অমন কথা বলতে নেই।

প্রথমা। ও বাবা! পেটটা কি ফুলো গা! মিন্বের পেট ফুলেছে না কি?

দ্বিতীয়া। বা বা, তোর আর বরের নিয়ে কবুতে হবে না। গোপী শুনে রাগ কবুবে। দেখিস, ঐ নাদোন্স নোদোন্স শরীর পেরে আমাদের গোপীর মন ভুলে যাবে।

প্রথমা। না, সত্যি দিদি, বরের পা ছুখানা দেখ, ও মা, পায়ে গোদ হয়েছে না কি? গোপী পা নিয়ে কোন্ লজ্জায় মিন্বে বিয়ে করতে এল? কোন্ এক জোড়া মোজা পরে ঢেকে এল দিদি?

দ্বিতীয়া। দেখিস, দেখিস, ঐ পা গোপী কত যত্নে পূজা কবুবে।

প্রথমা। ইস! তা আর হ'তে হবে না। গোপী আপনায় খুদে খুদে আলতা-মাখা পা ছুখানি যদি মিন্বের টোপরের উপর না রাখে, তবে আমি আর কি বলেছি। আমি গোপীকে জানি, সে চাপা মেয়ে, মুখে ভাল-মাস্থ, মনখানি কুরের মত খারাপ।

বর গাজোখান করিলেন, যেন হিমালয়-পর্বত শিকড় ছিঁড়িয়া উঠিলেন। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রী-আচার, রসিকাগণ সে আচার বর্ণনা করুন, আমরা তাহার কি জানি? বাড়ীর উঠানে একেবারে মেয়ে পিলু পিলু করিতেছে, তারিণীবাবুর বিশাল শরীরের চারিদিকে ঘুরিতেছে কিরিতেছে, নিলুজ্জ হইয়া থল থল করিয়া হাসিতেছে, যেন

একটি বিশাল তমালবৃক্ষের চতুর্দিকে বরনা পানীগুলি উড়িতেছে! কোন বেরেটি ডিঙ্গি মারিয়া তারিণী-বাবুর থলথলে কানটি একবার মলিয়া দিল। কেহ কেহ বা সেই প্রকাণ্ড উদরের উপর দৈবের হাতের ছাপ লাগাইয়া গেল এবং কোন রসিকা সেই বিশাল পৃষ্ঠদেশে আল্পানার দাগ দিয়া যেন দূরবিলম্বী মেঘরাশির উপর বিদ্যুতের শোভা করিয়া দিল।

কুজ গোপীকে পিড়ায় বসাইয়া বরের চারিদিকে সাতবার পাক দেওয়া হইল, তারিণী-বাবুর মনটি নৃত্য করিতেছে, নজরটি সেই পিড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে! যখন “বর বড় না ক'নে বড়” গ্লান হইল, তখন গোপীর পরমবজ্রগণও স্বীকার করিল, বর বড় বটে। যখন বরণডালা লইয়া পতি-পুত্রবতী কোন গৃহিণী নাজীর মহাশয়কে “ভ্যা” করিবার অহরোধ করিলেন, তখন রসিকাগণ কানাকানি করিতে লাগিল,— “ভ্যা করিবেন দিন কত পর—গোপী তেমন মেয়ে নয়।”

তাহার পর বর-কন্ডা একজু বসিলেন, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইলেন। তারিণী-বাবু স্বৈরপূর্ণ হুলহুলে কন্ডার সেই সুচিকণ হৃদয় পুষ্পবিন্দিত হস্ত গ্রহণ করিয়া গোমাক্ত হইলেন—অবগুণ্ঠনশূন্য বধুর মধুমাখা মুখ, মুক্তাবিভূষিত ললাট এবং অলঙ্কার-রঞ্জিত ওষ্ঠ দেখিয়া বুড়ো বুঝি, বিবাহ-সভায় মুচ্ছা যায়।

তাহার পর বাসরঘর! বাসরঘরে আজ বড় ভাষাসা—তারিণী-বাবুর মত নাদোন্স নোদোন্স, গোল-গাল, বরজ রসিক বর ভাল-পুরুষের সুললিত সর্বদা পান না, আজ বুঝি, বরকে আশুই খেয়ে কেলেন! বর ঘরে আসিবারাজ একজন ভাষা, হুলাদিনী, মধা

বরষা রসিকা তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন, “এস এস গোপীবরষা এস, তোমার বিরহে গোপবালা বে একেবারে শুকিয়ে পিরাচ্ছে।” রসিক তারিণী-বাবু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন নয়, বেন ষোলশত গোপিনী সেই নিকুঞ্জে বসিয়াছেন।

বাসুরঘরের রং-তাঁয়াসা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? বাসুরঘরের কথা আমরা কি জানি? কোথা গেলে রসিকা পদাঙ্গণ,—তোমরা সে গুঢ় আচার জান, তোমরা সে রসের কথা জান,—তোমরা যাঁহা করিবার কর। গোবর্দ্ধন পুরুষের স্নায় তারিণী-বাবুর কোলে মরনা পাখীটির স্নায় কন্ঠাটিকে বসাত, আমরা বিদায় হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

দম্পতি-প্রণয় ।

মুখের স্বপ্নের মত তারিণী-বাবুর ছুটি ফুরাইল, তিনি পুনরায় বর্ধমানের কার্যে যোগ দিলেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া নব-বধূটিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আবার অনিচ্ছক বলদের মত ফিরিয়া বর্ধমানের বাইরা আপিসের ঘনিগাছে বাঁধা হইয়া ঘুরিতেন।

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তারিণী-বাবুর আর কাজ করা পোষার নহ। বয়সে শরীর দুর্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়, কাজে সুরুদাই তুল হইত। সাহেবেয়া অভিশর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “নাভীর বাবুর পকাশ বৎসর বয়স হইয়াছে, পেন্সন

লউক।” অস্তান্ত আয়লাগণ কানাকান করিত, নাভীর মহাশয়ের মন নতুন বোয়ের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কাজ করিবেন কিরূপে?

চাকরীর মাসা শীঘ্র ছাড়া যায় না— অনেক গল্পনা সঙ্ঘ করিয়াও আরও এক বৎসর কাজ করিলেন, শেষে অগত্যা পেন্সন লইয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন। তখন গোপবালার চতুর্দশ বৎসর বয়স, বোবনের কান্তিতে শরীর কাটিয়া পড়িতেছে, রূপে ধর আলো করিয়াছে, গা ভারয়া গহনা পরিয়া রূপাভিমিনী গৃহিণী গৃহ জমকাইয়া বসিয়াছে। বার্ককে রূপ-তৃষ্ণার্ত তারিণী-বাবু মনে করিলেন, “চাকরীর মুখে আশুন, এবার নববধূকে লইয়া জীবন সার্থক করিব।” নব-বধূ মনে করিলেন, “এবার বুড়ো মিন্বেকে ঘরে পাইলাম, নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইব, কর্তাটি আর যাবেন কোথায়?”

উমার মা রোগাক্রান্তা, সংসার দেখিতে পারেন না, দু-বেলা ছুপেট খান, আর প্রায়ই আপনার ঘরে শুইয়া থাকেন। বিন্দু সুরুদাই জোঠাইমাকে দেখিতে যাইত, কিন্তু নববধূ তাহাতে মুখ ভার করিতেন। লোকের কাছে বলিতেন, “ওদের জাত গিরেছে, ওদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়, উহার ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে আমাদের নিন্দা হয়।” যে নম্রমুখী দরিদ্র-বালিকা নয়াবস্ত্রায় বিন্দুর উঠানে সেদিন খেলা করিতে আসিত, আর একটি সন্দেশের জঙ্ঘা লালারিত হইত, সে এখন বড়ঘরের গৃহিণী, সম্পর্কে গুরু। তাহার এই কথা শুনিয়া বিন্দু গোপনে হাসিলেন, জোঠাইয়ার বাড়ী যাওয়া আসা কতকটা বন্ধ করিলেন।

উমার মার একটি পুরাতন দাসী ছিল, সে শুক্রবা করিত। বড় সত্যনের প্রতি-

দাসীর এ মারা দেখিয়া নববধূ সে দাসীর প্রতি বিরক্ত হইলেন, অভিমানে স্তম্ভর চক্ষে জল আনিয়া লাল ঠোঁট ফুলাইয়া কর্তার কাছে লাগাইলেন, “আমার ঘর-সংসারের কাজ চলে না, আমি খেটে খেটে হাড় কালী করছি আর দিদি গিকে ঠেসান দিয়ে শুয়ে থাকেন, তাঁর দাসী না হ’লে চলে না। তা দিদিকে নিয়েই থাক, দিদি সংসার চালান, আমি বাপের বাড়ী চল্লেম।” বলা বাহুল্য, পুরাতন দাসী সেই দিনই বিদায় হইল। উমার মার মুখে জল দেয়, এমন একজন লোক রহিল না।

পড়ুসীর লোক সর্বদাই উমার মার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিত, ছোট-মার মেজাজ ও ভাবগতিক দেখিয়া তাহারও আসা প্রায় বন্ধ করিল। উমার মার কাপড়-চোপড় ও পূজা-আচ্ছাদ খরচের জন্য তারিণী-বাবু আলাদা কিছু টাকা মাসে মাসে দিতেন, নববধূর চক্ষে জল দেখিয়া তাহাও বন্ধ করিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও তারিণী-বাবু নব-বধূর মন পাইলেন না। স্তম্ভরী গোপবালা স্বামীর নিকট সর্বদাই বিমর্ষ, সর্বদাই অভিমানিনী। সুবতী নাগরীর অভিমান-অশ্রুর প্রভাব গোপবালা জানিতেন, বুদ্ধিমতী সুযোগ পাইয়া এখন ধধকে সেই অস্ত্র ছুড়িলেন।

বৃদ্ধ দেখিলেন, বর্দ্ধমানের সাহেবদের ঢাকরী করা অপেক্ষা তরুণী ভার্য্যার পরিচর্যা বিধম কাজ। সে কার্য্যে বৃদ্ধ হাবুড়ু খাইতে লাগিলেন, তবু ত তরুণীর মন উঠে না, মান ভাঙে না। নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার, নানা প্রকার উপাধের বস্ত্র দিয়া সে রাঙ্গা চরণের সেবা করিতেন, তবু ত সে রাঙ্গা চরণের প্রসাদ পান না। তালুক হইতে

তোড়া তোড়া টাকা আনিয়া দেন, তরুণী টাকাগুলি বাস্তে বন্ধ করিয়া মৃগ কিরাইয়া বসেন। জিজ্ঞাসা করিল তরুণী কথা কহেন না অথবা ঘোর অভিমানে ব্যস্ত করিয়া বলেন, “তবু যে জিগ-গেস করুলে, এই আমার ভাগ্যি। আমার প্রতি ত তোমার মারা নেই, মারা দিদির প্রতি! আমি গরিবের মেয়ে, আমাকে তামিল্য করবে না ত কি?” (ক্রন্দন)

বুড়ো চন্দ্রের জল মুছাইয়া বলিতেন, “সে কি, সে কি, তোমাকে মাথার ক’রে রাখব,—তুমি কি আমার অঘরের ঘন? কি করলে তুই হবে বল, আমি এখনই করছি।”

বিনাইয়া বিনাইয়া নবীনা বলিলেন, “তা আমি মেরেমাছুব, কি করলে ভাল হয়, আমি কি রকমে জীবব? ঐ চাটুযোদের বাড়ীর কর্তাটি বুড়ো বয়সে আবার একটা বিয়ে করেই কিছুদিন পরে তাঁর কাল হ’ল, ছোট মেয়েটাকে সতীনের হাতে ফেলে গেলেন। বড় সতীন, তাকে উঠতে বসতে গাল দেয়, দিবারাত্রি মজুরের মত খাটায়, ছুবেলা খেতে দেয় না। ছোট বোটি ঘেন মড়ার মত হয়ে গিয়েছে—পথের কাকালীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে; তা আমারও সেই দশা হবে। কেনই বা হবে না? কাকালীর ঘরে জন্ম, আমি পথে ভিক্ষা করব না ত কে করিবে?” (ক্রন্দন)।

তারিণী বাবু। সে কি? উমার মার মাধ্য কি তোমাকে বিছা বলে?

গৃহিণী। হাঁ, উমার মার ত আমার প্রতি বড় মারা! এখনই হুচকে দেখতে পারে না,—এর পরে আমাকে কি আর আত রাখবে? (ক্রন্দন)

এইৰূপ প্ৰায়ই যথেষ্ট যথেষ্ট কাদাকাটি হইত, দিবায়াত্ৰি অভিমান হইত, তাৰিণী-বাবু আৰু তিষ্ঠিতে পাৰিলেন না। গৃহিণীৰ কথা-বাৰ্ত্তাৰ বুঝিলেন যে, গৃহিণী ভবিষ্যতৰ ভক্ত কিছু সংগ্ৰহ কৰিতে চাহে। এতটুকু মেয়েৰ পেটে এত বুদ্ধি কেমন কৰিয়া হইল, বুঝিতে পাৰিলেন না। তাৰিণী-বাবু জানিতেন না যে, গৃহিণীৰ পৰামৰ্শদাতা পৰম বুদ্ধিমান্ গোঁকুলচন্দ্ৰ ঘন ঘন বৰ্দ্ধমান হইতে আসা-বাওৱা কৰিত এবং গোপনে ভগিনীৰ সহিত পৰামৰ্শ কৰিত।

তৰুণী ভাৰ্য্যাৰ তীব্ৰ অভিমান ও অশ্ল-জল দেখিয়া হৃদয়ে ধৈৰ্য্য ধৰিতে পাৰে, একৰূপ বীৰ-পুৰুষ সংসাৰে অগ্ন। তাৰিণী-বাবুৰ মন ক্ৰমে টলিতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমাৰ ভাল-মন্দ হইলে কিছু বিষয় ছোট গৃহিণীৰ হাতে থাকে, একৰূপ একটা বন্দোবস্ত কৰিয়া যাওৱা ভাল। উহাকে বিষয় দিব না ত কাহাকে দিব? সেই মাতাল ভামাইটা শেষকালে সমস্ত বিষয়টা কাড়িয়া লইবে? না, না, সে কথা নহে, আমাৰ প্ৰাণেৰ গোপবালাকে কিছু দিয়া যাইব। আৰ যদি ছোট গৃহিণী দ্বাৰা আমাৰ পুত্ৰ-সন্তান হয়, তাহা হইলে ত সেই পাইবে, মাকে দেওৱাও যা, ছেলেকে দেওৱাও তাই।”

অনেক বিবেচনা কৰিয়া বুদ্ধ বৰ্দ্ধমান গেলেন। তথাৰ উকীল-মোক্তাৱগণেৰ সহিত পৰামৰ্শ কৰিয়া, রেজিষ্টৰী-আপিসে হাটাইটি কৰিয়া শেষে একখানি দলীল লইয়া বাড়ী আসিলেন এবং বাড়ীতে পৌছিয়াই নব-বধূৰ ৰাঙ্গা চৰণে পূজা দিতে আসিলেন। হাতগদগদকৰে তৰুণী ভাৰ্য্যাকে সন্তাবণ কৰিয়া দলীলখানা তাঁহাৰ হস্তে দিলেন, মনে কৰিলেন, “এবাৰ উড়া পাখী পিৰুৱে

পুৱিলাম,—এ কুক-ময় এড়াইবাৰ নহে, দেখিব, মন গলে কি না গলে।”

অভিমানিনী বধু স্বামীৰ দিকে একবাৰ কিৰিয়াও চাহিল না।

তাৰিণী-বাবু। বলি, চূপ ক’ৱে ৰইলে বে? বধু। তবে কি ক’ব?।

তাৰিণী-বাবু। দলীলখানা কি জান?

বধু। কেমন ক’ৱে জান?

তাৰিণী-বাবু। এখানা উইল।

বধু। শুন্‌লেম।

তাৰিণী-বাবু। বড় মূল্যবান্ দলীল।

বধু। তোমাৰ বাক্সে ৰেখে দাও।

তাৰিণী-বাবু। আমাৰ ভাল-মন্দ হ’লে আমাৰ বিজয়পুৰ তালুকখানি তোমাৰই হইবে।

বধু। আমাৰ চাই না।

তাৰিণী-বাবু। সে কি? সে কি? এত অভিমান কিসেৰ?

বধু। অভিমান আবার কি? যে মানে ৰেখেছ, তেৰ হৱেছে।

তাৰিণী-বাবু অবাক হইয়া ৰহিলেন! বধু চকু মুহিতে লাগিলেন!

তাৰিণী-বাবু দলীলখানি জোৰ কৰিয়া বধুহস্তে দিলেন। বধু দলীলখানি খণ্ড খণ্ড কৰিয়া ছিঁড়িয়া কেঁলিয়া জোখে হনু হনু কৰিয়া চলিয়া গেলেন।

ৰাজি হইয়াছে। ছোট গৃহিণী ধান নাই, দৱজা বন্ধ কৰিয়া শুইয়াছেন। তাৰিণী-বাবুৰ মাথায় বজ্জাঘাত পড়িল। বৃদ্ধ হাৱদেখে কালীঘাটেৰ কাদালীৰ মত বসিয়া মিনতি কৰিতে লাগিলেন।

এক খণ্ডা মিনতিৰ পৰ দৱজা খুলিল।

বধু বলিলেন, “আবার হাড় জাৰাতে এসে কেন?”

তাৰিণী-বাবু সেই ৰাঙ্গা চৰণ দুইটি

আপনার কলপ দেওয়া চুলের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, “কি অপরাধ করেছি, বল ?”

বধূ। অপরাধ আবার কি ?

তারিণী-বাবু। দলীলখানা ছিঁড়লে কেন ?

বধূ। কি দলীল ?

তারিণী-বাবু। আমার প্রধান তালুকখানি তোমাকে উইল করে দিয়েছিলেন।

বধূ। আর সম্পত্তি যে জমীদারী কিনেছে, সেটি বুঝি, দিদির দেওয়া হবে ? তা দিদি তোমার নয়নের তারা, দিদি তোমার মাথার মণি,—দিদিকে সর্ব্বদা দিয়ে বাও। আমি গরিবের মেয়ে, আমি তোমার চকুর শূল হয়েছি, আমাকে ভিখারীর মত ভাড়িয়ে দাও, আমি গরিব মার কাছে চলে বাই। লোকের বাড়ী ধান ভেনে খাব, তবু তোমার অন্ন খাব না,—এ অপমান, এ লাহনা, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

(ক্রন্দন)

তারিণী-বাবু বিস্মিত হইলেন ! তিনি সম্পত্তি একটি জমীদারীর অংশ নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা গৃহিণীদের বলেন নাই। সে কথা গোপবালাকে কে বলিল ? নববধূ সেটিও চাহেন নাকি ? সর্ব্বদা নববধূকে উইল করিয়া বাইলে উমার মার দশা কি হইবে ? এইরূপ নানা চিন্তা তারিণী-বাবুর হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল।

সেয়ানা মেয়ে গোপবালা স্বামীর মনের সম্বন্ধে বুঝিতে পারিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিল, “আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পথের কাকালিনী হব, পথে ভিক্ষা করে খাব। আমাতে তোমার বিশ্বাস নাই, তখন আমি এ বাড়ীতে থাকব না, গাছভলার গুহে থাকব। বাহার উপর বিশ্বাস আছে,

সেই দিদির কাছে বাও,—আমাকে ছেড়ে দাও, আর দত্ত করে মেয়ে না।” রমণী আছাড় খাইয়া পড়িল—বুঝি বা হিষ্টিরিয়া হয়, বড়মামুষী ব্যারামটিও দরকারের সময় গোপবালার আসিত।

সে রাত্রির কথা অধিক বর্ণনায় আমরা অকম। একদিকে তারিণী-বাবুর ভীষণ বিষয়কামনা, অন্যদিকে তরুণী ভাৰ্য্যার ভয়ঙ্কর উপদ্রব,—আজি পথের ভিখারীও তারিণী-বাবুর অবস্থা দেখিলে দুঃখিত হইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ঘন ঘন অশ্রুবাণ, অতিমান-বাণ, ক্রন্দনবাণ, হিষ্টিরিয়া-বাণ, আবার মিনতি-বাণ, ভালবাসার বাণ দ্বারা বৃদ্ধের শরীর জর্জরিত করিলেন। কখন তর্জন-গর্জন, কখন সাধা-সাধনা, কখন বা মিনতি, কখন বা কত গল্প বলেন। কলিকাতার কত বড়মামুষ সমস্ত বিষয় শ্রীকে দিয়া গিয়াছেন, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী সুলভরূপে সংসার চালাইতেছেন। নারী কি বিশ্বাস-ঘাতিনী ? নারী কি স্বামীর সংসার, স্বামীর ঘর অবহেলা করিয়া জীবন-ধারণ করিতে পারে ? স্বামীর ঘর ভিন্ন নারীর কি অন্য ঘর এ জগতে আছে ?

সমস্ত রাত্রি এইরূপ যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃ-কালে প্রথম আলোকছুটি। পূর্ব্বদিকে দেখা দিল, তখন বিষয়ী তারিণী-বাবু পরাস্ত হইলেন; বলিলেন, “হৃদয়ের ধন ! তোমাকে দিব না ত কাহাকে দিব ? আমার বখাসর্ব্বস্ব তোমাকে লিখে দেব, তুমি বড় না আমার জমীদারী বড় ?”

সময়-বিজয়ী গোপবালা তখন নয়নের অশ্রু মুছিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া মাটি হইতে উঠাইয়া আপন পার্শ্বে স্থান দিলেন এবং রেহগঙ্গদ্বারে বলিলেন, “তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্ব্বদা, তুমিই আমার জীবন ! বিষয় কি তুচ্ছ,—তোমার

তাহার তঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনি
কাতার কোন শিক্তি নোকে মন
ভূত হইয়াছে? বহুনাথ-বাবুর
বালকদিগের উচ্চাভিলাষ, বহুনাথ-বাবুর
সহিত বহুতা করা বিষয়াদিগের
বহুনাথ-বাবুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন
কর্তাদিগের সুখবশ!

তাহার পক্ষেতে হাতকাটা
গরিয়া, সুবর্ণের চেন ঝুলাইয়া, হরিশঙ্কর
একটু একটু হাসিতেছেন। তিনি একজন লোক
লোক, ইংরাজী বড় জানেন না, উমা ছবৎসরে
ছরী কেনন! কোন ইংরাজীও
জ্ঞান চাকরী পাইয়াছে? তিনি পরের কথা,
কেটা বাধিয়া আপিসে বান, সে বড়াবত:
ইংরাজী কহেন, বড় বড় সাহেবের
পাত্র। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে
হরিশঙ্কর-বাবুর সাহেবের একা কেনন ক'রে
হিন্দুসমাজ-সম্বন্ধে হরিশঙ্কর
বেদ মনে করেন, হিন্দু
রীতি-নীতি বজার রূপ গিয়ে ছোটো কথা করে
কারণ মনে করেন,
হরিশঙ্কর-বাবুর উদ্দেশ্য ভরসা হ'ল না। তুমি এক-
বাবু লোকটি বিচক্ষণতার যা কর্তব্য, তা কর, তার
চলিলেই লাভ, আছেন।

অনুবর্তন করি পরদিন খাওয়ার পর
কলিল, ধর্মপুস্তকে সুধার কাছে রাখিয়া বিন্দু
ধর্মাবলম্বীকে কী করিয়া উমাকে দেখিতে
উপরে একটা সুধাও উমাদিদির সঙ্গে দেখা
রীতিনীতি ভাইবে বলিয়া উৎসাহ হইল, কিন্তু
সন্ধ্যায় সুবলিলেন, “আজ নয় বোন, আর এক-
গল্প করিয়াদি পারি, তোমাকে নিয়ে যাব।”

প্রাণশাস্ত্র শ্রবণকালে গিয়া বিন্দু দেখিলেন,
উৎস বহি একা বসিয়া একটা চুলের দড়ী বিনাই-
হরিশঙ্কর, দাস-দাসী সকলে নীচে আছে।
সভ্যতার কে দেখিয়া বিন্দু শিহরিয়া উঠিলেন।

এই কি সেই ভালপুকুরের উমা, বাহার
রোগকলের কথা বিন্দুবিরুদ্ধ প্রচার হইয়া-
ছিল? সুধার ঐ কাল হইয়া গিয়াছে,
এক কালী পড়িয়াছে, কঠোর হাড় ছুটা
হইয়া পড়িয়াছে, বাহ অভিশয় শীর্ণ,
শরীরখানি দড়ীর মত হইয়া গিয়াছে।
চারিমাশ পূর্বে বিন্দু বাহাকে প্রথম বোব-
নের লাগণে বিভূষিতা দেখিয়াছিলেন,
আজ তাহাকে জ্বিংশৎ বৎসরের রোগক্লিষ্টা
নারীর জ্ঞান বোধ হইতেছে। কঠোর হাড়ের
উপর দিয়া তারাহার লম্বমান রহিয়াছে,
বহুমূল্য বালা ছুগাছি সে শীর্ণ হস্তে চল চল
করিতেছে।

উমা পদদ্বন্দ্ব তুলিয়া স্নান চন্দ্র
সহিত পিছনে কিরিয়া দেখিলেন। বিন্দু
দেখিয়াই চুলের দড়ী রাখিয়া উঠিলেন।
স্নানবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, “আঃ, বিন্দু
দিদি, তুমি এসেছ, আমি কত দিন তোমার
কথা মনে করছি। তুমি ভাল আছ?
ছেলেরা ভাল আছে?”

সে ধীর কথাগুলি শুনিয়াই তীব্রবুদ্ধি
বিন্দু উমার হৃদয়ের অবস্থা ও তাহার চারি-
মাসের ইতিহাস অজ্ঞপ্ত করিলেন। বহু
জ্বরের উবেগ সঙ্গোপন করিয়া উহার হাত
ছুটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,
“হা বোন, আমরা সকলে ভাল আছি,
সুধার বড় জর হয়েছিল, তা সেও ভাল
হয়েছে। তুমি কেনন আছ উমা?
তোমাকে একটু কাহিল দেখছি কেন
বোন?”

উমা। ও কিছু নয় বিন্দু দিদি, আমারও
কল্কতায় এসে আমাশা হয়েছিল, তা ভাল
হয়েছে, এখন একটু কাসি আছে, বোধ হয়,
কল্কতায় জল আমাদের নয় না, আমরা
ভালপুকুরেই ভাল থাকি।

সেই নীরস ওষ্ঠে একটু কণ্ঠ হান্ত লক্ষিত হইল।

বিন্দু। তালপুকুরে আবার যেতে ইচ্ছে করে? আমরা এই পূজার পর বাই, তুমি যাবে কি?

উমা। তা সে তো আমার ইচ্ছে নয় বিন্দু দিদি, বাবু কি তাতে মত করবেন? বোধ হয় না।

বিন্দু। তবে তোমাকে এখানে দেখে শুনে কে? আমরা রইলাম অনেক দূরে, আর ছেলেরের কেলেও ত সর্বদা আসতে পারি না। তোমারও কান্না করেছে, রোগা হয়ে গেছে, তোমাকে দেখে কে?

উমা। কেন বিন্দু দিদি, রোজ ডাক্তার আসে, বাবু একজন ভাল-ডাক্তার রাখিয়ে দিয়েছেন। সে ওষুধ দিচ্ছে, আমি এখন ওষুধ খাই।

বিন্দু। তা যেম হ'ল, কিন্তু আপনার লোক না হ'লে কি দেখতে শুতে পারে? আর তোমার অসুখ হ'লে সংসারই দেখে কে? তা জ্যেষ্ঠাইমাকে কেন লেখ না; তিনি এসে দিন কতক থাকুন। আবার তুমি একটু সারুলে তিনি চ'লে যাবেন। তুমি না হয়, দিন কতক গিরে-তালপুকুরে থাকবে।

উমা। না, মাকে আর কেন আনান? আমার ব্যারামের বেশ চিকিৎসা হচ্ছে, আর সংসারে অনেক চাকর-লাসী আছে, কিছু অসুবিধা হচ্ছে না, তা মাকে কেন ডাকান?

বিন্দু। না, তবু বোধ হয়, তেমন যত্ন হয় না, মায়ে যেমন যত্ন করে। তেমন কি আর কেউ পারে? চাকর হোক মার প্রাণ। তা ধনঞ্জয়-বাবু তোমাকে যত্ন করেন ত?

অদি কণ্ঠস্বরে উমা উত্তর করিলেন, “হা, তা আমার যখন বা আবস্তক, তখনই পাই; কিছুই অভাব নেই। যত্ন করেন বৈ কি।”

ভীকরুদ্ভি বিন্দু দেখিলেন, অভিমানিনী উমা আপনার প্রকৃত বাতনার কথা কহিতে চাহে না, উমার ইহ-জগতে সুখ ও সুখের আশা ভস্মসাৎ হইরাছে। বিন্দুই বা সে কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করেন? কখনক চিন্তা করিয়া কহিলেন, “না উমা, আমার বোধ হয়, জ্যেষ্ঠাইমা এখানে এসে কয়েক দিন থাকলে ভাল হয়। দেখ, সুখ-দুঃখ ব্যারামভারাম আমাদের সকলেরই আছে, ব্যারামের সময় আপনার লোক বতটা করে, পরে কি ততটা করে? এই সুখার ব্যারাম হ'ল, বাবু ছিলেন, শরৎ ছিল, কত যত্ন, কত শুশ্রূষা করলে, তবে আরাম হ'ল। তুমিও বোন্ বড় কাহিল হয়ে গেছ, সর্বদা কাসুছ, এখন থেকে একটু যত্ন নেওয়া ভাল। তা আমার কথা রাখ বোন্, জ্যেষ্ঠাইমাকে আজই চিঠি লেখ, না হয় আমার বল। আমি লিখছি। আহা উমা, তুমি কি ছিলে বোন্, আর কি হয়ে গেছে।” এই বলিয়া বিন্দু সম্মুখে উমার কপালে হাত বুলাইয়া কপাল থেকে চুলগুলি সরাইয়া দিলেন।

এইটুকু স্নেহ উমা অনেক দিন পায়। মাই, এইটুকুতে তাহার হৃদয় উথলিল, চক্ষু হুইট ছল ছল করিল, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উমা ধীরে ধীরে বলিলেন “বিন্দু দিদি, তুমি আমাকে লেবেলা থেকে বড় ভালবাস—” আর কথা বাহির হইল না, উমা চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন।

বিন্দু অভিযর্থ স্নেহের ভাষায় বলিলেন, “উমা! তুমি কি আমাকে ভালবাস না?”

উমা। বাসি, বতদিন বাঁচব, তোমাকে ভালবাসব।

বিন্দু। তবে বোন্, আজ আমার কাছে এত গোপন চেষ্টা কেন? তোমার মনের দুঃখ কি আমি বুঝিনি? জগতে তোমার

সুখের আশা শেষ হয়েছে, তা কি আমি বুঝিনি ? বিবাহের পর বে প্রাণের ভূমি ভাসতে, আমার সঙ্গে দেখা হইলেই যে কথা আমাকে বলতে, যে প্রাণস্বপ্ন শেষ হয়েছে, তা কি আমি বুঝিনি ? উমা, তুমি এ সব কথা আমার নিকট কেন লুকাচ্ছ ? আমি কি পর ? প্রাণের উমা, তুমি আমি যদি পর হই, তবে ভগতে আপনার লোক কে আছে ?

এ স্নেহবাক্য উমা সহ্য করিতে পারিল না, নয়ন দিয়া বর্ষ বর্ষ করিয়া বারি বহিতে লাগিল, প্রাণের বিন্দু দিগির ভ্রমরে মুখখানি লুকাইয়া অভাগিনী একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল ।

অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া উমা কীর্ণস্বরে বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তোমার কাছে আমি কখনও কিছু গোপন করিনি, কখনও করুব না । কিন্তু আজ কমা কর, এ সব কথা আমি একদিন বলব ।”

বিন্দু । উমা, আমি আজই শুন্ব, মনের দুঃখ মনে রাখলে অধিক ক্লেশ হয়, আপনার লোকের কাছে বললে একটু শান্তি বোধ হয় ।

উমা । কি বলব বল ?

বিন্দু । আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ধন-গ্রন্থ-বাবু কি এখন তেমন ব্যস্ততা করেন ?

উমা । বিন্দু দিদি, আমার বখন বা দরকার হয়, সবই পাই, আবার রোগের চিকিৎসা করাতেন, যত্ন নেই কেমন করে বলব ?

বিন্দু । উমা, তুমি কি আমাকে পুরুষ-মাহুব পেয়েছ যে, ঐ কথাই ভুলচ্ছ ? ভাত-কাপড় ও ওষুধ কি আমার যত্ন ? আমি সে ব্যস্তের কথা বলিনি । ধনগ্রন্থ-বাবু কি পূর্বের মত তোমাকে স্নেহ করেন, পূর্বের মত মন খুলে তোমাকে ভালবালেন, পূর্বের মত কি তোমার ভালবাসার স্বীকৃতি হয় ?

উমা, মেয়েমাহুবের কাছে মেয়ে মাহুবের কি এ কথাগুলি খুলে জিজ্ঞাসা কর্তে হয় ? স্বামীর যে স্নেহ ধনবতী স্ত্রীর ধন, পরিজন নারীর সুখ, সকল মেয়েমাহুবের জীবন, সে স্নেহটি কি তোমার কাছে ?

হতভাগিনী উমা “না” কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িলে সেই কথার উত্তর করিয়া মাথাটি আবার বিন্দুর বুকে লুকাইলেন ।

বিন্দুর মুখ গভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “উমা, সে ধনটি হারালে ত চলবে না, সে ধনটি রাখবার জন্যে কি তুমি বিশেষ চেষ্টা করেছিলে ?”

উমা । ভগবান্ জানেন, আবার ভাল-বাসা কমেনি, তাঁকে এখনও চক্ষে দেখলে আমার শরীর জুড়ায় ।

বিন্দু । উমা, তোমার ভালবাসা আমি জানি, তুমি পতিব্রতা ও জীবনে তোমার ভালবাসা ভ্রাস হবেনা । কিন্তু দেখ বোন্, কেবল ভালবাসায় স্বামীর স্নেহ থাকে না, সংসারও চলে না । মেয়েমাহুবের আরও কিছু কর্তব্য আছে, আমাদের আর কিছু শিখতে হয় ।

উমা । বিন্দু দিদি, বিনি আমাদের খেতে পরতে দেন, বিনি আমাদের প্রাণের গুরু, তাঁকে ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি ? ভালবাসা ভিন্ন নারীর আর কি ঘের আছে ?

বিন্দু । উমা, ভালবাসাই আমাদের প্রথম ধর্ম, কিন্তু তা ভিন্ন আমাদের আরও কিছু শিখতে হয় । তা না হ’লে সংসার চলে না । বিনি আমাদের জন্যে এত করেন, তাঁর মনটি সর্বদা ভুট্ট রাখবার জন্যে, তাঁর গৃহটি সর্বদা প্রফুল্ল রাখবার জন্যে, আমরা যেন একটু বয়স কর্তে শিখি অনেক সময়

একটি মিষ্ট কথার কোভ নিবারণ হয়, একটি মিষ্ট কথার ক্রোধশান্তি হয়, আমাদের একটু বড় ও প্রকৃষ্টতার সংসারটি প্রকৃষ্ট থাকে। সংসারের জালা যদি একটু সহ্য করতে শিখি, ক্রোধ একটু সংবরণ করতে শিখি, অভিমান একটু ত্যাগ করে কমা-গুণ শিখি, তা হ'লে সংসারটি বজায় থাকে, না হ'লে জীবন তিক্ত হয়। উমা, আমি অনেক নির্দোষচরিত্র পুরুষ ও নির্দোষচরিত্রা নারী দেখেছি, তাদের ভালবাসারও অভাব নেই, তথাপি তাদের সংসার অশান্ত, জীবন তিক্ত। একটু ধৈর্য্য, একটু কমা সংসারের পথকে মসৃণ করে, সে গুণগুলির অভাবে উৎকৃষ্ট সংসারও কটকমর হয়, তখন তাঁরা মনে করেন, পূর্বে হ'তে একটু বড় করলে এ জীবনে কত সুখ হ'তে পড়ত। কিন্তু তখন জন্মের চ'লে গেছে। প্রায় একবার ধ্বংস হ'লে আর আসে না, জীবনের খেলা একবার সাক হ'লে আর সে খেলা আরম্ভ করতে আমাদের অধিকার নেই।

উমা। বিন্দু দিদি, তোমারই কাছে বাল্যকালে এ কথাটি আমি শুনেছিলাম, ভালপুত্রে তোমাদের দয়িত্ব সংসার দে'খে এ শিক্ষাটি আমি শিখেছি, ভগবান জানেন, এতে আমার কোন ত্রুটি হয়নি। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বলত, কিন্তু যিনি আমার গুরু, তিনিই আমাকে সর্বদা মুক্তা-হার ও হীরকাভরণ পড়তে দেখতে ভাল-বাসতেন, সেই জন্তে আমি পড়তাম, এই-রাত্রি আমার অভিমান। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বলত, কিন্তু দিদি, তুমি জান, সে রূপে আমি একদিন তুষ্ট ছিলেন, সেই জন্তে আমার অভিমান। তাঁকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য ইচ্ছা ছিল না। এখন কল্লিকতার এলেন, তখন

আমি এই বড় বিগুন করলেম, কেন না, আমি ভিন্ন এ বাড়ীতে আর মেয়েমাহুব ছিল না, আমি যদি একটু বড় না করি, কে করবে বল?

বিন্দু। উমা, তুমি বে একটু করবে, তা আমি জানতাম, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি জানতাম, অন্তে তোমাকে দোক দিবেছে, আমি লোব দিই নি। ধৈর্য্য, কমা, একটু বড়, মেহ ও প্রকৃষ্টতাই আমাদের কর্তব্য, এগুলি তুমি শিখেছ, সকলে শিখে না। পূর্বকালে আমরা বড় বড় সংসারে বৌ-মাহুব হয়ে থাকতাম, স্বামি ও নন্দনের ভয়ে, জায়ের ভয়ে, আমাদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেক চাপা পড়ত। আমরা বুধ বদ্ধ করে থাকতাম, স্বামিভীর আদেশে সংসার চলত। এখন সবাই পৃথক পৃথক থাকতে শিখেছে, ছেলেরাও যা ইচ্ছা করে, বোয়েরাও আপনাদের কর্তব্য ভুলে যায়, সংসারস্থ অনারাসে বিনষ্ট হয়।

উমা। বিন্দু দিদি, আমারও অনেক সময় মনে হয়, সকলে একত্রে থাকবার প্রথাই ভাল ছিল, ছেলেরা শীঘ্র কুপথে যেতে পারত না, মেয়েরাও নন্দ্রতা শিখত।

বিন্দু। উমা, সুখ-দুঃখ সকল প্রধাতাই আছে। কালীতারা বৃহৎ পরিবারে আছে, আর্হা! কালী কি সুখে আছে? একত্র বাস করবার কি এই সুখ?

উমা। কালীদিদির দুঃখের অন্ত কারণ বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, সে চির-জীবন প্রণয়স্থখে বঞ্চিত।

বিন্দু। আমি প্রণয়স্থখের কথা বলছি না। প্রতাহ সকাল থেকে দুপুররাত্রি পর্যন্ত পথের মুঠের চেয়েও খেটে খেটে যে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত

যে নির্দোষে পথের কাদালী অশেফা গল্পনা ও গালি ধার, তার কারণ কি ?

উমা । বিন্দু দিদি, কালীদিদির বুড়-বাগদারী বন্দ লোক, সেই ভুলে ।

বিন্দু । তা বড় সংসারে সকলেই যে ভাল লোক হবে, তারই সম্ভাবনা কি ? একজন মন্দ হলোই সংসার তিক্ত হয়, সমস্ত দিন বিটিনাটি ও কোন্দল ; যে কালীতারার মত ভালমানুষ, তারই অধিক বাতনা । এই সব দেখে, বাদেব একটু টাকা হয়, তারা ভিন্ন থাকতে চায়, না হ'লে আপনার লোক কে ইচ্ছে ক'রে ত্যাগ ক'রে বসে । তা ভিন্ন থেকেও যদি আমাদের বার বেটুকু করা আবশ্যক, তাই করি, বাগদারী ভয়ে বেটুকু লিপ্ত হই, সেইটুকু যদি নিজ বুদ্ধিতে শিখি, তা হ'লেও সংসারে অনেকটা সুখ থাকে । এখনকার মেয়েরা এটি বড় শিখে না, কালে বোধ হয় শিখবে ।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাস্তার জুড়ীর শব্দ হইল, একখানি গাড়ী আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল । উমা তাহার অর্থ বুঝিলেন, স্ততরাং দেখিতে উঠিলেন না, বিন্দু গবাকের নিকট বাইরা দেখিতে লাগিলেন । বাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন হইতে বঁদু বঁদু করিয়া জল পড়িতে লাগিল । ধনঞ্জয়-বাবু বাগান হইতে আসিলেন । তাঁহার বেশ-ভূষা বিশৃঙ্খল, তিনি নিজে অচেতন, দুই জন ভৃত্য তাঁকে গাড়ী হইতে উপরে উঠাইয়া লইয়া গেল ।

বঁদু বঁদু করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে হিন্দু উমাকে দুই হস্তে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, “উমা, ভগবানু জানেন, নামীর বস্তুর কষ্ট হয় । তুমি তা সহ করুহ, সেই কষ্টে উমা আর উমা নেই, বোধ হয়, রাত্রে ভোগে,

না খেয়ে, কেঁদে কেঁদে তোমার এই দশা হয়েছে, রোগও হয়েছে । কি করুবে বোন, যদি সহিতে হয়, সরে থাক, যত্নের ক্রটি করো না, অভিমান দেখিও না, একটি উচ্চকথা করো না, তা হ'লে আরও মন্দ হবে, এ রোগের সে ওষুধ নয় । নীরবে এ বাতনা সহ কর, যখন অবকাশ পাবে, মিষ্টকথার ধনঞ্জয়-বাবুকে ভুলে করো, কথার বা ইজিতে তিরস্কার করো না, কাঁদতে হয়, গোপনে কাঁদবে । বাদেব নিজে ধনঞ্জয়-বাবু এখন এত সুখ অশ্রুভব করেন, হয় ত কাঁল তাদের উপর বিরক্ত হবেন । পরম অসদাচারীও অসদাচার পরিত্যাগ ক'রে আবার পবিত্র ব্রহ্ম সংসারসুখ খুঁজছে, এমনও আমি দেখেছি । তোমার মাকে আমি আজই চিঠি লিখব, দৈর্ঘ্য ধারণ ক'রে আশার ভর ক'রে থাক । প্রাণের উমা, ভগবানু এখনও তোমার কষ্ট মোচন করিতে পারেন, তোমাকে সুখ দিবে পারেন ।

দুই ভগিনীতে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন । উমা বিন্দুর কথার কোন উত্তর দিলেন না, যেন মনে ভাবিলেন,—ভগবানু একটি সুখ আমাকে দিতে পারেন—মৃত্যু ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

আর একজন হতভাগিনী ।

একটা আসিয়া পাকী হইতে না নামিতে নামিতে সুধা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, “দিদি, দিদি, কে এসেছে, দেখবে এস ।”

বিন্দু । কে লো ?

সুধা। এই দেখবে এস না, এই পোবার
হরে বসে আছে।

বিন্দু। কে, শরৎ-বাবু?

সুধা। না, শরৎ-বাবু নয়। দিদি, শরৎ-
বাবু এখন আর আসেন না কেন?

বিন্দু। শরৎ-বাবুর কি পড়া-শুনা নেই?
তার পরীক্ষা কাছে, সে কি রোজ আসতে
পারে?

সুধা। পরীক্ষা কবে দিদি?

বিন্দু। এই শীতকালে!

সুধা। তার পর আসবেন?

বিন্দু। আসবে বৈ কি বোন, এখনও
আসবে। তবে রোজ রোজ কি আসতে
পারে? যে দিন অবকাশ পাবে, আসবে।
উপরে কে বসে আছে?

সুধা। কে বলানা?

বিন্দু। চন্দ্রনাথ-বাবুর স্ত্রী এসেছেন
না কি? তিনি ত মধ্যে মধ্যে আসেন, আর
কে আসবে?

সুধা। না, তিনি নন।

বিন্দু। বুঝি দেবী-বাবুর স্ত্রী?
এতদিন পর বুঝি তিনি একবার অচ্যুগ্রহ
ক'রে পদধূলি দিলেন?

সুধা। না, তিনিও নন, কালীদিদি
এসেছে।

বিন্দু। কালীতারা? তারা কল্কুকের
এসেছে, কৈ, কিছুই ত জানি না।

এই বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া
বিন্দু কালীতারাকে দেখিলেন। অনেক দিন
পর তাহাকে দেখিয়া বড় ভীত হইলেন;
বলিলেন, “এ কি, কালীতারা! কল্-
কুকের কবে এলে? তোমরা সকলে ভাল
আছ?”

কালী। এই পাঁচ সাত দিন হ'ল এসেছি,
এতদিন কাজের ঝন্টটে আসতে পারিনি,

আজ একবার যেখা খুঁজীকে অনেক ক'রে
ব'লে করে এলেন। ভাল নেই।

বিন্দু। কেন, কারও ব্যারাম হয়েছে
না কি?

কালী। বাবুর বড় ব্যারাম, তাঁরই চিকিৎসা
সার ভণ্ডে আমরা কল্কুকের এসেছি।
বর্তমানে এত চিকিৎসা করালেন, কিছুই হ'ল
না, এখন কল্কুকের ইংরেজ ডাক্তার দেখ-
ছেন, ভগবানের যা ইচ্ছে।” এই বলিয়া
কালীতারা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু। সে কি? কি ব্যারাম?

কালী। অরু আর আমাশা। সে অরুও
ছাড়ে না, সে আমাশাও বন্ধ হয় না। আহা!
তাঁর শরীরখানা বেন কাটিপানা হয়ে গেছে।
আবার চুটুতে বস্ত্র দিয়া কালীতারা
ফোপাইতে লাগিলেন।

বিন্দু। তা কীদ কেন বোন, কীদলে
আর কি হবে বল! এখন ভাল ক'রে
চিকিৎসা করাও। ব্যারাম হয়েছে, ভাল হয়ে
যাবে। তুঁতা কবিরাজ দেখাচ্ছ না কেন?
পুরাণ জরু আর আমাশায় কবিরাজ বেবন
চিকিৎসা করে, ইংরেজ ডাক্তারে তেমন কি
পারে?

কালী। কবিরাজ দেখাতে কি বাকি
রেখেছে বিন্দু, কবিরাজে হার মেনেছে,
তবে ইংরেজ ডাক্তার ভেঁকেছে। বর্তমানে
তিন মাস থেকে ভাল ভাল কবিরাজ দেখান
হয়েছে, কল্কুকে থেকে ভাল ভাল কবিরাজ
গিয়েছিল, কিছু কবুতে পারলে না।

বিন্দু। তবে দেখ বোন, ইংরেজী চিকিৎসা
সার কি হয়! তোমরা আছ কোথায়?

কালী। কালীঘাটে একটি বাড়ী নিরেছি,
টুক আদি-গদ্যার কিনারায়।

বিন্দু। কালীঘাটে কেন? এই বর্ষাকালে
কালীঘাটে শুনেছি অনেক ব্যারাম হচ্ছে,

সেখানে না থেকে একটু দাঁকা কারাগার
রইলে না কেন ?

কালী। তাও কি হর দিদি ? ওঁরা
কল্ককেতার আস্তে চান না, বলেন, এখানে
বাছ-বিচার নেই, এখানে জাভ থাকে না।
শেষে কত ক'রে কালীঘাটের একজন
পাণ্ডাকে দিয়ে একটি বাড়ী ঠিক ক'রে তবে
আমরা এলেম। রোজ আদিপুজার আমাদের
মান হয়, রোজ পূজা দেওয়া হয়। কত ক্রিয়া-
কর্ম, ঠাকুরকে কত মানত করা হয়েছে,
আমার স্বাভাবিক বোঝা মহিব যেনেছেন,
আমার কি আছে বিন্দু দিদি, আমার রূপার
গোট ছড়াটি বেচে বোড়া পাঁটা দেব
যেনেছি। আহা, ঠাকুর যদি রক্ষা করেন,
বাবুকে যদি এ স্বাত্রা বাঁচান, তবেই আমরা
বাঁচলেম, নৈলে আমাদের এত বড় সংসার
ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মান বল,
ধন বল, বিবর বল, খাতি বল, কুলের
গৌরব বল, বাবুর হাডেট সব ; তিনিই সক-
লের মাথা, তিনি একাই সব করুছেন কর্ণা-
ছেন, তিনিই সব চালিয়ে নিচ্ছেন, তিনি
না থাকলে আমাদের কে আছে বল ?
ডগবান ! এ কান্দালিনীকে চির-হতভাগিনী
করো না।

আজীবন যে স্বামীর প্রণয়সুখ কখনও
ভোগ করে নাই, প্রণয়সুখ কাহাকে বলে,
জানিত না। আজি সে স্বামী-বিরোগ-চিত্তার
বাতনার লুণ্ঠিত হইল !

বিন্দু কালীকে অনেক করিয়া সাহায্য
করিলেন ; বলিলেন, “তবু কি বোন, চিকিৎসা
হচ্ছে, তবে আর ভর কি ? আমাদের
বাবু আছেন, ভোমার ভাই শরৎ-বাবু
আছেন, সকলে দেখবে শুনবে, পীড়া শির
আরাম হবে। এই সুধার এমন ব্যাঘ্ররাম
হয়েছিল, শরৎ-বাবু কত বড় করলেন, দিন-

রাজি ষাওয়া খুব হেঁড়ে দেবা করলেন, তাই
রক্ষা, না হ'লে কি সুধা বাঁচত ?”

কালী। বিন্দু দিদি, শরৎ রোজ এখানে
আসে ?

বিন্দু। আগে আসত বোন, এখন তার
পরীক্ষা কাছে, তাই আসতে পারে না,
বাবুই বুঝি তাকে একটু ভাল ক'রে লেখা-
পড়া করতে বলেছেন ; প্রায় একমাস অবধি
আসে নি।

কালী। বিন্দু দিদি, মধ্যে মধ্যে তাকে
আসতে বলো, এখানে মধ্যে মধ্যে এসে গল্প-
সল্প করলে থাকলে ভাল, আহা, দিন-রাত
পড়ে পড়ে শরতের চেহারা কালী হয়ে
গেছে, চক্ষু ব'সে গেছে। কাল সে এসেছিল,
হঠাৎ চেনা যায় না।

বিন্দু। সে কি কালী, কৈ, তা আমরা
কিছু জানি না। এখানে যখন আসত, তখন
বেশ চেহারা ছিল, এর মধ্যে এমন হয়ে
গেছে ? এমন করেও পড়ে ? না হয় পরীক্ষা
নাই হ'ল, তাই বু'লে কি পড়ে ব্যাঘ্ররাম করবে ?
আমি বাবুকে বলব এখন, শরৎ-বাবুকে
একদিন ডেকে আনবেন, মধ্যে মধ্যে শনি-
বার কি রবিবার এখানেই না হয় থাকলো।

তাহার পর উমাতারার কথা হইল। বিন্দু
বাহা বাহা দেখিয়াছিলেন, অনেক আক্ষেপ
করিয়া কালীকে তাহা শুনাইলেন, কালীও
খানিক কাদিলেন। বিন্দু শেষে বলিলেন,
“আমি আজই জ্যোঠাইমাকে চিঠি লিখব,
জ্যোঠাইমা আনুন, বা করবার করুন, আমি
আর এ কষ্ট দেখতে পারি না। কল্ককেতা
ছাড়তে পারলে বাঁচি, আবার ভালপুত্রের
বেতে পারলে বাঁচি।”

কালী। তোদের এই ভাত্রমাসে বাবার
কথা ছিল না ? ভাত্র মাস ত প্রায় শেষ
হ'ল।

বিন্দু। কথা ত ছিল, কিন্তু হরে উঠল কে? আবার উমাতারার এই রোগ, তোমাদের বাড়ীতে রোগ, এ সব রেখে ত যেতে পারিনি? পূজার পর না হ'লে আমাদের বাড়ী হাছে না, পূজারও বড় দেরী নেই, হাসখানেকও নেই।

কালী। তবে তোমাদের খানটান দেখবে কে?

বিন্দু। বাবু সনাতনকে জমী ভাগে দিবে এসেছেন। সনাতন আমাদের পুরাতন লোক, আমাদের অংশ গোলায় বন্ধ ক'রে রাখবে, তার কোন ভাবনা নেই।

আর কতক্ষণ কথাবার্তার পর কালীতার। চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিলেন। বিন্দু কিছু জল খাবার আনিয়া দিলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেম। এদিকে উমাতারার রোগ ও দুর্দশা, ওদিকে কলিকাতার স্বামীর উৎকট পীড়া, আবার ছুটি বন্ধু, শরণও না কি ছেলেমানুষের মত শরীরের স্বাস্থ্য না নিয়ে পড়াশুনা করছে। এখন কোন্ দিক সামলাই? উপায় কি? বিশদে তুমিই মন্ত্রী, এর উপায় কি ঠিক করছ?

বিন্দু। লম্বাটের লিখন বাজার সৈন্তও কিরায় না, মন্ত্রীর স্বাস্থ্যও কিরায় না। তবে আমাদের বা সাধ্য, তা করব।

হেম। তবু কি ঠিক করলে? উমাকে কি ব'লে এলে?

বিন্দু। কি আর বলব? আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাই দিবে এলেম, এখনকার চকলমতি স্বামীকে বশ করবার যে মন্ত্রটি জানি, তাই শিখিয়ে এলেম।

হেম সে ভীষণ মন্ত্রটি কি, আমি জানতে পারি কি?

বিন্দু। জানবে না কেন? উমার বাড়ীতে বড় একটি কাঠালগাছ আছে, তারই ডাল নিয়ে প্রাক্তন একটি মূণ্ডর প্রস্তুত ক'রে বিপথগামী স্বামীকে তদ্বারা বিশেষরূপে শিক্তা দেওয়া। এই মহামন্ত্র!

হেম। না, বৃহস্পতির এরূপ মন্ত্র নয়।

বিন্দু। তবে কিরূপ?

হেম। কচি আঁবের অথল রেখে দেওয়া, পাকা আঁবের স্মিষ্ট রস ক'রে দেওয়া, বৃহস্পতির মন্ত্রের এইরূপ করেকটি সাধন দেখেছি, আর বেশী বড় জানি না।

বিন্দু। তবে তাই শিখিয়ে এসেছি। আর জ্যোঠাইমাকে পত্র লিখব, তিনি এলে বোধ হয়, উমার মনও একটু ভাল হবে, ধনঞ্জয়-বাবুও লজ্জার খাতিরে করেক মাস একটু সাবধানে থাকবেন।

হেম। জ্যোঠাইমা জামাইয়ের বাড়ীতে আসবেন কেন?

বিন্দু। আমি সব কথা লিখলে আসবেন। হাজার হোক মার মর।

হেম। আর কালীতারার কি উপায় করলে?

বিন্দু। সেটি তোমাকে দেখতে হবে। তোমার চাকরী টাকরী ত বিলক্ষণ হ'ল, এখন প্রত্যাহ একবার ক'রে কালীঘাটে গিয়ে রোগীর বস্তু করতে হবে। সে বাড়ীতে মাস্তবের মত মাস্তব একজনও নেই, হয় ত ঠাকুরবাড়ীর প্রাসাদগুলা খাইয়ে রোগীর রোগ আরও উৎকট করবে, চিকিৎসাটি বাতে ভাল ক'রে হয়, তুমি দেখো।

হেম। তা আমার বা সাধ্য করব। কাল প্রত্যাহেই সেখানে যাব। আর শরতের কি বন্দোবস্ত করলে? ছুটি রইলে একদিকে, আমি রইলেম আর একদিকে, শরণ-বাবুকে একটু দেখে শুনে কে?

বিন্দু। তাই ত, সে পাশ লা ছেলেটার কথা কৈ আমি ভাবিনি। ওলো সুখা, তুই একটু শরৎবাবুর যত্ন-টহু করুতে পারবি? নৈলে ত সে পড়ে পড়ে সারা হ'ল।

সুখা দূরে থেলা করিতেছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, “দিদি ডাকছিলে?”

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “হী বোন, ডাকছিলেম। বলি, তুমি শরৎ-বাবুর একটু যত্ন করুতে পারবে?”

বালিকার কণ্ঠ হঠাৎে মলাট-প্রদেহ পর্যন্ত রঞ্জিত হইল। সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজা।

আখিনে অধিকাপূজার সময় আগত হইতে লাগিল। ছেলেপুলের বড় আয়োজ। নূতন কাপড় হইবে, নূতন ছুতা হইবে, নূতন পোষাক বা টুপী হইবে, ইত্যুলের ছুটি হইবে, পূজার সময় যাডা হইবে, ভাসানের দিন বালকবৃন্দ আক্লাদে আটখানা।

গৃহস্থগৃহিণীদিগের আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড় ভব্বের আয়োজন করিতেছেন, নূতন জামাইকে ভাল রকম তত্ত্ব করিয়া বেরানের মন রাখিবেন। কেহ বড় তত্ত্ব প্রত্যাশা করিতেছেন, পাশকরা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিতেছেন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, ধারাপ হইয়াছিল বলিয়া তাহা টানিয়া কেলিয়া দিয়া বেরানের গোট বেড়াইয়া ভাল ঘড়ী আদায় করিয়াছেন, আবার অপরাধে ছায়ে পা যেলাইয়া ধসিয়া

বুদ্ধিমতী পড়সী-গৃহিণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, “এবার দেখ'ব, বেরান কেমন তত্ত্ব করে, যদি তত্ত্বের মত তত্ত্ব না করে, লাখি ঘেরে কে'লে দেব। বিয়ের সময় বড় কাকি দিয়েছে, এবার দেখ'ব, কে কাকি দেয়। আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে, এমন ছেলে কল্কেতার কটা আছে? মিন্‌বের যেমন বাহাতুরে ধরেছে, এমন ছেলেরও এমন ঘরে বিয়ে দেয়! তা দেখ'ব, দেখ'ব, তত্ত্বের সময় কড়াগড়া বুঝে নেব, নৈলে আমি কারেতের ঘেরে নই।” রোক্ত-মানা বালবধু বাপের বাড়ী বাবার ভক্ত তিন মাস হইতে বুখা ক্রন্দন করিতেছে, গৃহিণী তত্ত্বটি না দেখিয়া বৌ পাঠাইবেন না।

সামান্ত ঘরের যুবতীগণও দিন গণিতেছে, স্বামী বিশেষ চাকরী করেন, পূজার সময় অনেক কটে ছুটি পাংরা একবার ডার্যার মুখদর্শন করেন। এবার কি তিনি আসিবেন, সাহেব কি এবার ছুটি দিবেন? ইয়া গা, সাহেবদের কি একটু দয়া-মমতা নাই? তাঁদেরও কি স্বামী-পরিবারের ভক্ত একটু মন কেমন করে না?

বাঁহু-মহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হইতেছে, নাচ-গানের ভাল রকম আয়োজন হইতেছে, আর কত কি আয়োজন হইতেছে, জামরা তাহা কিরণে জানিব? আগার বাপায়া জাহাজের যবরে কাল কি?

গল্লাগ্রামেও আনন্দের সীমা নাই। বাতা বসুমতীর অগ্রহ্রহ অপার, কুবকপণ ভাত্র মাসে শত কাটিয়া জমিদারের খাদ্যনা দিতেছে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের ভক্ত গৃহে একটু ধান জমাইতেছে। কুবকবধূগণ গোপনে চোরের মত সেই ধান

একটু সরাইয়া হাতের দুইদ্বিধা খাঁকা করিতেছে বা হাটে একখানি নুতন কাপড় কিনিতেছে। বরষার পর শ্রমের বরষা বেন দ্রাভ হইয়া শ্রমের হরিষ্য বেন ধারণ করিল; আকাশ বেনরুপ কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া শরভের ঐআলোককর জ্যোৎস্না বরণ করিতে লাগিল। বায়ু নির্মল হইল, বড় গরম নহে, বড় শীতল নহে, বহুব্যাপারীর শ্রমবর্জন করিয়া মল্ল মল্ল বহিতে লাগিল। গৃহস্থের শরও ধনদ্রাভে পূর্ণ হইল, গৃহস্থের মন একটু আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চালে নুতন খড় দিয়া ছাউনি বাঁধা হইল। বজ্রদেশে শারদীয়া পূজার যে এত ধুমধাম, তাহার এই কারণ, অল্প কারণ আমরা জানি না।

কিন্তু আনন্দময় শরৎকাল সকলের পক্ষে শ্রমের সময় নহে। দরিদ্রের হৃৎ অপরীত হয়, কিন্তু শোকার্তের শোক অপরীত হয় না। উমাতার মাতা কলিকাতার আসিলেন। বিন্দু বার বার উমাকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু উমার রোগের শান্তি হইল না। ধনঞ্জয়-বাবু দিনকতক একটু অপ্রতিভের দ্বারা বোধ করিলেন, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আপনীত হইল না, তিনি বাড়ীর ভিতরে আসা বন্ধ করিলেন, বাহিরেই আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। উমার মাতা পুনরায় পরীগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যিন দিন কছার অবস্থা দেখিয়া সহসা কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হস্তাগিনী উমা আরও ক্লীণ হইতে লাগিল; বরষাশেষে তাহার কাসি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; মুখখানি অতিশয় শুষ্ক, চক্ষু দুইটি কোটর প্রকট। কাহাকেও ভিরকার না করিয়া, আপনার মনভাগ্যের কথা না

কহিয়া সে দিনে দিনে ধীরে ধীরে আপনার গৃহকায়া করিত, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিত, বাতায় সেবা-শুভ্রবা করিত, স্বামীর ভক্ত নানারূপ ব্যঞ্জনাদি বহুস্তে প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত।

হেমের বস্ত্রে কালাতীরার স্বামীর পিড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু আরোগ্য হইল না। সে বরষে পুরাতন রোগ শীঘ্র বায় না, তাহার উপর বৃহৎ সলোয়ের নানারূপ উপদ্রব, কালীঘাটের পাণ্ডাধিগের নানারূপ উপদ্রব। অনেক বস্ত্রে বেটুকু ভাল হয়, একদিন অনিয়মে সেটুকু আবার মল্ল হয়, হেমচন্দ্র পিড়ার আরোগ্যের বড় আশা করিতে পারিলেন না।

বিন্দু মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, শরৎ আসিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাঁহার পড়াশুনার বড় ধুম, এখন ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষা দিবেন, কিরূপে? বিন্দুও বড় জেদ করিতেন না, কেবল প্রত্যহ কোন নুতন ব্যঞ্জন রান্ধিয়া কি কল ছাড়াইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সুধা বস্ত্র সহকারে মিছরীর পানা প্রস্তুত করিত, আঁক পেপে ছাড়াইয়া দিত, মৃগের ডাল ভিজাইয়া দিত, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিজহস্তে রেকাবি সাজাইয়া কিয়ের দ্বারা শরভের বাটাতে পাঠাইয়া দিত। শরৎ অনেক বারগ করিয়া পাঠাইতেন, কিন্তু ছেলটি কিছু পেটুক, সেই মৃগের ডালগুলির নিদর্শন রেকাবিতে অধিকক্ষণ থাকিত না, একবার চুমুক দিতে আরম্ভ করিলে সে মিছরীর পানা নিমেষের মধ্যে অস্তিত্ব হইত। ঝিকে বলিতেন, “ঝি, কাল থেকে আর এনো না, তাঁরা কেন রোজ কষ্ট করে প্রস্তুত করেন? আমি সত্য বলছি, আমার এ সব দরকার নেই।” ঝি খালি পাত্রগুলি হাতে লইয়া “তা দেখতেই পাচ্ছি।”

মণিরা প্রস্থান করিত। বলা বাহুল্য যে, পেটুক বালকের কথার মনো করা না শুনিয়া সুধা প্রভাক্ত মিছরীর পাশা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শেষে পূজা আসিয়া পড়িল। দেবী-বাবুর বাড়ীতে বড় ধুমধাম; দেবীর বহু বৃত্তি, অনেক গাওনা, বাজনা, তিন রাত্রি যাত্রা! দেবী-বাবুর গৃহিণীর বৃকের বেঘনটা সেই সময় বোধ হয় একটু কমিয়াছিল, কেন না, তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত বারান্দার চিক কেলিয়া ঠার বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। কবিবাক্ষ গৃহিণীর মতলব বুঝিয়া, একটু আশ্রয় আশ্রয় করিয়া বলিল, “হাঁ, তাতে হানি কি? যে তেলটা দিয়েছি, দেটা যেন ভাল ক’রে মালিস করা হয়।”

দেবী-বাবুর গৃহিণীর উপরোধে চন্দ্রনাথ-বাবুর স্ত্রী ও অন্তান্ত ভদ্র-গৃহিণীগণ আসিয়া যাত্রা শুনিল, নিতান্ত অনভি-লাষও নাই। বিজ্ঞানমন্ডলের যাত্রা, রাধিকার মানভঞ্জন, গানগুলি বাছা বাছা, ভাবই কত, অর্থ ই কত! গৃহিণীগণ রোক্তমান গণ্ডা গণ্ডা ছেলেগুলোকে খাবড়া মারিয়া খুম পাড়াইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীতরস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদেশিনীর প্রতি রাধিকার স্তুতি শুনিয়া বুদ্ধাগণ ভাবে গদগদচিত্তে সুর তুলিয়া কাদিয়া উঠিলেন।

বিন্দুও কি করেন, একদিন ছেলে ছুটাকে স্ত্রীধার কাছে রাখিয়া যাত্রা শুনিয়া আসিলেন। সকালে আসিয়া গিয়া হেমকে বলিলেন, “মানভঞ্জন বড় মন্দ হয়নি, তুমি একদিন গিয়ে শুনে এস না।”

হেম। না, মানভঞ্জনপ্রথা তোমার কাছেই ছেলেবেলা অনেক শিখেছি, যাত্রার আর কি শিখব?

বিন্দু স্বামীর মুখ চাশিয়া ধরিয়া বলিলেন, “বিধা কথাসংগো আর বণো না, পাশ হবে।”

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া-দশমী।

আজি মহা কোলাহলে ভাসান হইয়া গিয়াছে; মহানগরীর পথে ঘাটে বাটীতে বাটীতে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে, বাজ ও গীতধ্বনি শব্দিত হইয়াছে। রাজপথে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, কি ইতর, কি ভদ্র, কি শিশু, কি যুবা, সকলেই নদীর স্রোতের স্তার গমনাগমন করিয়াছে; নিতান্ত দরিদ্রও একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছে। দেবীর উৎসবধ্বনি অস্ত্র এই মহানগরীকে পুলকিত ও কল্পিত করিয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইল।

ভাহার পর ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত, পুত্র মাতার নিকট, সকলে প্রণাম বা নমস্কার, আশীর্বাদ বা আলিঙ্গন দ্বারা সকলকে তৃপ্তি করিল। বোধ হইল যেন, জগতে আজি বৈরাগ্য তিরোহিত হইয়াছে, যেন শত্রু শত্রুকে ক্ষমা করিল, অপরাধগ্রস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করিল। মহা-হৃদয়ের স্নেহময় মনোবৃত্তিগুলি ক্ষতি পাইল, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও বাৎসল্য অস্ত্র বাক্যলীর হৃদয়ে উৎখলিতে লাগিল। শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাতে রাজপথে আনন্দের লহরী, সৌভাগ্যের লহরী, ভালবাসার লহরী বহিতে লাগিল। সংসারের লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক শোকের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, অনেক পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

কথায় বিশ্ব দেখিয়াছি, নির্ভর লেখনীতে
সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই পুণ্য-
রজনীতে কণেক কাড়াইয়া এই সুখলহরী
দেখিলাম, হৃদয় তুই হইল, শরীর পুলকিত
হইল। এ রজনীতে যদি কোন অপবিত্রতা
থাকে, কোন পাপাচরণ অন্তর্ভুক্ত হয়,
তাহার উপর বনিকা পাত্তিত কর, সেগুলি
আজ দেখিতে চাহি না।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিন্দু রাস্তাঘরে
ভাত খাইয়া উঠিলেন। ছেলে দুইটি বুয়াই-
রাছে, বুয়া বুয়াইরাছে, হেম-বাবুও শুইরা-
ছেন, কিও বাকী গিয়াছে, বিন্দু সদর-দরজার
বিল দিয়া নীচে একাকী ভাত খাইলেন ও
উঠিয়া আচমন করিলেন। এমন সময়
কপালট একটি শব্দ শুনিলেন, কে যেন
আন্তে আন্তে যা মারিল।

এত রাত্রিতে কে আসিয়াছে? বিন্দু
একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আবার
শব্দ হইল।

“কে গা? দরজার কে কাড়িয়ে গা?”
কোন উত্তর আসিল না, আবার শব্দ হইল।

বিন্দু কি উপরে গিয়া হেমকে উঠাইবেন?
হেম আজ অনেক হাঁটিয়াছেন, অতিশয় শ্রান্ত
হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। বিন্দু সাহসে ভর
করিয়া আপনি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।
লোকটা কে, দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারি-
লেন না, পরমুহূর্তেই চিনিলেন, শরচ্চন্দ্র!

কিন্তু এই কি শরচ্চন্দ্রের রূপ? বড় বড়
লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আসিয়া কপালে ও
চক্ষুতে পড়িয়াছে, চক্ষু দুটি কোটরপ্রবিষ্ট,
কিন্তু ধ্বংস করিয়া জলিতেছে, মুখ অতি-
শয় শুক ও অতিশয় গম্ভীর; শরীরখানি জীর্ণ
বয়সীরাছে; একখানি ময়লা একলাই সাজ
লাগিয়ায়। উভয়ে ভিতরে আসিলেন, শরৎ
কোণেন, “বিন্দু দিদি, অনেক দিন আস্তে
করি

পারিনি, কিছু মনে করো না, আজ বিজয়ার
দিন প্রণাম কস্তে এলেম।”

বিন্দু। শরৎ-বাবু, বেঁচে থাক, নীচ-
জীবী হও, তোমার বে-খা হোক, স্নেহে
সংসার কর, এইটি যেন চক্ষু দেখে বাই,
তাইকে আর কি আশীর্বাদ করব?

বিন্দুর স্নেহগর্ভ বাক্য শরতের চক্ষু
দিয়া জল পড়িতে লাগিল, শরৎ কোন
উত্তর করিতে পারিলেন না। বিন্দুর পা দুটি
ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বিন্দু অনেক
আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে দ্রুত ধরিয়া
তুলিলেন, পরে বলিলেন, “শরৎ-বাবু,
তুমি অনেক দিন এখানে এসনি, তাতে
এসে যায় না। প্রত্যহ তোমার খবর
পেতেম, জান্তেম, আমাদের কোন বিপদ
আপদ হলেই তুমি আসবে। কিন্তু এমন
ক’রে কি লেখাপড়া করে? লেখাপড়া
আগে, না শরীর আগে? আহা, তোমার
চক্ষু দুটি ব’সে গেছে, মুখখানি শুকিয়ে গেছে,
শরীর জীর্ণ হয়েছে, এমন ক’রে কি দিন-
রাত জেগে পড়ে? শরৎবাবু, তুমি বুদ্ধিমান
ছেলে, তোমাকে কি বুঝাতে হয়? তোমার
বিন্দু দিদির কথাটি রেখো, রাত্রিতে ঘুম ক’রে
সুশ্রী, দিনে সময়ে আহার করিও, তোমার
মত ছেলে পরীক্ষার অবশ্য উত্তীর্ণ হবে।”

শরতের শুক ওঠে একটু হাসি দেখা
গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,
“বিন্দু দিদি, পরীক্ষা দিতে পাবুলে কি জীব-
নের সুখবুদ্ধি হয়? হেমবাবু পরীক্ষা বড়
দেন নাই, হেমবাবুর মত সুখী লোক জগতে
করজন আছে?”

বিন্দু। তবে পরীক্ষার জন্তে এত চিন্তা
কেন? শরীর মাটি করুক কেন?

শরৎ। পরীক্ষার জন্তে এক মুহূর্তও
চিন্তা করি না।

বিন্দু। তবে কিসের চিন্তা?

শরৎ উত্তর দিলেন না, বিন্দুকে রকের উপরে বসাইলেন, আপনি নিকটে বসিলেন, বিন্দুর দুই হাত আপন হস্তে ধারণ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে বড় বড় অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া বিন্দুর হাতে পড়িতে লাগিল।

বিন্দু। একি শরৎ বাবু! কাঁছ কেন? ছি, তোমার কোন কাঁছ হয়েছে? মনে কোন ব্যতনা হয়েছে? তা আমাকে বলুন না কেন? শরৎ-বাবু, ছেলেবেলা থেকে তোমার মনের কোন কথাটি বলনি, আমি কোন কথাটি তোমার কাছে বুঝিয়েছি? এতদিনের স্নেহ কি আজ তুলে, তোমার বিন্দু দিমিকে কি পর মনে করলে?

শরৎ। বিন্দু দিদি, যে দিন তোমাকে পর মনে করব, সে দিন এ জগতে আমার আপনার কেউ থাকবে না। আমার মনের ব্যতনা তোমার নিকট লুকাব না, আমি হতভাগা, আমি পাপিষ্ঠ।

বিন্দু দেখিলেন, শরতের সেহ ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছে, নরন অগ্নির জ্বা অলিতেছে। বিন্দু একটু উষ্ম হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ-বাবু, তোমার মনের কথা আমাকে বল, শঙ্কোচ করো না।”

শরৎ। আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করো না। বিন্দু দিদি, আমি বোর পাপিষ্ঠ, আমার মন পাপ-চিন্তার রুদ্ধবর্ণ। বন্ধুর গৃহে এসে আমি অসদাচরণ করেছি, ভগিনীর প্রণয়ের বিষময় প্রতিদান করেছি, বিন্দু দিদি, আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করো না, আমার জীবনের বোর কলকে কলঙ্কিত।

শরৎ বিন্দুর হাত দুটি ছাড়িয়া দিয়া

দুই হস্তে বিন্দুর দুই বাহুদেশ ধরিলেন, এত বলের সহিত ধরিলেন যে, বিন্দুর সেই হৃৎকল কোমল বাহ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শরতের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, নরন হইতে অস্বাভাবিকতা বহির্গত হইতেছে।

বিন্দু শরৎকে এরূপ কখন দেখেন নাই, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ভয় হইল। সেই আদর্শচরিত্র ভ্রাতৃসম শরৎ কি মনে কোন পাপচিন্তা ধারণ করে? তাতা বিন্দুর স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু অত এই নিম্নের রাজিতে এই কিস্তপ্রায় দুবন্ধকে দেখিয়া সেই নিরাশ্রয় রমণীর মনে একটু ভয় হইল। প্রভাত্যপরম্ভূতি বিন্দু সে ভয় গোপন করিয়া স্পষ্টভাবে বলিলেন, “শরৎ-বাবু, তোমাকে বাধ্যকাল হ’তে আমি ভাই বলে জানি, তুমি আমাকে দিদি বলে ডাকতে; দিদির কাছে ভ্রাতা বা বন্ধুতে পারে, নিঃসঙ্কুচিত-চিত্তে তা বল।”

শরৎ। আমি যে অসদাচরণ করেছি, যে পাপচিন্তা মনে ধারণ করেছি, তা ভগিনীর কাছে বলা যায় না, আমি মহাপাপী।

বিন্দু সরোবে বলিলেন, “তবে আমার কাছে সে কথা বলবার আবশ্যক নেই,— আমাকে ছেড়ে দাও, ভগিনীকে সম্মান কর।”

শরৎ বিন্দুর বাহুবর ছাড়িয়া দিলেন, আপনার মুখখানি বিন্দুর কোলে লুকাইলেন, বালকের জ্ঞান অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শিশুর জ্ঞান বাহার নির্মল আচরণ, শিশুর জ্ঞান যে পদতলে পুড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি পাপচিন্তা ধারণ করিতে পারে ধীরে ধীরে শরতের মুখখানি তুলিলেন, ধীরে

ঘরে আপন অকল দিয়া তাঁহার নয়নবারি
হুঁইয়া দিলেন, পরে আস্তে আস্তে
বলিলেন, “শরৎ, তোমার হৃদয়ে এমন চিন্তা
উঠতে পারে না, যা আমার চুব্বার
অযোগ্য। তোমার যা বলবার বল, আমি
শুনছি।”

শরৎ। ভগদীশ্বর তোমার এই দরার
জন্তে তোমাকে সূখী করুন। বিন্দু দিদি,
আর একটি অভয়দান কর। যদি আমার
প্রার্থনা বিফল হয়, প্রতিজ্ঞা কর, তুমি এ
কথাটুকিকেও বলবে না? আমার পাপ-
চিন্তা আমার জীবনের সহিত শীঘ্র লীন
হবে, জগতে যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।

বিন্দু। তাই অস্বীকার করলেম।

শরৎ তখন মুহূর্তের ভক্ত চিন্তা করিলেন,
ছুই হস্ত দ্বারা হৃদয়ের উষ্মেগ যেন বদ্ধ
করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার
বিন্দুর হাত ছুটি ধরিয়া, তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত
মাথা নামাইয়া অক্ষুটবরে কহিলেন, “পুণ্য-
হৃদয়, সরলা, বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার
বিবাহ দাও।” বিন্দু তখন এক মুহূর্তের
মধ্যে ছয় মাসের ঘটনা বুঝিতে পারি-
লেন, তাঁহার মাথার আকাশ ভাঙ্গিয়া
পাড়িল।

শরৎ তখন ক্রিষ্টাব্দে বসিতে লাগিল,
“বিন্দু দিদি, আমি মহাপাপী। ছমাস
হ’ল, যে দিন স্ত্রীকে ভালপুঙ্কুরে দেখেলেম,
সেই দিন আমার মন বিচলিত হ’ল। পুস্তক-
পাঠ ভিন্ন অন্য ব্যবসা আমি জানুতেম না,
পুস্তকে ভিন্ন প্রণয় আমি জানুতেম না। সে
দিন সেই সরলহৃদয়, স্বর্গের লাভণ্যে বিভূ-
ষিতা, জ্যোৎস্না বৎসরের বালিকাকে দেখে
আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব করলেম।
কালে সেটি তিরোহিত হবে, আশা করে-
ছিলেম, কিন্তু দিন দিন ক্রমেই অধিক

বিষ পান করিতে লাগেলেম, আমার শরীর,
মন, আত্মা জর্জরিত হ’ল। বিন্দু দিদি, তুমি
সরল-হৃদয়ে আমাকে প্রত্যহ তোমার
বাটিতে আসিতে দিতে, হেমবাবু জ্যেষ্ঠ-
ভ্রাতার স্ত্রীর ঘেহ করে আমাকে আসিতে
দিতেন, আমি হৃদয়ে কালকূট ধারণ করে,
পাপচিন্তা ধারণ করে, দিনে দিনে এই
এই পবিত্র সংসারে আসতেম। ভগদীশ্বর এ
মহাপাপ, এ মহা প্রভারণা কি ক্ষমা করবেন?
বিন্দু দিদি, তুমি কি ক্ষমা করবে? স্ত্রীর
পীড়ার পর যখন প্রত্যহ তাকে সাধনা
করিতে আসতেম, অনেকক্ষণ বসে ছুই জনে
গল্প করুতেম, অথবা আকাশের তারা
গণতেম, তখন আমি জানুতুম হয়ে যে কি
পাপচিন্তা করুতেম, বিন্দু দিদি, তোমাকে
কি বলব। আমার বিবাহ হবে, একটি
সংসার হবে, লাভণ্যময়ী স্ত্রী সে সংসারে
রাজ্ঞী হবে, আমার জীবন সুখাময় করবে,
এই চিন্তা আমাকে পূর্ণ করত, এই চিন্তা
আকাশের নক্ষত্রে পাঠ করুতেম, এই চিন্তা
বায়ুর শব্দে শ্রবণ করুতেম। প্রত্যহ আস্তে
আস্তে আমি প্রায় জানুতুম হলেম, তখন
হেমবাবু আমার পাঠের বাধাত হচ্ছে ব’লে
একদিন কয়েকটি উপদেশ দিলেন। তখন
আমার জ্ঞান হইল, পাঠ্য পুস্তক ও পরীক্ষা
চিত্তার আশ্রয়ে বদ্ধ হোক, কিন্তু যে উৎকট
বিপদে আমি পড়েছি, পাছে সরলচিত্তা স্ত্রী
সেই বিপদে পড়ে, এই ভয় সহসা আমার
হৃদয়ে আগরিত হ’ল, আমি সেই অবধি এ
পুণ্য-সংসার ত্যাগ করলেম। স্ত্রীকে না
দেখে আমিও তার চিন্তা তুলব মনে করে-
ছিলেম; কিন্তু সে স্ত্রী আশা। বিন্দু দিদি, সে
পাপচিন্তা তুলবার জন্ত আমি ছুই মাস অবধি
প্রাণপণে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে স্ত্রী চেষ্টা।
নদীর স্রোত হস্ত দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টা

ভায়! আমি পাঠে মন রত করিতে চেষ্টা করেছি, নাট্যশালায় গিয়ে সে চিন্তা তুলিতে চেষ্টা করেছি, আমার সহপাঠীদের সহিত মিশেছি, পীত-বাস্ত শুনে গিরেছি, কিন্তু সে কাল-চিন্তা তুলিতে পারিনি। ঘরের দেয়ালে, নৈশ আকাশে, আমার পুস্তকের পৃষ্ঠান্তে পৃষ্ঠান্তে, নাট্যশালায় নাট্যাভিনয়ে, সেই অনিন্দনীয় মুখমণ্ডল দেখতেম, রাত্রিতে সেই আনন্দময়ী মুক্তির স্বপ্ন দেখতেম। বিন্দু দিদি, এ দুই মাসের কথা আর বলব না, পথের কাকালীও আমা অপেক্ষা সুখী। বিন্দু দিদি, আমার মনের কথা তোমাকে বল্লেম, আমাকে স্থগা করো না, আমাকে বল্লেম, আমাকে স্থগা করো না, আমাকে মহাপাপী বলে দূর করে দিও না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু তুমি স্থগা করলে এ জগতে কে আমাকে একটু স্নেহ করবে, কে আমাকে স্থান দেবে?”

আবার শরতের শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া নয়ন-বারি বহিতে লাগিল। বিন্দু স্থির হইয়া এই কথাগুলি শুনিলেন, কি উত্তর দিবেন? শরতের প্রস্তাব, পাগলের প্রস্তাব, কিন্তু সে কথা বলিলে হয় ত এই কিপ্তপ্রার যুবক আজই আত্মঘাতী হইবে। বিন্দু ধীরে ধীরে শরতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, “ছি, শরৎ-বাবু, আপনাকে এমন করে রোষ দিও না, আপনাকে থিকার করো না। তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি ভাইয়ের মত মনে করি, তোমাকে কি আমি স্থগা করিতে পারি? এতে স্থগার কথা ত কিছুই নেই, কেন আপনাকে মহাপাপী বলে থিকার করছ? তবে বিধবা-বিবাহ আমাদের সমাজে চলন নেই, তা এতদূর বিবাহ হয় কি না, বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, বা হয়, তিনি ব্যবস্থা করবেন। তা তুমি আপনাকে এতদূর রোষ দিও না, তোমার এ কথার

বাবুর ঘাই মত হ'ক না কেন, তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ এ জীবনে তিরোহিত হবে না।

শরৎ। বিন্দু দিদি, তোমার মুখে পুশ-চলন পড়ুক, তুমি আমাকে যে এই দয়া করলে, আমাকে যে আজ স্থগা করে তাকিয়ে দিলে না, এ দয়া আমি জীবন থাকতে বিশ্বস্ত হব না।

বিন্দু। শরৎ-বাবু, তোমার বোধ হয়, আজ রাত্রিতে এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি, কিছু খাবে? একটু মুখটুকু ধোও না? বাবুর জন্তে আজ তুচ্ছ করেছিলাম, তার খানকত আছে। একটা সন্দেশ দিবে খাবে?

শরৎ। না দিদি, আজ কিছু খাব না, খাচ্ছে আমার রুচি নেই।

বিন্দু। তবে কাল সকালে একবার এস, বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করো।

শরৎ। কমা কর, এ বিষয়ে হেমবাবু যা বলেন, আমাকে বলো, তার পূর্বে আমি হেমবাবুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

বিন্দু। তা কাল না এলে নেই নেই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এস, এমন করে আপনাকে কষ্ট দিলে অনুতাপ করবে যে।

শরৎ। দিদি, কমা কর, এ বিষয় নিশ্চিন্ত না হ'লে আমি স্থগার কাছে মুখ দেখাব না। দেখো বিন্দু দিদি, এ কথা যেন স্থগার কানে না উঠে, তার মন যেন বিচলিত না হয়। আমার আশা যদি পূর্ণ না হয়, জগতে একজন হতভাগা থাকবে, আর একজনকে হতভাগিনী করবার সুযোগ নেই।

বিন্দু। তা তবে এ বিষয়ে বাবুর যা মত হয়, তা তোমাকে লিখে পাঠাব।

শরৎ। না দিদি, পত্রে এ কথা লিখো না, আমি আপনি এসে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যাব। কবে আসব বল,

আমার জীবনে সিংহাসন স্থাপন করেছেন কি মুখ দেখেছেন, তবে জানুন বল ।

বিন্দু । শরৎ-বাবু, তা কথা ত হই এক-মিনে সিংহাসিত হই না, অনেক দিক্ দেখতে হবে, অনেক পরামর্শ করিতে হবে । তা তুমি কিম্ব ১৫/১৬ পরে এস ।

শরৎ । তাই হোক । আমি কালীপূজার সন্মিলিতে আমার আসিব, এ কয়েক দিন জীবন্ত হইয়া থাকিব ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

মেয়ে-মহলের মতামত ।

শরৎ-বাবু যেই বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, অমনি দেবী-বাবুর বাড়ীর একটি ঝি ঠাকুরের প্রসাদ এক খাল ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল । ঝি খাল নামাইয়া বলিল, “মাঠাকুরণ তোমাদের জন্যে এই ঠাকুরের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন গো ! অনেক বাড়ীতে যেতে হয়েছিল, তাই আসতে এত রাত হ’ল ।”

বিন্দু । খাল রাখ বাছা, ঐ রকে রাখ, কা’ল আমাদের বিকে দিয়ে খালা পাঠিয়ে দেব ।

ঝি রকের উপর খাল রাখিল । গার কাপড়খানা একটু টানিয়া গারে দিয়া, একটু মুখ কিরিয়া দাঁড়াইয়া, পাশে একটি আঁতুল দিয়া মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিল ।

বিন্দু । কি গো, কি হয়েছে ? তোদের বাড়ীতে পূজার কোন ভাষাটা টায়াসা হয়েছে না কি, তাই বলতে এসেছিস ?

ঝি । ই্যা, তামাসাই বটে, ভদ্র

নোকের ঘরে হলেই ভাষাটা, আমাদের ঘরে হলেই নোকে পাঁচ কথা কর ।

বিন্দু । কি গো, কি ভাষাটা, কোথায় হয়েছে ?

ঝি । না বাপু, আমরা গবিব-শুব্বো নোক, আমাদের সে কথার কাজ কি বাপু । তবে কি জান, নোকে এ সব দেখলেই পাঁচ কথা কর ।

বিন্দু । কি দেখলি রে, ভেবেই বল না ।

ঝি আর একবার কাপড়টা সোর ক’রে নিরে আর একটু মুচকে হেসে বলে, “বল, ঐ ছোঁড়াটা এত রাজে বেরিয়ে গেল, ও কে গো ?”

বিন্দু একটু ভীত হইলেন । সদর-দর-জাটা এতক্ষণ খোলা ছিল, ঝি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরতের কথাগুলি শুনিয়াছে ? একটু ঝুঙ্ক হইয়া বলিলেন, “তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস ? শরৎ-বাবু এসেছিলেন, চিন্তে পারিসনি ? তুই কি আজ নেকরা করতে এসেছিস ?”

ঝি । না, চোখের মাথা বাই নি গো । শরৎবাবু, তা চিনেছি । তা ভদ্র নোকের ছেলে কি ভদ্র নোকের মেয়ের লগে অমনি ক’রে হাত কাড়াকাড়ি করে ? জানি না বাপু, তোমাদের পাড়াগাঁয়ে কি নিয়ম, আমি এই উনত্রিশ বছর কলকাতার চাকরী করছি, কৈ, এমনি ধারাটি দেখিনি । তা ভদ্র নোকের কথার আমাদের কাজ কি বাপু ? আমরা ছবেলা ছপেট খেতে পাই, তাই ভাল, আমাদের ও সব কথার কাজ কি ?

দেবী-বাবুর বাড়ীর ঝিওলা বড় বেহারা, তাহা বিন্দু পূর্বে লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু অত এই ঝির এই বিজ্ঞপূর্ণ অকৃতজ্ঞ ও কথা শুনিয়া মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন । কিন্তু

কোথাও আরও জানিই হইবে জানিরা তাহা
স্বপ্নবর্ণ করিয়া কহিলেন, “ও কি জানিন্স
কি, শরৎ-বাবুর বা কবিরে দেব না, তাই
বাসার একলা থেকে পড়ে পড়ে পাগলের
মত হয়ে গিয়েছে, কি বলে, কি কয়, তার
ঠিক নেই।”

কি। হ্যাঁ গা, তা শরৎ-বাবু পাগলই
হোক আর ছাগলই হোক, পরের বাড়ী এসে
উৎপাত করে কেন? বিরে-পাগলা হয়ে
থাক, একটা বিরে করুক গিরে, তোমাকে
এসে টানাটানি করে কেন? তোমাকে বিরে
করতে চায় না কি?

বিন্দু। দূর পোড়ারমুখী! তোর মুখে কি
কথা আটকায় না না? বা মুখে আসে, তাই
বলিস? শরৎ-বাবু একটি মেরেকে দেখেছে,
তার সঙ্গে বিরে করতে চায়। তা শরৎ-বাবু
সে কথা বাড়ীর কাউকে বলতে পারে না,
লজ্জা করে, তাই আমার কাছে বলতে
এসেছিল।

কি। সে কে গা? কোন্ মেরেটি?
বিন্দু। তা জানিবি এখন, সৰ্ব্বদা যদি ঠিক
হয়, তোরা সবাই জানিবি!

কি। হ্যাঁ গা, আর লুকলে চলবে
কেন? আমরা কি আর কিছু জানিনি গা?
আমরা ত আর বুড়ো হাবড়া হইনি, চক্কর
মাথাও খাইনি, কানের মাথাও খাইনি।
ঐ যে সুধা সুধা করে চেঁচিয়ে শরৎ-বাবু
কাঁদছিলেন, বেন সুধার ভেত্রে বুক কেটে
বাচ্ছিল, তা কি আর শুনিনি গা? এ কথা
তোমরা বলবে কেন? এ কথা কি ভদ্র
নোকে বলে, না কেউ কখন শুনেছে? বিধ-
বার আবার বিরে? ও মা, হি! হি! হি!
ভদ্র নোককে হওবৎ, আমাদের ঘরে এমন
কথাটি হ'লে তাকে একঘরে করে। ও মা,
হি! হি! হি! এমন কলঙ্কের কথা কি কেউ

কোথাও শুনেছে? এ ভদ্রের ঘর? মুচি-
মুচনমানের ঘরে ত এমন কথা কেউ শুনে
নি। ও মা, হি! হি! হি! হি! ও মা, অবাক
করে মা, কোথা বাব মা—ইত্যাদি
ইত্যাদি।

বিন্দু এবার বথার্থই ভীত হইলেন। বড়-
মামুষের ঘরের গর্জিগী মন্দভাবিনী কি বড়-
কণ তাঁহার উপর ব্যস্ত করিতেছিল, ততক্ষণ
বিন্দু সহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুধার নামে
এ কলঙ্ক রটাইবে তাহিরা বিন্দু হতজ্ঞান হই-
লেন। শরতের পাগলামী প্রভাবে তিনি
কখনই সন্দেহ হইবেন না স্থির করিয়াছিলেন,
কিন্তু বিধবার নামে সামান্য মিথ্যা কলঙ্কও
বড় ভয়ানক, মিথ্যা সত্য কেহ ভাবে না,
কলঙ্ক চারিদিকে বিস্তৃত হয়, অগণনীয় হয় না।

বুদ্ধিমতী বিন্দু তখন একটু চিন্তা করিয়া
বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিলেন।
অল্প দিন দেবী-বাবুর বাটী হইতে ধাবার
আসিলে বিদের হুই আনা পরসা দিতেন,
অল্প সেই টাকাটি বিদের হাতে দিয়া বলি-
লেন, “বি ভুই দেবী-বাবুর, বাড়ীতে অনেক
দিন আছিল, পুজার সময় তোকে আর কি
দিব, এই একটি টাকা নিয়ে যা, একথানা
নূতন কাপড় কিনিস। আর শরৎ যে পাগলের
মত কথাগুলি বলেছে, সে কথা আর কাউকে
বলিস নি। আজ দশমীর দিন, বোধ
হয়, কোথাও সিদ্ধি খেদে এসেছিল, তাই
পাগলের মত বকেছিল। তা পাগলের কথা
কি ধ্বংস আছে, ভদ্রঘরে এমনও কি হয়,
আমাদের একটু মান-সম্মত আছে, শরৎ-
বাবুরও মা আছেন, বোন আছেন, এমন
কাজও কি হয়ে থাকে? তা পাগলের কথা
বা শুনেছিল শুনেছিল, কাউকে পিসিনি
বাহা, এ পাগলামী কথা বেন কেউ টের
পায় না।”

চক্চকে টাকাটি দেখিয়া কির মত একটু
কিরিল, (অনেকেই করে) সে বলিল,
“তা বৈ কি মা, পাগলের কথা কি ধরতে
আছে, না বলতে আছে? শরৎ-বাবু একটু
সিদ্ধি খেয়েছিলেন বই ত নয়, এই আমাদের
বাড়ীর ছেলেরা যে বোতল বোতল কি
আনাচ্ছে আর খাচ্ছে, আর কি বা আচ-
রণ! স্বাস্থ্যেতে বাড়ী থাকে না, বাপ-মাকে
একটু ভয় করে না, নজা করে না। এখন-
কার সব অমনি হয়েছে গো, তা এখনকার
ছেলেদের কথা কি ধরতে আছে? শরৎবাবু
বা বলেছে বলেছে, তা সে কথা আমি কি
মুখে আনতে পারি, না কাউকে বলতে পারি?
কাউকে বলব না মা, তুমি কিছু ভেব না।”

কি তুই হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল।
বলা বাহুল্য যে, মুহুর্তের মধ্যে তারের সংবাদ
যেমন অগতের এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত
পর্যন্ত ভ্রমণ করে, বিন্দুর বাড়ীর কথা সেই
স্বাস্থ্যেতেই শ্বেইরণ ভবানীপুর, কালীঘাট,
কলিকাতা অতিক্রম করিল। পরদিন প্রাতে
টি টি পড়িয়া গেল।

দেবী-বাবুর মহিবা পরদিন পা ছড়াইয়া
তেল মাখিতে মাখিতে এই কলঙ্ক-কণা
গুলি একেবারে ভেক-দর্শনে সর্পের ভায়
কঁাস করিয়া উঠিলেন।

“ই্যা পা, তা হবে না কেন গা, তা হবে
না কেন? এখন আর ভদ্র-ইতরে বাছ-
বিচার নেই, বত ছোটলোক পাড়া-গাঁ থেকে
এসে কায়েত বলে পরিচয় দেয়, অমনি
কায়েত হয়ে যায়। ওদের চোদ্দ পুরুষে
কেউ কায়েতের সঙ্গে ক্রিয়া-কর্ম করেছে,
না কায়েতের মান রাখতে জানে? ওদের
সঙ্গে আবার খাওয়া-দাওয়া। মিলেয় ষটে ত
বুঝি নেই, তাই ওদের সঙ্গে চলা-করা করে।
যেব এখন আজ মিলেকে ছুঁকথা শুনিবে,

আপনার মান-মর্যাদা জানে না, ভারী
হোসে কর্ম হয়েছে, যার তার সঙ্গে চলা-
করা করে। ওগো, আমি তাই
বুঝেছি গো, তখনই বুঝেছি, এখন-ভবানী-
পুরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে
যার হয় না, ডেকে পাঠাতে হয়, তখনই
বুঝেছি, কেমন কায়েত! আর সেই
অবধি আর আসা হয়নি, জাঁক কত! ঐ
বিধবা ছুঁড়ীটাকে আবার পাড়ওয়ালা কাপড়
পরান হয়, কত আদর করা হয়। তা হবে
না? এ সব হবে না? যেমন জাত, তেমনি
আচরণ, হাড়ী-মুচিদের আর কি হবে?
ঐ যে মুচনমানদের বিধবার নিকে হয় না?
এ তাই লো তাই।”

শ্রামীর মা। (গৃহিণীর ব্যথার জন্য
বুকে ও হাতে ঘন ঘন তৈল মর্দন করিতে
করিতে) তা না ত কি বোন, ওরা আবার
কায়েত! কায়েত হ'লে বিধবাটাকে অম্নি
ক'রে রাখে? ও মা, ঐ ছুঁড়ীটা আবার
একাদশীর দিন জল-টল খায়, গায়ে তেল
মাখে, মাছ না হ'লে ভাত-খাওয়া হয় না,
ছি। ছি। ছি। এই আজ একাদশী, কে
বলুক দেখি, সকাল থেকে একটু জল-
গ্রহণ করেছে।

বামীর মা। (গৃহিণীর চুলে তেল মাখা-
ইতে মাথাইতে) সুছ তাই? আবার
গাড়ী ক'রে ঐ ছুঁড়ীটাকে বেড়াতে নিয়ে
বাওয়া হয়, শরৎ-বাবু আবার ছুঁড়ীটাকে না
কি রোজ রোজ দেখতে আসে। ছি। ছি।
লজ্জার কথা, লজ্জার কথা।

গৃহিণী। অমন মেয়েকেও থিক! মেয়ের
মাকেও থিক! অমন মেয়ে কি গর্ভে ধারণ
করে? অমন মেয়ে কখনো মুখে হুণ দিয়ে
মেয়ে ফেলতে হয়। বিধবা হয়েছে, তবু
লজ্জা নেই, মাথার কাপড় খুলে শরতের

সঙ্গে ছাদে বেড়ান হয়, শরতের অস্তে মিছ-
রীর পান্না করে পাঠান হয়। তা শরৎ-বাবুর
কি দোষ বল ? পুরুষের মন বৈ ত নয়,
তাতে আবার বিদ্বেষা হয় নি, দুটো বোনে
অমন করে ছেঁলে মানুষকে ভোলালে সে
আর ভুলবে না ? অমন মেয়ের মুখ দেখতে
আছে ? বেঁটা মার, বেঁটা মার।

এইরূপে গৃহিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণের
স্মৃষ্টি কণ্ঠধ্বনি ক্রমে সপ্তমে চড়িতে লাগিল।
বিন্দুর মা, বিন্দুর বাপ, বিন্দুর চতুর্দশ পুরুষ
অবধি যাবতীয় পুরুষ স্ত্রীর বিশেষ স্তুতিবাদ
করা হইল, রোষে গৃহিণীর বকের ব্যাথাটা
বড়ই বাড়িল, ঘন ঘন কবিরাজ আসিতে
লাগিল, সন্ধ্যার সময় বাবু আপিস হইতে
আসিয়া গৃহিণীর পীড়া দেখিতে আসিয়া,
যে রূপ মধুর আলাপ শ্রবণ করিলেন, মনুষ্য-
ভাণ্ডে সেরূপ কদাচ ঘটে।

গৃহিণীর গলার শব্দ শুনিয়া দ্বি-বোরা
পাতকোতলার জড়সড় হইয়া কানাকানি
করিতে লাগিল।

প্রথমা। কি লো, কি হয়েছে, অত
চোঁচাচোঁচি কেন ?

দ্বিতীয়া। ওলো, তা শুনিব্ নি, তবে
শুনেছি কি ?

প্রথমা। ওলো, কি লো কি ?

দ্বিতীয়া। ওলো, ঐ যে হেম বলে
পাড়ারী থেকে এসেছে, সেই তার স্ত্রী আর
শ্রালী আমাদের বাড়ী একদিন এসেছিল, তা
সেই শ্রালী না কি বিধবা, তার আবার শরৎ-
বাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে।

তৃতীয়া। দূর পোড়াকপালী ! তাও
কি হয় লো, বিধবার আবার বিয়ে হয় ?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন, ঐ যে
বিভাসাগর বলে বড় পণ্ডিত আছে, ঐ
বার সীতার বনবাস তুই সে দিন পড়ছিল,

ঐ সেই না কি বলেছে, বিধবার বিয়ে হয়।
সে না কি কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিয়েছে
চতুর্থা। সে ত বড় রসের সাগর লো,
বিধবার আবার বিয়ে দেয় ? তা বিধবা
যদি বুড়ী হয়, তবুও বিয়ে হয় ?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন ? ইচ্ছে
কবুলেই হয়।

চতুর্থা। তবে শ্রামীর মা আর বামীর
মা কি দোষ করেছেন, চুরি করে ছুটুক
খান, মাচটুক খান। তা বিভাসাগরকে
বলে বিয়ে কবুলেই হয়, আর কিছু লুকোতে
চুরোতে হয় না।

প্রথমা। চুপ্ কর লো চুপ্ কর, এখনই
শুনতে পেলো বোকে কাটিয়ে দিবে। তা
শরৎ-বাবু শুনেছি ভাল ছেলে, তিনি এমন
করেন কেন ?

দ্বিতীয়া। আর ভাল ছেলে, বলে, বার
সঙ্গে বার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা
ডোম। ভাল ছেলে হ'লে কি ভর, হুইফটে
মেয়েটি বেখেছে, মন ভুলে গেছে।

তৃতীয়া। হ্যাঁ দিদি, সে হেমবাবুর
শ্রালীর বরস কত গা ?

দ্বিতীয়া। বরস ১৩।১৪ বছর হয়েছে,
দেখতেও সুন্দর, হেসে হেসে শরৎ-বাবুর
সঙ্গে কথা কয়, মিছরীর পান্না খাওয়ার,
তার সঙ্গে না জানি কি খাওয়ার, তাতে আর
শরৎবাবু ভুলবে না ? হাজার হোক, পুরুষের
মন ত।

চতুর্থা। তবে শরৎ-বাবুর সঙ্গে সে
মেয়েটির অনেক দিনের আলাপ।

দ্বিতীয়া। তবে আর শুনছি কি,
এ রসের কথা বুঝি কি ? আলাপ সেই
পাড়ারী থেকে। কি জানি বাবু, সেখানে
কি হয়েছে, না ঝেনে শুনে পরের নিষা করা
ভাল নয়, কিন্তু কলুকেতার এসে বে ডলা-

নটা চলিয়েছে, তা আর ভাবানীপুত্র কে না জানে? ওলো, শরৎ-বাবু সেই মেরেটিকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে কত দিন রাখে, তার বোন আর হেমবাবুও সেই বাড়ীতে ছিলেন। হেমবাবু না কি গতিক মন্দ বুঝে আলাদা বাড়ী করুলেন। তা সেখানে অমনি রাধিকা বিরহ-বেদনার অচেতন হয়ে পড়লেন, নড়া করুলেন যে, ভারী জ্বর হয়েছে, আবার আমাদের কুষ্ঠাকুর সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ওলো, এ ঢের কথা লো! বলি, বিজ্ঞানম্বর পড়েছিল? এ তাই লো তাই। এখনকার ছেলেরা সব সুডঙ্গ কাটতে শিখেছে। দেখিস্ লো সাবধান।

চতুর্থা। দূর পোড়ারমুখী!

দাসী-মহলেও বড় হলহুল পড়িয়া গেল। বুড়ী স্বির কাছে শুনে নবীনা মিয়া সকাল থেকে বারান্দার, উঠানে, রান্নাঘরে কানাকাণি করিতেছে আর কিস কিস করিতেছে। একজন ভরলী নবীনা বলিল, “হ্যাঁ, এ কি সত্তি লা, সত্তি বিধবার বিয়ে হবে না কি?”

হুলাদী নবীনা উত্তর করিল, “তবে শুনিছিস্ কি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, পত্তর হয়ে গেছে, হেমবাবু সেকরাকে গয়না গড়াতে দিয়েছে, আর তুই এখনও হবে কি না, জিজ্ঞেস কর্চিস্?”

তত্বদী। তবে ত এটা চলন হয়ে যাবে।

ভদ্রর ঘরে হ'লে ত ছোট লোকের ঘরেও হবে?

হু। কেন লো, তোর আবার সখ গেছে না কি? এ কৈবর্ত ছোঁড়াটাকে বে কর্চি না কি? এ তোদের কেউ হয় না! এ যে কিস কিস ক'রে তোর সঙ্গে সখাই কথা কর।

ও। দূর পোড়ারমুখী! অমন কথা

আমাকে বলিসনি। তোর আপনার মনের কথা বল্চিস্? এ যে তোদের ভেতের সদানন্দ বেণে আছে না, তার সে দিনে বো ম'রে গেছে, আর এখন ভাত রে'ধে খেয়, এমন নোকটি নেই। তা মনে মশলা কেন-বার নড়া ক'রে যে ঘন ঘন তার দোকানে বাওয়া হয়, বলি, তার ঘর করুতে ইচ্ছে হয় না কি?

হু। তোর বুখে আঙন!

এইরূপে দুই জন নবীনা পরস্পরের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল, “কি লো, তোরা গালাগালি করিস্ কেন লো?”

হু। না গো, কিছু নয়, এই শরৎ-বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বলছিহু। ভদ্রর বাই করে, তাই সাজে গো, আর আমাদের সময় যত কলঙ্ক

বৃদ্ধা। তা এটা কি ভদ্ররের কাজ? এ ত মুচনমানের কাজ?

হু। তবে হেমবাবু এমন কাজ করেন কেন?

বৃদ্ধা। করেন, তার কারণ আছে। তোরা কি জান্চি বল? তোরা কানে তুলো দিয়ে থাকিস্, এ কথা'র কি জান্চি বল?

উভর নবীনা। কি কি, বল না দিদি, এর কথাটা কি?

বৃদ্ধা। বলি শুনিমনি বুঝি? হেমবাবুর যে এখন আর না বিয়ে দিয়ে পারেন না, সে কথা শুনিমনি বুঝি?

উভরে। না না, কি কি?

বৃদ্ধা। এই শুন্বি আর, কানে কানে বলি।

উভর নবীনা কাকর্ষ্য ফেলিয়া বৃদ্ধার কাছে দৌড়িয়া আসিল। বৃদ্ধা তাহাদের কানে কানে বলিল। সে শব্দটি তেতালা

পৰ্য্যন্ত ও বার-বাড়ী পৰ্য্যন্ত শুনা গেল—“বলি, শুনিমনি? হেব-বাবুর জালী যে পোরাডী।”

সত্যের আধিকার হইতে লাগিল, সত্য প্রচারিত হইতে লাগিল।

ভবানীপুর হইতে কালীবাট পৰ্য্যন্ত থবর গেল। কালীতারার তিন খুঁড়খাণ্ডী সে দিন একাদশী করিয়া রুক্মণ্যভাব হইয়া আছেন, তাঁহার এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে তেলে-বেগুণে জলিয়া গেলেন। বড়িট একটু ভাল-মাছুব, তিনি বলিলেন, “এখনকার কালে আর ধর্ম নাই, বাছ-বিচার নাই, বার বা ইচ্ছে, সে তাই করে। করুক গিরে বাবু, যে পাশ করবে, সেই নরক ভুগবে, আমাদের সে কথার কাজ কি?”

ছোটটি বলিলেন, “কি হয়েছে, কি হয়েছে? আমাদের বৌয়ের ভাই বিধবা-বিয়ে করবে? ও মা, কি যেমার কথা গো, হি! হি! হি! নোকের কি এখন মান সম্মম নেই, একটু লজ্জা নেই, বা ইচ্ছে, তাই করে? এ বে হাড়ী-ছোমেরাও এমন কাজ করে না, এ বে আমাদের কুলে কালী পড়ল, এ বে ছোট লোকের মেয়ে বিয়ে ক’রে আপনার কুলটা মজালেন। ও মা, হি! হি! হি! হি!”

মেজোটি একবার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া কালীতারাকে সোধোখন করিয়া বলিলেন, “ও পোড়ারমুখী, ও হারামজাদী, বলি হেলা, এই তোদের মনে ছিল লা? ওলো, গলায় দড়ী দেবার জন্তে কি একটা পরসামেলেনি লা? বলি, কলসী গলায় বেঁধে আদি গম্বায় ডুবে মরুলি নি কেন? মরু, মরু, মরু। আমাদের কুলে এই লাহনা! ওলো বাগদীর মেয়ে! বলি, খন্তরকুলটা একেবারে ভোবালি রে? তা রোস্ না, বিয়ে হোক্ না, তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। নোড়া দিয়ে তোর মুখ ভোঁতা ক’রে দেব না? তোর

পিটে মুকো খেঁরো ভাঙবো না? মাথার খোল ঢেলে তোকে কেঁটা মেয়ে যদি বের ক’রে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।”

কালীতার কাদিয়া কাদিয়া সারা হইল, সন্ধ্যার সময়ে বিন্দুকে চিঠি লিখিলেন, “বিন্দু দিদি, এ কি কথা, এ ত আমি শুনি নাই, এ অপযশ, এ নিন্দা, এ কলঙ্ক কি আমাদের কুলে? বিন্দু দিদি, এ কাজটি করিও না। শরৎ যদি পাগল হইয়া থাকে, তাহাকে তোমাদের বাড়ী ঢুকিতে দিও না। এ কাজ হইলে আমি বস্তুরবাড়ী মুখ দেখাইতে পারিব না, খাণ্ডীরা আমাকে আন্ত রাখিবে না, তোমার কালীতারাকে আর দেখিতে পাইবে না।”

কলিকাতার সে সংবাদ রটিল। বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমা লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, “বিন্দু, তোকে আর সুধাকে আমি পেটের ছেলের মত মনে করি, পেটের ছেলের মত মাছুব করোছি। বুড়ী জ্যেষ্ঠাই-মাকে এ বরসে খুন করিসনি, মল্লিকবংশ একবারে কলঙ্কে ডুবাসনি। বাছা বিন্দু, তোর জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, বাপ-মার কুল নরকে ডুবাসনি। বাপ-মা থাকলে কি এমন কাজটি করতিস্ বাছা?”

বিন্দুর মাথার বজ্রাঘাত পড়িল। বিন্দু দেখিলেন, যিকি বে একটি টাকা দিয়া ছিলেন, তাহাতে কোন কলহ হয় নাই কলঙ্ক জগৎ শুদ্ধ রটিয়াছে।

দাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুণ্য-বহনের সত্যমত।

হেমচন্দ্র বিদ্যুৎ মিকট লম্বত কথা অব-
গত হইয়া অস্বাভাবিক বড়ই ব্যথিত হই-
লেন। শরতের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও
অস্থা ছিল, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হইল না,
শরতের প্রভাবটি তিনি পাণ প্রস্তাব মনে
করিলেন না। তিনি শান্ত স্থিতিপ্রিয় লোক
ছিলেন, সমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য
করিয়া সকল বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশীয়দিগের
মনে ক্রোধ দেওয়া ভারসম্বত কার্য বিবেচনা
করিলেন না। বাহা হউক, তিনি এ বিষয়ে
অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক পরামর্শ লইয়া
বাহা হউক নিশ্চিন্ত করিবেন, এইরূপ স্থির
করিলেন।

ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরামর্শের অভাব
রহিল না। পরামর্শদাতৃগণ দলে দলে
আসিতে লাগিলেন, হিতৈষী বন্ধুগণ হিতকথা
বলিতে আসিতে লাগিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-
গণ শাস্ত্রীয় কথা বলিতে আসিলেন, সমাজ-
সংস্কারকগণ প্রকৃত সংস্কার কাহাকে বলে,
বুঝাইতে আসিলেন; সমাজ-সংরক্ষকগণ
বুঝাইতে আসিলেন। ভবানীপুরে তাঁহার এত
বন্ধু ছিল, যেমত প্রকৃষ্ট তাহা অনুভব করেন
নাই।

প্রথমে জনার্দন-বাবু, গোবর্দ্ধন-বাবু,
হরিহর-বাবু প্রভৃতি বৃদ্ধ সমাজপতিগণ
আসিয়া হেম-বাবুর সঙ্গে অনেককণ এমিক্
ওমিক্ কথাবার্তা করিতে লাগিলেন। হে-
বাবু অতি উচ্চ কার্য-সম্পন্ন, তাঁহার শিষ্টা-
চারে সকলেই তুষ্ট আছেন, তাঁহার সর্বদাই
হেমবাবুর তত্ত্ব লইয়া থাকেন ও হিত-
কামনা করেন, হেমবাবুর চাকরীর কি

হইল, তিনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়া
জান করিয়া চেষ্টা করেন না। কেন, তাঁহার
হেম-বাবুকে কোন কোন দায়েবের কাছে
লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি অনেক যেরূপ
কথার আপনাদিগের অকৃত্রিম দেহ (বাহার
পরিচয় হেমবাবু ইতিপূর্বে পান নাই)
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেককণ পর
শয়ৎ-বা র কথা উঠিল, হেমবাবুর স্বরের
কথাও উঠিল, জনার্দন-বাবু বলিলেন, “এখন-
কার কলেজের ছেলেরা সকলেই ঐরূপ,
তাঁহার রীতি-নীতি বুঝে না, পৈতৃক আচার
হুসারে চলে না, স্তত্রায় দোষ ঘটে। তা
তুমি বাবা বুদ্ধিমান্ ছেলে, তুমি কি আর
নিরীকোষের কাজ করবে, তা আমরা
স্বপ্নেও মনে করি না। তোমাকে সংপরাশ্রম
দেওয়াই বাহুল্য।”

গোবর্দ্ধন বাবু। তবে কি জান বাবা,
আমরা কয়েকজন বৃদ্ধা আছি, বতদিন না
মরি, তোমাদেরই হিতকামনা করি, দুটা
কথা না বললে নয়। শরৎটা লক্ষ্মীছাড়া
ছেলে, আমাদের কথা শুনে না, বা ইচ্ছে তাই
করে, তা ওটাকে আর বাড়ীতে আসতে
দিও না, তা হ'লেই এ কথাটা আর কেউ বড়
শুনতে পাবে না, কে আর কার কথা মনে
করে রাখে বল?

হরিহর বাবু। হাঁ, তা বৈ কি? এ যে
মিস্ত্রিজার বাড়ীতে সে দিন একটা কলঙ্ক
উঠিল, তোমরা সে কথা অবশ্যই জান, (এই
বলিয়া কলঙ্কটি আর একবার প্রকাশ করা
হইল) তা মিস্ত্রিজা বুদ্ধিমান্ লোক, চাপিয়া
গেলেন, এখন আর সে কথা কে তোলে বল?

জনার্দন বাবু। হাঁ, তা বৈ কি? কে বা
কার কথা মনে রাখে? আজকাল সকলেই
আপনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে কালে এক
রীতি ছিল, গ্রামের বৃদ্ধাদের কথাটি না

নিয়ে পাড়ার কোম কাজ হ'ত না। কেমন, লে না গোবর্দ্ধন-বাবু, এইসকালে আমাদের ভোজন হ'ত না নিয়ে কি কেউ কোন কাজ করতে পারত ?

গোবর্দ্ধন বাবু। সাধি কি ? আর এখনই যারা একটু শিষ্ট-শাস্ত্র, তাঁরা কোন্ আমাদের না জিজ্ঞাসা করে কিছু করেন। ঐ ঘোষজা মশাইয়ের বিধবা ভাদ্রবৌকে নিয়ে সে বৎসর এইরূপ একটা কলঙ্ক হ'ল, (সে কলঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল) তা ঘোষজা মশাই তখনই আমার কাছে এসে বল্লেন, “হরিহর বাবু, করি কি ? বাই যে ?” তা আমি বল্লেম, “যখন আমার কাছে এসেছ, তখন কিছু ভয় নেই, আমি এর একটা কিনারা ক'রে দিবই।” কি বল জনাৰ্দ্দন-বাবু, আমরা অনেক দেখেছি শুনেছি, বিপদ-আপদের সময় আমাদের জানালে আমরা কোন একটা উপায় ক'রে দিতে পারি।

জনাৰ্দ্দন বাবু। তা বৈ কি।

হরিহর বাবু। তা আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোষজাকে বলিলাম, “তোমার ভাদ্রবৌকে ৬কালীধামে পাঠাইয়া দাও।” তিনি সেই অহুসারে কার্য করিলেন। এখন কাহার সাধ্য সে কথা উত্থাপন করে ? তা বাবা, এখনকার কি ছেলেরা, কি মেয়েরা সকলেই খেচ্ছা-চারী হয়েছ, ঘর বা ইচ্ছা করে, তাতে তোমার দোষ কি বল ? তা একটি কাজ কর। তোমার শ্রাণীটিকেও ৬কালীধামে পাঠিয়ে দাও, সেখানে যা ইচ্ছা করবে, কে দেখতে বাজে বল ? তোমার কোন অপমণ হবে না।

হেম আর সন্ত করিতে পারিলেন না, কল্পিতভাবে বলিলেন, “মহাশয়, আপনাদিগের কথা ঠিক বৃত্তিতে পারি-তেছি না, শরৎ যে সমাজনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার মত

নাই; সে বিষয় পরে বিচার্য। কিন্তু আপ-নারা যদি শরৎ-বাবুর অথবা আমার শ্রাণীর চরিত্রের কোন দোষ ধরিয়াছে, এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে একেবারে দ্রব করিয়াছেন। তাহাদের নির্দল চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, তাহাদিগের অপেক্ষা নির্দোষ-চারিত্র লোক আমি জানি না।”

জনাৰ্দ্দন-বাবু, গোবর্দ্ধন-বাবু ও হরিহর-বাবু একত্রে বলিলেন, “না না, আমরা দোষের কথা বলি নাই, এমন কথাও কি লোকে বলে ?”

হরিহর বাবু। এমন কথাও কি লোকে বলে, ঘরে কিছু হলেও কি লোকে বলে ? তা নয়, তা নয়। ঘোষজা মশাই কি সে কথা বলেছিলেন, তা নয়, অত একটু কারণ দেখিয়ে পাপ কর্লেন। তা আমরাও তাই বলছি, তোমার শ্রাণীর চরিত্রে কোন দোষ থাকলেও সে কথা মুখে আনতে আছে ? রাম ! আমরা কি কারও কলঙ্কের কথা মুখে আনতে পারি ? তা নয়, তা নয়। তবে গোলমালটা এইরূপে চুকিয়ে ফেল-লেই ভাল। সকল বিষয়েই সরল পথ অব-লম্বন করাই ভাল, সরলপথেই ধর্ম।

জনাৰ্দ্দন বাবু। তা বৈ কি, তা বৈ কি, “বতো ধর্মন্ততো জয়ঃ” শাস্ত্রেই এ কথা আছে। হরিহর বাবু যে কথাটা বল্লেন, তাই সংপথ, তার কি আর সন্দেহ আছে ? তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, এবারটা যেন চেপে গেলে, কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, ঘরে অল্প-বয়স্ক বিধবা কি রাগতে আছে ? কখন কি হয়, তার ঠিক আছে ?

গোবর্দ্ধন বাবু। তা বৈ কি, শাস্ত্রে বলে, সহস্রাঙ্ক ইন্দ্রও নারীর গুণকথা দেখতে পান না, পঞ্চমুখ ব্রহ্মাও নারীর গুণকথা জানতে পারেন না। তুমি শুধু বাবা ছেলেমানুষ।

হরিহর বাবু। তা বৈকি, এবার কেন চাপিয়া গেলে, কিন্তু দৈবক্রমে—দৈবের কথা বলা যায় না—যদি যথাকালে তরুণ বরুণা বিধবা একটি লজ্জান প্রাপ্ত করে, তাহা হইলে কি আর চাপিবার যো থাকিবে? লোক ত একেই কলঙ্প্রিয়, তখন কি আর রক্ষা থাকিবে? এখনই লোকে সেই কথা বলিতেছে। তা কাকী-ধামে পাঠানই শ্রেয়ঃ।

ইত্যাদি নানা সারণ্ত পরামর্শ দিয়া বুদ্ধগণ বিদার হইলেন। হেমচন্দ্র যোষে ও অভিমানে উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহার অলস নরন হইতে একবিন্দু অশ্রু বিমোচন করিলেন।

তাহার পর রামলাল, ভ্রামলাল, বহুলাল প্রভৃতি নবোদয় দল হেমচন্দ্রকে পরামর্শায়ত দান করিতে আসিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ শিক্ষিত; কেহ এটাল ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরে বাড়ীতেই (রেমল্ডস প্রভৃতি) সাহিত্য আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইরাছেন; কেহ গল্পবিজ্ঞ; কেহ বা সভ্যতা-সম্মত আশ্রয়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখেন। কিন্তু পরামর্শদানে সকলেই সমান সক্ষম, সকলেই হেমচন্দ্রের “হিতৈষী” বহু।

তাহারা অত্য প্রাতে একটি কথা শুনিয়া হেমবাবুর নিকট আসিলেন, হেমবাবুর অবস্থা নিম্নার প্রতিবাদ করাই তাহাদের একান্ত ইচ্ছা, পাড়ার একজন বিজ্ঞোৎসাহী যুবক ও একজন ধর্মপরায়া বিধবার অবস্থা অপবাদ তাহারা সজ করিতে পারেন না, সেই জন্যই হেমবাবুর নিকট প্রকৃত অবস্থা জানিতে আসিলেন। কিন্তু হেমবাবুর যদি কোন কথা বলিতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহারা জানিতে ইচ্ছা করেন

না। কেন না, কাহারও গুণকথা অঙ্গসন্ধান করা সূচি-সম্মত কার্য নহে। কিন্তু যদি হেম-বাবুর বলিতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে—ইত্যাদি ইত্যাদি নব্য ভাবের গৌরচন্দ্রিককা অনেকগুলি চলিল।

হেম-বাবুর এখন আর লুকাইবার কিছুই নাই, বৈষ্ণব অপবাদ রাষ্ট্র হইরাছে, তাহাতে সভ্যকথা প্রকাশ হওয়াই ভাল। এই অনাহিত বহুদিগের আগমনে ও প্রবেশে তিনি অতিশয় তিক্ত হইলেও বৈষ্ণব অবলম্বন করিয়া বাহা ঘটনা, তাহা জানাইলেন।

রামলাল। তা বাহাই হউক, অত বে হোর অপবাদ শুনিলাম, তাহার অধিকাংশ মিথ্যা জানিয়া আক্লান্বিত হইলাম। কিন্তু দেখুন, সকলে সহজে এ অপবাদটি অবিবাহিত করিবেন না। আপনি সকল সময়ে বাটী থাকেন না, শরণ কলেভেই কিছু অব্যাহা ও গরী এবং স্বীয় মতগুলি লইয়া বড় স্পর্ধা করে এবং নারীর চরিত্র দুর্কিঞ্জের। অতএব অপবাদ-সম্বন্ধে সমাজের মনে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ এবং মহাব্যচরিত্র পর্যালোচনার ফল মাত্র। তা বাহা হউক, আপনি বিবাহে আপাততঃ মত করেন নাই, এটি সুখের বিষয়।

ভ্রামলাল। সে কথা যথার্থ, আরও দেখুন, এ কার্য প্রকৃত সমাজসংস্কার নহে। যে কার্যে আমাদের দিন দিন একসাধন হইবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হইবে, তাহাই আমাদের কর্তব্য। পুরাতন লোকদিগের স্ত্রীর আমাদের কোন প্রেজুডিস নাই, কিন্তু এ কার্যটি আমাদের সমাজে বিঘ্ন ও বিচ্ছেদ ঘটাইবে মাত্র, ইহা দ্বারা আমাদের একসাধন হইবে না, অতএব এ কার্য গর্হিত।

বহুলাল। আরও দেখুন, মেলবস

বলেন, লোকসংখ্যা বড় দীর্ঘ বুদ্ধি পায়, খাদ্য তত দীর্ঘ বুদ্ধি পায় না। এই জন্যই মূলতঃ দেশে অনেক পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকে; আমাদের দেশে সেটি হয় না, অতএব নিবেশন, বিধবাগুলিকে অবিবাহিতা রাখা কর্তব্য।

ভায়াল। আর আপনায় যত বুদ্ধিমান লোক এটিও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে, দেশের উন্নতি, ভারতের উন্নতি, আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য; তাহাও বিধবা-বিবাহ দ্বারা বিশেষরূপে সংঘটিত হইবে না। আমার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা বড় দূর দেশের উন্নতি হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি। একটি লাইব্রেরী স্থাপন করি-
য়াছি, দেশস্থ ব্যবসায়ী গ্রন্থকারদিগকে পুস্তকের জন্য পত্র লিখিয়াছি এবং প্রতি শনিবারে সেই লাইব্রেরীতে কয়েকজন বন্ধু সমবেত হন, রাজনৈতিক তর্কও করিয়া থাকেন। আপনায় যদি অবকাশ থাকে, তবে এই আগামী শনিবার আসিলে আমরা বড়ই খুশি হইব।

বহুলা। আরও দেখুন, আমাদের সংসারে যে কবিবর, যে মধুরমুখী আছে, আমাদের গৃহে গৃহে যে অমৃতটুকু জুড়ায়িত আছে, কি কাল কি ধনী সকল গৃহে যে অর্কিচরিত্রীয় মিষ্টমুখী আছে, ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সেটুকু কোথায়? বৈদেশিক আচরণ অঙ্গুরণ করিবেন না, তাহাতে আমাদের গৃহধর্ম লুপ্ত হইবে, ভারতবাসীর শেষ মূখটুকু বিলুপ্ত হইবে, আর্ব্য-ধর্মের নিভেজ দীপটি একেবারে নির্মল হইবে। ইউরোপীয়-দিগের সমস্তগুলি অঙ্গুরণ করুন, আমাদের গৃহ-সংসারের কবিত্ব, মিষ্টমুখী ও হিন্দুধর্মটুকু ধ্বংস করিবেন না।

হায়লা। সে কথা সত্য। বহুবাহুর কথাগুলি শুনিবেন, তাহার দ্বারা বিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞেরা লোক আজকাল দেখা যায় না। তাহার কথাগুলি সারগর্ভ, তাহা আর আমার বলা বাহুল্য। আর যে অপবাদ শুনিলাম, তাহা যদি সত্য হয়—বাহা অনেকে বিশ্বাস করিবে, যদিও সে বিষয়ে আমার নিজের যত সমস্ত প্রমাণাদি না দেখিয়া ব্যক্ত করিতে চাহি না—যদি সে অপবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ বৃক ও এইরূপ রমণীকে উৎসাহিত করিলে ভারতের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, অধোগতি হইবে।

হেমচন্দ্র এরূপ তর্কের উত্তর করিতেও স্থণা বোধ করিলেন; নব্য পরামর্শদাতৃগণ কণেক পর উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর সমাজ-সংস্কারের দুই একজন চাই, দিগ্গজ ঠাকুরকে লইয়া হেম-বাবুর বাটা আসিলেন। দিগ্গজ ঠাকুর ভবানীপুরের মধ্যে হিন্দুধর্মের একটি আক্টল নী মহামেট, ধর্মশাস্ত্রের একটি পেসিকিক সমুদ্র, বিজ্ঞান একটি শুণ্ডারী দিগ্গজ, তর্কে বহুবাহু অবতার। বেদ-বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, রাশি, ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান, সকলই তাহার কর্তৃত্ব, সকল বিষয়েই তাহার সমান অধিকার। তিনি আপন পরিমাণবহিত বিজ্ঞা-পন্থা হইতে অজস্র তর্কশ্রোত বর্ষণ করিয়া হেম-চন্দ্রকে একেবারে প্রাবিত করিলেন, হেম-চন্দ্র একেবারে নিরস্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন দিগ্গজ ঠাকুরের গলা জাঙ্গী গেল, বাক্য-ক্ষমতা শেষ হইল, (তর্কক্ষমতা শেষ হইবার নহে) তখন তিনি কাসিতে কাসিতে আরক্ত নরনে নিরস্ত হইলেন।

হেম তখন বীরে বীরে উত্তর করিলেন, “মহাশয়, এ কার্য করিতে এখনও আমার

মত নাই, সুতরাং আপনার একপে এইরূপ পরিভ্রম স্বীকার করার বিশেষ আবশ্যক নাই। তবে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও গড়া-শনার বড়দর উপলব্ধি হয়, তাহাতে বোধ হয়, বিধবা-বিবাহ লব্ধকে আবাদিগের শাস্ত্রেও স্থিতি মত আছে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রথা ছিল। বৈদিক কালে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, মহু প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রণেতাদিগের কালে এ প্রথাটি একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ক্রমে উঠিয়া বাইতে-ছিল। পরে পৌরাণিক কালে এ প্রথাটি একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। আমার শাস্ত্রে অধিকার নাই, আলোচনারও ক্ষমতা নাই, অত পণ্ডিতদিগের মধ্যে বাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। শুনিয়াছি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাগণ্য বিজ্ঞানাগর মহাশয়ও বলেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রের অন্তর্গত নহে।”

বাহারা দ্বি-প্রহর রজনীতে সহসা একটু গ্রামে আগুন লাগিতে দেখিয়াছেন, আকাশের রক্তবর্ণ দেখিয়াছেন, অগ্নির প্রজ্বলিত অললেহী জিহ্বা দেখিয়াছেন, তাহারাই তৎকালে দিগ্‌গজ ঠাকুরের মুখের ভঙ্গী কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। অগ্নি-গর্জন-বিনিমিত-স্বরে তিনি কহিলেন, “সেই (কাসি) সেই বিধবা-বিবাহ-প্রচারক বিজ্ঞানাগর পণ্ডিত ? সে আবার পণ্ডিত ? সে বর্ণপরিচয় লিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছে, (অধিক কাসি) একটা নৃতক প্রথা লইয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছে, ধর্মে কুঠারাবাত করিয়াছে, মহু-ব্রহ্মের স্তরে স্তরে শেল নিক্ষেপ করিয়াছে, হিন্দু-চরিত্র অনগেনের কলঙ্করাশিতে আবৃত করিয়াছে, আর্ধ্যমান, আর্ধ্যগৌরব, আর্ধ্য রীতিনীতি একেবারে সূক্ষ্মবন্ধে ময় করিয়াছে, (ভরানক কাসি) উঃ, (কাসি) সে পণ্ডিত ? সেই অধর্মবিষেবী

য়েচ্ছদিগের অহঙ্করণকারী, বিদেশীর রীতির পক্ষপাতী, আর্ধ্যধর্মশূন্য, আর্ধ্য অভিমানেশূন্য, আর্ধ্যবংশের কুসন্তান—(অনবরত কাসিতে বাক্যস্রোত সহসা ক্রুদ্ধ হইল। তখন আসন পরিত্যাগ করিয়া) চক্ক হে সংরক্ষক মহাশয়, এ বাড়ীতে আর থাকা নহে, এখানে পদবিক্ষেপ করিলেও পাপ আছে। বাহা শুনিয়াছিলাম, সমস্তই সত্য বটে, সে গর্ভবতী, যদি গর্ভ নষ্ট করে, তোমরা পুলিশে সংবাদ দিও।”

হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন না, দিগ্‌গজ ঠাকুরের কোপ ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার একটু হাসি আসিল।

সে দিন সমস্ত দিন হেমচন্দ্রের পরামর্শের অভাব রহিল না। তাঁহার এত বন্ধু আছে, এত হিতৈষী আছে, এত পরামর্শদাতা আছে, তাহা পীড়ার সময়, কষ্টের সময়, দারিদ্র্যের সময়, হেমচন্দ্র, অনুভব করেন নাই।

কলিকাতা হইতে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হইল। ধনঞ্জয়-বাবুর বাগানে সুসভ্য সভা হইয়াছে, গীত, নৃত্য, সঙ্গীত দিবার ভায় বাড়ের আলোক সে লভাকে রঞ্জিত করিতেছে। তথায় দরিদ্রের এই কথাটি উঠিল।

ধনঞ্জয়-বাবু স্থানীয় কলঙ্ক সর্বদা আর কোন উপহাস করিলেন না, একটু হাসিলেন; কিন্তু অস্ত্রান্ত ধার্মিকগণ এ ধর্মবহির্ভূত কার্যের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, হিন্দুধর্মের মূল স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্কর-বাবু একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সুখাপাজ পড়িয়া শত খণ্ড হইয়া পেল, বলিলেন, “হী ধর্ম ! তোমাকে কি সকলেই বিশ্বাস হইল ? ভক্তলোকের ঘরে কি অধর্ম-আচরণ ! হিন্দুমানী আর বুদ্ধি

থাকে না।" শিক্ষিত বহুনাথের হস্ত হইতে কাঁটা-ছুরি পড়িয়া গেল, সম্মুখের গোজিহ্বা অনাবাদিত রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর সুখি ভ্রাশনালিটি থাকে না।" বিধব-বাবু, সিন্ধেশ্বর-বাবু, গিন্ধেশ্বর-বা প্রভৃতি বনিয়ারী ধনাঢ্যগণ নিজ নিজ আসনে কণ্ঠিত হইলেন, এই ঘোর অধর্ম-কর্মের নাম শুনিয়া তাঁহারা বাকশক্তি-রহিত হইলেন এবং তাঁহাদের কালের লোকের ধর্মাহতানের কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া এখনকার কলেজের ছেলেদের খেচ্ছাচারিতার ভূয়োভয়ঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার "মিষ্টর কর্ণ-কার"ও তাঁহার সারগর্ভ মত প্রকাশ করিলেন যে, "এরূপ বিবাহ পাশ্চাত্য সভ্যতার অমুমোদিত নহে, এ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবা বাহির হইয়া আসুক, জগৎ পরিদর্শন করুক, সুন্দর্য্য সুরূপ যুবক-দ্বিগের সহিত আলাপ করুক, (দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন) তৎপর দীর্ঘ কোর্টসিপের পর একজনকে নির্বাচন করুক, এইরূপ কার্য্য পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রথা; পিঞ্জরবদ্ধ বিধবাকে বিবাহ দেওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অবমাননা মাত্র।"

এই সারগর্ভ ভ্রমগ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া সভার সভ্যগণ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁহারা ত জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সুরূপ-সম্পন্ন যুবকদ্বিগের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের একটি করিয়া পাশ্চাত্য সভ্য (অর্থাৎ সুন্দর বর) মিলে না কেন? তাঁহাদের একটি করিয়া বিবাহ ঘটে না কেন?" সভ্য ও সভ্যাগিগের মধ্যে এ রসের কথাটা সুধার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গড়াইল, কিন্তু পাঠকগণ আমাদিগকে

যাচনা করিবেন, আমরা সে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

বিধবজগতের পরামর্শ, যতামত, বিক্রম ও দোষারোপ হেমচন্দ্রের কানে উঠিল। সম্ভার সময় হেম-বাবু বিন্দুর নিকট গিয়া বলিলেন, "সমাজ একমত হইয়া এই বিধবা-বিবাহ নিবারণ করিতেছে, এ কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বাঁহাদের বিজ্ঞা আছে, বাঁহাদের বিজ্ঞা নাই, বাঁহারা সংলোক। বাঁহারা সংলোক নহে, বাঁহাদের প্রজ্ঞা করি এবং বাঁহাদের প্রজ্ঞা করি না, সকলে একমত হইয়া এ কার্য্য নিষেধ করিতেছেন।"

বিন্দু। আর তা ছাড়া এ কাজে কলঙ্ক কত, নিন্দা কত! এ কাজ কবুলে সমাজে আমাদের অভিশপ্ত নিন্দা হবে।

হে। না, তাহার বড় ভয় নাই। সমাজ অগ্রগ্রহ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক বিখ্যাস করিতেছেন ও রটাইতেছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধবা-বিবাহে প্রকৃত অধর্ম নাই, আমাদিগের হিতৈষণা বিশেষ অগ্রগ্রহ করিয়া শরতের চরিত্র ও সরলা বালিকার চরিত্র-সম্বন্ধে যার পর নাই অধর্ম-সূচক প্রবাদ প্রকটত করিতেছেন, এক্ষণে সেই অধর্ম্মাচরণ গোপন করিয়া রাখিলেই সমাজের মতে ধর্ম্মরক্ষা হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

যার বে তার মনে আছে ।

সুধার বিবাহের কথা গুহীয়া পাড়াপড়গৌর ঘুম নাই, চল, একবার সেই সুধাকে দেখিয়া আসি। সূত্র গৃহের অভ্যন্তরে সেই সময়

বালিকা কি করিতেছিল, চল, একবার তাহা দেখিয়া আসি।

সুধার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার সমস্ত যত্ন বুঝা হইল। যে কথা লইয়া পাড়ার এত আন্দোলন, মেয়েমহলে এত আন্দোলন, সে কথা গোপন থাকে না। যে বাড়ীতে যি আছে, সে বাড়ীতে সংবাদপত্রেরও অনাবশ্যক।

তবে যি বিদ্যুর নিবেদনবাক্যের এইটুকু মান রাখিল যে, সুধাকে সব কথা ভাবিয়া বলিল না, সুধার চরিত্র-সম্বন্ধে যে কলঙ্ক উঠিয়াছিল, সেটুকু বলিল না। তবে শরৎ-বাবু যে সুধাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীর নিকট সেই বিবাহের জন্য জ্ঞেপ করিতেছেন, পাড়ার পাড়ার এই কথা রাষ্ট হইয়াছে, তাহা সুধাকে গোপনে অবগত করাইল।

বালিকা একেবারে শিহরিয়া লজ্জার অভিভূত হইল, বাতনার অস্থির হইল। উঃ, এ কি সর্বনাশের কথা, কি অধর্মের কথা, এ কথা কেন উঠিল, সুধা লোকের কাছে কেমন করিয়া আর এ মুখ দেখাইবে? কালী দিদির কাছে, শরতের মাতার কাছে, দেবী-বাবুর বাড়ীতে, চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? হতভাগিনী আবার তালপুকুরে কোন মুখে কিরিয়া বাইবে? ছি ছি! শরৎবাবু এমন কাজ কেন করুনেন, বিধবার নাম কেন লজ্জার ডুবালেন, এ কলঙ্ক কি আর কখনও বাবে? ঐ পথে মেয়েমাতৃহেরা কি বলিতে বলিতে বাই-তেছে? তাহারা বুঝি সুধার কলঙ্কের কথা কহিতেছে! ঐ হেম-বাবু দিদির সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন? লজ্জার, বিবাহে, মনের বাতনার, বালিকা অধীর হইল, মুখ ফুটিয়া রে কথা কাতাকাতক ভিত্তিতে পারে না।

বালিশে মুখ লুকাইয়া সমস্ত দুই প্রহর বেলা একাকিনী কাঁদিল, সন্ধ্যার সময় না খাইয়া শুইতে গেল। উঃ, শরৎ-বাবু কেন এমন কাজ করিলেন? দরিদ্র বিধবার কেন কলঙ্ক রটাইলেন?

কিন্তু অন্ধকারে হৃদপিণ্ড লতা বেরূপ সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া একটি সূর্য্য-রশ্মির দিকে ধায়, অভাগিনী সুধার শুষ্ক অন্তঃকরণ সেইরূপ এই বাতনার ও লজ্জার জীবনের একটি আশা-রশ্মির দিকে ধাবিত হইল। বিবাহে অন্ধকারের মধ্যে সুধা যেন একটি কিরণছটা দেখিতে পাইল, অকুল সমুদ্রের মধ্যে যেন ধ্রুব-নক্ষত্রের হীন জ্যোতি তাহার নরনে পতিত হইল।

শরৎ-বাবু কেন এমন কাজ করিলেন? বোধ হয় শরৎ-বাবু না আসিলে সুধা যেমন পথ চাহিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় একাকিনী বসিয়া শরৎ-বাবুর কথা ভাবে, শরৎ-বাবুও সেইরূপ সুধার কথা একবার মনে করেন। বোধ হয়, দিন-রাত্রি শরৎ-বাবু এই লজ্জার কথা ভাবেন, বোধ হয়, সেই জন্যই অস্থির হইয়া শরৎ-বাবু এই লজ্জার কথা প্রস্তাব করিয়াছেন। বোধ হয়, শরৎ-বাবু অনেক বাতনা পাইয়াছেন, না হইলে কি দিদির কাছে মুখ ফুটিয়া এমন কথাও বলিতে পারেন? যি বলে, শরৎ-বাবু বড় কাঁদিল হইয়া গিয়াছেন, অভাগিনী সুধার জন্য শরৎ-বাবু এত কষ্ট পাইয়াছেন। সুধার ইচ্ছা করে, একবার শরৎ-বাবুর পা ছুঁয়া দ্বন্দ্রে ধারণ করে। তা কি হবে? বিবাহা কি দরিদ্র সুধার কপালে এত সুখ লিখিয়াছেন? শরৎ-বাবু বাহা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কি হইতে পারে? উঃ, লজ্জার কথা, পাপের কথা, সুধা, এ কথা মনে স্থান দিও না।

ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে এক বিদ্যুৎ অশ্রু

বাহির হইয়া পড়িল। ছোট ছোট দুটি হস্ত দিয়া সেই চক্ষু মুছিয়া কেলিয়া সুখ আবার ভাবিতে লাগিল,—“আচ্ছা, শরৎ-বাবু বাহা বলিয়াছেন, সত্য সত্যই যদি তাহা হয়? দরিদ্র সুখা যদি সত্য সত্যই শরৎ-বাবুর গৃহিণী হয়? তাহা হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই ভালপুকুরে শরৎ-বাবুর বাড়ীটি পরিষ্কার করিবে, উঠান ঝাঁট দিবে, বাসন মাজিবে, কামরনে শরৎ-বাবুর মাতাকে সেবা করিবে, আর বহুশ্বে শরৎ-বাবুর ভাত রান্না দিয়া খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিবে। অপরাহ্নে আক ছাড়াইয়া দিবে,বেলের পান্না প্রস্তুত করিয়া দিবে, আর বহুশ্বে মিছরীর পান্নার বাটি শরৎ-বাবুর মুখের কাছে ধরিবে।” সহসা একটি পদশব্দ হইল, সুখা শিহরিয়া উঠিল, লজ্জার মুখ লুকাইল, পাছে তাহার হৃদয়ের চিন্তা কেহ টের পায়, পানীয়সীর পাপচিন্তা পাছে কেহ জানিতে পারে।

আর যদি শরৎ-বাবুর বিদেশে কোথায় চাকরী হয়? সুখা দাসীর স্তায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহার যত্ন করিবে, একটি কুড় কুটীরে তাহার বাস করিবে, সুখা সেই কুটীরে দুটি লাউগাছ দিবে, দুটি কুমড়াগাছ দিবে, দুই চারিটি কুলের গাছ বহুশ্বে রোপণ করিবে। কলিকাতার ঠাকুরদের সুন্দর সুন্দর ছবি চার পরশা করিয়া পাওয়া যায়, সুখা তাই কিনিয়া শুইবার ঘরটি সাজাইবে। উমা সিংহে চড়িয়া বাগের বাড়ী আসিয়াছে, উমার মাতা দুই হাত প্রসারিত করিয়া আলুধালু-বেশে মেরেকে একবার কোলে করিতে আসিয়াছে, দাসীগণ কেহ পাখা হাতে, কেহ খাখা হাতে, কেহ কুলের মালা হাতে করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছে। অথবা অন্ধকার জল্লের মধ্যে পতিপ্রাণা দমরুদী নিম্নিত রহিয়াছে, নল

রাজা উঠিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছে। অথবা কুঞ্জবনে রাধিকা গীলে হাত দিয়া ভাবিতেছে, বিদেশিনী তাহার নিকট বসিয়া ক্লেশের কথা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধিকার হৃদে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। এরূপ ঠাকুরের ছবিগুলি দিয়া সুখা ঘরটি সাজাইবে, ভাল করিয়া ঝাঁট দিয়া ঘরটি পরিষ্কার করিবে, আপন হস্তে শয্যা প্রস্তুত করিবে, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালাইয়া শরৎ-বাবু আসিতেছেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিবে। শরৎ-বাবু বাড়ী আসিলে সুখা জল আনিয়া আপন হস্তে শরতের পা ধুইয়া দিবে, সেই পা দুখানি ধারণ করিয়া সাজ্জনরনে একবার বলিবে, “তোমার দয়া, তোমার যত্ন, কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? আমার জীবনসর্ব্ব তোমারই, দরিদ্র বলিয়া একটু স্নেহ করিও।”

চিন্তা একবার আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না। প্রাতঃকালে সুখা গৃহকর্মা করিতে করিতে এই চিন্তা করিত, দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত দিন জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিত; সন্ধ্যার সময় বিলুপ্ত হেম-বাবু একত্র বসিয়া বথন কথাবার্তা কহিতেন, সুখাও তাঁহাদের কাছে বসিত, কিন্তু তাহার মন কোথায় বিচরণ করিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিলুপ্ত দেখিলেন, সুখা সমস্ত জানিতে পারিয়াছে, সুখা দিবা-রাত্রি চিন্তাশীল! সুখা আর প্রফুল্ল বালিকা নহে, বোবন-প্রায়শ্বে বোবনের বগ্ন তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়াছে। সুখা সমস্ত দিন অন্তঃকলঙ্ক; কখন কদাচ শরতের নামটি হইলেই সুখার দুখখানি লজ্জার রঞ্জিত হইত, বালিকা অন্তঃকলঙ্কে উঠিয়া বাইত।

একদিন অপরাহ্নে বিলুপ্ত ঘরে আসিয়া দেখিলেন, সুখা জানালার কাছে বসিয়া

একখানি বৈ পড়িতেছে, দিদি আসিতেই
সুখা সেই বইখানি খুঁজিল।

বিন্দু। ও কি বৈ পড়ছিলে বোন?

একটু লজ্জিত হইয়া সুখা বলিল, “ও
বন্ধিম বাবুর একখানা বই।”

বিন্দু। কি বই?

সুখা। বিবন্ধু।

বিন্দু সুখ গভীর হইল। তিনি ধীরে
ধীরে বলিলেন, “ও বই আমাকে দাও, উহা
পড়িও না।”

সুখা দিদির হাতে বৈখানি দিয়া আন্তে
আন্তে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন পড়িব না
দিদি? ও কি খারাপ বই?”

বিন্দু। না বোন, বইখানি ভাল, কিন্তু
ছেলেমানুষে কি ও বই পড়ে?

সুখা। তবে দিদি, তুমি আমাকে গল্পটি
বলিও।

বিন্দু। গল্প আর কি, বগেজের সঙ্গে
কুন্দের বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখ
হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।

ওক-কদমের সুখা স্থানান্তরে গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ালী।

ভারতবর্ষের দেওয়ালী একটি বড় সুন্দর
প্রথা। এই কালী-পূজার অঙ্গকার নিম্নে
ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত
যেখানে হিন্দু বাস করে, সেইখানেই গ্রাম,
নগর ও সংসারীর গৃহ দীপাবলীতে উদ্ভাস
হয়। সে দিন অমাবস্তার অঙ্গকার-রাজি
আলোকে পরিপূর্ণ হয়, আকাশের নির্মল
অঙ্গারসমস্ত নিস্তন্ধে অগভীর নক্ষত্র দেখিয়া

হাস্ত করে। ধনীর গৃহ উজ্জ্বল আলোক-
শ্রেণীতে পরিপূর্ণ হয়, দরিদ্র গৃহিণী একটি
পরসার তেল কিনিয়া কোন প্রকারে পাঁচটি
প্রদীপ লাগাইয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীরবারে
জালাইয়া দেয়।

কলিকাতার আজ বড় ধুম। গৃহে গৃহে
তুবড়ী উজ্জ্বল অগ্নি-কণা উসীরণ করিতেছে,
যেন আমাদের টাউন হলের লক্ষ্য-
দিগকে অন্ধকরণ করিতেছে, সেইরূপ গলার
আওয়াজের সহিত তাহাদের কার্য শেষ
হয়। সুখা যশোলিন্দু দিগের ভায় হাউইবাজি
আকাশের দিকে যহা ভেজে উঠিতেছে,
আবার তেজটুকু বাহির হইয়া গেলে হেঁট-
মুখ হইয়া ঝাটিতে পড়িতেছে; যাহার মাথার
পড়ে, তাহার সর্বনাশ। বঙ্গদেশের
অসংখ্য নব্য কবির ভায় আজি রাত্রিতে
অসংখ্য পটকা শব্দ করিতেছে—একই আও-
রাজে তাহাদের উদ্ভম শেষ—কেন না, প্রথম
প্রকাশিত পদ্মকুসুম বা গীতিকাখ্যাটি বিক্রয়
হইল না। বিবস্তীর ভায় চরকিবাজী বৃথা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতেও
সকলকে জালাইতেছে, মেজাজ বড় গরম
কেহ কাছে বাইতে পারে না। আর ছুঁচা-
বাজির ক্ষুদ্র ঘণিত জীবন ছুঁচামি করিয়াই
শেষ হইল; কুটিলতা! ভিন্ন সরল গতি
তাহারা জানে না, পরকে বিরক্ত করা, পর-
নিন্দা, পরহিংসা, পরমানি তাহাদের জীব-
কার উপায়।

রাজি দশটার পর শরচ্চন্দ্র হেমের
বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর সহিত
লেকা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন,
স্বয়ং হেমচন্দ্র দ্বারদেশে তাঁহাকে প্রতীক্ষা
করিতেছেন। হেমচন্দ্র নিস্তন্ধে শরতের হাত
ধরিয়া বাহিরের দরে লইয়া গেলেন, শরৎ
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কাঁপিতে, কাঁপিতে হেমের

সহিত সেই ঘরে গিয়া বসিলেন, মুখ নত করিয়া রহিলেন, বাক্যক্ষুণ্ণ হইল না।

হেম প্রদীপের সলতে উসকাইয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ, আমার ব্রীকে ছুমি যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা ভুলিয়াছি।”

শরৎ অনেক কষ্ট করিয়া অশ্রুটবরে বলিলেন, “বদি আমি দোষ করিয়া থাকি, আপনাদের বালা-স্বহৃদের এই একটি দোষ কমা করুন।”

হেম। শরৎ, তুমি দোষ কর নাই, তোমার উন্নত চরিত্রের উপযুক্ত কার্য করিয়াছ। সমস্ত জগৎ যদি তোমাকে নিন্দা করে, জানিও, তোমার প্রতি আমার মন তিলাঙ্কিত বিচলিত হয় নাই।

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুর জল স্বহৃদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিলেন।

হেম। আমার স্ত্রী বালাকাল অবধি তোমাকে বড় ভালবাসেন, ভ্রাতার মত স্নেহ করেন, তিনিও তোমার কথার দোষ গ্রহণ করেন নাই। তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি, আমাদের স্নেহ চিরকাল একরূপ থাকিবে।

শরৎ। আপনাদের এই দয়া আমি এ জীবনে ভুলিব না।

কণেক উত্তরে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে অনেক কষ্টের সহিত শরৎ স্বহৃদের উৎসেগ দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার প্রস্তাব-সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিয়াছেন?” বাস রুদ্ধ করিয়া শরৎ উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তাহার জীবনের সুখ বা দুঃখ এই উত্তরে নির্ভর করে।

হেম। সেই কথা বলিতেছি। তুমি

সকল দিক্ দেখিয়া, সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবটি করিয়াছ?

শরৎ। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বতসুর বুদ্ধিতে পারি, ইহাতে কোন পক্ষে কোন কতি দেখিতে পাই না। বতসুর আমার সাধ্য, আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই এ প্রস্তাবটি করিয়াছি।

হেম। শরৎ, ছুমি শিক্ষিত, কিন্তু তোমার বচন অল্প, এই জন্যই আমি দুই একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এ বিবাহে অতি-শয় লোক-নিন্দা।

শরৎ। অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছি, জীবনে অনেক নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কাজটি যদি অন্ত্যায় না হয়, তবে নিন্দা-তরে আমি জীবনের সুখ বিসর্জন করিব?

হেম। তোমাদের একঘরে করিবে।

শরৎ। সমাজের যদি তাহাতেই ক্রটি হয়, তাহাই তরুন। আমি সমাজের অঙ্গ-গ্রহের প্রার্থী নহি।

হেম। তোমাদের নিষ্কল কুলে কলক হইবে।

শরৎ। কলক কি? আমি বিধবাবিবাহ করিয়াছি, এই কথা? এটি যদি পাপকার্য না হয়, তবে সে কলক আমার গারে লাগিবে না; বাহার নিন্দা করিবেন, তাঁহাদের মতামতে আমার কতিবুদ্ধি নাই। আর যদি আপনি এ কাজ নিন্দনীর মনে করেন, আজ্ঞা করুন, আমি ইহাতে নিরস্ত হই।

হেম। বিধবা-বিবাহ বোঝ হয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আধুনিক রীতিবিরুদ্ধ।

শরৎ। জিৎশং বৎসর পূর্বে সমাজগমনও রীতিবিরুদ্ধ ছিল, অতঃপরে করিয়া

সহস্র সহস্র বাড়ী অগ্নিগর্ভ হইতেছে । চন্দ্র-নাথ-বাবু সে দিন বলিলেন, অস্বাভাবিক নিয়মগুলির ক্রমশঃ সংস্কার হওয়াই জীবিত সমাজের লক্ষণ । ক্রমশঃ উন্নতিই জীবনের চিহ্ন, গতিহীনতা মৃত্যুর চিহ্ন ।

হেম । শরৎ, তুমি চিন্তাশীল, তুমি উদার-চরিত্র, একটি কথা আমি পাষ্ট করিয়া বলি, বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমার প্রকৃত মতটি আমাকে বলিও । দেখ, দ্বন্দ্বের উষ্মেগ চিরকাল সমান থাকে না, অল্প বে প্রথম আমাদের গৃহে উদ্ভাস প্রায় করে, দুই বৎসর পর সেটি হ্রাস পায় অথবা আমরা সেটি একেবারে ভুলিয়া যাই । সুখের প্রতি তোমার এরূপ প্রথম চিরকাল না থাকিতে পারে, তখন তোমার মনে কি একটু আক্ষেপ উদয় হইবে না? উত্তর করিও না, আমি বাহা বলিতেছি, আগে মন দিয়া শুন । তখনও তোমরা একঘরে হইয়া থাকিবে, বন্ধুগণ তোমাদের গৃহে আহাৰ্য্য করিবে না, তোমার কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না, তোমার পুত্রকে কেহ গৃহে ডাকিবে না, সমাজের মধ্যে তোমরা একক । তখন হয় ত মনে উদয় হইবে, কেন বাল্য-কালে না বুঝিয়া একটি কাজ করিয়া এত বিপদ জড়াইলাম, আমার মেহের পাত্র, ভালবাসার পাত্র পুত্র-কন্যাকে জগতে অনুর্থী করিলাম । শরৎ, যে কাজে এই ফল সম্ভব, সে কাজে কি সহসা হস্তক্ষেপ করা বিধেয়? যৌবনের সময় একটু বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বার্ত্তক্যের অল্পশোচনা দূর করা উচিত নহে? সুখের দ্বার অনিচ্ছনীর, রূপ-বর্তী, অদ্রোদশবর্ষীয়া, সরলহৃদয়া অনেক বালিকা কারাগৃহে আছে, তোমার ভ্রাতা জামাতা পাইলে তাহাদের পিতা-মাতা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন, সেরূপ

বিবাহ করিলে এখন না হউক, কালে তুমিও সুখী হইবে । শরৎ, তুমি বুদ্ধিমান, বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, এখনকার লালসার বশ-বর্তী না হইয়া বাহাতে জীবনে সুখী হইবে, তাহাই কর ।

শরৎ । হেম-বাবু, আমার কথার বিবাস্ত ককন, আমি কেবল দ্বন্দ্বের উষ্মেগের বশ-বর্তী হইয়া এই প্রস্তাব করি নাই, জীবনে সুখী হইব, সেই আশার প্রস্তাব করিয়াছি । আপনি যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা শতবার আমার মনে উদয় হইয়াছে, আলোচনা করিতে ক্রটি করি নাই । আক্ষেপের বিষয়, বাহা বলিতেছেন, যদি বিধবাবিবাহ নিষ্পন্নীয় কার্য্য হয়, তবে আক্ষেপ হইবে বটে, যদি তাহা না হয়, তবে তদ্ব্যতীত কখনই আমার দ্বন্দ্বের আক্ষেপ উদয় হইবে না । বলুন, এই বিস্তীর্ণ সমাজে কোন্‌ বিজ্ঞ লোক সংকার্য্য করিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অনেকে জাতি হারাইয়া-ছেন, বিদেশগমন করিয়া অনেকের জাতি গিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌ তেজস্বী লোক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? সমাজের সংস্কার-পথে তাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগের বার্ত্তক্যে শাস্তি দান করে । হেম-বাবু, তাঁহারা সমাজের বহির্ভূত নহেন, সমাজ অল্প তাঁহাদিগকে ডাক্তি করে, সমাদর করে, স্নেহ করে, কল্যা তাঁহাদিগকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবে । এইরূপে সমাজসংস্কার সিদ্ধ হয়, এইরূপে জীবিত সমাজ হইতে অনিষ্টকর নিবেশগুলি একে একে খলিত হয় ।

হেম-বাবু, পরে আক্ষেপ হইবে, এরূপ কাজ করিতেছি না, চিরকাল সুখে থাকিব, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় চিরকাল জ্ঞানগিনি

স্বথাকে স্বীকৃতি, এই জন্ত এই কাজ করিতেছি।

সুখার মন, সুখার জ্ঞান, সুখার মেহ, সরলতা ও আত্মবিসর্জন আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সুখা আমার সহ-ধর্মিণী হইলে এ জীবন অমৃতময় হইবে। হেম-বাবু, আমার জ্বরের উষেগের কথা বলিয়া আপনাকে তাক্ত করিব না, কিন্তু যদি এ বিবাহে আপনাদিগের মত না হয়, আমার জীবনের উত্তম ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও চেষ্টা অস্ত্র সাক্ষ হইল, জ্বরে একটি শেল লইয়া প্রযজীবীরা পরিশ্রম করে না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, “একটি বালিকার জন্ত উৎসাহী পুরুষের জীবনের উৎসাহ লোপ হয় না, একটি নৈরাশ্রে তোমার জ্ঞান উন্নত-জ্ঞান যুবকের জীবনের চেষ্টা ও উত্তম কান্ত হইবে না।”

হতাশ হইয়া শরৎ বলিলেন, “একটি অবলম্বন না থাকিলে মনুষ্য-জ্বরে উৎসাহ, চেষ্টা, ধর্ম কিছুই থাকে না, অতঃপর আমার জীবন অবলম্বনশূন্য হইল। কিন্তু একথা আপনাকে বুঝাইতে পারি, এরূপ আমার ক্ষমতা নাই। তবে আপনারা স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আপনাদিগের মত নাই?”

হেমচন্দ্র শরতের দুইটি হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, “শরৎ, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া স্থিরিয়া এই কার্যটি করিতেছ কি না, তাহাই দেখিতেছিলাম। উপরে যাও, আমার স্ত্রী তোমাকে বলিলেন, এ বিবাহে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। হতাশাগিনী সুখার জীবন জগদীশ্বর অর্থপূর্ণ করিবেন। তাহাতে কি আমাদের অমৃত হইবে? জগদীশ্বর তোমাদের উভয়কে স্বীকৃতি করুন।”

• শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। দারা বহিরা তাঁহার নরন হইতে অস্ত্র পড়িতে

লাগিল। তিনি নীরবে হেবের হাত দুটি আপনায় মাথায় স্থাপন করিলেন, পরে উপরে গেলেন।

শরৎঘরে বিন্দু একটি প্রদীপ জালিয়া একটি মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিলেন, শরৎ সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর পা দুটি ধরিয়া নরনজলে তাহা সিক্ত করিয়া পদ-গদঘরে বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তুমি আমাকে জীবনদান করিলে, এ দয়া, এ মেহের কি পরিশোধ করিতে পারি?”

বিন্দু। ও কি শরৎ-বাবু, ছাড়, ছাড়, ছি! ছি! যার পা ধ্বংস হইবে, সে ধ্বংসই এখন, আমাকে কেন? ছি! দেখে দাও।

শরৎ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “বিন্দু দিদি, তুমি এ কথা বুঝাইয়াছ, তুমি এ কার্যে সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহার জন্ত আমি চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।”

বিন্দু। আর সন্তুষ্টি না দিয়া কি করি? যখন বরকর্তা ও কস্তাকর্তা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন আর আমরা বারণ করে কি করি?

শরৎ। বরকর্তা ও কস্তাকর্তা কে?

বিন্দু। দেখতে পাচ্ছি, বরই বরকর্তা, কস্তাই কস্তাকর্তা। বর এসে কনে বেঁধে গেলেন, বেশ পছন্দ হ'ল, আর কনেও লুকিয়ে লুকিয়ে বর দেখলেন, বেশ পছন্দ হ'ল, সবকিছু স্থির হয়ে গেল!

শরৎ। বিন্দু দিদি, একবার উপহাস ভাগ কর, তুমি নিঃসঙ্কটিভ-চিন্তে তোমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া আমার মনকে শান্ত কর। সুখা ছেলেমানুষ, তার আবার সন্তুষ্টি কি? সে এ ওর কার্যের কি বুঝবে বল?

বিন্দু। না গো, সে এখন বেশ সুখেরত সুখেরত জিবেছে। তা বুঝি ভাব না? সে যে

। সেখানে যেতে হয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে
হুক পড়ে।

শরৎ। তোমার পায়ে ধরি বিন্দু দিদি,
ছাড়, একবার তোমার মনের কথাটি
আমাকে তুষ্ণ কর।

বিন্দু। না বাবু, পায়ে-টারে ধরো না,
এই সুখ দেখতে পাবে, আবার রাগ
ব? তুমি চ'লে গেলে কি আমরা ছুটি
ন কৌদল করব? পরের দারে কেন
। বাবু?

শরৎ। তোমার সঙ্গে আর পারিলাম
বিন্দু দিদি! মনে করিয়াছিলাম, তোমার
পরামর্শ করিব, সব ঠিকঠাক করিব,
দেখিতেছি, আজ কিছুই হইল না।

বিন্দু। তা ঠিকঠাক আর কি? কেবল
ন-পুরুত ডাকা বাকি আছে বৈ ত নয়,
বা হয় ডেকে দি বল? না, কি আজ-
কলেজের ছেলে নিজেই বাবুন-পুরুতের
। সেরে নেয়, তাও ত জানি না। স্ত্রী-
টারটা কি আমাদের করতে হবে, না তাও
নিজেই সেরে নেবে? তানা হয় সুধাকে
ক দি? ও সুধা! একবার এদিকে আর
বাবু, শরৎ-বাবু তোকে ডাক্‌চেন, বড়
গর, একটু শীত কর'আর।

শরৎ হতাশ হইয়া উঠিলেন, বিন্দুও
নতে হাসিতে উঠিলেন। শরৎ তখন
র ছুটি হাত ধরিয়া বলিলেন, “বিন্দু
দি, তুমি ছেলেবেলা থেকে আমাকে
স্নেহ কর, একটি কথা শুন। তুমি
চাও সখ্য হইরাছ, হেম-বাবু তাহা
টাকে বলিয়াছেন, একবার সেই কথাটি
। বলিয়া আমাকে তুষ্ণ কর, একবার
। মনের আলিঙ্গন কর।”

বিন্দু তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, “শরৎ-
, ভগবান আমার অভাগিনী ভগিনীর

জীবনের সুখের উপায় করিয়া দিয়াছেন,
তাহাতে কি আমাদের অমত? ভগবান
ভোমাকে সুখে রাখুন, তোমার চেঁচামেচি
সকল করুন, তোমাকে যান ও বণ দান
করুন। অভাগিনী সুধাকে ভগবান সুখে
রাখুন, যেন স্নিগ্ধ পতিব্রতা হইয়া সংসারে
সুখলাভ করে।”

সাক্ষরনয়ন শরৎ উত্তর করিলেন, “বিন্দু-
দিদি, ভগবান তোমার এ দয়ার পুরস্কার
দিবেন। তোমাদের দয়া, তোমাদের সৎ-
কার্য, লাহস, তোমাদের অনিন্দনীয় স্নেহ এ
জগতে চুলভ। লোকনিন্দা-ভয় করিও
না; বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ বলেন, বিধবা-
বিবাহ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।”

বিন্দু। শরৎ বাবু, আমি যেয়েমাজ্‌ব,
আমি শাস্ত্র বুঝি মা। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র
বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, কচি মেয়েকে আমরা
চিরকাল বাতনা দিব, এরূপ আমাদের শাস্ত্রের
মত নয়, দয়াবান পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা নয়।

জগতের মধ্যে শরৎ বিন্দুর নিকট
অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লই-
লেন; নীচে উঠানে আসিলেন; দেখিলেন,
সুধা ভাঁড়ার-ঘরের দরজার চাবী দিয়া
একটি প্রদীপ হাতে করিয়া বাতির হইয়া
আসিতেছে। শরৎ সুধাক প্রায় ছই মাস
অবধি দেখেন নাই, তাঁহার হৃদয় ভক্তিত
হইল, শরীর কণ্টকিত হইল। ঐ লাবণ্যময়ী
পবিত্রদয়া স্বর্গীয়া কহা কি শরতের
হইবে? ঐ মেহমারিত নির্মল নয়ন দুটি কি
শরৎ চুম্বন করিবেন? ঐ লতা-বিনিমিত
কমনীয় পেলব বাহ দুটি কি শরৎ নিজ বাহুতে
ধারণ করিবেন? ঐ কুসুম-বিনিমিত
লাবণ্য-বিভূষিত দেহলতা কি শরৎ নিজ বক্ষে
ধারণ করিবেন? শরতের বহিঃ কটীরে কি
ঐ হৃদয় কুসুমটি দিবা-রাত্রি প্রকটিত

খাবিবে? প্রাতঃকালে উঠার আলোকের
জ্বাল এই প্রশ্ন-আলোক কি শরতের জীবন
আলোকিত করিবে? রায়কালে এই মেঘ-
একটি পিঁকি শরতের জ্বর। হৃদয় উজ্জল
করিবে? অসংখ্য উভয়ে, অসংখ্য চোখ,
কেশে ও পরিভ্রমে, এই মেঘময়ী ভাব্য কি
শরতের জীবনে পাতি দান করিবে, জীবন
সুখের করিবে? এইরূপ চিন্তা-লহরীতে
শরতের পূর্ণ জ্বর উদ্ভাসিত লাগিল, শরৎ
একটি কথা কহিতে পারিলেন না।

সুখা কবাক্টের শিকলী দিয়া চাবী বন্ধ
করিয়া, দেখিল, শরৎ-বাবু দাঁড়াইয়া
আছেন। সহসা তাহার গোরবর্ণ মুখমণ্ডল
লজ্জার রক্তবর্ণ হইল, সুখা হেটুম্বী হইল,
মাথার কাপড়টি টানিয়া দিল। আবার শরৎ-
বাবুর কাছে মাথার কাপড় দিল মনে করিয়া
অধিক লজ্জিত হইল, চক্ৰ ছুটি ব্রুদিত করিল,
চক্ষুর উপরের চর্মে পর্যন্ত লজ্জার রঞ্জিত হই-
য়াছে। সুখা আর দাঁড়াইতে পারিল না,
দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

সুখার সেই রঞ্জিত অবনত মুখখানি
অনেক দিন শরতের জ্বরে অভিভূত রহিল।
ক্রেপে, নৈরাত্রে, গীড়ার সে মুক্তি অনেক দিন
তাঁহার স্মরণপথে আরোহণ করিয়াছিল।

আনন্দ ও উদ্বেগপূর্ণ জ্বরে শরৎ-বাবু
আসিলেন। শরতের ভাগ্যে কি এই বর্গীর
সুখ বর্ষার্থই আছে? না অস্ত রজনীর দীপা-
বালীর জ্বার এই সুখের আশা সহসা নিবিয়া
বাইবে, বোর অসামন্তার অন্ধকার শরতের
জ্বর-পূর্ণ করিবে? অপরিমিত সুখ মজ্জা-
ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, অপরিমিত সুখের
সময় মজ্জাক্রমে এইরূপ ভরের উত্তর
হয়।

বাণী আসিবামাত্র শরতের ভৃত্য শরতের
হস্তে একখানি পত্র দিল। শরতের জ্বর

বহুতর তড়িত হইল, কেন হইল, শরৎ তাহা
জানেন না।

উপরে দিরা বাতির আলোকে শরৎ
দেখিলেন, তাঁহার হাতের চিঠি। মাতা
গুরুকে দিরা পত্র লিখাইয়াছেন। পত্র এই-
রূপ —

“বাহা শরৎ। তুমি সুস্থ-শরীরে কুশলে
থাক, তোমার চোখ সকল হব, তোমার
জীবন সুখের হয়, তাহাই ভগবানের নিকট
দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতেছি।

“বাহা, আজ একটি নিশ্কার কথা জনিয়া
মনে বড় ব্যথা পাইলাম। বাহা শরৎ, তুমি
ভাল ছেলে, তুমি মাকে ভালবাস; আমি
এ নিশ্কার কথা বিধান করি না। তুমি
তোমার অভাগিনী মাতাকে কষ্ট দিবে না।

“লোকে বলে, তুমি সুখকে বিবাহ
করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বাহা, এটি অর্থের
কথা, এ কাজটি করিয়া তোমার বাপের
নির্মল কুলে কলঙ্ক দিও না, তোমার মাতা যত
দিন বেঁচে আছে, তাহাকে তুমি কষ্ট দিও
না। বাহা, তুমি ত কথার স্বেচ্ছা ছেলে
নও।

“বাহা শরৎ, আমি অনেক কষ্ট সহ্য
করেছি। তোমার বাপ আমাকে কান্না
রেখে গিয়েছেন, বাহা কালীর যে অবস্থা, তা
তুমি জান। তুমি আমার জ্বরের ধন, তোমার
আশার রেখে আছি, এ বরসে তুমি আমাকে
কাদাইও না, আমার অধিক দিন বাঁচবার
নেই।

“আমার মাথার চুলের যত তোমার পর-
মায় হোক। তবমায় তোমাকে সংসারে সুখ
লাভ করুন, পুণ্যকর্মে তোমার মতি হোক।
এ অভাগিনী আর কি আশীর্বাদ করবে?”

শরৎ একবার, দুইবার, তিনবার এই
পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতে

লাগিল, সময় শরীর কাপিতে লাগিল, চক্কর
হত হইতে পড়খানি পড়িয়া গেল; শরৎ
বৃষ্টি হইয়া কুতলে পড়িল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতা ও সন্তান।

সে দিন রাজিতে শরৎ বে মাতন্য ভোগ
করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা
অক্ষম। নৈরাত্তের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া তাঁহার হৃদ-
য়ে আবৃত করিল, যুগা ও লজ্জা তাঁহাকে
বাধিত করিল, বজুর সর্বনাশ করিয়াছেন,
এই চিন্তা শত বৃক্ষিকের স্তায় তাঁহাকে দংশন
করিতে লাগিল।

বে অশ্রুবৎ স্রবের আশা ছয় মাস ধরিয়া
শরৎ হৃদয়ের হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়াছেন,
তাহা অভ জলাঞ্জলি দিবেন? মাতৃ-আজ্ঞা-
পালনার্থ শরৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন।
সমস্ত জীবন সুখশূন্য, উদ্বেগশূন্য, আশাশূন্য
হইবে, মরুভূমির স্তায় শুষ্ক ও রসশূন্য হইবে,
দুর্ভিক্ষ জীবনভার বহন করিতে পারিবেন?
মাতৃ-আজ্ঞার অন্ত শরৎ তাহাতেও প্রস্তুত
আছেন। কিন্তু জীবনের প্রিয়তম বন্ধু হেম-
চন্দ্র ও বিদ্যুৎ নামে আজি যে কলঙ্ক রটিল,
সমাজে তাঁহাদিগকে যুগা করিবে, ভিতরকার
করিবে, জ্বলন্ত দিয়া তাঁহাদিগের দিকে
দেখাইয়া দিবে, শরৎ সেটুকি সঙ্ক করিতে
পারিবেন? লোকে এখন বলিবে, ঐ দুই
জনে একটা নষ্টা বিধবাকে শরতের সঙ্গে
বিবাহ দিতে চাহিয়াছিল, শরৎ বৃষ্টিয়া
সুস্থিয়া সে বিবাহ করিলেন না, ব্যক্তিচারি-
নীটা হেমবাবুর ঘরেই আছে, এ হৃদয়বিন্দক

বিন্দু বাস্যাকাল্যাবধি শরতের দেহবরী ভগি-
নীর স্তায়, তাঁহার প্রতি শরৎ এইরূপ আচ-
রণ করিবেন? বে হেম-বাবু স্বীয় ঔদার্যভঙ্গে
শরৎকে তাঁতার স্তায় ভালবাসিতেন, লোক-
নিষ্ঠা তুচ্ছ করিয়া আজি কেবল শরৎ ও
সুখার স্রবের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরতের
বিষয় প্রস্তাবেও সম্মত হইরাছিলেন, তাঁহাকে
কি শরৎ অগতের ভিতরকার ও যুগার পদার্থ
করিবেন? বে রেহপূর্ণ নিম্নলঙ্ক পরিবারে
প্রবেশ করিয়া শরৎ এতদিন শান্তিলাভ
করিয়াছিলেন, আজি কি কুটিলগতি বিবধর
সপের স্তায় তাহাদিগকে দংশন করিয়া
চলিয়া আসিবেন? কালবিবে সে পরিবার
অর্জরিত হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, অনপনের
কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন হউক, শরৎ নিঃসঙ্কোচিত-
চিত্তে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিবেন?
এ চিন্তা শরতের অসহ্য হইল, অসহ্য বেদনার
চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “মাতা, কমা কর,
আমি এ কাজটি পারিব না।”

আর সেই ধর্মপরায়ণা, পবিত্র হৃদয়া,
হতভাগিনী সুধা? ছয়মাস পূর্বে সে বালিকা
ছিল, প্রণয়ের কথা জানিত না, বিবাহের
কথা মনে উদয় হয় নাই। এই ছয় মাসের
মধ্যে শরৎই তাহাকে প্রণয় শিক্ষাইয়াছে,
বালিকার হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন
আশা জাগরিত করিয়াছে। আহা! ঔষার
আলোক বেরূপ নিম্নলঙ্ক ধীরে ধীরে স্রুপ্ত
অগতে ও গভীর আকাশে প্রসারিত হয়, এই
নূতন আশা অনাধিনী বিধবার হৃদয়ে সেই-
রূপ ব্যাপ্ত হইয়াছে, লাক্ষাবতী নন্দমুখী
বিধবা তৃষ্ণার্ত চাতকের স্তায় প্রণয়-বারিষ্ণ
অন্ত চাহিয়া রহিয়াছে। এখন শরৎ তাহাকে
কলিতা করিবেন? চিরকাল হতভাগিনী
করিবেন? কলঙ্কে কলঙ্কিতা করিয়া তাহাকে

হয় ত অগতঃ অবমাননা ও কলঙ্কে দগ্ধ হইয়া অকালে সে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা চিরজীবন জগরে এই নিষ্ঠুর শেল বহন করিয়া জীবন্ত হইয়া থাকিবে। শরৎ আর সজ করিতে পারিলেন না, গর্জিত হৃৎক আঁজি ভূমিতে স্তম্ভিত হইয়া বালিকার দ্বার রোদন করিতে লাগিলেন।

শরৎ বড় গরম হইল। শরৎ উঠিয়া গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইলেন। শরৎকালের নৈশবায়ু তাঁহার ললাটে লাগিল, তাঁহার জলন্ত মুখমণ্ডল জেবৎ শীতল হইল। সমস্ত জগৎ সুপ্ত ও নিস্তরু। অমাবস্তার অন্ধকারে আকাশ ও মেঘিনী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, আকাশ হইতে অসংখ্য তারা এই পাপপূর্ণ, শোকপূর্ণ জগতের দিকে নিস্তরু দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে।

যাতা পত্রে লিখিয়াছেন, তিনি দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতার আসিবেন। যাতাকে এ সকল কথা বুঝাইলে তিনি বুঝিবেন? এ কার্যে তিনি সম্মতি দিবেন? সে বুঝা আশা! শরৎ যাতাকে জানিতেন। বার্ককো, বৈথব্যো তিনি কখনই এ কার্যে সম্মত হইবেন না, কিংবা যদি মুখে সম্মতি প্রকাশ করেন, জগরে বড় ব্যথা পাইবেন, পুত্রের আচরণে অচিরে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। করযোড় করিয়া সেই নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শরৎ লাড়নরনে কহিলেন, "পুণ্য! জননি! আমি যেন সন্তানের আচরণ না ভুলি, তোমার জগরে যেন সন্তাপ না দিই, তোমার শেষকাল যেন জিক্ত না করি।"

সমস্ত রাত্রি চিন্তার দংশনে শরৎজগৎ হুট-কট করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার শরীর একটু শীতল

কর্তব্য নিরূপণ করিলেন। শোকসন্তপ্ত কিন্তু শান্ত-হৃদয়ে তিনি নিবালোক প্রতীকী করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার একটু তপ্তা আসিল। কতকণ নিদ্রা গেলেন, তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন, কেহ কোমল হস্তে তাঁহার মাধার হাত বুলাইতেছে। তখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার স্নেহময়ী মাতা। তাঁহার মাধার কাছে বসিয়া বাৎসল্য ও স্নেহের সহিত তাঁহার মাধার হাত বুলাইতেছেন। শরৎ উঠিলামাত্র তাঁহার মাতা বসিলেন, "বাছা শরৎ, তুমি এত কাহিল হইয়া গিয়াছ; আঃ, তোমার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। বিছানার না শুইয়া ভূমিতে শুইয়া আছ কেন? এস বাছা, বিছানায় এস।"

শরৎ। না মা, আমি বেশ সুমাইয়াছি, আর সুমাইব না। যা, তুমি কখন এলে? কবে আসিবে, তাহা ঠিক করিয়া আমাকে লিখ নাই কেন? হেঁসন হইতে আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নিক?

যাতা। না বাছা, আমার সঙ্গে গুরু এসেছেন, তিনি গাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন, আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

শরৎ। যা, আমি না বুঝিয়া স্থগিয়া অপরাধ করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, সেটি কমা কর। তোমার চিঠি পাইয়া আমার অভিপ্রায় ত্যাস করিয়াছি।

মা, আমি তোমার অবাধ্য হইব না, যদি কিছু কষ্ট দিয়া থাকি, সন্তানকে সেটুকু ক্ষমা কর। যা, তুমি আমার সকল দোষই ত কমা কর।

বৃদ্ধার নরন হইতে বর বর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি স্নেহ-গদগদভাবে বলিলেন, "যাতা শরৎ, গোর মুখে হুল

পড়ুক, তুই আমার কথাটি রেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা করলি। বাছা, তুঁহি আমার কথা রাখিবে, তাহা জানিতাম, তুঁহি ত আমার অব্যাহা ছেলে নও। আহা, ভগবান্ ভোমাকে সুখী করুক।

মাতার কত দুটি মন্তকে স্থাপন করিয়া পরিত্যক্ত অবস্থিত অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মাতা অঞ্চল দিয়া পুত্রের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন, মাতৃবেহে পুত্রের হৃদয় শান্ত হইল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

কুলগৌরবের পরিণাম ।

সুখার সহিত শরতের বিবাহের কথা ভাবিয়া গিয়াছে, তথাপি মেয়ে-মহলে সে কলঙ্কের কথা লইয়া অনেক দিন অবধি নাড়া-চাড়া হইতে লাগিল, এমন সরল কথা কি আর রোজ মিলে? কালীতারার খাণ্ড-ডীরা ত হাটের নেড়া হজুক চায়, বখন একটু কাজকর্ম করিয়া অবসর হয় অথবা কালীতারাকে গল্পনা দিতে ইচ্ছা হয়, অমনি কথায় কথায় কথা উঠে।

ছোট। ই্যা ই্যা, বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, মুখেই ভেঙ্গেছে, কাজে কি আর ভাঙে? আমার বেন কলকাতার এসেছেন, ছেলে আর কি করে, দিন কত চুপ করে আছে। বেনও গলাবাজা কব্বেন, আর ছেলটো এই হতভাগী ছুঁতটীকে বিয়ে করবে।

মেজ। ই্যা গো ই্যা, বেন বড় গুণবতী। এই পোড়ারমুখী ত সব করেছে, ও না করলে কি আর সম্ভব হ'ত? তার পর আমাদের

ভবে সে কাজটা বেয়ে-দেল, আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছে, পোড়ারমুখীর প্রাণে ভর নেই, এই বিয়ে হ'লে কি আর কালীকে আন্তো রাখতুম? আহা, বেনম নজ্জার মা, তেমনি নজ্জার বেয়েও হয়েছে, এমন ছোট পোকের ঘরের বেয়েও কিরে করে আসে? আমাদের এমন কুলেও কালী বিয়েছে।

ছোট। আর সেই বাগীই কি নজ্জার বাবু—এ চেম-বাবুর স্ত্রীর কি লজ্জা-সরম নেই? সে কি না বিধবা বোনটাকে বিয়ে দিতে রাজি হ'ল? ও মা, ছি! ছি! চৌদ্দ-পুরুষকে একবারে কলঙ্কে ডুবালে? এমন মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ম'রে বাঁওয়াই ভাল। বাপ-মা হুণ খাইয়ে বেয়ে ফেলেনি কেন?

মেজ। আর সেই এক রক্তি মেয়েটাই কি নজ্জার গা? এমন বিধবাকে কি আর ঘরে রাখতে হয়? অন্ত নোক হ'লে কাণী-বন্দাবনে পাঠিয়ে দিত কি হরিনামের মালা হাতে দিয়ে বৈকুণ্ঠেশ্বর আখড়ার পাঠিয়ে দিতে। ছি! ছি! ভদ্রলোকের ঘরে এমন নজ্জার কথা?

ছোট। তা দিক্ না সেটাকে বেশ করে আর এত চলাচলি কেন, সেটাকে বাজারে বেয় করে দিক্ না?

মেজ। ওলো, চলাচলির কি হয়েছে? আরও হবে। তোর ত বোন সব কথা জানিলি নি? আমি ওদের সব শুনেছি। এই দেখ না কি হয়? বড় দেরি নেই। তখন কেমন করে সুকোর দেখব। পুলিশে খবর দেব না? এমন কুটুখ থাকার চেয়ে না থাকা ভাল, কুটুখের মুখে আগুন।

ছোট। আমার কলঙ্কের আর এসে কালীকে দিতে নোক পাঠিয়েছিল। একটু নজ্জা-সরম নেই গা?

বেক। ও সো, লক্ষ্য-লবন থাকলে আর পোড়ারমুখী ছেলের অমন সব্ব করের? তা হতভাগা বংশে আর কি হবে বল না? বোমাকে নিজে আসিয়ে? কঠোর চেনা দিয়ে শিঠ ভেঙে খেব না? কালী একবার বাবার নাম ককক কিকি? এর শিঠের চামড়া যদি না ফুলি তাহা কী করে তের খেবে নই। হি! হি! অমন বংশেই পাঠান, শুনের হুঁলে আমাদের সাত পুরুষের জাত বার, কি ককমারি হয়েছে যে, এমন হাড়ি-ভোমের বরে গিয়ে বাবু বিয়ে করেছেন। হি! হি! হি!

এইরূপ বংশের সুখ্যাতি, মাতার সুখ্যাতি, শরভের সুখ্যাতি, বিনু ও সুখার সুখ্যাতি কালীতারাকে কত দিন শুনিতে হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু অমৃতভাষিনী-দিগের সে অমৃত-বচন এক্ষণে কিছু দিনের জন্য মূলভূমী রহিল। বাবুর পীড়া মহলা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহার প্রাণের সশর; তখন সকলে তাঁহার চিন্তার ব্যাকুল হইল।

তখন কালীতারার খুড়খাওড়ীরা বড়ই ভয় পাইল, সে বিপুল বংশ গোছাইয়া রাখিতে পারে, এমন আর একজন লোক সে বংশে ছিল না। কালীতারার ভয়ে ও চিন্তার ঈর্ষ হইয়া গেল, খাইবার সময় খাওয়া হইত না, রাগিতে চিন্তার ঘুম হইত না, কেবল বাবু কেমন আছে, জানিবার জন্য ছটকট করিতেন। ভগিনীপতির সফটাপন্ন স্নিড়ার নবোন্ম পাইয়া শরভের সে ব্যাধিতে আসি-ছেন, কয়েকদিন তথায় রহিলেন। হেমচন্দ্রও প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া বিব্রহর পর্যন্ত তথায় থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে কানাকানি করিত, তিনি তাহা গ্রাহ্য করি-তেন না। হেমকে দেখিয়া শরভও একটু অপ্রস্তুত হইলেন, কিন্তু উদারচরিত্র হেম

শরভকে একপাঠে ডাকিয়া বইয়া গিয়া বলিলেন, “শরভ, তুমি আর আমাদের বাকী যাক না কেন? তুমি যম কার্য কর নাই, লক্ষ্য কিসের? বিবাহে তোমার বাস্তবিক নাই, মাতার কথা অনুসারে কার্য করি-বাহ, তাহা কি রিহস্যবী? তোমার মাতার কলমে তুমি যদি বিবাহ করিতে বীকার করিত, আসিয়া বীকার করিতাম না। শরভ, তোমার করণের দের নাই, হোমের কার্য না করিলে বিবাহ কারণ নাই। লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করি না, তুমিও গ্রাহ্য করিও না।”

শরভ হেমের এই কথাগুলি শুনিয়া তন্তিত হইলেন। যে বাল্য-বন্ধুকে তিনি জগতের দৃশ্যপদ করিয়াছেন, বাহার পবিত্র সংসার তিনি কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেই ষড়িভূল্য ব্যক্তি আপনি আসিয়া শর-ভের হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকল মার্জনা করিলেন। শরভ হেমের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, কৃতজ্ঞতার তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল, মনে মনে কহিলেন, “এত দিন আপ-নাকে কোষ্ঠ সহোদর বলিয়া প্রেম করিতাম, অস্ত্র হইতে লেব বলিয়া পূজা করিব।”

হেমচন্দ্র ও শরভ রোশীর যথেষ্ট শুক্রবী করিলেন, ঠাকুরের প্রসাদ বদ্ধ করিয়া দিলেন, অর্থব্যয়ে সজ্জিত না হইয়া কলি-কাতার মধ্যে সর্কোংকুট চিকিৎসকগণকে প্রত্যহ ডাকাইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন হয়, দেখিবার জা-শরভ দিকারাজি রোশীর ঘরে থাকিতেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তা-উৎকট পীড়া সহ করিয়া কালীতারার বার মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

কালীর শরীরখানি চিন্তার আধখানি হইয়া গিয়াছিল; এ সংবাদ পাইবামাত্র

সীৎকার শেষে ঘোড়ন করিয়া ঘুরিতে আত্মাভ
বাইল মুক্তি হইল ।

শরৎ অনেক জল গিয়া বাতাস করিয়া
বিলিকে সংজ্ঞা দান করিলেন, তখন কালী-
তারা একবার স্বামীর দিকে দেখিব বলিয়া
চীৎকার করিতে লাগিল । শরৎ সেটি
নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন
না । আলুখালুবেশে মুক্তকেশে শোকবিহ্বলা
কালীতারা স্বামীর ঘরে নৌড়িয়া গেলেন,
মৃত স্বামীর চরণ দুইটি মস্তকে স্থাপন করিয়া
ক্রন্দন-ধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করি-
লেন । কালীতারা স্বামীর প্রণয় কখনও
জানেন নাই, অত সে প্রণয়টি জানিল, শূন্য-
হৃদয় বিধবা অসহ্য বাতনার স্বামিপদে বার
বার লুপ্তি হইয়া অভাগিনীর কান্না কাঁদিতে
লাগিল । একবার করিয়া মৃত স্বামীর মুখ-
মণ্ডল দেখে আর একবার করিয়া হৃদয়
উখলিয়া উঠে, রোদনেও তাহার শক্তি হয় ।
কণেক পর আবার মুক্তি হইয়া পড়িল,
কালীর চৈতন্যশূন্য শীর্ণ দেহ হস্তে উঠাইয়া
শরৎ অস্ত্র ঘরে লইয়া আসিলেন ।

কয়েক দিন পরে কালীতারার স্বপ্ন-
বাড়ীর সকলে বন্ধমানে প্রস্থান করিলেন ।
শোকবিহ্বলা বিধবা ভবানীপুরে শরতের
বাড়ীতে আসিয়া যাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে
শান্তি লাভ করিলেন । কালীর বয়ঃক্রম
২০ বৎসর হয় নাই, কিন্তু তাহার সন্মুখের
সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটি বসিয়া
গিয়াছে, শরীরখানি অতি শীর্ণ, শোকে ও
কষ্টে নানারূপ রোগের সঞ্চার হইয়াছে ।
দেখিলে তাহাকে চত্বাবিংশৎ বৎসরের চির-
রোগিণী বলিয়া বোধ হয় । চির-
দুঃখিনী মাতৃস্নেহে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ
করিলেন ।

হইয়াছিল, কিন্তু উৎকট ক্লম হইলেই সর্বদা
স্বপ্ন হয় না ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ধনগৌরবের পরিণাম ।

আমরা একজন হতভাগিনীর কথা পূর্ক
পরিচ্ছেদে লিখিলাম, আর একজন হত-
ভাগিনীর কথা এই পরিচ্ছেদে লিখিব ।
শোকের কথা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না,
কিন্তু যখন সংসারের কথা লিখিতে বসিয়াছি,
তখন শোকের কাহিনীই লিখিতে বসিয়াছি ।
শোকভূষণের কথা না লিখিলে সংসারের
চিত্রটি প্রকৃত হয় না, সংক্ষেপে সে কথাটি
লিখিব ।

কালীতারার স্বামীর পীড়ার সময় হেয়-
চন্দ্র সর্দঙ্গাই সেই বাড়ীতে থাকিতেন,
সুতরাং বিন্দু বাড়ী হইতে বড় বাহির হইতে
পারিতেন না । তাঁহাদের পাড়ার লোকে
অনুগ্রহ করিয়া বেরুপ এবাদ রটাইয়াছিল,
তাহাতে তাঁহার বাড়ীর বাহিরে বাইতে বড়
ইচ্ছাও ছিল না । তবে উমাতারা কেমন
আছে, জানিতে বড় উৎসুক ছিলেন । যথো
যথো লোক পাঠাইতেন, লোকে বে ধবন
আমিত, তাহাতে বিন্দুর বড় ভয় হইতে
লাগিল । কয়েকদিন পরে তিনি পাড়ী করিয়া
উমার বাড়ী গেলেন ।

বিন্দু পথে মনে করিতেছিলেন, তাঁহার
জ্যেষ্ঠাইমা তাঁহাকে কত তিরস্কার করিবেন ;
কিন্তু বাড়ী পৌছিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠাইমাকে
বে অবস্থার দেখিলেন, তাহাতে বিন্দুর চক্ষুতে
জল আসিল । জ্যেষ্ঠাইমার সে চির-প্রকৃত মুখ-
বার্ন ভকাইয়া গিয়াছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন

তলি হায়ে হায়ে গর হইয়াছে, সে মূল শরীরখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে । কতবার সেবার দিনরাত্রি আগরধ করিবা, কতবার যামলিক কঠোর জন্ত নিব-রাত্র রোমন ও ভিত্তার উমার মাতা অকালে বার্কিকোর লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

বিন্দু আসিবারাজই তাঁহার জ্যেষ্ঠাইবা চক্ষুর জল কেলিয়া বলিলেন, “আর মা, তোরা একে একে আর, বাছা উমাকে এক-বার দেখ, বা কহুতে হয় কহ, আমি আর পারি না ।”

উষ্ম-হৃদয়ে বিন্দু জ্যেষ্ঠাইবার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন, উমাতারাকে দেখি-বারাজ তাঁহার জ্বর কলিত হইল । মৃত্যুর ছায়া সেই রক্তশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছে ।

বিন্দু দিমিকে দেখিয়া রোঞ্জির মুখখানি একবার একটু উজ্জ্বল হইল, বিন্দুর দিকে উমা হাত বাড়াইলেন, বিন্দু সেই হাতটি ধরিয়া বালা-সহচরী উমাতারার নিকট বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, মনে মনে ছেলেবেলার কথা উদর হইতে লাগিল । অতি শৈশবে বিন্দু জ্যেষ্ঠাইবার বাড়ী খেলা করিতে আসিত, উমার সঙ্গে কত খেলা করিত, উমা আপনান্নর সন্দেশটি ভাঙ্গিয়া বিন্দুকে দিত, আপনান্নর খেলনা হইতে বিন্দুকে একটি দিত । তাহার পর বিন্দুর পিতার মৃত্যু হইলে বিন্দু জ্যেষ্ঠাইবার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল, তখনও উমার সঙ্গেই খেলা করিতে ডাল-বাসিত, উমাও গরিবের ঘরে বলিয়া বিন্দুকে ভূষ করিত না ।

তাহার পর উভয়ের বিবাহ হইল, উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেলেন, কিন্তু বালাকালের প্রণয়টি ভুলিলেন না, এখন জ্যেষ্ঠাইবার বাড়ীতে উমার সঙ্গে দেখা হইত, তখনই কত

আনন্দ । হয় যান পূর্বে জ্যেষ্ঠাইবার বাড়ীতে হইত কত আনন্দে দেখা করিয়াছিলেন, আজ সে আনন্দ কোথায় ? কখনও উমার সেই অতুল সৌন্দর্য কোথায় ? সেই সুন্দর ললাটে হীরকের সিঁতি কোথায় ? সে সুগোল বাহতে হীরক-খচিত বলর কোথায় ? পরলটিজা জ্যেষ্ঠাইবার সেই মিষ্ট হাসি কোথায় ? সেই একটু ধনপর্ক, একটু সংসারিক পর্ক কোথায় ? সে সংসারমুখ অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে, সে সুখ উমা-তারার অদৃষ্টাকাশে আর কখন হইবে না । সে সুখ সাক্ষ হইয়াছে, উমাতারার লীলা-খেলাও সাক্ষপ্রায়, ধন, যৌবন, অতুল সৌন্দর্য অকালে লীন হইল ।

অনেকক্ষণ পরে কীর্ণস্বরে উমা কহিলেন, “বিন্দু দিদি, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম, তোমাকে একবার দেখিরা প্রাণটা জুড়াইল ।

বিন্দু । কালীতারার স্বামীর বড় গীড়া হইয়াছিল, তাই আমরা বড় ব্যস্ত ছিলাম, সেই জন্য উমা, তোমাকে দেখিতে আসিতে পারি নাই ।

উমা । ব্যারামটা আরাম হইয়াছে ?

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিলেন, “কালী বিধবা ।”

উমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; এক বিন্দু অশ্রুজল সেই শীর্ণ গভঃস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল । কথেক পরে বলিলেন, “কালী এখন কোথায় ?”

বিন্দু । শরতের বাড়ীতে আছে । কালীর মাও সেইখানে আছেন, তিনি কলি-কাতার আসিয়াছেন ।

উমা । কালীকে বলিও, তাহার মন সুস্থ হইলে একবার আসিরা দেখা করে । যদিবার আগেতাকে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা করে ।

বিন্দু। হি উমা, এমন কথা বুধে আন কেন? তোমার উৎকট রোগ হইয়াছে, তা ডাক্তার দেখিতেছে, ব্যারাম ভাল হুইবে এখন; হি, অমন ভাবনা হনে আনিও না।

উমা। ভাল হয়ে কি হবে?

বিন্দু। ভাল হইয়া আবার সংসার করিবে। মজুরের কষ্ট কি আর চিরকাল থাকে? আজ যে কষ্ট আছে, কাল তাহা থাকিবে না, সুখ-দুঃখ সকলেরই কপালে ঘটে। ব্যারাম ভাল হইলে তুমি সুখী হইবে, পতিপুত্রবতী হইয়া সোনার সংসারে বিরাজ করিবে।

উমা কোন উত্তর করিলেন না, একটি কীর্ণ হাসি সেই কীর্ণ গুহপ্রান্তে দেখা গেল। অনেক বেন কি এক ভূমিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, “ঐ জানালা থেকে দেখ।”

বিন্দু ও বিন্দুর জ্যোতাইমা জামালার নিকট গিয়া দেখিতে লাগিলেন। জুড়ী আসিয়া কটকের নিকট পাড়াইল, ঘনজর ও একটি বাবু পাড়া হইতে নামিলেন। দ্বার-বেশে একটি বুড়া পাড়াইয়া ছিল, তাহার নখে হুইজন কি কথা কহিতে লাগিলেন। তিনজন পুরান্ন করিতে করিতে উপরে গেলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্যোতাইমা, ঘনজর-বাবুর সঙ্গে ও বাবুটিকে?”

জ্যোতাইমা। ও গো, ঐ ত আমার জামাইয়ের শনি। ওর নাম সুবর্ত্তি-বাবু, কলিকাতার বড় বড় মাছের কাছে গিয়া পোড়ারমুখো অধনি করে হেসে হেসে কথা কর গো, আর বত মদ রীত-চরিত শিখার আর টাকা কীকি দেয়। জামাইয়ের কত টাকা কীকি দিয়ে নিয়েছে। ভগবান জানেন। বম কি পোড়ারমুখোকে ভুলে

বিন্দু। আর ঐ বুড়ীটাকে ঐ বে হাড মেড়ে নেড়ে হেসে হেসে বাবুদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে উপরে গেল?

জ্যোতাইমা। কে জানে, ও বুড়ীটাকে, ঐ করেকদিন অবধি জামাইয়ের মত আমার জামাইয়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। কি কুচক্ষে ঘুচে, কে জানে?

কীর্ণবরে উমা কহিলেন, “মা, আমি জানি, তোমারও শীঘ্র জানবে।” রোগী পাশ করিয়া শুইলেন ও নিদ্ভূত হইয়া রহিলেন। উমা একটু ঘুমাইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিন্দু সে দিন বিদায় হইলেন।

সেই দিন অবধি বিন্দু প্রায় প্রত্যহ উমাকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু বিন্দুর স্নেহ, উমার হাতার রক্ত, সমস্ত বুধা হইল। রোগীর মনে সুখ নাই, আশা নাই, জীবনে আর কুচি নাই, তাহার কাসি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, তাহার সঙ্গে আমাশাও বাড়িল, দুর্বল কীর্ণ উমা সমস্ত দিন প্রায় আর কথা কহিতে পারিত না। তখন চিকিৎসকগণও আরোয়া আশা ত্যাগ করিল, আজ আর কাল আর, এইরূপ বিশেষণা করিতে লাগিল।

শেষে বিন্দু কালীর বাড়ীতে ধবর পাঠাইলেন ও কালীকে সঙ্গে করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন।

হতজাগিনী বিবধা কালীদিবিকে দেখিয়া রোগীর চক্ষু হইতে ধারা বহিঃস্থিত পড়িতে লাগিল, রোগী কথা কহিতে পারিলেন না। কালীও উমার একটি হাত ধরিয়া দীর্ঘবে রোন করিতে লাগিলেন।

পীড়া বড় বাড়িল। সন্ধ্যার সময় শাড়ী অতিশয় কীর্ণ, প্রায় পাওয়া যায় না। চিকিৎসক আসিয়া দুখ ভাবি করিলেন, একটি নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া পেলেন,

যাওয়াইতে হইবে, প্রাতঃকালে আবার আসিব ।

উমার মাতা এ করেকদিন ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন । বিন্দু বলিলেন, “জ্যেষ্ঠাইমা, আজ তুমি ঘুমাও, কাজ আমি রাত্রিতে থাকিব, উমার কাছে আমিই বসিয়া আছি ।”

কালীভাড়াও থাকিতে ইচ্ছা করিল ।

রাত্রি ৯টা হইয়াছে, তখন বিন্দু একবার ঔষধ খাওয়াইলেন । উমা অতি ক্লিণ্ণ হয়ে বলিলেন, “আর কেন ঔষধ ? আমি চলিলাম । বাইবার সময় তোমাদের মুখ দেখিয়া মরিলাম, এই আমার পরম সুখ । বিন্দু দিদি, কালী দিদি, আমাকে মনে রাখিও ।”

বিন্দু ও কালী রে গীর দুই হস্ত আপনাদিগের বক্ষে ধারণ করিলেন, নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন ।

অর্ধ ঘণ্টা পর উমা ক্লিণ্ণ হয়ে বলিলেন, “মা, মা ।” উমার মাতা পাশেই শুইয়াছিলেন, তাঁহার খুম হয় নাই । তিনি কন্ডার আরও নিকটে আসিলেন । উমা দুই হাত তুলিয়া মার গলা ধরিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না । তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টে বহিতে লাগিল, হস্ত-শল হিম হইল, নখগুলি নীলবর্ণ হইল, চক্ষু স্থির হইল, মাতৃবক্ষে দেহময়ী উমার মৃতদেহ শান্তি প্রাপ্ত হইল ।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উমার মাতা, বিন্দু ও কালীভাড়া পাকী করিয়া সে বাটা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন । কটকের নিকট তাঁহারা দেখিলেন, সেই সুমতি-বাবু ও সেই ব্রহ্মা বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া নামিয়া আসিতেছেন । বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যেষ্ঠাইমা, ও বুড়ী কে, তুমি এখন কেনেছ ?

জ্যেষ্ঠাইমা কোন উত্তর করিলেন না ।

দুই ভিন্নবার বিন্দু জিজ্ঞাসা করার বলিলেন,

“ঐ বুড়ী মাগীর বোনদি না কে একটা আছে, সে এই থিয়েটারে সোভা সাজে, সাবিত্রী সাজে, রাধিকা সাজে, তার মুখে আগুন । সুমতি-বাবু সেইটাকে ধনঞ্জয়-বাবুর কাছে আনিয়াছিলেন, তার নাম করে ১০ ।

১৫ হাজার টাকা বা’র ক’রে নিরেছেন, ভগবানুই জানেন । বাছা উমা বেঁচে থাকতে সেটাকে বাড়ী আনেন নি, এখন না কি এনে রাখবেন, তার জন্ত অনেক টাকা দিয়ে বর সাজান হয়েছে ।”

* * * *

ধনবানু, গুণবানু, রূপবানু ধনঞ্জয়-বাবু কলিকাতা সমাজের একটি শিরোরত্ন । সকল সভায় তাঁহার সমান আদর, সকল স্থানে তাঁহার গৌরব, সকল গৃহে তাঁহার খ্যাতি । তাঁহার অমাত্যরা তাঁহার বদান্ততার সুখ্যাতি করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার কৃতির প্রশংসা করেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার হিন্দুত্বান্বিত প্রশংসা করেন, কতকর্ত্তাগণ (উমার মৃত্যুর পর) তাঁহার লিখিত লব্ধল্যাপনার্থ ঘন ঘন ঘটকী পাঠাইতেছেন । রাষ্ট্রপুরুষেরা ধনাঢ্য বদান্ত জমিদারপুত্রকে রাজ্য খেতাব দিবার সম্মত করিতেছেন ।

অবিজ্ঞ অশিক্ষিত সুমতি-বাবু শ্রী কলিকাতার একজন অনারারি মেজিষ্ট্রেট হইবেন, এই রূপ শুনা যায় । তিনি সাহেবদিগের সহিত সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ করেন, একবার লেভিতে গিয়াছিলেন । তাঁহার জজ্ঞাচরণ ও সুমার্জিত কথাবার্ত্তা শ্রবণে, সকলে ভুট্ট হইয়াছেন । সুমতি-বাবুর গাড়ী-খোঁড়া আছে, সুমার্জিত বুদ্ধি আছে ও মিষ্ট কথাই অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তিনি সাহেব-সুবোকে ভুট্ট রাখেন, বড়মহাশয়ের সর্বদাই মন বোগান, তিনি ক্রমশই উন্নতির

পথে উঠিতেছেন। তিনিও সমাজের একটি শিরোরত্ন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—৪—

পরীক্ষা।

শরৎ-বাবুর পরীক্ষা অতি নিকট, তিনি সমস্ত দিনই পড়েন, বাড়ীর ভিতর বড় বান না। শরৎ পড়িয়া পড়িয়া বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহার অনেক বহু-ভজনা করেন, শরতের ষাণ্ডারা দাওয়া দেখেন, যাতে শরৎ একটু ভাল থাকেন, একটু গায়ে সারেন, সে বিষয়ে বিবাহ-রাজি বহু করেন। কিন্তু শরতের চেহারা কিরিল না, শরৎ বড় পরি-ক্ষম করেন, রাজি জাগিয়া, একাকী পড়িবার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকেন, তিনি দিন দিন আরও বিবণ ও ছুর্জল হইতে লাগিলেন।

শরতের মাতা বলিলেন, “বাছা, এত প’ড়ে প’ড়ে কি ব্যায়াম করিবে? তোমার পরীক্ষা দিবে কাজ নাই, চল, আমরা তাল-পুকুরে কিলে নাই, তোমার বাগের বিষয় দেখিও, ঘুচ্ছলে থাকিবে। কলিকাতার জল হাওয়া তোমার সঙ্গ হয় না।”

শরৎ বলিলেন, “না মা, এই বরসে লেখা-পড়া ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় না। পরীক্ষা নিকট, একবার চেষ্টা করে দেখি।”

কালীতারা পূর্বেই বর্জ্যমানে শরতের বিবাহের সমস্ত হির করিয়াছিলেন। মনে করিলেন, বোঁ ঘরে এলে শরতের মনে ক্ষুধি হইবে, শরৎ একটু গায়ে সারিবে। সেই ববাহের কথা একদিন শরতের নিকট

উত্থাপন করিলেন। শরৎ বলিলেন, “দিদি, পড়িবার সময় ব্যস্ত কর কেন?”

বিন্দুর ভোঁটাইয়া এখন বিন্দুদের বাসায় থাকেন, এখনও তালপুকুরে কিরিয়া বান নাই। তিনি সর্বদাই শরতের মাতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং সমস্ত দিন ধরিয়া কথাবার্তা কহিতেন। তাঁহার দুই জনে উমার কথা কহিতেন, কালীর কথা কহিতেন, আর মনের দুখে রোদন করিতেন। উমার মা বলিতেন, “দিদি, তথর যদি লোকের কথা না শুনে আমরা একটু বুঝে শ্রুতে কাজ করিতেন, তা হ’লে আর আজ এমনটি হ’ত না। তুমি তখন বড় কুল দেখে বামুন-পুরুতের কথা শুনে কালীর বিবাহ দিলে, আমিও পড়লীর কথা শুনে বাছা উমার বড়মামুষের সঙ্গে বিবাহ দিলেম, তাই আজ এমন হ’ল। তা ভগবানের ইচ্ছা, এতে কি মামুষের হাত আছে, আমরা বা মনে করি, সেইটি কি হয়? তা দিদি, আমার যা হয়েছে, তা হয়েছে, তুমি শরৎকে একটু দেখো, বাছা প’ড়ে প’ড়ে বড় কাহিল হয়ে গিয়েছে। শরৎকে মামুষ কর, শ্রুৎ সংসার করতে পারে, এইরূপ বিয়ে-খা জুড়, বোঁ ঘরে নিয়ে এস, বোয়ের শ্রুৎ দেখে শোক একটু ভুলবে।”

শরতের মাতা বলিলেন, “আমার তাই ইচ্ছে। বাছা যে কাহিল হয়ে গিয়েছে, আমার বড়ই ভারনা হয়েছে। আমারও বোঁ ঘর, বিয়ে-খা দিলে বাছা একটু গায়ে সারিবে। তা শরৎ যে বিয়ে করতে চায় না। তার উপর লোকে যে একটা নিন্দা রটিয়েছে, মনে হ’লে কষ্ট হয়।”

উমার মাতা। হি, হি, সে কথা আর শ্রুৎ এন না। আমি তখন মেরেকে নিয়ে ব্যস্ত, কিছু দেখতে শুনতে পাইনি, তা না

হ'লে কি আমার এমন হয়? বাছা বিন্দু ছেলেমানুষ, হেঁচ আর শরৎও ছেলেমানুষ। ওরা সব সেদিনকার ছেলে, সেদিন ওদের হাতে ক'রে মারুৎ করেছি, ওদের কি এখনও ভেমন বুদ্ধি-তর্কি হয়েছে? তা নয়, বুদ্ধি থাকলে কি আর এমন কাজ করে? তা না হয়েছে হয়েছে, বিন্দু আর সে কথাটি বুঝে আনে না; তা তাতে তোমার ছেলের বিয়ে আটকাবে না, নিন্দে মেরেদেবই। ভুগুতে হবে, নিন্দে সহিতে হবে, বিন্দুকে আর বাছা সুধাকে। আহা, সে কচি মেয়ে, কিছু জানে না, সে দিন অবধি বেড়াল নিয়ে খেলা করত, আঁকুসি দিয়ে পেয়ারা পেড়ে খেতো, তাকেও এমন কলঙ্ক ডোবার? আহা, বাছার শরীরখানি যেন খেঁয়াকাঠি হয়ে গিয়েছে, মুখখানি শাদা হয়ে গিয়েছে, চোক দুটি ব'সে গিয়েছে। ছুধের ছেলে, এমন কলঙ্ক কি সহিতে পারে? তা কপালে নিন্দে আছে; কে থগাবে বল?

শরতের মা। আহা বাছা সুধার কথা মনে হ'লে আমার বুক কেটে যায়। কচি মেয়ে, ছেলেবেলার বিধবা হয়েছে, আহা, বাছার কপালে যে কি কষ্ট, তা আমরাই বুঝি, সে ছুধের ছেলে, সে কি বুঝবে? তার উপর আবার এই নিন্দে? যারা নিন্দে করে, তাদের কি একটু মারা-দরা নেই গা, একটু বিচার নেই? মুখা কি করেছিল? তার এতে কি দোষ টু বল? আর কাকেই বা দোষ দি? বাছা বিন্দুও ত মনুষ্য ভেবে এ কাজ করে নি; শরৎ হুথাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কলিকাতায় না কি এমন বিয়ে কটা হয়ে গিয়েছে; বিন্দু ছেলেমানুষ, সে মনে ডাবলে, এ বিয়ে হলই বা, না হয় খোঁকে দুটা মন বলবে, শরৎ আর সুধাও বুঝে থাকবে। এই ভেবেই বিন্দু কাজটা

করতে চেয়েছিল, সেও মন ভেবে করেনি, আহা, বিন্দুকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, তার মন মেরে আমাদের গ্রামে নেই। তা বিন্দু আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তাকে আসতে বলো, তাকে দেখলেও প্রাণটা জুড়ায়।

উমার মা। আমি বলি গো বলি; তা সে সমস্ত দিনই কাজ করছে, তাই আসতে পারে না। বাছা হুথাত আর এখন কিছু কাজ করতে পারে না, তার যে শরীর হয়েছে, তাকে বড় কাজ করতে দিই না। আমিও এই শোকে আর গেরে উঠি না, কুটনো কুটতে উমাকে মনে পড়ে, উঠতে দাঁড়াতে উমাকে মনে পড়ে। আহা! বাছা রে, এই বরসে মাকে কে'লে কেমন ক'রে গেলি?

উত্তরে অনেকক্ষণ যৌদন করিতে লাগিলেন। কালীতারা সেই সময়ে ঘরে আসিলেন। উমার মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ কালী, তোর ভাই অমন হয়ে যাচ্ছে কেন? তুই একটু দেখিস বাছা, একটু খাবার দাবার বত্ত করিস, প'ড়ে প'ড়ে কি ব্যারাম করবে?”

কালী। আমি বত্ত করি গো, কিন্তু সদাই পড়া-শুনা করে; খাওয়া দাওয়ার ভেমন মন নেই, তাই কাহিল হয়ে যাচ্ছে।

উমার মা। বিয়ের কথা বলেছিলি?

কালী। একবার কেন, অনেকবার বলেছিলাম।

উমার মা। কি বলে?

কালী। সে কথার কান ধের না, বলে, বিবাহে তার কচি নেই। অনেক জেন ক'রে, মার নাম করে বললে ব'লে, মাকে বলো, মা যদি নিতান্ত ইচ্ছা ক'রে থাকেন,

তবে আমি বিবাহ করব, কিন্তু তাতে আমি সুখী হব না।

উমার মা। ও সবটুকুই অমনই ক'রে বলে গো, তার পর বৌকে পছন্দ হলেই মন ফিরে যায়। আমার বোধ হয়, বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।

শরতের মা। না দিদি, বাছা শরৎ আমার কাছে কখন মনের কথা ঢেকে রাখে না। আমার ভয় করে, আমি জোর ক'রে বিয়ে দিলে পাছে শরৎ অসুখী হয়। আমার কপাল ত অনেক দিনই ভেঙ্গেছে, বাছা কালীর উপরও ভগবান নির্ভর হলেন, (রোদন) কেবল শরৎই আমার ভয়গা, শরৎ যদি অসুখী হয়, এ চক্ষে দেখতে পারব না।

উমার মা। বালাই, কেন গা বাছা, শরৎ অসুখী হবে? তা এখন বিয়ে না করে নেই, পরে করবে, এখন পড়া-শুনার মন দিয়েছে, না হয় পড়ুক না, সে ভালই ত।

শরতের মা। দিদি, পড়াশুনাও যে তখন হচ্ছে, আমার বোধ হয় না। শরতের চিরকাল পড়া-শুনার মন আছে, সে জন্ত সে এমন কাহিল হয়ে যায় না।

উমার মা সে দিন বিদায় হইলেন। কালীতারা বলিলেন, “মা, তবে শরতের জন্ত কি করব? ডাক্তার দেখাব?”

মাতা। বাছা, মনের ভাবনার ডাক্তার কি করবে? চিকিৎসক সে রোগ চিকিৎসা করতে জানে না।

কালী। তবে কি হবে? বিন্দু দিদির সঙ্গে একদিন পরামর্শ ক'রে দেখব? আমাদের এখন বা কষ্ট হ'ত, বিন্দু দিদিই আমাদের পরামর্শ দিতেন।

মাতা। বিন্দু এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে না।

কালী। দেবে বৈ কি মা, আমি এক-দিন বিন্দু দিদির বাড়ী যাব এখন।

শীতকালে শরতের পরীক্ষা আমিল। শরতের সহাধ্যায়ীরা সকলেই বলিল, পরীক্ষার হয় শরৎজন্ম, না হয় তাহার একজন সহাধ্যায়ী কান্তিকচন্দ্র, সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। একমাস পর পরীক্ষার ফল জানা গেল, কান্তিকচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। সে দিনে বিস্মিত হইয়া দেখিল, পরীক্ষার উত্তর ছাত্র-দ্বিগের মধ্যে শরতের নাম নাই।

তখন শরতের মাতা শরৎকে ডাকাইয়া বলিলেন, “বাছা, এত ক'রে প'ড়েও তেনে হাড় কালী ক'রেও ত পরীক্ষার উত্তর হতে পারুলে না। এখন কি করবে?”

শরৎ কিছুমাত্র উত্তর না হইয়া বলিলেন, “মা, একবার পারি নাই, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না। পরীক্ষা বড় কঠিন, অনেকেই প্রথমবার উত্তীর্ণ হইতে পারে না।”

কালীতারাও কয়েক দিন বিন্দু দিদির বাড়ী গেলেন, কিন্তু বিন্দু কোন পরামর্শ দিতে পারিলেন না, বলিলেন, “তোমার মাকে বলিও, জ্যেষ্ঠাই-মার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎ-বাবুর জন্ত বাহা ভাল হয়, তাহা করিবেন। আমরা বোন ছেলেমানুষ, আমরা এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারি?”

কালী এই কথাগুলি মাতাকে বলিলেন।

মাতা। বাছা, সুধাকে কেমন দেখলে?

কালী। সুখা ভাল আছে। কিন্তু কলুকেতার এসে কি বদলে গেছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না। সে এখন ঢেঁড়া হয়েছে, একটু কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু বেশ কাজ-কর্ম করছে। রংটাও সে ছেলে-বেশার মত কাঁচা সোনার রং নেই, এখন

কাল হয়ে গেছে, এখন আর সে তালপুকুরের সেই কচি মেরেটির মত নেই।

বুদ্ধিমতী শরতের মাতা কোন উত্তর করিলেন না। সমস্ত দিন আপনা আপনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কয়েক দিন অবধি প্রায়ই একাকী বসিয়া ভাবিতেন। পরে একদিন রাত্রে শয়ন করিতে বাইবার সময় মনে মনে বলিলেন, "বাছা শরৎ, মাতার প্রতি বাহা কর্ভবা, তাহা তুমি করিয়াছ। ভগবান্ সহায় হউন, সন্তানের প্রতি যাহা কর্ভবা, তাহা আমি করিব।"

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুরুদেবের আদেশ।

পরদিন প্রাতঃকালে শরতের মাতা একখানি শিবিকা আরোহণ করিয়া ভবানীপুর হইতে উত্তরদিকে ঝড়পে বেহালা নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র কুটারের সম্মুখে পাকীর ভিতর রহিলেন, সঙ্গে কি ছিল, সে কুটারের ভিতরে গেল।

ক্ষণেক পরে সেই ঝির সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া আসিলেন। ইহার বয়স কত, ঠিক অল্পভব করা যায় না। মস্তকে অল্পই কেশ আছে, তাহা লম্বা শুক্ল, শরীর গোরবর্ণ ও বলিষ্ঠ, মুখখানি বার্কিকোর রেখায় অঙ্কিত। ইনি তালপুকুরের ঘোষ-বংশের কুলগুরু। গুরুদেবের সঙ্গে একজন তেজস্বী ব্রহ্মচারীও বাহিরে আসিলেন, তিনি সম্ভ্রান্তি কর্ণী হইতে কলিকাতার আসিয়াছেন।

গুরুদেব। মা, আজ কি মনে করিয়া আমাকে সাক্ষাৎ দিতে আসিয়াছ? আইস, ঘরে আইস।

শরতের মাতা বৃদ্ধের সঙ্গে ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন;—**জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা কুশলে আছেন?**

গুরুদেব। ই্যা বাছা, ভগবানের ইচ্ছার আমার শরীর সুস্থ আছে। বাছা, তোমার মঙ্গল।

শরতের মাতা। ভগবান্ জীবিত রাখিয়াছেন; কিন্তু মনের সুখলাভ করিতে পারি নাই। আমার কন্যা কালীতারা আজ কয়েক মাস বিধবা হইয়াছে।

গুরুদেব নীরবে একটু অশ্রুবিধু ভ্যাগ করিলেন, বলিলেন, "মা, রোদন করিও না, ভগবানের বাহা ইচ্ছা, তাহাই সাধিত হইবে, কে নিবারণ করিতে পারে?"

শরতের মাতা। সে কথা সত্য। কিন্তু কালীর বিবাহের সময় আমি গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত অহুসারে কার্য করিয়াছিলাম। আপনি নিবেদন করিয়াছিলেন। আপনার কথা শুনিলে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, বাছা কালীকে এই বয়সে জলে ভাসাইতাম না। সেই সম্ভাপ আমার মনে দিবানিশি জ্বলিতেছে।

গুরুদেব। আপনাকে দোষ দিবেন না। এ সমস্ত মহাব্যয় হাত নহে, এ সকল বিষয়ে আমাদের পরামর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর। আমরা অনেক পরামর্শ করিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া, ভাল বুঝিয়াই কাজ করি, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের কল্পনা ও চিন্তা বিফল হইয়া যায়, ভগবান্ আপনার অভীষ্ট অহুসারে কার্য করেন।

শরতের মাতা। তথাপি সংপরাশ্রম লইয়া করিলে পরে আক্ষেপ থাকে না। পিতা, সেই জন্ত অস্ত্র আপনাকে কাছে আর একটী বিষয়ে সংপরাশ্রম লইতে আসিয়াছি। একটী ক্রিয়া-সম্বন্ধে আপনার বত লইতে আসিয়াছি।

গুরুদেব। মা, তুমি জানই ত আমি ক্রিয়া-কর্মে বাওরা অনেক বৎসর অবধি বন্ধ করিয়াছি, কোন শাস্ত্রীয় মতামতও দিতে এখন সর্থন নহি। আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কলিকাতার ও নবমীপে আছেন, শাস্ত্র আলোচনা করাই তাঁহাদের ব্যবসা, ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে তাঁহারা সুদক্ষ, মতামত দিতেও তাঁহারা সুপরাগ। আমি সে ব্যবসা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কেবল পরকালের সুখের জন্য প্রত্যাহ দেব-অর্চনা করি, মনের ভুটীর জন্য একটু ইচ্ছামুসারে শাস্ত্রাদি পাঠ করি। সে অতি সামান্য।

শরতের মাতা। পিতা, যদি কেবল একটি ক্রিয়া সম্বন্ধে মত লইবার আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, কিন্তু আপনারা আমার স্বামী-দেবের বংশাভ্যুগত গুরুদেব; আপনি আমার স্বামীর মহাশয়ের সুস্থ ছিলেন, স্বামী মহাশয়ের গুরু ছিলেন, আমাদের বংশে একটু বিশদ আপত্তি হইলে আপনার নিকট পরামর্শ লইব না ত কাহার নিকট লইব? আপনি আমাদের সংসারের জন্য যেটুকু স্নেহ ও যত্ন করিবেন, কে সেত্ব করিবে? আমাদের আর কে সহায় আছে?

গুরুদেব। মা, রোদন করিও না, আমার বংশাধ্য আমি তোমাদের জন্য করিব। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষমতা অল্প, বিচ্ছাও অল্প।

শরতের মাতা। বাঁহারা অধিক বিদ্যার অভিমান করেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইতে আমার কুটি হয় না। আপনার কতটুকু বিদ্যা, তাহা আমাদের বন্ধনশে অবিলম্বিত নাই, তাহা না হইলে রক্তপন্নীতে আপনার হৃদয় হুটীরে কাশী প্রভৃতি দূরদেশ হইতে বিভার্ণিধণ আসিত না। পিতা, আপনার কথাই আমার পক্ষে বৈধিক্য।

গুরুদেব। মা, তোমার ভ্রম হইয়াছে, আমার শাস্ত্রজ্ঞান সামান্য, আমাদের শাস্ত্র সমুদ্রতুল্য, আমি গণ্ডুমাত্র জল গ্রহণ করিয়াছি। অধ্যায়ীদিগের সহিত কথাবার্তা কহিতে আমার বড় ভাল লাগে, তাঁহাদের জন্য আমার মনে একটু স্নেহ উদয় হয়, সেই জন্যই ছুই একজন আমার নিকট আসেন, সম্প্রতি কাশী হইতে এই ব্রহ্মচারী ঠাকুর আসিয়াছেন।

শরতের মাতা। পিতা, সেই স্নেহটুকু পাইবার জন্য আমিও আসিয়াছি, কতক স্নেহ করিয়া একটু পরামর্শ দিন।

গুরুদেব। মা, বল, তোমার কি বলিবার আছে, আমি তোমার স্বামীর বংশ বহুকাল অবধি জানি, আমার সামান্য ক্ষমতার যদি তোমাদের কোন উপকার-সাধন করিতে পারি, সাধ্যামুসারে তাহা করিব।

শরতের মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন, “পিতা, আমার পুত্র শরতের সহিত একটি বাণবিধবার বিবাহের কথা হইতেছে, সেই বিষয়ে আপনার মত, আপনার পরামর্শ, আপনার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।”

গুরুদেব শরতের মাতাকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, তাঁহার হিন্দুধর্ম অনুষ্ঠানে প্রগাঢ় মতি জানিতেন, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিম্বিত হইলেন,—বলিলেন, “মা, বিধবা-বিবাহ আমাদের রীতি-বিরুদ্ধ, প্রচলিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, প্রচলিত ধর্ম-বিরুদ্ধ, তাহা কি তুমি জান না? এতো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সর্বসম্মত মত, সকলেই আপনাকে একথা বলিতে পারিত, এটি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ কি জন্য?”

শরতের মাতা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সর্বসম্মত মত জানিতে চাহি না, সে জন্য

আপনার কাছে আসি না। আপনার মত, আপনার পরামর্শ জানিত ইচ্ছা করি, এই জন্ত আসিয়াছি। শ্রবণ করুন, আমি নিবেদন করিতেছি।

তখন শরতের মাতা আপন ছুঃখের ইতিহাস আতোপান্ত গুরুদেবের নিকট বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিন্দুর মাতার কথা, বিন্দু ও হেমের কথা, হতভাগিনী সুধার কথা, তাহাঙ্গিরের কলিকাতায় আসিবার কথা, শরণ ও সুধার পবিত্র প্রণয়ের কথা, লোকের লজ্জাবহ অপযশের কথা, নিরস্ত্র নির্দোষ সুধার অধ্যাত্তি, অবমাননা, অসহ্য যাতন ও শরীরের ছুরবহার কথা, চিরদুঃখিনী কালীতারার কথা, হতভাগিনী উমার কথা সমস্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। সে কথা শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল, কালীর ব্রহ্মচারীর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। শেষে শরতের মাতা বলিলেন, “গুরুদেব, আমাদের চারদিকেই দুর্দশা উপস্থিত, এ ঘোর বিপদে পিতার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলাম। লোকের কথায় মত্ত হইয়া উমার মা উমাকে বড়মাঃ-বের ঘরে বিবাহ দিলেন, বাল্যকালেই সে উমা যতনায় প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা শুনিয়া, আপনার নং-পরামর্শ তখন তুচ্ছ করিয়া, আমি বড় কুলে কালার বিবাহ দিলাম, ভগবান্ সে পাপের শাস্তি আমাকে দিচ্ছিলেন। বাছা কালীর সুখের দিকে চাইলে বুক কেটে যায়। সংসারে আমার আর কেহ নাই, ভগতে আমার আর সুখ নাই; বাছা শরণ ভিন্ন আমার অবলম্বন নাই; আর বাছা হিন্দু ও সুখ আছে। তারাও আমার পেটের ছেলের মত, তাদের অভাগিনী মা মরিবার সময় তাদের

আমার হাতে সঁপিরা দিয়াছিল। গুরুদেব! আপনিই এখন ইচ্ছাদের বন্ধ, আপনিই ইচ্ছা-দিগের অভিভাবক, আপনি এগুলির ভার লউন, বাছা ভাল বিবেচনা করেন করুন; এ অনাথা বিধবা আর এ ভার-বহনে অক্ষম।”

এই কথাগুলি কহিয়া শরতের মাতা ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পিতৃতুল্য গুরুদেব নিকট ছুঃখের কথা বলায় বেন সে ব্যথিত হৃদয় একটু শান্ত হইল।

শরতের মাতার কথা শুনিতে শুনিতে বুদ্ধের চক্ষু অনেকবার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়াছিল, এখন নিরাশ্রয় বিধবাকে যোজন কার্যে দেখিয়া তাঁহার নয়ন হইতে দুই শীর্ণ গগুস্থল বহিয়া টু টু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ কণেক আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কণেক পর বলিলেন, “মা, তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার মন বড় বিচলিত হইতেছে। এখন কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।”

শরতের মাতা। পিতা, বিধবা-বিবাহ মহাপাপ কি না, আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য। গুরুদেব। বাছা, জগদীশ্বরই পাপপুণ্য ঠিক নিরূপণ করিতে পারেন, আমরা শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বলিতে পারি।

শরতের মাতা। তাহাই বলুন। আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে কি এ কাণ্ড রহিত? লোক-নিন্দার কথা আমাকে বলিবেন না; আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই; লোক-নিন্দার আমার আর বিশেষ কতি বৃদ্ধি নাই।

গুরুদেব। মা, শাস্ত্র একপানি নয়, সকল-গুলি এক সময়ের নয়, সকলগুলিতে এক কথা লিখা নাই। যে সময়ে এই হিন্দু জাতির বেকরণ আচার ব্যবহার ছিল, তাহারই সার-ভাগ, উৎকৃষ্ট ভাগটুকুই আমাদের শাস্ত্র।

শরতের মাতা। পিতা, আমি জীলোক, আমি ও সমস্ত কথা ঠিক বুঝিতে পারি না।

কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ কি না, এই কথাটুকু বলুন।

গুরুদেব। এখন ও প্রথা নিষিদ্ধ হই-
রাছে, অতএব এখনকার শাস্ত্রে ও কার্যটি
নিষিদ্ধ বৈ কি।

শরতের মাতা। পিতা, এখনকার শাস্ত্র
আর পুরাতন শাস্ত্র আমি জানি না, আমি
মূৰ্খ অরক্ষা। আপনার পড়িতে কিছু বাকি
নাই, যেগুলি আমাদের ধর্মের বুলশাস্ত্র,
তাহার মর্ম কি, এ দরিদ্র অনাথাকে বুঝাইয়া
বলুন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।
শুনিসাচ্ছি, কলিকাতার কোন কোন প্রধান
পণ্ডিত বলেন যে, শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ
নহে, কিন্তু আপনার মুখে সে কথা না
শুনিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিব না।
আপনার মতই আমার বেদবাক্য।

গুরুদেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে
লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন,
“মা, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি
কিছুই লুকাইব না, আমার মনের কথা
তোমাকে বলিব। তুমি যে পণ্ডিতের কথা
বলিতেছ, তিনি আমার সহায়ারী ছিলেন,
তাহার প্রগাঢ় শাস্ত্রবিজ্ঞা আমি জানি, তাহার
প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা আমি জানি। মা, একদিন
আমি বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবা-
বিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়া
ছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন
আমি শাস্ত্রবিজ্ঞাভিমাত্রী ছিলাম। কিন্তু মা,
বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি
জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন,
তাহার কথাটি প্রকৃত। বিধবা-বিবাহ সনাতন
হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। আমার পরম সুহৃদ
রামপ্রসাদ সরস্বতীরও এই মত, তিনি
তাহার মত প্রকাশ করিয়া তোমাকে আশ্বস্ত
করিবেন।

শরতের মাতা। পিতা, আপনার অনাথা
কন্তাকে যে শাস্তিদান করিলেন, জগদীশ্বর
তজ্জন্ত আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি
শাস্ত্রের কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না, সামা-
জিক রীতির কথাও জিজ্ঞাসা করিব না।
তবে ভগবানের নয়নে কাজটি ভাল কি মন্দ,
এই একটি কথা জানিতে বাসনা করি।
আপনারা দুই জন পণ্ডিত আছেন, একটি
উত্তর দিয়া বিধবাকে শাস্তি দান করুন।

রামপ্রসাদ সরস্বতী। মা, যিনি জগতের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তিনিও এ কথার উত্তর
দিতে অক্ষম, এ হীনবুদ্ধি কিরূপে ইহার
উত্তর দিবে? জগদীশ্বরের অতিপ্রায় অণু-
মাত্রও জানিতে পারে, মনুষ্যের এরূপ ক্ষমতা
নাই। তবে যিনি করুণাময়, তিনি বালবিধ-
বাকে চিরবৈধবা যন্ত্রণা সহ করিবার জন্ত
সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে
অজ্ঞাত হইয়া না।

সরস্বতী ঠাকুরের হির, গম্ভীর, পুণ্যময়
কথাগুলি সেই ক্ষুদ্র কুটারে শব্দিত হইতে
লাগিল। সরস্বতী ঠাকুর কে?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

বৈশাখ মাসে তালপুকুর গ্রামে আমরা
প্রথমে হেমচন্দ্র ও তাহার পরিবারের সহিত
আলাপ করিয়াছিলাম। তাহার আমাদের
এক বৎসর মাত্র পরিচিত হইলেও বড় স্নেহের
পাত্র। পুনরায় বৈশাখ মাস আসিয়াছে,
চল, তাহাদের সেই তালপুকুর গ্রামের
বাটাতে বাইরা বিদায় লই

হেমের কিছু হইল না, তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। তিন বৎসর বাবৎ কলিকাতার থাকিয়া পুনরায় চাষবাস দেখিবার জন্ত ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রনাথবাবু তাঁহাকে হাইকোর্টে কোন একটি কার্য্য দিবার জন্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মার্জিতবুদ্ধি যুবক-মাজ্রাই এমন সুবিধা পাইলে আপনার বিশেষ উন্নতি-সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু হেমের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নহে, বুদ্ধিটা কিছু পাড়াগৈয়ে, সুতরাং তিনি সে কার্য্য না লইয়া পাড়াগৈয়ে ফিরিয়া আসিলেন। শরৎ তাঁহাকে কলিকাতায় আর কয়েক মাস থাকিতে অনেক জেদ করিয়াছিলেন; হেম বলিলেন, “না শরৎ, কলিকাতা নগরী যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে তত কুচি নাই।”

বিন্দু পূর্ববৎ কচি আঁবের অখল রাখিতে তৎপর এবং এক্ষণে সে রন্ধন-কার্য্যের একটি সুবিধাও হইয়াছিল। বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমার উমা ভিন্ন আর সন্তানাদি ছিল না; উমার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে বিশেষ সুখ ছিল না; তিনি প্রায়ই দুই প্রহরের সময় বিন্দুর বাড়ীতে আসিতেন। বিন্দুর বাড়ীর রকে তিনি পা মেলাইয়া বসিতেন, বিন্দুর ছেল-গুলিকে লইয়া খেলা করিতেন, অথবা সনাতনের গৃহিণীর সহিত বসিয়া গল্প করিতেন, সেও বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমার চুলের সেবা করিত। আর বিন্দু, (আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে) সমস্ত দুই প্রহর বেলা নাউশাক কাটিত, সন্মানেপাতা পাড়িত, আঁকুসি দিয়া কচি আঁব পাড়িত। জ্যেষ্ঠাইয়া বলিতেন, “বিন্দু মেয়েটি ভাল বটে, কিন্তু বুদ্ধি-ভুদ্ধি কখনও পাকিল না।”

তারিণী-বাবুর একমাত্র কন্যা মরিয়াকে, তাহাতে তিনি একটু শোক পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিধবী লোক, লজ্জাই সে শোক

ভুলিলেন। তাঁহার কার্য্যও বিশেষ উৎসাহ ছিল, বিশেষ বর্ধমান কালেজেরীং সেরেস্তা-দারী থালি হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উৎসাহী তারিণীবাবুর জীবন উদ্বেগমুক্ত নহে।

শরতের মাতা সান্দ্রনরনে বধু সুধাকে ঘরে আনিয়া বুদ্ধবয়সে শান্তিলাভ করিলেন। বিবাহটা কলিকাতারই হইয়াছিল; কেহ বিবাহে আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না, কিন্তু কাজটা তজ্জন্ত বন্ধ রহিল না। বাহার্য্য কার্য্যে ত্রুটি হইয়াছিলেন, তাঁহার্য্যও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন না। শাস্ত্রপ্রতি দেবীপ্রসন্নবাবু একবার আসিবেন আসিবেন মনে করিয়া-ছিলেন, কিন্তু এগবার বাড়ীর ভিতরে সে কথাটা উত্থাপন করার বিশেষ হিতকর উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর আর আসিবার কথাও কহিলেন না। পাড়ার দলপতি, সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ একটা খুব হলভুল করিলেন, খুব গণ্ডগোল করিলেন, কাজটার বাধা দিবারও বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কাল গিয়াছে, সেরূপ বাধা দেওয়ার এক্ষণে লোকের গুণাগুণ প্রকাশ পায়, কাজ বন্ধ থাকে না। চন্দ্রনাথ সমস্ত ভবানীপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সেই বিবাহে নিমন্ত্রণ থাইতে আসিলেন, কলিকাতার অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিলেন, আনন্দের সহিত সে শুভকার্য্য নিম্নিষে সম্পন্ন হইল। পাড়ার সর্কশাস্ত্রজ পণ্ডিতগণ বিবাহ-সমাজে বিচ্ছা-সাগর মহাশয়ের দলের কোন কোন পণ্ডিত আসিবেন বলিয়া সে দিকে বড় ঘোঁষিলেন না। পাড়ার দেশহিতৈষী আর্য্যসন্তানগণ, বাহার্য্য এই অনার্য্য কার্য্যে বাধা দিবার জন্ত ঢিল ছুড়িতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার একজন অনার্য্য পুলিশের সার্জনের বিকৃত মুখ দেখিয়া অচিরে (ঢিল পকেটেই রাখিয়া) তথা হইতে অদূত হইলেন।

শরৎ ও হেম পল্লীগ্রামে আসিলে গ্রামস্থ লোকে প্রথমে তাঁহাদের সহিত আহার-ব্যবহার করিলেন না। কিন্তু তারিণী-বাবুর দ্বীয় অনেক অনুরোধে তারিণী-বাবু শেষে সকলকে ডাকাইয়া একটি মীমাংসা করিয়া দিলেন। বীবাংসা হইল যে, শরৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু শরৎ কলেজের ছেলে, বলিলেন, “আমি যে কার্য্যটি করি-রাছি, তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না।” শেষ শরতের মাতা একদিন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া দিলেন। তারিণী-বাবু রসিক লোক ছিলেন, হাসিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন, “ওহে বাবু, তোমরা বুঝ না, বুটের জল যে দিক্ দিয়েই যাক, শেষকালে গিয়া নদীতে পড়িবেই পড়িবে। তোমরা বিধবাই বিয়ে কর আর ঘরের বোকেই বাঁর করে নিরে যাও, বামুনদের পেটে কিছু পড়িলেই সব চুকিয়া যায়। এই আমাদের সমাজ হইয়াছে, তা তোমরা আপত্তি করি-যেই কি হইবে?” শরৎ উত্তর করিলেন, “এরূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্যস্বাভাবী ভাৱ অভ্যাসের বিচার না থাকিলে সে সমাজ থাকে না।”

সনাতনের স্ত্রী অনেকদিন বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিত;— বলিত, “আমি তখনই বলেছিহু গো, কল্কে-তায় বেও না, কল্কেতার গেলে জাতধর্ম থাকে না। ও মা, সোনার সংসার কি হলো পা? আহা, আমার সুখাদিদি আমার চিনি-পাতা দৈ খেতে বড় ভালবাসুক গো, ও মা, তার মনে এত ছিল, কে জানে বল? ও মা, তখনই বলেছিহু গো কলেজের ছেলে জেস্ত মাস্তবের গলার ছুরী দেয়; ও মা, তাই করে পা?” ইত্যাদি ইত্যাদি।

কল্কেতনের গৃহিণী মনে মনে সুধাকে

অনেক তিরস্কার করিত, কিন্তু মায়া কাটাইতে পারিল না, আবার লুকাইয়া লুকাইয়া চিনি-পাতা দৈ শরৎ-বাবুর বাড়ী লইয়া যািত। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব সন্তাৰ স্থাপিত হইল।

শরতের মাতা পূর্ববৎ ধর্ম্মকর্মে সমস্ত দিন মন দিতেন, সংসারের কিছু দেখিতেন না। কালীতারা সংসারে গৃহিণী, এত দিন পর জীবনের শাস্তি কাহাকে বলে, তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি ভাঁড়ার রাখিতেন, রন্ধ-নাদি করিতেন, সমস্ত গৃহটি পরিপাটি রাখি-তেন, সংসার চালাইতেন। সুখা শরতের মাতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত, কালী-দিদিকে স্নেহ করিত, কালীদিকি বাহা বলিত, তাহা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। ঘর ঝাঁট দিত, উঠান ঝাঁট দিত, পুকুর হইতে জল আনিত, বাটনা বাটিত, কুটুনো কুটিত, দুধ জাল দিত, আর পুকুরে বাইরা বাসন মাকিতে বড় ভালবাসিত। পুকুরধারে আঁব-গাছ ছিল, কাঁঠালগাছ ছিল, অভ্রান্ত কলের গাছ ছিল, সুখা সেইখানেও ঘুরিত, যে কলটি পাকিত, কালীদিদির কাছে আনিয়া দিত।

একদিন সন্ধ্যার সময় সুখা সেই গাছগুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কি একটা মনে ভাবিতেছে, এমন সময় শরৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল, “কি ভাবিতেছ?”

সুখা একটু লজ্জিত হইয়া মুখ ঢাকিয়া বলিল, “বলিব না।”

শরৎ। হ্যাঁ, বলিবে বৈ কি, বল না?

শরৎ ধীরে ধীরে সেই কুসুম-শুবকতুল্যা দেহখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে লজ্জাব-নতমুখার প্রফুল্লিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুখন করি-লেন। সে স্পর্শে সুখার সর্বশরীর কঁকরিত

সংসার।

হইল। লজ্জার অভিভূত হইয়া সুধা বলিল,
“ছি। ছেড়ে দাও।”

শরৎ ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, “তবে
বল।”

সুধা একটু হাসিয়া বলিল, “ছেলেবেলার
জোমাদের বাড়ীতে যখন আসিতাম, তখন
এই পেরারা-গাছের পেরারা তুমি আমাকে
পাড়িয়া দিতে, তাই মনে করিতে-
ছিলাম।”

শরৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “সেই আমা-
দের প্রথম প্রণয় এখনও ভুলিতে পার
নাই?”

আমাদের লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে,

শরৎ গাছে চড়িলেন, সুধা নীচে পেরারা
কুড়াইতে লাগিল। এমন সময় ঘাটের নিকট
একটা শব্দ হইল, কালীদিদি ঘাটে আসি-
তেছেন। সুধা লজ্জিত ও ভীত হইল,

এবার শরৎ-বাবু কোন্ পথ দিয়া পলাই-
বেন? কিন্তু সুধা স্বামীর সমস্ত ক্রমতা ও
গুণ জানিতেন না, শরৎ সেই গাছ হইতে
এক লাফে বেড়া ডিলাইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত-
মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

শরৎ সে বৎসর সম্মানের সহিত পরী-
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি লেখা-পড়া
বিলক্ষণ শিখিলেন; কিন্তু বিন্দুদিদি আক্ষেপ
করিতেন, গাছে চড়া অভ্যাসটি গেল না।

উৎসর্গ-পত্র ।

বঙ্গীয় সাহিত্যকে বাঁহারা নূতন রূপ, নূতন বল,

নূতন সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন,

বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে বাঁহারা নূতন আশা,

নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন,

পঞ্চ, গল্প ও নাটকে বাঁহারা বঙ্গভাষাকে

নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন,—

মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত

ও দীনবন্ধু মিত্র,

সেই মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম ।

চৈত্র-সংক্রান্তি,

১৩০০ বঙ্গাব্দ ।

}

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।



সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

চুল বাঁধা ।

মাতা । তাই তাই তাই !

শিশু । তাই তাই তাই ।

মাতা । আমার বাড়ী বাই ।

শিশু । আমার বালি দাই ।

মাতা । তাই তাই তাই ।

শিশু । তাই তাই তাই ।

মাতা । মাসীর বাড়ী বাই ।

শিশু । মাতি বালি দাই ।

মাতা । মাসী নেবে কোলে ।

শিশু । মাতি নেবে তোলে ।

মাতা । সন্দেশ দেবে গালে ।

শিশু । তাকে দেবে দলে ।

মাতা । কীর দেবে পাতে ।

শিশু । ধি দেবে পাতে ।

মাতা । চিনি দেবে হাতে ।

শিশু । তিনি দেবে আতে ।

মাতা । বাবা আসবেন ঘরে ।

শিশু । বাবা আবে দলে ।

মাতা । খোকা নেবে কোলে ।

শিশু । গাগা নেবে তোলে ।

মাতা । হার দেবে গলে ।

শিশু । হা দেবে দলে ।

মাতা । চুশো দেবে গালে,—

“কাকে চুশো দেবে লো ?” শিশু ও
মাতার মিষ্টালাপ হইতেছিল, এমন সময়ে

বরষা একজন নারী সহসা ঘরের ভিতর
আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কাকে
চুশো দেবে লো ? ছেলেকে, না ছেলের
মাকে ? ইস্ট্রী আজ যে বড় ষটা !
“আয়োজন হচ্ছে যে !”

লজ্জার আরক্তমুখী হইয়া শিশুর যুবতী
মাতা মাথা হেঁট করিলেন, চক্ষু মুদিত
করিলেন । লজ্জার ললাট, গণ্ডস্থল, চক্ষুর
চৰ্ম্ম পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল, প্রফুল্ল পুষ্পের স্থায়
ওষ্ঠ দুটি কাঁপিতে লাগিল ।

সত্যই আজ বড় ষটা ! শিশুর মাতা
ঘরের শানে বসিয়া সম্মুখে একটি দর্পণ রাখিয়া
চিরুণি লইয়া কেশবিন্যাস করিতেছিলেন ।
একদিকে পানের ডিবে, আর একদিকে
(আমাদের লিখিতে লজ্জা হয়) মেকসম
অয়েল প্রভৃতি নানারূপ সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের
উপকরণ রহিয়াছে । কি কি দ্রব্য আছে,
আমরা ঠিক জানি না, যৌবনোদ্ধতা সৌন্দর্য্য-
বিক্রমিতা রসিকাগণই সে উপকরণের বিশে-
ষত্ব অবগত আছেন

কাকপক্ষের স্থায় কৃষ্ণ-কেশপাশের উপর
চিরুণি ঘন ঘন চলিতেছে, সুন্দর, সুগোল,
সুললিত বাহুলতার বলর নন্দমুখ ঝুম্ ঝুম্
বাজিতেছে, অনাবৃত অনিন্দনীয় প্রিয় কণ্ঠে
সুবর্ণ-হার ছলিতেছে, অলঙ্কার-বিনিবন্ধিত
ওষ্ঠদ্বয়ে মুছ হাসি অনবরতই ফুটিতেছে ।
সে অঙ্গরোবিনিবন্ধিত প্রতীমুর্তি সুন্দর দর্পণে
প্রাতিকলিত হইয়াছে । সম্মুখে ঘরের দেয়ালে
একখানি ছবিতে শ্রীযাম, সীতা ও এক সিংহ

মুষ্টি বিরাজমান রহিয়াছে, পাখির কোমলে
সাবিত্রী ও সত্যবান, ললিতা ও কামরূপী
প্রভৃতি প্রাতঃসরসীর দম্পতিগণ বিরাজ
করিতেছেন। সমুখে একটি ছোট মাছের
উপর শিশু বসিয়া খেলা করিতেছে, যাতা
শিশুকে কথা কহিতে শিখাইতেছেন, অথবা
অল্পমনস্ক হইয়া এক একটি সলীত ঘুড় ঘুড়
ধরে উচ্চারণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখি-
য়াই বরষা ধরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“শিশুর পিতা কাহাকে স্নেহচূষন প্রদান
করিতেন?” শিশুর মাতা লজ্জার কণেক
অধোমুখী হইয়া পরে হাসিয়া বলিলেন,
“ঠাকুরকি, তোমার কি সকল কথাই ঠাট্টা?”

ঠাকুরকি। না বোন, ঠাট্টা আর কিসে
হ'ল? বলি, মনের কথাটা খুলে বল দেখি,
যাক এত আয়োজন কি শুধু শুধু?

ব্রাহ্মবধূ। আয়োজন আবার কিসের?
মেরেমাছবে কি চুল বাঁধে না?

ঠাকুরকি। তা বাঁধে বৈ কি বোন,
তবে আজ তাবিজ-বাছুর বাহার কিছু বেশী
রকম, তাই বলছি।

ব্রাহ্মবধূ। তা ঠাকুরকি, মেরেমাছবে কি
গরনা পরে না?

ঠাকুরকি। পরে বৈ কি, তবে আজ
আবার স্নানর স্নানর ফুল ও ফুলের মালারও
আয়োজন দেখছি।

ব্রাহ্মবধূ। তা ঠাকুরকি, মেরেমাছবে
কি ফুল পরে না?

ঠাকুরকি। পরে বৈ কি, তবে আজ
আবার গুন্ গুন্ করে গান হচ্ছিল, ঠোঁটে
ভাসি যে ধরে না ধো?

ব্রাহ্মবধূ। বলি ঠাকুরকি, যাত্রার গান হই
একটা তোমার কাছেই শু শিখেছি। আর
মেরেমাছবে কি কখনও হাসে না, সদাঃ
কাঁদে?

ঠাকুরকি। তা হাসে বৈ কি বোন,
আবার আনন্দ হ'লে মেরেমাছবের দুকটাও
একটু খড়াস খড়াস করে। কেমন, ঠিক কথা
বলেছি কি না?

ব্রাহ্মবধূ পরাক্ত হইলেন, লজ্জার অভিজুতা
হইলেন। রঞ্জিতমুখী বলিলেন, “ঠাকুরকি,
তোমার পায়ে ধরি, আর ঠাট্টা করো না,-
এই নাও চুল বাঁধা রেখে দিলেম।”

ঠাকুরকি। বালাই! চুল বাঁধা রাখ'বি
কেন বোন? তোদের চুল বাঁধবার ত
বয়সই এই। তোরা গরনা প'রবি নি ত
গরনা প'রবে কে? তোদের মুখে একটু
হাসি দেখলে আমাদের প্রাণটা জুড়োর।
আর বোন, ভাল ক'রে বোস, আমি তোরা
চুল বেঁধে দি। এমন ঘোঁপা বেঁধে দেব,
হাজার টাকা ফুল।

ব্রাহ্মবধূ স্বধার আপত্তি সত্ত্বেও স্নেহময়ী
ননদিনী কালীভারা পার্শ্বে বসিয়া সবস্ব
ঘোঁপা বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। সে ঘোঁপা
বাঁধিতে অনেককণ লাগিল, সন্ধ্যা হইয়া
আসিল, তথাপি ঘোঁপা বাঁধা শেষ হইল না।
ইত্যবসরে আমরা একবার গ্রামটা পরিক্রমণ
করিয়া আসি, গ্রামের খোসগল্ল ছই একটা
সংগ্রহ করিয়া লই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের ব্যবস্থা ।

আজ আট বৎসর সুধার বিবাহ হইয়াছে । অনেক গোলবোগের পর বিধবার বিবাহ হয়, বিবাহ হইয়াই যে গোলবোগ থাকিবে, আমাদের সেরূপ সমাজ নহে । শরতের মাতা ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন, সুধার জ্যোতী-মহাশয় তারিণী-বাবু দলহ লোকের অনেক অল্পনয়ন করিলেন, স্বদেশবৎসল শরচ্চন্দ্র গ্রামের অনেক উন্নতিসাধন করিলেন, দমার্জ-জদয়া সুধা গ্রামের গরিব দুঃখী সকলকে রোগে, শোকে, বিপদে, দুঃখে, আত্মীয়ের জ্বরে, ভগিনীর জ্বরে সাহায্য করিতে লাগিলেন । শরৎ ও সুধার অনিন্দনীয় চরিত্র, শেষের পরোপকার ও অকপট দেশহিতৈষিতার সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল । কিন্তু সবাচরণে জাতিরক্ষা,—গহিতাচরণে জাতিধ্বংস,—এ নিয়ম আমাদের প্রাচীন-কালে ছিল, এখনকার সমাজের রীতি নহে ।

তালপুকুর ও নিকটস্থ গ্রামের সমাজ-পতিগণ বৈকিয়া বসিলেন,—বলিলেন, “বিধবা-বিবাহ স্বীকার করিলে হিন্দুধর্মের আর রহিল কি ?” সর্বশাস্ত্রজ্ঞ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ তারত্বরে উচ্চারণ করিলেন, “বিধবাবিবাহপ্রথা ব্যভিচারমাত্র ।”

ভাগ্যক্রমে হেম ও শরৎ উক্ত সমাজ-পতি ও দিগ্‌গজদিগের সহিত জুটুখিতা পাতাইবার জন্ত বিশেষ উৎসুক ছিলেন না এবং তাঁহাদিগের মহামতের জন্ত অনাহারে

বা অনিদ্রার কাল কাটাইতেন না । হেমচন্দ্র স্নিকের সম্পত্তি হইতে বৎসামাত্র আর পাই-রাও তালপুকুর গ্রামে বহুদৈ কালবাপন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র ও কন্যাদিক সময়ে লাভন-পালন করিতে লাগিলেন । শরচ্চন্দ্র প্রজ্ঞানবরনা, সরলহৃদয়া, মেহময়ী দারীর পুত্রী পদম সুখে কলিকাতার বাস করিতে লাগিলেন এবং সম্মানের সহিত একে একে কলেজের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন ।

সুধার জ্যোতীমহাশয় তারিণী-বাবুর বড় বিপদ ! তিনি সেকলে লোক, সমাজপতি-দিগের সহিত বিরোধ করিতে পারেন না, অথচ বিষ্ণু ও সুধা ভিন্ন তাঁহার আর এখন কে আছে ? তাহাদেরই বা পায়ে ঠেলেন কি প্রকারে ? সামাজিক বুদ্ধিমান লোকে বাহ্য করেন, বুদ্ধিমান তারিণী-বাবুও তাহাই করিলেন । গোপনে বিষ্ণু ও সুধার সহিত সম্পর্ক রাখিলেন, প্রকাশ্যে তাহাদের একঘরে করিলেন ।

সুধার বিবাহের তিন বৎসর পরে তারিণী-বাবু একবার তিনমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানা জমকাইয়া বসিলেন । মহাজনি, তেজারতি, লয়িকাবী সকল প্রকার ব্যবসায়ে তাঁহার দুর্দমনীয় বিষয়বুদ্ধি পরিচালিত হইতে লাগিল । প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁহার ঘর লোকাকীর্ণ—কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, কেহ হিসাব মিটাইতে আসিয়াছে, কেহ কর্তব্য করিতে আসিয়াছে, কেহ সুখ দিতে আসিয়াছে, কেহ বা কেতখানি ভাগে লইবার জন্ত আসিয়াছে । গ্রামের প্রধান প্রধান দল-পতিগণ তাঁহার তত্ত্বপোষে বসিয়া অল্পপস্থিত বন্ধুদিগের চরিত্রের শ্রদ্ধা করিতেন, পাণ্ডিত্যভিমানিগণ সমবেত হইয়া সমাজের

* বিবাহা সুধার বিবাহের কথা ও পূর্ব-ইতিহাস জটিলিতে চাহেন, তাঁহারা সংগ্রহীত “সংসার” নামক উপন্যাসখানি পাঠ করিবেন ।

বিক্রমে অপারাবিগণকে দত্তিত করিয়া হিন্দু-
আচার সংরক্ষণ ও নিজের উন্নয়নশক্তি করিতেম,
কস্তারায়গ্রস্ত পিতৃগণ কস্তাদায় উদ্‌যাপন
কৃত্ত পরামর্শ করিতেম এবং আদালতের
কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ বর্ধমানের নাজীর
বহাশরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনাকে
কৃত্তার্থ মনে করিতেম। কলতঃ তালপুকুর
গ্রামে তারিগীরণ মল্লিকের জায় জ্ঞানী,
মানী ও সর্বজন-সমাদৃত অস্ত্র আর কে
আছে ?

এ সম্মান সত্ত্বেও বুদ্ধের হৃদয় নিশ্চিন্ত
ছিল না। একমাত্র কস্তার মৃত্যুশোক সে
বিষয়ী লোকের হৃদয়ে অধিক দিন স্থান
পাইল না। কিন্তু নিজের মৃত্যুর পর
তালপুকুরের মল্লিকবংশ নির্বংশ হইবে, এ
ভাবনা তাঁহার অসহ্য। তাঁহার পরামর্শ-
দাতারও অভাব ছিল না।

মলপতি ও সমাজপতিগণ সর্বদাই
বলিতেন, “তারিগী বাবুর এমনই কি বয়স
হইয়াছে, এই ত বিবাহের পরিপক্ব বয়স।
মানে বল, ধনে বল, জ্ঞানে বল, এরূপ বয়স
কি আজকাল কস্তার ভাগ্যে সহসা ঘটে ?
পুনরায় দারপরিগ্রহ করুন, নববধূ ঘরে
আনুন, আশু পুত্রমুখ দর্শন করিয়া শান্তি-
লাভ করুন। ঐ মিত্রদের বাড়ীতে নয় বৎস-
রের সুন্দরী কস্তা আছে, ঘটক পাঠান। কস্তা
ভাগ্যবতী না হইলে কি এমন উপযুক্ত পাত্র
পায় ? কস্তার পিতৃকুল এরূপ সঙ্কটে উদ্ধার
হইয়া যাইবে।” নয় বৎসর-বয়স্কা প্রণয়িনীর
মুখমধু আশ্বাসন করিতে তারিগী-বাবুর বিশেষ
আপত্তি ছিল, এমনত বোধ হয় না। গ্রামে
কেহ কেহ বলিত, তারিগী-বাবু সেই মনে
করিয়াই ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন !
বাহা হউক, এরূপ প্রস্তাবে তারিগী-বাবু শীঘ্র
কোন উত্তর দিতেন না।

মোনই সমুদ্রের লক্ষণ জানিয়া ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিতগণ বন বনে বলিতে লাগিলেন, “ভা
এ ত ভাল কাজই, প্রথম সংসারের কোন
সন্ধান নাই, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবেন,
এ ত শাস্ত্রসম্মত কার্য। আশে নয় বৎসরের
কস্তা ত গৌরীতুল্যা। পুরুষের বয়স সঙ্কটে
শাস্ত্রে কোন বিধান নাই, বয়স যতই হউক
না, পুরুষ বিবাহ করিতে সমর্থ। আর
তারিগী-বাবুর এমনই কি বয়স হইয়াছে ?
তা, এ শুভ কার্যের এখনই সমস্ত আয়োজন
করুন। তারিগী-বাবু, ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানী,
বিজ্ঞ লোক, পুত্রকামনার ও বংশরক্ষা
কামনার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া ধর্মী
চরণের জলন্ত দৃষ্টান্ত সকলকে প্রদর্শন করুন।
তারিগী-বাবু প্রকাশ্যে এ প্রস্তাবের উত্তর
দিলেন না, কিন্তু নবম-বর্ষীয়া বধূর কথা
আলোচনা করিয়া বুদ্ধের হৃদয়টা নাচিয়া
উঠিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সে দিন বিলক্ষণ
পারিতোষিক পাইলেন।

তারিগী-বাবুর বিশেষ সুহৃদ-বন্ধুগণও
এই পরামর্শ দিতেন। তারিগী-বাবুর মুখে
হাসি ধরিত না, তবে একটু অসম্মতির লক্ষণ
দেখাইয়া বলিতেন, “কি জান ভায়া, আমার
এ কাজে বড় মন নাই, তবে এই মল্লিকবংশ
দীপশ্রুত হইবে, তাহা ভাবিলে বড় আক্ষেপ
হয়।”

বহু। তা বৈ কি, আপনি নিজে
নিঃস্বার্থ নিশ্চল লোক, তাহা তালপুকুর ও
বর্ধমানে কে না জানে ? তবে বংশরক্ষা ধর্ম
সম্মত কার্য ; সেই জন্য, একটু কষ্ট স্বীকার
করুন। তা আপনি বলিয়া এক কষ্ট স্বীকার
করিতেছেন, সকলে কি এরূপ করে ?

(ঘরের কোণে একটি পাড়ার ছঁট ছেলে
বসিয়া ছিল, তারিগীবাবুর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ-
রূপ কষ্ট-স্বীকারের কথাটা শুনিয়া হাসি

সংবরণ করিতে না পারিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পালাইল। ছোঁড়াটা নিতাই ছুটিল।)

তারিগী বাবু। আর কি জান ভায়া, এই দুইটা ভাইঝিকে হাতে করিয়া মাহুব করি-রাছি, তাহাদেরও কিছু দিনে বাব মনে করিয়া-ছিলাম। তবে আজকালের ছেলে মেয়েরা সবই বেয়াড়া, ধর্মপথে ত কেহ চলে না।

বহুপণ। সে কথা আর বলেন কেন? আপনি ঐ বিলুপ্তবাসিনীর জন্ত আর সুখার জন্ত বা করিয়াছেন, আমরা কি আর তাহা দেখি নাই? সে ত সেদিনকার কথা। আপনি না থাকিলে দুটো অনাথা মেয়েকে খাওয়াত কে? পরাত কে? মাহুব করিত কে? আপনার দয়ার জয়, সেই জন্ত এত করিলেন, সকলে কি এত করে? তা, সেই মেয়ে দুইটা কি আরী না শিশুটি? এমন দয়াবান গুরুর কথা না শুনিয়া, ধর্ম্মে জলা-ঞ্জলি দিয়া, কি না বিধবা-বিবাহ! ছি! ছি! দুঃখি! তারিগী-বাবু, তাহাদের আর নাম করি-বেন না, পাপিষ্ঠাগুলার নাম করিলেও পাপ হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক, তাই তাহা-দের এ গ্রামে থাকিতে দিয়াছেন, অস্ত্রে হইলে তাহাদের মাথা মুড়াইয়া মাথার ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিত।

তারিগী বাবু। আর কি জান ভায়া,— মনের কথা তোমাদের খুলিয়া বলি, তোমা-দের না বলিলে কাহাকে বলিব? দিন দিন গৃহিণীর শরীরটা বড়ই অবসর হইয়া পড়ি-তেছে, তাঁহাকেও একজন দেখিবার স্তনি-বার লোক চাই। তা আমি ত সর্বদা বর্জমানের থাকি, সর্বদা ঘেঁষিতে পারি না, অল্পবয়স্ক আপনার লোক একজন ঘরে থাকিলে আমার গৃহিণীরও পরিচর্যা করিতে পারে, গৃহিণীর উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা হয়, এই জন্যই এ কার্যে মত দিতেছি,—

নচেৎ আমাদের এ বয়সে হার-পরিগ্রাহে একেবারেই মন নাই। এখন বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, এখন পারমার্থিক বিবরণেই মন দেওয়া জ্ঞেয়।

বহুপণ। তা সে কথা কি আর বলিতে হয়? আপনার নিম্পুহ সময় সভাব কি আমরা জানি না? আপনি যেরূপ গৃহিণীর প্রতি বহু করেন, আজকাল কয়জন সেরূপ করে? শাস্ত্রে বলে, নারী পুত্র-সন্তান এসব না করিলে পরিভাজ্য—অর্থাৎ তাহার মাথা মুড়াইয়া, ঝাঁটা মারিয়া বাজারে বাহির করিয়া দিবে। তবে যে আপনি এতদিন তাঁহাকে সযত্নে গৃহে রাখিয়াছেন, খাওয়া-ইতেছেন, পরাইতেছেন, এ আপনার দয়া। এক্ষণে যে তাঁহার পরিচর্যা করিবার বিধান করিতেছেন, সেও আপনার দয়া।

পরামর্শ অনেককণ চলিতে লাগিল। পরামর্শে কি ঠিক হইল, তাহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মকর্ত্তা যখন মত স্থির করিয়াই গ্রামে আসিলেন, তখন পরামর্শটি বিড়ঘনা মাড়।

তারিগী-বাবুর বাড়ীতে জাতিরসম্মী বঁাহারা বাস করিতেন, তাঁহার সর্বদা উমার মার শুশ্রূষা করিতেন। বাহিরে বৈঠকখানার যে কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অগোচর রহিল না এবং তাঁহারও অবিলম্বে নানা অলঙ্কার সহ সে কথাটি উমার মার কানে তুলিলেন।

রোগক্লিষ্ট উমার মা এক বিলুপ্ত চক্কর জল মোচন করিলেন;—বলিলেন, “যখন উমাকে হারাইয়াছি, তখন এ সংসারে সমস্ত হারাইয়াছি, সংসারে আমার আর সুখ নাই। বাবুর যদি কচি হয়, দ্বিতীয় সংসার করুন; তরঙ্গা করি, তিনি দ্বিতীয় সংসারে সুখী হইবেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:—

বিবাহের পাত্রী।

তালপুত্রের মিত্রদের আগে ভাল অবস্থা ছিল, এখন অবনতি। তালুক বাহা ছিল, তাহা অনেক দিনই গিয়াছে, দুই একটা জমা-জমী ছিল, তাহা দ্বারা মিত্র মহাশয় কোন প্রকারে সংসার চালাইতেন। যে বৎসর উমাতারার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই অনাথা বিধবা ও দুইটি সন্তান—রাখিয়া মিত্র মহাশয় পরলোক-গমন করেন। একটি পুত্র-সন্তান, নাম গোবুলচন্দ্র, অপরটি কন্যা-সন্তান, নাম গোপবালা।

মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে অনাথা বিধবা ও সন্তান দুটি বড়ই কষ্টে পড়িল এবং তাহা-দিগের সংসার-চালাইবার হইয়া উঠিল। গ্রামস্থ সন্ন্যাসী লোকে কিছু কিছু সহায়তা করিলেন, কিন্তু যখন কলিকাতা হইতে কিরিয়া আসিলেন, তখন মিত্র-পরিবারের যথেষ্ট সাহায্য করিলেন, মিত্রদিগের জমা-জমী বাহা ছিল, তাহা ভাগে বন্টাবদ্ধ করিয়া দিলেন, পরিবারের বাইবার ভত্তে মধ্যে মধ্যে চাউল, ডাল, তরিতকারি পাঠাইতেন, বর্ষাকালে তাহাদের বাড়ীর উঠানে কতকগুলি বেগুনগাছ ও নানা প্রকার শবজ রোপণ করিয়া দিতেন এবং শীতকালে ছেলেদের অন্ন গরম জামা সহজে সেলাই করিয়া দিতেন। সর্বদা দেখিতে যাইতেন এবং শিশু গোপবালা সর্বদা বিন্দুর বাড়ী খেলা করিতে আসিত।

গোবুলচন্দ্র গ্রামের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, কিন্তু পিতৃবিয়োগবশতঃ এখন অধ্যয়ন ত্যাগ করিল, কার্যের চেষ্টা

দেখিতে লাগিল। ১৫ বৎসরের অশিক্ষিত বালকের কি কাজ মিলিবে? কিন্তু ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান, ৮ টাকা ১০ টাকার বকশীগিরি বা সরকারি করিয়া কিছু টাকা করিল এবং এখন রাস্তা পথের কটাক্টি লইয়া বিশেষ উপার্জন করিতে আরম্ভ করিল। মাকে ও ভগিনীকে বড় কিছু পাঠাইত না; গোবুল বুদ্ধিমান, টাকা জমাইতে জানে।

তালপুত্রে গোবুলের মা ও ভগিনী জমী হইতে সামান্য আয় পাইয়া এবং বিন্দুর সাহায্যে কোন প্রকারে সংসার চালাইত। বিন্দুর কন্যা সুশীলার বয়স যখন সাত বৎসর, গোপবালার বয়স তখন নয় বৎসর, সুতরাং দুই জনে সর্বদাই একত্র বিন্দুর উঠানে খেলা করিত। সুশীল শ্রীমবর্ণা ও বড় ভাল মান্নব, চক্ষু দুটি মার মত সুন্দর ও বিশাল, কিন্তু মেয়েটি বিশেষ সুন্দরী নহে। গোপ-বালা বড় ধারাল মেয়ে, বড় সেয়ানা, বড় সুন্দরী। যুথখানি সৌন্দর্য ও বুদ্ধির লক্ষণে বিভূষিত, রং যেন কাঁচা সোনা, জলতা যেন তুলি দিয়া আঁকা, চক্ষু দুটি কি উজ্জ্বল, কি তীক্ষ্ণ! তালপুত্র গ্রামের মধ্যে একরূপ ফুট-ফুটে মেয়ে আর ছিল না, গ্রামের বিস্তীর্ণ বাগানে বা বৃক্ষচ্ছায়ার মেয়েটি যখন ছুটা-ছুটি করিয়া খেলা করিত, বোধ হইত যেন, কোন দেবকন্যা নন্দনকাননে বিচরণ করিতেছে। ক্রমবশতঃ মাঠে বাইবার সময় মেয়েটিকে দেখিলে ফিরে চাহিত, ঘাট থেকে মেয়েরা জল আনিবার সময় কলস নামাইয়া একবার মেয়েটিকে কোলে লইত।

গোপবালা যেমন সুন্দরী, তেমনি সেয়ানা। নয় বৎসরের মেয়ের যে পেটে পেটে বুদ্ধি, তাহা দেখিয়া গ্রামের বয়স্ক-গণ বিম্বিত হইতেন। সে একলা ভাবিত,

একলা মতলব স্থির করিত, একলা গোপনে সম্পাদন করিত। সুশীলার সহিত খেলা করিত, কিন্তু সুশীলা হাবা দেয়, গোপ-বাংলার মন কি বুঝবে? সুশীলাকে তুষ্ট করিয়া তাহার খেলার সামগ্রীগুলি একে একে সংগ্রহ করিত, বিন্দু ও স্নুধাকে মা বলিত ও কখন একটি খেলানা, কখন মিঠার, কখন একখানি ঢাকাই কাপড় সংগ্রহ করিত। বিন্দু বলিলেন, “আহা, যেহেটি কি শাস্ত, কি নশ্র, কি স্তম্ভীর। দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।”

মল্লিকবাড়ী হইতে গোপবাংলার মার নিকট ঘটকী আসিল। গোপীর মা গালি দিয়া বলিলেন, “বলিস্ কি পোড়ারমুখী, আমার মেয়েকে জলে ডাসাইয়া দিব? ৫০ বৎসরের বুড়োর সঙ্গে আমার কচিমেয়ের বিয়ে দিব? টাকা নিয়ে কি মেয়ে ধরে থাকবে, গরমা নিয়ে কি মেয়ে পেতে শোবে? হলেম বা আয়রা গরিব, আমরা গরিবই থাকব, টাকা নিয়ে মেয়েকে বিক্রয় করুব না। ও মা, ছি! ছি! ছি! ছি! বলি, বুড়ো যে আমার গোপীর ঠাকুরদাদার বয়সী,—বাছা উমার যদি ছেলে থাকত, সে যে আজ প্রায় আমার গোপীর বয়সী হত, বিন্দুর মেয়ে যে প্রায় আমার গোপীর বয়সী,—আর সেই বিন্দুর জ্যেষ্ঠা, উমার বাপ, সে কি না আমার গোপীকে বিয়ে করতে চায়? বলি, বম কি বুড়োদের ভুলে থাকে না? আর বুড়োগুলোই বা কি গা? নাতনী-বয়সী ছুটছুটে যেয়ে দেখেও মুখ দিয়ে নাল পড়ে? ছি! ছি! অমন বুড়োর মুখে আঙুন। না গো না, অমন কথাটি মুখে এনো না,—ঐ কালীর মা এক বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, কি হ'ল দেখলে ত? আবার সেই ব্রকম কাজ করে? না গো না,

আমার ভিনকাল গিরে এককালে ঠেকেছে, যার ধন, যার সংসার, তিনি আমাকে কান্দিতে চলে গিয়েছেন,—আমিও গেলেই বাঁচি, আর এ বয়সে সজ্জ হই না!” বিধবা স্বামীকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘটকী ফিরিয়া গেল, বালিকা গোপ-বালা বেড়ার বাহিরে ঠাড়াইয়া সকল কথা-গুলি শুনিল; মনে মনে বলিল, “আমি বড় ঘরের বৌ হব, তাহে মা আপত্তি করিতে-ছেন। মার আপত্তি খাটবে না।”

তারিণী-বাবু মতলব স্থির করিলে সহজে ইচ্ছাবার লোক নহেন। পরদিন ঘটকী বিন্দুর নিকট আসিল, একখানা চিঠি বিন্দুর হস্তে দিল। চিঠিখানি বিন্দুর জ্যেষ্ঠাইমা লিখিয়া-ছেন। তাহাতে এই লিখা আছে,—

“মা বিন্দু, তোমার জ্যেষ্ঠামহাশয়ের সন্তানাদি না থাকার আবার বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আমারও মত আছে। মিজগোষ্ঠীর গোপবালা নামে একটি মেয়ে আছে, তাহাকেই তোমার জ্যেষ্ঠামহাশয় পছন্দ করিয়াছেন, মেয়েটি শুনিয়াছি, বড় নশ্র। মেয়ের মা তোমারই আশ্রিত লোক এবং তোমার কথা শুনে। তাহার সম্মতি বাহাতে হয়, সে বিষয়ে যত্ন করিয়া তোমার জ্যেষ্ঠাইমার কথা রক্ষা কর।

পুনশ্চ—বাছা, উমা গিরে অবধি তুমিই আমার মেয়ে,—আবশ্যক হইলে তোমার ঘরে মাকে স্থান দিও।”

বুদ্ধিমতী বিন্দু পত্রের প্রথম ভাগ পড়িয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, শেষ ছাত্রটি পড়িয়া একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠাইমার এ বিবাহে কিরূপ মত আছে, শেষ ছাত্র বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তর লিখিলেন—

জ্যেষ্ঠাইমা, জ্যেষ্ঠামহাশয় জান হারাইয়া,

ছেন, তুমিও কি জ্ঞান হারাইবে? কালীতারার অবস্থা চক্ষে দেখিয়াও গ্রামের আর একটি মেরেকে জলে ডাসাইবে? জ্যোতাইমা, আমি ছেলেমানুষ, তোমাকে কি পরামর্শ দিব? তুমি বুঝিয়া দেখ, জ্যোতামহাশয়ের কি এ বিবাহে সুখী হইবেন? তুমি যেরূপ শরীর রাটি করিয়া জ্যোতামহাশয়ের শুদ্ধ বা করিতেছ, অল্পবয়স্ক স্ত্রী কি জ্যোতামহাশয়ের সেইরূপ পরিচর্যা করিবে? যদি সে স্ত্রী ক্লেশদায়িনী হয়, জ্যোতামহাশয়ের এই শেষাবস্থার ক্লেশ তোমাকে চক্ষে দেখিতে হইবে।

জ্যোতাইমা, এ কাজটি হইতে দিও না, এ কাজে আমি সাহায্য করিব না।”

বিন্দু চিঠিখানা একবার হুইবার চেষ্টায় পড়িলেন। চিঠিখানি মনোমত হইয়াছে। ঘটকীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঘটকী বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। তাহার অল্পকণ পরে আর একজন বেড়ার পাশ হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। গোপ-বালা দাঁড়াইয়া দুইখানি চিঠি আত্মোপাস্ত শুনিয়াছে, মনে মনে বলিল, “আমি বড়ঘরের বৌ হব, তাহাতে স্ত্রীলোক মা বাধা দিতেছে। বাধা খাটিবে না।”

সন্ধ্যার সমস্ত সুখা বিন্দুও সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সুখাকে দেখিয়াই বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, “বলি ওগো সুখা, আমাদের নূতন জ্যোতাইমাকে দেখেছিস্?”

সুখা। না দিদি, নূতন জ্যোতাইমা আবার কে?

বিন্দু। ওলো, তা জানিস্ নি? তবে জানিস্ কি? ঐ দেখ, বাগানে স্ত্রীলোক সঙ্গে খেলা করছে।

সুখা। সে কি দিদি? ও বে গোপী, ওর সঙ্গে জ্যোতাইমা সম্পর্ক পাতালে না কি?

বিন্দু। ওলো, আমি পাতাব কেন? সম্পর্ক পাতাবে, পাতাবে,—বার পাতাবার, সে পাতাবে।

সুখা। এ তোমার কি ঠাট্টা দিদি, আমি ত কিছুই বুঝতে পারি নি। তুমি যে ছেলে গড়িয়ে গেলে দিদি! সত্যি সত্যি বল না দিদি, হয়েছে কি?

বিন্দু। না, কিছু হয় নি, বোধ হয়, মাস-খানেকের মধ্যেই হবে।

সুখা। কি হবে, কি হবে?

বিন্দু। ঐ বে বল্লেম, ঐ গোপী আমাদের নূতন জ্যোতাইমা হবে, জ্যোতামশাই বে ওকে বিয়ে করবার জন্য ঘটকী পাঠিয়েছেন! ও গোপী, গোপী, বলি, জ্যোতামশাইকে বিয়ে কর্বি নো?

গোপী। বড়-মা ডাকছ?

বিন্দু। হাঁ, ডাকছি, একবার কোলে আর।

বিন্দু। বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া, সেই নম্রমুখী সৌন্দর্য্যপূর্ণা ফুটফুটে মেয়ের ঠোটে চুমো খেয়ে, তাহার উজ্জল কৃষ্ণ চক্ষু দুটিতে চুমো খেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি, জ্যোতামশাইকে দেখেছিস্?”

গোপী। হাঁ বড়মা, দেখেছি নৈ।

বিন্দু। কবে দেখলি নো?

গোপী। ঐ বে কাল বিকালে আমি পুকুরধারে খেলা করতে গিয়েছিলেম, তারিণী বাবুও গিয়েছিলেন।

সুখা। ও হরি! তবে বর-কনের চোখা-চোখি হয়ে গিয়েছে! হেলা, জ্যোতামশাই তোকে আদর করেছিল?

গোপী। হ্যাঁ ছোট মা, তারিণী-বাবু এক-বার চারিদিকে মেয়ে দেখলেন। দেখলেন, কেউ কোথাও নেই, তখন আমাকে কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করলেন।

বিন্দু হাসিতে হাসিতে ভ্রুক্ষেপে বুঝি

হইলেন ; উঠিয়া সুধাকে বলিলেন, “বলি শুনিয়া সুধা, এই কালেই বর-কনের মিষ্টালাপ হয়ে গিয়েছে ! বলে, সে কালের বুড়োরা নাভনীদেব, সঙ্গে ঠাট্টা করতো, আজকাল কি সত্য সত্যই নাভনীদেব সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে ? হি হি হি ! এ লজ্জার কথা বখন জগতে রাষ্ট্র হবে, তখন আমাদের কালানুগ্ন দুকাব কোথায় ? জ্যোষ্ঠামশায় কি সত্যি এ বরসে লোক হাসাবেন ? বলি, গোপা, জ্যোষ্ঠামশাইকে তোর মনে ধরে ?”

“ধরে।” এই কথাটি বলিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বিন্দু বলিলেন, “বালিকা কি সরলা, বিবয়ের কথা কিছু জানেও না, বুঝেও না, জ্যোষ্ঠামশাই উহাকে কোলে ক’রে আদর করেছেন, সরলা মেয়েটি তাতেই আনন্দিত হয়েছে। হি ! হি ! জ্যোষ্ঠামশায়, তুমি বিজ্ঞ, তুমি বহুদর্শী, তুমি বুদ্ধিমান, এই সরলা বালিকাকে অকুল সমুদ্রে ভাসিও না।”

বিন্দু একটু ভুল করিয়াছিলেন, বালিকা নিতান্ত সরলা নহে। বিবয়ের কথা কিছু কিছু জানে, ধনগৌরবের একটু লালসা রাখে, সুবর্ণ ও মণিসুতার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং দারিদ্র্য হইতে উত্থান করিয়া একবার বড়-বরের বৌ হইবার হৃদমনীয়া আকাঙ্ক্ষা বাল্যহৃদয়ে ধারণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

“বিবাহের কথাবার্তা স্থির।

তারিণী-বাবু একবার মতলব স্থির করিলে শীঘ্র হাটবার লোক নহেন। বর্ধমান

গোকুলচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইলেন। গোকুল লোকযুগে বিশেষ কোন কথা জানিতে পারিল না, তবে কোন কারণে তারিণী-বাবু জুড় হইয়াছেন শুনিয়া কিছু ভীত হইল। নাজীর মহাশয়ের বর্ধমান প্রভুত্ব সাহেবদের নিকট খাতির, এসকল বিবর গোকুল বিশেষ জানিত। নাজীর মহাশয় একবার সাহেবদের নিকট তাহার বহমান করিলে তাহার কণ্ট্রাঙ্কিত হুটিবে, অরও হুটিবে। সভয়ে পরদিনই গাড়ী করিয়া তাল-পুহুর গ্রামে আসিয়া, ঘরে না গিয়া একেবারেই তারিণী-বাবুর গৃহে উঠিয়া, নাজীর মহাশয়ের শ্রীচরণে প্রণাম করিল।

নাজীর মহাশয় বড় রুঠ, মুখ ফিরাইয়া কথা কহেন না। সভয়ে ও সম্মানে গোকুল অনেক মিষ্টকথা দ্বারা তারিণী-বাবুর মন ভিজাইয়া বলিল, “আমি চিরকালই আপনায় আজ্ঞাধীন, আপনাই অয়ে পালিত, আপনায় অহুগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করিতেছি। এ অধীনের প্রতি কি জন্ত বিরক্ত, একবার বলুন, কি আদেশ পালন করিতে হইবে বলুন, অধীন কি কখন আপনায় অবাধ্য হইতে পারে ?”

তারিণী-বাবু। না হে ভায়া, (এতদিন বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এখন নূতন সম্বন্ধ) এখন আর তোমরা অধীন কৈ ? এখন ঢের কণ্ট্রাঙ্কি পাও, ঢের টাকা রোজগার কর, এখন আমাদের কি আর মানিবে, না আমাদের কথা শুনিবে ? আচ্ছা দেখা বাবে, দেখা বাবে, কে সাহেবদের বলিয়া তোমাকে এত কণ্ট্রাঙ্কি দেওয়াইয়াছে, তাহা দেখি, আর ভবিষ্যতে কিরূপে কণ্ট্রাঙ্কি পাও, তাহাও দেখি।

গোকুল। সে কি ? বলেন কি ? আর-নারই অহুগ্রহে, আপনাই খাতিরে আশ্রয়

বখাসকর উপাধি, তাহা কি আমি জানি না? বর্ধমান এ কথা কে না জানে? আপনাকে অবহেলা করিব? আপনার পাতৃকা বহন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই, আপনার কথা শুনিব না ত কাহার কথা শুনিব?

তারিণী বাবু। না, আর আমাদের কথা কই খাটে? বাও ভায়া, বাড়ী বাও, তোমার যা আমার কিরূপ অপমান করিয়াছেন, গিয়া শুন। বাঁটা মারিয়া আমার লোক বিদার করিয়াছেন। মিত্রজা আমার সম্মান জানিতেন, এখন কি না, তাঁহার বিধবা—সাঁহাকে কষ্টের সময় অন্নবস্ত্র দিয়া পালন করিলাম, সে আমার এমন অপমান করে? আচ্ছা, দেখিব, দেখিব, কোথাকার জল কোথায় ফাঁড়ার?

গোকুল। বলেন কি? মা আমার পথের কান্দালী, সে তালপুকুরের ধনাঢ্য মল্লিক-বংশের অপমান করিবে? কথাটা কি, ভেঙ্গেই বলুন না।

তারিণী বাবু। আর ভেঙ্গে বলিয়া কি তোমার কাছে অপমানিত হইব? না হে ভায়া, তাহাকে কাজ নাই। এখন তোমরা বড় মাছুষ, তোমরা বড় ধর, আমরা ছোট লোক, এখন কি আর আমাদের দিকে ফিরে চাহিবে, না আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিবে?

গোকুল। কি বলিলেন? কি বলিলেন? আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা? এ বে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। এ দরিদ্র আপনাদের হাতের এক মুষ্টি ভিজা পাইলে সম্মানিত হয়, আমরা আপনাদের সহিত কুটুম্বিতা করিব, এমন দিনও হবে?

মিত্রকথার দেবতারাও তুষ্ট হন, তারিণী-বাবুর মন একটু ভিজিল। আজ্ঞা করিলেন, “হরে, হরে। তামাক দে ত। ব’স ভায়া ব’স,

অনেক দূর থেকে আসিয়াছ, দেখাছ, এখনও বাড়ী বাওয়া হয় নি, একেবারে এইখানেই উঠেছ। তা ব’স ভায়া ব’স, তোমার মত বিনীত ছেলে একজন দেখলেও আনন্দ হয়।”

গোকুল। আজ্ঞা না, আমি পাড়াগেই রহিলাম, বতকণ আপনার আদেশ না পাইব, বতকণ আপনার আদেশ তামিল না করিব, ততকণ আসন গ্রহণ করিব না, জলগ্রহণও করিব না।

তারিণী-বাবুর মুখে এখন হাসি দেখা দিল, হৃদয়ে উল্লাসের সঞ্চার হইল। গোকুলের হাত ধরিয়া বসাইয়া, একবার কল্কেতে হুঁ দিয়া আগুনটা ধরাইয়া ভাল করিয়া তামাক টানিয়া গলায় সাড়া দিয়া পরিকার করিয়া লইয়া বলিলেন, “না, বল্ছিলাম কি, তোমার পিতা মিত্রজার সহিত আমার কিরূপ প্রণয় ছিল, তাহা ত তুমি জানই।”

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, তাহা জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার বিপদ আসিলেব সময় সাহায্য দিতে গ্রামের মধ্যে কেহ ছিল না, তিনি আমার কাছেই আসুতেন, তাহাও ত তুমি জান।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তাঁহার মৃত্যুর পর, মাঠা কুরুণকে সাহায্য দেওয়া, তোমাকে বর্ধমান-সাহেবদের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া, তোমার ছোট বোনটিকে কাপড়-চোপড় দেওয়া,—এ সব কথা ত তুমি জানই। নিজের গুণ নিজমুখে বলা সাজে না, কিন্তু মিত্রবংশের জন্ত কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহা ত তুমি জানি।

গোকুল। আজ্ঞা হাঁ, জানি বৈ কি।

তারিণী বাবু। তা করিব না কেন বল ?
আমাদের কুল ভাল, বংশ ভাল, আচরণ
ভাল, তোমাদের জন্ত করিব না ত কি আমার
শ্রমিক জাই-ঝি-জামাইদের জন্ত করিব ?
। আমার নিজের মাতাল জামাইয়ের জন্ত
করিব ? না হে ভায়া, এ ঘোর কলিতেও
ধর্ম আছে, এখনও স্বর্ঘ্য পূর্বদিকে উদয় হয়,
রজনী তোমাদের স্নান/সম্বৎসরের উন্নতি
বশতই হইবে।

গোকুল। সে আপনার অমুগ্রহ।

তারিণী বাবু। তাই মনে কর-
ছলাম, বিষয়-সম্পত্তি বৎ-বিক্রিৎ করেছি,
গালুক, জমা, মহাজনি, তেজারতি, লগ্নি,
ফারবার, বাড়ী, ঘর, গহনাপত্র সমস্তই
দাখে। এ আর কাহাকে দিয়া যাব ?
কজা উমা ত আমাকে কাঁদিয়ে চলে
গিয়েছে, গৃহিণীও সেই শোকে যার যার
হয়েছেন। তা ভেবে চিন্তে দেখলেম,
তালপুকুর গ্রামের মধ্যে কুল, মানে, সদা-
চরণে মিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ, তা যদি মিত্রবংশের
সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা স্থাপন ক'রে যাই,
তা হ'লে যা রেখে যাব, এ সমস্তই তোমা-
দের, তোমার ভগিনীরও বা, তোমারও
তাই।

গোকুল বুদ্ধিমান ছেলে, কথার আভাষে
তারিণী-বাবুর মতলবটা বুঝিল, মনে মনে
বুদ্ধিমানের স্তায়ই নিষ্পত্তি করিল। ঝেরে-
ছেলের আবার পছন্দ অপছন্দ কি ? যেরে-
গুলো হয়েছে পুরুষের স্ত্রীর জন্ত এবং
বংশের উন্নতির জন্ত, তাহাদের আবার
স্বখই কি, উন্নতিই কি ? যদি ভগিনীটাকে
মন্ত্রিকবংশে ভাসিয়ে দিলে মিত্রবংশের
(অর্থাৎ নিজের) কোন উন্নতি-নাশন হয়,
তবে তলে পরম মঙ্গল। প্রকান্তে বাগল,
“মহাশয়, বাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এ ত

আপনার অমুগ্রহ মাত্র। ইহার বাড়ী কি
সম্মান আর আমাদের আছে ? আমরা
পথের কালালী, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা
ত আমাদের সশরীরে স্বর্গলাভ।”

তারিণী বাবু। আহা, তোমার মত
বিনীত মিষ্টভাবী ছেলে কি আজকাল দেখা
যায় ? আর দেখছি কি ভায়া, আমার যথা-
সরুয তোমাদেরই। তোমার বংশের উন্নতি
হউক, তোমার ভগিনী আমার গৃহের গৃহ-
লক্ষী হউক, তোমার মাতাটাকুরাণী দীর্ঘজীবী
হউন এবং তোমারও শু উপার্জন হউক,
তুমিও একটা বিবাহ করিয়া তোমাদের পুরা-
তন ঘর বজায় রাখ।

গোকুল তখন অনেককণ মাথা চুলকা-
ইয়া আত্মা আত্মা করিয়া শেষে মুখ
ফুটিয়া বলিল, “আমরা ত আপনাদেরই দাস,
যখন আজ্ঞা করিবেন, আমাদের ভগিনী আপ-
নার পরিচারিকা হইবে। তবে আমরা
আপনার সহিত কুটুম্বিতা করি, এরূপ আমা-
দের অবস্থা কৈ ? পৈতৃক ভাঙ্গা ঘরে আমরা
বাস করি, তাহার ইটকাঠ নাই। তা আমা-
দের ঘর বজায় থাকে যে বলছেন, সে আপ-
নারই অমুগ্রহের উপর নির্ভর। যখন এ
দৌনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুটুম্বিতার স্বীকার
হইয়াছেন, তখন বাহাতে আমাদের ঘর
বজায় থাকে, পুরাতন গৃহটির সংস্কার হয়,
আপনার কুটুম্ব বলিয়া লোকের নিকট পরি-
চয় দিতে পারি, এরূপ উপায় অবশ্যই আপনি
করিয়া দিবেন।”

বুদ্ধিমান তারিণী-বাবু দেখিলেন, বাগল
গোকুলজ্ঞ এত দিন বুধা বদ্ধমান নগরীতে
কাজ করে নাই, সেও বিশ্ববুদ্ধিতে নিপুণ
হইয়াছে, ভগিনীকে বিক্রয় করিয়া কিছু
টাকা আদায় করিবার উপায় করিতেছে
টাকার কথা উত্থাপন হওয়ার নাজীর

মহাশয়ের বুকটা একবার ধমিয়া গেল, কিন্তু আবার সেই ছুটছুটে বেয়েটির প্রকর ওঠ (হুই দিন পূর্বে বাহার বধু আদ্যবন করিয়া-ছিলেন) তাহার মনে পড়িল, বুকের ঠোঁট দিয়া নাল পড়িতে লাগিল। হস্তগদগদ-ধরে বলিলেন, “বল বল ভায়া, তোমার কি বতলব, তাহাই বল। আমার সমস্ত সম্পত্তি ত তোমাদেরই দিতে বসেছি, তা, এখনই দি, আর পরেই দি।”

গোকুল। বহি আজ্ঞা করেন ত বলি, আপনি সমস্তই জানেন। আমাদের বাহিরের ও ভিতরের ইষ্টকাবশিষ্ট বস—যাহা আপনার পদযুক্তিতে পবিত্র হইবে,—সেই বস পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। খিড়কীর পুকুরটি, বাহাতে আপনি পুণ্যশরীরে অব-গাহন করিবেন,—তাহাও সংস্কার করিতে হইবে। গৃহে কোন উপকরণাদি নাই, আপনি গেলে একটি আসন দিব, তাহারও উপায় নাই, চৌকি, তক্তপোষ, ষাট, বিছানা এ সমস্তই আবশ্যক। তত্ত্বিত্ত আপনার স্ত্রীর জামাতা পাইলে বাতা ঠাকুরাণী রূপার বাসন না করিয়া কিরূপে পাওয়াইবেন, আর মল্লিক-বংশের সহিত হুটুঘিভা হইলে আমাদের একটু মান রাখিয়া চলিতে হইবে, ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে হইবে, লোকজন জাতি-হুটু সকলকে তুটু করিতে হইবে, এ সমস্ত কথা কি আপনার স্ত্রীর বহুদর্শী লোকের নিকট আমার স্ত্রীর বালকের বলা সাজে? তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি আর কি বলিব? (পরে মাথা চুলকা-টতে চুলকাইতে) আজ্ঞে, পাঁচ হাজার টাকার কমে যে এ কার্য সম্পাদন হয়, এমন ত বোধ হয় না।

বৈজ্ঞানিক বলেন, পৃথিবীর উদরস্থ দ্রব-পদার্থ সর্বদাই কল্কল করিতেছে, যখন

অতিশয় বাষ্পের তেজ হয়, তখনই আয়ের-গিরি দিয়া ছুটিয়া বাহির হয়। টাকার কথা উত্থাপন হওয়াতেই তারিণী-বাবুর উদরস্থ রাগটা একটু কল্কল করিতেছিল, কিন্তু স্থির করিয়াছিলেন, গরিবদের হাজারটা টাকা কি জোর পনের শত টাকা দিয়া কত-রহাট ক্রম করিবে। কিন্তু যখন গোকুল পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ করিল, তখন আয়ের-গিরি কোথায় লাগে। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “কি বললে মিত্রের মিত্র? পাঁচহাজার টাকা? বলি, বত বড় মুখ, তত বড় কথা? বলি, আমি কি তোমাদের বংশ চিনি না? তোমার ঠাকুরদাদা প্রথম হাড় আলিয়ে গিয়েছে, তোমার বাবা হাড় আলিয়ে গিয়েছে, আবার তুমি হাড় জালাতে এসেছ? পাঁচ হাজার টাকা বলে ভেবে আসে, না পাঁচ হাজার টাকা কখন মিত্র-বংশে দেখেছে? বলি, এক রত্তি ছেলে, সে দিন হাতে ক’রে মাছব করেছি, আমাদের সম্মুখে এমন কথা বলতে ভয় হয় না? এমন বিধর্মীর সঙ্গে হুটুঘিভা করলে নরকভোগ করতে হয়! এমন কুলাকাণ্ডের মুখ দেখলেও পাপ হয়।” ইত্যাদি, ইত্যাদি। গোকুল কিছুমাত্র অপ্র-তিভ বা ক্রুদ্ধ না হইয়া নাজীর মহাশয়ের মেজাজ একটু গরম হইয়াছে দেখিয়া, একটি প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, নাজীর মহাশয়ের গরম হওয়া বৃথা, বুড়ো বয়সে বালিকা-বিবাহ লালস মনে উদয় হইলে সে রোগ আর ছাড়বে না। আবার তাহার উপর সেই বালিকাটিকেও মধ্যে মধ্যে পুকুরধারে দেখিতে পাইতেন, উঃ, কি চোক! কি ক্লক! কি ঠোঁট! বিধাতা কি তুলী দিয়া লিখিয়াছেন? উকটকে রং কি আনুতা দিয়া আঁকিয়াছেন? কি ললিত বাহুলতা

কি কুটকুটে শরীর ভায় শরীর! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুছ গৃহে কিরিয়া আসিলেন, মনে মনে হিন্ন করিলেন, “টাকা আমার শরীরের রক্ত, কিন্তু শরীরের রক্তপাত করেও এ রকম লাভ করুব। বংশটা বড় হারান্যজান্না, কিন্তু যেহেতু একবার ঘরে আনতে পাব্লে হয়, টাকা শুদ্ধ আদায় করুব, মিথ্রদের ঘর-ভিটে যদি বিক্রয় করে না লই, তবে আমার নাম তারিণী মল্লিক নয়।”

আর কয়েক দিন ঘটকী হাঁটাইটি করিল, দুই হাজার টাকা,—আড়াই হাজার টাকা—তিন হাজার টাকা, উঁহ! গোহুল প্রকাশে বলিল,—“আমরা নিতান্ত গরিব, তারিণীবাবু অগ্রহ না করিলে কে করিবে?” মনে মনে বলিল, “বুড়ো বরসে খেড়ে রোগ ধরি-রাছে, টাকা দেবে না? নাকে দড়ী দিয়া টাকা আদায় করিব।”

অবশেষে নাজীর বাবু ঘটকীকে চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া বলিলেন, “ইহাভে যদি না হয়, তবে ঐ সনাতনবাটী গ্রামে বহুদের বাড়ীতে যে যেহেট্ট আছে, দেখতে শুন্তে ভাল, বরসও শুনেছি দশ বারো বৎসর হইরাছে, তাহাদের বাড়ী বাইও, এই মাসেই ক্রিয়া সমাপন হইবে, ঠিক করিয়া আসিও।”

গোহুল দেখিল, নাজীর মহাশয়ের মানরকার জন্তও তাঁহার কথাটা কতক রাখা চাই। অতএব সেই চারি হাজার টাকাভেই সম্মত হইল, আর ভিক্ষা বলিয়া দেখুশত টাকা, আর চেনীর কাগড় বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর খাওরান দাওরান বলিয়া একশত টাকা, আর তত্ত্ব বলিয়া পঞ্চাশ টাকা, আর সভাধরচ পঞ্চাশ টাকা, আর বিবাহের অন্ত্যস্ত ধরচ বলিয়া একশত টাকা আদায়

করিয়া হইল। বলা বাহুল্য যে, এই ভিক্ষা ইত্যাদি ধরচেই গৃহে চুপকাই করা, পুছর সংকর করা ও বিবাহের সমস্ত ব্যয়ের আয়োজন হইল, চারি হাজার টাকার গোহুল-বাবুর কোম্পানীর কাগজ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের আয়োজন ।

তালপুকুরে হলহুল পড়িয়া গেল। ধন-শালী বিষয়ী বিজ্ঞ মহামান্ত নাজীর মহাশয় আবার দারপরিগ্রহ করিবেন, গ্রামের মধ্যে সুন্দরী মেয়ে বাছিয়া তাহাকে জন্মেরখরী করিবেন, মিথ্রবংশ সম্মানিত করিবেন, মল্লিকবংশ উজ্জল করিবেন, বিবাহে বড় ঘটী হইবে, দেশের সমস্ত উজ্জলোক সমবেত হইবে, মুজ্জের কাকালী ডিখারী বিদায় পাইবে,—এইরূপ কথা ঘরে, ঘারে, পথে, ঘাটে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কুবকেরা মল্লিক বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া ছুটা খোসগল্প শুনিয়া যাইত, রমণীগণ মিথ্র-বাড়ীর নিকট কলস নামাইয়া একবার মেয়েকে দেখিয়া যাইত।

তারিণী-বাবুর বৈঠকখানা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন-সময় পর্য্যন্ত, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকারণ্য; কত বন্ধু, কত পরামর্শ-দাতা, কত সমাজপতি ও দলপতি, কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিত, তাহার ঠিক নাই। দিব্যরাজি সাধুবাদ, তত্ত্ববাদের ও নাজীর মহাশয়ের বিজ্ঞতার প্রশংসা চলিত। দলপতি ও সমাজপতি বলিতেন,—“এত তারিণী-বাবুরই উপযুক্ত কাজ। এরূপ বোগ্য লোক কি

আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়? লক্ষী-সরস্বতী ঘারে বাঁধা। বিত্তা-বুদ্ধি-বলে সাহেব-মহলে তারিণী-বাবুর কত মান, কত রাজ্য। বারবাহাজুর হার মানিয়া যায়। আর বিষয়ের ত কথাই নাই, ভালপুত্রের মধ্যে দীন-মরিজ, ইতর-ভদ্র যে যখন বিপদে আপদে পড়ে, তারিণী-বাবু ভিন্ন আর সহায় কে? তারিণী-বাবু দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের সমাজ বজায় রাখুন, আশু পুত্রমুখ দেখিয়া পরম সুখ ভোগ করুন” ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তারম্বরে कहিলেন, “তারিণী-বাবুর সদাই বর্ধে মতি, তিনি ধর্মনিষ্ঠ লোক, তাঁহার ত এ বোধ্য কাজই বটে। সংকুল দেখিয়া, ভদ্রবংশ দেখিয়া স্নানকলা কতাই স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রসম্মত কাজ করিয়া হিন্দু আচার বজায় রাখিয়াছেন। আজকাল বেরূপ সময়, নাস্তিকগণো কি কি করে, তাহার ঠিক আছে? কেহ বরষা কতাই ধোঁজে, কেহ বিধবা বিয়ে করিতে চায়, কেহ বা আবার জাতি ছেড়ে অন্য জাতিতে বিয়ে করে। ছি! ছি! সমাজ, তারিণী-বাবুকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর। পুত্রসন্তান-কামনার সংশোধন, স্নানকলা, নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়া তারিণী-বাবু আজ স্বজাতির নাম উজ্জ্বল করিলেন, সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন।”

তারিণী-বাবুর বন্ধগণ বলিলেন, “তা নবমবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিবেন না কেন? তারিণী-বাবুর বয়সই বা কি? এখনও চন্দ্রশ পায় হয় নাই, এই ত বিবাহের উপযুক্ত কাল। আহা, মুখখানি যেন কাস্তিকের মত, শরীরখানি যেন গণেশের মত, কত কাল তপস্বী করিয়া কতাই একরূপ বরলাভ করে,” ইত্যাদি।

এই সকল কথা শুনিয়া তারিণী-বাবুর

মুখে আর হাসি ধরিত না, লুকাইয়া দর্পণে ঘন ঘন আপনার মুখখানি দেখিতেন, চুলে ঘর ঘন কলপ দিতেন, কাহার সাধ্য একপাছি পাকা চুল বাহির করে? নাগিতের মাছি-রানা ছিড়ণ করিয়া প্রত্যহ ক্ষৌরকাষ্য সম্পাদন করিতেন, মাড়ী-বোঁপ এখনও উঠে নাই বলিলেও চলে।

ঋণকার দিনে হই তিনবার করিয়া তারিণী-বাবুর বাড়ী হাটাইটি করিতেছে, পুরাতন গহনা ভাঙ্গিয়া নূতন ধরণের গহনা করিবার করমারেশ হইয়াছে, সেই নূতন গহনাতে প্রেমিক তারিণী-বাবু নব-বধূর অঙ্ক ভূষিত করিয়া দিবেন! কথাটা এক একবার মনে হইতেছে আর বুদ্ধের বুকটা নাচিয়া উঠিতেছে। বালিকার স্মরণ লগাটে সিঁতি পরাইয়া দিবেন, ললিত বাহুলতা হাতে ধরিয়া আদর করিয়া তাবিজ-বাজু পরাইয়া দিবেন, কুসুমকলি-বিনিমিত বকের উপর লবের হার ঝুলাইয়া দিবেন, কটিতে রসের চন্দ্রহার দোলাইবেন! ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধের শরীরটি রোমাঞ্চিত হইল,—বুড়ো বুঝি পাগল হইল!

তারিণী বাবুর বাড়ী আজ লোকাল্লা, এবং জাতিহুটুঘে পরিপূর্ণ। দাসদাসী গোলাপী কাপড় পরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, পুত্র হইতে বড় বড় মাছ, হাট হইতে চাকারী করিয়া শাক-সবজী, বর্দ্ধমান হইতে ষাঁজ, সীতাভোগ ও মিহিদানা, কলিকাতা হইতে সন্দেশ ও রসগোলা সংগৃহীত হইয়া বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। বাড়ীতে যেন দিবা-রাত্রি উৎসব হইতেছে, বাহিরে দিবা-রাত্রি বাজ ও লোকের কোলাহল, সমস্ত গ্রামে হলহুল পড়িয়া গিয়াছে।

দরিদ্র বিন্দু ও সুখা গলা ধরাধরি করিয়া কাদিল, একদিন সন্ধ্যার সময় লুকাইয়া

জ্যোতাইম'

কাদিল

হুঃখিঁ

সঙ্গে

গ্রাম

প্রচার

আজ য়

এদিকে

মিজগণ এ

ভালপুরুষ

জাতি-কুটুম্বের অভাব

সম্ভার অন্ধকারে যেমন পক্ষিকুল নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়া থাকে, মিজদিগের দরিদ্র ও দুরবস্থার সময় সেইরূপ জাতি-কুটুম্বগণ নিজ নিজ কুলায়ে লীন হইয়াছেন, কেহ সাড়াশব্দ করেন নাই, একবার তত্ত্বতল্লাস করেন নাই। আবার সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ পক্ষিকুল মহা আনন্দে শব্দ করিয়া পুনরায় আকাশ আচ্ছন্ন করে, আজি মিজদিগের সৌভাগ্যবির উদয়ে দশ গ্রাম হইতে জাতি-কুটুম্ব আসিয়া গোপীর মার পুরাতন গৃহ আচ্ছন্ন করিল।

চারুর মা সম্পর্কে গোপবালার মাসী হয়। বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে, স্থূল শরীর-খানি গহনা-ভরা, মুখে সদাই হাসি। এত দিন পরে বোন্‌থিকে মনে পড়িল, পাকী করিয়া মিজদের বাড়ী আসিলেন। হেসে হেসে গরবিনী বলিলেন, “তা বোন, আমার চারুও যে, গোপীও সে—আহা! এত দিন বাছা গোপীকে দেখিতে পাই নাই, মনে করি আসি আসি, তা আমাদের যে সংসার, সহজে কি আসা হয়? বেঁচে থাকুক, বস্তুরবাড়ীর গৃহলক্ষী হয়ে থাকুক, সোনার টালের মত হেলের মুখ লক্ষ্য করুক। মল্লিকদের বাড়ী সর্বদাই বাড়ীঘাত আছে, বাছা গোপীকে

গলা ধরিয়া

দর দিন,—

কে দেখে?

চোকির শব্দে

সমস্ত গ্রামে

নন্দের দিন,

শুভবিবাহ!

লোকারণ্য।

শাক ছিলেন,

হ তাঁহাদের

না, তবে

সর্বদাই কেঁথে বাব। আমরা আসবে না ত কে আসবে? কথার বলে, যাও যে, মাসীও সে, মা-মাসী বাছাকে দেখে বে না ত দেখবে কে?” ইত্যাদি।

হরির মা সম্পর্কে গোপীর পিসী হয়। সামান্য গৃহস্থঘরে বিবাহ হইয়াছে, শরীর ঈর্ষ, স্বভাবটি দ্রুত। ভ্রাতার মরণের পর মিজ-বাড়ীতে পা দেন নাই, তবে গোপীর মা অল্প কষ্টে লালায়িত হইয়া অনেক অহুনয়-বিনয় করায় একবার পাঁচ টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাহাও ঘটা-বাটি বিক্রয় করাইয়া, স্নানশুদ্ধ আদায় করিয়া লইয়াছেন। আজ পিসীমার শরীর স্নেহে গলিয়া পড়িতেছে। গোপীর চুল বেঁধে দিতেছেন, গহনা পরাইয়া দিতেছেন, কত সেবা-শুশ্রূষা। বলিলেন, “তা আমরা করুব না ত করবে কে গা বোন? থাকতেন আজ দাদা বেঁচে, আহা, এ আনন্দের দিনে কতই আনন্দ করতেন! আহা, দাদা যখন যে কাজটি করতেন, আমাদের না জিজ্ঞাসা করে ত করতেন না, আমাদের না ডাকাইয়া কি বাড়ীতে জিরাফ হবার বো ছিল? তা দাদা যেমন পুণ্যাত্মা ছিলেন, বাছা গোপীও সেই রকম গো। আহা, মেয়ের মুখে কথাটি নাই। তা এমন মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে না ত কার হবে? বেঁচে থাক বাছা, গা ভ'রে গহনা পরবি, পাকী চড়বি, বারাপসী শাড়া প'রে বোগ্‌গিবাড়ী যাবি,—এর বাড়ী কি সুখ আছে? বাছা, তোদের সুখ বেঁধে মরতে পাচ্ছেই বাঁচি।” ইত্যাদি।

জামের মা সম্পর্কে গোপীর খুড়ী হন। তাঁহার স্বামীর সহিত গোপীর বাগ বিষয় লইয়া অনেক বিবাদ করিয়াছেন,—গোপীর বাগের মৃত্যুর পর জামের মা বিধবা জার উপর সে কলহের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মোকদ্দমা করিয়া দরিদ্র জার

জমা-জমী বিক্রয় করিয়া তাঁহার বটী-বাটি বিক্রয় করিয়া লইলেন, সন্দেস হাতে করিয়া ছেলেদের পাঠাইয়া দিতেন; বলিয়া দিতেন, “গোপীকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবি।” গোপীর মা গরিব ও ভালমাহুয, সমস্ত সঙ্ক করিত ও কাঁদিত। টাকার কি মধুময়ী ক্ষমতা! গোপীর মার সৌভাগ্য-উদয়ে শ্রমেয় বা সমস্ত বৈরি-ভাব ভুলিলেন, শ্রিয় জার প্রতি তাঁর কত মায়ী, কক মমতা, কত যত্ন! বলিলেন, “আহা বোন্! পুরাতন কথা কি ভূলা যায়? সেই তোমার আমার একই! বৎসরে বিয়ে হয়, আহা, আমরা বেন বোনের মত ছিলাম গো। এক মন, এক প্রাণ, কেবল শরীর ভিন্নই ত নয়। তোমার গোকুল যখন পেটে, তখন বাছা শ্রামলাল হয়, তা আমার শ্রামলাল যে, গোকুলও সেই। তা গোকুল বেঁচে থাকুক, গুণবান বুদ্ধিমান্ ছেলে হয়েছে, দু পরসা রোজপার করছে, মিত্রকুলের নাম রাখবে। আর বাছা গোপীর বড় বরে বিয়ে হতেছে, বড় মাহুযের বৌ হবে, গা-ভঁরা গহনা পুরবে, সুখে থাকবে! আহা, ওদের সুখ দেখলে আমাদের চক্ষু জড়ায়,” ইত্যাদি।

এইরূপ আত্মীয়দিগের যত্ন, শুভ্রতা, আশী-রুদ্র ও মঙ্গলকামনার গোপীর মা বড়ই আপ্যায়িত হইলেন। তাহাদের বাড়ী হইতে বড় বড় তত্ত্ব আসিয়া মিত্র-বাড়ী ভরিয়া গেল। এক কয়েক বৎসর ইহার চতুর্থাংশ অল্পগ্রহ পাইলে গোপীর মা অন্নবস্ত্রের অভাব বিন্ ও সুখার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইত না। গোপবাল্য-মার চেয়ে সেরানা ঘেরে, বাপের বুদ্ধি পাই-রাছে। বুদ্ধাদিগের কাছে মেরের মুখে কথাটি নাই, তাহাদের মমতা ও মেহবাক্যে মেরের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। চক্ষু মুছিয়া পুত্র-ধারে সমবয়স্কদিগের কাছে আসিয়া একবার প্রশংসা লিখিয়া হাসিল।

সমবয়স্কারা বলিল, “কি লো, তুমি বরে-বিরে হবে ব’লে বড় আত্মার কে—মুখে হাসি ধরে না যে।”

গোপী। না লো, তার অভ্যাস নর। বয়স্ভাগ্য। তবে কি অভ্যাস, মনে, বাটা খুলে বল না।

গোপী। এই আমার মাসীমা, পিসীমা, খুড়ীমাদের যত্ন দেখে হাসছিলাম। বয়স্ভাগ্য। ইস! হেসে যে গড়িয়ে গেল। মেরের রকম দেখ না। তা মাসীমা বিয়ের সময় এসেছেন, তোদের ভালবাসেন ব’লে যত্ন করছেন, তাতে আবার হাসি কিসের লা?

গোপী বলিল, “না, না, তা নয়, তবে মাসীমা পিসীমার যত্ন দেখে একটা রূপকথা মনে পড়ল, তাই হাসছিলাম। রূপকথাটি বলি শুন।

ছুই ভাই ছিল, বড় ভাইটি বড়লোক আর ছোট ভাইটি গরিব। তা বড় ভাইয়ের ব্রী-বড়মাহুযী চাল, সে গরিব ছোট ভাইটিকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না, দেখা হ’লে কথাও কয় না। গরিবরা দুখে থাকে, কাঁদাকাটি করে, কিছু দিন পরে সে গ্রাম থেকে উঠে গেল।

বিদেশে চাকরী-বাকরী ক’রে গরিবদের শেষে অনেক টাকা হ’ল। তখন তারা গ্রামে ফিরে এসে পাকা বাড়ী করলে, নতুন পুত্র-কাটালে, জমিদারী কিনলে আর অনেক চাকর-বাকর রেখে বড়মাহুযী চালে চলতে লাগল।

বড়জা তখন ছোটজাকে অনেক আদর ক’রে নিমন্ত্রণ ক’রে পাকী পাঠালে। ছোট জা দেখে এসে দেখে—রূপার খালে ভাত বাড়ী, রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন-সাজান, রূপার রেকাবিতে লক্ষ্য-মত্তা।

ছোট জা আসনে বসল। ভাতগুলি চার ভাগ করলে, ব্যঞ্জনগুলি চার ভাগ করলে, সন্দেশ-মণ্ডাগুলি চার ভাগ করলে। এই রকমে ভাগ করে আসন থেকে উঠে হাত ধুলে।

বড় জা বললে, ‘এ কি বোন, খেলে কৈ?’
ছোট জা বললে, ‘বাদের জন্ত খাবার করেছি দিদি, তাদের জন্ত ভাগ করে দিলেম। এ ত আমার জন্ত খাবার করনি দিদি।’

বড় জা বললে, ‘তোমার জন্ত নয় ত কার জন্ত বোন?’ ছোট জা বললে, ‘এই এক ভাগ আমাদের পাকা বাড়ীর জন্ত, এই একে ভাগ আমাদের পুকুরের জন্ত, এই এক ভাগ আমাদের জমিদারীর জন্ত আর এই এক ভাগ আমাদের লোকজনের জন্ত। এই সব দে’খে রান্না-বান্না করেছি দিদি, খাওয়া-দাওয়া এদের সমর্পণ কর। আমাকে যদি খাওয়াতে ইচ্ছা থাকত, তা হ’লে যখন গরিব অবস্থায় আমার জন্ত লাগানিত ছিলাম, তখন একদিন ডেকে খাওয়াতে।’

সন্ধ্যার সময় শাঁক বাজিয়া উঠিল। ঘরে ঘরে প্রবীণ বাতি জলিল, বাহির-দরজার বাহ্য আরম্ভ হইল, বৃদ্ধাগণের ডাকাডাকি, তরুণীগণের খোসগল্প ও হাস্তধ্বনি, দাসীদিগের ছুটোছুটিতে বাড়ী পুরিয়া গেল। বাহির বাড়ীতে কত্য়াকর্তা পোরুল-বাবু কোমরে চাদর বাঁধিয়া ডাবা হ’কা হাতে লইয়া, সভা প্রস্তুত করিতেছেন, বাতি জ্বালাইতেছেন, হাঁক-ডাক দিতেছেন, আশ্বালন করিতেছেন। ভিতর-বাড়ীতে সমস্ত প্রস্তুত, কত্য়াকে সাজাইবার জন্ত ডাক হইল। ঘের সাজিতে বসিল। মুখখানি নয় ও শাড়, ছন্নখানি আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

বঠ পরিচ্ছেদ ।

—*—

শুভ বিবাহ ।

তুবারমণ্ডিত বিশাল হিমালয় পর্বতের স্তায় চৌপদ-মণ্ডিত তারিণী-বাবুর বিশাল শরীর সভাস্থল কম্বাইয়া রহিয়াছে। পাখুর-কাল হুল শরীরের উপর রক্তবর্ণ চেলির কাপড় শোভা পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের গৌণ-কামান বরের মাথার বিরাট চৌপদ শোভা পাইতেছে। কোথায় গেলেন কবি কালিদাস, তিনি সে মনোহর-রূপ বর্ণনা করুন,—আমরা অক্ষম।

বাড়ী লোকারণ্য, চারিদিকের গ্রামসমূহের কারহকুলের কেহ নিমন্ত্রণে বাদ পড়ে নাই। বাড়ীর ভিতর একেবারে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কল কল শব্দ, তাহাদের হাস্তধ্বনি ও তাহাদের কথাবহস্তে বাড়ী আনন্দপূর্ণ। কোন নবীন উঁকি-ঝুঁকি যারিয়া সখীকে ডাকিতেছে, “ওলো দেখবি আর লো দেখবি আর। ও মা, এ কি বিয়ের বর, না মুশকো মিন্বে লো?”

ষষ্ঠীয়া। দূর পোড়াকপালী, বিয়ের রাজি বরকে অমন কথা বলে? কেন লো, বরের রূপ মন্দই বা কি? রংটা একটু কাল বই ত নয়, মুখের ছিঁরি আছে।

প্রথম। হা, ছিঁরি আছে বৈ কি,—কেবল গাল দুটি বেন পাকা বেগুন বুলে রয়েছে।

ষষ্ঠীয়া। দূর পোড়াকপালী। তুকনো চড়ান গাল বুঝি ভাল?

প্রথম। আর ঠোঁট দুটি বেন বোল্ডার কান্ধে দিচ্ছে।

ষষ্ঠীয়া। দেখিস,—দেখিস, ঐ ঠোঁট

য়ে গোপী বলে বাবে। বস্তুরবাড়ী একবার
লে হয়, এমন গোলগাল স্বামী পেয়ে
রি এ-মুখে হবে না।

প্রথমা! আর বুকে কি চুল দিদি,
ক যেন আমাদের বাড়ীর আঁতাকুড়ের
চুল।

দ্বিতীয়া। দূর হতভাগী! এমন কথা
বুতে নেই।

প্রথমা। ও বাবা। পেটটা কি ফুলো গা।
মনুষের পেট ফুলেছে না কি?

দ্বিতীয়া। যা যা, তোর আর বরের নিশ্চ
বুতে হবে না। গোপী শুনে রাগ করবে।
দেখিস, ঐ নাদোস্ নাদোস্ শরীর পেয়ে
মামাদের গোপীর মন ভুলে যাবে।

প্রথমা। না, সত্যি দিদি, বরের পা
খানা দেখ, ও মা, পায়ে গোদ হয়েছে
কি? গোদা পা নিয়ে কোন্ লজ্জার
মনুষে বিয়ে করতে এল? কোন্ এক
জাড়া মোজা প'রে ঢেকে এল দিদি?

দ্বিতীয়া। দেখিস, দেখিস, ঐ পা গোপী
মত বয়ে পূজা করবে।

প্রথমা। ইস! তা আর হ'তে হবে না।
গোপী আপনার খুদে খুদে আলতা-মাখা পা
চুখানি যদি মিনুষের টোপরের উপর না
রাখে, তবে আমি আর কি বলেছি। আমি
গোপীকে জানি, সে চাপা মেয়ে, মুখে ভাল-
মাহু, মনখানি কুরের মত খারাপ।

বর গাজোখান করিলেন, যেন হিমালয়-
পর্বত শিকড় ছিঁড়িয়া উঠিলেন! বাড়ীর
ভিতরে জী-আচার, রসিকাগণ সে আচার
বর্ণনা করুন, আমরা তাহার কি জানি?
বাড়ীর উঠানে একেবারে মেয়ে পিল্ পিল্
করিতেছে, তারিণী-বাবুর বিশাল শরীরের
চারিদিকে ঘুরিতেছে কিরিতেছে, নিল্জ
হইয়া থল্ থল্ করিয়া হাসিতেছে, যেন

একটি বিশাল তমালবৃক্ষের চতুর্দিকে মননা
পাখীগুলি উড়িতেছে। কোন বেয়েটি ডিকি
যারিলা তারিণী-বাবুর থল্ থলে কানটি
একবার মলিয়া দিল। কেহ কেহ বা সেই
প্রকাণ্ড উল্লরের উপর দৈবের হাতের ছাপ
লাগাইয়া গেল এবং কোন রসিকা সেই
বিশাল পৃষ্ঠদেশে আল্পানার দাগ দিয়া
যেন দূরবিলম্বী মেঘরাশির উপর বিদ্যুতের
শোভা করিয়া দিল।

কুজ গোপীকে পিড়ার বসাইয়া বরের
চারিদিকে সাতবার পাক দেওয়া হইল,
তারিণী-বাবুর মনটি নৃত্য করিতেছে, নজরটি
সেই পিড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিরিতেছে।
যখন “বর বড় না ক'নে বড়” প্রশ্ন হইল,
তখন গোপীর পরমবন্ধুগণও স্বীকার করিল,
বর বড় বটে। যখন বরণভালা লইয়া পতি-
পুত্রবতী কোন গৃহিণী নাজীর মহাশয়কে
“ভ্যা” করিবার অহরোধ করিলেন, তখন
রসিকাগণ কানাকানি করিতে লাগিল,—
“ভ্যা করিবেন দিন কত পর—গোপী
তেমন মেয়ে নয়।”

তাহার পর বর-কস্তা একত্র বসিলেন,
পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইলেন। তারিণী-বাবু
স্বৈদপূর্ণ হুলহুলে কস্তার সেই স্তম্ভিক স্তম্ভর
পুষ্পবিনন্দিত হস্ত গ্রহণ করিয়া গোমাক্ত
হইলেন—অবগুণ্ঠনশূন্য বধূর মধুমাখা মুখ,
মুক্তাবিভূষিত ললাট এবং অলঙ্কার-রঞ্জিত
ওষ্ঠ দেখিয়া বুড়ো বুঝি, বিবাহ-সভার মুচ্ছা
যায়।

তাহার পর বাসরঘর! বাসরঘরে আজ
বড় তামাসা—তারিণী-বাবুর মত নাদস্-
নাদস্, গোল-গাল, বরক্ রসিক বর ভাল-
পুত্রেয় স্তম্ভরীগণ সর্বদা পান না, আজ
বুঝি, বরকে আঙঠি খেয়ে কেলেন। বর ঘরে
আসিবারাত্র একজন শ্রামা, হুলাসিনী, মধ্য

বয়স রসিকা তাঁহার হাত ধরিয়া বলাইয়া বলিলেন, “এস এস গোপীবল্লভ এস, তোমার বিরহে গোপবালা যে একেবারে তকিরে পিঁপড়াছে।” রসিক তারিণী-বাবু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন নয়, যেন বোল শত গোপিনী সেই নিকুঞ্জে বসিয়াছেন।

বাসরঘরের রং-তামাসা আমরা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? বাসরঘরের কথা আমরা কি জানি? কোথা গেলে রসিকা স্তম্ভরাগণ,—তোমরা সে গৃহ আচার জান, তোমরা সে রসের কথা জান,—তোমরা যাঁহা করিবার কর। গোবর্দ্ধন পুরুষের স্তার তারিণী-বাবুর কোলে ময়না পাখীটির স্তার কন্ঠাটিকে বসাও, আমরা বিদায় এইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দম্পতি-প্রণয়।

মুখের স্বপ্নের মত তারিণী-বাবুর ছুটি ফুরাইল, তিনি পুনরায় বর্ধমানের কার্যে যোগ দিলেন। মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া নব-বধুটিকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেন, আবার অনিচ্ছুক বলদের মত ফিরিয়া বর্ধমানের যাইয়া আপিসের দানিগাছে বাঁধা হইয়া ঘুরিতেন।

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তারিণী-বাবুর আর কাজ করা পোষার না। বয়সে শরীর দুর্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়, কাজে সর্বদাই ভুল হইত। সাহেবেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “নাভীর বাবুর পকাশ বৎসর বয়স হইয়াছে, পেন্সন

দেউবা।” অত্যন্ত আশ্চর্য্য কানাকান করিত, নাভীর মহাশয়ের মন নতুন বৌয়ের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কাজ করিবেন কিরূপে?

চাকরীর মাসা শীত ছাড়া আর না—অনেক গল্পনা সহ করিয়াও আরও এক বৎসর কাজ করিলেন, শেষে অগত্যা পেন্সন লইয়া গ্রামে আসিয়া বসিলেন। তখন গোপবালার চতুর্দশ বৎসর বয়স, যৌবনের কান্তিতে শরীর কাটিয়া পাড়তেছে, রূপে ঘর আলো করিয়াছে, গা ভারসা গহনা পরিয়া রূপাভিমনিয়া গৃহিণী গৃহ জমকাইয়া বসিয়াছে। বার্ককো রূপ-তুফার্ত তারিণী-বাবু মনে করিলেন, “চাকরীর মুখে আগুন, এবার নববধুকে লইয়া জীবন সার্থক করিবা।” নব-বধু মনে করিলেন, “এবার বড়ো মিন্‌ষেকে ঘরে পাইলাম, মাকে দড়ী দিয়া ঘুরাইব, কর্তাটি আর বাবেন কোথায়?”

উমার মা রোগক্রিষ্টা, সংসার দেখিতে পারেন না, হু-বেলা দুপেট খান, আর প্রায়ই আপনার ঘরে শুইয়া থাকেন। বিন্দু সর্বদাই জোঠাইমাকে দেখিতে বাইত, কিন্তু নববধু তাহাতে মুখ ভার করিতেন। লোকের কাছে বলিতেন, “ওদের জাত গিয়েছে, ওদের আচার-ব্যবহার ভাল নয়, উহার ঘন ঘন আসা যাওয়া করিলে আমাদের নিন্দা হয়।” যে নন্দমুখী দরিদ্র-বালিকা নবাবদাস বিন্দুর উঠানে সেদিন খেলা করিয়া তারিণী-বাবু আর একটি সপ্তসের লক্ষ্য লাভ করিলেন, সে এখন বড়কালীর ঘরের গৃহিণী, সম্পদে তাহার এই কল্যাণে নবাবদাস বিন্দু পোষিলেন, জ্যোৎস্না তাইমার বাড়ী যাওয়া কতকটা ব্যয় বলিয়া করিলেন।

৬ কেবল উমার মার একটি পুত্রসী ছিল, তারিণী সন্তুষ্টা করিত। বড়ার প্রতি

এইরূপ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কাদাকাটি হইত, দিবারাজি অভিমান হইত, তারিণী-বাবু আর ভিত্তিতে পারিলেন না। গৃহিণীর কথা-বার্তার বুঝিলেন যে, গৃহিণী ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে চাহে। এতটুকু মেয়ের পেটে এত বুদ্ধি কেমন করিয়া হইল, বুঝিতে পারিলেন না। তারিণী-বাবু জানিতেন না যে, গৃহিণীর পরামর্শদাতা পরম বুদ্ধিমান গোঁকুলচন্দ্র ঘন ঘন বর্ধমান হইতে আসা-যাওয়া করিত এবং গোপনে ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিত।

তরুণী ভার্ঘ্যার তীব্র অভিমান ও অশ্রু-জল দেখিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিতে পারে, এরূপ বীর-পুরুষ সংসারে অল্প। তারিণী-বাবুর মন ক্রমে টলিতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আমার ভাল মন্দ হইলে কিছু বিষয় ছোট গৃহিণীর হাতে থাকে, এরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া ভাল। উহাকে বিষয় দিব না ত কাহাকে দিব? সেই মাতাল জামাইটা শেষকালে সমস্ত বিষয়টা কাড়িয়া লইবে? না, না, সে কথা নহে, আমার প্রাণের গোপবালাকে কিছু দিয়া বাইব। আর যদি ছোট গৃহিণী দ্বারা আমার পুত্র-সন্তান হয়, তাহা হইলে ত সে-ই পাইবে, থাকে দেওয়াও বা, ছেলেকে দেওয়াও তাই।”

অনেক বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধ বর্ধমান গেলেন। তথায় উকীল-মোক্তারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রেজিষ্টারী-আপিসে হাটাইটি করিয়া শেষে একখানি দলীল লইয়া বাড়ী আসিলেন এবং বাড়ীতে পৌঁছিয়াই নব-বধূর রাঙ্গা চরণে পূজা দিতে আসিলেন। হস্তগতগদ্যবরে তরুণী ভার্ঘ্যাকে সন্তোষ করিয়া দলীলখানা তাঁহার হস্তে দিলেন, মনে করিলেন, “এবার উড়া পাখী পিঞ্জরে

পূরিলাম,—এ কুক-ময় এড়াইবার নহে, দেখিব, মন গলে কি না গলে।”

অভিমানিনী বধু স্বামীর দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

তারিণী-বাবু। বলি, চুপ করে রইলে যে?

বধু। তবে কি করব?

তারিণী-বাবু। দলীলখানা কি জান?

বধু। কেমন করে জানব?

তারিণী-বাবু। এখানা উইল।

বধু। শুনলেম।

তারিণী-বাবু। বড় মূল্যবান দলীল।

বধু। তোমার বাক্সে রেখে দাও।

তারিণী-বাবু। আমার ভাল মন্দ হইলে আমার বিজয়পুর তানুকখানি তোমারই হইবে।

বধু। আমার চাই না।

তারিণী-বাবু। সে কি? সে কি? এত অভিমান কিসের?

বধু। অভিমান আবার কি? যেখানে রেখেছ, ঢের হয়েছে।

তারিণী-বাবু অবাক হইয়া রহিলেন। বধু চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

তারিণী-বাবু দলীলখানি জোর করিয়া বধুহস্তে দিলেন। বধু দলীলখানি খুলি খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কোণে হনু হনু করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজি হইয়াছে। ছোট গৃহিণী-খান নাই, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছেন। তারিণী-বাবুর মাথার বজ্রাবাত পড়িল। বৃদ্ধ ভারদেশে কালীঘাটের কালীমায় মত বসিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন।

এক বটী মিনতির পর দরজা খুলিল।

বধু বলিলেন, “আবার হাড় জালাতে এসেছে কেন?”

তারিণী-বাবু সেই রাঙ্গা চরণ চুই

তালপুকুরের মধ্যে বড়লোক, বড়লোকের কথা কি শ্রীত শেষ হয়? তথাপি তালপুকুরে সামান্য অবস্থায় লোক বাস করিত, তাহাদের সম্বন্ধেও দুই একটি কথা লেখা আবশ্যিক।

বিন্দু চিরকালই দরিদ্র, কিন্তু এই দরিদ্র অবস্থাতেই বহুদৈন সংসার-বাজা করিত ও ছেলে দুইটিকে বাচুব করিত। মেয়ে সুনীলার বয়স এখন ষোল বৎসর হইয়াছে, দেখিতে একটু কাহিল ও স্ত্রামবর্ণ, কিন্তু মেয়েটি স্ত্রী, শান্ত এবং মায় মত চক্ৰ দুটি কাল, প্রসন্ন ও বড় সুন্দর। ছেলে সুবোধটির বয়স নয় বৎসর হইয়াছে, নিকটস্থ সনাতনবাটী গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে বার, এবং পিতার স্তায় শান্ত। বিন্দু আর সম্মান হয় নাই।

হেমচন্দ্র প্রায় গ্রামেই বাস করেন, জমীর চাষবাস দেখেন, আর বাড়ী বসিয়া দুই একখান বৈ পড়েন। বাঁল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বপ্নে আত্মা ছিল, কিন্তু আমরা বিদ্যালয়ে যে লেখা-পড়া শিখি, তাহাতে আমাদের নিজের শাস্ত্রে কিছুই শিক্ষা পাই না। হেমচন্দ্রের সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পড়িতে বড়ই ইচ্ছা হইত।

এ বয়সে তিনি টোলে গিয়া শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যক্রমে শাস্ত্রশিক্ষার একটি সুযোগ ঘটিল। সনাতনবাটীতে সম্ভ্রান্তি রমাশ্রমাদ সরস্বতী নামে একজন বহুশাস্ত্রবিদ্যার পণ্ডিত আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেক শিক্ষার্থী তাঁহার কাছে শাস্ত্র পাঠ করিতে বাইত, হেমচন্দ্রও পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তাঁহার নিকট কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং সর্বদা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভাল-বাগিতেন।

কবে হেমচন্দ্রের সহিত রমাশ্রমাদের বড়ই সৌহৃদ্য জন্মিল। রমাশ্রমাদের বয়স ষা বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু তিনি বহু-বৎসরাবধি কান্দীধামে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করিয়াছেন, এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শরীর এখনও তেজঃপূর্ণ ও বলিষ্ঠ। তিনি মতকে জটা ধারণ করিতেন, দীর্ঘ শ্রম রাধিয়া ছিলেন, হারিত্র-বসন পরিধান করিতেন এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে শিক্ষা-দান করিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহার দেবীপ্রসাদ নামে পঞ্চদশ বৎসরের একটি সম্মান ছিল, সে পিতার সহিত পশ্চিমে অনেক ভ্রমণ করিয়াছে, পিতার স্তায় তেজঃপূর্ণ ও উদারচেতা। সে এখন সনাতনবাটীর বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করে এবং পিতার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। দেবীপ্রসাদ বালক সুবোধকে বড় ভালবাসিত, সর্বদা আপন গৃহে লইয়া বাইত এবং তালপুকুরেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া সুবোধ ও সুনীলার সহিত খেলা করিত।

সুখা বিবাহের পর কয়েক বৎসর পুত্রের সঙ্গে কলিকাতায়ই বাস করিতেন, কখন কখন গ্রামে আসিতেন। পরচন্দ্র একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইলেন, পরে একটি উপযুক্ত চাকরীর সম্মান করিতে লাগিলেন। একবার ইচ্ছা হইল, বিলাতে বাইরা বড় পরীক্ষা দিয়া ভাল চাকরী লইয়া আইসেন, কিন্তু পরতের সেক্ষণ আর নাই, বে, বিলাতে বাইরা কয়েক বৎসর থাকেন। শুনিলেন, দেশেও ভাল পরীক্ষা দিতে পারিলে, "ট্যাট্টার সিভিল সার্ভিস" প্রবেশ করিয়া উচ্চকর্ম পাওয়া যায়, সুতরাং সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধিমান, উৎসাহী, কৃতবিল্ল
লোক পরীক্ষার বার্থ-প্রবৃত্ত হইলেন না । যে
বৎসর পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন, সেই বৎসরই
ভালপুকুর গ্রামে স্বধার একটি পুত্র সন্তান
হইল । স্বধা এটি স্নানকণ যমের করিয়া বড়
মেয়ে পুত্রের বুখচূষন করিলেন । খোকার
মাসী বড় বড় খোকার শুক্রবা করিতেন
এবং খোকার বাপ সহবে পুত্রবুখ দেখিয়া
চাকরীহান পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া গেলেন ।

সেই অবধি দুই বৎসর শরচ্ছত্র বিদেশে
বিশেষতঃ রহিলেন, দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ী
আসিতে পারেন নাষ্ট । স্বামীকে এত দিন
ছাড়িয়া থাকা স্বধার পক্ষে বড়ই কষ্টকর
হইয়াছিল, গোপনে গোপনে চিঠি দিতেন,
নিমির কাছে গিয়া অশ্রু বরিষণ করিতেন,
আবার পুত্রটিকে চুষন করিয়া অশ্রু মুছিতেন ।
এবার শরৎ-বাবু কার্যস্থানে স্বধাকে লইয়া
বাইবেন ; এক্ষণে দুই মাসের ছুটি লইয়া
বাড়ী আসিতেছেন, আজ তাঁহার ভালপুকুরে
আসিবার কথা,—সেই জন্ত স্বধা এত
প্রফুল্লজন্য হইয়াছেন,—সেই জন্ত স্বামি-
সোহাগিনী সর্বত্র বেশভূষা করিতেছেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

ঠাকুরমার পরামর্শ ।

বিন্দু । বলি, ও স্বধা, স্বধা, তোর কি
আজ খোঁপা বাঁধা হবে না বোন ? সন্ধ্যা
হয়ে গেল, এখনও কি তোর চুল বাঁধা শেষ
হয় না ? এমন চুলবাঁধা ত বাপের সঙ্গেও
দেখিনি ।

স্বধা । দেখ না দিদি, এই ঠাকুরমিরিক
বল্লেম, একরকম ক'রে চুল বেঁধে দিতে, তা
ঠাকুরমি যে কি ক'রছেন, তার ঠিক নেই

কালীতারা । হেঁ লো হেঁ, ঠাকুরমিরই
বড় সাধ, তোর মনে কিছু সাধ নেই, কেমন ?
লোকের ভাল ক'রলে বন্দ হ'ব, না ? তা
এই নে বোন, এই খোঁপা বাঁধা শেষ হ'ল
এখন রূপার ফুল ছুটি ব'লে দি, বসিয়ে দি ।

স্বধা । না ঠাকুরমি, রূপার ফুলে কাজ
নেই, ছেড়ে দাও, তোমার ছুটি পায়ে বসি ।

কালী । আর নেকামিতে কাজ কি লো ?
এই নে, ফুল দিয়ে দিয়েছি, এখন একবার
তোয়ালেখানা দাও ত বিন্দু দিদি, স্বধার
মুখখানা ভাল ক'রে মুছিয়ে দি ।

কালীতারা ছাড়িবার মেয়ে নয় । মুখখানি
বেশ করিয়া মুছাইয়া দিয়া, গলায় হার পরা-
ইয়া দিয়া, হাতে দুখানি পরনা পাইয়া দিয়া
একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরাইয়া পরে
আরসোখানি মুখে সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,
“এখন শরৎ বাড়ীতে এসে বলুক, মনের মত
বো হয়েছি কি না ?”

লজ্জার স্বধা আরক্তমুখী হইয়া ছুটিয়া
পলাইলেন, বিন্দু ও কালীতারা হাসিতে
লাগিলেন ।

কিন্তু স্বধার আয়োজন এখনও শেষ হয়
নাই । শুইবার ঘরে গিয়া একটি প্রাণীপ
আলিলেন, হাসি হাসি মুখে বিছানা করিলেন,
বিছানার ভিতর দুই একটি ফুলের মালা
লুকাইয়া রাখিলেন ডিবে ভরিয়া পান সাঝিয়া
রাখিলেন । কালীতারা ঘরে থাকিতে রন্ধন-
কার্য আর কাহাকেও দেখিতে হইত না,
তবে স্বধা মিছরিপানা, কল-মূল, মৃগের
ডাল ভিজান প্রভৃতি যে সকল উপায়ে
প্রথমে শরৎ বাবুকে বশ করিয়াছিলেন, সে
সমস্ত আয়োজন করিতে কাত হইলেন না ।

রেকাশি করিয়া লম্বা সাজাইতেছেন, এখন লম্বা বেই ঘরে ঠাকুরমাকে লইয়া বিবুদিনি প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরমা সুধাকে দেখিয়া বলিলেন, “বলি, আজ বড় আরোজন বে লো!” জ্বা-লজ্জার হেটুবা হইলেন।

ঠাকুরমার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিবু ও সুধার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, জানি না, গ্রামের কোন ঘরের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক, তাহাও জানি না, তবে বৃদ্ধা বিধবাকে গ্রামের বৃদ্ধগণ আদর করিয়া বা বলিয়া ডাকিত, সুতরাং তিনি গ্রামের মধ্যবরক ও সুবক-সুখতীদিগের ঠাকুরমা হইতেন। বাল্যকাল হইতেই বিধবা, সুতরাং আমিষর কখনও করেন নাই। যনটি সাদা, স্তন্য সমতাপূর্ণ, আর ছেলে দেখিলেই ঠাকুরমা কোলে লইতেন। সকল বাড়ীতেই তাঁহার বাতায়াত ছিল, সকল বাড়ীতেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সকল ঘরের ছেলেরা তাঁহাকে ভালবাসিত, সকল গৃহের গৃহিণীরা ঠাকুরমাকে বসাইরা দুইটি গল্প করিতেন। তবে ঠাকুরমা একটু রসিকা ছিলেন এবং কথাগুলি একটু অরমধু, নিতান্ত মিছরি-মাখান নয়।

আজ অনেক দিন পর শরৎ-বাবু বাড়ী আসিবেন, শরৎ-বাবুকে ঠাকুরমা ছেলেবেলা বড় ভালবাসিতেন, তাই আজ একবার দেখিতে আসিয়াছেন। শরৎ-বাবুকে গ্রামের লোক একঘরে করেছে, কিন্তু ঠাকুরমা মারা ও মমতা কাটাইতে পারেন নাই।

হাসিতে হাসিতে ঠাকুরমা বলিলেন, “বলি, আজ বড় আরোজন বে লো, বিশেষ কি আর কারও বামী চাকরী করে না, না বিশেষ খেঁকে কেউ কিরে আসে না! এত আরোজন কিসের লো? বড়ী ঠাকুরমা এসেছে, তা কি একবার চেরে দেখতে নেই?”

সুধা। না ঠাকুরমা, তুমি এসেছ বলে জানি না। আরোজন আর কি ঠাকুরমা, একটু জলখাবার তৈয়ার করে রাখছি। তা ঠাকুরমা, তুমি রেকাশিখানা সাজিয়ে দাও না।

ঠাকুরমা। দেখি দেখি, কি রেখেছিল। ইস, এ বে পানকল, আক, দুগের ডাল, আর এ পাখরের পেলাসে বুঝি মিছরিপানা? বিবু। হেঁ গো ঠাকুরমা, শরৎ-বাবু মিছরিপানা বড় ভালবাসেন।

ঠাকুরমা। আর এ বাটিতে কি? ও মা, এ বে চিনির রসে রসবড়া রে! এ বুঝি তুই আপনার হাতে করেছিল? এ বে ভারি বন্ধ লো! দেখিসু বাছা, এত বন্ধ-টব্ব করে বেন শরতের মাখাটি খাসু নি।

বিবু। কেন ঠাকুরমা, শরতের মাখা খেতে বাবে কেন? অনেকদিন পরে শরৎ বাড়ী আসছে, তা সুধা একটু বন্ধ করবে না ত কে করবে?

ঠাকুরমা। তা করবে বৈ কি বাছা! সুধা ভাল মেয়ে, শরতের বন্ধ-টব্ব করবে কি। তবে কি জানিস, আজকাল বে কাম সময় পড়েছে, জেরাদা বন্ধ-টব্ব করলেই পুরবমাহুর আবার মাখার চড়ে, তা বুঝি জানিসু নি?

বিবু। না ঠাকুরমা! সে আবার কেমন, বল না ঠাকুরমা!

ঠাকুরমা। ওলো দেখুবি, দেখুবি, এখন আমার মত বরস হবে, দেখে শিখুবি। আমি বাড়ী বাড়ী বাই, চের দেখেছি লো, তাই শিখেছি।

বিবু। তা আমাদের শিখাও না ঠাকুরমা, আমতা শুনি।

ঠাকুরমা। ওলো শুনি ত শোন। ঐ বে তোরা বিরে বিরে করে পাগল হস, ছেলের

বিরে দাঁও, মেয়ের বিরে দাঁও, বঁদে পাসদ হ'ল, আমি ত বলি, ছেলে-মেয়ের বিরে হয় না ত, ছেলে মেয়ের নড়াই নাগে। এই যেমন রাজার রাজার নড়াই হয় না? সেই রকম নড়াই নাগে। নে, তোরা যে হেসে গড়িয়ে গেলি। বুড়ার কথা শুনে যদি অমন ক'রে হাসিস্ ত আমি এই চলেম।

বিন্দু। না ঠাকুরমা, হাসব না, সভ্য হাসব না, বল, বল, বল, তোমার পারে বরি।

ঠাকুরমা। বলছিলাম কি, বিরে নয় ত, ছেলে-মেয়ের নড়াই নেগে যায়। যে বত আদার করুতে পারে, বুঝি কি না, মে'রে ধ'রে, ব'কে ব'কে, যে বত আদার করুতে পারে। ঐ আমাদের পাড়ার ঐ ঘোষালদের পো আছে না? তার দুটো ছেলে হয়েছে, ডা জানিস্ বাছা। তা ঘোষালদের বোটি রোগা ছেলে নিয়ে দুই ছেলে কঁাকে ক'রে সমস্ত দিন খাটছে গো, সমস্ত দিন খাটছে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, রাঁধা-বাড়া, সমস্ত সংসারের কাজ করুছে, তার উপর ছবেলা গাল খেতে খেতে প্রাণটা যায়। বাবুর যদি গরম ছুধটুকু পেতে একটু দেয়ী হ'ল, তা অম্নি গালাগালি, সে ত এমন গালি নয়, আমাদের কানে আঙ্গুল দিতে হয়। বোটি নিতান্ত ভাল-মাহুব, মুখে রক্ত উঠিয়ে বাবুর ঘর করে, তবু ত উঠতে নাবতে গাল খায়। ভাল-মাহুব হ'লে অম্নি হয় লো, পুরুষের হাতে প্রাণটা যায়। তাই বলি, অধিক ভালমাহুব হওয়া কিছু নয়, একটু আদর করুতে দেখে।

বিন্দু। তা সব পুরুষ কি ঐ রকম ঠাকুরমা?

ঠাকুরমা। না, তা বঝছিনি, তা বঝছিনি, আদার মেয়েও ভেম্নি আছে। ঐ যে

বড়ালদের বোটি কেমন শাক মেয়ে? স্বামীকে ঠিক যেন ভেড়া ক'রে রেখেছে। কর্তাটি বৌয়ের কথার উঠে, বৌয়ের কথার বসে, মুখে কবাটি কবার বো মাই। তবু ত বড়ালের বৌয়ের বহুনি খামে না, সকাল থেকে পিটু পিটু ক'রে বকছে, আর রাত দুই প্রহরের সময় সে বহুনি শেষ হয়। বাবুটি কলুর বন্দনের মত চৌক কান ঢেকে মুখ বুজিয়ে বৌয়ের বোঝা বাড়ে নিবে শারাদিন ঘুবেল। সাধার মেয়ে বা হটক! কেমন স্বামীকে বশ করেছে! কেমন কাজ আদায় ক'রে নিচ্ছে। গহনা বল, কাপড় বল, টাকা বল, মানটুকু বল, কেমন আদায় ক'রে নিচ্ছে। কোন কথার কর্তাটির কি কিছু বলবার বো আছে?

বিন্দু। তা ও রকম কি আদার করা ভাল? শুতে কি সংসারের সুখ হয়? এই দেখ না, জ্যোতামহাশয়ের সংসার কি হয়ে গেল।

ঠাকুরমা। ঠিক বলেছিস্ বাছা, আহা! ঠিক ধরেছিস্। তারিগী-বাবুর সোনার সংসার ছিল, উমার মাকে কখন একটা রেগে কথা কইতে শুনিনি গো। তা তাকে ভাল-মাহুব পেয়ে তোর জ্যোতামশাই তাকে পারে ঠেললেন, দেখলি ত। আহা, তাকে দড়ে মারলেন গো, দড়ে মারলেন! এ নড়াই শো নড়াই,—যে ভালমাহুব, তারই মরণ, যে শক্ত; তারই জিত। আবার এখন কেমন নড়াই বেখেছে। সেই ত তারিগী-বাবু,—পাড়ার পাড়ার বাঁড়ের মত করেন, সকলকে শাসন করেন,—বাড়ীতে প্রতুষ করন দেখি। কৈ, এবার ত ছেলে হ'ল না, আর একটি বো করন দেখি। তার বো নেই, ছোট গিন্নী তারে বাড়া শক্ত, নড়াইয়ে তারিগী-বাবুকে হারিয়ে

বলিল কেতে নিজেই। কেন করেছে। সুখ করেছে। সেবে যত মেরে বটে। বেশ করেছে, আদার কবুতে। অতঃপর মেরে না হ'লে কি সুখ হয়?

বিন্দু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা কোন্‌ জোঠাই বা কবুনে, সে কি ভাল কাজ ঠাকুরমা? ও রকম কাজে কি সংসারে সুখ হয়?”

ঠাকুরমা। ভাল আর কি? এই সংসারের রীতি, চিরকাল এই হয়ে আসছে। সুখ আবার কি? নড়াইতে সুখ হয়, না বিয়েতে সুখ হয়? যে যত কেড়ে নিতে পারে, মেরে ধ'রে ব'কে ব'কে যে যত আদার কবুতে পারে। আমি ত এই সংসারে দেখি, তোরা বাছা লেবা-পড়া শিখিছিস, কি জাবিস আমি না।

সুখা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আজ্ঞা ঠাকুরমা, দিদি ত হেম-বাবুকে সেবা-টেবা করে, আর হেমবাবুও দিদির বদ্ব করে। কৈ, দিদি ত আদার কবুতে শিখে নাই।”

ঠাকুরমা। ওলো, ওদের কথা বলিস কেন? হেমবাবুটি ত সন্ন্যাসী! আর বিন্দু চিরকালই একটু বোকা-সোকা মেরে, ওদের কথা ছেড়ে দে। তা ও রকম বোকা-সোকা ভালমাসুখ লোক সংসারে কটা আছে? আমি ত দেখি, সংসারে প্রায় নড়াই, যে ভালমাসুখ হয়, তারই সর্বনাশ। তা পুরুষের কি বল? তারা রোজগার করে, তাদের বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাদের আর আছে, তারা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, আর বৌগুলোকে দাসীর মত খাটাতে চায়। তা বৌগুলো যদি একটু ধারাল না হয়, একটু স্বাধীন না হয়, তোর জোঠাইয়ের মত শক্ত না হয়, তা হ'লে কেবল খেটে খেটে তাদের প্রাণটা যায়। পুরুষের নাকি-কাঁটা খেতে

হয়। কেন? জাই বনি বাছা, একটু ধারাল হবি, একটু স্বাধীন হবি, একটু শক্ত হবি। তা হ'লে মানে মানে থাকবি, আদার কবুতে শিখবি, কাশখানা, গয়নাখানা, টাকা ও প্রত্নবটুকু আদার কবুবি। পুরুষকে ভরে ভরে রাখবি, পুরুষের মতর খাটিলে আদার ক'রে নিবি, তবে ত বলি, সব্বের মত মেরে। আদার কবুতে শিখ'বিনি ত মেরে-জন্ম নিয়ে এসেছিল কেন?

বিন্দু। ঠাকুরমা, আদার কবুতে গিরে যদি সব নোকসান হয়?

ঠাকুরমা। যে রাধতে জানে, তার হাতে কি বেয়ন খারাপ হয়?

বিন্দু। ঠাকুরমা, এই বয়সেই আমি কত নোকসান দেখে লেম। কত পরিবার ঝগড়া-কাঁটি ক'রে যেন শ্রাশনের মত হয়ে গিয়েছে।

স্বামী কিংবা স্ত্রী একটু সহ কবুনে সোনার সংসার থাকত, কিন্তু সেইটুকু সহ না করাতে সংসারসুখ গোন্নায় গিয়েছে। অধিক আদার কবুতে গিরে নোকসান হয়েছে, ঠাকুরমা, শেষে যে আদায়ের চেষ্টা করেছিল, সেই মাথার হাত চাপড়েছে!

ঠাকুরমা। ওলো, সে রাধুনীর দোষে। বলি, ঐ যে এক একটা রাধুনী বেয়নে জেরাদা হুণ দিয়ে কেলে,—তাই বলে কি হুণ না দিলে রান্না হয়? তুই ত একজন ভাল রাধুনী, কৈ হুণ না দিয়ে কেবল মিছকি দিয়ে সব বেয়নগুলো রাধ দেখি?

দশম পরিচ্ছেদ ।

প্রিয় সমাধন ।

রাজি প্রায় আটটার সময় পরজন্ম বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন । তাঁহাকে দুই বৎসর পর দেখিবার জন্ত আজ বাড়ী লোকে পূর্ণ । হেমচন্দ্র এতদিন পর ত্রাত্তম শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া বথার্থই আনন্দ লাভ করিলেন । অত্যন্ত বয়স্ক-বন্ধুগণও শরৎকে মানন্দে অভিবাদন করিলেন । গ্রামের বৃদ্ধগণ (বাহারা শরচ্চন্দ্রকে একঘরে করিতে অগ্রগামী ছিলেন), তাঁহারা উচ্চপদাভিষিক্ত বহুকমতাশালী যুবককে “বাবাজি” বলিয়া বড়ই শ্রীতি, স্নেহ ও যত্ন দেখাইলেন । শরৎ সকলকে সম্মানিত করিয়া দ্বার ঘরে গেলেন ; ভূমিষ্ঠ হইয়া স্নেহময়ী মাতাকে প্রণাম করিলেন । গুরুকেশী গুরুবসনা বৃদ্ধা সজলনয়নে পুত্রের শিরশ্চ যন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।

অনেকক্ষণ মাতার কাছে বসিয়া মাতার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । শরতের মাতা সংসার হইতে প্রায় অবসর লইয়াছেন, সংসারের কাজকর্ম কিছুই দেখেন না । প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বিপ্রহর পর্য্যন্ত পূজা আত্মিক করেন, সন্ধ্যার সময় আবার আত্মিক করিয়া নিরামিষ-ভোজনানন্তর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করেন ।

শরৎকে যখন সকলে একঘরে করে, তখন শরতের মাতা স্বপ্নে বড় ব্যথা পাইয়া ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, “হা, কিছু ভাবিবেন না, ব্রাহ্মণ পুত্রারী আপনায় বাড়ীতে আসে বা না আসে, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই । আপনি যে নিরমে পূজা আত্মিক করেন, সেই নিরমেই করিতে থাকুন ;

কুহারী ব্রাহ্মণের সাহায্য লবায়তক । দানের সহিত জগদানকে ডাকিলেই জগদানের আশীর্বাদ হয়, জগদানের আশীর্বাদই বোকারদান আবশ্যক হয় না ।”

শরতের মাতা সেই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন । তাঁহার পূণ্যবলে শরৎ সকল পরাকার উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত কার্য্য পাঠরাছেন, আজ বিশেষ হইতে আসিয়া ডক্তিতাবে মাতার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন ।

বিন্দু ও কাশীতারা শরতের কাছে বসিয়া কত যত্ন করিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, শরৎও তাঁহাদের যথেষ্ট সন্তোষ করিলেন । পার্শ্বদণ্ডায়মানা অবগুর্ভনবতী সুধার কোড় হইতে প্রিয় শিশুকে কোড়ে লইয়া যন যন চুম্বন করিলেন,—আনন্দে সুধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল ।

রাজপুরুষদিগের আহ্বানার্থ নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে বড় ধুম হয় । পুণ্যচরিত্র পুণ্যহনয় শরচ্চন্দ্রকে আহ্বান করিবার জন্ত আজ সেই ক্ষুদ্র কুটার বৈরুপ স্নেহের লহরীতে ভাসিল, তদপেক্ষা প্রকৃত স্নেহ, প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভালবাসা এ জগতে দৃষ্ট হয় না ।

শরৎ অনেকক্ষণ পর যুধ-প্রক্ষালন করিলেন । অবগুর্ভনবতী সুধা সমস্তে জলখাবার আনিয়া দিলেন । জল খাইয়া পুনরায় হেমচন্দ্রের সহিত বাহিরের ঘরে বাইরা সমবেত বন্ধুদিগের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন । গ্রামের সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদিগকে আশু সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন, সাধারণের সাহায্য পুরিণী ও পথ-ঘাট-সন্ধ্যারের জন্ত কৃতদয় হইলেন, পীড়িতদিগের ঔষধাদি দানের ব্যবস্থা করিলেন, দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যালয়ের মাতিয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন । বৃদ্ধদিগের কাহারও ছেলের পড়িবার পুস্তক চাই,

কাহারও কিছুমানে কিছু সাহায্য চাই, কাহারও পরামর্শ চাইনা, কিছু বক্তৃতা চাই, শরণ হই বৎসর পর এখানে আসিয়াছেন, কাহারও বঞ্চিত করিবেন না, সকলকেই গাহায়াবাসে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

রাজি প্রায় পঞ্চাশের সবর আহাৰ প্রস্তুত হইয়াছে । হেম ও শরণ আহাৰে বসিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাছে বসিলেন, কানীতারা রন্ধনে অভুত্যা, তিনি তাঁহাকে মনের মত খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন ।

পরে বেরেদের খাওয়া খাওয়া হইল । রাজি বিশ্রামের পর হেম ও বিন্দু বিদায় হইলেন । বিন্দু বিদায় হইবার পূর্বে শরতের হাতে ধরিয়া তাঁহার শরনধর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া বসিলেন, “এখন তোমার ধন তুমি বুঝিয়া লও, আমরা চলিলাম ।” পরে প্রবেশ করিয়া শরণ দেখিলেন, শয্যার শিত্ত নিদ্রিত রহিয়াছে, পাশে একটি প্রাণীপ জলিতেছে, এবং শিত্তর নিকটে পূর্ববোঁরা, পতিপ্রাণা, লজ্জাবনতাশুখা রঞ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন ।

এক মুহূর্তকাল সেই পুণ্য-হৃদিটি দেখিলেন, প্রাণীর স্তিমিত আলোকে হৃদয়ের সর্বস্ব-রত্নকে নিরীকণ করিলেন,—ধীরে ধীরে শুধার পাশে আসিয়া সেই কোমল প্রেমবিলসল মেহলাতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই কম্পিত গুণধরে পাচ চুখন করিলেন ।

শুখা চক্ষু মুদিত করিলেন, সংজ্ঞাপূর্ণ হইয়া কোমল বাহুল্যতা দ্বারা পতিত পল-দেহ জড়াইয়া ধরিলেন,—বহনিনের হৃদয়ের বাধা ভুলিলেন । পতিপ্রাণা শুধার পূর্ণ হৃদয় স্নাত হইতে লাগিল, নয়ন দুটি আনন্দ-বারিতে আশ্রুত হইল ।

সাক্ষরে সে জল বুড়াইয়া দিয়া, সে শুধার নয়নধরে বার বার চুখন করিয়া শরজ্ঞ

হইলেন, “শুখা, আমি অপেক্ষা যথোক্তা-
বানু যে, তোমার মত রমণী-র আমার
হৃদয়াকাশে শোভা পাইতেছে, আমার জীবন-
কাশে চিরকাল নীত রহিয়াছে । বিশেষ,
বিশেষ, বিশেষ, শোকে, সজ্ঞাপে তুমিই
আমার নয়নযশি, তুমি আমার সূহৃদনী ।”

শুখা কিছু উত্তর দিতে পারিল না,—
স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে আবার
সজল-নয়নে চাহিল, আবার স্বামীর ধ্বংস
মুখ লুকাইয়া বর বর করিয়া নয়ন-জল ত্যাগ
করিল ।

পতিপ্রাণা শুধার মনের কথা যদি বাক্যে
প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে সে
বলিত, “পথের কালালিনীকে জুড়াইয়া হৃদয়ে
হান দিয়াছ,—তুঃখিনীর কত কত নিশা ও
কষ্ট সহ করিয়াছ—হৃদযেধর । আমি কি
তোমার রত্ন হইলাম ? চিরজীবন তোমার
দাসী হইয়া থাকিব, তবে ভয়ে ঐ পুণ্যপদ
সেবা করিব ।”

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

দাদামহাশয়ের পরামর্শ ।

ঠাকুরমা । কৈ গো শুখা, উঠেছিল ?

শুখা । উঠেছি ঠাকুরমা, এত সকালে বে ?

ঠাকুরমা । এই সকালে একবার এলেম
গো, শরণকে দেখতে । আর এই বে কাশ
রাজিতে একখানা ঝৈ পেতেছিলে, শরণের
জন্ত নিয়ে এলেম ।

শুখা । এ কি ঠাকুরমা ? এত বহু-উচ্চ
করুলে পুরুষমানুষ মাথার চড় বে বে ।

কানীতারা । ঠাকুরমার ঐ রকম বাবা ।

অন্ত লোককে বলেন, আদার করে নে, আদার করে নে, আর আপনি পরের অস্ত্র করে করে গতরখানি বাঁচি করুনেন। আহা, ঘোষালদের অস্ত্র ঠাকুরমা যদি না করত ত সে বোটা কি বাঁচত, সংসারের অর্ধেক কাজ ঠাকুরমা গিরে করে দিয়ে আসে। ঐ বড়ালদের বাড়ীর কঁঠাটির যখন ব্যারবার হ'ল, ঠাকুরমা ত পাঁচ সাত দিন ঘরে আসে নি, রোগীর কাছে ব'সেই ছিল। আহা, উমার মার শেষ দশার ঠাকুরমা না থাকলে কে করত, দিন নেই, রাত নেই, রোগীর যত করত। পাড়ার বত ছেলে ত ঠাকুরমাকে পেয়ে বসেছে, পাটালি শুড় আর দৈ কারও ঘরে কিনতে হয় না।

ঠাকুরমা। না লো না,—তবে লোকের ব্যারবার ত্রারাম হ'লে করতে হয়। বলি সুধা, কণাল রাত্রিতে একটু বান করেছিল না? হুই একটি বাল ঝাল কথা শুনিয়া দিই-ছিল? এতদিন পর বিদেশ থেকে এল, একবার অভিমান করে বৈকে বসেছিল ত? পারে চারে ধরিয়েছিল?

সুধা। না ঠাকুরমা, তুলে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরমা। ও বা! কোথাকার হাবা মেয়ে গা? বলি, একটু মুখ ভারি করে হুই একখানা গরনা আদার করি নি? তোর অস্ত্র হুই একখানা গরনা এনেছে?

সুধা। জানিনি ঠাকুরমা, জিজ্ঞাসা করতে তুলে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরমা। ও হরি! বলি, তুই কি একে-বারে কচি খুকী লো? এই রকম করে সংসার করবি? বলি, এতদিন যে বিশেষে চাকুরী করলে, টাকাগুলো কি করলে, তার খোঁজ-খবরও নিলিনি? তুই এমন ফুটফুটে বোঁ, তোর নামে কোম্পানির কাগজ হুই একখানা করে দিক না? তা বলেছিলি?

সুধা হাসিতে হাসিতে পুনরায় বলিলেন, “বলতে তুলে গিয়েছিলেন ঠাকুরমা।”

ঠাকুরমা। হয়েছে। নে বাছা, তোর মিছরি দিয়ে বেরন রাখ গে,—আমি তোর নুতন জোঠাইয়ার বাড়ী একবার বাই। সে বাড়ীর বেরনে বেশ একটু মশ মকা পড়ে।

এইরূপ কথা হইতেছিল, এমন সময় শরৎ-বাবু সেই ঘরে আসিয়া পড়িলেন। ঠাকুরমাকে দেখিয়া একটি গড় করিয়া বলিলেন, “ঠাকুরমা, এত সকালেই এসেছ, আমি মনে করছিলাম, একবার তোমার বাড়ী আজই বাব।”

ঠাকুরমা। না বাছা, তোরা যাবি কেন, আমি এসে এসে দেখব। কা'ল সন্ধ্যার সময় আমি এসেছিলাম, তোর আসতে রাত হ'ল দেখে চ'লে গেলাম। আহা, বেঁচে থাক, আমার মাথার চুলের মত তোর বরস হউক, ভগবান্ তোর মঙ্গল করুন। আহা, তোর হাততালী যদি আজ বেঁচে থাকত, সোনার টানের মত হুটি জামাই দেখে তার চক্ষু জুড়াত।

ঠাকুরমা কাপড়ের খোঁট দিয়া চক্ষু মুছিলেন। ক্ষণেক পর একটু হাসিয়া বলিলেন, “তা বাছা, এতদিন পর এলি, কৈ, বৌয়ের গরনা কৈ? ভালমাত্র বৌ ব'লে ফাকি দিলে ত হবে না, আমি এই বৌয়ের অস্ত্র কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছি।”

শরৎ হাসিয়া বলিলেন, “বৌ আপন, না ঠাকুরমা আপন?” এই বলিয়া ঠাকুরমার অস্ত্র বে তসরের শাটী আনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

ঠাকুরমার চক্রে আবার জল আসিল; বলিলেন, “এ সব কেন বাছা, আমাদের অস্ত্র এ সব কেন? আমি বুড়ো বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিরে এককালে তেঁকেছে,

আহার তসর-গররের কি কাজ বস্বে দেখি ?
তা ঠাকুরমাকে মনে ক'রে এনেছিস, বেঁচে
থাক বাছা, বেঁচে থাক । কিন্তু দেখ, শরৎ,
আর আহার জন্ত এমন ক'রে পরচপত্র
করিস্ নি ।”

শরৎ ঘরে আসতে সুধা খোঁসটা দিয়া
কোণে ঠাড়াইরাছিলেন, কানে কানে কালী-
তারাকে কি বলিলেন । কালীতারার হাসিরা
ঠাকুরমাকে বলিলেন, “বৌ বলছে, ঠাকুরমা,
তসরের কাপড়খানা নাও, আরও খুব আদার
ক'রে নাও, না হ'লে পুরুষমানুষ বাধার
চড়বে বে ।”

শরৎ হাসিয়া বলিলেন, “ঠাকুরমা বুঝি
আদার কবুবার মন্ত্র শিখাচ্ছিলেন ? ঠাকুরমার
যত সকলে যদি জগতে ঘেহ, ভালবাসা,
মমতা আদার কবুতে পারিত, তা হ'লে জগৎ
স্বর্গ হত ।”

ঠাকুরমার পর গ্রামের দুিদিমা শরৎকে
আশীর্বাদ করিতে আসিলেন । তাহার পর
জ্যোঠাইমা, খুড়ীমা, পিসীমা, মাসীমা, যত
বুজাগণ সকলে শরতের মুখচক্রে দেখিতে
আসিলেন । সমাজের নিয়ম অনুসারে তাহার
শরৎও সুধাকে একঘরে করিয়াছেন, কিন্তু
তাঁহাদের বেশভূষা অনিন্দনীয় চলিত্র,
তাঁহাদের অসীম পরোপকারিতা, তাঁহাদের
দয়া, মার্জা ও সংকার্য কাহারও অবিলম্বিত
ছিল না । গ্রামের আবার-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহা-
দের সাধুবাদ করিত, আবার-বৃদ্ধ-বনিতা
আজ ভালপুত্র গ্রামের যৌবনস্বরূপ শর-
তকে সম্ভাবণ করিতে আসিল । শরৎও
সকলকে প্রিয়-সভাবণে ভুট্ট করিলেন, বুজা-
দিগকে প্রণাম করিয়া বস্ত্রাদি দিগেল, বন্ধু-
দিগের সুখলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষক-
দিগের ছোট ছোট ছেলে-যেদের হাতে এক
একটি টাকা দিগেল । কৃষকপত্নীগণ সকল-

নরনে ছেলে কোলে লইয়া বাবুকে সাধুবাদ
করিতে করিতে চলিয়া গেল ।

আহারারির পর সমস্ত দিন শরৎ
গ্রাম পর্যটন করিয়া সকলের বাড়ী গিয়া
সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন, শত্রু-মিত্র বিচার
করিলেন না । অবশেষে বৈকাল বেলা তারিণী
বাবুর বাড়ীও গেলেন । তারিণী-বাবু শরৎকে
সমাদর করিলেন, শরৎ-বাবু প্রস্থান করিলে
তারিণী-বাবুর গরবিনী গৃহিণী ঠোট তুলিয়া
বলিলেন, “তা চাকরী হয়েছে, বাক্, চাকরী
করুক গিয়ে । আমাদের বাড়ীতে আসা
যাওয়া কেন ? হার জাত নেই, কুল নেই,
তার সঙ্গে মিশলে আমাদের পুণ্যের সংসারে
কলঙ্ক পড়বে বে ।”

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে কিছু জলযোগ
করিয়া শরৎ দাদামহাশয়ের বাড়ীতে
গেলেন । দাদামহাশয় গ্রামের মধ্যে বুড়ো,
কিন্তু এখনও খুব শক্ত—লাঠি ধরিয়া পাড়ার
পাড়ার ফিরেন, সকল বাড়ীর খবর রাখেন.
গ্রামের বয়স্কা গৃহিণীদিগকে কখন মা বলিয়া
সম্বোধন করেন, কখন কখন “বেটা” বলিয়া
গালি দেন, এবং গ্রামের যুবতীদিগকে
নাংনী বলিয়া উপহাস করেন । যুবতীগণ
ঘাট হইতে কলস লইয়া আসিবার সময়
বুড়োকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে ভয়ে
পলায়—“দাদামহাশয়ের” জ্বালায় গ্রাম
অস্থির ।

শরৎকে ছেলেবেলা হইতে দাদামহাশয়
বড় ভালবাসিতেন । শরৎও দাদামহাশয়কে
বড় সম্মান করিতেন এবং গ্রামে আসিলেই
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বাহিরের
রকের উপর দাদামহাশয় একাকী বসিয়া
আছেন, পূর্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন,
পূর্বস্মৃতি যোবহন করিতেছেন । দাদামহাশয়ের

সুখখানি রসিকের সুখ, নয়নের কোণে উপহাসের ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। দাদামহাশয়ের মনটি ভাল, কিন্তু মুখে কিছু আটকার না।

শরৎকে দেখিয়া দাদামহাশয় প্রকৃত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “এস ভায়া এস— অনেক দিন পর তোমাকে দেখিলাম। বলি, ভাল আছ ত?”

শরৎ। আপনার প্রসাদে ভালই আছি।

দাদা। তোমার মা ভাল আছেন? কালীতারা ভাল আছে? আর আমার সেই ফুটফুটে নাতবোটি ভাল আছে? খোকা ভাল আছে?

শরৎ। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলেই ভাল আছে।

দাদা। তা এত দিন পশ্চিম অঞ্চলে কেমন ছিলে? সে দেশের জল-হাওয়া কেমন?

শরৎ। ভালই ছিলাম। বিহারের জল-হাওয়া ভাল। তবে এখন এই বর্দ্ধমানের মত মেলেয়া-জর সেখানেও হইতেছে। মেলেয়াতে দেশটা উচ্ছন্ন হইল।

দাদা। বল কি? আমরা চিরকালই জানি, পশ্চিম-প্রদেশ বড়ই ভাল, কালী-প্রয়াগ যেমন পুণ্যস্থান, সেইরূপ শরীরের পক্ষেও উত্তম স্থান।

শরৎ। শুনিয়াছি, কালী, প্রয়াগ এবং দিল্লী, আগ্রা পর্য্যন্ত মেলেয়া-জর বিস্তারিত হইয়াছে, প্রভাব প্রদেশেও না কি যেলে-রিয়া হয়। আমি এই দুই বৎসর বিহারে ছলাম, সেখানে অভিশয় মেলেয়া হয়। তবে ভাগ্যক্রমে আমার এ পর্য্যন্ত জর হয় নাই।

এইরূপে দাদামহাশয়ের সহিত অনেককাল পশ্চিমবঙ্গের কথা, চাকরীর কথা, ভাল-

পুত্রের কথা ইত্যাদি নানা কথা হইতে লাগিল। দাদামহাশয় পূর্বকালের চাকরীর রহস্য-গল্প বলিলেন, পূর্বকালের গৃহসংসারের রহস্য-গল্প বলিলেন। কেমন করিয়া সাহেব-ঘের বশে রাখিতে হয়, তাহা বলিলেন, কেমন করিয়া বোকে বশে রাখিতে হয়, তাহাও বলিলেন। সেই সমস্ত কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি, এখন ছুটি লইয়া আসা হইয়াছে কি মনে করিয়া? নাতবোকে নিয়ে যেতে চাও বুঝি? তা হবে না ভায়া, নাতবোকে শীঘ্র ছাড়ব না।”

শরৎ। তা আপনারা অল্পমতি না দিলে কি প্রকারে পরিবার লইয়া বাই?

দাদা। তা অল্পমতি দি কেমন করে? তোমরা কালেজের ছেলে, বোকে মাথার করে রাখবে, আপনারও চাকরী সূচাবে, বোয়ের মাথাটিও থাকবে!

শরৎ। সে কি দাদামহাশয় মাথা খাব কেন?

দাদা। তা নয় শুনি। তোমাদের বো-ঠাকুরপরা না কি কলুর মত ঘানিগাছের উপর বসিয়া থাকেন, আর তোমাদের চোখে ঠুলি দিয়া খোরান। ভায়া! সেকালে ত এমন রীতিটি ছিল না, সেকালে অস্ত্র রীতি ছিল।

শরৎ। কি রীতি দাদামহাশয়? বল না, দুই একটা পুরাতন কথা শুনি, দুই একটা পুরাতন রীতি শিখিয়া লই।

দাদা। বলি, সে কালে কি বোদের গায়ের উপর পা দিয়া বসিবার উপর ছিল। ঐ সকাল থেকে উঠে বাসন মাঝা, ঘর খাঁট দেওয়া, ফুটনা কোটা, বাটনা বাটা, রাঁধা-বাড়া, পুরুষদের খাওয়ান, ছেলেদের খাওয়ান, এ সব কাজ হালে তবে বোয়েরা মুখে কল দিতে পায়ত। কাজ না করলে কি

বোঁ তৈয়ের হয় ? সে কালের খাণ্ডীয়া বোঁ তৈয়ের কবুতে জান্ত। তোমরা ভাষা কালেজের ছেলে, তোমরা তার কি জানবে বল ?

শরৎ। শুনেছি না কি সেকালে খাণ্ডীয়া কখন কখন হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়ে বোঁ তৈয়ের কবুত।

দাদা। ওহে ভায়া, চাই—চাই, একটু শাসন চাই। তোমরা সব বগী গাড়ী হাঁকাও না ? বলি, গাড়ী হাঁকাবার সময় ষোড়ার রাশ একটু টেনে রাখলে ষোড়া বার ভাল, কেমন ? আর তা না হ'লে ষোড়া মুখ খুবড়ে প'ড়ে বার। দেখ ভায়া ! তোমার যেমন রাশ আলুগা,—বেন নাথবোটি শেষে মুখ খুবড়ে প'ড়ে বার না !

শরৎ। দাদামহাশয় ! মেয়েমানুষ কি ষোড়া ? তারা কি আপনাদের কর্তব্য জানে না ? তাদের কি ষোড়ার মত মুখে রাশ দিয়া কিরাতে হয় ?

দাদা। হাঁ হে ভায়া, কর্তব্য সকলেই জানে, তবু মুখে রাশটা থাকলে কর্তব্যটা হয় ভাল। এই তোমরা যে সরকারী চাকরী কর, কেমন কড়া নিয়ম ? কোম্পানী কৈ একটু আলুগা দিক দেখি ? সব বিশ্বাস্য হয়ে বাবে !

শরৎ। দাদামহাশয়, গডব্র্যমেন্ট আমাদের মাহিনা দিয়া চাকর রাখিরাছে, চাককের মত খাটাইয়া লয়। মেয়েমানুষ কি আমাদের মাহিনা-করা দানী ? কাজ ত সকলেরই করা উচিত, আমরা বাহিরের কাজ করি, ভায়াহারা সঙ্গারের কাজ করিবে। কিন্তু তাদের প্রতি কি দানীর মত ব্যবহার করা উচিত ?

দাদা। ঐ ! কালেজের ছেলেদের বুলি ঐ। বলি, বাড়ি জোরাল দিলে যেমন কাজটি হয়, অমন কি তেমন হয় ? সঙ্গারের রীতি

এই,—বাড়ি জোরাল দিলে, খুব শাসন কবুবে, তবে বোল আনা কাজ আদার হবে।

শরৎ। আর যদি বাড়ি জোরাল না দিয়া বার আনা কাজ পাওয়া যায়, আর তার সঙ্গে যদি একটু ভালবাসা পাওয়া যায়, সেটা ভাল নয় ?

দাদা। ঐ ! কালেজের ছেলেদের বুলি ঐ ! ওহে বাপু, জোরাল না দিলে কাজও পাবে না, ভালবাসাও পাবে না, তা বুঝি জান না ? বলি, মেয়েমানুষদের মননা পাখীর মত সোনার ঝাড়ে বসিয়ে রাখলে কি তাদের যত্ন পাওয়া যায়, না ভালবাসা পাওয়া যায় ? তা নয়, তা নয় ! চারিদিকে চেয়ে দেখ ভায়া,—যে বাড়ীর গৃহিণী পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাকেন, তাঁর কাজও কম, যত্নও কম, ভালবাসাও কম। আর যে বাড়ীর কর্তা খুব শক্ত, খুব কড়া, খুব স্বার্থপর, কাজে একটু জটিল হ'লে শাসন করে, বোকে খুব খাটিয়ে খাটিয়ে আপনার বোল আনা বাবুগিরি বজায় রাখে, দেখবে ভায়া, সেই বাড়ীর বোয়েরই অধিক যত্ন, অধিক মাহ, সেই বাড়ীর কাজও ভাল হয়, সেই বাড়ীর রান্নাটাও ভাল হয়। পাকা আমের মত মেয়েমানুষের ভালবাসা গাছে কলে না,—যে একটু শাসন কবুতে পারে, একটু কড়া হয়, একটু স্বার্থপর হয়, মেয়েমানুষের কেমন তার দিকেই জোরাল টান হয়,—মেয়েমানুষের মনের রীতি এই।

শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, “দাদামহাশয়, এক দেশে এক রাজা ছিল, সে বলিত, মাংস যত পিষিবে, কাটলেই তত নরম হইবে,—মেয়েমানুষকে যত প্রহার করিবে, তার মনটি তত নরম হইবে। দাদামহাশয়েরও সেই মত না কি ?”

দাদা । ওহে ভাদ্রা, কটলেট ত কখনও খাই নি, কেমন করে বলব ? তোমরা কালেজের ছেলে, তোমরাই বলতে পার । তবে মরলাটা পিষলে জুটিটি বেশ নয়ম হয় না ? গরম গরম আলুর দইয়ের সঙ্গে মুখে দিলেই গলে যায় । বলি না তবোয়ের রান্নার বড় হাতবশ আছে না ?

শরৎ । কিছু কিছু রান্নাধিত্তে জানে বৈ কি ।—তাহার দিদির কাছে শিখিরাছে

দাদা । আহা, বেশ বেশ । আরও শিখিবে, বেশ করে ছুবেলা কাজ করাবে, তবে ত বোঁ তৈয়ের হবে । বেশ একটু মিঠেকড়া মেজাজ রাখলে বোঁ ভরে থাকবে, বেশ হুকুম-হাকাম চালালে বোঁ বস্ত্র কর্ত্তে শিখবে । দেখতে পাও না ? যে বাড়ীর কর্ত্তার রান্নাধিত্তে ঘুম হয় না, সে বাড়ীর বোঁ পা টিপতে শিখে । আর যে বাড়ীর কর্ত্তা পেট-রোগা, সে বাড়ীর বোঁ ভাল রান্না শিখে !

শরৎ । তা এ বড় মুন্সিল দাদামশাই ! বোঁকে পা টিপিতে শিখিবার জন্ত ঘুম বন্ধ করব ? না বোঁকে রান্না শিখিবার জন্ত পেট-রোগা হ'তে হবে ?

দাদা । না, কথার কথা বলছি,— পেট-রোগা যে হ'তে হবে, তা নয়, তবে একটু পিট্‌শিটে, একটু খিট্‌খিটে, একটু গরম মেজাজ হ'লে বোঁ থাকে ভাল, নৈলে মাথার চ'ড়ে বসে ! দেখতে পাও না ? আমরা যে কুকুর-বেরাল পুঁবি, তাদের কেবল ছুধ-ভাত খাইয়ে বিছানার শুইয়ে রাখলে কামড়াতে আসে । আর মধ্যে মধ্যে লাগি-ঝেঁটা দািলে কেমন পোষ মানে ।

শরৎ । দাদামহাশয়, মেরেমান্নবকে বাহারী কুকুর-বেড়ালের মত দেখে, তাহার

সেইরূপে পোষ মানায়, আর বাহারী বেড়-মান্নবকে লন্মানের বোঁগা বলিরা মনে করে, তাহার অন্তরূপে পোষ মানায় ।

দাদা । ঐ ! কালেজের ছেলের বুনিই ঐ । ওরে, লন্মান কি রে ? লন্মান কি কাজ পাওয়া যায়, না লন্মানে পেট ভরে ? কাজ আদায় করা চাই, তবে ত সংসার চলে ! বলি, ঐ ঘোবালের পো বে ও পাড়ার থাকে, তাকে তুমি জান ?

শরৎ । জানি ।

দাদা । ঘোবালের পো কেমন পাকা ছেলে । কেমন বোঁকে তৈয়ের করেছে ! ঠিক যেন ময়না পাখী পড়িয়েছে, ঘোবালের পো বা হুকুম দিবে, বোঁমা ছুঁ শব্দ না করে তাই করবে । বোঁকে ত এমন তৈয়ের করে নি ! মাঘমাসের সীতে দেখিছি, কাঁপতে কাঁপতে ঠটা রান্নার সময় ঘাটে ব'সে বাসন রাইছে, আর চৈত্রমাসের ঠিক দুই-প্রহরের রোদে দেখিছি, এক কোলে ছেলে, এক কোলে কলসী করে পুকুর-ঘাটে লম্বার উঠা-নামা করছে ! বামীর নাওয়া খাওয়া হ'লে, ছেলেরা ছই প্রহরের বেলা ঘুমালে, তবে বোঁমা নান কর্ত্তে পার, মুখে একটু জল দিতে পার । একে বলে হিন্দুর বাড়ীর বোঁ ! ঘোবালের পো কেমন বোঁ তৈয়ের করেছে ! মুখফুটে বোঁমা একটি কথা কহিতে পারি ?

শরৎ । দাদামহাশয়, বোঁকে ঐ প্রকারে তৈয়ার করা কি ভাল ? তাহাতে কি স্ত্রী সুখে থাকে, না স্বামী সুখে থাকে ?

দাদা । মেরেমান্নবের আবার সুখ কি ? পুকুরের লাগি-ঝেঁটা খেলেই তার সুখ । আর এমন করে বোঁটিকে তৈয়ের করলে পুকুরের কেমন সুখটুকু হয় বল দেখি ভাদ্রা ? ঘোবালের পো ঘুম থেকে উঠে

উঠতে সময় হয়নি। ভাত, বেড়িয়ে না। শান্তিতে আশ্রিত বৌমা না ঘোবার অলমিহে হানির, মান না হ'তে হ'তে পরের ভাত গ্রহণ। একটু এমিক্ ওমিক্ লোক দেখি, একটু খেরন খায়াল হোক দেখি। আঁঠাবার পর পান আশ্রিতে একটু ঘেরি হোক দেখি, আহারের পর বিছানা গ্রহণ হ'তে একটু বিলম্ব হোক দেখি, বৌমা সেদিন সমস্ত দিন চৌক পুঙ্করের প্রশংসা শুনে, তাঁর সেদিন ভাত খেতে হবে না। সেদিন বৌমার না কি শরীরটা খারাপ ছিল, রাত্রে একটু ঘেরি হয়েছিল, ঘোবার পো গলা সাড়া দিয়া বললেন, ঘোরের যদি বাড়ীর কাজ একলা করতে এতই কষ্ট হয়, তা হ'লে আর একটু বৌ আঁঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কথাটা শুনে বৌমা না কি আছাড় খেয়ে কেঁদেছিল, তার পর দিন ওটা রাত্রির সময় রান্না চড়িয়ে দিয়েছিল। জানলে ভায়া, এই রকম করে বৌ তৈরির করে। আঁঠা ঘের হিন্দুঘরের রীতি এই, ভোয়ার কালেকের ছেলে, এ সব রীতি কি জানবে?

শরৎ। তা দাদামহাশয়, ঘোবাল মহাশয়ের স্ত্রী দুই ছেলেকে লইয়া এরূপ আঁঠা কাজ করিয়া উন্নীত পাবেন?

দাদা। পারা পারি আবার কি? কাজ করতেই হবে। শুনেছি না কি বৌমা ইদানীং বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। পুঙ্কর থেকে জল তুলতে সেদিন আছাড় খেয়ে পড়েছিল, সিঁড়িতে উঠতে ইপার, একদিন না কি রাত্রে রাত্রে ঘুর্মা গিয়েছিল। তবু ত কাজ বন্ধ হবার বো নেই। ঘোবালের পো না কি বলছে, এক বৌ মরলে আর এক বৌ হবে, কিন্তু ঠিক সময়ে

বরন দুবড়ি বর হবে না। শুনেছি না কি এ বৌদি বড় অধিক দিন টিকবে না; ঘোবালের পো গোপনে না কি এমিক্ ওমিক্ ঘটকী পাঠাচ্ছে। ঘোবালের পো পাকা ছেলে, যদি এ বৌটি বর, ছয় মাসের মধ্যে আবার নতুন বৌটি তৈয়ারি করে নেবে।

শরৎ দাদামহাশয়ের সঙ্গে একটু মিঠা লাগ করিতে আসিয়াছিলেন, শোণ করিতে আটসেন নাই, কিন্তু ঘোবা নারী কথা শুনিয়া গোপনে বর বর করিয়া অঙ্গুলি বোচন করিলেন। সে যেহেতুকে বাংলাকাল হইতে আনিতে, ছেলেবেলা একত্র বেলা করিয়াছেন, তাহার বিবাহ হওয়া দেখিয়াছেন, কবে তাহার দুইটি সন্তান তওয়ার কথা শুনিয়াছেন। তাহার পর শরৎ বিদেশে ছিলেন, অত্র কথা বিশেষ শুনিতে পান নাই। দুই বৎসরের পর গ্রামে আসিয়া এ সমস্ত কথা শুনিয়া শরতের মনে আঁঠা ব্যথা লাগিল, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া হলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “দাদামহাশয়, নারীর অসম্মান করা ও নারীকে বাতনা দেওয়া হিন্দুধর্মও নহে, হিন্দু-আচারও নহে। আজকালকার আর্থপর লোকে আর্থপরতা অবলম্বন করিতে চাহিলে হিন্দুধর্মের দোহাই দেয়,—প্রবঞ্চকেরা প্রবঞ্চনা করিতে চাহিলে দেশীয় আচারের দোহাই দেয়,—জনশূন্য লোকে স্ত্রী-পরিবারের প্রতি নৃশংস আচরণ করিয়া আর্থ-রীতির দোহাই দেয়। দাদামহাশয়, বাহারা আর্থসাধনের অত্র দেশীয় আচারের দোহাই দেয়, বিলাসী হইয়া ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দেয় এবং আশ্র-স্থলের অত্র কীর্ণ, ফুরিল, বহুপ্রমত্তিষ্টা, বহুদুঃখ-ভাগিনী নারীর প্রতি নির্ধর হয়—তাহার আর্থ্যও নহে, হিন্দুও নহে, তাহাদের স্পর্শ

করিলে ধর্মপরাধ হিন্দুদের ক্ষতি বার।
বার্ষিকতা, প্রবন্ধনা ও নির্দিষ্টতা হিন্দু-
আচার নহে,—প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম উদার, মহৎ
ও নিঃস্বার্থ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:—:—

সনাতনবাটার জমিদারবংশ।

ভালপুরের অনতিদূরে সনাতনবাটা নামে একটি বড় গ্রাম ছিল। তথায় এক-
কালে সহস্র ঘর লোকের বাস ছিল, কিন্তু
বর্জমানের ম্যালেরিয়া-অরে গ্রাম উৎসন্ন হইয়া
গিয়াছে। এখনও তথায় পাঁচ ছয় শত
লোকের বাস আছে, তাহার মধ্যে প্রায় এক
শত ঘর ভদ্রলোক, কয়েক ঘর কলু, যরয়া,
কামার, কুবার, তাঁতি প্রভৃতি ব্যবসারী
লোক, আর অবশিষ্ট চাষী প্রজা। প্রত্যাহ
প্রাতঃকালে গ্রামে বাজার বসিত এবং চারি-
দিক্ হইতে মাছ, তরি-তরকারী বিক্রয় হইতে
আসিত। তত্তির কয়েকখানি স্থায়ী বোকান
ছিল। একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০৮০
জন ছেলে পড়িত, তাহা ভিন্ন বড়
পাঠশালার ব্যবসারী ও ইতরলোকদিগের
প্রায় এক শত ছেলে পড়িত।

সনাতনবাটার জমিদার সুখোপাধ্যায়বংশ
পুরাতন ঘর, পাঁচ ছয় পুরুষ হইতে তাঁহাদের
জমিদারী, এবং বংশটিও বিপুল হইয়াছে।
প্রাচীন জমিদার-বংশে যেমন হইয়া থাকে,
সুরিকে সুরিকে অনেক মামলা-মোকদ্দমা
হইয়া গিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে।
কোন কোন অঙ্গীদগের মধ্যে কেহ কেহ
একেবারে নিঃস্বয় হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া

বর্জনার বা কলিকাতার চাকরী লইয়াছেন।
কোন কোন সরিক মরিচ হইয়াও কোন-
একবারে সাবেক ভদ্রাসনে এখনও জমিদার
নামটা বজায় রাখিয়াছেন। আবার কোন
কোন তরক এখনও বেশ সঙ্গতিপর আছেন,
আর বখেই আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে
মামলা-মোকদ্দমাও চলিতেছে।

বংশের বৈরাগ্য অবস্থা, পুরাতন জমিদার-
বাড়ীরও সেই অবস্থা। প্রকাণ্ড হাতার
মধ্যে অতি প্রাচীন ইয়ারত, কোথাও ভাঙিয়া
পড়িয়াছে, কোথাও বা নূতন মেসারস করিয়া
হইয়াছে। প্রাচীন সিংহদ্বার এখন সিংহ-
পুঞ্জ, প্রাচীন উদ্যান এখন জঙ্গল, প্রাচীন
ধিকারী পুরুষের সারিকী, অতএব পানায়
পরিপূর্ণ।

এজমালির বাড়ীতে কেহ বড় টাকা খরচ
করিয়া সংস্কার করেন না, কিন্তু সঙ্গতিপর
অংশিগণ হানে হানে নূতন দালান তুলিয়া-
ছেন। বাঁহার বৈরাগ্য ক্রমত, তিনি সেই-
রূপ গৃহ-সংস্কার বা নূতন প্রস্তত করিয়াছেন।
কোন গৃহ অতি সামান্য, আবার সঙ্গতিপর,
কোন অংশীর নব্য-গৃহ প্রাসাদতুল্য শোভা
পাইতেছে।

এইরূপ সনাতনবাটার জমিদারী-আবাস
অনেক পুরুষের সৃষ্টি, অনেক বাঁচার নিশ্চিত,
অনেক অবস্থার পরিণত। কিন্তু তথাপি
সেই বিস্তীর্ণ আবাসস্থান, সনাতনবাটার
জমিদার-ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই বিস্তীর্ণ
আবাসে বাসিগণ, কি ধনী, কি মরিচ, সনাতনবাটার
জমিদারবংশের বলিয়া মর্যাদা
প্রাপ্ত হইতেন। ছেলে-মেয়ে লইয়া প্রায়
শতাধিক লোক সেই বিস্তীর্ণ জমিদার-
বাড়ীতে বাস করিতেন, কেহ বা পুরাতন
এজমালী বাড়ীর ভয় ঘরে, কেহ নূতন
নির্মিত প্রাসাদে। কেহ বা রাজার তুল্য

আর ভোগ করিভেন, কেহনা প্রকার উপর উৎপাত করিয়া আসিলে তব পুত্রী রক্তন প্রস্তুত করিভেন। কোন পুত্রী নিজ হাতে খিড়কীর পান্য-পুষ্করীতে বসিন বাজিভেন, আর কেহ অন্যর বাহুলভার হীরকখচিত বলয় ও কঙ্কণ ধারণ করিয়া কর্তার মন আকর্ষণ করিভেন। সকলেরই দেশবিদেশে সনাতনবাটীর জমিদারবংশীর বলিয়া মান-সম্মত আছে।

এই বহুজাতিপূর্ণ বাড়ীর মধ্যে কামিনী-কান্ত মুখোপাধ্যায়ই আজ প্রধান বলিতে হইবে। তাঁহার পিতা বড় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, ছলে, বলে বা কৌশলে ভর দেখাইয়া, ঠকাইয়া বা অর্থ হারা ক্রম করিয়া অনেক ক্ষুদ্র অংশ নিজের হস্তগত করিলেন ও অবশেষে সমস্ত জমিদারীর চারি আনা অংশের মালিক হইলেন। কামিনীকান্ত-বাবু নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে আর তিন আনা বাড়াইলেন, সুতরাং তাঁহাকে সাত আনার জমিদার বলিত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতার লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, —লেখা-পড়া ধনাঢ্য জমিদারের বৈষ্ণব হয়, সেইরূপই হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাবুগিরি শিখিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কামিনীকান্ত-বাবু নিজের অংশের অট্টালিকা ভাগ করিয়া সাজাইলেন, বাড়, লঠন, দেওয়ানগিরি, পাখা, স্বর্ণ-প্রস্তরের টেবিল, সোকা, চৌকি, কাপেট প্রভৃতি নানা উপকরণগ্রন্থ নব্য জমিদারের ঘর আগো করিল। সম্মুখে একটি বাগান করিলেন, মধ্যে পুষ্করী, চারিদিকে মর্দর-প্রস্তরের মূর্তি। বাগানে একটি নাচঘর নির্মাণ করিলেন, তাহাতে কখনকখন সাহেবদের খান্না দিতেন, কখন বা কলিকাতা হইতে বাই আসিয়া বাইন'চ দিতেন। কলিকাতার তাঁহার

দরবার বাজারাত ছিল এবং কলিকাতার সুনতা বহুসংখ্য কখনকখন তাঁহার ইন্দ্র-পুরীতে আসিয়া বসিয়া ভোগ করিভেন।

কামিনীকান্ত-বাবুর দোড়িও প্রতাপ। প্রজাগণ তাঁহার নাম শুনিলে কাঁপে, ক্ষুদ্র জয়গণ তাঁহার অত্যাচার বহন করেন, দরিদ্রা অশিনীগণ তাঁহার দ্বারা অবমানিত হইলে ঘরে গিয়া কাঁদেন, জমিদারবাড়ীর ছেলে-যেদেরা তাঁহাকে দেখিলে পলায়। সাহেব-মুহুরদের নিকট তাঁহার বখেই নাম, পুলিশ তাঁহাকে বখেই ভর করে, তাঁহার বাড়ীতে একটা ঘটন। হইলে শীঘ্র বেসে না। গ্রামের বুড়ো লোক বলিত, অনেক বৎসর পূর্বে একটা হাকামা হইয়া জমিদারদের বংশেরই একটা ছেলে খুন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু লাসও পাওয়া গেল না, পুলিশ কোন কিনারাও করিতে পারিল না। আধ্যাতিক-বিবৃতসময়ে কামিনীকান্ত-বাবুর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স, কিন্তু এখনও যৌবনের তেজ ও প্রতাপ কমে নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

জটাধারী ।

একদিন সন্ধ্যার সময় কামিনীকান্ত-বাবু একাকী উঠানে পাইচারি করিতেছেন, এমন সময় সহসা একজন দীর্ঘকায় জটাধারী সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জটাধারী কামিনীবাবুকে আশীর্বাদ করিলেন, পরে জমিদারের প্রাসাদ, উঠান, নাচঘর প্রভৃতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কামিনী-বাবু। আপনি কে ?

রমাশ্রম। আমি বিচার্য করি। কানীধারে ও কলকাত্ত হানে কহ বন্দনবিধি শাস্ত্রানি স্মারন করিয়াছি, অথবা এই পুস্তিকে লইয়া বদনেশে উপনীত হইয়াছি। নাম রমাশ্রম সরস্বতী।

কামিনী-বাবু। এ গ্রামে কবে আসা হইল? এখানে কি উদ্দেশ্য?

রমাশ্রম। এ গ্রামে অতাই আসিয়াছি, সনাতনবাগীতে কিছুদিন থাকিয়া শিষ্যদিগকে শাস্ত্রাধি পাঠ করাইব, আপাততঃ এই উদ্দেশ্য। শুনিলাম, এই বিখ্যাত জমীদার-গৃহে অনেক অতিথি আশ্রয় লাভ করে, অতএব আপনার যদি অহমতি হয়, আমিও একটা ওয় বরে আশ্রয় লইয়া কিছুদিন বিশ্রাম করি।

কামিনী-বাবু। আপনার এ প্রস্তাবে আমি সন্মানিত হইলাম। শাস্ত্রব্যবসারী-নাগকে আশ্রয়দান করা ও সমাদর করা আমাদের বংশের রীতি।

রমাশ্রম। আপনার স্বর্গীয় পিতা শাস্ত্রজ্ঞদিগের বিশেষ সমাদর করিতেন।

কামিনী-বাবু। আপনি আমার স্বর্গীয় পিতাকে জানিতেন?

রমাশ্রম। তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সম্ব্রত করিতেন, কানীধারেও সে ক্রিরাবান্ জমীদারের নাম অনবগত ছিল না।

কামিনী-বাবু। আপনার কথার বড় আশ্চর্য লাভ করিলাম। আপনি যখন এ গ্রামে আসিগাছেন, ভরসা করি, কিছুদিন অবস্থান করিয়া এ গৃহ পরিভ্রম করিবেন।

রমাশ্রম। অবস্থান করিবার মানসেই আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার অগ্রগ্রহ।

কামিনী-বাবু। ইচ্ছামত ঘর বাহিরা লউন, সপুত্র অবস্থান করুন, তাহাতে আমি

অস্বস্তিতে হইব। আমার একজন কৃত্য আপনায় আবশ্যকীয় বোধাইবে।

রমাশ্রম ও তাঁহার পুত্র জমীদারকে সেই বিখ্যাত ঐষ্টাধিকার নীচের একটি ঘর ঘরে আশ্রয় লইলেন। সন্ধ্যার সময় কিকিং জলযোগ করিয়া ভূমিতে কবল বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতে জমীদার-বাড়ীর সকলে শুনিল, পশ্চিমদেশ হইতে একজন বড় সাধু আসিয়াছেন। বাবুগণ একে একে আসিয়া সাধুর সহিত হু-চারিটি কথা কহিলেন, মেয়েরা বিড়কীর পুত্র হইতে আসিবার সময় কলসী কাকে করিয়া কণেক পাড়াইয়া জটাধারীকে দেখিয়া গেল, ছেলেগুলো উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া পলাইয়া গেল। হুই একদিন পর আর কেহ বড় রেখিতে আসিত না, মেয়েরা বলাবলি করিত, “ও সাধুও নয় সন্ন্যাসীও নয় লো, ও হাত দেখতেও জানে না। কেবল পশ্চিমে একটা পণ্ডিত, একটা টোল খুলবে বুঝি, তাই এসেছে। দিন-রাতই পুঁথি পড়ে, আর ছেলেটাকে পুঁথি পড়ার। আহা, ছেলেটি বেন সোনার চাঁদ।”

জমীদার-বংশের মধ্যে বোগমাণা নামেই একজন বরফা বিধবা ছিলেন, তিনি পণ্ডিত-ঠাকুরকে জলটল আসিয়া দিতেন, একটু সেবা-ভূজনাও করিতেন। বোগমাণার ছেলে-বেলায় বড় ঘটায় এই জমীদার-ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, কেন না, তাঁহার স্বস্তর এই জমীদারীর একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। শুনা যায়, তাঁহার বিবাহের পরই স্বস্তরের মৃত্যু হয়, হতভাগিনীর স্বামীও অচিরে মারা যায়,—অনাথা বিধবার বধাসর্ব্ব অত্র অংশীদারগণ দখল করিয়া লইলেন। সেই অবধি বিধবা বিখ্যাত স্বস্তরকুলে অত্রতমা দাসীর ভাৱ শোকে হুখে দাস করিতেন। হু-বেলা

হু শেট বাইরেই পাইকজন, কুল করিয়া পরের
পল্লব ভসিভেন, যে কখন বলিত, তখনই
কাহার বল করিয়া, বাসন মানিয়া, বর
কাজি দিয়া বিবেচন। এইরকমপার জিৎসং
বৎসর এইরকম কাটাটাইছেন,—খরীদখানি
বীণ, কিন্তু কখন হুখরী এখনও আপনিত হয়
নাই। চকু দুটি কোমল ও শান্ত, বাহুলতা
কিন্তু হইলেও এখনও আবগ্যপূত নহে, সমস্ত
অবসরে এখনও উত্তরবেশোচিত মাথুখা বিব্রাজ
করিতেছে। জিৎসং বৎসর কষ্টে কাটাটাইরা-
ছেন, আর কয়েক বৎসর এইরকম কাটাটাইরা
সংসার-হুং হইতে মুক্তি পাইবেন, মনে মনে
এই আশা করিতেন এবং ভগবানের নাম
লইতেন।

বে দিন সন্ধ্যার সময় সরস্বতী ঠাকুর সেই
জরীয়ার-পূর্বে আজ্ঞার লইলেন, সেই দিনই
বোগমায়ী ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।
ঠাকুরের সময়, শান্ত, উন্নত বৃষ্টি দেখিয়া,
বালক দেবীপ্রসাদের উল্লেখ, প্রশান্ত, তেজঃ-
পূর্ণ মুখখানি দেখিয়া বিবহার ক্রমে মায়ার
উন্নত হইল। বোগমায়ী ঠাকুরের বরটি
খাটি দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন, বল
আমিয়া দিলেন, আবস্তকীয় সমস্ত আরোজন
করিয়া দিলেন। ঠাকুর অনেককাল ধরিয়া
সেই কীৎকার হুঃখিনীর দিকে দেখিলেন,
চকুর একবিন্দু বল হুভিলেন, শেষে বলিলেন,
“ভয়ে। তোমার মনটি বরিত্রের প্রতি সময়,
তুমি আমার অনেক সেবা করিলে, ভগবান
তোমার উপকার করিবেন। জীবনে
অনেক কষ্ট পাইয়াছ, কিন্তু তোমার কষ্ট
অবসান হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু হুঃখিনি
প্রভাত হইবে।”

সেই অবধি বোগমায়ী সরস্বতী ঠাকু-
রের শুভ্রা করিতেন, সমস্ত আরোজন
করিয়া দিতেন। ঠাকুর নিজেই পাক করি-

তেন, বাড়িকে শিখা-পুড়ে কখন পাতিয়া
তইতেন,—অল্প দিখানা ব্যবহার করিতেন
না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রপ্রচার।

অল্পদিনের মধ্যে সমাজসংস্কারী ও চতু-
র্দিক্হ অনেক গ্রামে রম্যপ্রসাদ সরস্বতীর
নাম প্রকাশ হইল। তিনি বোগী সন্ন্যাসী
নহেন, হাত দেখেন না, বাহু-করেন না,
কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পা র
দর্শিতা, শাস্ত্রপ্রচারে আনন্দনীর উৎসাহ,
শাস্ত্রব্যাপ্যার অনির্বচনীয় কমতা গ্রামে গ্রামে
প্রকাশ পাইল। প্রাতঃকালে দান করিবার
সময় উন্নতবরে তিনি যখন বেরগান করি-
তেন, নারীগণ কলস নামাইয়া তাঁহাকে
কোন দেবের অবতার বলিয়া প্রণাম করিয়া
হাইত। মধ্যাহ্নে বৃক্ষতলে শিবা-পরিবেষ্টিত
হইয়া যখন উপনিষদের অনন্ত চিন্তা ও
অনন্ত ভাবের ব্যাখ্যা করিতেন, বিভাগয়ের
বালকগণ নিজ নিজ পাঠ ছাড়িয়া তাঁহার
কথা শুনিতে আসিত। আর সন্ধ্যার সময়
নিজ ভগ্ন আবাসে, যখন মহাভারতের বা
রামায়ণের বা পুরাণের শিকাগ্রহ উপাখ্যান-
গুলি বলিতেন, গ্রামের বৃদ্ধ, করাগ্রস্ত ও
মুগ্ধগণও সেই অন্ততারা পান করিয়া
জীবনের পাপক্ষলন করিত, জীবনের সারৎ-
কাল পবিত্র করিত।

চারিদিকে গ্রামের লোক বে দিন
অবসর পাইত, ঠাকুরের অন্তত কথা শুনিতে
আসিত। যেমন প্রায়ই সন্ধ্যার সময় ভাল-

সুহর হইতে আসিতে, অবশেষে শরৎ বাজী আসিলে তাঁহাকেও একদিন সন্ধ্যার সময় সনাতনবাটিতে হইয়া আসিলেন।

সরস্বতী ঠাকুর নিজ আবাসের সমুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে কখন বিছাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার চারিদিকে তাঁহার করেকজন শিষ্য ও বন্ধুগণ বসিয়া শাস্ত্রকথা শুনিতেছেন। প্রথমে হুই একটি বৈষ্ণবান গাইলেন, শিষ্যগণ বাহারা বাহারা গাইতে জানিত, গুরু সহিত তারস্বরে সেই অনন্ত গীত গাইরা নৈশ আকাশ সজীতে পূর্ণ করিল। গ্রামের গৃহে গৃহে সে শব্দ প্রবেশ করিল, বাতীর কোড়ে সুপ্ত বালক সে সঙ্গীত শুনিয়া নিজীবণে হাসিল।

তাঁহার পর উপনিষদব্যাখ্যা। উপনিষদের গভীর অর্থ কাশীধামে বৈষ্ণব শিক্ষা করিয়াছিলেন, উপনিষদের উপাত্ত পরস্বরের ব্রহ্মণ ও তত্ত্ব বৈষ্ণব জানিয়াছিলেন, উপনিষদের সারগর্ভ আখ্যানগুলির সরল অর্থ বৈষ্ণব ব্রহ্মণাছিলেন, সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সত্যকাম উপাখ্যানের অর্থ, মাটিকেতা উপাখ্যানের অর্থ, মৈত্রেয়ী উপাখ্যানের অর্থ,—ইত্যাদি নানারূপ উপাখ্যান-কথায় প্রায় এক প্রায় কাল অতিবাহিত হইল। প্রোত্বর্ণ নিম্নক হইয়া সে অব্যতকথা শুনিতে লাগিল, সে অব্যতকথা সকলের হৃদয় বর্জজ্ঞান ও পবিত্রভাবে প্রাপ্ত করিল।

তাঁহার পর সকলে একত্রিত হইয়া বেদের বিশ্বকথা, উপনিষদের পণ্ডিত্যকে প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদ সাজ হইল, বন্ধু বন্ধুকে, গুরু শিষ্যকে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া সভা-ভঙ্গ হইল।

পরন্তু অনেককণ পর্যন্ত বাক্যশূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে উঠিয়া রম্য-প্রদানের পদগুলি গ্রহণ করিয়া বসিলেন,

“গুরুদেব! আপনি আজ কাশীরিক বৈষ্ণবিক দিলেন, তাহা পিতৃগৃহে শিষ্য নাই, বিছায়ে শিষ্য নাই, কার্যকরো শিষ্য নাই। আশাদের এরূপ শাস্ত্র-কথা, নীতি-কথা থাকিতে আমার বিশেষীরসিগের নিকট থাকের কালাদী হই। গুরুদেব! নাহলে সত্যনানি হউন, উৎসাহে অঙ্গনর হউন, কৃতি ও অজ্ঞান-ভিষির তিরোহিত করিয়া আমাদের সনাতনবর্ষ প্রকাশ করুন, সনাতন শাস্ত্র প্রচার করুন, সনাতন নীতি-শিক্ষা দান করুন। পুরুষসিংহ! আপনার এ উত্তম সার্থক হইবে, হুম্বু কু-প্রাণ-সীড়িত জাতি আপনার সঙ্গী-বনী কথার জীবন পাইয়া পুনরুত্থান করিবে।”

স্বকের উৎসাহ দেখিয়া সরস্বতী ঠাকুরের চক্রে জল আসিল। তিনি শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “শরৎ! তুমি আমাকে চিন না,—আমি তোমাকে চিনি। তোমার কার্যকলাপ আমি জানি। তোমার উৎসাহ ও উত্তম আমি জানি। তোমাদের স্তার লোক থাকিলে আমাদের ধর্মেশের মঙ্গল।”

তৎপরে সরস্বতী ঠাকুর হেম ও শরৎকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

ঠাকুরের ভগ্ন ধরটি বোগমারা পরিচার্য করিতেছিলেন,—বাহিরের দুইজন লোক দেখিয়া বোগমারা সরিয়া গেলেন। সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন, “ভক্তে বোগমারা, সরিয়া বাইবার আবশ্যক নাই। হেম-বাবু ও শরৎ-বাবু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাধরূপ,—অঙ্গনিনম্যো তুমিও ইহাদিগকে চিনিবে। আজ উঠারা আমার এইখানেই কিঞ্চিৎ আহার করিবেন, তিনটি পাত কর।” বোগমারা সেইরূপই করিলেন।

শব্দভাষ্য পরিভাষ্য।

শাস্ত্রশিক্ষা।

শব্দঃ। আমা আপনকার শাস্ত্রশাস্ত্রাধ্যাপনায়।
তিনিই আমাদেয় হবারে নূতন আশার সঞ্চার
হইল। এই নূতন শিক্ষা কবে এ দেশে প্রচ-
লিত হইবে?

সরস্বতী। শরচ্ছত্র। এ শিক্ষা নূতন নহে,
আমাদের শাস্ত্র বহু দিনকার, বেদ বহু দিন-
কার, এ শিক্ষা তত্ত্ব দিনের। তবে আধুনিক
কাছে জনসাধারণের অজ্ঞানতাবশতঃ তাহারা
এ পবিত্র প্রথা হারায়াছে, তাত্ত্ব হইয়া
কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তুমি যদি রায়া-
ণী নগরে কখন বাও, বিবেচন-মন্দিরে
বাইও, দেখিবে, তথায় শাস্ত্রজ পণ্ডিতগণ
এখনও বেদপাঠ করেন, সে পবিত্রীত
তুমিও পাণ্যমোচন হয়, স্মৃতিলাভ হয়।

শব্দঃ। আমি কণ্ঠিতে কখনও বাই নাই,
কিন্তু তুমি যদি, তথায় এখনও বেদবেদান্তের
চর্চা আছে। কিন্তু সে কর জনের মধ্যে?
প্রকৃত শাস্ত্রকথা আমাদের দেশে কর জন
জানে?

সরস্বতী। অতি অল্পই বটে এবং সেই
জন্তই আমাদের প্রাচীন আচার-ব্যবহার,
ধর্ম ও নীতি, সকলই বিকৃত রূপ ধারণ করি-
য়াছে। শব্দঃ, তুমি ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের
ইতিহাস অবগত আছ, তুমি কি জান না যে,
জনসাধারণ অজ্ঞান ও অর্থ হইয়া থাকিলে
কোন্সচার বিকৃত হইয়া যায়? তুমি কি জান
না যে, জ্ঞানের আলোক বিকাশ পাইলে
জাহার সঙ্গে সঙ্গে রীতি ও বেশাচারের
পুনঃসংস্কার হয়?

শব্দঃ। সরস্বতী ঠাকুর। তাহা আমি
জানি, অগতঃ এরূপ অনেকবার বলিয়াছি।

কিন্তু আমাদের দেশে কি সেটি ঘটবে?
আমাদের দেশে কে প্রকৃত শাস্ত্র-প্রচার
করিবে? ইহাজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ, ইহারা শিক্ষা-
ইদে পিতৃহীনে পাবেন, তাঁহারা ইহা বর্জ-
কৃত সেতুদি বর্জপন করেন। হতভাগ্য
দেশে কি পুনরায় শাস্ত্রজ্ঞান-প্রকাশের উপায়
আছে?

সরস্বতী। শব্দঃ, ইহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা
স্বার্থপর নহেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান গোপন
করেন না। শাস্ত্রজ্ঞ রাজা রামমোহন রায়
প্রথমে উপনিষৎগুলি অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-
বাসীদিগের হস্তে অর্পণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমুদ্রতুল্য শাস্ত্রময়ন
করিয়া সমাজ সংস্কারে পবিত্র জীবন অতি-
বাহিত করেন। তুমি যদি, এখনও মলিকাতার
শাস্ত্রজ্ঞ বহুমতজ্ঞ মহাভারতে পুণ্যকথার
অনেকশ্লোককে উদ্ধার শিল্প তেছেন।

শব্দঃ। ইহাদের উপদেশ, ইহাদের কার্য,
ইহাদের চেষ্টা কলপ্রসবিনী হইবে, বঙ্গ-
সমাজ ইহাদের আহুত রত্নের উত্তরাধিকারী।
কিন্তু এরূপ অসাধারণ পণ্ডিতের কথা
ছাড়িয়া দাও, শাস্ত্র প্রকাশ করা শিক্ষিত
লোকমাত্রেয়ই কর্তব্য, যে বতটুকু পারে,
তাহার সেইটুকু করা কর্তব্য। কে শাস্ত্র
প্রকাশ করিবে জিজ্ঞাসা করিতেছ? শব্দঃ।
তুমি প্রকাশ করিবে, আমি প্রকাশ করিব,
হেম-বাবু প্রকাশ করিবেন, যে দেশাতুরাগী,
সে বতটুকু পারে, প্রকাশ করিবে। এইরূপে
দেশে দেশে প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষা প্রচার হইবে,
অজ্ঞান তিরোহিত হইবে, কু-রীতি কু-প্রথা
উন্মীয়া যাইবে। উৎসাহী উত্তমশীল যুবক,
তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ কার্য কাহার
দ্বারা সম্পাদিত হইবে? লৈন্ডলার সৈনিক-
পুত্র যুগলময় জিজ্ঞাসা করে, কে বিজ্ঞানভিত্তিক
করিবে?—অগ্রসর হও, আমিরাই করিয়া

করিল। এ কার্যে তাঁহার খুব তাহিরা থাকিল না, রাজপুরুষদিগের ইহাতে অবিকার নাই—কথ্যতাও নাই,—হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্র-প্রচার হিন্দুদিগেরই কর্তব্য।

পরং। আপনাদিগে পুণ্যচন্দন পড়ুক, আপনাদিগে কথ্য সকল হউক। কিন্তু এ যুদ্ধে আপনাদিগে কত কল বোপদান করিবেন? তিন জন শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত নাম করিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, হিন্দু-জাতির একসাধনে, উন্নতিসাধনে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু কত সহস্র সহস্র শাস্ত্রজ্ঞান পণ্ডিত আর্থসাধনার্থ শাস্ত্রজ্ঞান একচেটিয়া করিয়া রাখেন, নিজ প্রভু বজার রাখিবার জন্য হিন্দু-জাতিতে অবনত ও বিভিন্ন ও দুর্বল রাখিবার প্রয়াস পান।

সরস্বতী। পরং, তুমি শিক্ষিত, তুমি ইতিহাসজ্ঞ, তুমি কি জান না যে, আর্থ-পরদিগের প্রয়াস তাহাদিগের জীবনের সহিত গৌন হয়, নিঃস্বার্থ মনুষ্যের চেষ্টা কলপ্রসবিন? নিঃস্বার্থ বুদ্ধ-দেবের উত্তমফল অজ্ঞাবধি জগৎ-সংসারে দেখা পায়মান, যে আর্থপর লোকে তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহারা কোথায়, তাহাদিগের কর্মফল কোথায়? ইউরোপে নিঃস্বার্থ লুণ্ঠনের চেষ্টা কলপ্রসবিনী হই-রাছে, যে সহস্র সহস্র পুরোহিত তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে কে জানে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গরাশির দ্বারা ক্ষুদ্র আর্থপর লোকের চেষ্টা কালের করাল হৃদয়ে বিলীন হইয়া বাইবে—রামমোহন, দেবরচন ও বাসুদেবের চেষ্টা কলপ্রসবিনী হইবে। তাঁহাদের চেষ্টার অবনত হিন্দুজাতি উন্নত হইবে, জাতিনির্কিষেবে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবে।

পরং। হিন্দুজাতি নিরকিষেবে এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে, এইরূপ আপনাদিগে উন্নত।

সরস্বতী। হী পরং, সকল হিন্দুই শাস্ত্র-শিক্ষার অবিকার আছে, সকল হিন্দুই এ মহৎ শিক্ষা লাভ করুক, কলসাধারণের শিক্ষা তিন্ন উন্নতির উপায়ান্তর নাই। পুরাকালে অত্রি বৈত শকসেরই শাস্ত্রশিক্ষার অবিকার ছিল, এখন সেই অত্রি বৈত জাতিয়া গোয়রা শত শত তিন্ন জাতিতে পরিণত হই-রাছে, তোমাদের পৈতৃক অবিকার কে কাড়িয়া লয়? প্রাচীন শাস্ত্রাঙ্গসারে শূত্র অর্থে অনার্থ্য্য, যদি ভোগ্য অনার্থ্য্য হও, তাহা হইলে আমরা কি আর্থ্য্য? আর তোমরা যদি আর্থ্য্য হও, তোমরা যদি বিজসন্তান হও, তাহা হইলে আর্থ্য্যশাস্ত্ররূপ পৈতৃক ধন কে তোমাদের নিকট কাড়িয়া লইতে পারে?

পরং। তবে এতদিন শাস্ত্রজ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণগণ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন কেন?

সরস্বতী। তোমরা অত্রি-বৈত-সন্তান হইয়া নিজ পৈতৃক ধন তুলিয়াছিলে, এই জন্য ব্রাহ্মণেরা তোমাদের গচ্ছিত ধন রক্ষা করিয়াছেন! তোমরা যখন মৃত ছিলে, ব্রাহ্মণেরা জাগরিত থাকিয়া সে শাস্ত্রধন রক্ষা করিয়াছেন, তোমরা যখন বেদবেদান্ত তুলিলে, ব্রাহ্মণেরা সহস্র বৎসরের পর সহস্র বৎসর পর্যন্ত সেই বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। স্বাধীনতার, পরাধীনতার, শোকে, সন্তাপে, ব্রাহ্মণেরা সে অমূল্য ধন রক্ষা করিয়াছেন। জানপ্রাণ যখন ভারত-বর্ষে নির্বাপিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদ্বয়ের সে প্রাণিগণ রিড অধিনবর ভেঙ্গে অনিভেছিল, আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক যখন আধ্যাত্মিক

বিদ্যুৎ, আলোকবিদ্যুৎ, আকর্ষণ, প্রভৃতিতে
কেই ইতিহাস লিখানোর প্রবৃত্তি ছিল।
একসময় তিনি বঙ্গদেশে গিয়ে উৎসাহ
করিতেন, শৈল্পিক বস্তু তৈরি করতেন, মানসে
সুন্দর হইয়া সে বস্তু অঙ্কিত কর এবং
অন্যত্র ইত্যদ্যদ্বিধা হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা
গ্রহণ করিতেন, তাহাঙ্গিরসও এই শাস্ত্রধন
দান করিয়া উন্নত কর।

শরৎ। আপনার বহু কথ্য শুনিয়া
আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, উৎসাহে
পূর্ণ হইল। আপনার বাসনা পূর্ণ হউক।
সকল প্রদেশে সকল জাতীর হিন্দু ধর্ম
একত্র হইয়া একই আচার্য্য পুরোহিতের
শিকার এক ঈশ্বরকে পূজা দান করিবে,
তখন আমরা ঐক্য পাইব, বল পাইব, সাহস
পাইব। ভগবন্! এ অপূর্ণ মন্ত্র আপনি
কোথা শিখিলেন, কে আপনাকে শিখাইল,
জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। করেক মাস হইতে
আপনার ঐশ চারিত্রিকে শ্রুত হইতেছে,
আমি অত আপনার পবিত্র কার্য্যের যে
পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বিম্বিত হইরাছি।
সেই ক্ষমতা ইচ্ছা হয়, আপনার পবিত্র জীবনের
ইতিহাস কিছু জানি।

শরৎ। শরৎ, আমার জীবনের ইতি-
হাস বৎসরান্ত। যদি কচি হয়, আহা! তাহা
প্রবণ করিও।

বোগদায়া তিনজনকার আহারের ভ্রম
পাত পাতিয়া দিলেন, জল আনিয়া দিলেন,
এবং সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। বালক
সেবীপ্রসাদ সামান্ত আহার গ্রহণ করিয়া-
ছিল, তাহা আনিয়া দিল। তিনজন আহাঙ্গি
স্বাপন্ন করিলেন। বালকও পিতার পাতে
অবশিষ্ট কিছু আহার করিয়া পার্শ্বের ঘরে
পুস্তকপাঠে রত হইল।

বোড়শ পরিচ্ছেদ।

রমাপ্রসাদের ইতিহাস।

“আমি বনাজের সন্তান হিলাম, কিন্তু
অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় একটি বিব্রম
সকটে পড়িয়া সমস্ত হারাইয়া তীর্থপর্যটন
করিতে যাই। অনেক স্থান দর্শন করিয়া
শেষে কাশীধামে বৈদিক্যর ভ্রম অনেক
বৎসরব্যধি অবস্থান করি।

“কাশীধামে অনেক বৈদিক পণ্ডিত
আছেন, আমার গুরুদেব তাঁহাদের মধ্যে
প্রধান বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেন।
বেদপাঠ ও বৈদিক্যাদান ভিন্ন তাঁহার অন্য
কাজ ছিল না, দেশ-বিদেশ হইতে—ব্রাহ্মণ,
মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও কাশ্মীর হইতে শিষ্যগণ
তাঁহার নিকটে বেদাধ্যয়ন করিতে আসিত।
তিনি আমাকেও শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন,
তাঁহার নিজের অঙ্গগ্রহে, আমার গুণে
নহে।

“নয় বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার নিকট
বেদাধ্যয়ন করি। এই কালের মধ্যে কাশীর
অনেক বনাজ বৈদিক ও মহাজন, আমি
দরিদ্র, অন্ধাধ, বিচার্য্য বলিয়া আমাকে বরা
করিতেন। আমি অনেকের বাড়ী বাতায়াত
করিতাম, অনেকের নিকট পরিচিত হইলাম,
অনেকের অঙ্গগ্রহভাজন হইলাম।

“পঞ্চাব-দেশীয় কৃপাল সিংহ নামে এক-
জন কল্লির কাশীতে সপরিবার বাস করি-
তেন এবং আমাকে নিজের সন্তানের স্তায়
ভালবাসিতেন। বিদ্যার্থীর প্রয়োজন অতি
অল্প, আমার প্রয়োজন বশতঃ নহে, তাঁহার
বরা বশতই তিনি আমাকে অঙ্গগ্রহ করি-
তেন। ব্রহ্মচারি-বেশে যখন তাঁহার আলয়ে
বাইতাম, তাঁহার গৃহিণী আমাকে পুত্রবৎ রত

করিতেন, আমিও তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতাম। তাঁহার ছোট মেরেণ্ডিও আমাকে বড় বড় করিত।

“কালক্রমে কৃপাল সিংহ সেই একমাত্র কস্তা-সন্তান রাধিরা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন আমার পাঠ শেষ হইয়াছে, আমি নিজে একটি মঠ খুলিয়া কয়েক জন শিষ্য গ্রহণ করিলাম। কালীতে কৃপাল সিংহের আত্মীয় কেহ ছিল না, তাঁহার বিধবা আমার ঘরে বাস করিতেন, তাঁহার অল্প বাণ্য সম্পত্তি ছিল, তাহা আমারই হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে আরও একবৎসর অতিবাহিত হইল।

কৃপাল সিংহের একমাত্র বালিকা আমাকে অভিশয় স্নেহ করিত, তাহার নিরাশ্রয় অবস্থা, শাস্ত্যুত্তি এবং অনির্ভর্য্যতায় স্নেহ দেখিয়া আমারও তাহার প্রতি অহরহাঙ্গ কামিল। বালিকা যৌবনলক্ষণ প্রাপ্ত হইল, আমি যনের ভাব আর গোপন করিতে না পারিয়া সেই লাবণ্যময়ী সুলক্ষণ বালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলাম। আমার বরাক্রমে তখন অষ্টাবিংশ বৎসর, বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।”

সন্ধ্যা কণ্ঠে নিস্তব্ধ রহিলেন। শরচ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, কল্পিত-বালিকাকে কিরূপে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন?”

সন্ধ্যা। শরৎ, এরূপ ক্রিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, নীতিবিরুদ্ধও নহে। এটি কি নীতিবহির্গত কাজ বলিয়া তোমার মনে হয়?

শরৎ। ভগবন্! আমি এ কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি না। আমি নিজে বিধবার বিবাহ করিয়াছি; তাহা বোধ হয়, আপনি জানেন না।

সন্ধ্যা। শরৎ, সে কথা আমার অজান্তে নহে। তোমার মাতা ঠাকুরানীকে জিজ্ঞাসা করিও, রম্যপ্রসাদ সন্ধ্যাটাই সে বিবাহে ব্যবস্থা দান করিয়াছিল। আমি কালীমঠ হইতে মধ্যে মধ্যে বন্ধদেশে আসিতাম। তোমাদের ইতিহাস কিছু কিছু অবগত আছি।

শরৎ বিস্মিত হইয়া রহিলেন, এ রম্যপ্রসাদ সন্ধ্যাটাই কে? সন্ধ্যা পুনরায় আপনার ইতিহাস বলিতে লাগিলেন।

“কৃপাল সিংহের বিধবা আমাকে বর্ষ-পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন, আমি যখন এ বিবাহ বর্ষসম্বৃত্ত বলিয়া তাঁহার নিকট বার বার উপদেশ করিলাম, তখন তিনি অবশেষে সন্মত হইলেন। তাঁহার আতি-কটু কালীতে এরূপ কেহ ছিল না যে, এ কার্য্যে আপত্তি করে। আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে অনেক ভৎসনা করিলেন, আমার মঠ ডালিয়া গেল, শেষে আমি নববধূ ও তাহার মাতাকে লইয়া কালী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু কার্য্য অস্তায় বা শাস্ত্রবহির্গত বলিয়া আমার বোধ হয় না, হেম-বাবুর এ বিষয়ে কি মত, তাহা জানিতে বাসনা করি।”

হেমচন্দ্র। আপনি নিরাশ্রয় কল্পিত-বালিকাকে বিবাহ করিয়া আপনার দয়া, আপনাদের সাহস, আপনার বর্ষপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন।

সন্ধ্যা। হেম-বাবু, তোমার ভ্রাতৃ আদর্শচরিত্র লোকের এইরূপ মত হওয়া সম্ভব। ভগিনী বিন্দুবাসিনী যখন অনাথা দরিদ্রা বালিকা ছিলেন, তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নিজের দয়া, সাহস ও বর্ষপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলে। ভগিনী বিন্দুবাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিও, তাঁহার বাসাবস্থায় রম্য-

এসার সরস্বতী তাঁহার দাঁত দেখিয়া ভয়িত
বলিয়াছিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া রহিলেন। বৃথা
এসার সরস্বতীকে।

কয়েক পর, সরস্বতী আসার বলিলেন,
“হেমচন্দ্র! তুমিও অনাথা বালিকা বিবাহ
করিয়াছিলে, কিন্তু তিনি বড়াতীরা,
আমার ভার অত্যাচারী বালিকা বিবাহ
করিলে কিছুমাত্র আশ্রয়াদি বোধ
করিতে না?”

হে। কিছুমাত্র না।

সরস্বতী। আশ্রয় কি পরিবারের মধ্যে
যদি কেহ ভিন্নজাতির সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ
স্থাপন করে, তাহাকে কিছুমাত্র নিন্দা
করিতে না?

হেম। কিছুমাত্র না।

সরস্বতী। তোমার নিজের একপ অবস্থা
হইলে একপ কার্য করিতে সমর্থ হইবে?
অসুখা শাওরবরা তোমার বাগশ-বর্ষা
সুখীলা নারী বেকসুর আছে, তাহার সহিত
অত্যাচারী উপযুক্ত পাত্রের সহিত শুভ-
বিবাহে তোমার কোনরূপ আপত্তি হইবে
না?

হেমচন্দ্র এ প্রশ্নে বিস্মিত হইলেন; উত্তর
করিলেন, “শুধুদেব! পাত্র যদি উপযুক্ত
হন, এ কার্যে আমি কিছুমাত্র আপত্তি
করিব না।”

সরস্বতী তখন হাসিয়া বলিলেন, “নিশ্চিত
হও। আমি আপাততঃ সুখীলা বাতীর সহিত
আমার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিতেছি না,
তোমার মনটি জানিবার জন্য এ কথা
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।”

সকলে কণেক বিস্তর হইয়া রহিলেন।
পরে হেমচন্দ্র বলিলেন, “শুধুদেব, আগসার
ইতিহাসের পেরাংশ জানিতে বড় উৎসুক

হইতেছে, আপনিও কিছু বয়নাতি একপ
বোধায়?”

সরস্বতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া
বলিলেন, “আমার ইতিহাস যাকগাথ,
আমার জীবনের আশা-ভরসাও সার হই
যাছে। বিবাহের দুই বৎসর পরই সৌহার্দ্য
দুখ দেখিয়া আমার দাদাতী তাকুরাণী মানস-
লীলা সংবরণ করেন। তাহার পর আমি
পুত্র-কলঙ্ক লইয়া মধুরার ১৫ বৎসর ব্যকৎ
বাস করিতেছিলাম। সেখানে প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত
বয়নাতিরে অনন্তমহিমাপূর্ণ গাথ উচ্চার
করিয়া পরমাত্মার বিকাশাশ সূর্য্যদেবকে
আরাধনা করিতাম, সাংসারিক বয়নাতিতে
বসিয়া শিষ্যদিগকে উপনিষৎগুলির অস্তিত্ব-
নীর অর্থ শিখাইতাম। প্রিয় পুত্রকে নিজেই
সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাদান করিতাম এবং
তথাকার বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইতাম,
এবং স্নেহময়ী ভাষার বয়ে আমার সেই স্নেহ
কুটীরে স্বর্গস্থখভোগ করিতাম। সে স্নেহময়ী
অভ্যর্থিতা হইলেন, আমার মন বিচলিত
হইল, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে পর্য্য-
টন করিতেছি।”

সরস্বতী নিম্নে চক্ষু হইতে দুই একটি
অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন। হেম ও পরৎ
অচিরে বিদায়গ্রহণ করিয়া তালপুকুরে
প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামে মহৎ আন্দোলন।

স্বাধীনতার নূতন প্রচার শাস্ত্রপ্রচার
লইয়া গ্রামে অনেক আন্দোলন হইতে
লাগিল। নানারূপ লোকে নানারূপ কথা
কহিতে লাগিল। বাহারা প্রকৃত পণ্ডিত,

তাহারা রমাশ্রমাদের সাক্ষ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহারা পাতিভোর ভাগ করেন, তাহারা রমাশ্রমাদকে বিকৃতযুক্ত বলিয়া হটা গালি দিলেন। পরের একই উপকার করিলে বাহাদের হৃদয়ে আনন্দ হয়, তাহারা রমাশ্রমাদের সাহায্য করিলেন, পরের নিম্না রটাইরা বেড়াইরা বাহারা হু-পরগা আর করেন, সে ক্ষুদ্রভাগ্যবধ রমাশ্রমাদের নিম্না রটাইরা হুপরগা আর করিলেন। শাস্ত্রশিক্ষা দিয়া দেশের লোকের হৃদয় উন্নত করা, চরিত্র গঠিত করা বাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা রমাশ্রমাদের সহিত সহানুভূতি করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রপ্রচার হইলে বাহাদের ব্যবসা উঠিয়া যায়, অন্ন উঠিয়া যায়, তাহারা রমাশ্রমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। গ্রামের উন্নতি, দেশের উন্নতি হইলে বাহারা তুষ্ট হন, তাহারা রমাশ্রমাদের শিক্ষাদানে আনন্দিত হইলেন এবং দেশের সামাজিক বা ধর্মবিবরক উন্নতি হইলে বাহাদের একচেটিয়া উঠিয়া যায়, তাহারা রমাশ্রমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় উন্নতি-চেষ্টা দেখিয়া—বেহুদ গালি দিলেন।

এইরূপে পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী ঠাকুরের কথা লইয়া আন্দোলন বাড়িতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি নিম্নার কথা ছাটিল। হেমচন্দ্র ও শরতের সহিত সরস্বতী ঠাকুরের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, জমীদার-বাড়ীর কেহ কেহ আড়ালে থাকিয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। তাহারা এখন অসুগ্রহ করিয়া রটাইলেন যে, সরস্বতী ঠাকুর অল্পজাতীয়া দারী বিবাহ করিয়া জাতি হারা ইচ্ছাছেন, সনাতনবাদীর লোকের সর্কমাশ করিতে আনিয়াছেন, ভালপুত্রের হেম-বাসুর কজার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে বলিয়াছেন। লক্ষ্য রাতিবোধে গ্রামে অগ্নি লাগিলে নৈশ

আকাঙ্ক্ষা সেরিয়া রক্ত-অশ্রুকে পূর্ণ হয়, ভালপুত্র ও সনাতনবাদী গ্রাম এই নিম্না-কথার পূর্ণ-হইল।

সনাতনবাদীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এই অক-খাচারী শুণ্ড জটাধারীকে লক্ষ্য করিয়া বহুই নিম্নাবাদ করিলেন। প্রাচীনসম্রাট প্রাচীন হিন্দু খাচার-খালে গ্রাণ হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। নব্য-সম্রাট আর্বা-রীতির ব্যতিক্রম হইতেছে বলিয়া ইরোচী জাতির অনেক ভক্ত-বিতর্ক করিলেন। জমীদার-বাড়ীর মেয়ে-মহলে জম্মিয়া-প্রশং-বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া অনেক বাক করা হইল। ভালপুত্রের দানামতামর সন্ধ্যার সময় বা হাঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন, “এ আর কিছুই নয়,—মেয়েগুলো বড় স্বাধীন হইতেছে, তাই বত বিশৃঙ্খলা।” গরবিলী গোণবালা গরবের খোঁপা বাধিতে বাধিতে বলিলেন, “কি হয়েছে, কি হয়েছে? স্ত্রীলার মা বাসুনের হেলের সঙ্গে স্ত্রীলার বিয়ে দিবে? বাসুন না চণ্ডাল? তা হবে না কেন? ওদের ত আর ধর্মার্থ-জ্ঞান নাই, তা না হইলে বিধবার বিয়ে দেয়?” বুদ্ধিমান্ বোবালের পো শটকীয় সঙ্গে কি কথা কহিতেছিলেন এবং নূতন বৌ বাড়ীতে আনিবেন মনে করিয়া মুচ্কে মুচ্কে হাসিতেছিলেন,—এমন সময় রমাশ্রমাদের কথা শুনিয়া একেবারে দেশহিতৈষিতার অবশ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ হাঁকা হতে লইয়া সমাজ-সংরক্ষণার্থ দলবল জটাইতে বাহির হইলেন। এদিকে রক্ষণবদনা রক্ষচিষ্টা বড়ালের বৌ ছাদে বসিয়া পারে আলতা পরিতেছিলেন, তিনিও শাপতিনীর নিকট এই কলঙ্ক কথা শুনিয়া একেবারে লাগিনীর-ভার কোঁসু করিয়া উঠিলেন;—বলিলেন, “আর কিছু নয়, এখনকার যিন্বেগুলো একে-

বাগে সোনার নিচেই । আরক না আর, একবার বেশ মিলে বেশ এখন । সে দিন রাত্রিতে বড়ল মহাশয় যে অনুভবতন ভবিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম ।

কিন্তু এ কথা জমীদার কামিনীকান্ত বাবুর কাণে উঠিল । হিন্দুধর্ম-সংরক্ষণের জন্ত তিনি বিশেষ শিরোবেধনা ভোগ করিতেন না, কিন্তু তথাপি তিনি মেশের জমীদার, তিনি হিন্দু-আচার বকার না রাখিলে কে রাখবে ? অতএব তিনি আদেশ দিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জানাইবে, তিনি থাকতে জমীদার-গৃহে বড় গোলযোগ হইতেছে, এবং দেশাচারব্রত স্বধর্মপরায়ণ বংশেও কিছু কলহ পড়িতেছে । ঠাকুর অন্তহানে বাসা ঠিক করুন ।

বৈদ্যনরত্না তেজঃপুত্র রমাপ্রসাদকে সহসা এ কথা কেহ বলিতে সাহস করিল না । জমীদার-গৃহে লোক বকারকি করে, কানায়সো করে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলে না । অবশেষে বাড়ীর একজন বৃদ্ধ ভৃত্য একদিন অনেক কষ্টে, অনেক কথার পর, কোন প্রকারে প্রভুর আজ্ঞা ব্যক্ত করিল । রমাপ্রসাদ ভনিয়া হাসিলেন, আবাসস্থান ত্যাগ করিলেন না ।

জমীদার মহাশয় নিজ আজ্ঞা লজ্জিত হইয়াছে ভনিয়া তর্জুন-গর্জুন করিয়া উঠিলেন । চর্জুরসিং, রামখালাওল সিং, অর্জুন দোবে, বলবন্ত চোবে প্রভৃতি বৃহৎ লাঠিধারী দারবান্গণ আসিয়া রমাপ্রসাদের ঘরের সম্মুখে আক্ষালন করিল, তাঁহার কবল টানিয়া কেলিয়া দিল, তাঁহার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিল । দারবান্গণ এতটা বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বিজয় করিতে গেল, — রমাপ্রসাদ পুনরায় কবল বিছাইয়া পুঁথি পাঠ করিতে বসিলেন, দেবীপ্রসাদ নূতন হাঁড়ি কনিয়া আসিল ।

রমাপ্রসাদ সন্ধ্যার সময় পাত পাড়িয়া বিহার সময় অশ্রুজল ঘোচন করিলেন । অমায় হৃৎকপূর্ণ জীবনে তিনি এই সন্ন্যাসী জিন্ন আর কাহারও নিকট মিষ্টকথা বড় শুনে নাই, সন্ন্যাসীর বালক ভিন্ন আর কাহারও নিকট অপভ্রামর ঘেহ পান নাই । উইরা শীঘ্র চলিয়া বাইবেন শুনিয়া যোগমায়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিলেন ।

রমাপ্রসাদ মনের ভাব বুঝিলেন, কহিলেন, “যোগমায়া, তুমি অতি দুঃখিনী, তোমাকে এ দুঃখে কেলিয়া আমি চলিয়া বাইব না, নিশ্চিন্ত হও ।”

যোগমায়া । জমীদার-গৃহিণী আবেশ দিরাছেন, ভৃত্যগণ প্রভুকে কাল গৃহ হইতে বলপূর্বক বহিষ্কৃত করিবে ।

রমাপ্রসাদ । যোগমায়া, আমি তোমাকেই জমীদার-গৃহিণী ব'লে জানি ।

যোগমায়া । তগবন্ ! আমি এককালে জমীদার-গৃহিণী ছিলাম, এখন অনাখিনী । আমার কন্মতা কোথায় ? সম্পত্তি কোথায় ?

রমাপ্রসাদ । এই গৃহ তোমার স্বত্ত্বের সম্পত্তি, তোমার স্বামীর সম্পত্তি ।

যোগমায়া উত্তর দিলেন না । বলয়ন্ত দৃষ্ট হস্তের দ্বারা মুখ আবরণ করিয়া অনেকক্ষণ নীরবে যোদন করিলেন । তাঁহার শরীর কাপিতেছিল, হৃদয়ে কি একটি ভাব উদয় হইতেছিল, মুখে কি একটা কথা আসিতেছিল, কিন্তু তাহা বাক্যে প্রকাশ পাইল না । অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি জীলোক, সম্পত্তির কি জানি ।”

রমাপ্রসাদ । আমি তোমার সম্পত্তি জানি । আমি সে সম্পত্তি রক্ষা করিব ।

যোগমায়া । জমীদারের প্রভূত কন্মতা, আপনি আমার সম্পত্তি রক্ষা করিবেন কিরূপে, আমাকেই বা রক্ষা করিবেন কিরূপে ?

রমাশ্রমাদ । হৃৎকলকে বলা করা আশা-
বের বর্ষ, বর্ষাচরণে ইহর বলমান করিবেন ।

বোগমায়া । তবে আপনি বাহা বুঝেন
করুন, আমি অবলা, আমি—আমি—
আমি আপনার আশ্রিতা, আপনি আমার
দেবতা ।

রমাশ্রমাদ । নিশ্চিন্ত হও । কামিনীকান্ত-
বাবুর গৃহস্থীকে একবার বল, সমাসী ঠাকুর
একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করে,—কামিনী-
কান্ত-বাবুর মঙ্গল অমঙ্গল তাহার উপর
নির্ভর করে ।

বোগমায়া এই কথা গৃহস্থীকে জানাই-
লেন । গৃহস্থীর মনে একটু ভয় হইল ।
তিনি সমাসী ঠাকুরকে ডাকাইরা পাঠাই-
লেন ।

রমাশ্রমাদ । একজন দরিদ্র শাস্ত্রাবাসায়ী
আপনাদের বিতর্ক জমীদার-গৃহে আশ্রয়
লইয়াছে, তাহাকে তাড়াইরা দেওয়া কি
আপনার মত হইয়াছে ?

গৃহস্থী । বাবু এরূপ মত করিয়াছেন ।

রমাশ্রমাদ । এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে এ
দরিদ্র থাকিবার জন্ত কি একটি ঘর পার
না ?

গৃহস্থী । ঘরের অভাব নাই ।

রমাশ্রমাদ । হুবেলা দরিদ্রকে পাওয়াই-
বার অয়ের অকুলান ?

গৃহস্থী । অয়ের অভাব নাই ।

রমাশ্রমাদ । তবে দরিদ্রকে তাড়ান কেন ?

গৃহস্থী । অনেক পোলযোগ হচ্ছে, আমা-
দের বড় নিষ্ঠা হচ্ছে, আমাদের দেশাচার
সেঁথে চলতে হয়, সেই জন্য বোধ হয়, বাবু
এরূপ আদেশ দিয়াছেন ।

রমাশ্রমাদ । দেশাচার কি আমি অন্তথা
কল্পিলাম, না বোধহয় বিধি ?

গৃহস্থী কোন উত্তর করিলেন না,—তিনি

আজ্ঞা নারী একজন হৃৎকল-বর্ষাবার
কথা শুনিয়াছিলেন,—সীরবে চক্ৰ বল
হুছিলেন ।

রমাশ্রমাদ । তবে এ উপদ্রব কেন ?

গৃহস্থী । বাবুর আদেশ ।

রমাশ্রমাদ । দরিদ্রের উপর উপদ্রব
করিলে কি বাবুর মঙ্গল হইবে ?

গৃহস্থী বহুত্বিত হইয়া বলিলেন,—“আমিও
বাবুকে তাই বলিয়াছিলাম, বাবু শুনিলেন
না ।”

রমাশ্রমাদ । বাবুকে আর একটু বুঝাইয়া
বলিবেন যে, দরিদ্রের উপর অত্যাচারে বড়
লোকের অমঙ্গল হয় ।

গৃহস্থী । বলিয়াছিলাম, বাবু শুনিলেন না ।

রমাশ্রমাদ । তবে বাবুকে জিজ্ঞাসা করি-
বেন, জমীদার নামে এক জমীদার-পুত্র এই
জমীদার-গৃহে বাস করিতেন, বাবু তাঁহাকে
জানিতেন কি ?

গৃহস্থী শিহরিয়া উঠিলেন ! কোন উত্তর
করিলেন না ।

রমাশ্রমাদ । তাঁহাকে আপনি মেথিরা-
ছিলেন কি ?

গৃহস্থী । মেথিরাছিলাম । তখন আমার
নূতন বিবাহ হইয়াছে ।

রমাশ্রমাদ । তিনি কোথায় গেলেন ?
জানেন কি ?

গৃহস্থী । তাঁহার অনেক দিন হইল, কাল
হইয়াছে ।

রমাশ্রমাদ । কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হয় ?

গৃহস্থী আবার শিহরিয়া উঠিলেন ।

রমাশ্রমাদ । তাঁহার কিলে মৃত্যু হয়,
শুনিয়াছেন কি ?

গৃহস্থী । মরা মানুষের কথার প্রয়োজন
কি ?

রমাশ্রমাদ । তবে বাবুকে বলিবেক,

পরিষদের উপর উৎসাহিত করেছিল কি?
পাণের পরিমাণ অধিক হইলেই প্রায়শ্চিত্ত
আরম্ভ হয়।

পুষ্কীর সহিত রম্যপ্রসাদের বাহা বাহা
কথা হইয়াছিল, বোগমারা একপাশে দাঁড়া-
ইয়া সমস্ত অনিরাহিলেন। সে দিন সন্ধ্যার
সময় বোগমারা রম্যপ্রসাদের আহ্বারের সময়
আসিলেন। নিশীথে রম্যপ্রসাদ উঠিয়া বসি
দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন
যে, সেই শীর্ণকারা হস্তভাগিনী তাঁহার মাথার
নিকট বসিয়া অশ্রুবর্ণ করিতেছেন।

প্রাতঃকালে বোগমারা স্বপ্ন জল-টল
লইয়া আসিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর একটু
হাসিয়া বলিলেন, “এ জমীদার-পুত্রের লোক-
জন সব ভাল লোক ত? রাজিতে আসিয়া
সন্ন্যাসীর স্তুতি, গরিবের বাস্তু নাড়া-চাড়া
করে কে?”

বোগমারা হেঁটমুখী হইয়া রহিলেন,
কণেক পরে বলিলেন, “ঠেক, এ বাড়ীর
লোক-জনের কোন বদনাম শুনি নাই;
আপনার কোন দাসী আপনার দ্রব্য নাড়িয়া
চাড়িয়া থাকিবে।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শিড়কীর পুত্রের খোঁসগল্প।

পরদিন প্রাতে সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া
যাইবেন, সকলে প্রত্যাশা করিয়াছিল,
যেখিল, তাহার বিপরীত। সন্ন্যাসী ঠাকুরের
সেবার ভক্ত বড় কর্তার খান ভৃত্য প্রাতঃকাল

হইতে দুটা দুটা করিতেছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের
বাঁহবার কত সন্ধ্যা দুখ-বাখন আনিয়া
দিয়া, ময়রা বিটোর আনিয়া দিয়া। সন্ন্যাসী
ঠাকুরের কতক শালনের জন্ত একজন দারবান
সর্বদা দ্বারে বজায়মান। বড় পুষ্কীর খান-
দারী সন্ন্যাসী ঠাকুরের বয়স ঠাট্টা মিডেছে,
বড় পুষ্কীর খান হাঁহুদী বজনের আরোজন
করিতেছে।

জমীদার-বাড়ীর শিড়কী-পুত্রের ঘাটে
আজ বড় হলহুল। মেরেবহলে খোঁসগল্পের
শেষ নাই। জুংখের বিষয়, কোন সংবাদ-
পত্রের সংবাদদাতা শিড়কীর পুত্রের ঘাটে
দণ্ডায়মান ছিলেন না, এবং কোন নব্য লেখ-
কও সেই ঘাটের কথাবার্তার “শট” হেণ্ড
রিপোর্ট” করেন নাই। যদি লইতেন, তাহা
হহলে “যেদে-মহলে চরিত্র-সমালোচনা”
নামক অপূর্ণ উপস্থাপন লিখিয়া বঙ্গীয় পত্রিক-
বন্ধকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন।

প্রথমে মল পায়ে, গহনা পায়ে, হাসি-
মুখে, নবীনাদিগের দল সেই ঘাটে বসু বসু
করিয়া আসিলেন। রসিকা ফুলকন
তাঁহারের নেত্রী, কলসটি নামাইয়া আর
একটি ছড়া কাটিলেন—

“ও লো, এতদিনের পর সন্ন্যাসীর

কপাল কিরেছে।

কর্তাটি কর্তাটি ব’লে বড় গিন্না ডেকেছে।”

বসন্তকুমারী। ছয় পোড়ারমুখী, বড়গিন্নার
উপর ঠাট্টা। শুভেতে পেলো মাথা হুড়িরে বাড়ী
থেকে বের করে দেবে।

ফুলকুমারী। ঠাট্টা আবার কি? বড়
গিন্নার দাসী এখানে কাল করছে, হাঁহুদী
রাজার আরোজন করছে, তা বড় গিন্না সন্ন্যাসী
ঠাকুরের উপর সদয় হয়েছেন নয় ত কি?
হুহুহুহুহুহুহু। না লো না, তা নয়। বড়

গিরীর একটা বড় কাঁড়া ছিল, সন্ন্যাসী স্বপ্ন-
দ্রুত করে তাই কাটিয়ে নিরেছে, তাই সন্ন্যাসী
এত আশ্রয়।

হেমকুমারী। তা নয় নো তা নয়, তোরা
জানিস্ নি তুমিস্ নি, কথা ক'স্ কেন ?
কর্তার একটা বড় কাঁড়া ছিল, তাই গিরী
সন্ন্যাসীকে কাল সন্ধ্যার সময় ডাকিয়ে
পাঠিয়েছিলেন।

বর্ণকুমারী। ওলো, আমি যদি শোন।
সন্ন্যাসীকে ঔষুধ করতে ডেকেছিল।

কুলকুমারী। কিসের ঔষুধ নো ? বড়
গিরীর এ বগসে আশ্রয় ছেলে হবার সাধ
আছে না কি ?

বর্ণকুমারী। দূর পোড়াকপালো ! তা
নয় নো তা নয়, এ অস্ত্র ঔষুধ।

সকলে। কি ? কি ? কি ঔষুধ ?

বর্ণকুমারী। বড় গিরীর একটা শত্রু
আছে, তাকে বাণ মারবার ঔষুধ। এখন
তুমি ?

সকলে। কে ? কে ? কে ? শত্রু কে ?

বর্ণকুমারী। ওলো, বলি শোন। ঐ যে
একটা মুছনমানী কলকোতার আছে না ?
তার নাম খোজেন্তা, তাকেই বাণ মারবে।
আমাদের খোকার খি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনে
এসেছে। সন্ন্যাসী না কি বলেছে, সেই
মুছনমানীকে মৃত্যু দ্বন্দ্ব কবুবে।

নবীনাদিগের হল চলিয়া না বাইতে
বাইতে মধ্যবরা এক হল আসিয়া সেই
বাটে কলস নামাইলেন।

মাতঙ্গিনী। ওলো, আজ বে বড় ঘট
দেখছি। কি, হয়েছে কি ?

তরঙ্গিনী। ওলো, তা জানিস্ নি, আরা-
বের বোগবারার যে কপাল দিয়েছে।

মাতঙ্গিনী। সে কি ? সে কি ? কি
করেছে ?

তরঙ্গিনী। হবে আবার কি ? কাল
বোগবারা না কি বড়গিরীর কাছে সন্ন্যাসীকে
নিরে গিরে ঢের কাঁধাকাটি করেছে ;
বলেছে, সন্ন্যাসীকে বাড়ী থেকে বার করে
দিলে আমি তুমি নিরে তার সঙ্গে বৈকল্য
হয়ে বেরিয়ে বাব।

মাতঙ্গিনী। অথাক করে যা। কোথা
বাব না ? ও মা, চল্লিশবৎসরের বুড়ী বৈকল্য
হবে। কলিতে কতই না কি হবে।

রাধারঙ্গিনী। ওলো, তা নয়, তোরা
জানল কথা তুমিস্ নি।

সকলে। কি ? কি ? আসল কথাটি
কি ?

রাধারঙ্গিনী বলিল, “ঐ যে তালপুকুর
থেকে ছুটা বাবু আসে না, হেম-বাবু আর
শরৎ-বাবু ? তাদের মধ্যে শরৎ-বাবুটি
একটি বিধবা-বিরে করেছে, সে না কি
হেম-বাবুর স্ত্রী হয়। তা তারাই না কি
সন্ন্যাসীকে ভজিয়েছে যে, বিধবার বিরে
হয়। এই আর আমাদের বোগবারা কোথায়
যায় ? একেবারে নেচে উঠেছে। এইজন্য
সন্ন্যাসীর এত গুজরা করে, সন্ন্যাসীর পাভ
পেতে দেয়, জল এনে দেয়, কত সেবা
করে।

কুলকুমারী। ওলো, তা নয় নো তা
নয়, তোরা আসল কথা তুমিস্ নি।

সকলে। কি ? কি ? কি ? কি হয়েছে ?

কুলকুমারী। হবে আর কি ? ঐ সন্ন্যাসীর
ছেলেটির সঙ্গে হেম-বাবুর মেয়েটির বিয়ে
হবে, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সকলে। বলিস্ কি নো ? সত্য না কি ?

অথাক করে যা। কোথা বাব না !

রাধারঙ্গিনী। তাও কি হয় নো ? সন্ন্যাসী
হ'ল বাবু, হেম-বাবু হ'ল কায়ের, এদের কি
বিয়ে হয় ?

ককশুন্দরী : কিসের বাবুন ? বাবুনের
মুখে আগুন !

সকলে : অবাধ কত বা ! কোথার বাব
মা ! ইত্যাদি ।

মধ্যস্বরকার লল বিহার না হইতে হইতে
লুফার লল কলস মায়াইরা সেই বাটে সত্যের
আবিষ্কার করিতে বসিলেন ।

ভামাসুন্দরী : আজ যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের
বড় সন্মান ।

বামাসুন্দরী : এখন হয়েছে কি ? আরও
সন্মান হবে ।

ভামাসুন্দরী : কেন লো ? কি হয়েছে ?

বামাসুন্দরী : ওলো, তা বুঝি জানিস
নি, তবে শোন, চুপি চুপি শোন । কর্তা
দ্বিতীয় তনুতে আমাদের কেঁটা যেয়ে বের
ক'রে বেবে ।

শ্যামাসুন্দরী : কি ? কি ? কি ? কি
হয়েছে ?

বামাসুন্দরী : বলি, এই জমিদার-বাড়ীর
একটা ছেলে খুন হয়ে গিয়েছিল, তা কি
তমিস্ নি ?

ত্রিপুরাসুন্দরী : হাঁ, হাঁ, হাঁ ! ও মা, সে
বে আজ ত্রিশ বছর হ'তে গেল গো !
আমার বিলাসকামিনীর সেই হাতে বিয়ে
হয়, ও মা, সে কথা কি আমরা ভুলতে পারি ?
ও মা, কি ভয় পেয়েছিছ গো ! বিয়ের সখ
বুঝি ভেঙ্গে যায় ! তা বিয়ের খট্টা সব বন্ধ
হয়ে গেল, বাজনা বন্ধ হয়ে গেল, নিয়ন্ত্রণ
বন্ধ হয়ে গেল, চুপি চুপি বাবুন ডাকিয়ে
আমার মেয়ের বিয়ে হয় । হা আমার পোড়া
কপাল রে !

হরসুন্দরী : ও মা, সে কথা আর মনে
নেই ? সে বে বৈশাখ মাসে । আমার
নাড়ু গোপালের সেই হাতে তাত, সে কথা
কি আমি ভুলতে পারি ? বাছা নাড়ু গোপা-

লের ডাকের সব আরোজন বন্ধ হয়ে গেল,
লোকজনকে ভাল করে বাওরাতেও পারি-
নেয় না ! হা আমার তাকা কপাল রে !

ককশুন্দরী : ও মা, সে কথা জানি বৈ
কি ? ঐ যে ঠিক সেই মাসে আমার বড়
বৌয়ের সাথ, সাথের কত আরোজন, কত
বগুণি, কত নৌকজন জড় হয়েছে,
রাজ্যের মেয়ে আমার বড় বৌর সঙ্গে
এসেছে ! ও মা, এমন সময় আমার থেকে
ধবর এল যে, বড় হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে,
রমণী-বাবু খুন হয়েছে ! ও মা, কি সর্বনাশ !
কি সর্বনাশ ! আমার বড় বৌ ত শুনে প্রাণ
মুছ ! বায়, আমি ত অবাধ, বাড়ী মুছ মেয়ে
ভয়ে আড়ট ! কেবা বগুণিতে বায়, কেবা
খাওয়ার ?

বামাসুন্দরী : ঠিক বলেছ দিদি ! ছেলে-
টির নাম রমণী-বাবুই বটে । আহা, যেন
সোনার টাকটি ।

ত্রিপুরাসুন্দরী : আহা ! এমন ছেলেও
যা! বায় গা ? কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ !
আহা, রমণী-বাবু আমাকে কত সন্মান করত,
আমার বিলাসকামিনীকে ঠিক বোনের মত
তালবাস্ত ।

হরসুন্দরী : আহা ! তার কথা মনে
হ'লে এখনও চোখে জল আসে । রমণীবাবু
আমার নাড়ু গোপালকে কত কোলে করত,
নাড়ু হাতে দিত, আর কত আদর করত ।
আহা, বাছা রে, এমন সোনার টার ছেলেও
যা! বায় !

ককশুন্দরী : আহা, ম'রে বাই, সে কথা
তুলো না গো, সে কথা তুলো না । বাছা
রমণী আমার ছেলের মত ছিল গো,
আমার বড় বৌ তাকে কেবর ব'ন্দে কড়ই
ঠাট্টা করত । আর সে ত এমন দেবর ছিল
না, কাপড়খানি, সরনাখানি, বর্জমান

থেকে খাবা যেমতই সৰ্দ্ধা আমার বড় বোনের অস্ত পাঠিয়ে বিত। আমার বড় বোনের খোকা হবে খোকা হবে বলে কতই আকাঙ্ক্ষা করত। তা বাছা, খোকাকেও বেঁধে গেল না।

বামানন্দরী। তা সে খুন ত পুলিশ কিছু কিনারা করতে পারবে না, লাল রাতা-রাত্তি আলিয়ে ফেলেছিল। এতদিন ত কেউ ধমুতে পারে নি, এখন না কি, সন্ন্যাসী বয়স পড়ে তাই বার করেছে। কর্তা বাবু না কি বড় ভয় পেয়েছেন, তাই সন্ন্যাসীর এত খোঁসামোহ।

এইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া জমিদার-কাজিতে বড়সিয়ার চরিত্র, বোগনার চরিত্র, কর্তা মহাশয়ের চরিত্র এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরিত্র লইয়া অনেক সমালোচনা হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় দেবীপ্রসাদ পিতাকে বলিল, "বোধ হয়, জমিদার মহাশয় আমাদের উপর আজ সদয় হয়েছেন, আপনার প্রতি অসুস্থ তুল্য ব্যবহার করুছেন।"

রমাপ্রসাদ। বেবী, তুমি ভুল বুঝেছ। আজ জমিদার মহাশয় আমাদের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সতর্ক থেকো।

দেবীপ্রসাদ। সে কি? তিনি আমাদের আহারের অস্ত দ্রব্যাদি পাঠিয়েছেন, আমাদের সেবার অস্ত দাস-দাসী রেখেছেন।

রমাপ্রসাদ। তাঁহার দত্ত আহার স্পর্শ করিও না,—তাঁহার দাস-দাসী,—আমাদের দিগকে পাহারা দিবার অস্ত।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা যাত্রা।

যে দিন রমাপ্রসাদ গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহার পরদিন হইতে কমিনীকান্ত জমিদার মহাশয়ের কোষ বড় দর্শন পাইত না। তিনি সৰ্দ্ধাইয়ের ভিতর থাকিতেন, গোপনে কি পরামর্শ করিতেন, বর্দ্ধমান ও কলিকাতার লোক পাঠাইতেন, সৰ্দ্ধা নানা দিক হইতে পত্র পাইতেন, নানাদ্বানে পত্র পাঠাইতেন। ভৃত্যগণ বলিত, জমিদার মহাশয় স্নানকৃত্য হইয়া গিয়াছেন, দাসীগণ বলিত, কর্তাবাবুর শরীর আশ্বাসান হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে ছুই তিন মাস অতিবাহিত হইলে পর, তালপুতুর হইতে সংবাদ আসিল, বৃদ্ধ তারিণী-বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। আরও সংবাদ আসিল যে, মৃত্যুর পূর্বে তারিণী-বাবু রমাপ্রসাদ সরস্বতী ঠাকুরকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, সরস্বতী ঠাকুর মৃত্যুর পরে সমস্ত রাজি ছিলেন। সুধা এবার শরভের সহিত পূর্বদেশে গিয়াছেন, শরৎ সেই দেশে বহলি হইয়াছেন, স্ত্রীর বিবু একাকী জ্যোতী মহাশয়ের অনেক সেবা-শ্রদ্ধা করিয়াছেন। গোপী জ্যোতী বিশ্বর আশা-বাণী ইচ্ছা করিতেন না, কিন্তু বাবুর কঠিন পীড়ায় মৃত্যু হুটিয়া কোন আপত্তি করেন নাই। আরও সংবাদ আসিল যে, মৃত্যুর সময়ে তারিণী-বাবুর নিকট রমাপ্রসাদ ছিলেন,—মৃত্যুতঃ গ্রীকে উইল দ্বারা যে সম্পত্তি দান করিয়াছেন, সে উইল অনুযায়ী করিয়া সম্পত্তি বিশ্ববাসিনীকে ও স্ত্রীকে উইল করিয়া দিয়াছেন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া কামিনীকান্ত-বাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন : “যে ছিল খাওয়া, ঘুম ভাঙ্গ করিলেন, সমস্ত দিন কসিয়া অতি যোগে পড়াশুনা করিতে আসিলেন। ভাঙি-বাবুর লগ্নতিটুকু বেন ও শরৎকে না দিয়া আপাততঃ যোগদলার হস্তে রাখেন এবং ক্রমশঃ নিজে আয়সাং করেন ; অধর্দাচারী রমাপ্রসাদের উপরে কোন প্রকারে বৈর-নির্বাদন করেন, উক্ত হেমকে একটু শিক্ষা দান করেন, ভাবী বোকম্বার একটা হলফুল করিয়া আপন ক্রমতা প্রচার করেন ; সুনীলা ও দেবীপ্রসাদের বিবাহ বন্ধ করিয়া আপন ধর্মপ্রিয়তা ও সৈন্যচরিত্রতা প্রকটিত করেন ;—এইরূপ নানা চিন্তা ও প্রলোভনে বিবরী কামিনীকান্তের মন একেবারে বিপ-বাস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইল। দুই প্রহর, আড়াই প্রহর, তিন প্রহর হইয়া গেল,—স্নান নাই, আহার নাই, কেবল ভূত্যাগণ ঘন ঘন তামাকু আনিয়া দিতেছে এবং জিলিপির পাকের মত কামিনীকান্ত ও বন্ধুবর্গের মন্ত্রণার পাক চলিতেছে !

সন্ধ্যার সময় উল্লাসপূর্ণমুখে কামিনীকান্ত-বাবু বারান্দায় দাঁড়াইয়াছেন, ঘুম হইতে দেখিলেন, তালপুকুর হইতে রমাপ্রসাদ কিরিয়া আসিতেছেন। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, “সন্ন্যাসী ঠাকুর ! তুমি ভারী খেলোরাড় ! খুব এক ঢাল ঢালিয়া কিস্তি দিরাছ। আমিও খেলার কিছু জানি, আমিও একরার একঢাল ঢালিব,—সাধবান !”

পরদিন প্রাতে সনাতনবাটীর জমীদারগৃহ হইতে পাকী ও রি তালপুকুরে উপস্থিত হইল, জমীদারগৃহস্থী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তারিগী-বাবুর স্বী পতিশোকে বড় কাতর হইয়াছেন, তালপুকুরে তাঁহাকে দেখিবার শুনিবার কেহ নাই, বিবর-রক্তপের পরামর্শ দিবারও কেহ

নাই, সন্ধ্যায় দুইটুকু ইচ্ছা যে, যোগদলা করেক দিন সনাতনবাটী গিয়া থাকেন। শোক একটু হ্রাস হইলে, বিবর শকতিসের হস্ত হইতে নিরাপদ হইলে, যোগদলা পুন-রায় নিষ্কর্ষায়ে আসিবেন। আর বাকি কথা এই তারিগী-বাবু উইল করিয়া বিবর তাই-বিসের দিলা থাকেন, তাহা হইলে ও সে বিবর লইয়া একটা যোকদলা হইবেই। সনাতনবাটীর জমীদার মহাশয় সে যোক-দলার নিরাপত্তা বিবরার পক্ষ হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতে সম্মত আছেন।

এরূপ দ্বার্দ জমীদারের নিয়ন্ত্রণে নিত্যক-সন্মানিত হইয়া যোগদলা তৎক্ষণাৎ সনা-তনবাটী উপস্থিত হইয়া তথার অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দশ পনর দিন ধরিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমান হইতে গোবুলচন্দ্র আসিল, কামিনী-বাবুর অজ্ঞাত পরামর্শদাতা আসিল, অনেক পরামর্শ করিয়া কার্যপ্রণালী স্থির হইল। বর্দ্ধমানে ঘন ঘন দরখাস্ত পড়িল, পুলি-সের থানার ঘন ঘন লোক হাইতে লাগিল। সমস্ত ঠিক হইল, যোগদলা তাল-রে কিরিয়া গেলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় সময় কামিনীকান্তবাবু মহা সমারোহে শিবিকায় আরোহণ করিয়া সনাতনবাটী ত্যাগ করিলেন।

রমাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ থাইতে বসি-রাছেন, এমন সময় মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। দেবীপ্রসাদ বলিল, “ঐ জমী-দার মহাশয় থাইতেছেন। করেকমাস হইতে তাঁহার শরীর নিত্যক অন্তর ও দুর্বল হইয়াছে। শুনিরাছি, বাবু-পরিবর্তনের জন্য পশ্চিম হাইতেছেন।”

রমাপ্রসাদ। দেবী, তুমি তুল শুনি-রাছ। আমাদিগকে একটা বোর লফটে

কেলিবার অস্ত্র বুদ্ধিমান কলিকাতা
হাইতেছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুমতি-বাবুর বৈঠকখানা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্নী সুমতি-বাবুর
বৈঠকখানাটি বড় কিছুটাট। অধিক বাড়ল-
নের আড়ম্বর নাই, কেবল ঘরের মধ্যে তিন
ভালওয়ারা শেঙেলীরে গ্যাস জলিতেছে
আর লিথিবার টেবিলের উপর অসলরের
বাড়ীর একটি পরিষ্কার সিডিং-ল্যাম্প।
ঘোলে বিবস্ত্রা অঙ্গরাদিগের ছবি ধুমধাম
নাই, ধানচারেক সুন্দর দৃশ্যের ছবিমাত্র,—
পর্বত, সমুদ্র, ব্রহ্ম ও পরীশ্রামের ছবি। মর্ষর-
প্রস্তরের উপকরণাদির অধিক ছড়াছড়ি
নাই, কেবল একটি পরিষ্কার লিথিবার
টেবিল, কয়েকখানি চৌকি, দুইটি সোকা
ও একখানি ইজি চেয়ার। কার্পেট-গালিচার
আড়ম্বর নাই, ঘরের মেঝে নূতন মার্বেল
দিয়া ঢাকা। নানাপ্রকার মূলাহেব ও গীত-
বাউ-কুশল লোক দ্বারা সে ঘর পূর্ণ নহে।
সুমতি-বাবুর ঘরে অল্প কয়েক জন বাছা
বাছা বন্ধু মাত্র। ধনী বলিয়া সুমতি-বাবু
পরিচয় দেন না। দেখিলে শুনিলে তাঁহাকে
বুদ্ধিজীবী লোক বলিয়া বোধ হয়।

সন্ধ্যা হইরাছে, বাড়ি জলিতেছে, বন্ধুগণ
কথাবার্তা ও মিষ্টালাপ করিতেছেন। তাঁহা-
দের মধ্যে দুইজন বন্ধু আমাদের পরিচিত।

ধনপূরের ধনঞ্জয়-বাবুর আর পূর্বের স্ত্রার
ধন নাই। বিষয় অনেক হাতছাড়া হইরাছে,
অবশিষ্ট বিষয় ধ্বংসের অন্ত আঘাত হইরাছে,
শেষে কাপাকাপি করে, ধনঞ্জয়-বাবুর অধি-
কাল ধনই সুস্থবুদ্ধি সুমতি-বাবুরই হস্তগত

হইরাছে, ধনঞ্জয়-বাবু এই দ্বিতীয় সুস্থবুদ্ধি
সুখী হন নাই, উপসুস্থবুদ্ধিগণ গৃহশালের স্ত্রার
মাংসপুষ্ট শব ত্যাগ করিয়া অস্ত্র শর অধিবনে
উড়িয়া গিয়াছে, নদের বাগান বিক্রয় হইয়া
গিয়াছে, সুতরাং ধনঞ্জয়-বাবু এই সুমতি-
বাবুর বৈঠকখানাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-
ছেন। সুমতি-বাবু অত্যন্ত শোক নহেন, বাঁহার
সর্ব্ব্ব শোষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে একেবারে
তাচ্ছল্য করেন না, বৈঠকখানার একপার্শ্বে
ধনঞ্জয়-বাবু বলিয়া থাকেন, সুমতি-বাবুর
অন্তঃপ্রাণে একটু একটু হইয়া পান করেন,
সুমতি-বাবুর মিষ্টকথার আপনাকে সমাধৃত
বোধ করেন, ধনঞ্জয়-বাবুর পূর্ব্ববৎ রূপ নাই,
বৌবন-লক্ষণ নাই, অকালেই চক্কর জ্যোতি:
কমিয়া গিয়াছে, মাথার চুল কিছু বেতবর্ণ হই-
রাছে, হাতে হইকীর মাস একটু একটু কাঁপি-
তেছে। ধনঞ্জয়-বাবুর পূর্ব্বের কালজুড়ী ও
লাদা জুড়ীর পরিবর্তে একটি অনাহারী ষোড়ার

গাড়ী টানে, সেইস কোচম্যানগণও প্রায় অনা-
হারী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং বেশ ছিন্ন,
তকমা মলিন। সস্ত্রি তারিণী-বাবুর বৃদ্ধা
হইরাছে শুনিয়া ধনঞ্জয়-বাবুর নূতন বিষয়-
লাভের একটু আশা হইরাছে। সুমতি-বাবুর
নিকট পরামর্শ লয়েন, সুমতি-বাবুর স্ত্রার
পরামর্শদাতা কলিকাতার কয় জন আছে ?

কয়েক জন নব্য জমীদারও আজ সুমতি-
বাবুর নিকট আসিয়াছেন। কেহ এখনও
নাবালক, শীঘ্রই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন, ইতিমধ্যে
টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইরাছে, সে প্রয়ো-
জন-সাধনে সুমতি-বাবুর স্ত্রার আর কে পণ্ডিত
আছে ? কেহ বৃত্ত আতির বিষয়টুকু লইবার
অস্ত্র লোদুপ হইরাছেন, মানারূপ যোক-
দমার আরোজন করিতেছেন, একখানি উইল
কিরূপে সৃষ্ট, তাহা আমরা জানি না, সুমতি-
বাবুকে দেখাইতে আসিয়াছেন। কেহ বিলাস-

সাগরে নদীর নদীর তীরস্থিত নিম্নাঞ্চে, নদীতীরস্থিত দেশের সুখের বিষয়গুলির ইত্যাদি বহু হইয়া সেই নিম্নাঞ্চে তত্ত্ব-সুখাদি সুখ-অনুভব সহিত নিম্নাঞ্চে ক্রটিতে আসিয়াছেন। কেহ আত্মীয়-সমিতির দ্বারা পাইয়াছেন, সুখ-বাবুকে নিম্নাঞ্চে ক্রটিতে আসিয়াছেন। কেহ এই পথ দ্বারা হইতে-ছিলেন, কেবল সুখ-বাবুকে দেখিবার জন্যই এক গ্রাম হইয়া-পানার্বে একবার পাতী থেকে নামিয়াছেন।

এইরূপ নানাপ্রকার-বিভূষিত সুখ-বাবু বৈঠকখানার পারিজাত-পুষ্পের দ্বারা কামিনী-কান্ত-বাবু শোভা পাইতেছেন। কিন্তু এ হস্তপূর্ণ ঘরে তাঁহার সুখখানি আজ গভীর, নানা কথাবার্তার মধ্যে কামিনী-বাবু আজ নির্ভাক হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ভীতবুদ্ধি সুখ-বাবু মিলেন, বিবরণী কিছু গুরুতর।

অনেককণ ধরিয়া কথাবার্তা ও গল্পবহন হইতে লাগিল, স্বামী প্রায় দশটার সময় সকলে গাছোখান করিয়া বিদায় লইলেন। কেবল ধনঞ্জয়-বাবু ঘরের একপার্শ্বে হইবার গ্রাম লইয়া একটু ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া কামিনীকান্ত আপন-নার কথা সংক্ষেপে বলিলেন। গ্রামে এক ঘোর অধর্মান্বিতা লটকাইয়া আসিয়াছে, সে ব্রাহ্মপুঞ্জের সহিত কারস-কতার বিবাহ দিতে চায়, তারিণী-বাবুর বিধবাকে স্বামীর বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে চায়। তারিণী-বাবুর পীড়ার সময় নে-ই ভবন খাওয়াইয়া-ছিল, তারিণী-বাবুর মৃত্যুর পর নে-ই আল উইল প্রস্তুত করাইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-আচার রক্ষা করা হিন্দুযাত্রেরই কর্তব্য, এবং নিরাজ্ঞের বিধবা জমিদার-পত্নীকে সাহায্য করা জমিদারপত্নীরই কর্তব্য। অতএব লটকা-বারীকে কৌতুহ্যবোধকর্মের কেন্দ্র বৈ-

আমেরিকান হস্তাধার, তৎসমস্ত কথা লক্ষ্যে কামিনী-বাবু বিবৃত করিলেন।

বিবৃত করিতে করিতে স্বামী এগারট বাজিল, পরামর্শের পর বাই, সুখের আর একদিন কথা হইবে বলিয়া কামিনী-বাবু বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময় বলিলেন, “আপনার সচ্ছন্দ-আবস্থা কত দেখা হইবে? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ আবশ্যিক, সেই জন্যই আনিয়াছি।”

সুখ-বাবু। তবে আপনি আজ্ঞা করেন।

কামিনীকান্ত। কল্যাণের সময় স্ব-কাশ হইবে? আমার বাগানবাগিতে বসি আসেন, তাহা হইলে কিছু গীতবাহুও হইবে, কথাবার্তাও হইবে।

সুখ-বাবু। অবশ্য আসিব। আপনার সেই কোকিল-মিঠমিঠা-বসন্ত-সুন্দরীটি আন-ত? তাহার “তাজা ব তাজা” গানটি আর একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে। পার কোন তানলান, নাচে যেন পরীটি।

কামিনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন, “আপনার আদেশে সে সম্মানিত হইবে! সন্ধ্যার সময় আসিবেন, গানটানও হইবে, আপনার বিষয়ের কথাও হইবে।”

এই বলিয়া কামিনী-বাবু প্রস্থান করিলেন,—চাহিয়া দেখিলেন, ধনঞ্জয়-বাবু তখনও নিদ্রিত।

কামিনী-বাবু একটি ফুল করিয়াছেন, ধনঞ্জয়-বাবু বস্তুরের উইলের কথা শুনিয়া, কান খাড়া করিয়া, চক্ষু বুজিয়া, সমস্ত কথা শুনিয়াছেন।

একদিনে পরিচ্ছেদ ।

—১৭—

কামিনী-বাবুর বাগানবাড়ী ।

“আজ কামিনী-বাবুর বাগানে বাই-নাচ ।
কোকিল-বিনিমিত-বয়ে ধোকেস্তা বিবি
“তাজা ব তাজা” গাইল, অপরোষিনিমিত্ত
ভালে নৃত্য করিল, যুগনয়ন-বিনিমিত্ত
কটাকে তীর স্বর বর্ণন করিল । সুমতি-বাবু
অনিবেদন-নয়নে, মিতকুল-বদনে সে নর্তকীর
দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কামিনীকান্ত-
বাবুর লগাট হইতে চিন্তা-রেখা আজ অগ-
নীত হইল না ।

নৃত্যান্তে খাওয়া লাগিয়া হইল । বলা
বাহলা, থানা ইংরাজি ধরণে । মুসলমান
খামশায়া নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য মেজের
উপর আনিয়া দিল, ধোকেস্তা বিবি খান-
সামার হাত হইতে শেম্পোন-বোতল লইয়া
স্বহস্তে বাবুদের পাত্র ভরিয়া সুধা ঢালিল
এবং হাকেকজ কবির “সাকী মর বাকী”
সায়ক অপূর্ণ সঙ্গীত গাইল । গীত সাদ
করিয়া ধোকেস্তা বিবি বিদায় লইল, কিন্তু
কামিনীকান্ত-বাবুর অনাবাদিত সুরা সন্মু-
খেই রহিল, তাঁহার লগাট হইতে চিন্তা-
রেখা অপনীত হইল না ।

তখন দুইজনে নিকটে বসিয়া যুদ্ধস্বরে
কথা কহিতে লাগিলেন ।

সুমতি । এখন আপনার কথাটি পুনরায়
বলুন দেখি । কল্য সমস্ত বলা হয় নাই ।

কামিনী । সমস্ত কথাই প্রায় কল্য বলি-
য়াছি । আমাদের গ্রামে কয়েক মাস হইতে
যে একজন জটাধারী ব্রাহ্মণ আসিয়া হুলস্থূল
বাগাইয়াছে, তাহার কথা কলাই বলিয়াছি ।
সে উপনিষদ পড়ে, সে বেদগান গায়, সে
জনসাধারণকে ডাকিয়া শাস্ত্রশিক্ষা দেয়,

জড়িতই হোক ও বরজের বহিঃ, আহার্যাদি
কর, ভবিষ্যদি, সে কাহন-করার সন্তোষ
আপনার পুত্রের বিবাহ দিতেও চেষ্টা করি-
তেছে । উঃ, কি অবস্থাচরণ ! সমাজ-
যাত্রী গ্রামে সুখি হিন্দুরানী ও হেশায়া
আর থাকে না ।

সুমতি । আপনি হিন্দুরানীর তত্ত-বরণ,
আপনি থাকিতে জটাধারী বেটার দ্বারা
বিক্রম ? আপনি কেন একটি সহপার জব-
লখন করুন না ?

কামিনী । আদেশ করুন ।

সুমতি । আপনি আজ বে বাই-নাচ
দিলেন, আপনার গ্রামে সেই বাই-নাচ দিল ।
ববন-জুন্দারীর প্রতাপে জটাধারী বেটা বলা
বাগ করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবে ।

কামিনী । না হে, সে কাজের কথা
নয় । আমাদের গ্রামের লোকদের এথকও
কুসংস্কার আছে, তেমন উন্নতি হয় নাই ।
মুদলমানীকে গ্রামে লইয়া গেলে নিন্দা হই-
বার সম্ভব ।

সুমতি । তবে বিত্তীয় উপায়টি অব-
লখন করুন ।

কামিনী । সে কি উপায়, বলুন ।

সুমতি । আপনার বলবন্ত নায়ে কে
লাঠিধারী দ্বারবান আছে, তাহাকে বন্ধন,
জটাধারী বেটার জটা ধরিয়া গ্রামের বাজির
করিয়া দেয় । এই সামান্ত বিষয় লইয়া
আপনি এরূপ চিন্তিত হইয়াছেন ?

কামিনী । সে উপায়ও অবলম্বন করিয়া-
ছিলাম । কিন্তু সে উপায় বার্থ হইয়াছে ।
কলাই বলিয়াছি, সে জটাধারী বোণ হয়,
আমাদের গ্রামের পূর্বের ঘটনার কথা কিছু
জানে ! তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে সে
পূর্বের কথা তুলিয়া আমাদেরই সকলকে
বিপদে ফেলিবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস

সুমতি । আপনার গ্রামের পূর্ব-ইন্ডি-
হাসটি যদি ভাঙিয়া বলেন, তাহা হইলে
আমি সমস্ত বুঝিতে পারি ।

কামিনী । তবে পুরাতন কথা শ্রবণ
করুন । আমার পিতা অতি বুদ্ধিমান লোক
ছিলেন, আমাদের বিপুল জমিদারীর
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ক্রয় করিয়া চারি
আনার মালিক হইয়া পরলোকগমন করেন,
তাহা আপনি জানেন । আমি সেই চারি
আনা দখল করিলাম এবং রমণীকান্ত নামে
আমার জাতি-ভাই ছিল,—সে তখন নাবা-
লক,—তাহার তিন আনা অংশও আমাদের
হাতেই ছিল ।

সুমতি । আপনি বুদ্ধিমান,—সুতরাং
সে নাবালকের তিন আনা অনান্যসেই
আপনার হাতেই রহিয়া গিয়াছে ।

কামিনী । বড় অনান্যসেই মনে । সে
নাবালক রমণীকান্ত ডয়ানক গৌরার ছেলে
ছিল । তাহার অংশ আমার হাত-ছাড়া
করিতে চায় । ইন্ডিরা বর্তমানে গিয়া কালেক-
টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে যে,
তাহার অংশ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে
বায়, কিন্তু কালেকটর সাহেব আমার হাত-
ধরা—দরখাস্ত নামকুর হইল, নাবালকের
সম্পত্তির ভার আমারই হস্তে রহিল ।

গৌরার রমণীকান্ত তার পর বীরগ্রামে
গিয়া প্রজাদিগকে খাজনা দিতে রহিত
করিল, নিজে লাঠি লইয়া আমার নগদী-
সপক্ষে বীরগ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিল, প্রায়
একশত প্রজার হস্তে লাঠি মিয়া সেই গ্রামের
রাজা হইয়া বসিল ।

এখনকার কালে সেজন্য হইলে পুলিশে
খবর দিতে হয়, সে কালে আমরা নিজের
হাতেই অনেক কাজ করিতাম । আমিও
সে বয়সে একটু নির্দোষ ও গৌরার ছিলাম,

পাঁচ শত লাঠিমান লইয়া সেই গ্রাম আক্র-
মণ করিলাম । তাহার পর কি হইয়াছে
আপনি বোধ হয় শুনিরাছেন ।

সুমতি । শুনিরাছি, সেই হান্দামার
রমণীকান্ত খুন হইয়াছিল । তাহা লইয়া
পুলিস আপনাদিগকে অনেকদিন অবধি
দিক করিয়াছিল ।

কামিনী । পুলিশকে গরিবেরা ভয় করে,
ধনীলোকে ভয় করে না । তবে কাহাকেও
চালান না দিলে দারোগা বাবুর চাকরী থাকে
না, তাই পাঁচ সাত জন আমাদের মাহিনা-
করা লাঠিমান ধরিয়া দিলাম, তাহাদের
শাস্তি হইয়া গেল, তৎক্ষণ তাহাদের স্ত্রী-
পুত্রকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলাম । বাহারা
প্রকৃত আসামী, তাহাদের সরাইয়া দিলাম,
এবং হীরাসিং, লালসিং আর জওহর সিং
ইহারা রাজির মধ্যে রমণীকান্তের লাশ দাফ
করিয়া ফেলিল এবং দেশান্তর হইল ।

সুমতি । সুন্য বন্দোবস্ত ! ইতার পর
আপনার ভাবনার কারণ কি আছে? হান্দা-
মার আপনি ছিলেন না, প্রমাণ করিয়াছেন
বাহাদের কথা প্রমাণ করিলেন, তাহারা
জেলের গেল, আর চিন্তা কিসের? জটা-
ধারী কি জিংগৎ বৎসর পর আপনার
বিকক্ষে সেই মোকদমা আবার উঠাইতে
চাহে?

কামিনী । জটাধারী যে সেই হান্দা-
মার কথা জানে, তাহা আমার বিশ্ব-বিশ্বাস,
সে সমস্ত শুনিরাছে, সমস্ত জানে । কিন্তু
সে জন্ত আমি ভয় করি না । জিংগৎ বৎসর
পর পুরাতন মোকদমা উত্থাপন করিতে
পারিবে, সে ভয় আমি করি না ।

সুমতি । তবে কিসের ভয়?

কামিনী । রমণীকান্ত আমার সহিত
নিরোধ আশ্রয় করিয়া অবধি তাহার স্ত্রীকে

পোষাপুত্র লইবার অহুজাপত্র দেয়।
কোয়ার ছেলে বোধ হয়, বুঝিরাছিল যে,
কোন দিন লাঠালাঠিতে তাহার প্রাণ
বাইবে।

সুমতি। আপনি বুঝিমান্ জমীদার
হইয়া একটা বিধবা মেরেমাছুবকে ভয়
করেন? আপনি সনাতনবাটিতে থাকিতে
রমণীকান্তের বিধবা পোষ্য গ্রহণ করিবে?

কামিনী। সে পথ আমি বন্ধ করি-

রমণীকান্তের মৃত্যুর পর তাহার
বিধবা যোগমারার নিকট সে অহুজা-পত্র
কাড়িয়া লইয়াছি এবং তাহার স্বামীর
সমস্ত সম্পত্তি তাহার নিকট লিখাইয়া
লইয়াছি; কিন্তু আমি গুপ্ত অহুসন্ধানে
জানিয়াছি, এই জটাধারী সেই অহুজা-
পত্রের কথা জানে, এখন সেই কথা আদা-
লতে প্রমাণ করাইবে এবং আপন ছেলে-

পোষ্যস্বরূপ যোগমারাকে দিবে।

তাহার পর পুত্রের স্বত্বে তিন আনা জমী-
দারীর মালিক হইয়া বসিবে। যেক্ষণ
যোগমারার আচার-ব্যবহার দেখিতেছি,
বোধ হয়, সেই নিলজ্জ বিধবাও বুঝি জটা-
ধারীর গৃহলক্ষী হইয়া বসিবে। যেক্ষণ জটা-
ধারীর আচার-ব্যবহার দেখিতেছি, তাহার
ধর্মপ্রচার বোল আনা ভণ্ডামী, উদ্দেশ্য জমী-
দার হইয়া বসিবে। থাকিত সাবেক কাল,
এমন বিধবী দেশাচারপ্রভি স্ত্রী-পুরুষকে
আন্তো মাটিতে পুতিয়া কেলিতাম। কিন্তু
এখন কি আমাদের ক্ষমতা আছে, না হিন্দু-
রানী আছে?

অনেকক্ষণ কথা কহিয়া কামিনী-বাবুর
গলা শুকাইয়া আসিয়াছে এবং হিন্দুরানীর
কর্ণদ্বার জন্ত হৃদয়ও ব্যথিত হইয়াছে, সুতরাং
এক গ্রাস সুরা পান করিয়া গলাটা সিক্ত
করিলেন এবং হিন্দুরানী বজায় রাখিলেন।

পরে ধীরে ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন,
“এই আমাদের বিপদ, এখন যে উপায় অব-
লম্বন করিয়াছি, তাহা সমস্ত কল্যাণ বলি নাই,
অবণ করুন।

ভালপুত্রের তারিফ মল্লিকের সম্পত্তি
কাল হইয়াছে। তাহার সম্পত্তি সে পূর্বেই
দ্রীকে উইল করিয়া দিয়াছিল। তনিসায়
না কি মরিবার সময় আর একটা উইল
করিয়াছে, তদ্বারা আপনার সমস্ত সম্পত্তি
হেমও শরৎকে দিয়া গিয়াছে। কি সর্ব-
নাশ! অনাথা বিধবাকে কি কেহ এরূপ
করিয়া ভাসাইয়া যায়?”

সুমতি। ভাসিয়া আসিয়া না কি সে
বিধবা সনাতনবাটিতে কুল-কিনারা পাই-
য়াছে?

কামিনী। গোপবালা নিরাশ্রয় হইয়া
পরামর্শ লইতে আসিয়াছিল। আমিও
সুপারামর্শ দিয়াছি।

সুমতি। এ অবস্থায় পরামর্শ ত সহজ।
উইল রদ করিয়া নিরাশ্রয় বিধবার সম্পত্তি
রক্ষার ভার গ্রহণ করুন এবং সেই যৌবন-
ক্লিষ্টা বিধবাকে আপনি স্নেহদান পূর্বক
সাহসনা করুন।

কামিনী। না হে, এ ঠাট্টার কথা নহে,
এর ভিতর গুরুতর কথা আছে। সেই জটা-
ধারী তারিণীর মৃত্যুর সময়ে ছিল, বুড়ো
উইল করিয়াই যে হঠাৎ মরিল, তাহাতে
সন্দেহের কারণ আছে। জটাধারী বড় সহজ
লোক নহে।

সুমতি। এ দেখিতেছি, আপনাদের
পড়াপেঁরে বুড়ো কলিকাতা আপনাদের
কাছে হার মানিয়াছে। তা জটাধারীর
উপর খুনের দাবী চাপাইয়াছেন না কি?
সাবাস পাড়াপেঁরে বুদ্ধি! বীরপ্রাচীর
হালামা লইয়া সে আপনার উপর খুন্দে

করী আমিনে—আ আমিন আমিনে থাকিতে
আমার বাবু, বুসের দাবী আমিনাছেন।
সম্মান।

কামিনী।—আমি দাবী আমিনে কেন?
সে যে বড় কাটা করে হয়।—পোশাকসম
কোনো পরখান পাঠাইয়াছে যে, তাহার
ফারীর হঠাৎ বুজতে সবেহের কারণ
আছে, সুতরাং যে বিষয়ে তদন্ত হওয়া
উচিত। সুতরাং পুলিশ তদন্ত করিবে,—
এক পুলিশ আমাদের হাতে। জটাধারী যদি
বুসের দাবীতে চালান না হয়, তবে আমি
এত দিন বুধা বিষয়কর্ম করিলাম।

সুমতি। কামিনী-বাবু, আপনি আমার
নিকট বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন,
আমি বন্ধু হইয়া মিথ্যা পরামর্শ দিব না,
—আপনি এ কার্যে একটু ভুল করিয়াছেন।
এখনকার কালে এরূপ মিথ্যা বুসের দাবী
বোধ হয়, টিকিবে না, শেষে আপনি বিপদে
পড়িতে পারেন।

কামিনী। এটি আপনার ভুল।
কলিকাতার কি হয়, জানি না, কিন্তু পাড়া-
পায়ে আবাসবুদ্ধবিনতা সকলে যে কথা
জানে, বিচারাসন পর্যন্ত সে কথা পৌছে
না,—এই আমাদের আধুনিক বিচারের
বিষয়। কার্য দান কে কাটিয়া লইল, গ্রাম
শুধু সকলে জানে, বিচারক মাথা চুলকাইয়া
বুঝিতে পারিলেন না, বিপরীত বিচার করি-
লেন। জটাধারী নির্দোষী বলিয়া দেশ-
কিংশে পরিচিত হউক না কেন, বিচার-
পতি তাহা জানিবেন না,—নিশ্চিত সাক্ষী
যেমন বলিবে, অর্থহীন পুলিশ যেমন
রিপোর্ট দিবে, তাহার বাহিরে বিচারকের
সাইবার উপায় নাই, এই আধুনিক বিচারের
বিষয়। সাহেবেরা বিচারদেবীকে একটি
হুঁসি পরাইয়া তাহার হৃদয় করেন

না। আমাদের বিচারপতিগণকে তত্বতে হুঁসি
পড়িয়া এবং কানে বুধা দিয়া আমিন গ্রহণ
করেন।

সুমতি। এ কথা সত্য, কিন্তু তবুপি
কামিনী-বাবু, লোকজন। বিচারের ক্ষেত্রে বুদী
বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে কি?

কামিনী। যদি নাই পারি, তথাপি ত
কয়েক মাস জটাধারী মহাশয়কে হাবুডুদ
বাওরাইব, একটু বিলম্ব শিক্ষা দান
করিব।

সুমতি। এ আপনাদের পাড়াপেয়ে
বুদ্ধি। মোকদ্দমার শেষে কিছু হইবে না,
কেবল হাররাণ করিবার জন্য মোকদ্দমা
করা, এও আপনাদের পাড়াপেয়ে বুদ্ধি!

কামিনী। আর আপনারা কলিকাতার
লোক বড় হাররাণ করেন না, এক কোপে
কাটেন। কেমন?

সুমতি। তা আমরা হিম্মুর ছেলে হয়ে
আর কি করি? এক কোপেই কাটিতে
হয়। তা এখন সমস্ত অবস্থা বুঝিলাম, এখন
কি করিতে হইবে, বলুন।

কামিনী। বাল্যকাল হইতে আপনি
আমার সুহৃদ, আমার পরামর্শদাতা, বিপদে
আপনে আমার বন্ধু, এই মোকদ্দমার আপ-
নাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। আপ-
নাকে বর্জন বাইতে হইবে, আমার
উকীলগণকে শিক্ষা দিতে হইবে, এই বিষয়
মোকদ্দমাটি আপনাকে বহুতে চালাইতে
হইবে। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আপনার
অসাধারণ উদ্ভাবন-কমতা, আপনার অসাধ্য
বন্ধু ও আশাপ্রী লোক, এ সমস্ত আমার
অপরিচিত নহে। আপনি কলিকাতার মধ্যে
অবিত্যরী বীসম্পন্ন এটর্নী এবং আমার পরম
সুহৃদ, এই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।
অনেকজন ধরিয়া মোকদ্দমার কথা হইতে

শামিল, অনেক সময়কার পর পর
কথাটা পুনরাবৃত্তি করছিল। “কিন্তু এই প্রকৃত
পক্ষে হয়নি। বিচার হয়েছেন, হাইবার
সময়কার মিস্টার-বাবুকে কলিগেন, “আপনি কখন
কখনো মিস্টার-বাবুকে কলিগেন কলি-
কলি-কলিগেন, “আপনি কখনো কলিগেন
কলিগেন, “আপনি কখনো কলিগেন, “আপনি
কখনো কলিগেন, “আপনি কখনো কলিগেন,
“কলিগেন-বাবু এ কালটিতে সহস্র হাত
কেনে। কলিগেন না। নিজেই কলিগেন উপর
খুলে মোকদ্দমা চাপান, —কালটি কি পাড়া-
বেরে রক্ত হইয়াছে! প্রথমে কলি সাহেবের
নিকট উইলফান্ড জাল প্রমাণ করিলেই
হইত। তাহার পর কলি সাহেবের অজুয়তি
কলিগেন জটাবারী বেটাকে জালের মোকদ্দমার
কেলাইলেই হইত। তাহান্না করিয়া গৌরারের
মত একেবারে খনের মোকদ্দমা চাপাইয়া-
ছেন। কলিগেন-বাবু শরীয়তানিও যেমন
কলি, বুদ্ধিখানিও সেইরূপ কলি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

খিড়কীর পুকুরে খোসগল।

কলিকাতার যখন এই সমস্ত আরোজন
হইতেছিল, সে সময়ে সনাতনবাটিতে অনেক
খটনা হইয়া গিয়াছিল। কাহার নিকট সে
সমস্ত ঘটনার সংবাদ পাইবে? কে আমাদের
যে সমস্ত কথা জানাইবে? চুখের বিষয়,
সনাতনবাটিতে সংবাদপত্রও নাই, সংবাদ-
দাতাও নাই। অগত্যা আমরা আর একবার
জব্বার-বাড়ীর খিড়কীর পুকুরে যাই,—
তখন প্রত্যহই প্রামের সংবাদ রটনা হয়
এবং প্রামের লোকদিগের চরিত্রের লক্ষণ
কথাবার্তা প্রকাশিত হয়।

এককালে খুঁচা না উঠিতে উঠিতেই
আরও পূর্ণ-পরিচিন্তা নবীনার রক্ত যত
কম কম হইবে বাট প্রতিকারিত করিলেন,
হবে বাট কলিগেন করিলেন। কলিগী, মিসকা
কলিগীরা কাল-কলিগেন কলিগেন কলিগীরা
একই কলিগেন হাঙ্গির। কলিগী হুড়া কলিগেনে
আরও করিলেন,—

“ওলো, কলিগীরা কলিগেনে কলিগেন কলিগী
কলিগেনে কলিগী।
কলিগীরা কলিগী না কি হবে
কলিগীরা।
কলিগীরা। কে লো, কে কলিগী
হবে? তোর বে আক বড় রক্ত দেখছি।
বলে,—

“মলিনী তোর রক্ত দেখে অঙ্গ অঙ্গ বার।”
কলিগীরা। আমার আবার রক্ত কি?
বার রক্ত কলিগীর সময় হয়েছে, সে রক্ত
কলিগী।

কলিগীরা। সে কে লো! ভেদেই বল
না, অত ঠেকার কিসের?

কলিগীরা। আমার আবার ঠেকার
কিসের না? বার ঠেকার হবার, তার
ঠেকার দেখে গে বা।

হেমকুমারী। বুঝি, বুঝি! তাই
বুঝি বিভাসুন্দরের ছড়া কাটছিলি? তা
কথাটা কি সত্য না কি? আমাদের বিভা
ঠাকুর সত্য সত্য বৈষ্ণবী হয়ে বেরিয়ে যাবে
না কি? বলে,

“পান চিবুতে কান না ধরিলি। শিখতে
হবে সিঁড়ি বেঁটা।”

হেমকুমারী। আর “বিভা” “বিভা, ক’রে
জ্বলে কি হবে? আগুন কি আর চাই
দিয়ে ঢাকা বার? না আমাদের বোগমারীর
আচরণের কথা কাপড় বুধে বিরা বড় রাখা
বার।

হেমকুমারী। ওলো, নাম-টায় করিস্
নি লো,—তুমুকে পেলে এখনই মহা কুল-
কেতু লাগিয়ে দেবে।

স্বর্ণকুমারী। কিদের কুলকেতু? যে দিন
সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর বাধা ধরিয়েছে
বলিয় ভাসেন, আর বোগমারা-দিদি ঘোষ্টা
হিরে পায়ে ঠাকুরে পাধা করতে লাগ-
লেন,—তা কি কেউ দেখে নাই? আমরা
কি চখে ঠুনি বেবেছিলেম?

বসন্তকুমারী। সত্য না কি লো? সত্য?

স্বর্ণকুমারী। সত্য নয় ত কি? আর
বোগমারা-দিদি সন্ন্যাসী ঠাকুরের অস্ত
বাতাসা তিজিরে রাখেন, পানকল ছাড়িয়ে
রাখেন,—তুই দেখ্‌ছিস্ কি? সন্ন্যাসীর
ঘরের লম্বা হয়েছেন, কবে মালা বদল করে
গেকরা বসন পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়ে
যায় দেখ।

হেমকুমারী। না লো না, বোগমারা-দিদি
আবার গেকরা-বসন পাবে। তোরা তবে
সব দেখিস্‌নি বুঝি?

সকলে। কি? কি? কি?

হেমকুমারী। সব চখ বুজিয়ে থাকবি ত
দেখ্‌বি কি? আমি সে দিন সন্ধ্যার সময়
বোগমারা-দিদির ঘরে উঁকি মেয়ে দেখি, ও
না। দেখি না, হাড়ীতে একখানি নূতন কালা-
পেড়ে শাড়ী বুলছে,—ও মা, আমি ত দেখে
অবাক্! আজ তিরিশ বছর বিধবা হয়েছে,
খান কাপড় পরেছে, এখন কি না পাড়ওলা
কাপড় পড়বার সাধ হয়েছে? ও মা, কোথা
যাব মা? বোগমারা-দিদির মনে এত ছিল?

স্বর্ণকুমারী। আরও কত দেখ্‌বি লো,
আরও কত শুন্‌বি। তোরা কানে তুলা দিয়ে
ধাকিস্, তা সব কথা শুন্‌বি কোথা থেকে?
সব কথা ত শুন্‌স্‌নি।

সকলে। কি কি, বল না স্বর্ণদিদি।

স্বর্ণকুমারী। বলি, ঐ যে বেগেবৌ আমা-
দের বাড়ীতে আসে না? তাকে জিজ্ঞাসা
করিস্। বোগমারা-দিদি না কি বেগের
দোকান থেকে আঁঠাঘরা এনেছে, যেতি
এনেছে, আরও কত কি কিনেছে। আর,
বেশ! বেশ! বেশ! ওলো, বুঝে হ'লে কি
মনের লাথটুকু মেটে, তা মেটে না। বোগ-
মারা-দিদির সাথটুকু আবার গজিয়ে উঠছে।

স্বর্ণকুমারী। ওলো, শুধু বাধা-বধা নয়
লো, আরও কত কি দেখ্‌বি।

সকলে। আর কি গো দিদি?

স্বর্ণকুমারী। ওলো, ঐ নাপতে-বৌ
আমাদের বাড়ী আসে না? তাকে জিজ্ঞাসা
করিস্, কত শুন্‌বি এখন। কোন্ দিন বা
বোগমারা-দিদি পায়ে আলতা দিয়ে, দাঁতে
মিশি দিয়ে দর্শন দিবেন। দিদির কাঁচা বয়স
কিরে আসছে লো। কথায় বলে,

“জীবন মোবন গেলে, কি করে।” তা
বোগমারা-দিদির কিরেছে। বোগমারা-
দিদির বড় কপালের জোর লো, বড় কপা-
লের জোর।

স্বর্ণকুমারী। সত্য লো, সে কথা সত্য।
বোগমারা-দিদির চুলে এখন একটু বেশ
তেল পড়ে, আবার শুনেছি, নানারূপ বেশ-
ভূবার আয়োজন হচ্ছে। ঐ তাঁতিবৌ
আমাদের বাড়ী আসে না? তাকে জিজ্ঞাসা
করিস্। ও মা! বোগমারা-দিদি না কি
তাঁতিবৌকে রাধা পেড়ে শাড়ী, কালাপেড়ে
শাড়ী, সব আনতে বলেছে। অবাক্ কবুলে
মা। কোথা যাব মা? ইত্যাদি।

নবীনার দল কলস লইয়া চলিয়া না
যাইতে বাইতেই একদল মধ্যবয়স্কা নারী
উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদেরও আজ চের
কথা—সনাতনবাটীতে আজকাল নানা
বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে।

মাতঙ্গিনী । ও লো, আজ যে বড়
তোদের হাসি-খুশী দেখছি, কি, কথাটা কি ?
তরঙ্গিনী । ওলো, তা জানিসনি ? এই
যে বিয়েতে আমরা অল সহিতে বাব ।

মাতঙ্গিনী । কার বিয়ে লো, কার বিয়ে ?
রামরঙ্গিনী । ও যা, তা জানিস নি ? তুই
কি এই বয়সে চখের মাখা খেয়েছিল না কি ?
বলি, কিছু ঠাণ্ড করিতে পারিস নি ?

মাতঙ্গিনী । কে, আমি ত বাড়ীর কারও
বিয়ের কথা শুনি নি ।

রুক্মসঙ্গিনী । ঠিক ওলো, এ সব বিয়ের কি
কথা হয়, এ সব বিয়ে আগে হয়, তার পর
কথা উঠে । ঐ যে তালপুকুরে মল্লিকদের
বাড়ী একটা মেয়ে বিধবা হয়ে আবার বিয়ে
করেছিল না ? এবার আবার আমাদের
জমীদার-বাড়ীতেই তাই বুঝি হয় ।

মাতঙ্গিনী । সে কি ? সে কি ? বিধবা
হ'লে কি আবার বিয়ে হয় ? তালপুকুরে
তার না কি একঘরে হয়ে আছে ?

তরঙ্গিনী । তা হ'লই বা একঘরে । অমন
রূপবান্ সন্ন্যাসীকে নিয়ে সে ত বেরিয়ে
যাবে,—তার পর গাঁয়ের লোক একঘরে
কবুলেই বা !

মাতঙ্গিনী । সন্ন্যাসীর সঙ্গে কার বিয়ে ;
হবে লো ?

রামরঙ্গিনী । বলি, তুই কি কচি খুকী
লা ? আমাদের বোণমারার রকম-সকম
দেখিস নি ? ছি ! ছি ! অমন মেয়ের মুখে
আগুন, সন্ন্যাসীর মুখে আগুন !

রুক্মসঙ্গিনী । কচি খুকী না কচি খুকী !
বলি, ঐ সেকরাদের ছেনেটা আমাদের
বাড়ী এসেছিল, তা তুই কি দেখিস নি ?

মাতঙ্গিনী । হাঁ হাঁ, তা দেখেছি । সে
ছোঁড়াটা এসেছিল কেন ?

রুক্মসঙ্গিনী । ও যা, তা জানিস নি ?

সেকরাদের ছেনেটা এসে কিস্ কিস্ করে
অনেকক্ষণ ধরে আমাদের বোণমারার সঙ্গে
কথা কছিল । আমি অবুনি খোঁকার ঝিকে
পাঠিয়ে দিলে, বলি, যা ত, কি বলছে শোন
ত । খোঁকার ঝি কলসাদেহের আড়াল থেকে
সব শুনেছে ।

মাতঙ্গিনী । কি বুদ্ধি! দিদি, বোণ-
মারা কি গয়না করিতে দিয়েছে ?

রুক্মসঙ্গিনী । ওলো, গয়নার বাড়া লো, !

গয়নার বাড়া ! সেকরাকে একগাছা হাতের
নো তৈয়ার করিতে বলেছে । বিধবা হয়ে
আবার বিয়ে করবে, আবার শোন্টো দিবে
বৌ হবে, আবার হাতে নো পরবে, গারে
গহনা পরবে, এ বয়সে আবার ছেলের মা
হবে ! মুখে আগুন ! মুখে আগুন ! বম কি
এমন বিধবাদের তুলে থাকে ? পোড়ামুখী

চল্লিশ পেরোয়, আবার নাকে নখ পরবে, পায়ে
মল পরবে, কালাপেড়ে সাজী পরে সন্ন্যাসীর
ঘর করবে ! মুখে আগুন ! মুখে আগুন !

রামরঙ্গিনী । ওলো, মল পরাবে লো,
মল পরাবে । কা'ল সন্ধ্যার সময় লোহার
মল নিয়ে সব এসেছে, মল পরবার আশা
মেটাবে ।

সকলে । কে এসেচে দিদি ? কে
এসেচে ?

রামরঙ্গিনী । তা বুঝি জানিস নি ? ঐ
যে পুলিশের দারোগা এসেছে, লালপাগড়ী
বেঁধে সব পাহারাওরা এসেছে ।

সকলে । কি সর্কনাশ ! ও যা, কি হবে
গো ? দারোগা কেন এসেছে দিদি ?

রামরঙ্গিনী । শুনিছি না কি কর্তা-বাবু
দারোগা মশাইকে ডাকিয়েছেন, ঐ সন্ন্যাসী
ঠাকুরকে বেঁধে বর্জমান্নে নিয়ে যাবে । বোণ-
মারার রকম-সকম দেখে কর্তা-বাবু না কি
বড়ই রেগেছেন, বোধ হয়, বর্জমান্নে সাহেব-

দের কাছে বলেছেন, সাহেবেবো! হুকুম দিয়েছে—সন্ন্যাসীকে আর বোগমারাকে বেঁধে বর্জমানে নিয়ে আর।

সকলে। কি সর্কনাশ! কি সর্কনাশ! হি। হি। জমীদারের বাড়ীর বৌ হরে যোগমারা এমন চলাচলটা চলালে! শেষে পুলিশ পর্যন্ত এ কলঙ্ক রাষ্ট্র হ'ল! হি। হি।

মধ্যমবরজাদিগের দল কলস লইয়া চলিয়া গেলেন,—তাহার পর প্রাচীনাদিগের দল আসিলেন। তাঁহাদেরও ঐ কথা-বার্তা, সনাতনবাটীতে পুলিশ আসিয়াছে, সুতরাং ঐ বিষয় ভিন্ন গ্রামে আজ অল্প কথা নাই।

ভামাসুন্দরী। ওলো, আর শুনেছি! ঐ ভালপুকুরে পুলিশের দারোগা বাবু এসে-ছিল, সে না কি কা'ল লক্ষ্যায় সময় আমাদের গ্রামে এসেছে?

ভামাসুন্দরী। কেন লো? পুলিশ আবার কেন? ও মা, শুনলে যে গা কাঁপে।

ভামাসুন্দরী। তা আসবে না ত কি? গ্রামের যেমন রীতিপদ্ধতি হয়েছে, পুলিশ না এসে আর কি করে? ঐ সে বছর না কি ভালপুকুরের হেম-বাবুর ঘর থেকে একটা বিধবা মেয়েকে বার করে শরৎ-বাবু বিয়ে করেছে। আবার এখন জমীদার-বাড়ীতে শুনছি, ঐ পোড়ামুখো সন্ন্যাসীটা না কি সেই তলাসে ঘুরছে। কর্তা-বাবু গ্রাম থেকে গিয়ে অবধি সন্ন্যাসীটার সর্ক। বেড়েছে, এখন না কি বলেছে, আমাদের বোগমারার গলায় মালা দিয়ে তাকে বের করে নিয়ে যাবে। ও মা হি। হি। হি। তা কর্তা বশাই না কি সাহেবদের ছাই বলে দিয়েছেন।

ভামাসুন্দরী। ও মা, কি লজ্জার কথা! কি ঘোর কথা!

ভামাসুন্দরী। তাতে আবার লজ্জা কি লো? কলির যে রীতিই এই।

হরসুন্দরী। ওলো, তা নয় লো, তা নয়, সেজন্য পুলিশ আসেনি! লো, সে জন্ত নয়। সকলে। তবে কিসের জন্ত দিদি?

হরসুন্দরী। কর্তাবাবু আমার লাড়-বোপালকে একদিন বলেছিলেন, সন্ন্যাসী না কি দালা করে, খুন করে, লোককে ঠুং খাওয়ার, সব করতে পারে। তাই পুলিশ এসেছে লো।

হরসুন্দরী। না লো, তা ত নয়, তা নয়, ঐ যে ভালপুকুর থেকে মল্লিকদের বৌ আমাদের বাড়ী এসেছিল না?—আহা, বাছার কপাল ভেঙে গেছে। এ বরশে বিধবা হয়েছে।—তার সঙ্গে বড় গিন্নী একদিন কথা-বার্তা বলছিলেন, তখন আমার বড় বৌ সেইখানে ছিল। তা মল্লিকদের বৌ বলছিল যে, ঐ ওদের গ্রামে যে হেম-বাবু আছে, সে না কি মল্লিকদের সব বিষয় ঠকিয়ে নিয়েছে। তাই পুলিশ এসেছে গো, তাই পুলিশ এসেছে।

জিপুরাসুন্দরী। ওগো, না গো, তা নয়! আমাদের বিলাসকামিনী এর ভিতরের কথা সব জানে। আমার বিলাসকামিনীর যে বছর বিয়ে হয়, সেই বছর আমাদের বাড়ীর রমণী-বাবু খুন হয় না?

হরসুন্দরী। হাঁ হাঁ, আর বাছা লাড়-গোপালের সেই মাসে ভাত হয় গো, সেই মাসে তার ভাত হয়। তা ভাতের সব আরোজন,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হরসুন্দরী। ঠিক বলেছ দিদি, ঠিক বলেছ, সেই মাসে আমার বড় বৌয়ের লাড় হয়। আহা, রমণী আমার যৌকে কত সামগ্রী দিত,—তা সে খোকার হুখ দেখেও যেতে পারতেন না গো,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জিপুরাশ্রমেরী । তা সেই খুনী মোকদ্দমা
পুলিস না কি এতদিনে সন্ধান পেয়েছে, তাই
এসেছে । আহা, এমন ছেলেও খুন হয়, সে
আমার বিলাসকাষিনীকে কত ভালবাসত,
বাছা বিয়েটাও দেখে বেতে গেলে না গো—
ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

সন্ধ্যার সময় জমাদার মহাশয় খানার কিরীদা
পেলেন ।

দারোগা । কি হইল ?

জমাদার । মৃত্যুতে বহত সন্দেহ আছে ।

দারোগা । কিরূপ সন্দেহ ?

জমাদার । বোধ হয়, দাঁড়ায় থেকে
খুন করা হোঁগা ।

দারোগা । কে খুন করিরাছে ?

জমাদার । বোধ করি, রমাপ্রসাদ নামে
একটো সন্ন্যাসী । সন্ন্যাসীতো বহত বদমাস
আছে । সাহেবকো পাস আপনি রিপোর্ট
লিখুন যে, বদমাস রেলিষ্টারিমে উস্কো নাম
লিখা যায় ।

দারোগা । কি বদমাসী করিরাছে ?

জমাদার । সে পুলিস ডরায় না ।
হামাকে দেখ্কে সবকোই ডরায়, সে কিছু
ডরায় না । জমাদারের সত্তাল সে হালে,
এরসা বদমাস ।

দারোগা । তা তদন্তে হির হইল কি ?
খুন মিথ্যা ?

জমাদার । ঠিক কেমন ক'রে হইবে ?
তদন্তলোক আসামী হইলে কি খুন আসকারা
হোর ? পরিষলোক হোর তো ডুবুসে জন্দি
কবুল করান যায়,—বস কবুল জবাব লিখ্কে
খুনি মুকদ্দমা চালান দে ।

দারোগা । হুয় মেডুরাবাদী । এখন
কেবল কবুলে কি খুনী মোকদ্দমা প্রমাণ

জমাদার । হয় না ত কি ? খুনী মোক-
দ্দমার কবুল আসামী লোককো ডিপুটী
বারু ছোড় দেনে শক্তা ।

দারোগা । আরে, ডিপুটী-বারু যেন
দারবার সোপর্দি করিলেন । দারবার কি
হয় ? অজ-সাহেব বখন ছাড়িয়া দিবেন, তখন
কি হবে ?

জমাদার । আরে, আসামী দারবার-সোপর্দি

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পুলিস-তদন্ত ।

খিড়কীর পুকুরের খোসগল হইতে
আমরা জানিয়াছি যে, প্রথমে ভালপুকুরে,
তৎপরে সনাতনবাগীতে পুলিসের আগমন
হইয়াছে ; সুতরাং এক্ষণে পুলিসের তদন্ত-
সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক ।

বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব নাজীর তারিণী মল্লি-
কেয় সহসা মৃত্যু হইয়াছে, গ্রামের লোকে
সন্দেহ করে, মৃত ব্যক্তির স্বী সন্দেহ করে
যে, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নহে, তদন্ত আবশ্যক ।
মৃত্যু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক,—শিক্ষিত,
উন্নতচরিত্র রমাপ্রসাদ সরস্বতী ঘোষী কি
নির্দোষী, এ শুধু বিষয় তদন্ত করিতে
অসীম-ক্ষমতামণী জমাদার মহাশয় গ্রামে
উপস্থিত হইলেন ।

জমাদার পশ্চিমে লোক, তিনি বাঙ্গালীও
জানেন না, ভাল হিন্দীও জানেন না,—
তাহার বৃহৎ শরীর ও বৃহৎ গোঁপ দেখিয়া
বোধ হয়, কর্তৃপক্ষীরেরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
জমাদার করিয়াছেন । তাহার বৈতন ১৫৮
টাকা, ১৫৮ টাকার উপযুক্ত তদন্ত হইল ।
অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, সরস্বতী
ঠাকুরকে দুই চারিটা ভিরকার করা হইল,

হইলে তো হাম লোককে কাম তামাম হইল। ছুরি লোক ঘর আসামী খালসি দেব, ডব হামলোককা সাহাব সর্বমেষ্ঠমে রোপোট কয়েক কি, ছুরি লোক গাথা আছে।

দারোগা মহাশয় দেখিলেন, জমাদার মোকদ্দমাবাদী হইলেও বুদ্ধিমান বটে। বাহা হুটক, এ মোকদ্দমার বিশেষ সন্দেহের কারণ থাকার দারোগা মহাশয় নিজেই তদন্তে বাহির হইলেন।

জমাদার বেরূপ দেখিতে পালোরান, দারোগা মহাশয় সেইরূপ ক্ষুদ্র, ক্রীণ ও হুর্দল, কিন্তু বুদ্ধিটুকু বড়ই তীক্ষ্ণ। দারোগা বাবু বাধরগঞ্জের লোক, বাধরগঞ্জের কোন পুলিশ-কর্মচারীর ভৃত্য থাকিয়া পুলিশ-কার্যে দীক্ষিত হইয়াছেন। তার পর কিছুদিন কুলীর রিক্রুটর হইয়াছিলেন, শেষে তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে পুলিশে চাকরী পাইলেন। কয়েক বৎসর জমাদারী করিয়া দারোগাগিরী কাজ পাইলেন এবং কার্য-দক্ষতার কর্তৃপক্ষদিগকে সর্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতেন। নিজ গ্রামে পাকা ইমারত প্রস্তুত হইতেছে। পুকুরিণী, বাগান প্রস্তুত হইতেছে। বাড়ীতে যথেষ্ট টাকা পাঠান, গৃহিণীর সোনার গহনার অভাব নাই, ছেলে-পুলেদের কাপড়-চোপড় অতি উৎকৃষ্ট। ভদ্রি থানার মিকট একটি সদোগাপ-বিধবা বাস করিত, তাহার জন্ত ১২ ডরির সোনার চন্দ্রহার সেকরা তৈয়ারি করিতেছে। দারোগা মহাশয়ের একটি ঘোড়া আছে, এবং বাবুন, চাকর ও সহস থানার বাস করে। দারোগা মহাশয়ের বেতন মাসে ৩০ টাকা।

দারোগা মহাশয় বিশেষ তদন্ত করিতে লাগিলেন। কখন কখন ডাইয়ারি পাঠাইতে

লাগিলেন, ডাইয়ারির লেখা অতি সুন্দর, অতি পরিষ্কার এবং অনিন্দনীয়। তদন্তে স্থির হইল যে, রমাপ্রসাদ তারিণী-বাবুকে ঐযুবির পরিবর্তে বিব বাওয়াইয়াছেন, তাহাতেই তারিণী-বাবুর সহসা মৃত্যু হইয়াছে। প্রমাণ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমে সন্ন্যাসী-টাকে হাতে হাতকড়ি দিয়া বদ্ধমানে চালান দিতেছেন, এমন সময় ইন্সপেক্টর-বাবু গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

ইন্সপেক্টর বাবু শিক্ষিত বুবা, কলেজে পড়িয়াছেন, উদ্ব্রহরে জন্ম, বর্ধাধর্মজ্ঞান আছে। বদ্ধমানে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহার দ্বারা মোকদ্দমা তদন্ত হয় বলিয়া পক্ষেরা সর্বদা আদালতে আবেদন করিত। তিনি ভালপুকুরে মল্লিকদের বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, দারোগা-বাবু বলিয়া ধূম-পান করিতেছেন,—সম্মুখে রমাপ্রসাদ দণ্ডায়মান,—হাতে

দেখিয়াই তাঁহার আপদ-মন্তক শরীর অলিয়া গেল, কর্মমন্তক জুতার আশ্বাসন দারোগা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ দান করিতে তাঁহার বড়ই প্রবৃত্তি হইল,—কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা সংবরণ করিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি?”

দারোগা তখন মাথা চুলকাইয়া অক্ষুট-স্বরে বলিলেন, “খুনী মোকদ্দমার আসামী চালান দিতেছিলাম,—তা আপনি আসিয়াছেন,—বাহা আজ্ঞা হয়, করিব।”

ইন্সপেক্টর বজ্ঞনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমাপ্রসাদ সরস্বতী খুনের অপরাধী? এই তুমি তদন্তে জানিরাছ?”

দারোগা বড় কিছু উত্তর দিতে পারলেন না।

ইন্সপেক্টর স্বয়ং আসামীর হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া বলিলেন, “কমা করুন, আপনার

উপর যে অভিজ্ঞাচরণ করা হইরাছে, তাহার
জন্ত আমি কমা প্রার্থনা করিতেছি।”

রমাশ্রদাশ । কমা প্রার্থনার কিছুই নাই ।
দারোগা মহাশয় বোধ হয়, নিজের কর্তব্য-
সাধন করিতেছিলেন মাত্র ।

ইন্সপেক্টর । ঐ কথাটি উচ্চারণ করিবেন
না । দেশের বত বহুদূরত প্রত্যেক লোকে
আজকাল “কর্তব্যসাধন” কথাটি শিখি-
য়াছে,—“কর্তব্যসাধন” করিবার ভাণ করিয়া
দেশে প্রতারণার উদ্ভব করিল । বাহা হউক,
আপনি আজ জামিন দিয়া গৃহে যান, আমি
মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখি, আপনাকে
আবশ্যক হইলে পুনরায় তলব করিব ।

ইন্সপেক্টর-বাবু দারোগাকে ধানার পাঠা-
ইরা দিলেন, আপনি সমস্ত প্রমাণের কাগজ
তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন । সেই প্রমা-
ণের কথা রিপোর্ট করিয়া “কর্তৃপক্ষীয়দিগের
নিকট আপন মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন যে,
বিষ-প্রয়োগ-সম্বন্ধে প্রমাণ আছে, কিন্তু সে
প্রমাণ সমস্ত মিথ্যা এবং গ্রামের জমাদার
দ্বারা সৃষ্ট ; তারিগী-বাবুর রোগে মৃত্যু হই-
য়াছে । কর্তৃপক্ষীয়গণ আদেশ পাঠাইলেন,—
বিষপ্রয়োগ দ্বারা হত্যা মোকদ্দমার যখন
প্রমাণ হইয়াছে, ইন্সপেক্টর অবিলম্বে বিচার-
স্বার্থ মোকদ্দমা চালান দিবেন । প্রমাণ সত্য
কি মিথ্যা, আদালতে প্রকাশ পাইবে ।

রোবে ও হুংথে অক্লান্ত যোচন করিয়া
ইন্সপেক্টর-বাবু মোকদ্দমা চালান দিলেন,
নিজের ব্যয়ে গরুর গাড়ী করিয়া আসামীকে
বর্দ্ধমানে পাঠাইরা দিলেন ।

বিপদে আপদে রমাশ্রদাসের মুখ এক
মুহুর্তের জন্য কেহ যান দেখে নাই, তবে সে
গভীর প্রসন্নমুখ একদিনের জন্য দেখাচ্ছ
কর নাই । বর্দ্ধমানে গমনকালে পুত্রকে
আলিঙ্গন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “বৎস,

বড় সমারোহে বর্দ্ধমানে বেড়াইতে বাই
তেছি, চিন্তিত হইও না, কখনো কিরিয়
আসিরা ।” সম্মেলনয়নে দেবীশ্রদাস পিতা-
চরণ ধরিয়া বিদায় লইল ।

পরে রমাশ্রদাস হেমচন্দ্রের চক্ষে জল
ধেখিয়া বলিলেন, “হেমচন্দ্র, অক্লান্ত যোচন
কর, লক্ষ্য রাখিয়া যেন মৃত্যুর্তের জন্তও আমাদের
কাতরতা-চিন্তা না দেখিতে পায়,—পাপভি
ভরের জন্য কারণ নাই ।” পরে হেমচন্দ্রকে
একপার্শ্বে ডাকিয়া লইরা এই বোকদ্দমা-
সম্বন্ধে বাহা বাহা করিতে হইবে, অবিচলিত-
চিত্তে তাহা বুঝাইরা দিলেন ।

হেম বিন্দুর নিকট বিদায় লইরা সেই
রাত্রিতেই বর্দ্ধমানে আসিলেন এবং পর-
দিন প্রাতের গাড়ীতে কলিকাতায় চলিয়া
গেলেন ।

চতুর্কবংশ পরিচ্ছেদ ।

বিচারের গৃহ ।

বর্দ্ধমানের বিচার-গৃহ আজি বড় শোভা-
ময় । তারিগী-বাবুর মৃত্যুর মোকদ্দমা আজি
বিচার হইবে । জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব
তারিগী-বাবুকে জানিতেন, বড় অমুগ্রহ
করিতেন, পেলন লইতে তারিগী-বাবু
বর্দ্ধমানে আসিলে তাঁহাকে আপনার বাস
কামরার ডাকিয়া বসাইতেন, তাঁহাকে
অনার্য্যি মাজিষ্ট্রেট করিবেন, এক্ষণ মতও
প্রকাশ করিয়াছিলেন । তারিগী-বাবুর
মৃত্যুর সংবাদে স্কন্ধ হইরাছিলেন, তারিগী-
বাবুর বিষবার লরখাত পাইরা অভিযার
কৃত্ত হইরাছিলেন । বৃদ্ধ-বয়সে সন্তান

ভালুকমার ও ভবীশ্বরকে ঘিষ বাওরাই
যািররাছে? এক অজ্ঞাত পশ্চিমে বঙ্গাসী
এই নৃশংস কার্য করিরাছে? নিরাজ্ঞার
বিধবাকে অকূল সাগরে ভাসাইরা মুহুর
নিকট ঊইদ দ্বারা সন্ধ্যা সম্পাদিত অস্তের
নাথে লিখাইরা লইরাছে? তারিণী-বাবুর
বৃত্তা না হইতে হইতেই সে বিধবাকে গ্রাম
হইতোসনাতনবাগীতে তাড়াইরা দিরাছে?
এরূপ নৃশংস স্বদরপুত্র মানবাকৃতিধারী
চিত্রক পশু কি অগতে থাকিতে পারে?
যোবে তাহার শরীর কল্লিত হইল,
তিনি ভাল করিয়া পুলিশ-তহব্বের আদেশ
দিলেন।

দারোগা-বাবু যে ডাইরারি পাঠাইরাছি-
লেন, বাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমস্ত আভোপান্ত
পড়িলেন,—পড়িরা তুট হইলেন। ইলপেট্টর-
বাবু যে রিপোর্ট পাঠান, তাহা তিনি ক্রোধে
কেলিরা দিলেন,—বলিলেন, “এ মোকদ্দমার
বিচার হওয়া নিত্য কৰ্তব্য, এখনই চালান
দাও।” সন্ধ্যার সময় খেলিবার স্থানে পুলিশ-
সাহেবের সহিত তাস খেলিতে খেলিতে
বলিলেন, “তোমার ঐ দারোগাটি আমার
জেলার মধ্যে কার্যদক্ষ, তোমার ইলপেট্টরটি
বড় গাধা।”

গুডফ্রাইডের ছুটিতে মোকদ্দমা আসিরা
সৌছিল। দারোগা মহাশয় সাক্ষী লইরা
নিজেই হাজির; বাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে
গিরা আবেদন করিলেন, অষ্টাইপ্রমাণ লেখা
হউক, নচেৎ সাক্ষী ধারাপ হইরা বাইতে
পারে, আসামী বড় ফেরেকাজ ও কুদোক,
সাক্ষী হাত করিতে পারে। পুলিশের মোক-
দ্দমা পোলাওয়ের মত তত্ত্ব তত্ত্বই ভাল, ঠাণ্ডা
হইলে ধারাপ হইরা যায়। বাজিষ্ট্রেট সাহে-
বেরও ইচ্ছা, তখনই বিচার আরম্ভ

হিলেন না। ছুটিতে উকীল-মোক্তার বীড়া
গিরাছে, এই ছুটির সময় মোকদ্দমার বিচার
করিবে আসামীর প্রতি নিত্য অজ্ঞার
হইবে জানিরা বিচার তিন দিনের অল্প
মূলত্বী রাখিলেন।

আসামীদের জামিনে ছাড়িরা দিরা
কল্প-একজন ক্ষত্রকার কীর্ণকীৰ্ত্তা মোক্তার
বরখাস্ত করিলেন,—তর্ক করিলেন যে,
প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে আসামীকে
হাজতে নেওয়া আইন ও হাইকোর্টের মতের
বিরুদ্ধ। সাহেব তীব্রবরে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, “কি? খুনী-মোকদ্দমার আসামীর
জামিন প্রার্থনা? তোমার স্বদেশীয় সন্তান
লোককে হত্যা করা হইরাছে, সেই মোকদ্দ-
মার আসামীকে উচিত দণ্ডবিধানের অল্প
মোকদ্দমা হইতেছে, আর তুমি তারিণী-বাবুর
বন্ধ,—তুমি তারিণী-বাবুর স্বদেশীয় লোক,—
তুমি সেই তারিণী-বাবুর হত্যা-মোকদ্দমার
আসামীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ?
তাহার জামিন প্রার্থনা করিতেছ? জামি
বিস্মিত হইলাম।” সাহেবের তীব্রবক্তিত
দেখিরা ক্ষত্রকার মোক্তার মহাশয় চারিদিকে
সদ্বৎ-কুল দেখিলেন, আর অধিক বাক্যব্যয়
না করিরা বামহস্তে শায়লা ধরিরা সেলাম
ঠুকিরা চম্পট দিলেন।

ছুটির কয়েকদিন অভিবাহিত হইল।
দারোগা মহাশয় বড়ই চিন্তায় সে কররি
কাটাইলেন, পাছে সাক্ষীদিগকে কেহ হাত
করে, পাছে তালপুত্র হইতে কোন
লোক সাক্ষীদের সহিত দেখা করে, পাছে
রমাপ্রসাদের দেবভূলা চরিত্র ও মির্দোবিতা
আকোচনা করিরা সাক্ষীদের মন আপন
হইতেই কিরিয়া যায়। ছোট ডিকীতে
চড়িরা জাল কেলিরা জেলোভায়া বন্ধন

যখন বড়কড় করিতে থাকে, জানই ছেড়ে
কি ডিকাই ভাবে,—তখন কেলে তার
যেরপ উৎসুক হন, দারোগা মহাশয় আজ
সেইরূপ উদ্বিগ্ন। যে কাতলামাছ তাঁহার
জালে পড়িয়াছে, ইহা নিরাপদে ডিকাইতে
ভুলিতে পারিলে তাঁহার লাভের শেষ নাই,
বোধ হয়, দুই এক মাসের মধ্যে পদ ও
বেতন বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু এ বিষয় কাতলা
জটীকারীকে কেহ চিনে না, উহাকে সন্দেহ
লোক বলিয়া প্রমাণ করা বড় কঠিন নহে,
দারোগা মহাশয় এইরূপ মনে করিয়াছিলেন,
কিন্তু মোকদ্দমা হইয়া অবশিষ্ট সরস্বতী ঠাকুরের
বন আরও চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল।
দারোগা-বাবুর ভিকী বুরি ভোবে!

ছুটির কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।
সাহেবমহলে সে কয়েকদিন ঐ মোকদ্দমার
অনেক কথা হইত। তারিগী-বাবুকে সাহে-
বেরা চিনিতেন, তারিগী-বাবুর হত্যার
সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আগমাদিগের
শাসনকার্য্যের গ্লানি বলিয়া জ্ঞান করিয়া-
ছিলেন। তীত্বরে পুলিশ-সাহেব ক্রুদ্ধ
হইয়া বলিলেন, “সেই হত্যাকারী সম্মানী
বদি এ মোকদ্দমার খালাস পায়, তাহা হইলে
বঙ্গদেশে মহাব্যব জীবন ও সম্পত্তি আর
নিরাপদে থাকিবে না।”

ছুটির কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।
সে কয়েক দিন বর্ধমানের দোকানে, বাজারে,
ডল্লোলকের গৃহে গৃহে এই লইয়া
বিশেষ আন্দোলন। তারিগী-বাবুর খুনের
কথা শুনিয়া প্রথমে সকলেই বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ
হইয়াছিল, ক্রমে আসল কথা প্রকাশ
পাইতে লাগিল, লোকে কামিনীকান্ত-বাবুর
নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, দারোগা-
বাবুর চালাকীর উল্লেখ করিতে লাগিল।
দারোগা-বাবুর মুখ দেখান তার

হইল,—তিনি সাহেব-মহলেই প্রায় যুগ
দেখাইতেন।

ছুটির কয়েক দিন অতিবাহিত হইল।
আজি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারাসনে বসিয়া-
ছেন, তিনি স্বয়ং এই মোকদ্দমা বিচার করি-
ছেন। ইতর ভ্রম অনেক লোকে আজ
বিচার-গৃহ পূর্ণ। বর্ধমানের ভূতপূর্ব নাজী-
রের হত্যার মোকদ্দমা সকলেই দেখিতে
আসিয়াছে, বাজারের লোক বারান্দার ও
চারদিকের মাঠে ডাকিয়া পড়িয়াছে।
মাজিষ্ট্রেট সাহেব গভীরমুগ্ধি ধারণ করিয়া
বসিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে পুলিশ-সাহেব
বসিয়াছেন, তিনি মোকদ্দমা চালাইতে আসিয়া
ছেন। কোর্ট-বাবু কন্ঠেবল সহ বর্তমান,
আমলা, কেরানী আজ কাজকর্ম ফেলিয়া এই
বৃহৎ মোকদ্দমা দেখিতে আসিয়াছে। উকীল
মহাশয়ের মধ্যে কেহ বাকী নাই। মাজিষ্ট্রেট
সাহেবের আদেশ অনুসারে উকীল-সমকার
মহাশয় এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য উপ-
স্থিত। তাঁহার বিজ্ঞ আকৃতি ও বিজ্ঞ প্রকৃতি
বর্ধমানে কে না জানে, তাঁহার স্মৃতি শরীর
ও স্মৃতি বুদ্ধি, বর্ধমানে কাহার অপরিচিত?

তাঁহার মিতট গভীরাকৃতি উমাপ্রসন্ন-বাবু
আসীন রহিয়াছেন,—বর্ধমান জেলার উমা-
প্রসন্ন-বাবুর ভ্রাতৃ কাহার বন, কাহার নাম,
কাহার অভিজ্ঞতা? লক্ষী তাঁহার প্রতি সম্মত,
সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠে বাস করেন, যাক
যেবালা, বিজ্ঞা, বন-গোরব সকল বিষয়েই
উমাপ্রসন্ন-বাবু ভাগ্যবান। উমাপ্রসন্ন-বাবুর
সমকক্ষ হওয়া উকীলদিগের উচ্চাভিলাষ,
উমাপ্রসন্ন-বাবুকে নিবৃত্ত করা বনী জমীদার-
দিগের আকাঙ্ক্ষা, উমাপ্রসন্ন-বাবুর ভ্রাতৃ বড়
লোক হওয়া বর্ধমানের বিভাগের বার্ষিক-
দিগের বাল্যস্বপ্ন।

তাঁহার পার্শ্বে কীশোরীন্দ্র স্মৃতি, জুয়

পদ্মশোভন-বাবু বসিয়াছেন,—কার্যকরতার বল, ক্মতার বল, সাহেবদিগের নিকট মান-মর্যাদার বল, স্বর্গমোহের নিকট সুনামের বল,—পদ্মশোভন-বাবুর জায় বন্ধ মানে কে আছে? বর্জমান সহরের লোক তাঁহার আদেশ বিরোধিতা করিয়া মনে, পল্লীগ্রামের লোকে তাঁহার অহুগ্রহ অপেক্ষা করে।

তাঁহার নিকট প্রবীণ, বুদ্ধিমান, অমায়িক, মিষ্টভাষী শ্রামলাল-বাবু, শ্রামলাল-বাবু সকলের প্রিয়, যে তাঁহাকে জানে, সে তাঁহাকে আদর করে, তাঁহাকে ভালবাসে, তাঁহার প্রিয়কথার ভুট হয়, তাঁহার সংপর্শ-মর্শে উপকৃত হয়। তাঁহার পার্শ্বে আর,—আর কত নাম করিব? পদ্মসরোবরের জায় আজ বিচার-গৃহ শোভা পাইতেছে—শ্রামলা-পরিধারী উকীল মহাশয়গণ যেন পদ্মফুল-ফুটিয়া রহিয়াছেন?

রমাশ্রমাদেয় দীর্ঘজটাজ্জাদিত তীত্র নরন দেখিয়া লোকে আরও বিস্মিত হইল। বাঁহার শাস্ত্রশিক্ষা অসাধারণ, বেদ-বেদান্ত বাঁহার কর্তৃত্ব, সরস্বতী বাঁহার ওঠে বাস করেন, যিনি কান্না বৃন্দাবন পর্য্যটন করিয়াছেন, যিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ব্যয়ক্রমেও দৈববল ধারণ করেন, যিনি জীবনের শেষাবস্থা ধর্ম-লিঙ্গাদানে অতিবাহিত করিতেছেন, সেই প্রাচীন ঋষিভূলা মহত্ব কি তারিণী-বাবুর হত্যাকারী? এই প্রশ্নান্ত দেবতুল্য ললাটে কি হত্যাকারীর দ্বন্দ্ব অঙ্কিত আছে?

বড় বড় উকীল সমস্ত বাবীর পক্ষে—আসামীর পক্ষে সেই কুজকার কীপজীবী মোক্তার। তিনি মাজিষ্ট্রেটের ভাবগতিক দেখিয়া অনেক কষ্টে একখানি দরখাস্ত দাখিল করিলেন।

দরখাস্ত এই যে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব দরখাস্ত তারিণী-বাবুকে জানিভেন, সনাতনবাহীর

কর্মসময় কামিনীকান্ত-বাবুকেও জানেন, তারিণী-বাবুর বিধবা ও কামিনীকান্ত-বাবু এই মোক্তারের প্রকৃত বাবী। অতএব মোক্তারটি মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজ বিচার না করিয়া অন্য বিচারকের হস্তে দিলে ভাল হয়। যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা না করেন, তবে আসামীকে অবকাশ দিন,—আসামী এ বিষয়ে হাইকোর্টে আবেদন করিতে চাহে।

দরখাস্ত শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরম হইলেন, পুলিশ-সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, ভদ্রকারী দারোগা কাঁপিতে লাগিল,—মোক্তার মূলভূমী হইলে বা হত্যাকারী হইলে দারোগা মহাশয়ের ডিকী বৃথি ডোবে! অথচ কুজকার মোক্তার নাছোড়বন্দ, আইনের পুস্তক খুলিয়া বসিয়াছে!

ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ মোক্তার অতিশয় গুরুতর বলিয়া আমি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছি। আমি বিচার করি, ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?”

প্রশান্তহৃদয় রমাশ্রমাদ উত্তর করিলেন, “আপনি বিচারপতি, সুবিচার আপনাদেয় অত্যন্ত কার্য। সুবিচারে আমার ভয় নাই, আপনাই বিচার করুন।”

কুজকার মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বসিলেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তিরস্কারে ভীত হইলেন, বাবীর সাক্ষীদিগকে জেরা করিতেও সাহস পাইলেন না। কেবল কোন সাক্ষী কি বলিতেছে, একপার্শ্বে বসিয়া লিখিয়া লইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

বিষকচুর মোকদ্দমা ।

প্রথম সাক্ষী,—সনাতনবাগীর একজন ভাত্যার-বাবু । তিনি বলিলেন, “তারিঙ্গী-বাবুর পীড়ার সময় মধ্যে মধ্যে আমি আসিয়া দেখিতাম এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিতাম । তারিঙ্গী-বাবুর কোন সামাজিক পীড়া হয় নাই, কেবল বাত এবং জ্বর । তাঁহার বরস অল্পমান ২২ বৎসর হইয়াছিল, এ বরসে ঐরূপ সামান্য পীড়ার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব । মৃত্যুর পূর্বেক দিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে আসিয়াছিলাম, জ্বর বিশেষ বাড়ে নাই, মৃত্যুর কোনই সম্ভাবনা ছিল না । তাহার পরদিন মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, লাশ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম, রমাশ্রমাদ রাতারাতিই লাশ দাহ করাইয়াছেন ।”

তারিঙ্গী-বাবুর সাক্ষী পীড়া ও সহসা মৃত্যু-সম্বন্ধে তাঁহার বাড়ীর দুই তিন জন লোক প্রমাণ দিল ।

তাঁহার পর সনাতনবাগীর বিভাগলের একজন শিক্ষক । তিনি বলিলেন, “মৃত্যুর পূর্বে সন্ধ্যার সময় তারিঙ্গী-বাবু পূর্বেক উইল রদ করিয়া নূতন একখানি উইল করেন । সে উইলখানি দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি আপন ব্রাতৃকন্যা বিন্দুবাসিনীকে ও সুধাহাসিনীকে দান করিয়া যান । উইলখানি করিবার কয়েক দিন পূর্বে হইতে সরস্বতী ঠাকুর ঐরূপ উইল করিবার জন্ত দ্বিবারান্ত্র বিরক্ত করিতেন এবং দুই একজন লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ অধিক দিন বাঁচিবেন না । যে সময়ে নূতন উইল হইল, সে সময়ে রমাশ্রমাদ উপস্থিত

ছিলেন, এবং তিনি উইলের একজন সাক্ষী । তার পর রমাশ্রমাদ সেই ঘরে বহিলেন, সে রাতে ঘরে আর কেহ ছিল না, সেই রাতেই তারিঙ্গী-বাবুর সহসা কাল হয় ।”

তারিঙ্গী-বাবুর তৃত্যোরা প্রমাণ দিল যে, রাতে তারিঙ্গী-বাবু নিদ্রা বাইতেছিলেন, সে ঘরে রমাশ্রমাদ ছিলেন । হঠাৎ দুই প্রহর রাজির সময় মৃত্যুর গোল উঠিল, তৃত্যোরা বাইয়া দেখিল, বাবু হাত-পা খেঁচিতেছেন, মুখে কেনা উঠিতেছে, ঠিক বিঘ খাইয়া মরিলে যে রূপ মৃত্যু হয়, সেই রূপ আকার হইয়াছে । তৃত্যোরা মাঠা-রানীকে এ কথা বলিয়াছিল, অতঃপর লোককে ঐরূপ জানাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রমাশ্রমাদ তাহাদের নিবেদন করিয়া সেই রাতে লাশ জালাইয়া দিলেন ।

গোপবালার বাপের বাড়ীর প্রিয় পরিচারিকা আসিয়া প্রমাণ দিল যে, রমাশ্রমাদ তারিঙ্গী-বাবুকে ঔষধি খাওয়াইতেন । ঘটনার রাতে রমাশ্রমাদ ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া কতকগুলি শিকড় বাটিতে বলিলেন, আমি সেই শিকড়গুলি বাটিয়া দিলাম, তাহাতে প্রায় দুই ছটাক রস বাহির হইয়াছিল । শিকড়গুলি দেখিতে এক প্রকার বিষকচুর শিকড় । সে রস পান্ড করিয়া রমাশ্রমাদ ঠাকুরের নিকট রাখিয়া আমি চলিয়া বাই, রস ঝাওরান দেখি নাই । মৃত্যুর পর আমার মনে সন্দেহ হয়, সুতরাং সেই পান্ড ও শিকড় বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দারোগা মহাশয়কে দিয়াছি । রমাশ্রমাদ অনেক রকম ঔষধ জানে, রোগীকে ভাল করিতে পারে, জীবন্ত বাহ্যকে মারিতেও জানে । উহার নিকট ঔষধের জন্ত অনেক লোকে আইসে । সেই ঔষধপাত্র ও শিকড় পাওয়াও

ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠান সম্বন্ধে দারোগা-বাবু স্বয়ং ও দুই একজন কনেটবল জবাবদানী দিল। তাহার পর ডাক্তার-সাহেব জবাবদানী দিছেন যে, তিনি ঐ পাত্রহরস ও নিকট পরীক্ষা করিয়াছেন, উহা শরীরের অতিশয় অপকারজনক। ঐ রস অধিক পরিমাণে খাইলে মস্তিস্কের মৃত্যু হইতেও পারে।

শেষ সাক্ষী সনাতনবাটীর একজন ভক্তলোক। তিনি বলিলেন, “তারিণী-বাবুর লাশ-দাহের সময় আমি ছিলাম। রমাপ্রসাদ ও হেম-বাবু আস্তে আস্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। হেম-বাবু বলিতেছিলেন, আজ কটকোদ্ধার হইল, বিলুপ্ত ও স্মৃতির পিতৃকুলের সম্পত্তি বিষ্ণু ও স্মৃতি কিরিয়া পাইল। রমাপ্রসাদ উত্তর করিলেন,—“বিষকটু চমৎকার ঔষধি,—উহার প্রয়োগে অন্তে সুকলংকলে।”

বাণীর পক্ষের প্রমাণ সাক্ষ হইল। বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পরদিন চার্জ করিয়া আসামীর জবাব গ্রহণ করিবেন, অত মৌকদ্দমা মূলভূমী রাখিয়া গার্ডোথান করিলেন। আসামী পুনরায় হাজতে গেলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

মৌকদ্দমা বিচারাবধীন।

পরদিন ১১টার সময় পুনরায় বিচারখর লোকারণ্য, পুনরায় উকীলগণ উপস্থিত হইয়াছেন, আসামী রমাপ্রসাদ আসামী-

দিগের স্থানে দণ্ডারমান হইয়াছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার-আসনে বসিয়াছেন।

পেশকার একথানা চার্জসিট প্রদান করিল,—সাহেব দণ্ডবিধি আইন খুলিয়া দেখিতেছেন, কলম লইয়া মাড়াচাড়া করিতেছেন।

এমন সময় কাছারীর বাহিরে একটা গোল হইল, একথানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে দুইজন লোক নামিয়া অতি বেগে বিচারখরে প্রবেশ করিলেন।

একজনকে বর্তমানের উকীলগণ জানিতেন,—তিনি হাইকোর্টের বশখী উকীল চন্দ্রনাথ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম রাখিয়া একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, এ আবার কোথা হইতে বিপদ আসিল! উকীলের সঙ্গে হেমচন্দ্র,—রমা-প্রসাদ তাঁহাকে দেখিয়া আশঙ্ক হইলেন।

চন্দ্রনাথ সাহেবকে জানাইলেন, “আমি আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইতেছি, বাণীর সাক্ষীদিগকে কূটপ্রস্ত করা হয় নাই, আদালত যদি অহুমতি করেন ত সে সাক্ষীদের ডাকিয়া একবার জেরা করিতে ইচ্ছা করি।”

মাজিষ্ট্রেট। সাক্ষীর কল্যাণ প্রমাণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পুনরায় তলব করিয়া মৌকদ্দমা-কার্যে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, মৌকদ্দমা দায়রার বিচার হইবে, তুমি ইচ্ছা করিলে দায়রার বিচারের সময় জেরা করিতে পার।

চন্দ্রনাথ। সাক্ষীরা চলিয়া যায় নাই, এই আদালতের নিকটেই বর্তমান আছে। যদি অহুমতি করেন, আমি এখনই দেখাইয়া দিতেছি। জেরা করিতে আমার এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে না, অতি গুরু অপরাধে দায়রার প্রেরিত হইবার পূর্বে আসামী এই সাক্ষীরা অহুমতি প্রার্থনা করিতেছে। জেরার

পর যদি মোকদ্দমা দায়রার পাঠান আবশ্যক বিবেচনা করেন, সে বিষয়ে আদালতের সম্পূর্ণ অধিকার ।

মাজিষ্ট্রেট অপত্য অহুমতি দান করিলেন । সনাতনবাটীর সাক্ষিগণ চলিয়া যাব নাই, কাছারীর বাহিরে সনাতনবাটীর সদর-দারের মহাশয়ের সহিত মিষ্টালাপ করিতেছিল এবং ঘূমপান করিতেছিল । তাহাদের পুনরায় আনা হইল ।

প্রথম সাক্ষী ডাক্তার-বাবু । কূটপ্রদ্রে প্রকাশ হইল, তিনি ডাক্তার-বাবু নহেন । কোন কালে ডাক্তারী পড়েন নাই, কোন পরীক্ষা দেন নাই, এক ডাক্তারখানার কয়েক মাস কশাউগুর ছিলেন, শেষে মাতলামী দোষে সে কর্তৃক হারান । এখন সনাতনবাটীতে থাকেন, লোকের অর-টর হইলে কুইনাইন বাজারের দরের দেড়া দরে বিক্রয় করেন এবং কামিনীকান্ত-বাবুর মুসাফেরী করেন, কলিকাতা হইতে বাই-নাচ আনিতে হইলে তিনিই কলিকাতায় গিয়া আয়োজন করেন । ডাক্তার-বাবু আরও স্বীকার করিলেন যে, তারিগী-বাবুর মৃত্যু বড় সহসা হয় নাই, সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল না, বিশেষ কারণ থাকিলে আমি খানার সংবাদ অবশ্য দিতাম ।

তার পর উইলের সাক্ষী কূটপ্রদ্রে প্রকাশ করিলেন, “আমি সনাতনবাটীতে থাকি, কামিনীকান্ত-বাবুর আশ্রিত লোক । ভালপুকুরে বড় বাই না, কেবল উইল করিবার দিন গিয়াছিলাম যাত্র । রম্যপ্রসাধ তারিগী-বাবুকে উইল করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা নিজের কর্ণে শুনি নাই, সনাতনবাটীতে এইরূপ লোকের মুখে শুনিয়াছি যাত্র ।”

যে পরিচারিকা স্ত্রমরী, বিবকচু বাটীর

প্রমাণ দিয়াছিলেন, তিনি কূটপ্রদ্রে প্রকাশ করিলেন, “আমি কামিনীকান্তের তারিগী-বাবুর বাটীতে দাসী ছিলাম না, পোপবালার বাণেশ বাড়ীর দাসী । তারিগী-বাবুর মৃত্যুর দিন সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, এবং সেই মল্লিকদের বাটীতে শয়ন করিয়াছিলাম । দ্বি-প্রহর রাত্রে বিবকচু বাটীবার আবশ্যক হওয়ার বাটীর দাসীদের না বলিয়া সম্মানী ঠাকুর আমাকেই ডাকিয়া বিবকচু বাটীতে বলিয়াছিলেন, কেন না আমি বড় বিধবাসী পুরাতন ঝি । তাহার পর পাত্র কোথায় ছিল, জানি না, বিবকচুর শিকড় কোথায় ছিল, জানি না, দারোগা মহাশয় বাটি ও শিকড় খুঁজিয়া বাহির করাতে আমি তাহা সনাক্ত করিয়াছি যাত্র । কাছারীতে যে পাত্র আছে, সে সেই পাত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, ঠিক বলিতে পারি না ।”

তাহার পর দারোগা মহাশয়ের জবান-বন্দী,—বর্দ্ধমানের সমস্ত লোক সে জবান-বন্দী শুনিতে কাছারী-ঘরে যেকৈ আসিল । দারোগা মহাশয় কূটপ্রদ্রে প্রকাশ করিলেন, “আমার বাড়ী বাথরগঞ্জ জেলা । আগে বাথরগঞ্জের কোন দারোগার ভাণ্ডারী অর্থাৎ ভৃত্য ছিলাম । সেই দারোগা বাঁকুড়া জেলার বদলী হইলে তাহার সহিত আইসি এবং তথায় ভাণ্ডারী-কাজ ছাড়িয়া দিয়া কুলীর কন্টাক্টর হই । তাহাতে বিস্তর লাভ হয়, কিন্তু একটি বিবাহিতা স্ত্রীকে বাহির করিয়া কুলী করিয়া চালান দেওয়ার ধরা পড়ি ও সে বিষয়ে মোকদ্দমা হয় । মোকদ্দমার অব্যাহতি পাই, কিন্তু কুলীর কাঁবা ছাড়িয়া দিয়া পুলিশে কনেটবল হইলাম, এই মোকদ্দমা তদন্ত সনাতনবাটীতে বসিয়াই হইয়াছে, তথাকার সদর দারোগা মহাশয় সমস্ত সাক্ষী জোগাড় করিয়া

দিয়াছেন এবং তদন্তে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বিবকচূর শিকড় তারিগী-বাবুর বাড়ীতেই পাওয়া যায়, পাত্রও তথায় পাওয়া যায়। হাসী দিয়াছিল কি, কি একায়ে

ওয়া যায়, তাহা ঠিক স্মরণ নাই। বাথর-পঞ্জের দারোগার নিকট দশ বৎসর ডাওয়ারী-কার্য্য করিয়াছি, সে অবকাশে তথাকার পুলিশের কার্য্য অনেক দেখিয়াছি।”

শেখ সাকী, যিনি লাশ জালাইবার ময় রমাশ্রমাদ ও হেমের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন, তিনি তালপুকুর গ্রাম কিল্লপ, স্মানভূমি কেথার, কিছুই বলিতে পারিলেন না। আরও কূটপ্রশ্নে প্রকাশ পাইল, তিনি কলিকাতার কামিনীকান্ত মহাশয়ের বাগান-বাড়ীর একজন ভৃত্য।

এইরূপ সমস্ত কথা প্রকাশ হওয়ার্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম রাখিয়া দীর্ঘ শব্দ কত্থন করিতে-আরম্ভ করিলেন। তিনি অভাবতঃ কিছু উগ্র, কিছু ক্ষিপ্ত, কিছু ব্যস্ত-চিত্ত, কিন্তু তিনি বুদ্ধিশূন্যও নহেন, হৃদয়শূন্যও নহেন,—মোকদ্দমার রূপ অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, আসামীর প্রশান্তমুষ্টির দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভাবগতিক দেখিয়া দারোগা বাবুর মুখ শুকাইল, বারাকার গিয়া বসিয়া পড়িলেন, বীননাথ কনষ্টেবলকে পুতুর খেকে এক বটা জল আনিতে বলিলেন।

চন্দ্রনাথ তখন আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আসামী নিরপরাধী, নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ লোক, অভিশয় কুলোকের মিথ্যা চক্রান্তে পড়িয়া এই কষ্টভার, এই কলঙ্কভার বহন করিতেছেন। আদালত অজ্ঞমতি দিন, কয়েকজন সাকীই সাকী দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করি।”

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনও ক্রন্দন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, “সাক্ষিগণ সকলেই কামিনীকান্তের অল্পগত লোক, কামিনীকান্তের উত্তেজনার এ মোকদ্দমার সৃষ্টি, কামিনীকান্তের উত্তেজনার সকল সাকী আপাগোড়া মিথ্যা বলিয়া গিয়াছে। বিবকচূর গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা, বাথরগঙ্গাবাসী এই দারোগা সে গল্পটি সৃষ্টি করিয়াছে। সে বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, অজ্ঞমতি দিন, আমি কয়েকজন সাকী সাকী ডাকি।”

মাজিষ্ট্রেট তখন উত্তর করিলেন, “বাদীর প্রমাণ যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহা হইলে আসামীর সাকী ডাকিবার কিছু আবশ্যক আছে কি?”

চন্দ্রনাথ বলিলেন, “সচরাচর মোকদ্দমার আবশ্যক নাই বটে, কিন্তু এ মোকদ্দমার আছে। এ মোকদ্দমার একজন ধর্ম্মপরায়ণ উন্নতচরিত্র উদ্রলোকের নামে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অপরাধ আরোপিত হইয়াছে। বার্ডকো, রোগে বে লোকের মৃত্যু হইল, তাহাকে বিব বাওয়ানর একটি অজ্ঞত গল্প সৃষ্টি হইয়াছে। বিবকচূর বলিয়া কি পদার্থ আছে, তাহা সচরাচর লোকে জানে না, পুলিশ সেই বিবকচূর শিকড় পাঠাইয়াছেন, পাত্রটি পর্য্যন্ত ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন। যদি এ তরফর অপরাধ সত্য হয়, তাহা হইলে আসামীর প্রাণদণ্ড বিষয়। যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বে নৃশংস মিথ্যাব্যবসারী রূপে মোকদ্দমা সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান আপনাদ কর্তব্য। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, রূপে নৃশংস, মিথ্যাব্যবসারী পুলিশ-কর্ম্মচারী বহুদেশে আজকাল অধিক

নাই,—যদি এরূপ থাকে,—যদি তাহা-
নিগের শঠতা ও নৃশংসতা প্রমাণ হয়,
তাহা হইলে সেই পুলিশ কুলাকার-
দিগকে তিরোহিত করিয়া প্রজাতিগকে
রক্ষা করা রাজার সমুচিত কার্য। আপনি
কেবল বিচারপতি নহেন, এ জেলার শাসন-
কর্ত্তা, শাসনের ভার আপনার হস্তে।
বেচারের সহায়তার জন্য, শাসনের সহায়-
তার জন্য, আমার বশেষবাসীদিগের মঙ্গলের
জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি, আমাকে
দুই ঘণ্টা মাত্র সময় দিন। আদালতের সময়
মুলাবান্, কিন্তু দুই ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম
করিলে আপনার মনের সম্পূর্ণ সন্বেহ-
দূর হইবে, আপনি জানিতে পারিবেন, এ
মোকদ্দমা সম্পূর্ণ সত্য কি সম্পূর্ণ মিথ্যা,
এ কথা আপনার স্বয়ংক্রিয় হইলে আপনিও
কর্ত্তব্যকার্য সাধন করিয়া সন্তোষলাভ করি-
বেন,—আসামীও প্রমাণ দিয়া সন্তোষ লাভ
করিবে। তাহার পর আপনি যাহা আদেশ
দিবেন, আসামী শিরোধার্য করিয়া মানিবে।
আমার সাক্ষী আমি স্বয়ং অনিরাছি, বাহিরে
উপস্থিত আছে, আদেশ করুন, তাহাদের
শ্রুতি ।”

মজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষী সাক্ষীদের
শ্রুতিতে আদেশ দিলেন ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

মোকদ্দমার শেষ ।

কামিনীকান্তের ভায় জমীদার কাছা-
রীতে মোকদ্দমা দেখিতে আইসেন না।
কিন্তু অল্প ছাত্র হইয়া দুই জটাধারী দায়রার
প্রেরিত হইবে, ডাঙ প্রত্যেক জমীদারের

কমজা বুরিতে পারিবে, এই উল্লাসে
কামিনীকান্ত-বাবু নিজে উকীলের সহিত
আসিয়া * উকীলদিগের সহিত বসিয়া-
ছিলেন। যখন চন্দ্রনাথ-বাবু হেমচন্দ্রকে
লইয়া বিচার-ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন
কামিনী-বাবুর ক্রমকম্প হইল, চন্দ্রনাথ-
বাবুর ক্রুৎপ্রশ্নে মোকদ্দমার আসল অবস্থা
প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন কামিনী-বাবু
মূর্ছা বাইবার উপক্রম হইল। তিনি বার
বার বাহিরে চাহিতে লাগিলেন, স্মৃতি-
বাবুর বর্জ্যমানে আসিবার কথা ছিল, এ
বিপত্তির সময় স্মৃতি-বাবু কোথায়? স্মৃতি-
বাবু কলিকাতার বুদ্ধিমান এটর্নী, পাড়ারপেরে
মোটা বুদ্ধিতে বেরূপ মোকদ্দমা স্থাপন করা
হইয়াছে, তাহাতে বড় হাত দেন নাই, পরে
হাইকোর্টের চন্দ্রনাথ-বাবু এ মোকদ্দমার
আছেন শুনিয়া মোকদ্দমায় কি হইবে,
তখনই বুঝিয়াছিলেন। ডুবন্ত ভিকীকে পদা-
ঘাত করিয়া ডুবাইয়া দোণ্ডা স্মৃতি-বাবুর
রীতি ছিল, তিনি হেমচ ও যশসী চন্দ্রনাথ-
বাবুর পরম বন্ধু হইয়া রথতী ঠাকুরের
সাক্ষীর অনেক আরোজন করিয়া দিলেন।
এদিকে কামিনীকান্ত-বাবুকে তাহা সংবাদ
পাঠাইলেন,—“বিশেষ কার্যে ব্যস্ত থাকিতে
আমি বর্জ্যমানে আসিতে অশক্ত, ভরসা
করি, আপনার কার্য সিদ্ধ হইবে।”

সাক্ষী সাক্ষীর জবানবন্দী হইল
লাগিল।

আসামীর প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইলেন
তিনি তারিণী-বাবুর গুরুদেব, সমান্তনবাসীর
একজন উচ্চ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। টোলে শিবা-
দিগকে স্বতিশাস্ত্র পাঠ করান, জমীদার-বৃদ্ধ
কিরাকর্ষ-সম্পাদনার্থ যান, সমস্ত গ্রামে
আবৃত্ত ও সম্ভ্রান্ত। ৭০ বৎসর বয়স্ক হই-
রাছে, কখনও আদালতে পদক্ষেপ করেন

রমেশচন্দ্রের প্রসঙ্গ।

১. আমি বিশ্বাসিনী ও বোধমারীর
দল এড়াইতে না পারিয়া আসিতে বাধ্য
হইলাম।

তিনি প্রকাশ করিলেন, “রমাপ্রসাদ
দুই মাস অবধি সনাতনবাটিতে বাস
করিতেছেন, জমিদার মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
তাঁহাকে বাহির করিয়া দিবার আদেশ
করিয়াছিলেন। তাহার পর রমাপ্রসাদ
জমিদারকে ভয়প্রদর্শন করেন, তাহাতে
কামিনী-বাবু করেকজন বিষয় বন্ধুকে
ভাতিয়া শপথ করিয়া বলেন, যদি রমাপ্রসা-
দকে উৎসন্ন না করি, তাহা হইলে আমি
নিজ দেশ ত্যাগ করিব। তারিণী-বাবু
মৃত্যুর করেক মাস পূর্বে হইতে তাঁহার নতন
গৃহিণীর সহিত বড় কথা কহিতেন না,
কেবল তাঁহার মৃত পত্নীর কথা ভাবিতেন,
বিন্দু ও সুধার কথা ভাবিতেন, এবং চক্ষুর
জল কেলিতেন। তারিণী-বাবু আমাকে
ডাকাইয়া অনেকবার বলেন,—বিষয় আমার
প্রাত্যহিক জীবনেরই দিব, গৃহিণীকে দিব না।
হেমচন্দ্র এ কথা শুনিয়া তারিণী-বাবুকে
স্পষ্টই বলিতেন,—আপনার স্ত্রী বর্তমান
ধাকিতে এ বিষয় আমার লইব না। পরে
বৈমলসিংহ বাইবার আগে তারিণী-বাবুকে
বলিয়া গেলেন,—আপনার বিষয় জ্যেষ্ঠাই-
মাকেই দিন, আমার লইতে স্বীকৃত হইব
না। তথাপি বুদ্ধের মন ফিরিল না, মৃত্যুর
পূর্বসংস্কার উইল করিয়া বিন্দু ও সুধাকে
সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন, রমাপ্রসাদ ঠাকুর
এবং আমি সে উইলের সাক্ষী। তারিণী-বাবুর
মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা সনাতনবাটিতে
আসিয়া অবস্থান করেন। বধন গোপবালা
স্বামীর মৃত্যু-সম্বন্ধে দরখাস্ত করিলেন, তখন
তিনি কামিনীকান্ত-বাবুর বাসিতে অবস্থিত
করিতেছিলেন।”

সনাতনবাটির পুরাতন একজন দাস,
(সে বোধমারীকে বাল্যকাল হইতে বন্দ
করিত) আসিয়া প্রকাশ করিল, “আমি
৪০ বৎসর ঐ বাসিতে আছি, ৩০ বৎসর
পূর্বে রমণীকান্ত নামে নাবালক জমিদার
বাস করিতেন, কামিনীকান্তের সহিত হাঙ্গা-
মার তাঁহার কাল হয়। সে কথা সকলে প্রাচ-
তুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই
কথার উল্লেখ করিয়া কামিনীকান্তের গৃহি-
ণীকে ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমি
আপন কর্ণে শুনিয়াছি। সেই অবধি জমী-
দার-বাবু সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বড় বন্দ করি-
তেন, অচিরে কলিকাতায় চলিয়া
গেলেন।”

ধনপুরের ধনঞ্জয়-বাবু তাহার পর উপ-
স্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কামিনীকান্ত-
বাবু চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন,
“তারিণী-বাবু আমার খবর হইতেন, মৃত্যুর
করেক মাস পূর্বে আমি একবার তারিণী
বাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। তারিণী-
বাবুর সাক্ষী পতিপ্রাণা প্রথমা স্ত্রী শোকে ও
যোগে প্রাণত্যাগ করেন, তারিণী-বাবুর
দ্বিতীয় স্ত্রী অতিশয় প্রথরা ও উদ্ধতস্বভাবা,
তারিণী-বাবুকে জ্বালাতন করিয়া সমস্ত
সম্পত্তি উইল করিয়া লইয়াছিলেন। তারিণী-
বাবুর মৃত্যুর পর কামিনীকান্ত-বাবু কলি-
কাতার স্মৃতি-বাবুর নিকট গিয়াছিলেন, সে
দিন সে সময়ে আমিও স্মৃতি-বাবুর বাসিতে
ছিলাম। কামিনী-বাবু বলিলেন যে, রমা-
প্রসাদ সরস্বতী একটি হাঙ্গামার মোকদমা
কথা উপাধন করিয়া কামিনী-বাবুকে শাসন
করিয়াছেন এবং তারিণী-বাবুর নিকট নতন
উইল করিয়া লইয়া বিষয় তাঁহার প্রাত্যহিক-
জীবনে দেওয়াইয়াছেন। ঐ সকল কারণে
কামিনী-বাবু তারিণী-বাবুর বিষয়কে দিয়া

স্বপ্নাশ্রমের মাঝে একটি খুনের যোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন।” ধনঞ্জয়-বাবু আরও বলিলেন, “আমি স্বপ্নের বিষয় পাইতে এক সময়ে লুন্ড ছিলাম, এখন আর নাই। আমি নিজের দোষে বিপুল সম্পত্তি হারাইয়াছি, পতিব্রতা, সাক্ষী, স্নেহ-ময়ী স্ত্রী (তিনি হেম-বাবুর ভগ্নী হইতেন), তাঁহাকেও হারাইয়াছি। সে সময়ে হেম-বাবু আমাকে অনেক সংপরামর্শ দিয়াছিলেন, হেম-বাবুর স্ত্রী আমাদের বাড়ী আসিয়া অনেক উপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের দোষে আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করি নাই; হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র তারিণী-বাবুও বিষয় পাইয়াছেন সুনিরা তুট হইয়াছি, আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, আর একটি সম্পত্তি লাভ করিয়া অপব্যয় করিবার ইচ্ছাও নাই। বাল্যকাল হইতে সুরাপান শিখিয়াছি, তাহাতেই শীঘ্র আমার মৃত্যু হইবে, আমার পাপের প্রারম্ভিত হইবে।”

ধনঞ্জয়-বাবুর এইরূপ আত্মগোপন ও আত্ম-দোষ-স্বীকার শুনিয়া সকলের চক্ষুতে জল আসিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল।

তাহার পর খোজেন্দা বিবি নর্তুকী। তাহাকে দেখিবামাত্র কামিনী-বাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল, কাছারীর লোক একেবারে কাঁকিয়া আসিল। সে প্রকাশ করিল যে, “আমি কলিকাতার একজন নর্তুকী। কামিনী-বাবু বাইনাচগ্রর, বাইনাচ হেথিবার জন্ত আমাকে সর্বস্বা ডাকিয়া পাঠান। সম্পত্তি কামিনী-বাবুর বাগানে একদিন ডাকাইয়া ছিলেন, তথায় স্মৃতি-বাবু ছিলেন।” তাহার পর স্মৃতি-বাবুর নিকট কামিনী-বাবু যে কথা বলিয়াছিলেন, খোজেন্দা সমস্ত প্রকাশ করিল। সমস্ত আদায়িত নিষেধ, অব্যাহ ও হতজ্ঞান।

কামিনী-বাবুর উকীল প্রস্থ করিলেন, “তুমি মুসলমানী, কামিনী-বাবু তোমার হস্ত হইতে স্বধা পান করিয়াছিলেন, এইরূপ বলিয়াছ?”

খোজেন্দা। বলিয়াছি।

উকীল। কামিনী-বাবু সনাতনবাণীক জাতি-রক্ষা-সভার অধ্যক্ষ, তাহা তুমি জান? খোজেন্দা। শুনিয়াছি।

উকীল। কামিনী-বাবু তালপুতুরের শরণ ও হেমকে একঘরে করিয়াছেন, তাহা তুমি জান?

খোজেন্দা। শুনিয়াছি।

উকীল। কামিনী-বাবু জাতি-রক্ষা-সম্মেলনে এতদূর উৎসাহী হইয়া তোমার স্ত্রী স্বধা পান করেন কিরূপে?

খোজেন্দা। তাহা আমিও বাবুজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

উকীল। বাবুজী কি বলিলেন?

খোজেন্দা। বলিলেন, “গোপনে কিছু করিলে তাহাতে জাতি যায় না।” বাবু মহশয়, আপনি কি তাহা জানেন না?

উকীল মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া পড়িলেন। শেষ সাক্ষী গৈয়মনসিংহের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট শরচ্চন্দ্র ঘোষ। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,— শরৎকে কে ডাকাইল? কবে মৈমনসিংহ হইতে আসিলেন?

হেমচন্দ্র বিষয়লুভ লোক, তিনিই সরস্বতী ঠাকুর দ্বারা নূতন উইল লিখাই লইয়াছেন, —এ সকল কথা অপ্রমাণ করাইবার জন্ত শরচ্চন্দ্র সাক্ষীর স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। চন্দ্রনাথ-বাবু কোন প্রশ্ন করিলেন না, শরৎ-বাবু আপনিই বাহা জানেন, বাল্যে গোপ-লেন। হেমচন্দ্রের মহন্ত, হেমচন্দ্রের নির্ভীকতা, হেমচন্দ্রের দৃঢ়তা, হেমচন্দ্রের অবচলিত

ভারপরায়ণতা সজল-নয়মে বর্ণনা করিলেন । তারিণী-বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর জন্ত বিন্দুর বস্ত্র, ঐচ্ছা ও যারা বর্ণনা করিলেন, রোগে, শোকে, পরিতাপে শতবার বিন্দুবাসিনী তারিণী-বাবুর বাটী গিয়া দাসীর ভ্রাতৃ সেবা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিলেন । তারিণী-বাবু বধন প্রকাশে হেম ও বিন্দুকে জ্ঞাতীভূত করিলেন, তখনও বিন্দু গোপনে বাইরা জ্যোতীমহাশয়ের সেবা করিতেন, জ্যোতীমহার শুক্রবা করিতেন । তারিণী-বাবুর নববধূ বধন বিন্দুর সে বাটী যাওয়া বন্ধ করিলেন, তখনও বিন্দু সে কথা না মানিয়া পীড়ার সময়ে, শোকের সময়ে মল্লিকবাড়ী বাইতেন । ঐ নববধূ সেদিন দরিদ্র বালিকা ছিল—দিবাপ্তে চারিটি ভাত খাইতে দেখ, একপ লোক গ্রামে ছিল না,—বিন্দু তাহাদের চাল-ভাল দিয়া আসিতেন, কাপড় কিনিয়া দিতেন, বিন্দু আপনার মেরেকে কেলিয়া মাতার মত গোপবালাকে কোলে লইয়া ছদ্ম খাওয়াইতেন । সেই গোপবালা বধন তারিণী-বাবুর গৃহিণী হইলেন, তখন অহঙ্কারে বিন্দুকে ভৎসনা করিয়া পাঠাইতেন, বিন্দুবাসিনী একদিনের জন্ত রুট কথা কহেন নাই, অভিমান করেন নাই, দাসীর মত জ্যোতীমহাশয়ের বাড়ী গিয়া শুক্রবা করিয়া আসিয়াছেন । বিবর পাইবার জন্ত হেমচন্দ্র দ্বিতীয় উইল করিয়া লরেন নাই, তাঁহার অমতে তারিণী-বাবু গোপবালার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ঐ উইল করিয়াছেন । হেম-বাবু তারিণী-বাবুর বিবর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বার বার পরংকে চিঠি লিখিয়াছিলেন । পরং সে চিঠি বৈয়নসিংহে পাঠাইয়াছেন, সমস্ত আদালতে দাখিল করিলেন ।

তাঁহার পর পরজন্ম রমাপ্রসাদ সরস্বতীর কথা বলিতে লাগিলেন । রমাপ্রসাদের যুব-

তুল্য চরিত্র, অসাধারণ ধর্মশিক্ষা, আনন্দনীর উৎসাহ, অবিচলিত দেশহিতৈষিতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন । জ্ঞাতি-নির্কিংশে, অবস্থা-নির্কিংশে, সকল হিন্দুকে ডাকিয়া বধর্মের শিক্ষা দিতেছেন, খের, হিংসা ও অনৈক্য-প্রদীড়িত সমাজে ঐক্যসাধনে বস্ত্র করিতেছেন, সনাতন হিন্দুবর্ষের সজীবনী কথা দ্বারা আধুনিক হিন্দু-সমাজে জীবনদান করিতেছেন । এই চেষ্টার রমাপ্রসাদ কলকাতার আনন্দে বহন করিয়াছেন, বিন্দুকদিগের শিক্ষা-কথা শুনিয়া হাস্ত করিয়াছেন, ঘেবীদিগের অপকার-চেষ্টার কথা শুনিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সংপরামর্শ দিয়াছেন । ঘেবী ও অভিমানীদিগের ভৎসনার মুহূর্তের জন্তও রমাপ্রসাদের হৃদয় বিচলিত হয় নাই, সনাতনবাটীর জীবীদার মহাশয়ের ভয়ে যুর্ভের জন্তও রমাপ্রসাদের উদ্বেগ লক্ষিত হয় নাই । স্বদেশবৎসল রমাপ্রসাদ একাগ্রচিত্তে, অবিচলিত-হৃদয়ে, স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতেছেন, বধর্মের গৌরব-বর্দ্ধন করিতেছেন, অনৈক্য-বিক্ষত স্বদেশ-বাসীদিগের মধ্যে ঐক্যসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন । তাঁহার পবিত্র জীবনের সেই পবিত্র উদ্বেগসাধন করিবার চেষ্টার অন্ত তিনি বিপদ, ক্রোধ ও মিথ্যা কলকে পতিত হইয়াছেন । আমি রমাপ্রসাদকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-স্বরূপ সম্মান করি, তাঁহার উন্নত-চরিত্রে দোষ, কলঙ্ক ও অপরাধ স্থান পায় না ।

এই পর্যন্ত প্রমাণ সিপিদ্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলম কেলিয়া বলেন,—তিনি ব্যগ্রস্বভাব, কিন্তু ক্ষমণ্য নহেন । মুষ্টি দ্বারা নজোরে টেবিলে আঘাত করিয়া মোটে গর্জিয়া বলিলেন, “এই দেবতুল্য মহাব্যাক পিশাচ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত কামিনী-বাবু বস্ত্র করিয়াছেন ? এই উন্নত-

কর দেশহিতৈষীকে কখন কবিবার মানসে গোপবালা সরখাত করিয়াছেন ? আমাদের শুই আদালত কি মিথ্যা, শঠতা, প্রবন্ধনার রদতুমি হইরাছে ? আমাদের গঠিত পুলিশ কি জমীদারদিগের অভ্যাচারের উপায়স্বরূপ হইরাছে ? রমাপ্রসাদ ! কল্যাণ আমি তোমাকে মহা অপরাধে অপরাধী মনে করিয়াছিলাম, অস্ত আমি আমার ভ্রম বুঝিলাম । তুমি নির্দোষী, উন্নতচরিত্র, পরোপকারী ও বর্ণ-পরায়ণ । তোমার ন্যায় অধিক লোক থাকিলে তোমার দেশ এত হতভাগ্য হইত না ! তোমাকে ধান্য দিলাম এবং তোমার নামে যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তজ্জ-তুমি নাশিত করিতে পার ।

সমস্ত বিচারগৃহ নিমন্তক, নির্বাক ! সেই নিমন্তকতার মধ্যে রমাপ্রসাদ তীব্রস্বরে কহিলেন, “বিচারপতি ! আপনার সুবিচার জন্ত দ্বিধার আপনার মঙ্গল করিবেন, কিন্তু আমার আর একটি বক্তব্য আছে ।”

মাজিষ্ট্রেট । কি ?

রমাপ্রসাদ । সাক্ষীরা বলিয়া গিয়াছে, জিংশৎ বৎসর পূর্বে ঐ কামিনীকান্ত একটি হাকীমা করিয়া তাহার ভ্রাতা রমণীকান্তকে খুন করিয়াছে । তাহার বিচার এখনও হয় নাই ।

মাজিষ্ট্রেট । জিংশৎ বৎসর পূর্বের ঘটনাও অস্ত বিচার হইতে পারে ; কিন্তু তাহার প্রমাণ এখন কি আছে ? তাহার সাক্ষী এখন করজন আছে ?

রমাপ্রসাদ । হাকীমার প্রমাণ বঞ্চেই আছে । কিন্তু ভ্রাতৃবধস্বরূপ ভরসার পাতক হইতে বরং জগদীশ্বরই কামিনী-বাবুকে অব্যাহতি দিয়াছেন । রমণীকান্ত সে হাকীমার আহত হয়, কিন্তু প্রাণে মরে নাই । তিনজন দারবান রমণীকান্তের মৃতবৎ দেখ

সরাইয়া কেল, পরে রমণীকান্ত চৈতন্ত পাইলে তাহাকে লইয়া পশ্চিমদেশে পলাইয়া যায় । সে তিনজন দারবান পশ্চিম হইতে আসিয়াছে, হীরা সিং, দাল সিং ও জগদহর সিংহ ঐ দাড়াইয়া আছে,—কামিনী-বাবু বোধ হয়, তাহাদের চিনিতে পারিবেন । আর, (কামিনী-বাবুর দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া মস্তকের জটা সরাইয়া, সন্ন্যাসী সিংহ-নামে বলিলেন,) সে রমণীকান্ত এখনও জীবিত আছে, কামিনী-বাবু ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তাহার ভ্রাতাকেও চিনিতে পারিবেন ।

কামিনী-বাবু সেই জটাধারীর জটামূল লগাট দেখিলেন, তাহার অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত নয়ন দেখিলেন, তাহার প্রচণ্ডমুষ্টি দেখিলেন, সেই ক্রুদ্ধস্রাব বালক আজি মহাবলে বলিষ্ঠ বীরপুরুষ হইয়া বৈরনির্ঘাতন করিতে আসিয়াছেন ! কামিনী-বাবু নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া গেলেন,—লোকে ক্রোধধরি করিয়া জমীদার-বাবুকে বাহিরে লইয়া গেল ।

কাছারিতে একটা মহা গুণ্ডগোল হইয়া উঠিল । সে গোল থামাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “রমাপ্রসাদ ! তুমিই রমণীকান্ত ? কামিনী-বাবু তোমাকেই বাল্যকালে খুন করিতে উদ্ভত হইরাছিলেন ? সে বিবরে অভিযোগ কর, প্রমাণ লইয়া আইস,—ইংরাজ-শাসনাধীনে তুমি সু-বিচার পাইবে,—আমি নিজে তোমার অভিযোগ তদন্ত করিব ।”

অকস্মিক পরিচ্ছেদ।

—

কটি আঁবের অন্ন ও চিনিপাতা দি।

বিহার-কুহের বাহিরে সে দিন যে কিরণ
মোহনসিং, কিরণ আন্দোলন, কিরণ “মহা-
শাস্ত্রী” কথ, “বড়লাট” এজমিন লাহেবের
কথ প্রভৃতি শব্দ হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা
করিতে আমরা অক্ষম। জটীয়ারীবেশে
রমণীকান্ত জমীদারকে দেখিবার অল্প দেশের
লোক ভাঙ্গিয়া আসিল, হাইকোর্টের উকীল
চন্দ্রনাথ-বাবুকে দেখিবার অল্প, বড়লাট ডিউ
হইল, মৈমনসিংহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শরৎকে
দেখিবার অল্প অনেকে ছুটিয়া আসিল।
সে গোলমালের মধ্যে কথাবার্তা হওয়া অস-
ম্ভব,—কেবল চন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও শরৎকে
আসিজন করিয়া রমণীকান্ত আপনার স্ব-
য়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

টিক হইল, সকলে মোক্তারের বাসার
বাইবেন, তথায় সন্ধ্যার সময়পকল বিষয়ে
আলাপ হইবে। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ-বাবু,
শরৎ-বাবু ও রমণীকান্ত-বাবুকে ধরাধরি
করিয়া বর্জমানের উকীলগণ একজন প্রধান
উকীলের বাড়ী লইয়া গেলেন, তথায় কিছু
ভলবোগ না করিলে—ইহারা কিছুতেই
ছাড়িবেন না। সুতরাং হেমচন্দ্র একাই
মোক্তার মহাশয়ের বাসা জিজ্ঞাসা করিয়া
তথায় উঠিলেন।

হেমচন্দ্র মোক্তার মহাশয়ের বাটী গিয়া
প্রবেশিলেন, কাছারী হইতে তখনও কেহ আই-
সেন নাই। সুতরাং তিনি বাহিরের একটি
ঘরে রসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কৃত্তিক পর পার্বের একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার
ঘরের কপাটটি খুলিল, সেই ঘর দিয়া বাহির-
বাটী হইতে ভিতর-বাটী বাওয়া বার। সেই

অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে একটি সুগোল
দমদম ও তারিক-পর্যায় বাহু দেখা গেল।
মেরেমাছুবটি যুবতী ও ঘোমটা দেওয়া,—
হেমচন্দ্র অন্ধকারে চাহিলেন।

দমদম ও তারিকের শব্দ হইল। হেম-
চন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, সেই মেরেমাছুবটি
অমূল্য দ্বারা হেম-বাবুকে সেই ঘরে আসিতে
ইঙ্গারা করিতেছে।

হেম-বাবু নিতান্ত ভুল্ললোক, একটু
ইতস্ততঃ করিলেন, ডাবিলেন, বর্জমানের
মেরেদের এইরূপ আচার-ব্যবহার না কি ?
তথাপি মেরেটি কি অল্প ডাকিতেছে, জানা
উচিত, সুতরাং সেই ঘরে গেলেন। যুবতী
কপাট বন্ধ করিল, খিল দিল।

হেম-বাবু পাড়ারগেয়ে ভালমাস্রব,—
বর্জমানের মেরের হাতে পড়িয়া বড়ই বিপদে
পড়িলেন। অন্ধকার ঘরে অপরিচিতা যুব-
তীর সহিত এক মুহূর্তও থাকা ভুল্ললোকের
উচিত কার্য্য নহে, মোক্তার মহাশয় হেম-
চন্দ্রের এ ব্যবহার জানিতে পারিলে কি
বলিবেন ?

বাড়ীর ভিতর-দিকের একটা ছায়া
খুলিয়া যুবতী সেই দিকে পলাইয়া গেল।
আবার সেই বাড়ীর ভিতর হইতে হেম-
বাবুকে ইসারা করিয়া ডাকিতে লাগিল।
বর্জমানের মেরেদের রীতি-সম্বন্ধে নানারূপ
চিন্তা করিতে করিতে হেম-বাবু অগত্যা
বাড়ীর ভিতর গেলেন।

যুবতী আসন পাতিয়া দিল এবং এক-
জন পাচিকা হেম-বাবুকে কয়েকখানা
ফুল্কা লুচি ও আদুর দম আনিয়া দিল।
হেম-বাবু হাত বুইয়া আহায়ে বসিলেন।
দেখিলেন, বর্জমানের মেরেদের ব্যবহার
যেমনই হউক না,—তাহাদের স্বকন্যা বড়ই
উৎকৃষ্ট।

কিন্তু পাচিকা যেত বোহারা ! লুচি দিতেছে আর মুচুক মুচুকে হাসিতেছে,—হেম-বাবু পাড়ান্ধে লোক, তাঁহার খাইবার রকম-সকম দেখিয়া বেবে দুইটি হাসিতেছে !

আহার প্রায় শেষ হইল, পাচিকা অন্ন আনিয়া দিল । হেম-বাবু কচি আবেল অন্ন একটু চাকিয়া দেখিলেন,—আবার চাকিয়া দেখিলেন,—অবগুণ্ঠনবতী পাচিকার মুখের দিকে চাহিলেন,—সহসা বামহস্ত দিয়া পাচিকার হাত ধরিলেন ।

এ কি ! হেম-বাবু নিত্য ভদ্রলোক, পরের বাড়ীর রাঁধুণীর হাত ধরা কি রকম ! পাচিকা “ছি” “ছি” বলিয়া হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, হেম হাসিয়া বলিলেন, “আর লুকাইলে হইবে না, এই কচি আবেল অন্ন খাইয়া চিনিরাছি, এ তালপুকুরের রাসা বিন্দু, ভূমি কবে আসিলে, কি প্রকারে বর্ধমান আসিলে ?”

বিন্দু তখন ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর পার্শ্বে বলিলেন । বলিলেন, “বোগমারা সনাতনবাটীর প্রাচীন দাসীকে লইয়া বর্ধমানে আসিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছি ।”

হেম । বোগমারা এই বাটীতে আছেন ? দাসী এ বাটীতে আছে ?

বিন্দু । তাহারা দুই জনই এখানে আছে । বোক্তার মহাশয়ের পুত্রী আমাদের অনেক বন্ধু করিয়া এখানে রাখিয়াছেন । তাঁহার লোক বড় ভাল ।

হেম । লোক ভাল হইতে পারেন, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের আচার-বাবহার একটু বেহারা । যে মেয়েটি আমাকে বাহির হইতে ডেকে আনিল, তাহার রকম বেশ কেমন কেমন ।

বিন্দু । না গো না, যে মেয়েটির কথা চরিত্র খুব ভাল, তবে ছেলেবেলা থেকে একটু বারান । ঐ যে সে আবার আসিলে ।

পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত একটা দাসী, গাধারদাটি করিয়া চিনিপাতা দই আনিয়া বিন্দু এবং হেবচন্দ্রের পাতে দুইটা সন্দেশ দিল ।

চিনিপাতা দই দেখিয়াই হেম-বাবু মনে সন্দেহ হইল, আশ্বাসন করিয়া হাসিয়া বৃত্তীকে বলিলেন, “সুবেছি, আর ঘোমটার কাজ কি ? ঘোমটাটি খোল । এই চিনিপাতা দই দিইয়াই ধরা পড়েছে ।”

হাসিয়া মুখ তখন অভিমান ভাণ করিয়া বলিলেন, “না গো না, ঘোমটা খুলিতে ভয় করে । ঘোমটা দিয়াই ‘বেহারা’ হইলাম, না জানি, ঘোমটা খুলিলে কি হইবে ?”

হেবচন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন, অনেক মিনতি দ্বারা স্নগহাসিনীর মান ভাঙ্গিলেন ।

শরৎ ও সুধার কথা জিজ্ঞাসা করিতে বিন্দু তখন বলিলেন, “আমি বর্ধমানে আসিয়া শুনিলাম যে, বোকদমা হইতে দুই দিন দিন দেয়া আছে । আরও শুনিলাম যে, মৈমনসিংহ হইতে এখানে দুই দিন আসা যায় । সরস্বতী ঠাকুরের এ বিপজির সময় শরৎ-বাবু আসিলে সাহেবদের বলিয়া কহিয়া হয় ত কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন, এইরূপ সাত পাচ ভাবিয়া আমি শরৎকে টেলিগ্রাম পাঠাইলাম । শরৎ টেলিগ্রাম পাইয়া অনেক জেদ করিয়া কর্তৃপক্ষের দিগের নিকট দশ দিন মাজের ছুটি লইয়া সুধার সহিত বর্ধমানে আসিয়াছেন ।”

এই সমস্ত শুনিয়া হেবচন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “এমন বুদ্ধিবত্তী উকাল তালপুকুরে আছে আরিলে সরস্বতী ঠাকুর আমাকে বোধ হয়, কলিকাতার উকাল

আমাদের সান্নিধ্যের না। রমণী তাঁর
বে, তা জানি।”

বিনু হাসিল, “আমের বিন আছি।”

হেম-বাবু নিশিত হইয়া হাসিয়া করি-
লেন, “বে কি? তোমাকে কে বলিল?
জিৎসং কলসর পর রমণী-বাবুকে গ্রামের
কে চিনিল?”

বিনু হাসিয়া বলিলেন, “পুরুষমানুষে
কেহ চিনে নাই, পুরুষমানুষে আপনার
লোককে ভুলে,—মেরেমানুষ তাহা ভুলে
না। এই যে আমি ঘোমটা দিয়াছিলাম,
আর ভূমি আমাকে চিনিতে পারিলে না।
পুরুষের খাবার দিকেই মন, আমাকে ভুলিয়া
আঁবের অন্নটা চিনিলে। মেরেমানুষ ত
ভেদন নয়, জিৎসং বৎসর পরও বোগমারা-
দিদি রমণী-বাবুকে দেখিয়াই চিনিয়া-
ছিলেন। নারী কি স্বামীকে কখনও ভুলিতে
পারে?”

সুধাহাসিনী ধোকাকে কোঁলে করিয়া
হেম-বাবুর পার্শ্বে বসিলেন, “তিনিও বো
পাইয়া আবার একটু বোঁটা দিয়া বলিলেন,
“হিদি, বোগমারা-দিদি রমণী-বাবুকে চিনিয়া-
ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেন, তাঁহার
খাবার প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহাতে রমণী-
বাবু বোগমারা-দিদিকে ‘মেহারা’ মনে
করেন নিত?”

হেম-বাবু আজ দুই ভগিনীর কাছে
পড়াই হইলেন, দুই ভরী একত্র হইলে
তাহাদের সহিত কথা পারিয়া উঠা ভার।
কথার কোন উত্তর নািয়া বুদ্ধিমানের মত
কি আঁবের অন্নটুকু আর চিনিপাতা গই-
ল সমস্ত খেব করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বোগমারার দড়িহার।

বোগমারার মশ বৎসর বয়সের সময়
সনাতনবাণীর জমিদার-গৃহে রমণী-বাবুর
সহিত বড় সুধামের সহিত বিবাহ হয়।
চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় হতভাগিনী
স্বামীকে হারায়। চতুর্দশ বৎসরের বড়
স্বামীকে চিনিয়াছিল, স্বামীকে ভালবাসিতে
শিখিয়াছিল, স্বামীর দেবতুল্য মুখছবি হৃদয়ে
ধারণ করিতে শিখিয়াছিল। যৌবনের
প্রারম্ভে বোগমারা পতিকে হারাইলেন,—
তাঁহার পর সপ্তবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল-
মাত্র পতির সেই দেবতুল্য মুখছবি হৃদয়ে
ধারণ করিয়া শোকে, কষ্টে, পরের অত্যাচার
ও অবমাননা সহ করিয়া পতিপ্রাণা নারী
প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। যে বৎসরে তাল-
পুত্রে বিনুর জন্ম হয়, সেই বৎসরই সনাতন-
বাটা হইতে রমণী-বাবু দেশত্যাগী হন,
হুতরাং বিনু অপেক্ষা বোগমারা চতুর্দশ
বৎসরের বড়।

যে দিন সন্ধ্যার সময় রমণীকান্ত জটা-
ধারী-বেশে পুনরায় জমিদার-গৃহে আস্তর
গইলেন, শান্তহৃদয়া হুঃখিনী বোগমারা সন্ন্যাসী
দ্বারে একটু জল ছিটাইয়া খাঁট দিয়া
গেলেন। রাত্রিতে যখন সন্ন্যাসী দীপ
জালিয়া একাকী বসিয়া উন্নতভাবে বর্ষশায়
পাঠ করিতে বসিলেন, হুঃখিনী সে বর্ষশীতে
আকুট হইয়া পার্শ্বে বসিয়া শুনিতে
লাগিলেন এবং এক একবার সেই পুণ্য দেব-
তুল্য মূর্তির দিকে দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী
দ্বার পতীরদ্বারে শায়পাঠ শুনিয়া, সন্ন্যাসীর
প্রশান্ত উজ্জল মূর্তি দেখিয়া বোগমারার ছেলে
বেলাকার কথা এক একবার মনে পড়িতে

লাগিল,—কেন, যোগমারী আসেন না।
লাজি ছই প্রহর সন্ধ্যাসী বীণ নির্ঝা-
রিয়া, বস কান, যোগমারী পূর্ণবৃতি
ব্যাঙ্কল ওত হইয়া বিধবার নিরা-
শা শবার ব্যক্তি করিলেন। নিজা
হইল না, বার কাল্যাকালের কথা যনে
লাগিতে লাগিল বার বৌবনের জন-
রকে যনে পাঠালাগিল, বার বার সেই
সব-বেধবোর কৈশা সপ্তবিংশ বৎসর
পর বিধবার আবার মন করিতে
লাগিল। বস মুখ চাকিয়া নীরবে
কানিয়া অভা নিজা বাইল। নিজা স্বপ্ন-
পূর্ণ, বোধ হইল, ছাদের উপর হইতে
তাহার বৌবনোমী, সেই তেজঃপূর্ণ রমণী-
কান্ত উন্নতস্থাত গাইতেছেন। চমকিত
হইয়া হতভী উঠিল, প্রাতঃকাল হই-
রাছে, সূর্য্যি বৃক, তড়াগ ও শত্ৰুক্ষে
রঞ্জিত হই; আর সেই সূর্যালোকে
দণ্ডায়মান উন্নতস্থানে সরস্বতী ঠাকুর
বেদগান করছেন।

তাহার—তাহার পর দিন দিন
যখন সন্ধ্যার আঁট দিতে আসিতেন,
প্রাতঃকাল অপরাহ্নে কলমলাদি লইয়া
আসিতেন, তার সময় প্রদীপ জালিয়া
আনিতেন, যোগমারী শান্ত হৃদয় উষ্ম
হইত, বোধের শান্ত চিত্ত অশেষ চিন্তা-
তরঙ্গে আহুত! আর যখন সরস্বতী
ঠাকুর কালে উন্নতস্থানে শিষ্য-
দিগের উপনিষৎ পাঠ করিতেন
অথবা নিশি পর্য্যন্ত একাকী
নীপালোমী সঙ্গীতপূর্ণবরে মহাতারত
বা পুরাণ করিতেন,—যোগমারী
নিশ্চেষ্ট হইয়া পাঠকের দিকে চাহিয়া
থাকিতেন তখন হইয়া সেই অমৃত-
বচন শ্রবণ। তাহার জীবন আনন্দ-

পূর্ণ হইত, হৃদয় শান্তিপূর্ণ হইত। পাঠ-
শেষ হইলে হতভামিনী বীণনিধাব করিয়া
করিয়া, সেই বোগিবরের দিকে চাহিয়া
চাহিয়া, নৃত্যবরে নিজ আবাসে ফিরিয়া
যাইতেন। এ কি বৌবনের উদ্বেগ—
যোগমারীর বৌবন ত অনেক দিন পায়
হইয়া গিয়াছে। এ কি নুভন ঐশ্বরের
উদ্বেগ? যোগমারীর হৃদয় ত ঐশ্বরের
আকাজকা অনেক দিন তুলিয়াছে। তথাপি
সন্ধ্যাসী সেই প্রশান্ত মুখবত্তের দিকে
দেখিলেই যোগমারীর বেন পূর্ণবৃতি উদয়
হইত, হৃদয় বিলোড়িত হইত, মন নানাক্রপ
চিন্তা বা কল্পনা বা স্বপ্নে ভাসিয়া বাইত।

যে দিন সরস্বতী ঠাকুর আপন জীবন-
ইতিহাস হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রকে বলেন,
সে দিন যোগমারীর হৃদয় নানাক্রপ চিন্তার
একেবারে ব্যাকুল ও বিপর্য্যস্ত হইল। সর-
স্বতী ঠাকুর বনীর সন্তান ছিলেন, সরস্বতী
ঠাকুর অষ্টাদশ বৎসর বয়সে একটি সন্তানে
পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, সরস্বতী ঠাকুর
পশ্চিম হইতে পুনরায় সনাতনবাণীতে
ফিরিয়া আসিয়াছেন। সরস্বতী ঠাকুর কি—?
বিধাতা, রক্ষা করুন! আমি বেন বুধা লোভে
লুভ না হই, আমি বেন পাগমোহে হুহ না
নই, আমি বেন পাগলিনী না হই।

করেকদিন ধরিয়া যোগমারী ব্যাকুলচিন্তা
হইয়া রহিলেন, পূর্ণবৃতি ও নব-অপরিমিত
আশাতে সে শুভ হৃদয় উবলিতে লাগিল।
পরে যে দিন সরস্বতী ঠাকুর যোগমারীর
নিকট যোগমারীর স্বামীর কথা ও
সম্পত্তির কথা উত্থাপন করেন ও কামিনী-
কান্তের বৃহদীস সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
রমণীকান্তের কথা উত্থাপন করেন, তখন
যোগমারীর মনে আর সন্দেহ রহিল না।
ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ স্বামীর চরণে আশ্রয়

বাইরা পড়িয়া তখনই সে প্রিয় চরণ দুইটি জড়াইয়া ধরেন। কিন্তু স্বামী কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন? স্বামী কি তাহাকে গ্রহণ করিবেন? স্বামী ত এত দিন অবধি তাঁতাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, সে বিষয়ে পরিচরও দিলেন না, স্ত্রীর কি সে পরিচর প্রথমে দেওয়া ভাল? নানা চিন্তার অভিভূত হইয়া যোগমায়ার সে দিন রাজে জল গ্রহণ না করিয়া শুইলেন।

রাজে ঘুম হইল না। নানা কথা মনে উদয় হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীর অবয়ব, সন্ন্যাসীর বেদপাঠ, সন্ন্যাসীর খুলিটি মনে পড়িতে লাগিল, সন্ন্যাসীর খুলির ভিতর একটি ছোট বাক্স আছে, তাহা মনে পড়িতে লাগিল। বাক্সের চাবিটি বালিসের নীচে রাখিয়া সন্ন্যাসী নিজা ঘান, তাহা যোগমায়ার দেখিয়াছেন। মনে হইল, বাক্সে কি আছে? বাক্সে একবার খুলিয়া দেখিব? তাঁহার মনে আমি খুলিব, ইহাতে কি দোষ আছে?

দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় দীপ হস্তে করিয়া যোগমায়ার সন্ন্যাসীর ঘরে বাইলেন, বালিসের নীচে হইতে আঙুলে আঙুলে চাবিটি বাহির করিলেন, বাক্সটি খুলিলেন। বাহা দেখিলেন, যোগমায়ার চক্ষু দিয়া বহু বহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। রমণীকান্ত বিবাহের পর মাতার একগাছি দড়াহাড় বধুকে দিয়াছিলেন, যোগমায়ার স্বামীর প্রথম উপহারটি ক্রমশঃ করিয়া লইয়াছিলেন। কাহারও কাছে রাখিতে বিবাল হয় না বলিয়া স্বামীর কাছে সে ধন গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন, আজ সম্ভবতঃ বৎসর পর সেই গচ্ছিত ধনটি স্বামীর বাক্সে দেখিলেন। ইতিমধ্যে রমণী-বাবু আহত হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, বেশে বিশেষে ভিক্ষা করিয়া বাইরা

যোগমায়ার হারটি হস্ত করেন মাই যোগমায়ার গচ্ছিত ধন কসান করেন নাই। "প্রভু! তুমি বর্ষণ, তাই অজ্ঞা গিনীর গচ্ছিত ধনটি বহু রা রাখিয়াছ। আর একটি ধনও তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম,—সেটি আমার প্রথম ভালবাসা! যে দিন সমুদ্রইব, যে দিন তুমি অনুমতি দিবে, সে সে ধনটিও দাবী করিব।" সমস্ত রাত্রি হারটি বৃকে করিয়া যোগমায়ার সেই বসিয়া কাঁদিলেন; পরে হার পুনরায় বাখিয়া, চাবি বালিসের নীচে রাখিয়া, আ কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন।

রমাশ্রম বা রমণীকান্ত ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পরিচরণা হতাশাগিনী স্ত্রী ক্রমশঃ শরকে ভুলে,—সন্ন্যাসীর বেশে বা জটাভারে পাতা রমণীর চক্ষু প্রতারিত হয় না,—যোগমায়ার নিকট আর গোপন থাকিবার চেষ্টা নানা মাত্র। সুতরাং একদিন সন্ধ্যার সময় যোগমায়াকে গোপনে সমস্ত কথা বলিলেন, বিংশ বৎসর পর যৌবনের প্রণয়িনীকে যেরূপে ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন, সঘরে যোগমায়ার অশ্রু-মোচন করিয়া সেই শুষ্ক গুঠেন করিলেন; পরে অতিশয় গভীর হইলেন, "যোগমায়ার! ভগবানের প্রসাদে মায়ার আর এক দিন পরম্পরের মনের খুলিয়া বলিব, বহু বৎসর পর যৌবন-রস কথা শ্রবণ করিব,—এখন এই পর্য্যন্ত দিন আমি নিজ নামে প্রকাশ না হস্ত দিন আমি সন্ন্যাসী মাত্র, তুমি জর-গৃহের বিধবা। ইতিমধ্যে লোকে আমাদের জানিতে পারিলে আমাদের এই সংসার আছে,—কামিনীকান্ত-বাবুকে খোঁজা, সাধনা!"

রিলেন। মিসী-বাবুর সহিত বিবর-
বাদ নিশ্চ করিতে অধিক বিলম্ব হইল
।। কামি-বাবুর উকীলগণই বিবকচুর
মোকদ্দমা সা কামিনী-বাবুরকে বঞ্চে ৩০
সনা করিয়াগলেন, “আপনি যদি এ
রমণী-বাবুর জমীদারী অংশ নিবিশি
না ছাড়িয়া এবং রমণী-বাবুর নিকট
কমা প্রার্থনরররর তাঁহার সহিত আলাপ
না করেন, আমাদের সহিত আপনাদ
সম্বন্ধ এইখাশব হইল। আপনাদ মোক-
দ্দমা স্পর্শ না বর্জমানের উকীলগণ যেরূপ
কলঙ্কিত হচ্ছে, এরূপ কলঙ্কের ভার
আমাদের ব কখনও বহন করিতে হয়
নাই।” কামি-বাবু মহাবিক্রমশালী জমী-
দার, কিন্তু মহাবিপদে পড়িয়াছেন।
অচতুর স্ত্রম্যাবু তাঁহাকে ভাগ করিয়া-
ছেন, বর্জমা উকীলগণ তাঁহাকে ৩০ সনা
করিতেছেন। বাবু ইচ্ছা করিলে তাঁহার
বিরুদ্ধে পুর হাকীমার মোকদ্দমা স্থাপন
করিতে পা। রোবে গর্জন করিয়া
কামিনী-বসগতা। ভ্রাতার সমস্ত অংশ
ছাড়িয়া দি। ভিখাংসাপূর্ণ-হৃদয়ে কলি-
কাতার িএকটি বৃহৎ “জাতিসংরক্ষণ
সমাজ” স্থাকরিলেন এবং হৃদয়ের শান্তি-
লাভের জরবার বাইনাচ দিবার প্রস্তাব
করিলেন। বোজেতা স্ত্রম্যরীকে পুনরার
ডাকাইয়া ইলেন।

রমণীক তৃতীয় কার্য, —তারিণী-
বাবুর বিবরু মীমাংসা করা। তারিণী-
বাবু শেষের দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি বিন্দু
ও স্ত্রম্যকে। গিয়াছেন, কিন্তু তারিণী-
বাবুর বিবর বঞ্চিত করিয়া সে বিবর
গ্রহণ করিচল্ল ও শরচল্ল অস্বীকার
করিলেন। চল্ল বলিলেন, “বিবর সম-
স্তই বাণ্ডুয়া গ্রহণ করুন, ও বিবর

আমরা স্পর্শ করিব না।” রমণীকাত্ত ভর
করিলেন, “গোপবালা প্রথম যৌবনে বিববা
চল্লিছেন, তাঁহাকে দেখিবার স্তনিবার
। লোক নাই, অনেকগুলি টাকা হাতে
দেয়া তাঁহাকে শীত্র পাণের পথে প্রেরণ
করাই কি তোমাদের ইচ্ছা?” অনেক ভর্ক-
বিতর্কের পর স্থির হইল যে, হেম ও শরৎ
সে বিবর দখল করিবেন এবং বিবরের লাভ
কড়াকস্তি পর্যন্ত গণিয়া কিস্তি কিস্তি
গোপবালার নিকট প্রেরণ করিবেন। বোর
অভিমামিনী গোপবালা রোবে গর্জন করি-
লেন, আবার বিন্দু ও স্ত্রম্যর নিকট ভিক্ষা
গ্রহণ করিতে হইল, এই অভিমানে ক্রন্দন
করিলেন। তিনি বিন্দু ও স্ত্রম্যর সহিত দেখা
করিলেন না, তালপুতুর গ্রামে মৃৎ দেখাইলেন
না, গোতুলচল্লকে সঙ্গে লইয়া বিবর
উদ্ধারের পরামর্শ করিবার জস্ত কলিকাতার
চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পর গোতুলচল্ল
বার্ষপ্রযত্ব হইয়া ফিরিয়া আসিল, গোপ-
বালার আর কোন খবর পাওয়া গেল না।
বিন্দুকে লোকে বলিত, গোপবালা পরামর্শ
গ্রহণ জস্ত স্ত্রম্য-বাবুর বাণীতে সর্বাধা
যাতারাত করিতেন।

রমণীকাত্তের তৃতীয় কার্য, —পুত্রের
বিবাহ স্থির করা। অনেক দিন পরে রমণী-
বাবু হেমচল্লের নিকট আপন জীবন-ইতি-
হাস ব্যাখ্যা করিবার সময় ভিন্ন জাতির
মধ্যে বিবাহ বিধের কি না, সে বিবরে হেম-
বাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হেম-
বাবু এখন সে প্রশ্নের উত্তর বুঝিলেন। তিনি
সানন্দে অঙ্গপূর্ণলোচনে যুবা দেবীপ্রসাদের
সহিত স্ত্রম্যলা যাতার বিবাহ দিতে সম্মত
হইলেন। স্ত্রম্যলার মাসী স্ত্রম্যলাকে ক্রন্দন
করিয়া বলিলেন, “দোখল বাছা, বড় বড়
বো হুঁজে যেন আমাদের তুলে বাস নি।”

ব্রাহ্মণ-পুত্রের সহিত কারু-কন্ডার
বিবাহ হইবে ভাবিয়া বহুদিনেই হুলস্থূল পড়িয়া
গেল। কিন্তু হেমচন্দ্র ও রমণীকান্ত কার্যো
ব্রতী হইলো লোকনিন্দা বা লোকতরে
স্বার লোক নহেন। বিবাহের দিন
হইল, বর্ধমানের বিবাহের পত্র হইয়া গেল,
তালপুকুর গ্রামে মহানমারোহে বিবাহ হইবে
হির হইল।

পরদিন মৈমনসিংহে করিয়া গেলেন,
কিন্তু স্থা বিবাহ না দেখিয়া যাইবেন না
বলিয়া ক লইয়া হেম ও বিষ্ণুর
সহিত তালপুকুরে আসিলেন। এমিকে
রমণীকান্ত ও যোগমারা মহানমারোহে সনা-
তনবাগীতে আসিয়া আগুনানিগের জমীদারী
কেন্দ্র করিয়া বসিলেন। সনাতনবাগীতে হল-
স্থূল পড়িয়া গেল; হাটে বাজারে আজ
নতুন জমীদারের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই,
পুকুর-ঘাটে মেরে-মহলে আজ যোগমারার
কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই। ফুলুমারী কলসী
গাকে করিয়া ঘাটে পাড়াইয়া বলিতে লাগি-
লেন, “ওলো, মিন্বে যোগীও নয়, সন্ন্যাসীও
নয়, আমাদের ভিন্ন আদী জমীদার লো!
বাধার জটা কেলে দিবে ঠিক কেন ক্রান্তিক
ঠাকুরের মত রূপ হয়েছে। যোগমারা দিদির
খুব কপাল-জার!”

ফুলুমারী হাতে মিসি দিতে দিতে
বলিলেন, “ও লো, কপাল-জোর মিন্বেয়!
কালীগড়ে কাপড় পরি, গারে গরনা দিবে
যোগমারা দিদির কেম্ব রূপ ঘেরিয়েছে
কোথেনিস? ঠিক কেন রাধা বোটি বর্ধমান
থেকে বয়ে এল!”

ফুলুমারী আকুতা-বাধা রাধা চরণ
হইতে হইতে বলিলেন, “ও লো, যোগমারা
দিদি রাধা বো হবে কেন? রাধা বো যে
হয়ে আসিছে।”

হেমফুমারী কলসী নাড়াইয়া
বিনিমিত নিবিড় কৃষ্ণ বেশ্যার
খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “হা
নম বে, রমণী-বাবুর
জ্বর জ্বর-বাবুর মেয়ের মত সখ
বাধা”

গরানী, ফুলুমারী তাবিজ-
বাধা হাত নাড়িয়া বলিলেন, “পোড়া-
কপালী! তাও কি হয় লো আমরা যে
বামুন লো, আমরা যে দেবী যে আমাদের
সঙ্গে কি করেতমের বিয়ে কথায়?”

রমণীকান্ত গ্রামে আসিয়া এর ইতর
ভক্ত সকলকে বজ্র, মিঠার ও নানা উপহার
বিতরণ করিলেন; যোগমারা জ্বর-গৃহের
বৌ, বি, প্রাচীনা, নবীনা, সব সন্মান
করিয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার বিা করি-
লেন। গ্রামে নতুন জমীদারের জরকার
হইতে লাগিল, জমীদার-গৃহে জ্বর-ঘাটে
যোগমারার চরিত্র-সমালোচন কিছুদিন
স্থগিত রহিল। প্রাচীনাগণ র তসর-
গরদের কাপড় পরিয়া অহুগ্রহ বা বলি-
লেন, “না, বাছা যোগমারার
আছে, আমাদের জন্ত একটু ও আছে,
তা ও চিরকালই বলেছি। ভবোলা মন্দ,
তাই একটা ইতরজাতির সতীকরেছিল,
তারই ছেলেটাকে ক্বারেতমের বিয়ে
হিছে; নিতান্ত ভাড়া কপালমলে কি
বামুনের মেরে বো হয়ে কাকের সঙ্গে
সখ্য করে?”

গ্রামের পণ্ডিতাভিমাত্রী শরণ দল
বহু হইয়া একদিন রমণী-বাবুর ট পিরা
এরূপ গহিত সখ্য করিতে মিলিলেন
সমাজের আদেশ লইয়া শান্ত কা
করা ভাষা, এইরূপ নানা তবিলেন
রমণী-বাবুর হা-হা জিজ্ঞাসা রিলেন

